প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা। আশ্বিন ১৩৩৪ সাল।

ধূপছায়া

সম্পাদক—শ্রীরেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়— শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

প্রতি সংখ্যা ।০ আনা। বার্ষিক ৩৷৵০ আনা

Miller & Co's

Pipe-tone Organs & Harmoniums
with

high pipe-cells and enlarged scale reeds are acknowledged to be the standard of perfection.

A few out of numerous letter received during July 1927.

A RECORD UNPARALLEL.

26th July, 1927.

Before placing an order for another organ I congratulate you on the excellant organ supplied 4 years ago. To day it is better than when it was purchased.

(*Sd.*) J. K. Deva.

Dehra Dun. *29th July, 1927.*

* * * My unbounded appreciation of the instrument made for me......is far beyond my expectation. * * * Apart form its merit as an unique instrument it can occupy the place of a Drawing-room furniture.

(*Sd.*) A. Raja Ram.
Acctt. 1/2nd Gurkhas.

Rai Bareli. *16th July, 1927.*

* * * Indeed it is a marvel at the price.......

(*Sd.*) Mashud Ahmed.

Gorakhpur. *1/7/27.*

* * * Quite pleased with the organ. Accept my best thanks.

Sd. (Miss.) E. B. Samuel.

NEW LIST FREE.
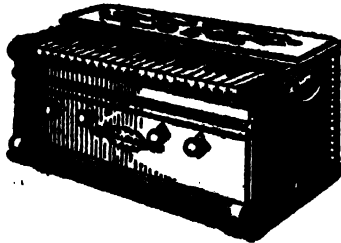
Miller & Co.

7, Lower Chitpore Road,
CALCUTTA.

বোলো নার্শারী

তাজা দেশী বিলাতী সব্জী ও ফল ফুলের বীজ, নানা জাতীয় ফল ফুলের চারা ও জোড় কলম, ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বৃদ্ধিকারক সার, মৎস্য ধরিবার হুইল, বঁড়শি, সুতা ও চার প্রভৃতি সর্ব্বদা পাওয়া যায়। উদ্যান রচনা, উদ্যান পরিদর্শন ও জীর্ণ উদ্যানের সংস্কার ও উৎসব উপলক্ষে গৃহ প্রাঙ্গনাদির সুশোভনের ভার সুলভে লইয়া থাকি।

ম্যানেজার—ডি, বোলোরাম।

আফিস—৭নং সৃষ্টিধর দত্তের লেন, হাতিবাগান, কলিকাতা।

H. K. MITRA.

Pro.—**J. K. MITRA & CO.**

Precious stone merchants, Jewellers, Opticians & Watch makers.

Direct Importers of

Watches, Clocks, Time-Pieces & Optical goods.

112, College Street, Calcutta

বেদনাঞ্জন

বেদনাঞ্জন বাত ও বেদনা, শিরঃপীড়া, যাবতীয় চক্ষু, চর্ম্ম ও দন্তরোগ এবং আভিবাতিক রোগ মাত্রেরই সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী। মূল্য মাত্র ।৶০ আনা, মাশুল স্বতন্ত্র।

সকল ষ্টেশনারী, বড় বড় ডাক্তার খানা ও নিম্নলিখিত স্থানে পওয়া যায়।

এ, সি, চ্যাটার্জ্জি ব্রাদার্স

৪৫নং ষ্টলকাট লেন, সালিখা, হাওড়া।

ডাঃ এ, সেন, এম, বি'র

"ফি-ফো" ট্যাবলেট

কলিকাতার প্রধান প্রধান ডাক্তারগণ ম্যালেরিয়া জ্বরে "ফি-ফো" ট্যাবলেট ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহা একাধারে প্রতিষেধক, রোগবিনাশক ও বলসম্পাদক।

প্রাপ্তিস্থান—২৫নং বলরাম মজুমদার ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

এজেন্ট—মেসার্স বি, কে, পাল এণ্ড কোং।

সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার
ইন্দু মাধব মল্লিকের, (এম.এ,এম.ডি,বি.এল)
ইক-মিক কুকার
সমগ্র ভারতে আড়াই লক্ষ ইকমিক প্রচলিত ও সমাদৃত
ইহাতে অতি সহজে ভাত, ডাল, তরকারী, মাংস প্রভৃতি
সকল রকম আমিষ ও নিরামিষ খাদ্য ১ ঘণ্টার মধ্যে
এক সঙ্গে আধপয়সার কয়লা,গুল বা কেরোসিনে
বিনাক্লেশে রান্না হয়। দশঘণ্টা রাখিলেও খাদ্য
ধরিবার বা পুড়িবার ভয় নাই। আধুনিক ইকমিকের
বহুবিধ নূতন নূতন প্রণালী ও উন্নতি সাধনের বিস্তৃত
বিবরণ জানিবার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন
টেলিফোন নং
আফিষ
৮৫৯ বড়বাজার
কারখানা
৩৯৮৪ কলিকাতা
ম্যানেজার ইকমিককুকার
২৯নং কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

বিষয় সূচী

বিষয় সূচী

বিষয় সূচী

ধূপছায়ার নিয়মাবলী।

মূল্য—

ধূপছায়ার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩।৵০ ও ষান্মাষিক ১৸০, প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। নমুনার মূল্যও ।০ আনা। বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ধূপছায়ার বৎসর গণনা করা হয়। মূল্যাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হয়। ভিঃ পিঃতে কাগজ পাঠাইতে অনেক অসুবিধা সুতরাং আগে মণিঅর্ডারে টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হইলে, আমাদের ও গ্রাহকদের সকলেরই সুবিধা।

অপ্রাপ্ত সংখ্যা—

ধূপছায়া প্রতি বাংলামাসের ১লা প্রকাশিত হয়। সুতরাং কোন মাসের কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া ডাক বিভাগের উত্তরসহ সেই মাসের ১০ই তারিখের মধ্যে আমাদের নিকট অপ্রাপ্তি সংবাদ পৌছান আবশ্যক।

পত্রোত্তর—

রিপ্লাই কার্ড বা ডাকটিকিট না পাঠাইলে কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব নয়।

রচনা—

সকল রচনা সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। টিকিট দেওয়া থাকিলে অমনোনীত রচনা গল্প কবিতা ফেরৎ দেওয়া হয়। রচনা কেন অমনোনীত হইল তৎসম্বন্ধে সম্পাদক কোনও উত্তর দিতে অসমর্থ। ফেরৎ রচনাদি লেখকদিগের নিকট পৌছান সম্বন্ধে আমরা দায়ী নহি। কাগজের এক পৃষ্ঠায় মার্জ্জিন দিয়া ফাঁক ফাঁক করিয়া পরিষ্কার অক্ষরে রচনা না পাঠাইলে প্রকাশিত না হইবারই বেশী সম্ভাবনা।

বিজ্ঞাপন—

কোনও মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বের মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হয়। বিজ্ঞাপন বন্ধ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ব্লক ফেরৎ লইবেন। ব্লক কোন প্রকারে ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই, যদিও ব্লক যাহাতে না ভাঙ্গে সে সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন লওয়া হইয়া থাকে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিজ্ঞাপনে হার নিম্নে দিলাম।

নিবেদক—কার্য্যাধক্ষ—**ধূপছায়া**।
কার্য্যালয়—১৪নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

আশ্বিন মাস হইতে "ধূপছায়া"র কলেবর বৃদ্ধি হওয়াতে বিজ্ঞাপনের হারের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিল।

বিজ্ঞাপনের হার।

প্রথম কভারের অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	...	...	৩০৲ টাকা
দ্বিতীয় " পূর্ণ "	...	...	৩০৲ টাকা
" " অর্দ্ধ "	...	...	১৬৲ টাকা
তৃতীয় " পূর্ণ "	...	...	৩০৲ টাকা
" " অর্দ্ধ "	...	...	১৬৲ টাকা
চতুর্থ " পূর্ণ "	...	...	৫০৲ টাকা
সাধারণ " পূর্ণ "	...	...	১৫৲ টাকা
সাধারণ " অর্দ্ধ "	...	...	৮৲ টাকা
" " সিকি "	...	...	৫৲ টাকা
সূচীর নীচে অর্দ্ধ "	...	...	১০৲ টাকা
" " সিকি "	...	...	৬৲ টাকা
টাইটেল পৃষ্ঠার সম্মুখের পৃষ্ঠা	...	...	১৬৲ টাকা
আরম্ভের সম্মুখের পৃষ্ঠা	...	...	১৬৲ টাকা

নিবেদক—
কার্য্যাধ্যক্ষ—ধূপছায়া।

(মাসিক সাহিত্য পত্রিকা)

প্রথম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ২য় খণ্ড

আশ্বিন, ১৩৩৪ সাল

সম্পাদক

শ্রীরেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

পরিচালক

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীপ্রণবদেব মুখোপাধ্যায়।

ধূপছায়া কার্য্যালয়

১৪নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"ধূপছায়া" কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়

সমীপেষু—

১৬নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহাশয়!

আমি আপনাদের পত্রিকা "ধূপছায়া"র বার্ষিক গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করি। অতএব প্রকাশিত সংখ্যাগুলি নিম্নলিখিত ঠিকানায় ভিঃ পিঃ করিয়া আমাকে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবেন। ইতি—

নাম—

ঠিকানা—

(মাসিক সাহিত্য পত্রিকা)

প্রথম বর্ষ—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

—বৈশাখ হইতে চৈত্র—

১৩৩৪ সাল

সম্পাদক

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

শ্রীরেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়।

সহ-সম্পাদক

শ্রীসুরেন ভট্টাচার্য্য।

পরিচালক

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীপ্রণবদেব মুখোপাধ্যায়।

ধূপছায়া কার্য্যালয়

১৪নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ধূপছায়া

সূচীপত্র

প্রথম বর্ষ—প্রথম খণ্ড

—বৈশাখ হইতে ভাদ্র—

১৩৩৪

সূচীপত্র

—প্রথম বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড—

[আশ্বিন থেকে চৈত্র, ১৩৩৪]

—:o:—

ত্রুটী

জ্যৈষ্ঠ মাসের ক্রমিক পত্র সংখ্যা ভুলক্রমে "১" হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আসল সংখ্যা, প্রত্যেকের সহিত ৫৮ যোগ করিয়া লইলেই পাওয়া যাইবে। পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া এই ত্রুটীটুকু সংশোধন করিয়া লইবেন। —ইতি ধূঃ সঃ

[আশ্বিন ১৩৩৪]

মনের বাগান বাড়ি

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভালবাসা অর্থে আত্মসমর্পণ নহে। ভালবাসা অর্থে, নিজের যাহা কিছু ভাল তাহাই সমর্পণ করা। হৃদয়ে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা নহে; হৃদয়ের যেখানে দেবত্র-ভূমি, যেখানে মন্দির, সেইখানে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা।

যাহাকে তুমি ভালবাস', তাহাকে ফুল দাও, কাঁটা দিওনা; তোমার হৃদয়-সরোবরের পদ্ম দাও, পঙ্ক দিওনা। হাসির হীরা দাও, অশ্রুর মুক্তা দাও, হাসির বিদ্যুৎ দিওনা, অশ্রুর বাদল দিওনা। প্রেম হৃদয়ের সারভাগ মাত্র। হৃদয় মন্থন করিয়া যে অমৃত উঠে তাহাই। ইহা দেবতাদিগের ভোগ্য। অসুর আসিয়া খায়, কিন্তু তাহাকে দেবতার ছদ্মবেশে খাইতে হয়। যাহাকে তুমি দেবতা বলিয়া জান তাহাকেই তুমি অমৃত দাও, যাহাকে দেবতা বলিয়া বোধ হইতেছে তাহাকেই অমৃত দাও। কিন্তু এমন মহাদেব সংসারে আছেন, যিনি দেবতা বটেন, কিন্তু যাঁহার ভাগ্যে অমৃত জুটে নাই, সংসারের সমস্ত বিষ তাঁহাকে পান করিতে হইয়াছে, আবার এমন রাহুও আছে যে অমৃত খাইয়া থাকে।

যাঁহাকে তুমি ভালবাস', তাঁহাকে তোমার হৃদয়ের সমস্তটা দেখাইও না। যেখানে তোমার হৃদয়ের পয়ঃপ্রণালী, যেখানে আবর্জ্জনা, যেখানে জঞ্জাল, সেখানে তাঁহাকে লইয়া যাইও না; তাহা যদি পার' তবে আর তোমার কিসের ভালবাসা! তাঁহাকে তোমার হৃদয়ের এমন অঞ্চলের ভিত্তিতে জড়

করিবে, যেখানে ম্যালেরিয়া নাই, ওলাউঠা নাই, বসন্ত নাই। তাঁহাকে যে বাড়ি দিবে তাহার দক্ষিণ দিকে খোলা, বাতাস আনাগোনা করে, বড় বড় ঘর, সূর্য্যের আলোক প্রবেশ করে। ইহা যে করে সেই যথার্থ ভালবাসে। এমন স্বার্থপর প্রণয়ী বোধ করি নাই, যে মনে করে, তাহার প্রণয়ীকে তাহার হৃদয়ের সমস্ত বাঁশঝাড়ে ঘুরাইয়া, সমস্ত পচা পুকুরে স্নান করাইয়া না বেড়াইলে যথার্থ ভালবাসা হয় না। অনেকের মত তাহাই বটে, কিন্তু সঙ্কোচে পারিয়া উঠে না। এ বড় অপূর্ব্ব মত।

অনেকে বলিয়া উঠিবেন, "এ কি রকম কথা; যাঁহাকে তুমি খুব ভালবাস', যাঁহাকে নিতান্ত আত্মীয় মনে করা যায়, তাঁহার নিকটে মনের কোন ভাগ গোপন করা কি উচিত?" উচিত নহে ত কি? সর্ব্বাপেক্ষা আত্মীয় "নিজের" নিকটে স্বভাবতঃ অনেকটা গোপন করিতে হয়। না করিলে চলে না, না করিলে মঙ্গল নাই। প্রকৃতি যাহাদের চক্ষের পাতা দেন নাই, যাহারা আবশ্যক মত চোক বুজিতে পারে না, মনে যাহা কিছু আসে, যে অবস্থাতেই আসে, তাহাদের কুম্ভীর-চক্ষে পড়িবেই, তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত দুর্দ্দশা। আমরা অনেক মনোভাব ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি না, চোক বুজিয়া যাই। এরূপ করিলে সে ভাবগুলিকে উপেক্ষা করা হয়, অনাদর করা হয়। ক্রমে তাহারা ম্রিয়মান হইয়া পড়ে। এই ভাবগুলি, প্রবৃত্তিগুলি যদি ঢাকিয়া রাখা না যায়, পরস্পরের কাছে প্রকাশ করিয়া, বৈঠকখানার মধ্যে, কথাবার্ত্তার মধ্যে, তাহাদের ডাকিয়া আনা হয়, তাহাদের সহিত বিশেষ চেনা শুনা হইয়া যায়, তাহাদের কদর্য্য মূর্ত্তি এমন সহিয়া যায় যে, আর খারাপ লাগে না, সে কি ভাল? ইহাতে কি তাহাদের অত্যন্ত আস্কারা দেওয়া হয় না? একে ত যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে ভাল জিনিস দিতে ইচ্ছা করে। দ্বিতীয়তঃ তাহাকে মন্দ জিনিষ দিলে মন্দ জিনিষের দর অত্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া বিষ দেওয়া, রোগ দেওয়া, প্রহার দেওয়াকে কি দাতাবৃত্তি বলে?

দোকানে হাটে, রাস্তায় ঘাটে, যাহাদের সঙ্গে আমাদের সচরাচর দেখা শুনা হয়, তাহাদের সঙ্গে আমাদের নানান্ কাজের সম্বন্ধ। তাহাদের সঙ্গে আমাদের নানা সাংসারিক ভাবের আদান প্রদান চলে। পরস্পরে দেখাশুনা হইলে, হয় কথাই হয় না, নয় অতি তুচ্ছ বিষয়ে কথা হয়, নয় কাজের কথা চলে। ইহারা ত সাধারণ মনুষ্য। কিন্তু এমন একজনকে আমার চ'খের সামনে আমার মনের প্রতিবেশী করিয়া রাখা উচিত, যে আমার আদর্শ মনুষ্য। সে যে সত্যকার আদর্শ মনুষ্য এমন না হইতে পারে; তাহার মনের যতটুকু আদর্শভাব সেইটুকু সে আমার কাছে প্রকাশ করিয়াছে। তাহার সঙ্গে আমার অন্য কোন কাজ কর্ম্মের সম্পর্ক নাই, কেনাবেচার সম্বন্ধ নাই, দলিল দস্তাবেজের আত্মীয়তা নাই। আমি তাহার নিকট আদর্শ, সে আমার নিকট আদর্শ। আমার মনের বাগান বাড়ি তাহার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছি, সে তাহার বাগানটি আমার জন্য রাখিয়াছে। এ বাগানের কাছে কদর্য্য কিছুই নাই, দুর্গন্ধ কিছুই নাই। পরস্পরের উচিত, যাহাতে নিজের নিজের বাগান পরস্পরের নিকট রমণীয় হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করা। যত ফুলগাছ রোপন করা যায়, যত কাঁটাগাছ উপড়াইয়া ফেলা হয় ততই ভাল। এত বানিজ্য ব্যবসায় বাড়িতেছে, এত কল-কারখানা স্থাপিত হইতেছে যে, গাছ-পালা-ফুল-ভরা হাওয়া খাইবার জমী কমিয়া আসিতেছে। এই নিমিত্ত তোমার মনের এক অংশে গাছপালা

রোপণ করিয়া রাখিয়া দেওয়া উচিত; যাহাতে তোমার প্রিয়তম তোমার মনের মধ্যে আসিয়া মাঝে মাঝে হাওয়া খাইয়া যাইতে পারেন। সে স্থানে অস্বাস্থ্য-জনক দূষিত কিছু না থাকে যেন, যদি থাকে তাহা আবৃত করিয়া রাখিও।

সত্যকার আদর্শলোক সংসারে পাওয়া দুঃসাধ্য। ভালবাসার একটি মহান্ গুণ এই যে, সে প্রত্যেককে নিদেন এক জনের নিকটও আদর্শ করিয়া তুলে। এইরূপে সংসারে আদর্শ ভাবের চর্চ্চা হইতে থাকে। ভালবাসার খাতিরে লোককে মনের মধ্যে ফুলের গাছ রোপণ করিতে হয়, ইহাতে তাহার নিজের মনের স্বাস্থ্য সম্পাদন হয়, আর তাহার মনোবিহারী বন্ধুর স্বাস্থ্যের পক্ষেও ইহা অত্যন্ত উপযোগী। নিজের মনের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল জমীটুকু অন্যকে দেওয়ায়, ভালবাসা ছাড়া অমন আর কে করিতে পারে? তাই বলিতেছি ভালবাসা অর্থে আত্ম-সমর্পণ করা নহে, ভাল-বাসা অর্থে ভাল বাসা, অর্থাৎ অন্যকে ভাল বাসস্থান দেওয়া, অন্যকে মনের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল জায়গায় স্থাপন করা। যাঁহাদের হৃদয় কাননের ফুল শুকাইয়াছে, ফুলগাছ মরিয়া গিয়াছে, চারিদিকে কাঁটাগাছ জন্মিয়াছে, এমন সকল অনুর্ব্বরহৃদয় বিজ্ঞবৃদ্ধেরাই ভালবাসার নিন্দা করেন।

বিশ্বভারতীর অনুমত্যানুসারে।

{ 'বিবিধ প্রবন্ধ'—— কবির ষোল বছরের রচনা

—"আনন্দময়ীর আগমনে"—

—শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়

মা আসিতেছেন।

আটকোটী-(x+y)* বঙ্গবাসীর মানসসরোবরে আনন্দের শ্বেতশতদল আজ পরিপূর্ণ বিভ্রমে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে;—এখন সেখানে না আছে পানীয়ের পবিত্রতা, স্নানের তৃপ্তি, বা সন্তরণের উল্লাস। মায়ের পূজায় আজ সকলেই কণ্ঠাগত-প্রাণ, অর্থাৎ উৎগ্রীব।

কিন্তু মাকে চিনিতে পারিল কয়জন? ভাই বাঙালী, একবার তন্মত হইয়া ভাবিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে, মা ঐশী শক্তিও ন'ন, দৈবশক্তিও ন'ন, জড় প্রকৃতিও ন'ন, দেশমাতাও ন'ন। মা আমাদের ম্যালেরিয়া। শরৎ ও হেমন্তের সন্ধিক্ষণে, যখন বসুন্ধরার রস মরিতে থাকে, কাশ-বনের কেশে পাক ধরে, এবং নীলাম্বরের লোল চর্ম্ম ছিন্ন মেঘের আকারে সঙ্কুচিত হইয়া যায়, সেই সময়ে ইঁহার আবির্ভাব।

ইঁহার প্রভাবে চারিদিকের অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায় লক্ষ্য করিয়া দেখ—স্বয়ং লক্ষ্মী গতৈশ্বর্য্যা, হতশ্রী, তাঁহার সমস্ত Cash ও Commodities হাৎড়াইয়া মিলিতে পারে কয়েকটা কানাকড়ি, ও দুএকটা পদ্মাবাণী বিতন্ত্রবীণা,—যন্ত্রের অভাবে, অথবা সুরবোধের অভাবে কাঠি বাজাইতেছেন। আর বিদ্যার কথা কি বলিব, বাগ্‌দেবী দাঁড়াইয়া আছেন। বহু-কাল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পা ভারিয়া গিয়াছে। এখন একপায়ে মাত্র ভর করিয়া দাঁড়াইয়াছেন;—ক্লাসে যে ছেলে দিনের পর দিন বেঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া থাকে তাহার বিদ্যার দৌড় বুঝিতে কাহারও বাকী থাকে না। আরও দেখ, বামে বলরূপী কার্ত্তিকেয়,—rapidy losing weight এখন ময়ূরে চড়িয়াছেন।—দুদিন পরে হাওয়ায় উড়িবেন। দক্ষিণে সিদ্ধিদাতা গণেশ, মূষিকবাহনে ঘরে ঘরে সিদ্ধি দান করিয়া ফিরিতেছেন। ঐ বরবপু! তার অমন বাহন! Rate of progress সহজেই অনুমান করা যায়, আর পাড়ার লোকের সিদ্ধিলাভ কতটা হইতেছে, তাহাও বুঝিতে বিলম্ব

* x এবং y অজ্ঞাত সংখ্যা। x মানে যাঁরা হিন্দু নহেন, আর y হ'চ্ছেন যাঁরা হিন্দু হয়েও প্রতিমাপূজক নন।

হয় না।

দেবী স্বয়ং সিংহবাহিনী। সিংহ—যে হিংসা করে বা দংশন করে—দংশ—ডাঁশ,—মশা। মশক বাহনে ইনি গৃহে গৃহে প্রবেশ লাভ করিতেছেন। ইনি দশভুজে দশ প্রহরণ ধারিণী। কিন্তু মহিষাসুরবধে নিয়োগ করিয়াছেন দুইটী অস্ত্র,—একদিকে বর্ষা, অপরদিকে বিষধর; উদ্দেশ্য বিদ্ধ করা, এবং বিষ নিষেক করা, এক কথায়, Injection of poison.

মা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন মহিষাসুরনিপাতে। বছর বছর ঐ কার্য্যই করিয়া আসিতেছেন। মহিষাসুর সহজে ছাড়িবার পাত্র নয়। সে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিতে চায়। কিন্তু চাহিলে কি হইবে? মহামায়ার মায়ায় সে যে হীনবুদ্ধি, দীনবল। যুদ্ধ করিবে, অথচ নিজের পায়ে দাঁড়াইবার শক্তি নাই। বিপক্ষের পদপ্রান্তে নতজানু হইয়া সে যুদ্ধ করিবে। মনের অন্তঃস্থলে হয়ত একটু আশা আছে যে মরিলে স্বর্গে যাইতে পারিবে। তাই অনাদিকাল যুদ্ধ চলিল, এখনও সে তাহার শাণিত তরবারিকে খাপ হইতে টানিয়া বাহির করিতে পারে নাই।

মহিষাসুর বলিতে কি বুঝিব? যাহারা সুর, বা দেবতা নহে, অর্থাৎ যাহারা মর্ত্তবাসী তাহারাই অসুর। ইহাদের মধ্যে মহিষ কোনটী?

আমরা জানি মহিষ গোজাতীয় জীব। কেবল তাহার গলকম্বল নাই, এই টুকু প্রভেদ। তাই সন্দেহ হয় মহিষাসুর নামে শাস্ত্রকারগণ হয়ত আমাদিগকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কারণ আমাদেরও ত গলকম্বল নাই।

তবে তাহাই হউক। আমাদের জন্যই একবার আয় মা। তোর সখের মহিষাসুরকে সনাতন প্রথায় এবারেও বধ করিতে থাক্।

গরবিনী

—হুমায়ুন কবির

হে প্রিয় দুয়ারে তব এসেছিনু ভিখারিণী বেশে
বেদনা বিনত আঁখি অশ্রুজলে ভেসে
রজনীর শেষে।
বসন্ত-পূর্ণিমা রাতি, উচ্ছসিয়া উঠে বারে বার
আকুল দক্ষিণ বায়ু, আলোড়িয়া মরমের দ্বার
হৃদয় গুমরি' ওঠে বেদনার ভরে,
রজনীর পরিপূর্ণ রূপ হেরি' মোর অশ্রু ঝরে!

ভূতলে লুটায়ে পড়ি' কেঁদেছিনু তোমারে স্মরিয়া
কেন আসি' হাসি' মম হৃদয় হরিয়া
দাঁড়ালে সরিয়া!
যদি হরেছিলে হিয়া, কেন মোরে বাসিলেনা ভালো?
কেন মোর অন্ধকার হৃদিমাঝে জ্বালিলেনা আলো?
কেন হরিলে না প্রিয় প্রাণের ব্যর্থতা?
সকল জীবন ভরি' আজি মম অগ্নিময় ব্যথা!

আজি নিশি অবসানে দুঃখভারে অবসন্ন হিয়া
প্রভাতআলোক মাঝে পড়ে মূরছিয়া
কাতরে কাঁদিয়া !
ঘুচিবেনা কোনদিন এ জীবনে প্রাণের পিয়াসা
ফুটিবেনা এ পরাণে প্রেমপ্রীতিস্নেহ ভালবাসা,
অপ্রিয় জীবন মম কাটিবে ভুবনে,
দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ রাত্রি যাবে কাটি' মরণ-স্বপনে !

রজনীর অবসানে মলিন পাণ্ডুর শশীখানি
মুছিয়া আসিছে যেন বেদনার বাণী
কেন নাহি জানি !
সারা নিশি বসি' বসি' রচিয়াছে গগণের তলে
আপন প্রাণের স্বপ্ন, দিবা আসি আলোক অঞ্চলে
হেলায় মুছিল তার অন্তরের কথা,
তাই ব্যথাদীর্ণ এবে প্রাণহীন বিবর্ণ শুভ্রতা !

তোমার দুয়ারে সখা পড়েছিনু সারানিশি ভোর
ব্যথায় গুমরি' হিয়া বাজিয়াছে মোর
বহি আঁখিলোর !
তুমি মোর ভালবাসি কর নাই সফল জীবন
তোমার লাগিয়া তাই উতরোল বাজিছে ক্রন্দন
মুখরিয়া ব্যথাভারে হৃদয় আমার,—
আপন অন্তর মাঝে মূরছিয়া পড়ে বারবার !

তোমারে যে বাসিয়াছি ভাল আমি দেহমন দিয়া
তার লাগি খেদে মম রহিয়া রহিয়া
কাঁদে নাক হিয়া !
তুমি বাস নাই ভাল, নাই ভাল বাসিলে আমায়,—
তোমার প্রেমের পূজা চাব আমি কোন ভরসায় ?

আজিও দিয়েছি মম সকল পরাণ,
সেই আজি জীবনের পূর্ণতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান !

তবু যদি হিয়া কাঁদে, বারে বারে টলি শুধু পড়ে
একাকী চলিব পথ আহত অন্তরে
ব্যথা বুকে করে'
ভিখারিণী আমি তবু জীবনের সকল জীবন
বারেক দ্বিধা না করি তোমারে করিনু সমর্পণ
তাই আজি রিক্ত আমি, তবু মোর মনে
ঐশ্বর্য্য-গরব বাজে—সেই মম পাথেয় ভুবনে !

—:•:—

দূরের পাখী বসেছিলাম দু'দিন শাখার পর—

—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

বুঝারৎ !

জ্যৈষ্ঠদুপুরে মাঠের রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করে……

তে-পায়া টেবিলটি সুমুখে পাতিয়া জরীপের নক্সা দেখিয়া হাঁকি,—তেরশ' তেত্রিশ নম্বর খতিয়ান, দাগ নম্বর দু'হাজার অষ্টনব্বই—

যাহার জমী তিনি ভিড় ঠেলিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়ান।

সেট্‌লমেণ্টের সরদার আমীন……ইহাই আমার পেশা। বলি,—দেখান তো মশাই, আপনার কাগজ-পত্তর।

জমীর মালিক কাগজ-পত্তর দেখান। বলেন,—ভাগ-দখল। পেয়্‌জা শ্রীমুচিরাম মণ্ডল। পিতা ঈশ্বর—

মুচিরাম হাঁকিয়া উঠে,—হুজুর !

ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করি,—কি ?

মুচিরাম হাঁউ-মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠে,—কোরপা সত্ব হুজুর—ঠিকে—ঠিকেয় আজ বিশ বছর কচ্ছি—

জমীর মালিক চোখ পাকাইয়া বলেন,—ঠিকে না আমার ইয়ে ! কিচ্ছু নয়—সব মিছে কথা। কই স্থাপাক্‌দিকি কি আছে ওর কবচ-দাখিলে।

নিরুপায় …………

মুচিরামের চোক দিয়া জল পড়ে। বলে,—কবচ-দাখিলে তো কিচ্ছু নি হুজুর ! মুখির কোতায় জমী চষ্‌চি, খাজনা দিচ্ছি,—বয়েস তোর—সেই ওনার বাপের আমল থাক্‌তি—

কেমন যেন একটা সহানুভূতি জাগে। মনে হয়, কথাটা বোধ হয় মিথ্যা নয়। বলি,—পাশের কৃষাণ কেউ সাক্ষী আছে তোমার ?

বলে,—পাশ-কিয়ৎবেন্ তো আচে হুজুর, কিন্তু সাক্ষী দেবে কি না তা তো বলতি পাল্লোম নি। দয়া কোরে আপনি 'দিষ্টিপুটি' নিকে নাও—তারপর যা আচে আমার অদেষ্টে।

বলি,—সেই ভালো।

মালিক গরম হইয়া উঠেন। বলেন,—ডিস্পিউট্ কিসে হবে? কাগজ নেই, পত্তর নেই—

বলি;—সে কথা আপনি কামুন গো সাহেবকে বলবেন—আমাকে নয়।

ডিস্পিউট্ লিখি।

ভদ্রলোকটি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকেন। শেষে নরম হইয়া বলেন,—আজ বিকেলে বাসায় আপনার সঙ্গে দেখা করব কি?

দুঃসাহস দেখিয়া বিস্মিত হই। রাগে সমস্ত শরীরটা যেন ইস্পিস্ করিয়া উঠে। বলি,—কোন প্রয়োজন নাই। পাশের কৃষাণ অপেক্ষা আপনার এই প্রস্তাবটাই ওর প্রকৃত সত্বের পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ।

পূর্ব্বে বোধ হয় এমন কথা তিনি আর কখনও কোন আমীনের মুখ হইতে শুনেন নাই, তাই হঠাৎ যেন কেমন ভ্যাবাচাকা খাইয়া যান;—মুখে আর কথাটি ফুটে না।

মাটী লইয়া হিংস্র পশুর মত মানুষে-মানুষে কামড়া-কামড়ি.........লোভের অন্ত নাই......অর্থের অহঙ্কার মানুষের মহাসত্যকে কিনিতে চায়!

মাটী মাপিতে আসিয়া অনেক শিখি.........

দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, মানুষ যেন বিধাতার সৃষ্টি-শক্তির একটা বিরাট অপচয়!

বাসায় ফিরি......বেলা তখন প্রায় গড়াইয়া পড়ে।

পরের বাড়ী.........

অবস্থা নাকি এককালে খুব ভালোই ছিল; কিন্তু এখন ঐ শ্যাওলাধরা ভাঙা পাঁচীলটারই মত!

নিবিড় ঘন জঙ্গলের মধ্যে প্রকাণ্ড দো-মহলা পাকা বাড়ী। দেওয়ালে ও পাঁচীলে হয়ত কোথাও বিবর্ণ চুণ-সুরকী এখনও একটু লাগিয়া আছে, স্থানে স্থানে ইট্ বসিয়া স্তূপাকার, স্তূপের উপর আগাছার ঝোপ, কবেকার কোন্ এক ভূমিকম্পে দেওয়ালের খানিকটা অতি শোচনীয় রূপে ফাটিয়া গিয়াছে, সেই ফাটালের ভিতর হইতে এক শিশু বট তাহার সহস্র শাখা মেলিয়া যেন আকাশকে আলিঙ্গন করিবার উদ্দেশ্যেই মাথা-ঝাড়া দিয়া ঠেলিয়া উঠিয়াছে!

বুড়ী বলে,—সব ছিল বাবা, সব ছিল। এই বাড়ীতেই দোল-দুগ্‌গোচ্ছব—বারো মাসে তেরো পার্ব্বন!

বলিবার প্রয়োজন ছিল না—বাড়ীখানা দেখিয়া এখনও তাহা বুঝিতে পারি। জরা জীর্ণ পূজার দালানটা আজিও হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িয়া আছে।

বুড়ী বলে,—আজ খাঁ খাঁ করচে! কিন্তু এমন একদিন ছিল বাবা, যেদিন লোক-জন ছেলে-পুলেয় এই বাড়ীটা গম্ গম্ করত।

উজ্জ্বল অতীতের গৌরবময় চিত্রখানা বোধ হয় মনে পড়ে।—বুড়ীর চোখে জল আসে। বলে,—আজ আর কেউ নেই বাবা, আজ আর কেউ নাই। রাক্কুসী আমি সব খেয়েছি। আমার ত আর মরণ নেই বাবা, আকোন্দর ডাল মুড়ি দিয়ে এসেছি!

বলীরেখাআঁকা লোল গণ্ড বাহিয়া হু হু করিয়া জল ঝরিয়া পড়ে।.........বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকি—সান্ত্বনার বাণী খুঁজিয়া পাই না।

একটুখানি থামিয়া বুড়ী আবার বলে,—বাকী আছি শুধু আমি আর ঐ বৌ-টা। যমরাজ অরুচি—তাই এখনও এই অন্ধকার কোনে শিব রাত্তিরের সল্‌তের মত টিম্ টিম্ কোরো জ্বলছি আমরা!

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া নামে।

একঘেয়ে একটা ঝিঁঝিঁর শব্দ;—মনে হয় অন্ধকারের অতল গহ্বর হইতে এ যেন কোন্ এক অমুক্ত আত্মার আকুল আর্ত্তনাদ!

বাহির বাড়ীর শাখাবহুল আমগাছটার মাথায় রাজ্যের অন্ধকার আসিয়া বাসা বাঁধে।—সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া ক্লান্ত আঁখি দু'টি ঝিমাইতে থাকে।

সাড়াশব্দহীন গভীর অন্ধকারে বাড়ীখানা যেন প্রেত পুরীর মত ছম্ ছম্ করে।

বুড়ী বলে,—হাত-পা ধুয়ে মুখে একটু জল দাও বাবা।

সেই কোন্ সকালে দু'টি মুখে দিয়ে গেছ—তারপর সমস্ত দিনই ত মাঠে-বাটে!

তন্দ্রা টুটিয়া যায়।—চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখি কে আসিয়া কখন অদূরে আলো জ্বালিয়া জল-ছড়া দিয়া আসন পাতিয়া ঠাঁই করিয়া গিয়াছে!

বুঝিতে পারি না ব্যাপার কি।—আহারাদির বন্দোবস্ত ত আমি অন্যত্রই করিয়াছি। জিজ্ঞাসা করি,—এ সব আবার কি?

বুড়ী লজ্জিত হইয়া বলে,—এ আর কি বাবা, কিছুই নয়। সারাদিন রোদ্দুরে তেতে-পুড়ে এসছো—একটু ঠাণ্ডা হও। খেতে যাবার ত এখনও দেরী আছে।

একটি অবগুণ্ঠিতা তরুণী ছোট্ট একখানি রেকাবীতে গুটি কয়েক কচি তাল শাঁস, একটু ফুটি, একটুখানি গুড় ও একবাটি বেলের সরবৎ লইয়া পৃথিবীর লজ্জা ও কুণ্ঠা চরণে জড়াইয়া সসঙ্কোচে আসিয়া দাঁড়ায়।

অনুমানে বুঝি ঐটি বুড়ীর পুত্রবধূ। বলি,—আমার জন্যে আপনাদের আবার এ সব আয়োজন কেন মা?

বুড়ী বলে,—তা হোক। আর দেরী কর না বাবা;—নাও, উঠে পড়।

অগত্যা উঠিতে হয়।

খাইতে খাইতে শুনি বুড়ী হাসি-মুখে বলে,—বৌ-মা আমাদের, কি বলে জান বাবা?—বলে, আমীন বাবুর মা-বোন ত' কেউ নেই এখানে—আমরা যত্ন-আত্তি না করলে করবে কে?

মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখি,—ঝাপ্‌সা অন্ধকারে স্পষ্ট করিয়া কিছু দেখা যায় না; কিন্তু তবু যেন মনে হয় মূর্ত্তিমতী স্নেহের মত কাহার দু'টি স্নিগ্ধমধুর ঝালর-ঝাঁপা কালো চোখ আমারই দিকে চাহিয়া আছে!

এক মায়ের কাছে ছাড়া এত যত্ন বুঝি আর কোথাও কখন পাই নাই।

ভাবিয়াছিলাম, বিদেশে-বিভুঁয়ে হয়ত অনেক কষ্টই সহিতে হইবে। দীর্ঘ দশ বৎসর এই কর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতায় বাস্তা বুঝিয়াছি তাহাতে মানুষের সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে আমার ধারণা অনেক উচ্চে। দিনে আহার নাই, রাত্রে নিদ্রা নাই,—রৌদ্র-বৃষ্টি যেন সঙ্গের সাথী!.........অম্লান বদনে মানুষ সবই সহিতে পারে শুধু দারিদ্র্যের তাড়নায়—পেটের হুকুমে!

যাযাবরের জীবন ....যেখানেই জরীপ হয় সেখানেই ছুটি। বেদিয়ার মত টোল ফেলিয়া ফেলিয়া বেড়াই। উপার্জ্জন এমন বেশী নহে যে পরিবারবর্গকে সঙ্গে লইয়া ঘুরি।—তাই, সমস্ত দিনের প্রাণান্ত পরিশ্রমের পর কর্ম্মক্লান্ত দেহটিকে কোনও রূপে টানিয়া লইয়া যখন বাসায় ফিরি তখন এতটুকু একটু মমতামাখা স্নেহ-স্পর্শের অভাব বড় বেশী করিয়াই বুকে বাজে!

কিন্তু ঐ অভাবটি এখানে আসিয়া অবধি একদিনও অনুভব করি নাই।

থাকি বাহির মহলের ক্ষুদ্র একটি ঘরে। কিন্তু সেখানেও দেখি কাহার দু'টি সুনিপুন হাতের মঙ্গল স্পর্শ আমার বিছানাটিতে লাগিয়া রহিয়াছে! কাগজ পত্র গুলি একধারে সযত্নে গোছান। ঘরখানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। মেঝেয় সিঁদুর পড়িলেও যেন খুঁটিয়া তোলা যায়!

বুঝি সবই।—তাই, বড় ভাল লাগে, যখন ভাবি, একটি সেবাপরায়ণা তরুণী মেয়ের শুভ্র দু'খানি কোমল হস্ত কেবল মাত্র আমারই সেবার জন্য ব্যাকুল আগ্রহে উন্মুখ হইয়া আছে!......বড় ভাললাগে ঐ পবিত্র দরদটুকু। মনে হয় যেন কোন্ জন্মজন্মান্তরে ও ছিল আমার সব চেয়ে বড় প্রিয়জন—সব চেয়ে বড় দরদিয়া সখি!

মন বড় খুশী হইয়া উঠে!

মানুষের বোধহয় স্বভাবই এই।

একদিন দেখি, আপ্‌নার ময়লা কাপড়গুলি সহসা যেন কোন্ যাদু মন্ত্রবলে একেবারে ফুলের মত সাদা ধব্‌ধবে হইয়া গিয়াছে। সাবান দিয়া কাপড় কাচিলে কাপড় যে অত ফর্সা হয় তাহা আমার ধারণাই ছিল না!......কিংবা ঐ শুভ্রতাটুকু হয়ত আরও কিছু......হয়ত কোন্ গোপন বুকের পবিত্র ভালবাসার রং লাগিয়াছে।

ভাবি, কেমন করিয়া শোধ করিব এই অযাচিত স্নেহের ঋণ!

বুড়ী বলে,—আজ তোমার নেমন্তন্ন বাবা, রাতে এখানেই তোমাকে খেতে হবে।

বুঝিতে পারি এ কাহার আহ্বান!

কিন্তু উপেক্ষা করিতে পারি না.........

নিজের দুর্ব্বলতা নিজেই বুঝি।

খাইতে বসিয়া প্রতিগ্রাসেই যেন কাহার হাতের মিষ্টি একটি গন্ধ পাই!

মন ভরিয়া উঠে।—পেট ভরিবার প্রয়োজন হয় না।—

বুড়ী বলে,—বৌ-মার বড় ইচ্ছে বাবা, যে, তোমাকে একদিন রেঁধে খাওয়ায়। বলে, পুরুষ মানুষের খাওয়া—মেয়েরা যত্ন না নিলে কি পেট ভরে!

মাঝে মাঝে অর্থ খুঁজি ঐ যত্নটুকুর......

শেষে নিজের চিন্তায় নিজেই লজ্জা পাই।

কী সন্দিগ্ধ মন এই মানুষের!

বেশ মনে আছে পাঞ্জাবীটার গলার বোতামটা সেদিন ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু গায়ে দিতে গিয়া দেখি সেখানে একটা নূতন বোতাম!

ভাবি, এই যে সতত সজাগ দৃষ্টিটুকু—আমার এতটুকু অভাবও যাহার তীক্ষ্ণতার সম্মুখে ধরা পড়িয়া যায়—ঈশ্বরের অযাচিত আশীর্ব্বাদের মত উহার ঐ পবিত্র মাধুর্য্যটুকু ত ভুলিতে পারিব না কোন দিন!

এমনি প্রতিদিনকার অতি তুচ্ছ খুঁটি-নাটির ভিতরেও যেন কোন্ গোপন-চারিণী পূজারিণীর নিষ্ঠ প্রাণের পরিচয় পাই।

কী অপূর্ব্ব ঐ নিষ্ঠাটুকু!

শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে মন অভিভূত হইয়া পড়ে।

সারাদিন মাঠের কাজে রৌদ্রে পুড়িয়া ঘরে ফিরি......

একটি প্রতীক্ষমানা সুন্দরী তরুণীর সেবা-চন্দনের শান্তি প্রলেপে সমস্ত দেহ-মন যে মুহূর্ত্তে জুড়াইয়া যায়!......

এক একদিন মনে হয় সত্যই বুঝি ঈশ্বরের করুণার অন্ত নাই!

হঠাৎ সেদিন মুচিরাম আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল,—অক্ষে কর হুজুর, আমি বড় গরীব।

জিজ্ঞাসা করি,—ব্যাপার কি মুচিরাম?

মুচিরাম কাঁদিতে কাঁদিতে বলে,—কানুনগো আমায় তেইড়ে দেলে হুজুর। পাশ-কিরষেণরা সব ঘুষ খেয়ে জলের নাগাতি বলে গেল যে আমি ও জমীর এক বছুরে ভাগ্‌রা-পের্‌জা!

চমৎকার হইয়াছে!—প্রকৃতির নিয়মে ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

পৃথিবীতে যাহার অর্থবল নাই জীবন-যুদ্ধে পরাজয় ত তাহার ঘটিবেই।

কানুনগো সাহেব ঠিকই করিয়াছেন! বিচারকের আসনে বসিয়া নিজের বিবেক বুদ্ধির টুঁটি টিপিয়া ধরিতে পারা যায় কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ, দলিল-দস্তাবেজের ত তাহা পারা যায় না!

মুচিরাম হঠাৎ আমার পা দুইটা জড়াইয়া ধরে বলে,—হুজুর! আপনি আমার বাপ-মা—অক্ষে কর।

বুঝাইয়া বলি,—এখন আর আমার কোন হাত নেই মুচিরাম। যখন ছিল তখন করেছি। এখন কানুনগো সাহেব যদি কিছু না করেন তা হলে তুমি এ্যাটেসট্রেসনে নালিশ করো।

মুচিরাম জল-ভরা চোখে অর্থহীন দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে............দেখিয়া মনে হয় যেন সে আমার কথা কিছুই বুঝে না!

বুঝারৎ শেষ হইয়া আসে—সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রবাস-বাসের দিনগুলিও।

মায়ের নিকট হইতে পত্র পাইয়াছি—আমাকে দেখিবার জন্য মন তাঁহার বড়ই হা হা করিতেছে অতএব কাজ শেষ হইলে এখানে যেন আর একদণ্ড না অপেক্ষা করি!

যাহাদের বাড়ীতে আশ্রয় পাইয়াছি এ কথা কিন্তু একদিনও তাহাদিগকে বলিতে পারি নাই। কেমন করিয়া যে কথাটা পাড়িব তাহাই বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

এদিকে দীর্ঘ পথের পর্য্যটনে ক্লান্ত আমার পথিক মনও যেন এই ক্ষণিক থাকার ক্ষুদ্র পান্থশালাটিতেই তাহার চির বিশ্রামের আশ্রয়স্থল খুঁজিয়া পাইয়াছে! মমতাভরা এই

স্নেহনীড়টিকে ছাড়িয়া যাইতে কেমন যেন মায়া হয়।

ভাবি, ঐ যে ব্রতচারিণী মেয়েটি পরম নিষ্ঠার সহিত নীরবে এতদিন আমার পূজা করিয়া আসিল—উহার নিকটে কি আমার কোন ঋণ নাই ?............

কিন্তু নিরুপায় !—

যাইতে আমাকে হইবেই।—আর একটি স্নেহাতুর প্রাণ যে আমারই পথ চাহিয়া দিন গণিতেছে !

শেষে সত্যই কথাটা একদিন পাড়িতে হইল।

বুড়ী শুনিয়া কাঁদে। বলে,—তুমি যে বাবা পরের ছেলে।—আটুকে রাখবার অধিকার ত নেই আমাদের।

বাড়ীর ভিতরে গিয়াও খবরটি পৌছায়। কিন্তু ব্যতিক্রম ত কিছুই চোখে পড়ে না।—দিনের পর দিন যায়।—সেই সেবা, সেই নিষ্ঠা, সেই সতত সজাগ দৃষ্টিটুকু,—সবই যেন ঠিক তেমনি ভাবেই শুধু আমারই জন্যই জাগিয়া থাকে !

বুঝি, চোরাবালির তলায় যে গোপন ধারাটি সকলের অগোচরে একান্ত নীরবে বহিয়া যায় তাহার তরঙ্গের প্রকৃত স্বরূপটি ত উপরের মানুষের চোখে ধরে পড়ে না।

বিদায় লইতে যেন চক্ষু ফাটিয়া বন্যা আসে !

বুড়ীর চোখে ত অশ্রুজলের বিরাম নাই। বলে দিন দু'য়েকের মায়া বাবা, কিন্তু বাঁধন তার এমনি শক্ত যে ছিঁড়তে যেন বুক ফেটে যায় !

নত হইয়া বুড়ীর পায়ে প্রণাম করি।

নীরব আশীর্বাদের শুভ্র বিন্দু মাথার উপর ঝরিয়া পড়ে।

ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান আমার তোরঙ্গ-বিছানা প্রভৃতি মাথায় বহিয়া ছাদে বোঝাই করে। বলে,—আর দেরী কন্না বাবু, তা হলে টেরেন্ মিল্‌বে না।

চলি।—চলিতে চলিতে মনে হয় কী যেন একটা আকর্ষণ কেবলই আমাকে পিছনে টানিতেছে !

সহসা ফিরিয়া চাই।—দেখি, জীর্ণ-ভাঙা কবাটের ফাঁকে ঘোমটা-খোলা একখানি সুন্দর মুখ !—তার জল-ভরা দু'টি কাজল কালো আয়ত আঁখি পলক বিহীন ব্যথিত দৃষ্টিতে শুধু আমারই চলিয়া-আসা পথের দিকে চাহিয়া আছে !

চকিতের দেখা !—ইচ্ছা করে প্রাণ ভরিয়া একবার তাহাকে দেখিয়া লই।—কিন্তু............

গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইয়া দেয়।

নিবিড় ঘন বনান্তরালে আর কাহাকেও দেখা যায় না।

সাকী

—৺ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

ইচ্ছা হয় আরো কিছু বলি
বিন্দুর রহস্য কথা সাকী,
আমি ত বলিতে পারি দেবি
বুঝিতে পারিবে তুমি তা কি ?

নীরবে দাঁড়ায়ে স্মিতাননে
কিন্তু চোখে বিন্দুটি তোমার,
তোমারে শুনাতে সেই কথা
নিষেধ করিছে বার বার।

বিন্দু বিন্দু মিলনে মিলনে
কি অপূর্ব্ব হইল যে রেখা,
আমার দেখার রন্ধ্র মাঝে
এখনো তা রয়েছে যে লেখা!

এইবার—বল তুমি প্রিয়া,
পাত্রস্থিত বিন্দু করি পান,
বিন্দুমধ্যে কোথায় তোমার
পূজারীরে দিয়েছিলে স্থান?*

"—ঝড় হ'য়ে গেছে রজনীগন্ধার বনে"

—শ্রীজ্যোৎস্নানাথ চন্দ।

— এক —

পূর্ণিমা রাত্রি!

চাঁদের আলোয় ভুবন রাঙিয়া গিয়াছে। পদ্মবনের ধার দিয়া চলিতেছিলাম আমরা দুইজন। শিপ্রা চাবির রিংটা আঁচল হইতে খুলিয়া লইয়া আঙুলের মাথায় রাখিয়া সেটাকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে পথ চলিতেছিল। হঠাৎ সেটা ছিট্‌কাইয়া গিয়া একটা পদ্মপাতার উপর পড়িল আর শিপ্রা অমনি বলিয়া উঠিল—এই যাঃ, দেখেচেন রিংটা আর একটু হলেই গিয়েছিল আর কি···ভাগ্যিস্ জলে পড়েনি।············

দীঘির কালোজলে নামিয়া রিংটা তুলিয়া আনিলাম। কাপড়ের খানিকটা ভিজিল।

শিপ্রা বলিল—সত্যি, আপনাকে যা কষ্ট দিলুম্! আজকের বেড়ানোটাই মাটী হল। তা চলুন বাড়ী ফেরা যাক্, বিশেষ করে কাপড়টা যখন ভিজে গেছে।·········

হাসিয়া বলিলাম···হাঁ, কষ্ট যা দিলেন তাতো দেখ্‌তেই পাচ্ছেন, তবে কিনা কথাটা হল এই যে আমি তো আর কচি খোকাটী নই যে একটু ভেজা কাপড় গায়ে লাগ্‌লেই অসুখ কর্‌বে। আর কথা না বলে চলুন ওই শালবনের বাঁকটা ঘুরে যাওয়া যাক্!············

দুইজনে আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম। আকাশে অগণিত তারার মেলা বসিয়াছে। শালবনের ফাঁক দিয়া জ্যোৎস্নার আলো সেই পাহাড়ী পথের বুকে লক্ষ রকমের রঙীন্ আল্‌পনা কাটিয়া দিতেছিল। শিপ্রা উচ্ছ্বসিত গলায় বলিয়া উঠিল—আজকের রাত্রিটা কী enchanting!······

এই বলিয়া সে ব্রাউনিং'এর একটা কবিতার গোটা-কয়েক লাইন আওড়াইয়া গেল। পদ্মপাতার উপর জলের কণাগুলি মুক্তার মতন ঝলমল্ করিতেছিল। জলে স্থলে কেমন যেন একটা নীরবতা। পথের ধারের একটা বাঙলোর লালগোলাপগুলি চাঁদের আলোয় জীবন্ত হইয়া চমৎকার দেখাইতেছিল। শিপ্রার য়্যাপিনাইন-ব্লু শাড়ীটার উপর আলো পড়িয়া তাহাকে দেখাইতেছিল ঠিক্ Venus

* অপ্রকাশিত কবিতা।—মৃত্যুর পূর্ব্বদিনে রচিত।

de milo'র মতন।

—উঃ, কী বিচ্ছিরি পথ গো!·········বলিয়া শিপ্রা বসিয়া পড়িল। দেখিলাম একটা পাথরে হোঁচট্ খাইয়া তার পায়ের খানিকটা কাটিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি পকেট হইতে রুমালটা বাহির করিয়া একটু ভিজাইয়া পা'টা বাঁধিয়া দিলাম। চোখে তখন তাহার দুইফোঁটা জল টলমল করিতেছিল।

—আপনার কথা না শুনে শুধুপায়ে বেড়িয়ে খুব ভুগ্‌লুম্ যাহোক্············না, আর একটু এদিকে, এই হয়েচে·········ব্যস্!·········

নরম ফর্সা পা'টী তার রক্তের আল্‌তায় একেবারে লাল হইয়া গিয়াছিল। সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম—খুব লেগেচে, না? তা চলুন আমার কাঁধে ভর করে······কেন বা শুধু পায়ে এলেন!·········

বাড়ী পৌঁছিয়া ভালো করিয়া ধোয়াইয়া আইওডিন লাগাইয়া বাঁধিয়া দিলাম। শিপ্রা যখন তাহার বেড্-রুমে গিয়া ঢুকিল ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলাম বারোটা বাজিতে মাত্র মিনিট দশেক্ বাকী। অবাক্ হইয়া গেলাম। এত রাত্রিতে যে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম তাহা মনেই করিতে পারি নাই। দরজা বন্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়িলাম। জানালা দিয়া যুঁই-ফুলের মতন জ্যোৎস্নাধারা অঝোরে বিছানার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল।

ভাবিতেছিলাম এ রকম আব্‌হাওয়ার ভিতর দিয়া তো মানুষ হইয়া উঠি নাই!

আজ হঠাৎ জীবন-যাত্রার নিত্যিকালের পদ্ধতি এমন করিয়া বদ্‌লাইয়া ফেলিলে আমার চলিবে কেন!······ আমি যে বোহিমিয়ান্ লাইফের এপ্রেন্টিস!······বদ্‌লাইয়াই না হয় ফেলিলাম কিন্তু দুইদিন বাদে যখন এ স্বপ্ন টুটিয়া যাইবে তখন আমি কোথায় গিয়া ঠাঁই লইব। মনে পড়িয়া গেল কল্যাণশ্রীতে গড়া স্নেহ-স্নিগ্ধ আমার মায়ের মুখখানি, সে যে অনেক আশা করিয়া আছে তার এই একটী ছেলের উপর!·········ভুলিলে চলিবে কেন আনন্দের পাথার সর্ব্ব-রিক্তের জন্ত জন্মায় নাই, তাহার থাকিবে অশ্রুর তাজমহল পায়ের তলায় চিরটীকাল ঘুমাইয়া! মনে জাগিল দার্শনিক স্বকৃনহরের ফিলজফির কথা। 'হাসি? সে যে রঙীন ধুলা!' ······অত বড় সত্যি কথা এ পর্য্যন্ত আর কেহ বলিতে পারিয়াছে কী? জীবনকে স্বকৃনহর সকলের বাড়া সুন্দর করিয়া চিনিয়াছিল। * * *

এতদিন তো বেশ চলিতেছিলাম—হঠাৎ আজ কেন জীবনের স্রোতটা ঘুরিয়া গেল! নারী······সে আসিয়া মানুষের স্বচ্ছ ঘর-কন্নার উপর দিয়া একটা ঝড় বহাইয়া দিয়া দেখিতে দেখিতে উধাও হইয়া যায়। অগ্নিশিখার মতনই দীপ্ত তাহার রূপ······ কথা কহিলে মনে হয় ধরণীর সুরের সেতারে ঝঙ্কার উঠিল! সারা গায়ে কে যেন আগুণ ছড়াইয়া দিতেছিল।

ঘর ছাড়িয়া বাহিরে গিয়া একটা সিঁড়ির উপর বসিলাম। আকাশের পানে চাহিলাম······নিখিল ধরণী বুঝি তারই পানে চাহিয়া বিপুল বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই ধরণীর শিশু আমি কেমন করিয়া জীবনের কয়টা দিনকে পিছু ফেলিয়া এই পথ-চলার উপর সমাপ্তির যবনিকা চিরতরে টানিব।······কত কিছু পড়িলাম! ব্রাউনিং ও ওমার খৈয়াম বলিলেন——'Eat, drink and be merry, for to-morrow we die!' কিন্তু জীবনটা শুধু সম্ভোগের সুরা-সমুদ্রেই কী চিরটীকাল সাঁতার কাটিবে······ইহার চেয়ে বড় কাজ কী মানুষের উপর পড়িয়া নাই?...মানুষের হৃদয়ে যে স্নেহ-প্রীতি ভালবাসার দুতেরা নীড় বাঁধিয়া রহিয়াছে তাহাদের কী অন্ত মানুষের কাছে আপন-আপন হৃদয়ের বার্ত্তা, সুখদুঃখ হাসি-কান্নার লক্ষ কথার পশ্‌রা লইয়া পৌঁছাইয়া দিতে নাই!······কেহ বলিলেন দুনিয়ার কালো চোখ যত উপাড়িয়া ফেলিতে। কেন! ওই কাল চোখের মনোরম স্নিগ্ধতা যে আকাশ-স্পর্শী আগুণকেও মুহূর্ত্তেকে জল করিয়া দেয়!······দূরের ছেঁড়া-মেঘের ফাঁকে কোন্ তরুণী যুগ-যুগান্তর চাহিয়া আছে?······শেলির এমিলিয়া ভিভিয়ানী, না দান্তের বিয়াত্রিস, না আমার শিপ্রা? উঠিয়া পড়িলাম······যে নীড় এক বৈশাখী ঝড়ে ভাঙিয়া গিয়াছে মনে করিয়াছিলাম—তাহাকে আবার বাঁধিতে সুরু করিলাম ·········কেন? তা জানিনা, জানি এইটুকু যে মানুষের প্রাণ, মানুষের অনুভূতি, মানুষের সুখ-দুঃখ লইয়া আমি মানুষ! * * * * *

— দুই—

——ওকি……আপনার চোক এত লাল দেখ্‌চি কেন ?

একটু যেন কেমন হইয়া গেলাম। মুখে হঠাৎ কোন জবাব খুঁজিয়া পাইলাম না। বলিলাম——ওঃ! কাল ফেরার পথে একটা বুনো পোকা চোখে পড়েছিল তাই বুঝি এমন হয়েচে।……শিপ্রা আর কিছু না বলিয়া আমাকে আরও দু' স্লাইস কেক্‌ দিতে উদ্যত হইল। বাধা দিয়া বলিলাম——আপনি পাগল হয়েচেন? আমার পেটটা একটু elastic হলে না হয় ওগুলো এতে ফেলা যেত!……সে একটু মৃদু হাসিল। চামচে দিয়া চায়ের চিনি গুলিতে গুলিতে সে একটি ফরাসী গানের গৎ গাহিতেছিল গুন্‌ গুন্‌ করিয়া। বলিলাম——তা চা খেয়েই কিন্তু আপ্‌নাকে পিয়ানোয় বস্‌তে হবে!………

——আমি আজ কিছুতেই গাইব না যদি না আপ্‌নি 'পাগলাঝোরার' সেই গানটা আজ গান!—শিপ্রা অভিমানের সুরে কহিল।……

জিজ্ঞাসু হইয়া বলিলাম—কোন্‌ গানটা বলুন তো?

——ওই সেই

আজ সবার রঙে রঙ্‌ মিশাতে হবে
ওগো আমার প্রিয়—
তোমার রঙীন্‌ উত্তরীয়
পর' পর পর তবে!

বলিয়া শিপ্রা নিজেই কয়েকটা লাইন গাহিয়া গেল।……সেদিন ভোরে আমাকে গোটা চারেক গান গাহিতে হইয়াছিল। পিয়ানো ছাড়িয়া উঠিতেই শিপ্রা বলিল——এই দেখুন গর্কির একটা detailed appreciation বেরিয়েছে। সত্যি, মানব-জীবনের এমন সব সাধারণ এবং অসাধারণ কথা গর্কির কলম দিয়ে বেরিয়েচে যা অতি চমৎকার!…………

——সারমন নেই, মানুষকে পথ বাৎলে দেওয়া নেই, আছে কেবল মানব-মনের চিরন্তন অনুভূতি একটা স-লীল স্বচ্ছন্দ প্রকাশ,—এইটেই আমার মতে গর্কির সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।—আমি বলিলাম।………

——আচ্ছা প্রতুলবাবু গর্কির Mother খানা আপ্‌নার বিশেষ করে কেমন লাগে। ওখানা পড়েচেন নিশ্চয়ই!…

বলিলাম——একবার নয়, বইখানাকে বার তিনেক্‌ আমি পড়েচি। পাশার চরিত্রটা নানাদিক্‌ দিয়ে এমন হয়ে ফুটে উঠেচে যে তা আজও আমি ঠিক্‌ ভালো করে বুঝে উঠ্‌তে পারি নি! আর মা, পৃথিবীর সব মার মতনই অপরিসীম স্নেহ-স্নিগ্ধ মন নিয়ে পাশার মা!………

তার মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে উচ্ছ্বসিত গলায় বলিয়া উঠিল——Exactly so! * * * এমনি নানা কথাবার্তার ভিতর দিয়া যে প্রভাতী রৌদ্রে আঙ্গিনা ভরিয়া গিয়াছে তাহা আমরা কেহই লক্ষ্য করি নাই।……

——ওহো ভুল হয়ে গেছে। আপ্‌নার পায়ের অবস্থাটা কেমন হয়েচে বলুন্‌ তো? একটু হাসিয়া সে বলিল—তা সেজন্যে আপ্‌নাকে আর ভাব্‌তে হবে না। আইওডিন্‌ আর জামবাক্‌'এ খুব ভাল effect করেচে………এতটুকু বেদনা নেই!…………

—তা যাক্‌ শুনে নিশ্চিন্ত হলুম্‌, এখন তাহলে একবার বন্ধুবরের খোঁজে বেরুতে হচ্ছে।………

এই বলিয়া আমি উঠিয়া দাঁড়াইতেই শিপ্রা বলিল——আমিও চল্‌লুম্‌ রান্নাঘরের দিকে!……

বন্ধু বলিয়া গিয়াছিলেন তিনি তাঁর কার লইয়া সেন-সাহেবের বাঙ্‌লোর সুমুখে অপেক্ষা করিবেন। একটা হ্যাভেনায় অগ্নি-সংযোগ করিয়া বাহিরে যাইতেছিলাম হঠাৎ দেখি হুস্‌ করিয়া বন্ধুর নিঃসাড় রোল্‌স-রয়্‌স্‌ আমাদের গেটের সাম্‌নে আসিয়া থামিল। বন্ধু তাড়াতাড়ি নামিয়া সেক্‌হ্যাণ্ড্‌ করিয়া বলিলেন——Hullo old boy! what nonsense had you been doing all the while?

বলিলাম——তা দেরী যখন একবার হয়ে গেছে তখন তো আর তা ফেরানো যাবেনা। আর নিয়ম-রক্ষা যে আমার ধাতে নেই এতো তুমিও জানো সাহেব!………

বন্ধু এককার টানিয়াই আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া ষ্টীয়ারিং

হাইল ধরিয়া বলিলেন——never mind silly chap! হাওয়ার আগে বন্ধু কার ছুটাইয়া দিলেন। বন্ধুর আমার বরাবরই একটা আইডিয়া ছিল যে জীবনটাকে ওই মেশিনটারই মতন চালাইতে হইবে।

ঘণ্টা-খানেক্ চলিবার পর বলিলাম—ওহে বার্গসইজ্‌ম্ রেখে একটু হেঁটে বেড়ালে চল্‌তো না?

কথাটা তার মনে লাগিল। দীঘির পুব্-পারে গাড়ীটা রাখিয়া আমরা হাঁটিয়া দুইজন চলিলাম। কালোজলে প্রভাতী রৌদ্র ঝল্‌সাইতেছিল। বন্ধু পথ চলিতে চলিতে বলিলেন—দ্যাখো, জীবনটাকে ঘরের কোনে সাড়ীর আড়ালে লুকিয়ে রেখোনা। তাকে ছুট্‌তে দাও, নইলে লাইফ বলে যে একটা জিনিষ রয়েচে তাকে চিন্‌বে কী করে?.........

বন্ধু আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, বাধা দিয়া বলিলাম——লেক্‌চার তো তোমার আমি কম শুনিনি! সেই কলেজের ফার্ষ্ট ইয়ারে প্রথম দিন তোমার পাশটাতেই বসেছিলুম্—সেদিনও তুমি ওই সব ছাই-ভস্ম ঝেড়ে দুটোদিন আমার মনটাকে রীতিমত ঝাঁকুনী খাইয়েছো। তোমার বেঠোফেনই বল আর যাই বল আজকের রোদের মতন মিষ্টি কী আর কিছু হয়?—

ওই করেই তো গেলে! মিষ্টি, সুন্দর, lovely ও সব বদ্‌খদ্ শব্দ আমাদের অভিধানে নেই। রূপকথার স্নিগ্ধ তপোবন চাইলে, চাই প্রাণময় যন্ত্রচালিত দুরন্ত জীবন।.........বলিয়াই বন্ধুবর আমার শরীরটাকে বেশ একটু ঝাঁকুনী দিলেন।

বলিলাম——ওহে কথার চোটেই তো গেছি তার ওপরে যদি দৈহিক ঝাঁকুনী দাও তো বেমালুম্ মারা যাব!.........

বন্ধুবর একটা গাছের পাতার উপরে তাহার হাণ্টিং ষ্টিক্ দিয়া একটা আঘাত করিয়া বলিলেন—হাসালে যাহোক্, ওই পেলব প্রাণ নিয়ে কোনদিন যে কোথায় তলিয়ে যাবে তাই ভাবচি!.........

আমিও হাসিলাম। কিন্তু মনে মনে। ভাবিলাম জীবন-রথের দোলায় কে কতখানি পাইবে.........এই যন্ত্র-লীলা-দগ্ধ মানুষটী তাহার প্রাণ-পূর্ণ কল-কারখানার মেশিনগুলি ঘাঁটিয়া মনে করিতেছে জীবনের রূপ-রস ও আনন্দকে সে মুঠার মধ্যে পুরিয়াছে। সত্যই কী তাই? আজ আমার এই ছন্নছাড়া জীবনের সার্থকতা অ-সার্থকতার কথাও আপনা হইতে মনে আসিয়া গেল। পাইলাম কি......জীবনটাকে বহুদিন আগে একবার মনে করিয়াছিলাম চিনিয়াছি—সে কলেজের প্রথম দিক্'টাতে, ওয়ালটেয়ারের সী-বীচ্'এ!......সমুদ্রের ধারে তরুণী সে বেঠোফেনের ninth symphony'র ধারায় বোধ হয় একটা বাঙ্‌লা গানকে ফেলিবার চেষ্টায় ছিল.........সহসা সুমুখে গিয়া গায়ে পড়িয়া তার সঙ্গে আলাপ জমাইয়া ফেলিলাম। তারপর একটা মাস যখন হাওয়ার আগে নিঃশেষিত হইয়া গেল, তখন দেখিলাম সে বেচারী কাঁদিয়া চলিয়া গেল। যাওয়ার সময় পাইয়াছিলাম তাহার সপ্রেম একটী চুম্বন আর স্নিগ্ধ দুইফোঁটা চোখের জল। সেদিন মনে হইয়াছিল জীবনে যেটুকু লইয়া মানুষ বেসাতি করে আমি তাহার সবখানি পাইয়াছি।......

—কি প্রতুল গুপ্ত ভাবচেন কী?......

বলার সঙ্গে সঙ্গেই একটা ভালো রকমের কিল পড়িল।

—ওই যাঃ, আবার তোমার কোমল অঙ্গে ব্যথা দিলুম! never mind dear!

বলিয়া বন্ধুবর হাসিলেন। মনে হইল হাসিতে পারে অনেকেই, তবে এ রকম হাসি হাসিতে পারে খুব কম লোকে। ধুবড়ীর এই প্রান্তরে চারিদিক্ ভরিয়া সে প্রাণ-খোলা হাসি ছড়াইয়া গেল!......

বলিলাম—বেড়ানো তো হল, এখন চল ফেরা যাক্!

—হাঁ, চলো কাল্‌কেও কিন্তু তোমায় চাই বুঝ্‌লে!

নিঃসাড় রোল্‌স-রয়স গেটে থামিল। বন্ধু আমাকে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

তিন

তিন বছর পরের কথা।

দার্জ্জিলিং'এ মলের পাশ দিয়া ফিরিতেছি। আকাশ হইতে তখন আলোর ঝর্‌ণা অঝোরে ঝরিয়া পড়িতেছিল।

—প্রতুলবাবু, প্রতুলবাবু......

পিছন ফিরিয়া দেখি শিপ্রা। অবাক্ হইয়া গেলাম। ধুবড়ী আর দার্জ্জিলিং।

—আপ্‌নি খুবই অবাক্ হয়ে গেছেন আমাকে এখানে দেখে, কেমন?

হাঁ, তা না হয়ে কী করি বলুন? তিন তিন্‌টে বছর পরে জীবনের নানা স্রোতাবর্ত্তের পাক খেয়ে এখানে আপনার সঙ্গে যে এম্‌নি আচম্‌কা দেখা হয়ে যাবে এ কে জান্‌তো?......

—তা বটে, কিন্তু আগেকার সে মানুষটার সঙ্গে কিন্তু আপ্‌নার পরিচয় হল না, আমি যে এখন যক্ষ্মারোগী!......

সদ্য প্রকাশিত কতগুলি ফরাসী বই কিনিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলাম। সংজ্ঞাহীন হাত হইতে সেগুলি মাটিতে পড়িয়া গেল। হঠাৎ এক ঝলক চাঁদের আলো তার মুখে আসিয়া পড়িল.........দেখিলাম সে মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে। এ কোন্ রহস্যময়ী নারী আমার আঁখির আগে দাঁড়াইয়া? না, ইহাকে আমি চিনি না........ আমি চিনি কৌতুক-উজ্জ্বল চঞ্চলময়ী সে আর এক তরুণীকে।

কালো কালো মেঘগুলি পাথরের মতন আকাশের অন্ত-হীন আলো-সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে শত খণ্ডে ভাঙ্গিয়া চুর চুর হইয়া পড়িতেছিল। পথের ধারের একটা বাঙলোর অতসীগুলি নীলার মতন জ্বলিতেছিল।..........

ছন্নছাড়া জীবনের জীবন্ত ইতিহাস এক তরুণ, আর তার সম্মুখে দাঁড়াইয়া যৌবন-উদ্বেল যক্ষ্মারোগাক্রান্ত এক তন্বী তরুণী!.........বাজ-পড়া একটা তালগাছের সম্মুখে রস-নিঙড়ে নেওয়া একটী মাধবীলতা।.............

—কি ভাবচেন প্রতুলবাবু? চলুন এগিয়ে পড়া যাক্।...

—না, ভাবব আর কি.........ভাবচি এখনো আর কত বাকী আছে!.........

দুইজনে নীরবে চলিতে লাগিলাম। শিপ্রা আগে, আমি পিছনে। খানিক্ দূর গিয়া শিপ্রা বাঁয়ের দিকে চলিল এবং একখানা ছোট্ট বাঙলো প্যাটার্ণের বাড়ীর কাছে আসিয়া থামিল। নাম দেখিলাম—"ভায়োলেট্ ভিলা"!

নীচের তলায় সুইচ ছিলনা। অন্ধকার। শিপ্রার হাত ধরিয়া এক পা, এক পা করিয়া উপরে উঠিলাম। শিপ্রার রক্ত-শূন্য হাত এত ঠাণ্ডা মনে হইল যেন বরফের চাকার উপর হাত রাখিয়াছি। উপরে উঠিয়া সে সুইচ টিপিয়া দিল। ধূপছায়া রঙের সাড়ীটার সঙ্গে ফিকে হলুদের একটা ব্লাউজে শিপ্রাকে দেখাইতেছিল আলো-উজ্জ্বল ভিনিসের বুকে গণ্ডোলায় বিয়াত্রিসের মতন।

—ও ঘরে মা আছেন। শিপ্রা দক্ষিণ-দিকের একটা ঘর দেখাইয়া দিল। দেখিলাম তিনি একটা ইজি-চেয়ারে রুমাল চোখে দিয়া বসিয়া আছেন। ডাকিলাম—মাসীমা! ....তিনি চম্‌কাইয়া চাহিলেন।

—কে? ওঃ, তুই প্রতুল—তা হঠাৎ কোত্থেকে আমাদের খোঁজ পেলি বলতো?

—হাঁ আমি, মাসীমা!.........একটু হাসিয়া শিপ্রার সঙ্গে হঠাৎ কেমন করিয়া দেখা হইল তাহাই বলিলাম।

মাসী জিজ্ঞাসা করিলেন—তা তুই কী কর্‌ছিস্ এখন, শরীর ভা'লা ছিল তো?.........তিনটী বছর পর আজ দেখা!.........

—করি ইস্কুলের মাষ্টারী! শরীর ভাল ছিল বলি কি করে তবে ছিল এক রকম!.........আমি কথা বলিতেছিলাম কিন্তু কণ্ঠ আমার রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। মাসীর মা-প্রাণটার চোখ এড়াইতে পারিলাম না!......

—শিপু তোকে বলেছে বুঝি.........একটা মেয়ে আমার সেওতো যে'ত বসেচে। মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে তিনি বলে গিয়েছিলেন "আমার শিপুর তোমরা অযত্ন করোনা, লক্ষ্মী মেয়ে আমার!".........অযত্ন করিনি কোনদিন তা তুই জানিস্ কিন্তু তাকে তো রাখতে পার্‌লুম্ না, প্রতুল! ....ধৈর্য্য তাঁহার ভাঙ্গিয়া পড়িল। বজ্রের মেরুদণ্ড কে যেন থেঁতলাইয়া দিল। হাজার হইলেও মানুষ তো! বিধবার এই বিত্তটুকু কাড়িয়া না লইলে কি ভগবানের সৃষ্টি অচল হইয়া যাইত.........স্রষ্টার বিরুদ্ধে সারা অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। চোখের জল রাখিতে পারিলাম না......... রাত্তিরের জ্যোৎস্নাধারার সঙ্গেও যেন ঝরিয়া পড়িতেছিল আকাশের চোখের জল!—

কাঁদিসনে প্রতুল.........মরণের কোঠায় ওকে তুলে দিতেই হবে!.........

কণ্ঠস্বর তাঁর রুদ্ধ হইয়া টস্ টস্ করিয়া গণ্ড বহিয়া জল পড়িতেছিল। কী কষ্টেই না জানি মায়ের মুখ দিয়া স্নেহ-সিক্ত

সন্তানের মরণের বার্ত্তা বাহির হইল।

*   *   *   *   *   *

তিন মাস পর!.........

সম্মুখের ছোট্ট খালটায় তখন টাইগ্রিসের কালো জলের মাতামাতি সুরু হইয়া গিয়াছিল। রাত্রি বারোটা। শিপ্রার বিছানার পাশে বসিয়া আছি। হঠাৎ শিপ্রা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।.........ও কী... ওঃ! চোখ দুইটা সহসা তার যেন অগ্নি শিখার মতনই দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।......তারপর তার শুভ্রতনুখানি বিছানার উপর পড়িয়া রহিল—নিস্পন্দ!......চখের পলক্ পড়ে না।——

শিপ্, শিপু......গলাটা যেন কে শেলাই করিয়া দিয়াছে, এ গলা দিয়া যেন জীবনে কোনো কথা বাহির হয় নাই!—নাই গো নাই, ভাবিতে পারিলাম না যাহাকে একদিন নিঃশেষে আপনার বলিয়া যাহা কিছু ছিল সবই দান করিয়াছিলাম আজ সে কেমন করিয়া একমিনিটে এতখানি পর হইয়া গেল!... ..রক্ত-শূন্য, ফ্যাকাশে গালে তার চুমা দিতে গেলাম।......একী? মরার গালে চুমো!............উঃ, মৃত্যু।——শিপু!.........

কে জবাব দেবে? খাল্‌টার জল ছল্ ছল্ করিয়া পাহাড়ী পথের বুকটাকে ক্রমাগত আঘাত করিতেছিল। সেই দুর্য্যোগের রাত্রি শেষে আবার আমার ছন্নছাড়া, বোহিমিয়ান্ জীবনের পথের বাঁশি বাজাইল।.........

ভাঙা-নীড় আবার ভাঙিল!

———

বাবা ও ছেলে

—শ্রীক্ষেত্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছেলেটী দুঁদে দুষ্টু।

যেন পাষাণ কুঁদিয়া তাহার শরীর খানি রচনা। কালো কুচকুচ্ করিতেছে। বলদৃপ্ত দৌরাত্ম্যে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলি পরিপুষ্ট ও প্রাণ-বাণ। বসা বসা চোখ দুখানিতে দুষ্টামি যেন ছমছম করিতেছে। নির্ভীকতার একটু হাসি ঠোঁট দুখানিতে সদাই লাগিয়া আছে। তাহাতে প্রায়ই সামনের দন্ত দুইটী বাহির হইয়া পড়ে। তাহার মাঝখানে ছোট্ট একটী কাল দাগ। মাথার কোঁকড়া চুলে প্রকৃতিগত দৃঢ়তা যেন তরঙ্গায়িত। বয়স ৬।৭ বৎসর হইবে।

বাবাটী আধুনিক জগতের অভিশপ্ত কেরাণী। সুতরাং আকার ছিপ্ ছিপে। এবং মাজাটী ভাঙা। মাঝে মাঝে হাঁপাইবার ঝোঁক আসে। দাড়ি রাখেন। বিড়ি খান। সময় সময় ডানদিককার ভগ্নি-ভাঙা একটী চসমা নাকের উপর খাটাইয়া দেন।

দড়ি-ওঠা 'নিরামিষ' জুতা পায়ে এক পা ধূলা লইয়া ছেঁড়া পিরাণ-গায়ে 'স-দাড়ি' বাবা রোজই পাঁচটার সময় আপিস হইতে বাড়ী আসেন। আসিয়াই একটু হাঁপান। তারপর যথারীতি চারটী ভাতের গন্ধ গ্রহণ করিয়া একটী বিড়ি ধরাইয়া ফেলেন ও চস্মা চড়াইয়া সনাতন শয্যাটীর উপর চিৎপাত হইয়া হ্যারিকেনের আলোকে পাঞ্জির পিছনদিক উল্টাইয়া রেলষ্টেশনের নামগুলি পড়েন ও তাহার ভাড়া দেখিয়া যান। বিড়ি নিবিয়া গেলেও চুষিয়া খান।

ছেলেটী সমস্তদিন দৌড়াদৌড়ি করে; গাছে চড়ে ও সমবয়সীদের চাঁটি দেয়। সন্ধ্যা হইলেই কিন্তু সে খাইয়া দাইয়া বাপের কোলের কাছে শোয়। শুইয়াই কোনদিন ঘুমাইয়া পড়ে। কোনদিন আবার শুইয়া শুইয়া বিছানার উপরে ডিগবাজী খাইবার চেষ্টা করে। তাহাতে কোন কোন সময়ে হ্যারিকেনটী উল্টাইয়া যায়। বাবার কিন্তু তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। তিনি হয়ত তখন মনোরথে 'চন্দ্রনাথ' গিয়া হাওয়া বদ্‌লাইতেছেন।

যথারীতি আজ বিছানায় বাপের কোলের কাছে শুইয়া ছেলেটীর ঘুম আসিতেছেনা। সে একবার দাড়িগুলির ভিতর

আঙ্গুল চালাইয়া দিল, 'চিৎপাত'-পিতার পাঁজরার হাড়গুলি গণিল। তারপর খানিকক্ষণ 'গুম' হইয়া কি ভাবিল। শেষে ডাকিল।—

—'বাবা'!

তন্ময়তা-জড়িতস্বরে উক্ত হইল, 'হুঁ'।

—গাছে উঠতে পারিস্?

—হুঁ!

—দৌড়ুতে?

—হুঁ!

—মারতে পারিস্?

—হুঁ!

—ধীরের বাবাকে?

—হুঁ।

—যতের কাকাকে।

—হুঁ।

—ফণের দাদাকে?

—হুঁ।

——'ইঃ', বলিয়া খোকা কাত হইয়াছিল, চিৎ হইয়া পড়িল। সেই সময়ে তাহার পাষাণ-পানা ডান হাতখানা সশব্দে কেরাণীবাবার বিষ্ণুপঞ্জরে আসিয়া পড়িল। বাবা 'কোক্' করিয়া উঠিলেন। মনের রেলগাড়িতে দেশভ্রমণটা গুলাইয়া গেল। রাগিয়া তিনি বলিলেন, 'খুনে ছেলে! ফের দুষ্টামি করলে পুলিশ ডেকে দোব।—ঘুমো!'

খুনে ছেলে পিতৃআজ্ঞা পালন করিল না। এতটুকু হাসিয়া সে আপনার দাঁতের মাড়ি বাহির করিয়া মাথাটাকে মৃদু একটু নাড়া দিয়া বলিল, 'পুলিশ কি করে বাবা?'

'ধরে। তোকে অম্নি ক্যাঁক্ করে ধরবে।'

'ইঃ,—আমি অম্নি এ্যা-ক ছুট দেবো।'

'সেও যাবে।'

'আমি একেবারে তাদের তেতলার ছাতে উঠে পড়বো।'

'সেও উঠবে রে বোকা।'

'উ—ওঃ। তাহলে তাকে মারবো এক ধাক্কা, সে একেবারে দুম্ করে বিপ্‌নেদের কানাচের নর্দ্দমায় গিয়ে পড়বে।'

ধ্যানী বাবা অনেকগুলি কথা কহিয়াছেন; হাঁপাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাই ব্যাপারটার উপসংহার করিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন,

'ডাকাত কি না!'

—হায়, শৈশবের আশা অগাধ; উৎসাহ উচ্চৈঃশ্রবার মত ছোটে; কিন্তু ক্রমে ক্রমে জীবনপথে বাস্তবতার তাতে আশা শুকাইয়া যায়, উৎসাহ মুমূর্ষ হইয়া আসে। বাল্যের ডাকাতি যদি বয়স হইলেও থাকিত!—তাহা হইলে মাজা এমন করিয়া ভাঙিত না! বিষ্ণুপঞ্জর এমন করিয়া ঠেলিয়া বাহির হইত না আর,—আর কিছু হোক আর নাই হোক, বাঙ্গালী জাতি এমন করিয়া কেরাণী হইত না! দাড়িও বোধ হয় এত করিয়া গজাইত না!

সাবিত্রী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন

হে দেবি ! জানিয়া নিজ অদৃষ্ট-লিখন,
কি সাহসে কি হরষে করিয়া অর্পণ
বরমাল্য, অরিষ্টের কবচ অক্ষয়,
পতিরে লইলে বরি' ; এতটুকু ভয়-
সংশয়-বিকল্প-মেঘ হৃদয়-আকাশে
উদিল না, শোচনার তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে
বিম্বাধর হইল না ম্লান একবার,
শীতে কিশলয় সম মাধবীলতার ?

প্রভঞ্জনে ভাঙ্গে তরু, পর্ব্বত অটল,
সেইমত দ্বৈধীভাব-শূন্য অচঞ্চল
দুর্ব্বার সঙ্কল্পে দৃঢ় বাঁধিয়া হৃদয়
প্রবেশিলে অনিশ্চিত অন্ধকারময়
ভীষণ কণ্টকাকীর্ণ ভবিষ্যত-পথে,
নির্ভীক আনন্দে চড়ি' মনোরথ-রথে ;
কি ধর্ম্ম বিশ্বাস, তেজ কি গৌরবময়,
অলৌকিক সুগভীর কি আত্ম-প্রত্যয় !

ঐশ্বর্য্যের খরদীপ্ত উল্লাস-আলোক
উপেক্ষি', স্বেচ্ছায় ডুবে দুঃখ-দৈন্য-শোক-
দারিদ্র্যের ঘন কৃষ্ণ ভীষণ আঁধারে
রহিলে, তাপসীমত আচারে বিচারে
শুদ্ধপূতা, সুদুশ্চর আসিধার-ব্রতে
দীক্ষিত হইয়া, এই পাপের মরতে
পুণ্যের অভয়বাণী প্রেমের বিজয়,
ঘোষিলে, দেখালে সবে প্রেম মৃত্যুঞ্জয়।

কি প্রেম সে, তুচ্ছ করে যাহা ভয়ঙ্কর
কালের করাল রূপ, নাহি করে ডর
মৃত্যুর ভ্রূকুটী-ভঙ্গী, যাহা লুব্ধ নহে
প্রলোভন-মধু-বাক্যে, নিত্য তৃপ্ত রহে
সুখে দুঃখে, প্রতিষ্ঠিত দেব-মহিমায়,
স্বার্থগন্ধ মলিনতা কিছু নাই তায়,
অকৈতব, অহেতুক, শ্রেষ্ঠ রসায়ন,
অমৃত ভেষজ ইহা, মৃত সঞ্জীবন।

জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী রাত্রি, অন্ধকার
হইয়াছে কৃষ্ণতর, অশেষ প্রকার
তরু-লতাকীর্ণ-বন-বর্হি করি-কুল-
নীলিমায়, একাকিনী ভাবনা-আকুল,
হৃদয়ের মর্ম্মন্তুদ চাপিয়া বেদন
প্রতিজ্ঞা-প্রদীপ্ত-চিত্তে, ভয়ে অকম্পন,
সম্মুখে মৃত্যুকে রাখি, মৃত্যু কোলে করি,
অপূর্ব্ব সতীত্ব-তেজে, রহিলে সুন্দরি !

কি বর্ণে, কি তুলি দিয়া আঁকিয়াছে কবি
ভুবনমোহন এই মধুময় ছবি !
কতকাল গেছে চলে, যুগ ব্যবধান,
সমভাবে উঠে সেই প্রেমের তুফান
হৃদয়-বারিধি মাঝে বিশ্ব-মানবের,
প্রথম উঠিয়াছিল যবে ভারতের
হিয়াকে প্লাবিয়া, আজো তেমনি বিধুর
মুগ্ধ করে চিত্র এই অমর মধুর।

সাবিত্রি! সবিতৃ-কর রঞ্জিত মণ্ডল-
মধ্যস্থা গায়ত্রী-রূপা, চঞ্চল তরল
বিদ্যুৎ-বিলাসমত ঝলসি' নয়ন
ক্ষণিক প্রভায়, পুন হও না মগন
গভীর আঁধারে, ধীর স্থির নিরমল
জ্যোতি-বিভাসিতা, বিশ্ব-তপস্যা-মঙ্গল
পুণ্যফল একীভূত রাশাকৃত হয়ে,
আসিলে লাবণ্যময়ী পূত মূর্ত্তি লয়ে।

প্রেমের সে সিদ্ধমন্ত্র, হে ব্রহ্মচারিণি,
জপিয়া চৈতন্য দিয়া, বিচিত্র-রূপিনী
শক্তিতে সজীব কার' মহী মহনীয়
করিলে যেদিন, তাহা রবে স্মরণীয়,
"মেঘশ্যাম আষাঢ়ের প্রথম দিবস"
রহে যথা; তিগৃহ হউক সরস
নবীন আনন্দ-পূত উৎসব-মুখর
শান্তিমন্ত্রে, দূরে যাক্ পাপ নিশাচর।

ফর্সা হাত

—শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

ব্যারাকপুরে ডাক্তারী করতাম। ক্যাম্বেল পাশ, দশ বৎসরের অভিজ্ঞতায়ও আয়ের দিক থেকে বিশেষ সুবিধা করতে পারলাম না। আশা করছিলাম মাসী পিসীদের মধ্যে কেউ বিপুল সম্পত্তি আমার নামে রেখে স্বর্গগত হলে জীবনের শেষের দিকটা সুখ করা যেত কিন্তু তা হবার কোনো আশু সম্ভাবনা দেখা গেল না। এদিক থেকে একটা অন্তরায় ছিল এই যে, মাসী এবং পিসী আমার ছিলই না।

'ডক্টার রয়' এমনি সময় পেশোয়ার থেকে নিজের পৈত্রিক ভিটা, ব্যারাকপুরের "আনন্দ ভবনে" ফিরে এলেন।

নাম শুনেছিলাম, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপ ছিল না। একই পেশার লোক; একদিন আপনা হইতেই তাঁর বৈঠকখানায় গিয়ে উঠলাম।

দাড়ী গোঁফ কামানো বৃদ্ধ ভদ্রলোক, শীর্ণদেহ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, দীর্ঘ শুভ্র কেশ বিক্ষিপ্ত; স্মিতহাস্যে পরিচয় করলেন।

চায়ের টেবিলে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন।

নানা আলোচনা চল্ল। পেশোয়ারের সস্তা মেওয়ার

বিষয় আরম্ভ করে তর্কের ধারা নানা বিচিত্র কথার স্রোতে ভারতে ইংরেজ শাসনের ফলাফল, মুসলিম সমাজের অহেতুক আব্দার, কলিকাতার চালচলন, সনাতন শিক্ষা, বঙ্কিমচন্দ্র, জল, বাঘশিকার, মশার অত্যাচার, ইত্যাদি কত বিষয়ে ঢেউ তুলে অবশেষে আত্মা আছে কিনা এই সমস্যার চড়ায় গিয়ে ঠেকল।

আত্মা এবং জীবাত্মা এবং পরমাত্মা স্পিরিট মেসমেরিজম্ —এই সব বিষয় নিয়ে একদিন অনেক সময় নষ্ট করেছি, কাজেই আমার বলবারও অনেক কিছু ছিল। সেই সব বললাম, ডক্টর রয় মন্ত্রমুগ্ধের মতন নিশ্চল হয়ে শুনলেন।

কথায় কথায় রাত্রি অনেক হয়ে গেল। ডক্টর রায় বললেন, শুন্‌লাম আপনি একলা বাড়ী থাকেন, আজ না হয় নাই গেলেন। আমার সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করুন এবং থাকুন, যদি অবশ্য আপনার আপত্তি না থাকে ......আমি আপনার বাড়ীতে ঠাকুরকে ফোন করে দিই ?... .....কি বলেন ?

আত্মা সম্বন্ধে এত মাথা ঘামালেও ছেলেবেলার কুসংস্কারের ফলে আমার মনের কোন্ কোণে একটু ছমছমে ভাব প্রচ্ছন্ন ছিল, এবং যে রাত্রে এসম্বন্ধে আলোচনা একটু বেশী হত সে রাত্রের নিদ্রা দুঃস্বপ্নে ব্যাহত হতই। কাজেই বললাম আপনি অবশ্যই যখন......মানে......আমার আর আপত্তি কি ? তবে .....কেন খাওয়াদাওয়ার হাঙ্গাম......মিছে... আপনাদের অসুবিধে.........

বৃদ্ধ সজোরে মাথা নেড়ে বললেন, কিছু না কিছু না...... কি বলছেন আপনি ! ওগো শুনছ ! বলে' পাশের ঘরের পর্দ্দার দিকে চাইলেন। তাঁর স্ত্রী মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে পর্দ্দা সরিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন। স্বামীর মতন তাঁরও দেহ জীর্ণ, মুখে চিন্তার বিষণ্ণ ছায়া। ডক্টর রয় বললেন, ডক্টর সেন আজ এইখানেই খাবেন, বাবুর্চ্চিকে বলে দিও গো।

মিসেস্ রয় ঘাড় নেড়ে সরে গেলেন।

ডক্টর রয় সেই পুরোণ কথা পাড়লেন—আত্মা প্রেতাত্মা আপনি মানেন, আচ্ছা আসুন ত এধারে.........

আমি উঠ্‌লাম।

হলের দক্ষিণ দিকে একটা ঘরের দরজা তিনি খুললেন। কাঁচের দরজা লাগানো প্রকাণ্ড একটা র‍্যাক একদিকের দেয়াল জুড়ে রয়েছে তার মধ্যে নানা রকমের ছোট বড় কাঁচের জার উগ্র এসিডে ভর্ত্তি, তারই মধ্যে কোনটায় একটা পা, কোনটায় বত্রিশপাটি দাঁত, অস্থি ইত্যাদি। তিনি বললেন এই সবেরই পশ্চাতে এক একটি পরলোকগত পুরুষ কিংবা নারীর জীবনের চমকপ্রদ ইতিহাস আছে। আমার শোনবার আগ্রহ হচ্ছিল, কিন্তু তখন তিনি কিছু বললেন না, বললেন কাল হবে।

সেদিন রামপক্ষীর সুমিষ্ট মাংসে চপ কাটলেট ইত্যাদি রসনাতৃপ্তিকর নানা ভোজ্যে রাত্রের আহারটি খুব ভালোই হল কিন্তু শয়নের ব্যবস্থা যখন সেই এসিড সুরভি পরিপূর্ণ ঘরে দেখলাম তখন আপত্তি করবার কথা মনে হল।

আমাকে নিস্তব্ধ দেখে ডক্টর রয় যখন বললেন, কি হে সমীর, তোমার ভয় করবে নাকি এ ঘরে শুতে ? ভয় করে ত' বলো ?......তখন স্বচ্ছন্দে বলে ফেললাম, ভয় কিসের ? বেশ শুতে পারব।

রাত্তিরে ভয়টয় পেলে আমাকে ডেকো, চুপ করে থেকোনা, ঐ যাঃ প্রথম দিনেই তোমাকে তুমি বলে ফেললাম, জুনিয়ারদের সঙ্গে আমি বেশীক্ষণ 'আপনি' চালাতে পারি না ! ডোন্ষ্টিউ মাইণ্ড ফর দ্যাট মাই ডিয়ার চ্যাপ...বলে তিনি একবার হাসবার চেষ্টা করলেন।

আমি তাঁকে বললাম, রাত হয়েছে অনেক। আর কথা নয়। আপনি শুতে যান, কাল আবার হবে !

যাবার সময় দরজা ভেজিয়ে দিতে দিতে তিনি পুনশ্চ বলে গেলেন, দরকার হলেই ডেকো, আমি পাশের ঘরে আছি।

তিনটে জানলা খোলা রয়েছে, চাঁদের আলো গরাদের ফাঁক দিয়ে মশারির ভেতর দিয়ে আমার বিছানায় বিচিত্র রূপ নিয়ে এসে পড়েছে, টেবিলের তলায় র‍্যাকের পাশে জারগুলার পিছনে কোণে এবং মেঝের কোন কোন অংশে অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে নানা মূর্ত্তি নিয়েছে।

বাইরের বাগানের পল্লব মর্ম্মরেও যেন সেদিন আত্মার ভাষা চলছিল, রাত্রির শান্ত নিস্তব্ধতার ভয় যেন ছড়িয়ে পড়েছিল ঈগলের মতন বিস্তৃত ডানা মেলে।

ক্লান্ত আঁখির পাতা নিদ্রার মোহে কখন জড়িয়ে গেছে জানি না ; কিন্তু দুঃস্বপ্ন তার নৃত্য সুরু করে দিল।

সহসা কার মৃদু স্পর্শে চমকে উঠে যখন জীবন্ত জগতে চোখ মেললাম তখন সামনের দৃশ্য দেখে শরীর হিম হয়ে গেল। একটা কাবুলীওলার মূর্ত্তি, আমার মশারীর একদিকটা তুলে বিছানায় অর্দ্ধাঙ্গ ঢুকিয়ে দিয়েছে এবং আমার মুখের অত্যন্ত কাছে তার জ্বলন্ত চোকদুটো নির্নিমেষ।

মুহূর্ত্ত পরেই সরে গেল, এবং র‍্যাকের জারগুলা আঙুল দিয়ে গুনতে লাগল, একে একে সবগুলো দেখা শেষ করে সে ফিরে বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল, তার জোব্বা জাব্বা আলথাল্লা হাওয়ায় উড়তে লাগল। দেখলাম বাঁ হাত সে বার বার তুলছে কিন্তু ডানদিকের আস্তিনটা সোজা পড়ে আছে, হাতের কোনো চিহ্ন নেই।

একটা ভদ্রলোকের ঘরে এত রাত্রে কাবুলীওলার কি প্রয়োজন এবং প্রবেশাধিকারই বা পেল সে কিসে একথা মীমাংসা করবার মুখেই ভৌতিক ভাবটা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল, তবু সাহস সঞ্চয় করে বললাম—কোন্ হ্যায় শালা, হিঁয়া কাহে আয়া?

তাতেও সে কোন জবাব দিল না, এধার ওধার খানিকটা পায়চারী ক'রে অকস্মাৎ ধূম্রাকাশে মিলিয়ে গেল।

আমার গলা থেকে যে আওয়াজটা বেরিয়েছিল, ভীতি বশতঃ সেটা খুব সুস্পষ্ট হয়নি, কিন্তু তারই প্রতিধ্বনি ডক্টর রয়কে জাগিয়ে তুলেছিল। তিনি দরজা খুলে এসে জিগেস করলেন, ডাক্‌ছিলে?

বললাম, আপনাকে না। হঠাৎ কি একটা দেখলাম...

তাড়াতাড়ি বিছানার কাছে এসে তিনি জিগেস করলেন কি দেখলে? কোনো কাবুলীওলা কি?

—হ্যাঁ, ডান হাতটা তার আবার নেই।

—ঠিক ঠিক—তাহলে আমার চোখের ভুল নয়! ঐ জিনিস আমি আজ দু বছর ধরে প্রতি রাত্রে দেখে আসছি।

আমি উঠে বসলাম—ব্যাপারটা কি বলুন ত?

ব্যাপারটা হচ্ছে এই—বলে তিনি আমার বিছানার এক পাশে বসলেন। তারপর আরম্ভ করলেন—ব্যাপারট হচ্ছে এই:—

পেশোয়ারে যখন ছিলাম তখন 'হস্পিটালে' একদিন এক কাবুলী পেসাণ্ট এল, তার ডান হাতটা একেবারে অপারেশানে বাদ দিতে হবে। তখনই সে বলে দিল হাত খানা রেখে দেবেন, আমি মারা গেলে আমার কবরে পাঠিয়ে দেবেন, নইলে ঐ হাত নিতে আমাকে আবার আসতে হবে।

আমি বললাম, আচ্ছা, আমি এসিডে এটা প্রিজার্ভ করে রাখব।

রাখলুমও তাই। বছর দুই পরে একদিন আমার বাংলোয় কি করে আগুন লাগল সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে গেল কিছুই বাঁচানো গেল না। সে হাতখানাও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

তারই মাস ছয়েক পরে খবর পেলাম, সেই কাবুলীটা মারা গেছে কিন্তু তখন হাত ফিরিয়ে দেবার কোনো উপায় ছিল না। একদিন রাত্রে দেখলাম, সে আমার ঘরে এসেছে এবং আমার মশারির নেট তুলে বাঁ হাত দিয়ে আমায় ঠেলছে। সে যা ভঙ্গী করল তাতে বুঝলাম সে হাতখানা চায়। আমি তাকে সব কথা বললাম, কিন্তু কিছুতেই সে শুনল না, ঘরের সব জারগুণ' আঙুল দিয়ে গুণে সে চলে গেল। তারপর থেকে এই দীর্ঘ চার বছর ধরে প্রতি রাত্রে সে আসে, এসে ঠেলে, জারগুণ' গুণে চলে যায়। যতই দরজা বন্ধ করে থাকি যতই লোকজন নিয়ে শুই, সে ঠিক এসে আমাকে ঠেলা দেয়।

কখন আসবে এই ভেবে সমস্ত রাতই আতঙ্কে আমার ঘুম হয় না, এবং আমার স্ত্রীও সেই ভয়ে শুকিয়ে উঠছেন। এই একটা মহা আপদ থেকে আমাকে কেউ বাঁচাতে পারছে না। পেশোয়ার ছেড়ে এত দূর খাণ্ডোয়ায় চলে এলাম, তাও দ্যাখো, ঠিক পেছু নিয়েছে!

ভাবনার কথা বটে।

আমি বললাম আচ্ছা এ সম্বন্ধে আমি বই-টই দেখে একটা উপায় স্থির করব। এখন উঠি।

বাড়ী এসে প্রেততত্ত্বের একখানা ইংরেজী বই বার করে নিয়ে পড়লাম।

এক জায়গায় লিখেছে মৃত্যুর মুহূর্ত্তে মানুষ যে কামনা করে তাই পূরণ করবার জন্যে তাকে ঘুরে ঘুরে পৃথিবীতে আসতে হয়। তার সে ইচ্ছা যতক্ষণ না মেটে ততক্ষণ তার প্রেতাত্মার মুক্তি নেই। যা চায় ঠিক সে জিনিস যদি সব সময় তাকে না-ও দেওয়া যায় সেই রকম অন্য কিছু দিয়ে আপোষে মীমাংসা করা যেতে পারে।

এই আপোষ মীমাংসা করবার কথায় আমার মাথায় এক

কন্দী জেগে উঠ্‌ল।……

দুপুরের ট্রেণে আমি কলকাতা যাত্রা করলাম।

মেডিকেল কলেজের হাউস সার্জ্জন অতুল—আমার বাল্যবন্ধু। তার কাছে গিয়ে বললাম—একখানা হাত আমাকে যোগাড় করে দিতে পারো? ফরসা একখানা হাত?……

অতুল আশ্চর্য্য হয়ে বলল, হাত কি হবে? কতকাল পরে দেখা, খবর কি বলো, একেবারে এসেই একখানা হাত চাইছ, ব্যাপার কি হে?……

বললাম, ব্যাপার বলবার সময় নেই, পরে হবে; এখন ভাখো কারর হাত অপারেশন করা হয়নি কি?

হয়েছে। কালই একজন চাটগেঁয়ে লস্করের দুখানা হাত কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে; ফরসা বলছ? হ্যাঁ, ফরসা বলা যেতে পারে……কিন্তু……

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, কিন্তু পরে হবে অতুল, মীমাংসা হয়ে গেলে সব বলব। ভৌতিক কাণ্ড……

অতুলের বিস্ময় যারপর নাই বেড়ে গেল, যাই হোক বেশী বাক্যব্যয় না করে সে একজন ডোমকে ডেকে বলে দিল, একখানা হাত প্যাক করে দাও ত, সেই লস্করের!……

সন্ধ্যার আগেই আমি ডক্টর রয়ের বাড়ী এসে উঠ্‌লাম। বললাম, হাত এনেছি, এই নিয়ে আমি প্রেতাত্মার সঙ্গে রফা করতে চাই।

সে রাত্রেও আমি সেইঘরে শুলাম। হাতখানা খোলা টেবিলের ওপর রয়েছে।

সেদিন কখন চাঁদ উঠ্‌বে জানা ছিল না, অন্ধকার রাত ……একটু আধটু খুস্‌খাস্ শুনে চেয়ে দেখছিলাম, কোনো আবছায়া মূর্ত্তি এল কি না।

উৎকণ্ঠায় বহুক্ষণ কাট্‌ল। অবশেষে দেখলাম, কালো কালো ছায়ার মতন কাবুলীওলা এসে পড়েছে।

মশারী তুলে দেখল তারপর এক দুই করে জারগুলা গুণে চলল। তারপর হাতের কাছে দাঁড়াল।

কিন্তু সম্ভবতঃ হাতখানা হাতে নিয়েই একটা বিকট চীৎকার করে উঠ্‌ল……ঘরের দরজা জানালা কেঁপে উঠ্‌ল……হাতখানাকে সজোরে মাটিতে আছড়ে ফেলে রজনীর বুক চিরে অতি করুণ এবং অতি ভীষণ এক আর্ত্ত-নাদ করে সহসা সে চলে গেল।

বাতাসে তার ভয়ঙ্কর আওয়াজের প্রতিধ্বনি কতক্ষণ ধরে চলল।

ডক্টর রয় কাঁপতে কাঁপতে এলেন আলো নিয়ে, এসে বললেন—কি হল সমীর?

বললাম, হাতখানা ফেলে দিয়ে চলে গেল।

বৃদ্ধ হতাশ হয়ে বসে পড়লেন, আমার নিষ্ফলতার লজ্জা আমাকে চিন্তিত করে তুলল।

সে রাত্রির ঘুম নষ্ট হয়ে গেল, প্রতিক্ষণই আশঙ্কা করছিলাম, আবার বুঝি আসে।

ভোর হল, বিবর্ণ ছিন্ন হাতখানার দিকে চেয়ে গত নিশীথের বিশ্রী ব্যাপারের স্মৃতিতে মন আরো খারাপ হয়ে পড়ল।

কিন্তু হঠাৎ হাত খানা দেখে আর একটা কথা মনে পড়ল —এটা যে বাঁহাত। তা'র যে ডান হাত নেই!

আর একবার শেষ চেষ্টা করা যাক্। ডক্টর রয়কে কিছু না বলে প্রথম ট্রেনেই কলিকাতা চললাম।

ডানহাতখানা তখনো হাঁসপাতালে ছিল, কাগজে মুড়ে নিয়ে এলাম।

সেদিনও টেবিলে আগের দিনের মতই রাখা হল, কিন্তু সে ঘরে শুতে আমাদের কারুরই সাহস হল না।

আমি এবং ডক্টর রয় হলঘরে একই শয্যায় শুলাম, পাশের ঘরে তাঁর গৃহিণী আঁচলে সরষে পড়া আর বিছানায় রাম-নাম লিখে ঝিকে দোর গোড়ায় শুইয়ে বিনিদ্র রজনী যাপন করতে লাগলেন।

ডক্টর রায় চুপচাপ শুয়ে রইলেন। আমি আপনার মনে ভাবতে লাগলেম সকলকেই ত একদিন দুনিয়া ছেড়ে যেতে হয় কিন্তু প্রেতাত্মা হওয়ায় কষ্ট বুঝি বহু অভিশাপের ফল।

বাইরে মাঝে মাঝে ঝড় উঠ্‌ছিল, আমি ভাবছিলাম কোন্ দেবতার নাম করলে মাম্‌দোভূত পালায় অন্ধকারে বুঝতে পারছিলাম না। ডক্টর রয় জেগে আছেন কি না তাঁকে ডেকে বিরক্ত করতেও ইচ্ছে করছিল না।

রাত্রি থমথম করছে, মাঝে মাঝে সদ্য-বিধবার আকুল হাহাকারের মতন বাইরে ঝড়ের শব্দ……মাঝে মাঝে

একটা দুর আর্ত্তনাদ অত্যন্ত অস্পষ্ট—যেন কোথায় কত দুরের গ্রামে সহসা আগুন লেগেছে।

পাশের ঘরে কে যেন জানালা খুলল, এবং বন্ধ করল ......একটা টিকটিকি ডেকে উঠ্‌ল......তারপর সব চুপ।

দুর্য্যোগের উৎকণ্ঠা-ভরা রাত তারায়-ভরা আকাশের নীচে শেষ আর হতে চায় না।

ওদিকে তন্দ্রাও চোখে জড়িয়ে আসছে ছোট ছেলের আদরের মতন।

দুটো পাতায় কখন এক হয়ে গেছে, শান্ত মায়াচ্ছন্ন ভাব চূর্ণ করে দিয়ে দক্ষিণদিকের দরজা হঠাৎ খুলে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ফিরে দেখলাম কাবলীওয়ালার ছায়া মূর্ত্তি এসে দাঁড়িয়েছে মশারী তুলে।

ডাক্তারকে বাঁহাত দিয়ে নাড়া দিয়ে সে পাশের ঘরে চলে গেল।

কি হবে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম অধীর আশঙ্কায়।

কি একটা আওয়াজ উঠ্‌ল এবং থেমে গেল।

আবার সে মূর্ত্তি হল ঘরের গাঢ় তমসায় এসে দাঁড়াল তার অস্পষ্ট আভা নিয়ে।

আরো কাছে ......আরো কাছে......তার চোখের জলন্ত আলোয় দেখলাম মাথার উপরে দুটো হাত তুলে সে দাঁড়িয়েছে —একটা যেন আনন্দের আভাস।

তারপরে খাটের পাশে এসে ডক্টর রয়ের দিকে চেয়ে দুহাত কপালে ঠেকিয়ে কুর্নিশ করতে করতে পেছু হেঁটে সে মিলিয়ে গেল।

তারপর দিন থেকে কোনো রাত্রি ডক্টর রয়ের বাড়ীতে আর সে আসেনি। তার হাত পেয়ে বোধ হয় সে খুসিই হয়ে গেছে।

ডক্টর রয়ের সুখের এবং স্বাস্থ্যের দিন আরম্ভ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমারো ভাগ্য পরিবর্ত্তন হয়ে গেল।

তাঁর বিপুল সম্পত্তি আমার নামে লিখে দিলেন তিনটী উপযুক্ত ভাইপো থাকা সত্ত্বেও।

তাঁর দুরবস্থা এবং তা থেকে মুক্তির কথা ভাবতে গেলে এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নাই।

সাহিত্যে বিয়ে

—শ্রীরেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলা ভাষায় সাহিত্য বলতে বুঝি গল্প, নাটক, আর উপন্যাস। উদ্বৃত্ত দুচারটে প্রবন্ধ কিংবা পুঁচকে কবিতা—তা' সে ধর্ত্তব্য নয়! বিজ্ঞাপনের বই, 'পোকামাকড়' 'জন্তু-জানোয়ার' ইত্যাদি ছেলে-ভোলোনো কথানা যা আছে তাতে ক্ষুধা মেটে না।

গল্প কিংবা উপন্যাসও যা আছে, তাদের আখ্যান বস্তুর মধ্যে বৈচিত্র্য দেখাবার চেষ্টা কারও নেই। একটা মানুষের জীবন কথা বলতে গেলে দুচার কথায় শেষ হয় না। সারা জীবনে সুখ দুঃখের অনেক পরিচয়ই ঘটে। বাঙ্গালী সাহিত্যিক জীবনের মহাকাব্য লিখতে বসে' শুধু বিয়ের দিনটাকেই রাঙিয়ে তোলে। কলমের যত কালি বিয়ের ইতিহাস লিখতেই ফুরিয়ে যায়। উপন্যাস বলতে আমরা যে কোনও একটা বিবাহেরই আনুসঙ্গিক কাহিনী বলেই বুঝি। লোকে কথায় বলে লাখ কথায় বিয়ে হয়। নাটক নভেল গুলা ঐ লাখ কথারই পরিচয় লিপি, permutation ও combination এর দ্বারা রচিত। সব বই গুলারই মূল কথাটা এক;—ভিতরের পরিচ্ছদ গুলা বিভিন্ন শিল্পীর তুলির বিভিন্ন রঙে রঙান। এই ভিতরের কথাগুলা যিনি যত ঘোরালো করে বলবেন তাঁর তত বাহাদুরী।

বর্ণিত তথ্যটী সম্বন্ধে প্রমাণ যদি চান ত বলি,—'দত্তা'

বিজয়া ও নরেনের বিয়ের ইতিহাস। তেমনি 'বিষবৃক্ষে' কুন্দ ও নগেন্দ্রের বিবাহের সূচনা ও সমাপ্তি ছাড়া আর কিছু নেই। 'পরিণীতা' ও মহাজনদের দল ছাড়া নন। 'খাসদখলে'র কবি শেষ পর্য্যন্ত অনেকটা বাগিয়ে এনেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ তাঁর এত যত্নের এবং আয়োজনের ফল বিয়েটাই ফস্কে গেল। তাই 'হোলোনা ইজ্ দি নতুন বন্দোবস্ত'। 'বৈরাগযোগে'র বৈরাগী বিয়ে করে তবে ছাড়লেন। 'অমূল তরু' প্রচলিত পথ হতে বাদ পড়ে না। 'গোড়ায় গলদ' ওরফে 'শেষ রক্ষা'র গোড়া হতে শেষ পর্য্যন্ত তিন চারটে বিয়ের বেতালা ছন্দ বেজে চলেছে।

বিয়ে ছাড়া যখন বই হয় না এবং বিয়ের রাতে আলো গোটাকতক জ্বালালে এবং একটা দুটো ভুঁই পটকার আওয়াজ করলেই যখন ঔপন্যাসিক হওয়া যায়—তখন সাহিত্য-যশঃপ্রার্থী সকলকারই উচিত বিয়ের ব্যাপারে নর-নারীর মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করতে শেখা। বিয়ে কাকে বলে, তাহার আবশ্যকতা এবং দোষগুণ, কোন্ বয়সে বিয়ে করা উচিত, কত রকমের বিভিন্ন বিয়ের রূপ এবং শ্রেণীভেদ চলিত আছে এ সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা নীচে লিখে জানাচ্ছি।

বিয়ে কথাটা বিবাহের অপভ্রংশ।

বিবাহ মানে—'বিশেষ রূপে বহন করা' হতে পারে আবার 'বন্ধন (শিকলি) পরা' বললেও ভুল হবে না।

বিয়ে একটা বন্ধন। পতঙ্গ যেমন মৃত্যু সামনে জেনেও আগুনে ঝাঁপ দিতে দ্বিধা করে না, মানুষও তেমনি বন্ধনের অশেষ যন্ত্রণা বুঝেও বিবাহ কর্তে ছোটে। বিয়ের বাস্তবিক আবশ্যকতা আছে কি না জানি না, তবু চার কালের আপামর জনসাধারণ সারাজীবন ধরেই এই শৃঙ্খলে বাঁধা পড়বার জন্য পা বাড়িয়ে থাকে। আদিম যুগে বিবাহ প্রথা ছিল না এবং বর্ত্তমানে জন্তু জানোয়ারদের মধ্যেও উহা অপ্রচলিত। এখন মানুষ নিজেকে সত্যকালের লোকদের চেয়ে এবং জানোয়ারদের অপেক্ষা উন্নত বলেই মনে করে, তাই এমনি সব সংস্কারের জাল বুনে নিজের আবাস গৃহটীকে সে সুদৃঢ় করে তুলতে চায়।

সত্যযুগের আদর্শে এখন কেহ কেহ সংস্কার মাত্রকেই কুসংস্কার বলে মনে করেন। সকল প্রকারে সকল বন্ধন হতেই তাঁরা আপনাদিগকে মুক্ত করতে চান। এই স্বাধীন পুরুষেরা ক্রমেই বিবাহ প্রথার চরম বিরোধী হয়ে দাঁড়াচ্ছেন।

যাঁদের সৎসাহস এখনও অতটা জাগে নি, এমনি কেহ কেহ বিবাহ প্রথাটাকে একটা civil contract অর্থাৎ ব্যবসাদারী চুক্তি বলেই মানতে চান, তার বেশী একতিলও নয়।

জগৎটা হচ্ছে একটা প্রকাণ্ড হাটবাজারের সামিল। প্রত্যেক মানুষই চায় বাকী সকলকার কাছে যতটুকু সুখ সুবিধা এবং স্বাচ্ছন্দ্য আদায় করতে পারে কড়ায় গণ্ডায় তা বুঝে নিতে। পুরুষ স্ত্রীর কাছে যেটুকু কাজ অথবা সাহায্যের দাবী করে, বিনিময় হিসাবে স্ত্রী তার মূল্য ধরে নিতে ভোলে না। চুক্তির সর্ত্ত একপক্ষ মানতে রাজী না হলেই ফারখতের মামলা রুজু হবে।

চুক্তি-মূলক বিবাহের লাভ হচ্ছে এই যে, স্ত্রী নিজেকে পুরুষের সমান বলেই ভাবে, এবং পুরুষও স্ত্রীকে সমান ছাড়া বেশী বা কম বলে ভাবতে পারে না!—কেহ কারও অধীন নয়। যে ক'দিন পরস্পরের সঙ্গে বনিবনা হবে—সেক'দিন একত্র ঘর সংসার করবে। মতের অমিল হলেই বিবাহ বন্ধনটাকে বন্ধন বলে আঁকড়ে মাটী কামড়ে পড়ে না থেকে দুই পক্ষই অন্যত্র আপনাপন সুখান্বেষণে বাহির হতে পারবে!

আর এক রকমের বিবাহ প্রচলিত আছে যার মধ্যে বর্ব্বরতার সীমা নেই। ধর্ম্ম সাক্ষীর ভাণ করে স্ত্রী পুরুষ যে বন্ধনটা স্বীকার করে নেয়, প্রাণ না যাওয়া পর্য্যন্ত তাকে স্বীকার করতেই হবে। স্বামী অত্যাচারী হোক, লম্পট হোক, ব্যাধিগ্রস্ত হোক, তাহাকে স্ত্রীর চরম গতি বলে মানতে হবে। আর স্ত্রী যদি স্বামীর অবাধ্য হয় অথবা ব্যভিচারিণী হয়, শুধু এ জীবনে নয় পরলোক নামক জগতে গিয়েও সেই স্ত্রীকেই সঙ্গের সাথী করে তাকে অনন্তকাল ধরে ভুগতে হবে।

এই তিন রকম প্রচলিত বিবাহের প্রথমটী—যার মধ্যে আচার বা সংস্কারের ছায়া নেই তাহাকে সাত্ত্বিক বিয়ে বলতে পারেন। চুক্তি ও রেজেষ্ট্রী করে বিয়ে করাটার নাম দিতে পারেন রাজসিক। আর সর্ব্বশেষোক্ত বৈচিত্র্যহীন বিবাহ প্রথাটার নাম তামসিক বললে কেউ আপত্তি করবে না।

তাহলে দেখা গেল গোত্র হিসাবে বিবাহের তিন মূর্ত্তি।

জাতি হিসাবে বিবাহের আবার আটটা শ্রেণী আছে। যথা,—ব্রাহ্ম দৈব আর্ষ প্রাজাপত্য গান্ধর্ব্ব আসুর রাক্ষস ও পৈশাচ।

ব্রাহ্ম বিবাহ মানে—মেয়ের বাপ ব্রহ্মজ্ঞানী সচ্চরিত্র দেখে পাত্রের হাতে কন্যাসম্প্রদান করেন—এবং যৌতুক বলে, যে রত্নালঙ্কার দেন তার পরিমাণ তাঁর নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী স্থির হয়।

কোন যজ্ঞ ব্যাপারে পুরোহিতকে দক্ষিণার বদলে যদি কন্যাসম্প্রদান করা হয় তাকে বলে দৈব বিবাহ।

আর্ষ বিবাহের মানে—জামাতা শ্বশুরকে তাঁর কন্যা গ্রহণের বিনিময়ে সৎকার্য্যে খাটাবার জন্য দুটী গরু দান করেন। অর্থাৎ একটী কন্যা—দুইটী গরু।

প্রাজাপত্য বিবাহে বর নিজে উপযাচক হয়ে কন্যার পিতার কাছে তাঁর মেয়ের পাণি প্রার্থনা করেন।

পরস্পর ভালবাসার ফলে বর কন্যা পরস্পরের গলায় মালা পরাইলে তাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলে।

আসুর বিবাহ বলতে বুঝি, কন্যার পিতা জামাতাকে উপযুক্ত মূল্যাদির বিনিময়ে কন্যা বিক্রয় করেন।

রাক্ষস বিবাহ মানে, পুরুষে রণকৌশলে রমণী জয় করে আনে।

আর পৈশাচ বিবাহ বল্লে বোঝায়—পুরুষ রমণীর প্রতি তাহার ইচ্ছা এবং অনুমতির বিরুদ্ধে বল প্রয়োগে প্রথমে ধর্ম্ম নষ্ট করে, পরে বিবাহ করে।

এই আট রকম বিবাহ বিধির মধ্যে প্রথম চারিটীই কেবল সম্মান ও গৌরবের যোগ্য। বাকী চারিটী বিধি আইনের চক্ষে দূষনীয়।

বর্ত্তমানে সমাজ-নীতি অনেক উদার হয়েছে।

আজকালকার বিচারকদের বিচারে গান্ধর্ব্ব ও আসুর বিবাহ আইন সিদ্ধ। রাক্ষস এবং পৈশাচ বিবাহ প্রথাটা নিন্দনীয় হলেও, সে বিবাহের ফলও নাকচ করা যায় না।

সাহিত্যে এই বিবাহরীতিগুলির যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ও রূপান্তর ঘটেছে।

অনেক পুঁথি ঘেঁটেও ব্রাহ্ম বিবাহের নিদর্শন বেশী কিছু মেলে না। ব্রাহ্ম বিবাহ সকল বিবাহ বিধির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেও সব সময়ে সুখের হয় না। সীতারাম ও শ্রীর বিবাহ ব্রাহ্মরীতি অনুসারেই হয়েছিল,—কিন্তু শ্রী স্বামীর ঘর করতে পারে নি!

'পণ্ডিত মশাই' এ বৃন্দাবন ও কুসুমের বিবাহকেও ব্রাহ্ম বিবাহ বলিলে হয়ত কেহ আপত্তি করবে না।—কিন্তু একবার সে বিবাহ নাকচ ত হলই, ভবিষ্যতে তাহার জের অনেক দূর পর্য্যন্তই গড়াইয়াছিল।

'প্রফুল্ল'র অবস্থা 'কুসী পোড়ারমুখী'র মতই। বুড়া বয়সে সেই ব্রাহ্ম বিবাহের জের মেটাবার জন্য পুনর্ব্বার গান্ধর্ব্ব-মন্ত্র ও তুক্ তাকে ব্রজেশ্বরকে ভুলাইয়া তবে স্বামীর ঘরে আশ্রয় পেয়েছিল।

গোকুল মুখুজ্যের মেয়ের ভাগ্যে, তাহার স্বামী শরৎ প্রবেশিকা পাশটাও করতে পারল না। শুধু তাই নয়—তাহার বাপ মারা গেল এবং তাহাদের পৈতৃক ভিটাটাও আধা কড়িতে বিক্রয় হয়ে গেল। ('ঘর জামাই')

তবে ব্রাহ্ম মানে 'চন্দ্রশেখরের'র মত 'ব্রহ্মজ্ঞানী' অথবা 'ব্রাহ্ম সমাজ পন্থী' সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে একথা সত্য! তাহলেও খাঁটি ব্রাহ্ম বর কনেরাও যে সব সময়ে সুখী হতে পারেন সে কথাতেও সন্দেহ আছে।

দৈব বিবাহের উদাহরণ ব্রাহ্মর মতই দুর্লভ। বাংলা সমাজে আজকাল যজ্ঞের মত যজ্ঞই বা হয় কই। যে কটা ক্রিয়া কারণ ঘটে, তাতে পুরোহিতেরা বড় জোর দুথালা নৈবেদ্য এবং পাঁচসিকে পয়সা পান, দক্ষিণার বিনিময়ে কনে-লাভ তাঁদের বরাতে ঘটে না।

জামাতা শ্বশুরকে দুটী গরু দান করবে এ ব্যাপারটা আজকাল হিন্দু সমাজে মোটেই চলিত নেই। মুসলমান সমাজে কোথাও কোথাও ইহার নিদর্শন চোখে পড়ে—এবং সেটাকে আর্ষ বিবাহও বলা যায়, কেননা গরু দুটী দেব-সেবাতেই ব্যবহার করা হয়!

প্রাজাপত্য বিবাহের উদাহরণ বিরল নয়।

চন্দ্রনাথ ও সরযুর বিয়ে ইহার একটী আদর্শ নিদর্শন। শচীন্দ্র ও রজনী, চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনী সবাই তাঁদের সগোত্র।

এখন বাংলা সাহিত্যে গান্ধর্ব্ব বিবাহের যুগ চলছে।

নতুন পুরাণো তরুণ বৃদ্ধ সকল লেখকের লেখাতেই গান্ধর্ব্ব বিবাহের ছবিটা ফোটে ভাল।

ফ্রয়েডীয়ান কম্‌প্লেক্স ইহার পশ্চাতে কতখানি কলকাটী ঘোরায় তাহা গবেষণার বিষয়; ইহার সঠিক বিবরণ অধ্যাপক ধূর্জ্জটীবাবুর কাছে মিলবে।

জগৎ সিংহ ও তিলোত্তমা, রুক্মিণীকুমার ও রাধারাণী, হেমচন্দ্র ও মৃণালিনী, গিরিজায়া ও দিগ্বিজয়, নগেন্দ্র ও কুন্দনন্দিনী, মাণিকলাল ও নির্ম্মলকুমারী এবং ইন্দিরা ওরফে কুমুদিনী এবং উবাবুর দ্বিতীয় বাসর—এ সমস্তই গান্ধর্ব্ব বিবাহের উদাহরণ। বঙ্কিমবাবুর কথা ছেড়ে দিলেও আধুনিক যুগে—নরেন্দ্র বিজয়া, শেখর ললিতা, শ্রীকান্ত পিয়ারী বাইজী প্রভৃতি দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই।

আসুর বিবাহ অর্থাৎ কনে বেচা আজ কাল শ্রোত্রীয়ের মধ্যে, ছোটনাগপুরে ও খোট্টাদের দেশে চলিত আছে। বাঙালীদের মধ্যে, ক্রমশঃই এ প্রথাটীর প্রচলন কমে যাচ্ছে। অগত্যা সৌরীনবাবু বাধ্য হয়েই শিবুকে ধাঙড় বানিয়ে তবে গঙ্গাস্নানের ফল-প্রত্যাশিনীর হাত দুখানি দশহাজার টাকায় কিনিয়েছেন।

রাক্ষস বিবাহের প্রথা আদিকালে রাক্ষসেরাই মানত। রুক্মিণীপতি শ্রীকৃষ্ণদেব কংসরাজার ভাগ্নে বলেই বোধ হয় ও প্রথাটা ভোলেন নাই। তাঁর নাতি অনিরুদ্ধও মহাজনের পথানুসরণ করেছিলেন। সুভদ্রা-পতি অর্জ্জুনই বা বাদ যান কেন!

মোগল বাদশাদের আমলে ঔরঙ্গজেব উদিপুরীকে বিবাহ করেছিলেন। বাপ্পারাও যবন-কন্যা হরণ করেছিলেন। এমনি অনেক দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে।

বর্ত্তমানে অস্ত্র ও ছোরা-যুদ্ধ বিদ্যাটা হিন্দু বাঙালীরা বিশেষ করে ভুলে গিয়েছেন। তাই বাস্তব জীবনে রাক্ষস বিবাহের নমুনা তাঁরা দেখাতে পারেন না। কিন্তু লেখনী যুদ্ধের কসরৎ শিখতে তাঁরা ভোলেন নি, কাজেই তাঁদের লেখা গল্প আর উপন্যাসে ও জিনিষটা ভাল করেই ফুটে ওঠে দেখি।

রাক্ষস এবং পৈশাচ বিবাহ—দুটাতেই গায়ের বল দরকার। গুণ্ডানামধেয় বীরগণ দুটী প্রথাতেই সিদ্ধ হস্ত হয়েছেন। তাঁদের রোমাঞ্চকর ক্ষমতার পরিচয় প্রতিদিনই সংবাদ পত্রের 'আদালতের খবর' নামক স্তম্ভগুলিতে বর্ণিত দেখবেন ——সুতরাং এখানে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

জাতি এবং গোত্র ছাড়া মানুষকে আরও অনেক রকমেই শ্রেণী বদ্ধ করা যায়। যেমন—কুলীন কিম্বা ভঙ্গ ইত্যাদি।

বিয়ের রকম ফের দেখাতে গিয়েও সে কথাটা আমাদের ভাবতে হবে।

সবর্ণ বিবাহের নাম দেওয়া যেতে পারে কুলীন এবং ভঙ্গ বলতে বুঝব 'অসবর্ণ'।

'সবর্ণ' এবং 'অসবর্ণ' এদের প্রত্যেকের আবার, বধূ কুমারী সধবা অথবা বিধবা ভেদে, তিনটে করে 'মেল' আছে——দার্জ্জিলিং মেল পাঞ্জাব মেল ও বোম্বে মেলের মতই——।

বিয়ের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে এতক্ষণ যে সব কথা বলেছি নিম্নলিখিত ছক হতে সে ব্যাপারটা সহজেই বোধগম্য হবে।

আগামী সংখ্যায়

—সম্পাদকের বিপদ—

—ছক (ক)—

কোন্ বয়সে বিয়ে প্রশস্ত এবং বিয়ের বাজারে কোন্ কোন্ গুণ থাকা ভাল এ সম্বন্ধে সাহিত্যিকদের মতামত জানবার জন্ত নিয়ে আর একটী ছকের নমুনা দিতেছি।

—ছক (খ)—

	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
নায়িকার নাম	কুন্দনন্দিনী	দেবী চৌধুরাণী (পিপি)	ললিতা	সুধা	মোক্ষদা (।৴০)
,, রূপ গুণ	(১) বালবৈধব্য (২) নীল চোখ (৩) ভরা যৌবন	(১) দোজবরে বউ (?) (২) ডাকাতের রাণী (৩) পরমা সুন্দরী	(১) চা খায় না (২) রাঁধতে জানে (৩) কাপড় ও বই গুছিয়ে দেয়	(১) বাল-বিধবা (২) লুকিয়ে বিষবৃক্ষ পড়ে (৩) মিছরীর পানা করে খাওয়ায়	(১) গ্রাস উইডো (২) টাকা আছে (৩) কবিতা পড়েন
,, বয়স	১৮	২৮	১৭	১৪	২৬
নায়কের বয়স	৩৫	৩২	৩০	১৭	?
,, রূপগুণ	১। জমিদার ২। অভিভাবিকা শক্ত নয় ৩। বিদ্যাসাগর-ভক্ত সুতরাং পণ্ডিত	১। কুলীন ২। পিতৃভক্ত ৩। জমিদারের এক ছেলে	১। চা খায় না ২। কাপড় গুছতে জানে না ৩। গম্ভীর (৶০)	১। পেয়ারা গাছে চড়তে জানে ২। একটু ফাজিল ৩। সংস্কারক	১। কবি ২। সৌভাগ্য শুনলে চটে যান ৩। কিন্তু টাকা like করেন
,, নাম	নগেন্দ্র	ব্রজেশ্বর	শেখর	শরৎ	মোহিত
বিবাহের গোত্র	তামসিক (৴০)	তামসিক	তামসিক	তামসিক (৴০)	রাজসিক (?)
,, কুল	সবর্ণ	সবর্ণ (৵০)	সবর্ণ	সবর্ণ	সবর্ণ
,, মেল	বিধবা	সধবা	কুমারী	বিধবা	বিধবা (?)
,, জাতি	প্রাজাপত্য	ব্রাহ্ম	গান্ধর্ব্ব (।০)	গান্ধর্ব্ব	গান্ধর্ব্ব (?)

মন্তব্য—

(৴০) বিধবা বিয়ে অথচ রেজেষ্ট্রী হয়েছিল কিনা জানা নেই।

(৵০) দেবী রাণী ছেলে বেলায় বাগ্দিনী ছিলেন তাহলেও বর্ণ তাঁর সুন্দর ছিল—ব্রজেশ্বরের মতই—তাই সবর্ণ বলা হয়েছে।

(৶০) চিরদিন গম্ভীর—একদিন কিন্তু পরিহাস করেই যত গোল বাধিয়ে ছিল।

(।০) ৪ বছর আগে গোপনে বিয়েটা গান্ধর্ব্ব মতে হয়েছিল, শেষে কিন্তু আবার প্রাজাপত্য মতে পুনর্ব্বার অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

(।৴০) বিয়েটা পাকাপাকি প্রায় হয়ে গিয়েও শেষকালে কিন্তু রেজেষ্ট্রী পর্য্যন্ত মোহিত বাবুর 'সৈভাগ্যে' টেঁকল না।

পাঁচটার বেশী উদাহরণ দিলাম না বাহুল্য ভয়ে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, পাঠক পাঠিকারা যদি উক্ত ছকের আকারে সাহিত্যের সকল বিয়েরই একটা statistics তৈরী করেন তাহলে দেখতে পাবেন বিয়ের বাজারে সব চেয়ে দাম যে নায়িকার, তাঁর থাকা উচিত (১) ষোল থেকে আঠার বছর বয়স, (২) বালবৈধব্য বা অমনি কিছু একটা দুঃখের করুণ ইতিহাস (৩) ভরা যৌবন (৪) ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান এমনি স্বাস্থ্য (৫) ধনী বাপের একমাত্র কন্যাত্ব (৬) লুকিয়ে বিষবৃক্ষ পড়বার আগ্রহ ইত্যাদি।

আর নায়কের থাকা উচিত (১) ১৭ থেকে ৩২ বয়স (যতই হোক না কেন) (২) পরদুঃখকাতরতা (৩) মুগ্ধ চোখ (৪) গুণ্ডার মত সবল দেহ (৫) কবিতা লেখার ক্ষমতা এবং (৬) সমাজ সংস্কারের ঝোঁক ইত্যাদি।

নীরব দান

—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

চৈত্র গেল মাঠের বুকে ফসল ফলিয়ে
সবার হাতে বিলিয়ে সেবার দান,
হাওয়ার মুখে বিদায়বাণী কেবল বলিয়ে,
শুনিয়ে দিয়ে বছর-শেষের গান;
শস্য ক্ষেতের গন্ধ মাখি' আকাশে
গুঞ্জরণের রেশটি রাখি' বাতাসে
বসুমতীর বক্ষে ঢাকি' মাথা সে
কোথায় করে নীরব অভিযান!

রাত্রি গেল অরুণ আলো ফুটিয়ে
সবার চোখে বুলিয়ে সোণার শিখা,
অন্ধকারের ব্যথার কুঁড়ি টুটিয়ে
রূপের ফুলে পরিয়ে রাজটীকা;
আজানাদের রুদ্ধ দুয়ার ঠেলিয়া
অচেনাদের চোখের দৃষ্টি মেলিয়া
ছায়ার মত লুকায় কোথা হেলিয়া
কালের কোলে লিখি' বিদায় লিখা!

দিলাম বলে' নাইক অভিমান
শব্দ বিহীন নীরব মহাদান।
তুচ্ছদানের উচ্চ আস্ফালনে
ধারা বহে ধরার দু'নয়নে॥

দেবতার রোষ

—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

উঠোউঠি চারিটি বোনকে হারাইয়া ললিতের যৌবনদৃপ্ত প্রাণ ভাঙ্গিয়া পড়িল।........

ললিত মাতৃহীন। তাই তাহার পিপাসার্ত্ত অন্তরের অফুরন্ত স্নেহের উৎস বোন চারিটিকে ঘিরিয়া উৎসারিত হইতে থাকিত। মাতার মৃত্যুর পর পিতা সংসারে থাকিয়াও সন্ন্যাসী-বেশ পরিয়াছেন। গেরুয়া বসন, দীর্ঘকেশ, কপালে রক্তচন্দন ও সিন্দুরের ফোঁটা জল্ জল্ করিতেছে। বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের সেবায় তাঁহার দিন কাটিয়া যায়। সংসারের সব ললিতকেই দেখিতে হইত, এবং মাতৃপিতৃস্নেহ-বঞ্চিত বোন চারিটিকে স্নেহের অচ্ছেদ্য বর্ম্মে ঘিরিয়া, তাহাদের সমস্ত খুঁটিনাটি আদর আবদার সহ্য করিয়া তাহার বুভুক্ষু হৃদয়ের স্নেহাকাঙ্ক্ষা অনেকটা তৃপ্ত হইত।

কিন্তু—বিধাতার খেয়ালের যে চিরকালই সাত খুন মাপ! —পর পর এতগুলি শোক ললিত সহ্য করিতে পারিল না।

বিরহী তপ্ত হৃদয়ের কান্না সে রোধ করিল বটে, কিন্তু বাহিরে তাহার জবাফুলের মত লাল চক্ষু দুটী এবং তাহাতে একটা উদাস ভাব দেখিলে বোধ হইত, তাহার বুকে যে স্নেহশীল হৃদয়টা আকুলি ব্যাকুলি করিতেছে তাহারই আলোড়নে বুকখানা বুঝি ফাটিয়া পড়িবে।

ললিতের বিবাহ হইয়াছিল, এবং তাহারই ফলস্বরূপ যে নবীন অতিথিটি আজ মাস আষ্টেক হইল বাড়ীতে হাস্য ও ক্রন্দন ধ্বনিতে নিজের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে তাহারই মঙ্গল কামনায় বাড়ীতে শোকের আবেগ অনেকটা কমানো হইল বটে কিন্তু ললিতের তপ্তপ্রাণ আর কিছুতেই শান্ত হইতে চাহিল না।

ললিতের মনটা ছেলেবেলা হইতেই ছিল ভারী স্নেহ-প্রবণ। তাই কষ্টের সংসারে লোকজনের অভাবে ললিতই তার চারিটি ছোট বোনকে একরকম কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়া তুলিতেছিল। তখনও তাহার বিবাহ হয় নাই। শিশুদের তরল হাস্য পরিহাস ও নির্ম্মল কলগুঞ্জনে তাহার মাতৃহীন হৃদয় ভরিয়া উঠিত। অবিশ্রান্ত গল্পের মাঝ-খানে তাহার সময় যে কোথা দিয়া কি করিয়া কাটিত সে তাহা টেরই পাইত না।

এমনি করিয়া চারিটী ছোট শিশুকে অবলম্বন করিয়া স্নেহের একটী অবিচ্ছেদ্য সূত্র তাহাকে জগতের সমস্ত কর্ম্ম-কোলাহল হইতে টানিয়া আনিয়া হাসি-খুসী-ভরা একটী ছোট্ট অনাবিল শান্তির নীড়ে টানিয়া রাখিত। তাহার পর বিবাহ হইল, সন্তান হইল—তথাপি এক দণ্ডও বোনগুলিকে সে চোখের আড়াল করিতে পারিত না।

কিন্তু এত আদর যত্নে থাকিয়াও যখন তিনটি শিশু-পুষ্প ফুটিয়া উঠিবার আগেই ঝরিয়া গেল, তখন শেষ বোনটীকে বুকে চাপিয়া ললিত হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল!

সমস্তদিন ধরিয়া বোনটিকে বুকে কোলে করিয়া সে লইয়া বেড়াইল। নিজের নবজাত সন্তানের প্রতি তাহার আর দৃষ্টি রহিল না। সমস্ত সংসারের ভার ক্ষুদ্র বধূর উপর ছাড়িয়া দিয়া সে বক্ষের স্নেহশীতল ছায়ায় বোনটীকে আগলাইয়া রহিল।

কিন্তু সে বোনটীও যখন অসুখে পড়িল তখন ললিতের আর আহার নিদ্রা রহিল না। সহরের যত ভাল ডাক্তার মোটা মোটা ফি লইয়াও রোগ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। তাহার পর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহেব ডাক্তার একমাস চিকিৎসা করিয়াও যখন মুখ ভার করিয়া বিদায় লইলেন তখন ললিত পাগলের মত হইয়া উঠিল।

ললিতের পিতা সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ। ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক ও পূজাতেই তাঁহার পাঁচ ছয় ঘণ্টা ব্যয় হইত। বাকী সময়টুকু তিনি অনাদৃত নবজাত পিতৃস্নেহ-পরিত্যক্ত নাতিটিকে বুকে করিয়া বেড়াইতেন।

একদিন ঠাকুর ঘরে কালীমূর্ত্তির পূজা শেষ করিয়া তিনি

ললিতকে ডাকিয়া কহিলেন—দেখ, কাল মা আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন। ডাক্তারী ওষুধ পত্র সব ছেড়ে তাঁর চরণামৃত পান করাও, সেরে উঠবে।

ললিত পিতার পদধূলি মাথায় দিয়া বলিল—তাই হোক্ বাবা, যে করেই হোক্ 'মণি'কে সারিয়ে তুলতেই হবে—মা যখন বাড়ীতে সাক্ষাৎ প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন তখন কেন যে বাড়ীতে এত অমঙ্গল হচ্ছে, বুঝতে পারছি না।—বলিয়া ললিত ঠাকুর ঘরে আসিয়া কালীমূর্ত্তির পায়ে মাথা নত করিয়া চক্ষু জলে বলিল—'মা গো, সম্পদে ত তোমায় ভুলে থাকি নি কোনদিন, তবে কেন বিপদে তুমি ফিরে তাকাচ্ছ না মা?'

কালীর চরণামৃত পান করিয়া সেদিন মণি অনেকটা সুস্থ রহিল। ললিতের মন আশার আলোকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

পরদিন মণি বলিল—এইবারে সেরে উঠব, না দাদু?

ললিত আদর সোহাগজড়িত কণ্ঠে বলিল—সেরে উঠবে বই কি মণি; দেখছ না ভাই যন্ত্রণা কত কমে গেছে। মা কালী একদম সারিয়ে দেবেন।

রোগক্লান্ত শিশু নিঃশ্বাস লইয়া বলিল—সেই গানটা গাও না দাদু, একটু শুনি।

—গাইব? এই যে গাইছি সোণামণি।—বলিয়া ললিত গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল—

"শ্যামা শ্যাম শিবরাম
আমি ঐ নাম যে বড় ভালবাসি।"—

গানটি মণি বড় ভালবাসিত। তাই তার অসুখের সময় ললিত প্রায়ই সেটী গাহিয়া শুনাইত।

গান শুনিয়া মণি বলিল—চন্নামেত্ত দেবে না দাদু, সময় হয়েছে যে, দাও ভাই—আঃ কি মিষ্টি!

কিন্তু দুইদিন যাইতে না যাইতেই রোগ যন্ত্রণা আবার বৃদ্ধি পাইল। পিতা আসিয়া পূজার ফুল লইয়া মণির সর্ব্বাঙ্গে বুলাইয়া দিলেন, মাথায় হাত দিয়া জপ করিয়া কত মন্ত্র পড়িলেন, কিন্তু যন্ত্রণার উপশম হইল না!

সমস্ত রাত্রি জাগিয়া-ভোরের দিকে ললিত একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল—হঠাৎ একটী দুঃস্বপ্নে তন্দ্রা ছুটিয়া যাইতেই চাহিয়া দেখিল—মণি ঘরে নাই।

আকুল ভাবনায় অধীর হইয়া সমস্ত বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিল—কোথাও তাহাকে পাইল না। সমস্ত জগৎ তখন নিদ্রাচ্ছন্ন। গোধূলির ধূসর ম্লান আলোক তখন সবে মাত্র পৃথিবীতে পদার্পণ করিয়াছে!

পাগলের মত ছুটিয়া ললিত ঠাকুর ঘরে আসিয়া দেখিল—রোগতপ্ত শিশু কালীপ্রতিমার পায়ে লুটাইয়া কাঁদিতেছে। —মা কালী, আর পারি না, রক্ষা কর—কি হবে, কি ক'রে কমবে—মা গো!

ললিতের বুক ফাটিয়া গেল। দুই চক্ষে অসীম জ্বালা ধরিল। বোনটিকে বুকে করিয়া শয়ন ঘরে লইয়া আসিয়া আস্তে আস্তে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া ললিত কহিল—আমাকে না ডেকে এমনি করে একলা উঠে যেতে হয়? যদি পড়ে যেতে?

—কি করি আর যে পারি না দাদু, উঃ বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে —মা কালী!

তারপর আর এক গোধুলির পবিত্র ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে আলোক আঁধারের মিলন ক্ষণে, মার চরণামৃত পান করিয়া সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইয়া যখন শিশু-আত্মা তাহার দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া চলিয়া গেল তখন ললিত শুধু শুষ্ক নেত্রে চাহিয়া রহিল……! শোকের পরিবর্ত্তে একটা দুর্নিবার বিদ্রোহের জ্বলন্ত উচ্ছ্বাস তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া আকাশে উঠিতে লাগিল।

কালের গতিতে সকল শোকেরই উপশম হয়। মাস খানেক বাদে ললিতও অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল। কিন্তু নিজের শিশু-সন্তানটীর উপর তাহার বিতৃষ্ণা বাড়িয়া গেল। জন্মাবধিই বেচারা পিতৃস্নেহ পায় নাই, মায়েরও সংসারের সকল কাজ সারিয়া পুত্রকে আদর করিবার সময় আর বেশী অবশিষ্ট থাকিত না—সে শুধু ঠাকুর্দ্দার স্নেহের কোলেই এতদিন বাড়িয়া উঠিতেছিল। এখন পিতার বিরাগ দৃষ্টিতে বেচারা শুকাইয়া যাইতে লাগিল।

মাঝে মাঝে যখন ক্ষুদ্র শিশু এক গাল হাসিয়া কচিমুখে বা-বা বলিয়া ললিতের হাঁটু ধরিয়া কোলে উঠিতে চেষ্টা করে, তখন এক একবার বুকের স্নেহের কোমল স্থানটীতে চাড় পড়ে,—ইচ্ছা হয় কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার গাল দুটীতে চুমু খায় কিন্তু তখনই বোনদের কথা মনে পড়িয়া যায়—ইহারই আগমনে যে তাহারা অভিমানে পলাইয়াছে, ইহা ভাবিয়া পুত্রের প্রতি তাহার দৃষ্টি কটু হইয়া উঠে।

কালীঘাটে ললিতের সাইকেলের দোকান ছিল। এতদিন মালিকের অভাবে দোকানের কাজকর্ম্ম বিশৃঙ্খলভাবে চলিতেছিল। তাই বহুকাল পরে ললিত দোকানটার একটা শৃঙ্খলা করিয়া দিয়া আসিতে সেদিন বাহির হইতেছিল,—নাতিকে বুকে করিয়া পিতা ডাকিলেন—দোকানে যাচ্ছিস্?

ললিত বলিল—হ্যাঁ।

—তাহ'লে এক কাজ করিস, খোকার ভাতের সময়কার মাথায় ঠেকান টাকা কয়টা তোলা রয়েছে অমনি কালীঘাটের পূজোটা দিয়ে আসিস্।

ললিতের ইচ্ছা হইল বলে—এততেও আপনার বিশ্বাস গেল না?—ও পাষাণ মূর্ত্তিকে এখনও ঠাকুর বলে পূজো করতে আপনার ইচ্ছা হয়?— এ মরজগতে ভগবান কি আছে? কিন্তু মুখে কিছু বলিল না, টাকা কয়টা লইয়া প্রস্থান করিল। এবং দোকানে পহুঁছিবার আগেই সেই টাকায় খাবার কিনিয়া রাস্তার দুঃখী বালকদিগের ভিতর তাহা বিতরণ করিয়া দিল।

সে দিন বাড়ী ফিরিলে পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—পূজো দিয়ে এলি, নির্ম্মাল্য ফুল দুটো আনতে পারিলি না?

ললিত মুখে কিছু বলিল না, কিন্তু মনে মনে ভাবিল —নির্ম্মাল্য ও আঁস্তাকুড়ের আবর্জ্জনায় ত কিছুই তফাৎ দেখি না বাবা।

আরও কিছুদিন গেল—ললিতের নাস্তিকতাও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। দিন পাঁচ ছয় পরে সূর্য্য গ্রহণের পূর্ণগ্রাস উপলক্ষে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুদিগের ভিতর একটা সাড়া পড়িয়া পড়িয়া গেল। ললিতের পিতাও কাশীতে স্নান করিতে যাইবার মনস্থ করিলেন।

ইদানীং পুত্রের মনের ভাব বুঝিয়াই তিনি সহপাঠী ব্রাহ্মণ স্মৃতিভূষণকে বাড়ীর বিগ্রহের পূজার ভার দিয়া যাত্রার পূর্ব্বে পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন—দেখো, মার পূজা যেন নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, আমি দুচারদিনের ভেতরই ফিরবো, এ কয়দিন স্মৃতিভূষণ পূজা করে যাবেন—আর দাদাভাইকে একটু যত্ন কোরো, যেন অসুখ বিসুখ না করে।—তাহার পর গোছ গাছ করিয়া তিনি সন্ধ্যার সময় বাহির হইয়া পড়িলেন।

পিতাও চলিয়া গেলেন—সেই রাত্রেই খোকাও জ্বরে পড়িল। সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল, ভাল করিয়া ঘুমাইল না।

পিতার কোন কার্য্যের উপর সমালোচনা করা ললিতের সাধ্য ছিল না, তাই পরদিন যখন পূজার নিমিত্ত স্মৃতিভূষণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন ললিত পিতার অনুপস্থিতিতে মনের ঝাল মিটাইয়া তাঁহাকে অপমানিত করিয়া বিদায় দিল, বলিল—নিজের চরকায় তেল দিন গে যান্ এ বাড়ীতে ঠাকুরের পূজোটুজো আর চলবে না।

স্মৃতিভূষণ প্রস্থান করিলে বধূ আসিয়া স্বামীকে বলিল—করলে কি বলত? তোমার বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পেয়েছে না কি?

—হ্যাঁ পেয়েছে, কি করবে? মারবে আমায়? বধূ ভয়ে থামিয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল—কিন্তু বাবা বলে গেলেন—

—কি বলে গেছেন আমি জানি, তোমার সেজন্তে মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

তবুও বধূ ক্ষীণ কণ্ঠে প্রতিবাদ করিতে চাহিল—বলিল,—দেখো ছেলেটার অসুখ করেছে অকল্যাণ হবে, মাথা খারাপ করবার সময় নয় এখন। বাপ্ পিতেমোর প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ সমস্তদিন উপবাসী থাকবেন?

—হ্যাঁ থাকবেন, যে সমস্ত জিনিষ গিলেছেন তাতে দুদিন উপবাসী থাকলেও মরবেন না, বুঝলে? এখন যাও রোগা ছেলেটাকে একটু দেখ গে, আমায় আর বিরক্ত কোরো না।

ললিত উঠিয়া পড়িল—তারপর পাছে বধূ পাড়ার কাহারও সাহায্যে ব্রাহ্মণ ডাকাইয়া পূজার উদ্যোগ করে এই কারণে

সে ঠাকুর ঘরে ভাল করিয়া তালা লাগাইয়া ছেলের জন্য হোমিওপ্যাথি ঔষধের বন্দোবস্ত করিয়া নিজের দোকানের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

স্বামী চলিয়া গেলে বধূ সমস্তদিন মাথা খুঁড়িয়া কাঁদিয়া কাটিয়া ঠাকুরের কাছে স্বামীর দুর্ব্বুদ্ধি ও পুত্রের কল্যাণের জন্য ক্ষমা চাহিল; তাহার পর সমস্তদিন উপবাসী থাকিয়া ভয়ে কাঁটা হইয়া দিন কাটাইল।

সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া ললিত দেখিল—বৌ খোকাকে ঘুম পাড়াইয়া ম্লানমুখে তাহার পার্শ্বে বসিয়া আছে,—চক্ষু দুটী তাহার জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

বিরক্ত হইয়া ললিত বলিল—সন্ধ্যার সময় আর কান্নাকাটী করে দরকার নেই। ঠাকুর দেবতা মানতে চাও ত ছেলে নিয়ে বাপের বাড়ী গিয়ে ও সব ভণ্ডামি কর গে—এখেনে থাকতে হ'লে ওসব চলবে না, এ তোমায় আমি স্পষ্ট বলে দিলুম।

প্রত্যুত্তরে কিছু না বলিয়া বধূ অশ্রুভারাক্রান্ত নতমুখখানি ফিরাইয়া লইল।

রাত্রে খোকার জ্বর ছাড়িল না বটে কিন্তু একটু সুস্থির হইয়া ঘুমাইতেছে দেখিয়া পূর্ব্বরাত্রিজাগরণক্লান্ত দেহ এলাইয়া দিয়া ললিত শীঘ্রই নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

রাত্রি শেষে হঠাৎ স্ত্রীর চীৎকার ও ডাকাডাকিতে ললিতের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে উঠিয়া বসিয়া কহিল—কি হল আবার?

—ওগো, দেখ ছেলে কি রকম করছে—চোখ কপালে তুলছে কেন—হাত পা যে সব অসাড়, কি করব আমি—ওগো ওগো—বলিতে বলিতে সে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

প্রবল ঝড় বুকে বহিয়া ললিত স্তব্ধনেত্রে তাকাইয়া রহিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বৌ বলিল—ওগো, এখনও আছে চল, ঠাকুরের কাছে ক্ষমা চাইবে—চল একে তার পায়ে ফেলে দিই—চল চল—

ভোরের বাতাস তখন বহিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং রাত্রির অন্ধকার ধীরে ধীরে অপসৃত হইতেছে।

বিছানা হইতে নামিয়া বিকৃতকণ্ঠে ললিত বলিল—দেখো, যে ঠাকুর নির্ম্মল নির্দ্দোষ ক্ষুদ্র শিশুর আকুল আহ্বানও কানে তোলেন না, শুধু রাগ দেখাবার বেলায় তেড়ে আসেন—তাকে সন্তুষ্ট করার চেয়ে পুত্রবলি দেওয়াও ঢের ভালো—বলিয়া ললিত যেখানে মৃতসন্তানকে বুকে জড়াইয়া বধূ হাহাকার রবে গগন বিদীর্ণ করিতেছিল—সেইদিকে দুটো জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

বাতাস ও স্বাস্থ্য

(বৈজ্ঞানিকী)

—শ্রীরাসগৌর ঘোষাল

পবিত্র বায়ু সেবনে যে স্বাস্থ্যের উপকার হয়, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু পবিত্র বায়ু স্বাস্থ্যের কি উপকার করে এবং অপবিত্র বায়ুই বা স্বাস্থ্যের কি ক্ষতি করে?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, বায়ুতে কি কি জিনিস আছে আর—তার প্রত্যেকের সঙ্গে স্বাস্থ্যের কি সম্বন্ধ তা' আমাদের জানা উচিত।

সাধারণ বায়ুতে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি বর্ত্তমান:—

অম্লজান বাষ্প—	শতকরা	২০·৬০ ভাগ
যবক্ষারজান ,,—	,,	৭৭·১১ ,,
আর্গন ,,—	,,	·৮ (?) ,,
কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড ,,		·০৪ ,,
ওজোন অ্যামোনিয়া ইত্যাদি	} নাম মাত্র	

জলীয় বাষ্প — পরিমাণ স্থান ও কালভেদে বিভিন্ন।

অম্লজান—

খাদ্যের সহিত আমরা যে শর্করাজাতীয় ও ঘৃতজাতীয় পদার্থ গ্রহণ করি, তাহা শরীরে প্রবেশ করিয়া নিশ্বাসের সহিত গৃহীত অম্লজান বাষ্পের সহিত সংযুক্ত হয় এবং জল ও কার্ব্বন ডাইঅক্সাইডে পরিণত হয়; এই শেষোক্ত গ্যাসটা আমরা প্রশ্বাসের সহিত ত্যাগ করি এবং সেইজন্যই প্রশ্বাসের বাতাসে ইহার পরিমাণ প্রায় শতকরা ৪ ভাগ। প্রদীপের তৈল যেমন পুড়িবার সময়ে বাতাসের অম্লজানের সহিত সংযুক্ত হইয়া জলীয় বাষ্প ও কার্ব্বনডাইঅক্সাইড্ প্রস্তুত করে,—তেমনই শরীরের অভ্যন্তরস্থ শর্করা ও চর্ব্বিজাতীয় দ্রব্যগুলিও অম্লজানের সহিত মিশিবার সময়ে, শরীরকে উত্তাপ ও শক্তি প্রদান করে। মানুষের দেহের উত্তাপ আর শক্তি দুটোই এই মৃদু দাহনের ফল। যদি কোনস্থানে অম্লজানের পরিমাণ এরূপ ভাবে কমিয়া যায় যে সে বায়ুতে শরীরের মৃদু দাহনের কাজ সহজভাবে চলিতে পারে না, তাহলে সেই বাতাস স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকারী। বাস্তবিকই দেখা গিয়াছে যে, ঘরের বাতাসে অম্লজানের পরিমাণ শতকরা ১০-১৫ ভাগের কম হইলে ঘরে থাকিতে বিশেষ কষ্ট অনুভব হয় এবং শতকরা ৭-৮ ভাগ হইলে মানুষ সে ঘরে বাঁচিতে পারে না। কিন্তু সাধারণভাবে দেখিতে গেলে, লোকালয়ে অথবা বাসগৃহের অভ্যন্তরে বাতাসে অম্লজানের পরিমাণ কখনও এরূপভাবে কমিয়া যায় না এবং অপরিষ্কার বায়ুতে স্বাস্থ্যহানির কারণ সাধারণতঃ অম্লজানের অভাব নয়।

যবক্ষারজান, আর্গন ইত্যাদি—

বাতাসে যবক্ষারজানের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। মানবদেহের পক্ষে ইহার কোন উপকারিতা জানা নাই। বাতাসে এই সমস্ত গ্যাসের অংশ কমিলে অথবা বাড়িলে—যদি অম্লজান ও কার্ব্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত না হয়—স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হয় না।

কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড—

বাতাসে উপরি উক্ত গ্যাসের আধিক্য হইলে নিশ্বাসের বেগ দ্রুত হয় এবং ক্রমশঃ হাঁপানী হইতে থাকে; কিন্তু সাধারণ ভাবে জীবনধারণের পক্ষে কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড্ হইতে আমাদের ভয়ের সম্ভাবনা আছে বলিয়া বোধ হয় না।

ওজোন—

সমুদ্রের তীরের বায়ুতে ইহা পাওয়া যায়। লোকালয়ের বায়ুতে ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই বলিলেই হয়। কোনও কোনও ব্যাধিতে ওজোনে বিশেষ উপকার হয় কিন্তু ওজোনের অভাববশতঃ কোন রোগের কথা বিশেষ ভাবে জানা নাই।

অ্যামোনিয়া, নাইট্রিক অ্যাসিড্ ইত্যাদি—

এই সকল গ্যাস সাধারণ বায়ুতে নাই বলিলেই হয়। কোন কোন রাসায়নিক কারখানার নিকট ইহাদের সাক্ষাৎকার লাভ ঘটিয়া থাকে। নাসিকার ও ফুসফুসে প্রবেশ করিবার নালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে প্রদাহ উৎপাদন করে বলিয়া, বাতাসে ইহাদের উপস্থিতি কোনও মতে প্রার্থনীয় নয়।

জলীয় বাষ্প—

জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বিভিন্ন স্থানের ও বিভিন্ন সময়ের বাতাসে অনেক তফাৎ। মানুষের স্বাস্থ্যের সহিত বাতাসের জলীয় বাষ্পের বিশেষ সম্বন্ধ। অনেক সময় বাতাস অত্যন্ত উষ্ণ হওয়ায় অর্থাৎ বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকায় নিশ্বাস লইতে কষ্ট বোধ হয়। কিন্তু বাতাসে জলীয় বাষ্পের অভাবে যত কষ্ট অথবা ক্ষতি হয়, জলীয় বাষ্পের আধিক্যে তাহার অনেক বেশী লোকসান হইয়া থাকে।

মানুষেয় শরীরে দিনরাত মৃদু দাহনের ফলস্বরূপ যে উত্তাপের সৃষ্টি হয় তাহা সময়ে সময়ে—বিশেষতঃ আমাদের দেশের মত গরম দেশে—প্রয়োজনের অপেক্ষা অনেক বেশী। যদি আমাদের শরীর সেই বেশীর ভাগ উত্তাপটুকু তাড়াইতে না পারিত, তবে শরীরের তাপমাত্রা (Temperature) ৯৮°৪° ডিগ্রী না হইয়া ১০৫°-৭° ডিগ্রী হইত; এখন মানুষের শরীরের কলকব্জা এরূপ যে ১০৫°-৭° ডিগ্রীতে কাজ করিতে তাদের বড় অসুবিধা হয়—এমন কি বেশীক্ষণ ঐ তাপ মাত্রায় থাকিলে যন্ত্রপাতি সমস্ত আংশিক ভাবে বা সম্পূর্ণ ভাবে বিকল হইয়া যায়। এইজন্যই শরীরের ভিতরের তাপ দরকারের অতিরিক্ত পরিমাণে যখন সৃষ্ট হয় তখনই

শরীর কোনও উপায়ে সেই অতিরিক্ত তাপটাকে দূর করিয়া দেয়। উপায়টা এই রকম। মানুষ যখন গরম অনুভব করে—তখন তাহার ঘাম হয়, ঘামটা শুকাইবার জন্ম তাপের প্রয়োজন ; ওই অতিরিক্ত তাপট্যাকে এই কাজে লাগান হয়।

কিন্তু ঘামটা শীঘ্র শীঘ্র শুকাইতে হইলে আরও দুইটা জিনিষের দরকার :—(ক) বায়ুপ্রবাহ অর্থাৎ দেহের উপর দিয়া যদি বাতাস বহিয়া যায় তা'হলে ঘামটা শীঘ্রই শুকাইয়া যায়। (খ) বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকা।—যদি বাতাসে জলীয় বাষ্প আগে হ'তেই প্রচুর পরিমাণে থাকে, জল শীঘ্র শুকায় না এবং এই জন্যই বর্ষাকালে কাপড় শুকাইতে যত দেরী লাগে শীতকালে বাতাসের তাপ মাত্রা কম থাকিলেও কাপড় তাড়াতাড়ি শুকাইয়া যায়। এই সমস্ত থেকে আমরা বুঝিতে পারি যে বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশী থাকিলে শরীরের কিরূপ ক্ষতি হইতে পারে—বিশেষতঃ যদি সঙ্গে সঙ্গে বায়ুপ্রবাহ না থাকে।

বায়ুতে প্রবাহ থাকার আর একটা গুণ ত্বকের উপর দিয়ে বয়ে যাবার সময় বাতাস শরীরের উপর একটা স্ফূর্ত্তি জনক বা stimulating কাজ করে এবং এই কাজটার মূল্য অনেক। ভিড়ের মধ্যে গিয়ে কোন লোককে মূর্চ্ছিত হতে অনেকেই দেখে থাকেন, মানুষের চাপের চেয়ে বায়ু প্রবাহের অভাব এবং উত্তাপই এই মূর্চ্ছা যাওয়ার বড় কারণ।

যাদের স্বাস্থ্য একটু খারাপ, জনাকীর্ণ স্থানে যাওয়া তাদের নিষিদ্ধ। এই নিষেধের একটা কারণ হচ্ছে যে জনাকীর্ণ স্থানের বায়ুতে রোগের বীজাণু ভেসে বেড়াবার সম্ভাবনা বেশী ; আর একটা কারণ হচ্ছে যে, ভিড়ের মধ্যে গেলে সেখানকার গরমে আর নিশ্চল বাতাসে, শরীরের একটা সাময়িক অবসাদ আসে এবং ঐ সময়ে রোগের সঙ্গে লড়াই করবার শক্তি (Resistance) শরীরে কমে যায়। বায়ুর নিশ্চলতায় আর বায়ুতে জলীয় বাষ্পের আধিক্যের একটা উদাহরণ হচ্ছে মোপলা ট্রেণ দুর্ঘটনা ; মালগাড়ীর ভিতর আবদ্ধ মোপলাদের মধ্যে যাহারা মরিয়া গিয়াছিল, তাহাদের মৃত্যুর জন্ম বাতাসে অম্লজানের অল্পতা অথবা কার্ব্বন ডাইঅক্সাইডের আধিক্য ততটা দায়ী নয় যতটা দায়ী বাতাসের উত্তাপ, নিশ্চলতা এবং জলীয় বাষ্পের আধিক্য।

সাধারণতঃ বায়ুর রাসায়নিক পবিত্রতা অপেক্ষা বায়ুর অবস্থা (Physical condition) অর্থাৎ তাপমাত্রা, প্রবাহ ও জলীয় বাষ্পের মাত্রারই (Humidity) স্বাস্থ্যের ও স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত বেশী সম্বন্ধ।

অতনু

—শ্রীগিরিজাকুমার বসু

তোমার কি কোনোদিন কোনো শুভক্ষণে
আমার প্রতিমাখানি নাহি জাগে মনে ?

বিরহের ব্যথা মোর তব হৃদিমাঝে
প্রণয়ের স্মৃতিভরে কভু নাহি বাজে
অনিবার আঁখি জলে ? নিমিষের তরে
দরশ-পরশ-তৃষা নয়নে, অধরে
উঠেনা আকুল হোয়ে ? ওগো প্রিয়তমা
ওগো মোর সাধনার দেবতা পরমা

মূর্ত্তিমতী করুণা লো, জীবনের মধু
ওই রাঙা পদতলে ঢেলেছি যে বঁধু
রিক্ত করি' প্রাণপাত্র ; অনুরাগ-হীনা
তুমি আজ অকরুণা, নির্ম্মম, কঠিনা
নিয়তির পরিহাস ; তাই হোক্ প্রিয়ে,
বুকে থেকো ভরা—ধরা, নহে দেহ দিয়ে।

পথের মাঝে বাদল বরিষণে

—শ্রীঅরিন্দম বসু

বর্ষণ-ক্লান্ত শ্রাবণের স্তব্ধ সন্ধ্যাটা…………

কিন্তু মাথার ওপরে তখনো মেঘের ঘনঘটা……… অফুরন্ত আয়োজন!

সত্যি করেই যেন ওরা অশেষ।

শুধু ক্ষণকালের বিশ্রাম—

তারপরই আবার হয়তো সুরু…………

তেম্নি ঝর্ঝর…………

নির্লিপ্ত মনের তেম্নি অবসাদ।

তবুও বেড়িয়ে পড়্লাম…………বসে বসে চিত্ত বিকল…………পকেটের সিগারেট নিঃশেষ।

বন্ধুর বাড়ীর বিয়েয় নেমন্তন্ন।

রসন-চৌকীর বাজনাটা বেশ!

তরুণীঅভ্যাগতার চুড়ি-ব্রেস্লেটের নিক্বনটা অপরূপ!

মনের কোনে সুখের হিল্লোল………সুরের আবেশ—

যৌবনের মোহ-মদির-আঁখি………ওরই সাম্‌নে অপূর্ব্ব মায়াজাল!

আনন্দ যেন চোখের তারায় উপ্‌চে পড়ে।

রূপ-রস-গন্ধাকুল লোভনীয় সে বাড়ীখানি।

তারই একধারে বন্ধু সুনীল অভ্যাগতঅভ্যর্থনায় ব্যস্ত।

আস্তে ডাক দিলাম—শুন্‌বে সুনীল?

কাছে এলে আরো চুপি চুপি বল্লাম—কিগো, বোনের বিয়েতে—এযে দিব্বি একটা নন্দন কানন!

কিন্তু চোখের তৃপ্তিই কি সব?

পেটের দেবতাটা যে ঈর্ষ্যায় জলে পুড়ে যাচ্ছেন।

তারপর হঠাৎ আপনাথেকেই মুখ হতে বেরিয়ে গেলো—হ্যাঁ, সিঁড়ির পাশে দেখ্‌চো?

ও উন্মুখ হ'য়ে চাইলে—কি?

—ঐ যে একটা হরিণ-আঁখি-তন্বী…………

—নিটোল দুটী হাত…………নিরাভরণা প্রায়……

—আর আল্‌গা-চুলের শুভ্র-সিঁথীর রেখা…………

এ দুর্ল্লভ প্যাটার্ণটী কে গো?

কিন্তু থেকে থেকে আমার পানেই চাইচে—না?

শুন্‌লাম—সুনীল বল্লে—হ্যাঁ, ওর বয়ে গ্যাচে………

রেগে বল্‌লাম—গ্যাচে বৈকি!

সৌন্দর্য্যের গর্ব্ব আমারই কি কিছু কম?

কিন্তু তখনকার মত সেটা মনের কোণেই চাপা রইলো।

সুদূর ওপরে মেঘ-মেদুর আকাশ………

জমাট-গম্ভীর।

কিন্তু ওকে আড়াল করে রেখে একধারে প্রকাণ্ড চাঁদোয়া!

আর তারই নীচে অপূর্ব্ব সমারোহ।

কত না সুগন্ধি………কত না পুষ্প-সম্ভার!

দেহ-মন যেন অবশ হয়ে ওঠে।

সবার মাঝখানে ব্রীড়াবনতা তরুণী মেয়েটী………

সুনীলেরই ছোট বোন—ডলি।

একদিকে এম্নি।

আর ওদিকটাতে অপরিসীম খাবারের আয়োজন।

নেমন্তন্নটা মন্দ দাঁড়ায় নি।

লুচি, পোলাও, মাংস থেকে সুরু করে সন্দেশ সরপুরিয়া আরও অনেক কিছু……।

সর্ব্বোপরি এমন তরুণী-মেলা—

সত্যি কথাই তবে বলি

মেজাজটা যেন একবারে দিল-দরিয়া……!

তা যাক্।

নেমন্তন্ন-বাড়ীতে শুধু হাতে আস্‌তে নেই।

তাই লাল রেশমী ফিতায় বাঁধা 'টয়লেট কাস্কেটটা……'

জাপানী-শিল্পীর শিল্প-নিদর্শনটুকু ওরই ডালার ওপর……

……অতি অপরূপ…………দুটি চোখ্‌কে যেন বেঁধে রাখ্‌তে চায়।

বিয়ে তখন শেষ হয়ে গ্যাচে।

ডলির হাতে এই স্নেহের নিদর্শনটুকু দেওয়া শুধু বাকি।

তারপরই বাড়ীর পথে………

মেঘের ভয়টা তো খুবই!

একবার সুরু হলেই অবিশ্রান্ত ঝর্ঝর………

ধীরে ধীরে ঐদিক পানেই চল্‌লাম।

কিন্তু অব্যক্ত সে দৃশ্য!

ধরণীর সমস্ত সৌন্দর্য্যের উৎসটুকু কি ঐখানটাতেই?

ছোট্ট আসরখানির চারধারে হাস্যরসের উচ্ছল ফোয়ারা… ……বসন্তের অভিনব উৎসব!

রং-বেরংয়ের কত শাড়ী………

টুকটুকে পদ্মের মত কত মুখ………

মণিকার দ্যুতি-ভরা কত চাউনি………

রূপকথার পরীর দেশের মত ফুটন্ত।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম।

কাস্কেটটা ওর হাতে দিয়ে বললাম—কিরে, চল্‌লি তো পরের বাড়ী—কিন্তু ভুলিস্‌নে যেন আমাদের………

চম্‌কে উঠলাম।

একি ওধারটাতে বসে ওকে?

সেই হরিণ-আঁখি-বালা?

তবে ডলিরই বুঝি বন্ধু কেউ!

অপ্রতিভ হয়ে পড়লাম।

পরিহাসের সুরে কি একটা কথা বলে ডলি নত হয়ে প্রণাম করলে। কিন্তু ওর মাথায় হাত রেখে নিজে আমি কি যে ছাই বললাম—

নিজের মনের কাছেও যেন তা অবোধ্য।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিই বা উপায় তখন ছিলো?

দশটা তখন বেজে গ্যাচে।

বন্ধুমহলে শুভরাত্রি জানাতে হ'ল।

বাইরে গিয়ে আকাশের পানে চাইলুম…………

কিন্তু ওখানে ঐ মেঘের রাজত্বে যেন স্বাধীনতার লড়াই চল্‌চে।

নিস্তব্ধ রাত্রি।

নির্জ্জন রাস্তা।

শুধু দুধারে ত্রিশ চল্লিশ হাত ফাঁকে ফাঁকে উজ্জ্বল গ্যাসের আলো।

আঁধার সমুদ্রের এক একটা লাইট-হাউসের মতোই।

তাড়াতাড়ি পথ চলবার ফাঁকে কত কিই না ভাব্‌ছিলাম…………

এক অনূঢ়া তন্বীর রূপ-সায়রে যেন নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েচি।

নবাগত অতিথি।

তারই প্রেমের পূজারী।

আমার প্রতীক্ষায় সে আকুল, অধীর!

হাতে বরণডালা…………

মুখে মৃদু হাসি…………

অভিনব অভ্যর্থনার আয়োজন।

মনে হ'ল আমি যেন সর্ব্বজয়ী বীর।

সত্যি করেই কি স্বর্গের দুন্দুভি বাজচে?

শত শত পুষ্পবৃষ্টি কি আমারই মাথার ওপর কি আকুল হয়ে ঝরে পড়চে?

কিন্তু কই!………

একি স্বপ্ন?

একি পুষ্পবৃষ্টি?

মেঘের বুক চিরে আস্‌চে ও কি?

আর্কটিক ওসানের বরফ-গলা জল?

ও তো দুন্দুভি নয়…………

মেঘের গর্জ্জন।

ছাতাটা খুলে নিয়ে ছুটলাম।

কিন্তু রাস্তায় ওরা কারা?

একটী আঁচল ঘেরা মেয়ে,

একটী বুড়ো ধরনের লোক,

আর তারই কোলে ছোট একটী ছেলে।

লোকটীর হাতে তো ছাতা…………

কিন্তু মেয়েটীর?

এম্‌নি তো কতই দেখেছি,

তবে দয়া দেখাবার আকাঙ্ক্ষাটা কোন দিনই জাগেনি।

কিন্তু আজ কষ্ট হ'লো—

এম্‌নি ক্ষেত্রে তাই হয় বুঝি।

তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে বল্‌লাম—দেখুন, এই ছাতাটা আপনি নিন ·····আপনাদের অনেকটা হয়তো যেতে হবে··· কিন্তু আমার বাড়ী খুব কাছেই······একটা ছুটেই যেতে পার্ব্বো।

অযাচিত উপকার······

নিজের কাছেও যেন অনেকটা বেখাপ্পা ঠেক্‌লো।

কিন্তু মেয়েটী কুণ্ঠিত হস্তে ছাতাটী গ্রহণ করলে—

হয়তো ওর শাড়ী-ব্লাউস্‌টী খুবই দামী।

যাই থাক্,

বিস্মিতই হলাম—

সেই হরিণাক্ষী মেয়েটী।

সঙ্কুচিত হয়ে বল্‌লাম—লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই আপনার······ছাতাটী পরেই না হয় ফিরিয়ে দেবেন······ঐ যে বৃষ্টি বুঝি জোরেই এলো······আচ্ছা, আসি,···নমস্কার।

দুটী হাত তুলে মেয়েটী কৃতজ্ঞতা জানালে—আপনার কিন্তু ভারি কষ্ট হ'বে।

—না,—কিচ্ছু না।

আট, দশ দিন কেটে গ্যাচে।

হিন্দু ল' পড়তে গিয়ে মনে জাগে একটা বাদলা রাতের কথা, জুরিস প্রুডেন্সের লেক্‌চার শুনতে গিয়ে মনে পড়ে এক রূপসীর করুণ আঁখির গোপন আকুলতা।

কিন্তু সার শুধু ওই স্বপ্নটুকুই······

আর কিই বা লাভ ওতে আছে?

বরং লোকসান এটুকু যে অমন সৌখীন সুন্দর ছাতাটী আর ঘরে ফিরে এলো না।

কতদিনই যে অনর্থক ক্লাস ফাঁকি দিয়েছি······

সবই ব্যর্থ হয়ে গ্যাচে।

কোন চিঠি তো দূরের কথা ······সংবাদটা অবধি নয়।

দুঃখ শুধু হয় ঠিকানা জানাতে সেদিন ক্ষতিটা ছিলো কি?

বিকালে ক্লাসের দিকে যাচ্ছিলাম—

ওরাস্তাটা দিয়ে খুব কমই গেচি;

সেদিন কিন্তু বিনা কাজেই চল্‌লাম।

তবে একটা ক্ষীণ আশা যে না ছিলো তা নয়।

হঠাৎ পেছন থেকে ডাক শুন্‌লাম—

'শিরীষ বাবু'—

চম্‌কে উঠ্‌লাম।

এদিক্‌কার কোন বাড়ীর সাথে কি আমার পরিচয় ছিলো?

ভেবে চিন্তে কিন্তু মনে আন্‌তে পারলাম না।

মুখ ফেরাতেই চোখে পড়লো—ছোটো একটী ছেলে।

কাছে এসে বললে—আপনি একটু আসুন,······মা ডাক্‌চে······

ইতস্ততঃ করলাম—আমায় নয় খোকা..., তুমি ভুল করচো······

—আপনার নাম শিরীষ বাবু নয়?·········দিদি যে আপনাকেই দেখিয়ে দিলে!

এক মুহূর্ত্তে সব স্পষ্ট হয়ে গেলো।

ধীরে ধীরে ওর অনুসরণ করলাম।

বাড়ীটী বেশ বড়োই।

যে ঘরটাতে গিয়ে বসলাম, একটা ধারে সেটা।

বেশ সুন্দর···সাজানো, গোছানো।

বুকের ভেতর কিসের যেন একটা দুরু দুরু······

হয়তো পুলকের উত্তেজনা,

নয় তো নিরাশার কল্পনা,

কিন্তু বেশীক্ষণ ও ভাবটা ছিলো না।

একটু পরেই পর্দ্দা সরিয়ে ভেতরে এলেন।

হ্যাঁ গো,—সেই বাদলা রাতেরই······

বেশ একটু সন্ত্রস্ত হতে হ'লো।

কথাবলার ধরণটি কি সুন্দর.

সুরটী কি মিষ্টি!

বল্লে—আপনার ঠিকানাটা জানিনে বলে ছাতাটা আর দেওয়া হয় নি······ভাবছিলুম, ডলিকে লিখে ঠিকানাটা আনিয়ে নেবো।

কবে ভুগোলে পড়েছিলাম পৃথিবী নাকি ঘোরে।

ওর জন্ত কত প্রমাণই না একদিন মুখস্ত করতে হয়েচে।

কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণটা আজই যেন পেলাম।

তা যাক্।

একটু পরেই তিনি চলে গেলেন।

ক্ষণকাল বসবার অনুরোধ,—

দুটী চোখের মিনতি—

অগত্যা কি আর করি ?

প্রতীক্ষা যেন দুঃসহ।

বিভোর মনে কতো কি ভাব্‌ছিলাম............

হঠাৎ বাধা পড়লো।

বিশ্রি, মোটা গলার আওয়াজটী............

বল্লেন—তুমি বুঝি 'ডলির' ভাইয়ের বন্ধু ?

তোমার কথাই বিথীর মুখে শুনেচি............সেদিন অমন হতভাগা বিষ্টিতে ভিজে তোমার অসুক করেনি তো বাছা ?.........ভাগ্যিস তুমি ছাতাটা দিয়েছিলে.........

একবার ওর যা ব্রঙ্কাইটিস্ হ'য়েছিলো !.........ঠাণ্ডাটা ধাতে ওর মোটেই সয় না।

তা যাক্।

তুমি বসো বাপু.........তোমায় দেখে খুসী হলুম...... আচ্ছা, আস্‌চি.........আমার আবার বাতের শরীর...... কইরে বিথী............

চেহারার হিসেবে পরিচয়টা অনুমান করা কঠিন।

কিন্তু ওরই জননী।

শরীরে পদার্থহীনতার অনেকগুলো অব্যর্থ প্রমাণের কথা জানিয়ে উনি চলে গেলেন।

একটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

মিনিটকয়েক নিতান্ত একা চুপচাপ বসে।

ওপরের কড়িকাঠ গোণা ছাড়া আর করাই বা কি ?

কিন্তু আজ তাও যেন ভালো।

রূপকথার পাতালপুরীর রাজকন্যার মতোই—

আমার হোষ্টেস্ মহাশয়াটী দেখা দিলেন।

বুকের ভেতর দুরুদুরুটা যেন বেড়েই চলে ?

কোনমতে বল্লাম—আপনার নাম বিথী—আই মিন্— বিথীকা বুঝি ?

তিনি শুধু মুখ টিপে একটু হাসলেন।

যেন অনুমানটী মিছে নয়।

কিন্তু অমনধারা হাসিই বুঝি মানুষকে মাতাল করে...!

পেছনদিকটায় দশবছরের সেই খোকা।

ছাতাটা ওর হাত হ'তে নিয়ে আমার পাশে রেখে দিলেন।

মুখে বল্লেন—দেখুন আপনি এখুনি যেতে পাচ্ছেন না.........একটু কিন্তু বসতে হবে।

দু'টী চোখেই মিনতির চাউনি—

স্বীকার না করে কি উপায় ছিলো ?

ছোটবেলায় আরব্যোপন্যাস পড়ে ছিলাম.........

আমি যেন একটী বেলার জন্য সেই হারুণ-অল-রসিদের সিংহাসনটী পেয়েছি।

তা যাক্।

আলাপটা বেশ আপনাথেকেই জমে গেলো।

লুচি-চা-সন্দেশের সাথে রূপসীতরুণীর নিরিবিলি সঙ্গ...... ......সকৌতুক আলাপন—সে যে কি মধুর—কি উপাদেয় তাকি বলবার ?

'মুট কোর্টে' এটেণ্ড কর্ব্বার কথা............

কে জানে সে কোন সুদূরে !

গানের শেষে,—সাঁঝের আঁধারে সেদিন বাড়ী ফিরি।

সারাটী পথ ওরই সুরের রেশ.........

'নিশীথ রাতের বাদল ধারা—'

সে কী আনন্দ !.........

ধরণীর শ্রেষ্ঠতম মাধুর্য্যের প্রথম আস্বাদ বুঝি ঐ.........

অ্যালেকজ্যাণ্ডারের মতোই যেন ভুবনবিজয়ী বীর।

রূপ-রস-গন্ধভরা জীবনের সেই তো সবে সুরু.........

অনেকদিনই কেটে গ্যাচে।

হয় তো সাত আট মাস।

আজ বাসন্তী-সুষমার বন্দনার গান নয়।

—নিজের প্রাণের কথা.........সাধনার কথা।

ফুলটী একদিন কুঁড়ি ছিলো,

আজ পূর্ণ উন্মেষ.........

প্রেমের রঙে রঙীন।

'হিন্দু ল'.........'রোমান ল'.........

আরো কত কি.........

কিন্তু চুলোয় যাক ওসব কথা।
জীবনের এই তো পরম সম্পদ।
এর কাছে ঐ তুচ্ছ পরীক্ষার চিন্তা—
সে তো শুধু নোট মুখস্থ করে জীবনটাকে পঙ্গু
করে তোলা।
আসচে ফাগুনেরই একটী দিন.........
পরিপূর্ণ জয়—
জীবনের সর্ব্বোত্তম সফলতা।

নীলকণ্ঠ

—পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর—

[পূর্ব্বানুবৃত্তি—চন্দননগরের বৃন্দাবন বসু একজন সমৃদ্ধ ব্যবসাদার। তাঁর পুত্র গোপাল বি-এ, পাশ দিয়া বাড়ী আসিয়াছে। বৃন্দাবন, শ্রীরামপুরের জমিদার প্রিয়নাথ মিত্রের কন্যা সুলতাকে দেখিয়া অবধি পুত্রবধূ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। গোপালকে সে কথা বলাতে, সে নিজে একবার সুলতাকে দেখিবে বলিল। বৃন্দাবনের ভ্রাতুষ্পুত্র নিখিলকে সঙ্গে লইয়া গোপাল একদিন সুলতাদের বাড়ী উপস্থিত হইল। সেখানে সুলতাকে গোপালের পছন্দ হয় নাই, কিন্তু মালতী নামে অন্য একটী মেয়ের স্পষ্টবাদিতা এবং ব্যঙ্গশ্লেষের পরিচয় পাইয়া গোপাল মনে মনে নিজেকে যথেষ্ট অপমানিত মনে করিয়াও, মালতীকেই বিবাহ করিবার ইচ্ছা জানাইল। নিখিল এবং অপর সকলে গোপালের পছন্দে আশ্চর্য্য হইয়াছিল। গোপাল কিন্তু তাহার গোপন অভিসন্ধি কাহাকেও জানাইল না! সে চাহিয়াছিল মালতীকে বিবাহ করিয়া লাঞ্ছনা ও অনাদরে তাহাকে ব্যথিত করিয়া পূর্ব্ব অপমানের প্রতিশোধ দিবে।

বৃন্দাবন, তাঁহার ইচ্ছামত গোপাল সুলতাকে বিবাহ করিতে রাজী না হওয়াতে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, গোপাল মালতীকেই বিবাহ করিল আর সুলতার বিবাহ হইল নিখিলের সঙ্গে। নিখিল বেশী লেখা পড়া শেখে নাই সত্য, কিন্তু বৃন্দাবনের কাছে থাকিয়া ব্যবসায়-সংক্রান্ত সে অনেক কিছুই শিখিয়াছিল। বৃন্দাবনের হইয়া তাঁর সকল বিষয় আশয় নিখিলই তত্ত্বাবধান করিত। প্রিয়নাথ নিখিলকে ঘর-জামাই করিতে চাহিয়াছিলেন, বৃন্দাবন তাহাতে মত দেন নাই।

একদিন কিন্তু সর্প দংশনে নিখিল মারা গেল। বৃন্দাবন প্রিয়নাথ সুলতা সকলেই মর্ম্মাহত হইলেন। প্রিয়নাথ সুলতাকে সঙ্গে লইয়া কাশী যাইলেন। বৃন্দাবন আপত্তি করিলেন না, বলিলেন "আমি যেদিন ডাকব সুলতাকে আমার কাছে পাঠাতে আপত্তি করলে চলবে না তা কিন্তু বলে দিচ্ছি।"

প্রিয়নাথ, সুলতা, সুলতার মা এবং তাঁহাদের সঙ্গে মালতীর পিতা শ্রীনাথ ও মালতীর বাল-বিধবা বড় বোন রমা কাশীতেই বাস করিতে থাকিলেন। মালতী ও বৃন্দাবন চন্দন নগরে থাকেন। নিখিলের শোকে তাঁহাদের মনে সুখ ছিল না। তাছাড়া গোপাল কলিকাতায় থাকিয়া এম-এ পড়িতেছিল, একবারও বাড়ী আসে না, কচিৎ কোন দিন চিঠি লেখে ত এক মাস আর কোন খবর নেয় না। মালতীকে সে যথেষ্টই অবজ্ঞা করিয়া চলে। কলিকাতায় গোপাল, সুরথ বলিয়া তাহার এক বন্ধুর বাড়ীতে মাঝে মাঝে বেড়াইতে যায়, তা নইলে আর কোন পরিচিত কাহারও কোন সন্ধান রাখে না। তার এক এক বার মনে হয় মালতীকে তাহার দেওয়া অপমানের প্রতিশোধ লইবার যে উপায় সে অবলম্বন করিয়াছে, হয়ত সেটা প্রকৃষ্ট উপায় নয়। পরক্ষণে সে চিন্তা মন থেকে মুছিয়া ফেলে।

গোপাল গোপনে বিলাত যাবার আয়োজন করিল। কলিকাতার বাড়ী বাঁধা রাখিয়া কিছু টাকা যোগাড় করিয়া একদিন দেশে গিয়া হাজির হইল। সেখানে মালতীকে গোপনে টাকা সংগ্রহ করিতে বলাতে মালতী রাজী হয় নাই। গোপাল গভীর রাত্রে মালতীর বাক্স খুলিয়া গহণা চুরি করিয়া পলাইতেছিল, কিন্তু ধরা পড়িয়া গেল। বৃন্দাবন সমস্ত শুনিলেন। গোপালের কোন কাজই তিনি সমর্থন করিলেন না, যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন কিন্তু পুত্রস্নেহে গোপালের সঙ্কল্পে বাধা দিলেন না।

মালতীর প্রতি দ্বিগুণ অবজ্ঞা বুকে লইয়া গোপাল বিলাত যাত্রা করিল। বন্ধুপত্নী নীরজা, সুরথ ও নীরজার ভাই সুভাষ হাওড়া ষ্টেশনে গোপালকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে গিয়াছিল। গোপালের বিদেশ যাত্রা সব চেয়ে বেশী কাতর করিয়াছিল নীরজাকে।]

—আট—

নীরজা দিনে দিনে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল। আর সে ভাল করিয়া হাসে না। তাহার গম্ভীর উদাস ভাব লক্ষ্য করিয়া সুরথের ভয় হইতে লাগিল। স্বামীর সামনে নীরজা আপনার মনের ব্যথা গোপন করিবার জন্য সাধ্যমত হাসিয়া কাটাইতে চেষ্টা করিত। কিন্তু সুরথ সমস্তই বুঝিত। গোপাল বিহনে এই ক্ষুদ্র পরিবারটীর সকল ব্যবস্থাই যেন বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে। সুভাষ আর সঙ্গী সাথীদের কাছে খেলিতে যায় না। অবসর সময়েও ঘরে বসিয়া

আপনার বই লইয়া কাটায়। সুরথ তাহাদের মনের গতি ফিরাইবার জন্য প্রায়ই বায়স্কোপ থিয়েটার প্রভৃতি দেখাইতে লইয়া যাইত; নূতন নূতন গল্প-উপন্যাস কিনিয়া আনিত; মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বর, ডায়মণ্ডহারবার ইত্যাদি দ্রষ্টব্য জায়গায় বেড়াইতে যাইত। সুভাষ ক্রমে মন দৃঢ় করিল। ছোটদার কথা ভাবিয়া আর অস্থির হইত না। নীরজা পারিল না। একেলা থাকিলেই তাহার মাথায় যত উদ্ভট ভাবনা আসিয়া জুটিত!—আজ হয়ত গোপাল জাহাজে যাইতেছে, সাগরে তুমুল তুফান উঠিয়াছে, সকলে পরিত্রাহি করিতেছে, নীরজার চোখের সামনেই যেন এমনি একটা দৃশ্য ভাসিয়া উঠিল। নীরজা চোখ বুজিয়া বলিয়া উঠিল—"ভগবান! রক্ষা কর! রক্ষা কর প্রভু! সব শান্ত করে দাও।" আবার হয়ত মনে করিল, আজ গোপালের অসুখ হইয়াছে, রোগের যাতনায় সে অস্থির হইয়া কাঁদিতেছে। নীরজা প্রার্থনা করিল,—"আহা! পিতা, বন্ধু, আত্মীয় কেহ তার কাছে নাই, তুমিই আছ প্রভু! তুমি তারে বাঁচিয়ে রাখ। তার সকল যন্ত্রণার অবসান করে দিও।"

এডেন হইতে গোপাল সুরথকে চিঠি লিখিয়াছে—

"সুরথ! ভাই! যত অগ্রসর হচ্ছি মনে হচ্ছে তোমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছি। মানচিত্রের দিকে চেয়ে দেখি—ভয়ে শিউরে উঠি—কোথায় তোমরা আর আমি কোথায়! সেদিনও তোমাদের সঙ্গে বসে গল্প করে এসেছি। আজ হাজার ক্রোশ পথ আমাদের ব্যবধান করে দিয়েছে।...... সামনে পেছনে জল—শুধু অসীম জল! কখনো বা কোথাও তীর দেখা যায়। অমনি প্রাণ কেঁদে উঠে! সেখানে ঘরে ঘরে প্রতি সন্ধ্যায় সকলে, বোনে বোনে, ভায়ে ভায়ে, সুখে স্বচ্ছন্দে কতনা গল্প করে দিন কাটাচ্ছে। আমরাও কজনে অবসর পেলেই এমনি আমোদ করতুম, খেলতুম.—সে কি আনন্দের দিন ছিল! আজ তোমরা কেউ কাছে নেই। কিছু ভাল লাগ্‌ছে না। মনে হচ্ছে ফিরে যাই। শুনতে পাচ্ছি, বাংলার মাটি, বাংলার মা বোন্ ভাই, সবাই যেন কেবলি আমায় ডাকছে, ফিরে এস। তাদের ব্যাকুল আহ্বানে সাড়া দেব ভাবি। পারি না। অদৃষ্ট আমাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। স্রোতের টানে ভেসে চলিছি।......জানি না, কবে আবার তোমাদের দেখব। আমার ভালবাসা জেন। ইতি

এডেন,
ষ্টীমার মাণ্ডালা
২১শে চৈত্র, ১৩২০

স্নেহের "গোপাল"

সুরথ চিঠি পড়িয়া নীরজাকে দেখাইল।

নীরজা ব্যগ্র হইয়া সমস্তটা পড়িল। একবার—দুইবার তিনবার পড়িল। তাহার কথা কিছুই লেখা নাই। শুধু ভাসাভাসা কয়েকটা কথা—এ যেন অন্তরের কথা কিছু নয়। শুধু লিখিতে হয় তাই লেখা। পুরুষের মন পাষাণের চেয়ে দৃঢ়। এত দিনকার দেখা, এত ভালবাসা, কয়েকদিনের মধ্যে সব ভুলিয়াছে!

নীরজা চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

বলিল "এতদিন পরে এই চিঠিটুকু লেখবার দরকার কি ছিল? আমাদের জন্য তার ঘুম হচ্ছেনা সে ত বুঝাই যাচ্ছে! ও বানানো স্তোক আমি পড়তে চাই না। পুরুষ মানুষ কেমন তা বুঝলুম। তোমরা কাছে থাকলে কতই না আত্মীয়তা দেখাও। সব মিথ্যে——ছল!"

সুরথ বলিল "তোমার ঠাকুরপোর ওপর রাগ করে, গায়ের ঝালটা আমার ওপর দিয়ে মিটিও না।—অন্ততঃ যতক্ষণ এমনি অবহেলা আমার কাছে না পাচ্ছ! এতই যদি বিরহের কষ্ট ভাবনা—তাঁর সঙ্গেই কেন গেলে না? রেলে-জাহাজে —একসঙ্গে আমোদ করে যেতে—।"

"কি যে বল তুমি! আমি কেন যেতে যাব? ওসব জঘন্য ঠাট্টা ভাল লাগে না। আমার দায় পড়েছে ভাববার তার জন্যে।"

গোপাল লণ্ডনে পৌছিয়া হোষ্টেল হইতে যে চিঠি লিখিল, সে খানা আরও সংক্ষিপ্ত। শুধু নিরাপদে পৌছিয়াছে এই সংবাদ! আর সুরথ যেন চিঠির উত্তর দেয় তার জন্য অনুরোধ।

সুরথ এ চিঠিখানাও নীরজাকে দেখাইতে আনিল। সে দেখিল না বলিল "তোমার চিঠি আমি দেখতে চাই না। দেখলে এবারও নাজানি আরও কত ঠাট্টা করবে।"

সুরথ বলিল "তোমার চিঠি আমি দেখব না, আমার চিঠি

তুমি দেখবে না, ও সব আইন আদালতের তর্ক এখন তোলবার প্রয়োজন নেই। তোমাতে আমাতে ব্যক্তিগত অধিকার নিয়ে তফাৎ আছে, আজ এই প্রথম তোমার মুখে শুনলুম। বেশ! না দেখতে চাও, দেখো না। আমিও আর বলব না!"

সুরথ চলিয়া যাইতেছিল। নীরজা ব্যগ্রস্বরে বলিল "দেখিতে চাইনা—কিন্তু তুমি বল। শুধু এই খবর টুকু আমাকে জানতে দাও—সে ভাল আছে।"

"না—সে কথাও আমি বলব না। পরের চিঠি দেখতেও যেমন নেই তেমনি শুনতেও নেই। পাপ হয়।"

"নাই বা বললে! আমার তা না শুনলে যেন ভাত হজম হবেনা। দরকার নেই আমার—"

"আহা! এত রাগ দেখিনি! কিন্তু আমি কি করেছি বল! তুমি নিজেই বললে, দেখতে নেই, হয়ত পাপ হবে, এই পাপের জন্ত তোমার মহাভারত পর্য্যন্ত অশুদ্ধ হয়ে যাবে—"

"ওগো! ক্ষমা কর আমাকে! আমার ঘাট হয়েছে। আমি গলায় আঁচল জড়িয়ে তোমার মাপ চাচ্ছি! তুমি—চুপ কর। আমার ভাল লাগছে না—!"

"আচ্ছা পাগল! নাও! আর রাগ দেখিও না, তাহলে আবার আমার ঠাট্টা সহ্য করতে হবে। তার চেয়ে শান্ত শিষ্টের মত এইটে পড়তে থাক!"

বলা বাহুল্য গোপালের এই চিঠি দেখিয়া নীরজার রাগ বাড়িয়া গেল। সে মনে মনে ভাবিল গোপালের কথা স্মৃতি হইতে মুছিয়া ফেলিবে। তাহাদের জন্ত যে এতটুকু ভাবেনা, তাহার কথা মনে করিয়া সেই বা কেন চোখের জল ফেলিবে?

সুরথ প্রত্যুত্তরে লিখিল,—

"বন্ধুবর, গোপাল

তোমার দুখানা চিঠি পেয়েছি তুমি নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিয়াছ জানিয়া সুখী হয়েছি।

আমার দু'পাঁচ লাইনের বেশী লেখা অভ্যাস নাই। কাজেই এই ছোট উত্তর দেখিয়া তুমি রাগ ক'র না! কিন্তু তুমি নিজে কবি এবং সুলেখক—তোমার চিঠির মাঝে হীরা মুক্তা না ছড়ালে তোমাকে কৃপণ আখ্যা পেতে হবে।—

ব্যাপারটা বিশেষ গুরুতর। সেই জন্যই তোমায় আগে থাকতে জানিয়ে সাবধান করা দরকার। তুমি একটীবার নীরজার নাম পর্য্যন্ত লিখে সে কেমন আছে জানতে চাও না। তার ভালবাসা যদি হারাতে না চাও এবার থেকে তাকেই চিঠি লিখ। আমাকে আলাদা করে কিছু লেখা নিষ্প্রয়োজন নীরজাকে যখন লিখবে একটু বড় করে লিখ। আর যদি কাব্য আওড়াতে পার ভুল' না। সে তোমার তিন লাইন চিঠি দেখে ভীষণ রেগেছে।

আমরা সকলে ভাল আছি।

তুমি চিঠি লিখিতে ভুল না। আমাদের স্নেহ নিও। ইতি—

২৭শে বৈশাখ ১৩২১ } তোমারই
কলিকাতা } সুরথ।"

সুরথের চিঠি লিখিবার সাতদিন পরে নীরজার নামে গোপালের চিঠি আসিল।

নীরজা তারিখ দেখিয়া বুঝিল গোপালের দ্বিতীয় পত্র ও ইহা একই সময় লেখা এবং ডাকে ফেলা হইয়াছিল। পোষ্ট অফিসের দোষে শেষের খানি একটা ডাক পরে আসিয়াছিল।

গোপালের প্রতি সমস্ত ক্রোধ এক নিমিষে জল হইয়া গেল। চিঠির দৈর্ঘ্য দেখিয়া সুরথের ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছিল। সে একটা পাতাও পড়িল না। নীরজাকে বলিল "আর যেন পুরুষ মানুষদের নিন্দা কর না—তারা ভালবাসতে পারে না—এবং চিঠি লিখতেও পারে না।"

সুরথ নীরজাকে চিঠি পড়িবার অবসর দিবার জন্তই অন্যত্র প্রস্থান করিল।

গোপাল লিখিয়াছিল,——

"পূজনীয়া

শ্রীমতী নীরজা দেবী

সমীপে।

বৌদি!

তোমার কাছে আমার এই প্রথম চিঠি! তোমায়

লিখতে বসে সেই কথাটাই আমার বারবার মনে পড়ল। আর মনে হল জীবনে যত লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে সকলের চেয়ে তুমিই আমার আপনার।

পিতার ভালবাসা হয়ত তোমাদের সবার চেয়ে গভীর—হয়ত জগতে তার তুলনা নেই। কিন্তু বরাবরই তাঁকে আমি ভয় করে এসেছি, তাঁর বিচারকের মত কঠোর দৃষ্টির কাছে নত না হয়ে দাঁড়াতে পারিনি। তাঁর কাছে একদিনও প্রাণখুলে কথা বলতে পারিনি, আর তোমার সামনে যখনি দাঁড়িয়েছি, তুমি নির্ম্মল অগাধ অসীম ভালবাসা দিয়ে আমাকে কাছে ডেকে নিয়েছ। সময় অসময় ন্যায় অন্যায় দোষগুণ কিছুই তোমার মনে জাগে নি। অপরিচিত ও অনাত্মীয় বলে একদিনও সঙ্কোচ বোধ কর নি। প্রথম থেকেই সুভাষের মত আর একটী ভাই ভেবে স্নেহের বাঁধনে বেঁধেছিলে।

যতদিন কাছে ছিলুম এতকথা কিছুই ভেবে দেখিনি। সেদিন প্রথম বুঝতে পারলুম প্রিয়জনের বিচ্ছেদ কত অসহ। সারাপথ কেবলি তোমাদের কথা ভেবেছি। ষ্টেশনে তোমরা আমার দিকে ছল ছল নেত্রে চেয়ে বিদায় দিয়েছিলে সেই ছবিটাই কেবলি চোখের সামনে জাগছে। যেন মনে হচ্ছে তুমি সেইখানে দাঁড়িয়ে আজও প্রতীক্ষা করে রয়েছে, আর কেবল ডাকছ 'আয়! ফিরে আয়! ফিরে আয়। কিসের অভাব তোর? দেশের মাটী ছেড়ে, বন্ধুর ও ভগিনীর স্নেহভুলে, পিতার আশীর্ব্বাদ উপেক্ষা করে কেন গিয়েছিস?'

কেন এসেছি নিজেই তা জানি না! প্রথমে মন বলত, পড়ার বাতিক্ আর বড় হবার লালসা। আজ এখানে এসে ভেবে দেখছি সব মিথ্যে। আই সি এস দেব ভেবেছিলুম, ইচ্ছা হচ্ছে না। ছেড়ে দেব! ব্যারিষ্টারী পড়ব মনে করছি হয়ত তাও ভাল লাগবে না। নূতন দেশে এসেছি—নূতন নূতন দৃশ্য দেখতে ইচ্ছা কখনও হয়—কিন্তু ভাল লাগে না। একা এই নিঃসঙ্গ জীবন দুর্ব্বহ বোধ হচ্ছে।.........

আজ আঠারো দিন জাহাজে থাকার ইতিহাস লিখতে বসে ভাবতে গিয়ে দেখি লেখবার মত কিছুই নেই।........

মাঝে মাঝে আকাশ যখন কাল নিবিড় মেঘে ভরে যেত', ঝড়ো হাওয়া মাতাল হয়ে লাফালাফি করত, জলের ঢেউগুলা উঁচু হয়ে জাহাজের ওপর ছিটকে এসে পড়ত ভাবতুম রুদ্রভৈরবের এই তাণ্ডবনৃত্য আমার হৃদয়ের গতি ছন্দ ও তাল অনুসরণ করে চলেছে—আমারও ইচ্ছা হত' এমনি উন্মাদ হয়ে ওদের মাঝে মিশে যাই, ফেনিলোচ্ছল সাগরের দোলা খেতে খেতে চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়ি! তখনি কিন্তু তোমাদের বিদায় বিহ্বল-বিষাদ-কাতর দৃষ্টির কথা স্মরণ হত', ফিরে যাবার ব্যাকুল আহ্বান শুনতে পেতুম, আর সেই নির্ব্বাণের আনন্দ ও সৌন্দর্য্য এক মুহূর্ত্তে বিভীষিকাময় অন্ধকার বলে প্রতীয়মান হত। মুক্তি পাবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠতুম।............

আবার যখন আকাশ পরিষ্কার থাকত' পশ্চিমের শেষ সীমায় সূর্য্য ঢলে পড়ত' প্রশান্ত ধ্যানমৌন সাগরের জলে তার রাঙা কিরণ প্রতিফলিত হয়ে ঝিকমিক্ ঝিকমিক্ করত' সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখতে দেখতে চোখে জল আসত! যা দেখতুম তার তুলনা নেই, কাগজে কালি দিয়ে রঙ ফলিয়ে কেউ তার প্রতিচ্ছবি আঁকতে পারে না। ভাষার বর্ণনায় তাকে রূপ দেওয়া যায় না। ভাবতুম আমি স্বার্থপরের মত একলা দাঁড়িয়ে তাই উপভোগ করছি! তোমরাও কাছে থেকে যদি দেখতে—কত আনন্দ হত।............

এমনি রকম হাসি কান্নার মাঝখানেই দিন কেটে গেছে!............

সঙ্গী সহযাত্রীদের ভেতর দু'চারজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কাহারও সঙ্গে মিশে কথা কয়ে আমোদ পাই নি। তাদের হাসি ঠাট্টার মজলিশে আমি যোগ দিতে পারতুম না। বেশীর ভাগ সময় একলা ডেকে দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকতুম—সুদূরের দিকে—সেই যেখানে সাগর আর আকাশ গিয়ে মিশে এক হয়ে গেছে,—সীমা অসীমের মাঝে আপনাকে হারিয়ে ফেলেছে! উদাস মনকে ভুলিয়ে রাখবার আর কোন উপায় ছিল না।............

নিজের ব্যথার কথাই কেবল গেয়ে মরছি। তার জন্য আমায় মাপ কর' কেননা আমি আপাততঃ আর কিছুই ভাবতে পারছি না।

তোমরা কেমন আছ খবর জানবার জন্য ব্যাকুল হয়ে

প্রতীক্ষা করছি।

আমার প্রণাম নিও।

সুরথ ও সুভাষকে ভালবাসা জানিও। ইতি—

স্নেহের "গোপাল।"

চিঠি পড়া হইলে নীরজা তন্ময় হইয়া ভাবিতে লাগিল। গোপালের ব্যর্থতার বেদনা তাহার অন্তরে করুণ প্রতিধ্বনি তুলিতেছিল।

ক্রমশঃ—

শ্রী........................

প্রাক্‌-প্রাবৃট্‌

—শ্রীনরেন্দ্র দেব।

অভিমান বেদনায় আঁখি দু'টি প্রিয়ে
আজি কেন হেরি ছল ছল?
বরষার কালো মেঘে ঢেকেছে সে আলো
এখনি ঝরিবে যেন জল!
থেকে থেকে কেঁপে ওঠে অধর-কিনারে
কি ব্যথা ও করুণ কোমল?
বুকে যে গো কেঁপে ওঠে নিঃশ্বাসের বিষ
সমুদ্র-মন্থন হলাহল!
কি দুখে দহিছে দেহ, কী যাতনা মনে
কি তাপে লো অন্তর বিকল?
প'লায়ে গেছে কি তব পোষা পাখী সখী
নিশি শেষে ছিঁড়িয়া শিকল?
পীড়িত কি মৃগ-শিশু? গাভী তব আজ
ছোঁয়নি কি নব-তৃণ-দল?
মরিয়া গেছে কি বেজী, প্রিয় সাথী তব
তাই কি গো হ'য়েছো বিহ্বল?
সখীরা কি দেছে আড়ি তব সনে কেহ
কলহে কি উঠেছে গরল?
ভাঙিয়া দেছে কি কেহ সাধের বীণাটি
ছিঁড়েছে কি ভাব-শতদল?

কেড়ে কি নিয়েছে’ কেহ কপালের টিপ
মুছে দেছে আঁখির কাজল
চেয়ে কি পাওনি কিছু কারো কাছে আজ
তাই কি গো অধীর চঞ্চল ?
হারায়ে গেছে কি কিছু প্রিয়নিধি আজ
জীবনের একান্ত সম্বল ?
তাই কি বিবশা হেন, আলু থালু কেশ
ধূলিপরে লুটায় অঞ্চল ?
মনের মানুষ কি গো চলে গেছে দূরে
সুখ-স্বপ্ন করিয়া বিকল,
আঁখি অন্তরালে কেহ গেছে বুঝি তাই
যুগ বলি মনে হয় পল ?
তাই কি নয়নকোনে অশ্রুকণা আজ
মুক্তা হেন করে টল-মল ?
এখনি কপোল বহি বিপুল প্লাবনে
নামিবে কি আষাঢ়ের ঢল ?
তোমার ও অশ্রুধারে সিক্ত হবে ক্ষিতি
রোমাঞ্চিত হবে ধরাতল !
রুদ্র বৈশাখের হবে নির্ব্বাপিত প্রিয়ে
অতনু-দহন-দাবানল !
গগনের বাতায়নে অপাঙ্গ নয়নে
বিজলী হাসিবে খল-খল !
ঈর্ষ্যামত্ত জলদের গভীর গর্জ্জনে
চমকি উঠিবে বন স্থল !
বিরহীর দীর্ঘশ্বাসে তাপিত বাতাস
আঁখি জলে হবে সুশীতল !
বেদনার বারিধারা হৃদি উৎস হ’তে
ধরা প্রান্তে ঝরি অবিরল
নিখিলের মলা মাটি মুছায়ে করিবে
শরৎ-শোভায় নিরমল !

বঙ্গ সাহিত্যে বৈদেশিকতা

—শ্রীকমলকুমার সান্ন্যাল।

আজকাল বাজারের সর্ব্বত্র বিদেশী মালের আমদানী। অশনে, বসনে, শয়নে স্বপনে—প্রায় সকল সময়েই আমরা বিদেশীর ভাবে বিভোর! অঙ্গে আমাদের বিদেশী বসন; পরিচ্ছদে আমরা কখনও সাহেব, কখনও মোল্লা। পানার্থে আমরা চা-তে তৃপ্ত, জলযোগে আমরা বিস্কুট বা পাঁউরুটির ভক্ত। পণ্যবিচারে আমরা নিরুপেক্ষ ক্রেতা, উচিত মূল্যের অধিক দেওয়া অনুচিত মনে করি। আমাদের বিলাসভূষণ আসে বিদেশ হইতে;—সকলকে আমরা সমান আদরে বরণ করিয়া লই। আমাদের অত্যাবশ্যক তৈলাধারটি হইতে অজ্ঞান-তিমিরনাশী গ্রন্থরাশি পর্য্যন্ত সব বিদেশের যাত্রী।

ব্যবহারিক জীবনে যাহার সহিত এমন নিকট সম্পর্ক তাহা যে আমাদের চিত্তে ও চিন্তাতেও তাহার প্রভাব বিস্তার করিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? শৈশবে যেদিন বিদ্যাসাগরের বাংলা প্রথমভাগের সঙ্গে ইংরাজী প্রথম ভাগের পাঠাভ্যাস আরম্ভ হয়, সেইদিন হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত ঐ এক বিদেশী ভাষা আর বিদেশী ভাবের অবিশ্রান্ত অত্যাচার। আমাদের চিন্তার উপর জীবনব্যাপা এই উৎপীড়নের ফলে আমাদের সনাতন সমাজনীতি আমূল পরিবর্ত্তিত হইবার মত হইয়াছে।

এ হেন বিদেশীভাবের বন্যা আমাদের সাধের বাংলা সাহিত্যকে প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে বা ফেলিবার উদ্যোগ করিয়াছে, বলিয়া আমাদের সমাজ-হিতৈষী পুরুষগণ শঙ্কান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন। বঙ্গভাষায় যাহারা যাহারা উপন্যাস লিখিয়াছেন বা লিখিতেছেন তাঁহাদের অনেকের বিরুদ্ধেই অভিযোগ হইয়াছে যে তাঁহারা উপন্যাসের ভিতর দিয়া দেশে বিদেশী বিষ ছড়াইতেছেন। সাহিত্যের স্বাস্থ্যবেত্তা সিংহ মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিকতম ঔপন্যাসিক পর্য্যন্ত সকলকেই বিদেশী-দুষ্ট বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। কিন্তু বিদেশী সম্বন্ধে তাঁহার ধারণাই সর্ব্বসাধারণের নিকট গ্রাহ্য হইয়াছে কি না সন্দেহ।

সিংহ মহাশয়ের প্রধান অভিযোগ হইতেছে পরকীয়ার বিরুদ্ধে। পরকীয়াকে তিনি সাহিত্য হইতে একেবারে বহিস্কৃত করিতে চান; সেজন্য যদি সৎসাহিত্যের সীমান্ত হইতে বৈষ্ণব কাব্যকেও নির্ব্বাসিত করিতে হয়, তাহাতেও তিনি প্রস্তুত! কিন্তু এ সমস্যার মীমাংসা কি এত সহজ? বাংলার সৎসাহিত্য হইতে বৈষ্ণব কাব্যকে এত সহজে ত্যাগ করা যাইতে পারে কি? বৈষ্ণব কাব্য যে পরবর্ত্তী বাংলা সাহিত্যের অফুরন্ত প্রেরণার প্রস্রবণ! সিংহ মহাশয়ের অভিযোগ, বৈষ্ণব কাব্য হিন্দু সমাজে নেড়ানেড়ির সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্মের নামে যে ব্যভিচার আমরা ইতস্ততঃ দেখিতে পাই তাহার জন্য কি একা বৈষ্ণব কাব্যই দায়ী? যখনই যে কোনও মহান্ ধর্ম্ম নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের অধিগত হইয়াছে, তখনই সেই ধর্ম্মের এই প্রকার অবনতি হয় নাই কি?

তা' ছাড়া, বৈষ্ণব কাব্যের বিষয় যে সাধারণ মনুষ্য জীবনের অন্তর্গত নয়, ইহা ত বৈষ্ণব কবি প্রতিপদেই ইঙ্গিত করিয়াছেন। বৈষ্ণবকবির পরকীয়া এবং আধুনিক ঔপন্যাসিকের পরকীয়ায় ইহাই যে প্রভেদ! বৈষ্ণব কাব্য মনুষ্য জীবনের যে অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে, তাহা চরম পরিণতির অবস্থা—যে অবস্থায় মানুষ ভগবৎপ্রেমে আত্মহারা হইয়া ভগবান্‌কেই সর্ব্বস্ব সঁপিয়া দেয়। সুতরাং বৈষ্ণব কবির রচনা একান্ত আদর্শ মুখী রচনা, উহার প্রেরণা শুদ্ধমাত্র ভগবানের মানুষী লীলায়। পক্ষান্তরে, আধুনিক সাহিত্য সম্পূর্ণ রূপে বাস্তবাচ্ছন্ন,—একেবারে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইহজীবনের সঙ্কীর্ণ সীমাটুকুর মধ্যে পর্য্যবসিত। জীবনের নিছক্ বাস্তবটাকে যথাসম্ভব তন্ন তন্ন করিয়া দেখাই হইতেছে আধুনিক সাহিত্যের কাজ; ইহাতে যদি বীভৎস রসেরও সৃষ্টি করিতে হয় আধুনিক সাহিত্যিক তাহাতেও পশ্চাৎপদ হন না!

এখন দেখিতে হইবে, আধুনিক রস-রচনার প্রাণস্বরূপ এই যে বাস্তবপ্রীতি—ইহা কতদূর যুক্তিযুক্ত। মনে রাখিতে হইবে যে, যে দুর্দ্দান্ত আগন্তুক-সভ্যতা তাহার করাল ছায়া লইয়া আজ আমাদের বিরাট্ হিন্দু সমাজকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে উদ্যত, তাহার প্রাণশক্তি ঐ বাস্তবতায়। সেই বাস্তবতাকে আমরা জীবনের অনেকাংশে গ্রহণ করিয়াছি, আমাদের চিন্তা-রাজ্যেও তাহাকে গ্রহণ করিব কি না তাহা বিবেচ্য।

যেদিন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা আমাদের এক মাত্র ভরসার বস্তু ছিল, সেদিন কি আর আছে? আমরা কি বুঝি নাই যে কেবল আধ্যাত্মিকতায় কোনও জাতিকে সুস্থ রাখিতে পারে না? আমরা জানিয়াছি, ভারতের আধ্যাত্মিকতা ভারতকে পরাধীনতার শৃখল হইতে মুক্ত করিতে পারে নাই; আমরা দেখিয়াছি, ভারতের তেত্রিশ কোটি দেবতা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সহায়তা করেন নাই। ভারতের কর্ম্মপ্রাণতা ভারতের বৈশিষ্ট্যকে আজ পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিয়াছে বটে; কিন্তু ধর্ম্মই তাহার সকল কামনাকে পূরণ করিতে পারে নাই। দেহের ধর্ম্ম মনের ধর্ম্ম অপেক্ষা হীন এবং তুচ্ছ হইলেও একেবারে অগ্রাহ্য নহে। সেইজন্যই আজ আমাদের দেশে বিদেশী এবং বৈদেশিকতার এত আদর। কেন না, বিদেশীর মধ্যে আমরা এমন একটি বস্তুর সন্ধান পাইয়াছি যাহা আমাদের প্রাচ্য সভ্যতায় নিতান্ত অবজ্ঞাত ছিল।

ভারতের দ্বারে পাশ্চাত্য আজ নবীন অতিথি। তাহার প্রভাব আপাততঃ অসম্বরণীয়, কেন না সে নবীন। বৃদ্ধ ভারতের সহিত তরুণ পাশ্চাত্যের মিলনে ক্ষতির সম্ভাবনা বৃদ্ধেরই বেশী। তথাপি এ মিলন বাঞ্ছনীয়, যেহেতু ইহাতে শেষ পর্য্যন্ত আমাদের লাভের সম্ভাবনা। এই লাভের সম্ভাবনা যে কি, তাহার প্রতি প্রথম ইঙ্গিত করেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'আনন্দমঠে'। সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসের এক পাত্রকে দিয়া বলাইয়াছেন, "তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতন ধর্ম্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম্ম; তাহার প্রভাবে প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম—ম্লেচ্ছেরা যাহাকে হিন্দুধর্ম্ম বলে—তাহা লোপ পাইয়াছে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক---কর্ম্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার,—বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। অন্তর্বিষয়ক যে জ্ঞান সেই সনাতন ধর্ম্মের প্রথম ভাগ। কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি আগে না জানিলে, সূক্ষ্ম কি তাহা জানা যায় না।...... এখন এদেশে বহির্বিষয়ক কোন জ্ঞান নাই—শিখায় এমন লোক নাই, আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরেজি শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে।"

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই মহামিলন আজও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই মিলন প্রচারের ভার বাংলার তথা হিন্দুস্থানের ধর্ম্মযাজকেরা লন নাই, কেন না তাঁহারা বর্ত্তমানের সম্পর্কশূন্য। এ মিলন প্রচারের ভার লইয়াছেন আমাদের সাহিত্যিকের দল। কবীন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর বিপুল আয়োজন এই প্রচার-চেষ্টারই বিকাশ। ধর্ম্ম যাহাকে অস্বীকার করিল, সাহিত্য তাহাকে অস্বীকার করিল না। বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ-আন্দোলন নিস্ফল হইল; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র তাঁহাদের অমর গ্রন্থে বিধবা-বিবাহকে চিরস্থায়ীভাবে প্রচার করিয়া গেলেন। সাহিত্যের ইহাই রীতি! কারণ, সাহিত্য জীবনধর্ম্মী, তাহার প্রেরণা প্রত্যক্ষভাবে জীবনে, পরোক্ষভাবে ধর্ম্মে। ধর্ম্ম আমাদের নিঃস্ব। জীবনকে যে ধর্ম্ম স্বীকার করে না, শক্তিহীন তাহাকে হইতেই হইবে। অবস্থার বিপর্য্যয়কে যদি তুমি স্বীকার না করিয়া চল, তাহা হইলে অবস্থার নিষ্পেষণে তোমাকে নিষ্পিষ্ট হইতেই হইবে। ধর্ম্ম আমাদের জীবনের প্রয়োজনের দিকে চাহে না; সে শুধু তাহার নিজের জেদই বজায় রাখিতে চায়। ফলে, জীবন তাহাকে মানে না। গুরু যেখানে শিষ্যের প্রকৃতি বুঝিয়া উপদেশ দিতে পারেন না, সেখানে গুরুশিষ্য সম্বন্ধ স্থায়ী হইতে পারে না। আমাদের ধর্ম্ম বলে তুমি সমুদ্র পারে যাইও না; জীবন দেখে সমুদ্র পারে যাওয়া একান্ত অনিবার্য্য। ধর্ম্ম বলে, তুমি শূদ্রকে আলিঙ্গন করিও না, ম্লেচ্ছকে স্পর্শ করিও না; জীবন দেখে

অস্পৃশ্যতা মৃত্যুমুখী, অতএব অবশ্য বর্জ্জনীয়। এমনি করিয়া আমাদের ধর্ম্ম কেবলই জীবন হইতে সরিয়া গিয়াছে। এই রূপে, যাহাকে আশ্রয় করিয়া জীবন স্বপথে চলিতে পারিত, তাহার দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া জীবন এখন স্বেচ্ছাচারী। সেই স্বেচ্ছাচারী জীবন হইতে উদ্ভূত যে সাহিত্য, তাহা স্বেচ্ছাচারী না হইয়া পারে না।

এই স্বেচ্ছাচারকে আমাদের আপাততঃ সহ্য করিতে হইবে। ইহা যুগ-পরিবর্ত্তনের একটা লক্ষণ। যখন কোনও দেশে, কোনও বিষয়ে একটা বৃহৎ পরিবর্ত্তন আসিতে থাকে;—তখন নিয়ম লঙ্ঘন স্বাভাবিক। উহা অবিমৃষ্যকারী সমাজের নিঃশঙ্ক অত্যাচারের অবশ্যম্ভাবী প্রতিফল। উহার বিরুদ্ধে লিখিয়া, তর্ক করিয়া ফল অতি অল্পই আশা করা যায়। রবীন্দ্রনাথ অভয়বাণী শুনাইয়াছেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে ভারতীয় সভ্যতা তাহার বৈশিষ্ট্য হারাইবে না, কেবল পরিমার্জ্জিত হইবে। ইতিমধ্যে, আমরা যে নূতন অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিব তাহাতে হয়ত আমরা প্রাচীন সত্যকেই এক নূতনভাবে অবধারণ করিতে শিখিব। যে ঋষি-প্রণীত সত্যকে হয়ত আমরা অবহেলায় হারাইয়াছিলাম, তাহাকে জীবনের ভিতরে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার যথার্থ মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিব। এতদিন আমরা শুধু শাস্ত্র-বাক্যের আবৃত্তি করিয়াছি, তাহার অর্থ বুঝি নাই। এত-দিন আমরা মনে করিয়াছি শাস্ত্রার্থ বুঝি কেবলই বুদ্ধি-গম্য,—ন্যায় এবং তর্কের দ্বারাই শাস্ত্রের সকল সমস্যার নিষ্পত্তি; কিন্তু আজ জানিতেছি যে সত্য বুদ্ধিগ্রাহ্য নহে, বোধিগ্রাহ্য। সেই বোধিশক্তিকে জাগ্রত করিতে হইলে কেবল ঋষির বচনই যথেষ্ট নহে। তাহার জন্য তপস্যা চাই, প্রাণপণ সাধনা চাই। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ।" এখন আমাদের ব্যক্তিগত এবং সমাজগত জীবনে সেই তপশ্চর্য্যার প্রয়োজন। কবে আমরা জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া সেই তপঃসাধ্য সত্যকে স্বাধীনভাবে লাভ করিব, সেইজন্য আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে।

ধর্ম্মকে পিছাইয়া রাখিয়া জীবনের ও সাহিত্যের আজ এই যে উদ্দাম অভিযান, ইহা স্থায়ী অমঙ্গলের সূচনা করে না। ইহা আজ আমাদিগকে বুঝিবার অবসর দিতেছে সংযমের সহিত জীবনের কি পর্য্যন্ত সম্বন্ধ। সংযম যে পর্য্যন্ত জীবনকে কেবল নিয়ন্ত্রিত করে, শৃঙ্খলিত করে না, সেই পর্য্যন্ত সংযম জীবনের মিত্র। কিন্তু সংযম যেখানে জীবনের স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিয়া তাহার স্বাচ্ছন্দ্যকে হরণ করে, সেখানে উহা জীবনের শত্রু। আজ প্রাচ্যশিক্ষার সহিত পাশ্চাত্যশিক্ষার মিলনে আমাদের বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে সংযম যেমন জীবনের ধর্ম্ম, স্বাধীনতাও তেমনি জীবনের ধর্ম্ম। সংযমকে বর্জ্জন করিলে জীবন উচ্ছৃঙ্খল হয়, ব্যাভিচারী হয়; আর, স্বাধীনতাকে বর্জ্জন করিলে জীবন নিস্তেজ হয়, মৃত্যুমুখীন হয়। আজ আমাদের জীবনে ও সাহিত্যে যে নব ভাবের সঞ্চার হইয়াছে তাহা যৌবনের রাজটীকা, মুমূর্ষুর বিকারচিহ্ন নহে। অতএব হে নীতিক্লিষ্ট সমাজ-ধুরন্ধর! শান্ত হও! তোমার রসপিপাসু চিত্তকে তোমার নীতিজ্ঞানের দ্বারা পীড়িত করিও না!—আধুনিক রসরচনায় মধ্যে যে ভাবাধিক্য দেখিয়া তুমি ক্ষোভে, আশঙ্কায় উদ্ভ্রান্ত হইয়াছ; তাহা প্রকৃতপক্ষে অত ভীতি-প্রদ নাও হইতে পারে। উহা ক্ষণিকের উত্তেজনা, ক্ষণিকে মিলাইয়া যাইবে। যেদিন নবীন সাহিত্যের রসনিপুণগণ দেখিবেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে, তাঁহাদের নব আদর্শে অনুপ্রাণিত সমাজ অদূরবর্ত্তী হইয়াছে, সেইদিন তাঁহাদের লেখনী সার্থকজ্ঞান করিয়া তাঁহারা সাক্ষাৎভাবেই সমাজের গাত্রে মঙ্গলহস্ত সঞ্চারণ করিতে আসিবেন। সেদিন পণ্ডিত ও সাহিত্যিক একযোগে বলিবেন, "হাঁ,—এই আদর্শই সত্য! এককালে যাহাকে দেখিয়া সংশয়াম্বিত হইয়াছিলাম, সন্ত্রস্ত হইয়াছিলাম, এখন বুঝিলাম এ যুগের তাহাই পরম সত্য! প্রেমে হউক, কর্ম্মে হউক, শিক্ষায় হউক, দীক্ষায় হউক, স্বাধীনতা জীবনের পরম মিত্র। স্বাধীনতাকে বর্জ্জন করিয়া একদিন আমরা জীবনকেও বর্জ্জন করিতে বসিয়াছিলাম। আজ স্বাধীনতাকে ও জীবনকে নবরূপে বরণ করিলাম, নবভাবে লাভ করিলাম। আন্দো-লনের দিনের অতিরঞ্জন ও অতিরিক্ত অভিব্যক্তিকে ত্যাগ করিয়া আজ যে সত্যকে গ্রহণ করিলাম, ইহাই জীবনের উপযোগী, জীবনের পক্ষে পরম প্রেরণা-পূর্ণ।" সেইদিন আসিবে,—যেদিন সাহিত্যিক তাঁহার সমাজবিরোধী প্রাণের নিগূঢ় আবেগকে সফল দেখিয়া সমাজেরই আশ্রয়ে ফিরিয়া

আসিবেন। ইত্যবসরে আমরা যেন বুঝিতে চেষ্টা করি যে, যিনি শিব, যিনি মঙ্গলময়, যিনি এই ভূর্ভুবঃস্বলোকের সঙ্গে প্রতিনিয়ত প্রতি নরনারীর বুদ্ধিবৃত্তিকে চালনা করিতেছেন, যাঁহার প্রশাসনে সূর্য্য এবং চন্দ্রমা, স্বর্গ এবং পৃথিবী বিধৃত রহিয়াছে, যাঁহার প্রশাসনে নিমেষ, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, অর্দ্ধ মাস, মাস, ঋতু, সম্বৎসর প্রভৃতি বিধৃত রহিয়াছে তাঁহারই অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাঁহারই অনির্দ্দেশ্য ইঙ্গিতে আজ সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত আন্দোলনের সঙ্গে আমাদেরও এই ক্ষুদ্র দেশের ক্ষুদ্র সাহিত্য এক নূতন পথে, নূতন সন্ধানে চলিয়াছে।*

—শ্রীপাঁচুগোপাল মিত্র।

সন্ধ্যা সাতটা........

যশোর রোডের ওপর দিয়ে গরুর গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছিল যজ্ঞেশ্বর।

ফাঁকা রাস্তা,...গাড়ীর তত ভিড় নেই। গলা ছেড়ে গাইছিল সে,—

'যা'রে বিদেশী বঁধু আমি তোরে চাই না'—

দু'-পাশে রেলের লাইন। বাতাস আসছিল হু' হু' ক'রে।.........যজ্ঞেশ্বরের তেড়ীটা এলোমেলো হ'য়ে যাচ্ছিল। লম্বা লম্বা চুল গুলো চোখে মুখে প'ড়ছিল বার, বার।...... গরু দুটোর ল্যাজ মলে দিয়ে বার কতক টক্ টক্ শব্দ ক'রে যজ্ঞেশ্বর গানের পরের চরণ ধ'রল,—

যখন তোরে খুঁজি আমি
তখন তোরে পাই না—

যা'রে বিদেশী বঁধু———

এই শালা পয়সা নিকালো,—লাল পাগ্ড়ীর ডাক শুনে যজ্ঞেশ্বরের গান বন্ধ হ'য়ে গেল। বিরক্তির সঙ্গে টেঁকে হাত দিয়ে দেখে সবই টাকা।.........

যজ্ঞেশ্বর জানালে—খুচ্রো পয়সা নেই, টাকা আছে। প্রজার রক্ষক উত্তর ক'রলে,—আচ্ছা দে, টাকার ভাঙানী দিচ্ছি।

যজ্ঞেশ্বর ভালই জানে ভাঙানী কেমন পাওয়া যাবে। এখনি হয়ত কত বাকী বকেয়া বেরিয়ে প'ড়বে।.........সে ব'ল্লে—কাল দোব।

চোখ দুটো রাঙিয়ে, রুল উঁচু ক'রে শান্তি রক্ষক এসে গরু দুটোর শিঙ্ ধ'রে হুকুম দিল গাড়ী ঘোরাতে। থানায় যেতে হবে। অনেক মিনতি ক'রতেও কোন ফল হ'ল না।.........মনে মনে গাল দিয়ে যজ্ঞেশ্বর গাড়ী ঘুরিয়ে ফেল্লে। থানায় তাকে যেতেই হবে! সে না কি বে-আইনী ক'রেছে!...........

ইংরেজের রাজত্ব!———

বে-আইনীর জো'টা নেই।........

গাড়ী খানা থানায় রেখে রাত প্রায় এগারোটার সময় বাড়ী এল যজ্ঞেশ্বর।.........গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান। এরকম অনেকবারই রাজবাড়ীতে গাড়ী রাখ্তে হ'য়েছে। ....বউ জিজ্ঞাসা ক'রলে—আজ আবার! বিড়িটা ধরিয়ে যজ্ঞেশ্বর ব'ল্লে—হ্যাঁ।.........

এত অত্যাচার,.........গরীব ব'লেই!.........

চোখ দুটো অকস্মাৎ সজল হ'য়ে এল।

বাইরে খাটিয়াটার উপর ব'সে সকলের সঙ্গে দুঃখের আলোচনাই ক'রতে লাগ্ল। কেউ ব'ল্লে, রাজার রাজ্যে বিচার নেই। কেউ ব'ল্লে, ওসব পাহারাওলাদের তাদের দরকার নেই। কোন কাজের নয় বেটারা, খালি পয়সা রোজগারের ফিকির। একজন ব'ল্লে, ওরা নিজের জাত হ'য়েও এমন করে। অপরজন উত্তর দেয়, ও যে পোষাকের

* শান্তিপুর সাহিত্য সম্মিলনীতে শ্রীমতী সরলা দেবীর সভাপতিত্বে পঠিত।

মাহাত্ম্য। ও "সাহেবী" পোষাক একবার গায়ে উঠ্‌লেই হ'ল। আর একজন বলে, রাজাও এসব দেখে না। যত দুঃখ, কষ্ট সহ্য ক'রতে হয় তাহাদিগকেই।.........পয়সাকে পয়সাও দেবে, আবার বিনাদোষে দণ্ডও পাবে।.........এই সব কথা কিছুক্ষণ চলে।.........গরীব বেচারারা।.........

খানিকক্ষণ সব চুপ থাকে। একজন একটা গজল ধরে, অপরজন তাল দেয়। আর সবাই শোনে।.........মেঘ-হীন আকাশে টুক্‌রো চাঁদ আপন মনেই হাসে। হীরে-মুক্তো ছড়িয়ে পড়ে।.........আলোর ধারায় ধুয়ে যায় সারা ভুবন। নিশীথ রাতের বাতাস আসে মন্দ গতি নিয়ে। বিজন দেশের ফুলের বাস হেথা সেথা ছড়ায়।......মনে নেশা জাগে।......

ঘুমিয়ে পড়ে অনেকেই।.........

যজ্ঞেশ্বরের বউ ডাকে, ওঠ...ওগো খাবে এস!......

খেয়ে নেয়।....

ঘরে গিয়ে শোয়।......

...পাত কুড়িয়ে খেয়ে বউ ঘরে আসে।

খুবই কাছে.........

একটু হাসে।

বিছানাটির কাছে আরও এগিয়ে যায়।......

যৌবনের জোয়ার প্রাণের ভেতর ডেকে ওঠে। কীসের নেশায় নেচে ওঠে সারা মন, প্রাণ।

যজ্ঞেশ্বর অপলক চোখে চেয়ে থাকে।......

বউ আবার হাসে।——

ভারী মিষ্টি।............

বুকে টেনে নেয়......অধরে অধর ছোঁয়ায়।......

বিরাট বুক খানার ওপর মাথাটা লুটিয়ে পড়ে।

রূপোর খাড়ু বাঁধা দিয়ে টাকা এনে দিল যজ্ঞেশ্বরের বউ।......তার শূন্য হাত দু'খানির পানে নীরব-নয়নে ব্যথা জাগিয়ে চেয়ে রইল যজ্ঞেশ্বর।......এই অযথা পীড়নের কথা ভাবতে গিয়ে রাগে কেঁপে উঠ্‌ল তার দেহখানা।.........উপায় নেই।.........

কত অসহায় তারা।........

গরীবের ব্যথা কেউ বোঝে না।.........

মুখ তুলে চায়ও না।......

......দুঃখে কেঁদে ফেল্‌লে বেচারী।

স্ত্রী এসে সান্ত্বনা দিলে—আবার হবে। কাঁদে কি? ছিঃ!—

......আদালতে জরিমানা হ'ল—পাঁচ টাকা।

যজ্ঞেশ্বরের হাজার আবেদন নিবেদনেও রায় বজায় রইল।......

সেই পাহারাওলাটা গোঁফে চাড়া দিয়ে একবার তার দিকে তাকালে।.........

এক পয়সার জন্য পাঁচ টাকা।.........

কিন্তু তখন যে ছিল না, তাই।......——

ভাবতে ভাবতে চ'লেছিল যজ্ঞেশ্বর।

গনেশ পালের তাড়িখানার পাশ দিয়ে পথ।

ভেতরে খুব গোলমাল চলছিল।

যজ্ঞেশ্বর একবার ট্যাঁকটায় হাত দিল......একটা টাকা তখনও আছে।......একবার ভাবে, না দরকার নেই।

......আজ তো রোজগার হয় নি মোটে খাবে কি?...

আবার ভাবে—খালি এক ভাঁড়.........

চঞ্চল চরণ এগিয়ে যায়।

ফিরতে চায়।.........

দোকানের ভেতর থেকে পরিচিত বন্ধুদের ডাক আসে।.........

আর ফেরা হয় না।.........

বউ ব'ল্‌ল একটা দানা নেই ঘরে, আর তুমি তাড়ি খেয়ে টাকাটা উড়িয়ে এলে!............

যজ্ঞেশ্বরের মেজাজ গরম হ'য়ে যায়। বলে তোর বাবার কি!.........বউ দু'একটা অনুযোগ করে।.........

যজ্ঞেশ্বর আর সইতে পারে না, তার ভেতর পৌরুষত্ব জেগে ওঠে।......দু'ঘা বসিয়ে দেয় বেশ ক'রে।......

সে খানিকটা কাঁদে।......চোখ মুছে কী ভাবে।......

তারপর থালা বাসন বা পায় নিয়ে বেরোয়।.........

দু'-চার আনা ধার ক'রতে।............

পেটের যোগাড় তো ক'রতে হবে!.........

—:◎:—

সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্

—শ্রীবিমলা দেবী।

কোন্‌রূপে তাঁর অর্চ্চনা করব!—দিনের আলোর সদ্ব্যবহার করতে পারিনে কেন? কে জানে? যত কিছু দুর্ব্বলতা আমাদের আছে তা দূর করছে ভগবান্। ইহলোকের ধর্ম্ম আমরা বুঝতে পারিনে—পরলোকে আমাদের স্পৃহা নেই। আমাদের সুন্দর কর—তোমার ঐ আকাশ আলোর মত সুন্দর। আমাদের পবিত্র কর, ঐ ধ্রুবলোকের গৈরিক পরিহিত জবাকুসুমসঙ্কাশের মত। আমরা জানি আমাদের দেহ অবিনাশী নয়, আমরা জানি তুমি আমাদের চারিদিকে সহস্র আঁখি মেলিয়া চেয়ে আছ। জাগিয়ে তোল তোমার কর্ম্মশক্তি আমাদের এই ক্ষীণ বাহুযুগলের মাঝে। সম্মুখে উত্তাল সিন্ধু—নীল ঢেউগুলি নিবিড় হয়ে কূলে এসে আছাড়িয়া মরিতেছে। জীবনের শত হাহাকারের মধ্যে সার্থকতা কোথায়? পুরাতনের মধ্যে তুমি চিরজীবন আমাদের কাছে ধরা পড়েছ। তুমি নারীর মত স্নেহশীলা, মায়ের মত শুচি না হলে শেফালি অত রূপ কেমন করে পেয়েছিল!

শিশির স্নাত হাঁসনাহানার গন্ধে বাতাস যখন মাতাল হয়ে উঠে, তখন এই জ্যোৎস্নাস্নিগ্ধ ধরণীর বুকে একটা স্বর্গের ছায়া এসে পড়ে। তোমার আকাশ বাতাস, জল ও আলোক আমার নিকট করুণায় ভরে উঠে। পুলকিতা রজনীতে হৃদয় আমাদের অভিসারে বাহির হয়।—পথে কণ্টক, মনে গোপন উল্লাস। দূর হতে—ঐ সুদূর আকাশের যবনিকা অন্তরাল হতে কে আমাদের কাণে কাণে বলে দেয়—"মাভৈঃ—ওগো যাত্রী।"

সুখের মধ্যে তোমার মঙ্গল মূর্ত্তি ফুটে ওঠে না, দারিদ্র্যের মধ্যেই তোমাকে চিনব। দুঃখেই যে আমার দেবতার আদর বাড়বে। সংসার কোলাহলের মধ্যে তোমাকে বুঝি, সে সামর্থ্য আমাদের কই? কিন্তু নিভৃত নিরালা ঘরের কোণে তোমারই স্নিগ্ধ মধুর হাসি ফুটে উঠতে দেখি। আজ হে রুদ্র দেবতা, তোমাকে আমি মন্দিরে খুঁজব না, ঐশ্বর্য্যের মধ্যে চাইব না—তোমাকে একান্ত নিজের করে মনের নিভৃত আবাসেই পেতে চাই! সফল হোক্ এ আশা, চূর্ণ হোক স্বার্থ। কাজে উৎসাহ দাও, ফলে নিরাকাঙ্ক্ষ কর।

"অসতো মাং সদ্গময়,
তমসো মাং জ্যোতির্গময়
মৃত্যো মাং অমৃতং গময়।"

—(:০:)—

সওদা

গড়ের মাঠের কবি সজনীকান্ত দাস রবীন্দ্রনাথকে এক পত্র লিখে ছাপিয়েছেন দেখা গেল। অধুনাতন বঙ্গসাহিত্য স্রোত দুর্ব্বার ও ফেনায়মান হয়ে উঠেছে যে গোটা 'কুড়ি বাইশ' সজনের কাঠি পুঁতে এ অদ্ভুত ভৈরব ভাববন্যাকে রোধ করা সম্ভবপর হচ্ছেনা। তাই কবিকুলগুরু রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করা হয়েছে এই তরঙ্গসঙ্কুল সুদূর বিস্তীর্ণ ভাবসিন্ধুর ওপর বালির বাঁধ নির্ম্মাণ করতে।

"আধুনিক সাহিত্য" রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়ে না। এ কি তাঁর অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা, ভীতি বা অনবসরজনিত অনিচ্ছা; —কে বলবে? তবে দৈবাৎ যেটুকু পড়ে তাতে কলমের খোঁচায় আব্রু ছিন্ন হয়েছে নাকি। হায়, খালি সেইটুকুই মহাকবির চোখে পড়ল? যেখানে কাব্যবধূ বা সাহিত্য-লক্ষ্মী দৃঢ়াবগুণ্ঠিতা ব্রীড়াবনতনেত্রা অসূর্য্যম্পশ্যা অন্তঃপুরিকা হয়ে খালি বর্ষাগমে শঙ্খধ্বনি করল ও বসন্ত বায়ুতে নিজের

বিরহব্যথাতপ্ত স্নিগ্ধ দীর্ঘশ্বাস ভাসাল,—তা বুঝি তাঁর চোখে পড়্‌ল না? তা একান্ত তাঁরই অনুকরণ বলে' বুঝি তিনি মৌনাবলম্বন কর্‌লেন? আর যেই আর তাঁকে অনুসরণ করা হ'ল না, বরং সৃষ্টির অনুসরণই করতে গিয়ে নবতন সৃষ্টির প্রেরণায় নব নব পথ আবিষ্কার করা হ'ল,—অমনিই সমস্ত কিছু বে-আব্রু কলুষদুষ্ট ও 'ল্যাঙট-পরা' হয়ে গেল? (শব্দপ্রয়োজনটা মোটেই কবিজনসম্মত হয় নি।) হয়ত "আধুনিক সাহিত্যের" যেখানটাই তথাকথিত দুর্নীতি দুষ্ট, সেখানটাই তাঁর ভক্ত পার্শ্বচর ও শিষ্যমণ্ডলী তাঁর নয়নগোচর করে' থাক্‌বেন। "আধুনিক সাহিত্যের" সঙ্গে যদি তিনি রোষকষায়িতনেত্র সমালোচকের মত নয়, সমসুখদুঃখভাগী সহানুভাবী বন্ধু ও আত্মীয়ের মত পরিচিত হতেন ত' এমন ব্যাপক-ভাবে তাঁর পরবর্ত্তী সাহিত্যকে এমন অসংলগ্ন ভাষাপ্রয়োগে নিন্দিত কর্‌তে পার্‌তেন না। আর যা দৈবাৎ চোখে পড়ে, তার সম্বন্ধে এমন একটা ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ অপবাদ দেওয়ার মধ্যে কোনই সার্থকতা নেই।

যারা রবীন্দ্রনাথকে নকল করে' না পার্‌ল একটা জীবন্ত গল্প ফাঁদ্‌তে, না বা পার্‌ল সত্যিকারের একটা কবিতা রচনা কর্‌তে,—যেমন ধরা যাক্ এসাইলাম্ লেনের সজনী দাস,—তারাই সস্তায় কিস্তি মেরে নাম কর্‌বার লোভে বাংলা সাহিত্যের "আগাছা" নির্ম্মূল করবার জন্ম কোমর বেঁধেছেন। শেষকালে পরাভূত হয়ে প্রবলপক্ষ রবীন্দ্রনাথের দরবারে কেঁদে নালিশ করেছেন,—আর রবীন্দ্রনাথ অমনিই বিচলিত বোধ করে' ঘোষণা করে' দিলেন যে, "আধুনিক সাহিত্য" ল্যাঙট্ পরা, গুলি-পাকানো সাহিত্য! কী উচ্চাঙ্গের উপমা!

শুধু রবীন্দ্রনাথের কাছে আবেদন করেই তিনি তৃপ্তি পাননি, তিনি তাঁরই একদার শ্রদ্ধাভাজন শ্রীমোহিতলাল মজুমদারকে নিয়ে শরৎচন্দ্রের কাছেও নালিশ করতে গিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে যে সব উক্তি করেছেন বলে' প্রকাশ, যতক্ষণ না শরৎবাবু নিজে সাধারণের সমক্ষে তা ব্যক্ত কর্‌ছেন ততক্ষণ তা বিশ্বাস করবার কোনই হেতু নেই। কেননা এর মধ্যেই শোনা যাচ্ছে যে 'শনিবারের চিঠিতে' শরৎবাবুর মন্তব্য বলে' যা ঘোষিত হয়েছে ওঁর সত্যিকারের মত তার থেকে ঢের আলাদা।

শরৎচন্দ্র তরুণ সাহিত্যিকদের "শিক্ষাদীক্ষাহীন অর্ব্বাচীন"-আখ্যায় কলঙ্কিত করেছেন বলে' প্রকাশ। যে সব তরুণ, কলাসরস্বতীর পূজামণ্ডপে ভক্তি-অর্ঘ্য নিয়ে প্রণতশিরে এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের বিদ্যাবুদ্ধি "প্রবাসী"-কর্ম্মচারীর অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে, এ কথাও হয়ত শরৎচন্দ্র বলে' থাক্‌বেন,—হয়ত ভুলে তা 'শনিবারের চিঠিতে' ছাপা হয়নি।

শরৎচন্দ্র নাকি রেঙ্গুনের গোটা লাইব্রেরির সমস্ত ইংরিজি ও বাংলা বই পড়ে' ফেলেছিলেন,—সে লাইব্রেরিতে কত বই ছিল তা অবশ্যি সজনীকান্ত বলে' দেন নি। পরোক্ষে এটাই ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে অত বিদ্যাবত্তা ছিল বলে'ই শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সাধনা সার্থক হতে পেরেছে। আমাদের পাড়ার এক ভদ্রলোক কয়েক মাসের মধ্যেই গোটা রামমোহন লাইব্রেরিটা মুখস্ত করে' ফেলেছে,—সে শীঘ্রই ধাপার মাঠে বসে' "অসভ্যতা" সম্বন্ধে কবিতা লিখ্‌বে! সবাই অবহিত হোন্।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে সজনীকান্তের ত' খুব গদ্‌গদ ভাব দেখা যাচ্ছে,—কিন্তু "আমিনাবিবির আত্মকথা"-রচয়িতা যতীন্দ্র সিংহ মহাশয়ের কি মত? কোনো জঘন্য দৃশ্য বর্ণনা করে' পরে "লজ্জায় শিহরিয়া উঠিতেছে",—এটুকু লিখ্‌লেই কি সজনীকান্তের মতে যথেষ্ট হ'ল? আর সিংহ মহাশয়ের মতে? এই ভুঁইফোঁড় সমালোচকের দল আগাছার মত এখানে ওখানে গজাচ্ছে,—চোরকাঁটার দল, ঝিঁঝিঁপোকার দল,—পরে আবার প্রবল বন্যাপ্লাবনে ছারেখারে যাচ্ছে।

সজনীকান্ত বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদ্বয়ের তথাকথিত অভিমত বাংলার পাঠক সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থাপিত করে' নিবেদন কর্‌ছেন, এ সাহিত্য যাতে সমূলে বিনষ্ট হয় তারই জন্য সে সচেষ্ট হোক। সজনীকান্ত ভুলে যাচ্ছেন এই পাঠক সমাজই একদিন ঘরে বাইরেও 'বয়কট্' করেছিল, "প্রতি অঙ্গ লাগি মোর প্রতি অঙ্গ কাঁদে" শুনে বই পুড়িয়ে ফেলেছিল, নষ্টনীড়ের নষ্টামিতে মূর্চ্ছিত হয়েছিল। কিন্তু তবুও

ঘরে বাইরে যে অত্যুৎকৃষ্ট সাহিত্য সম্পদ সে বিষয়ে আজকালকার কারুরই ত' কণামাত্র সন্দেহ নেই।

অপক্ষপাত পাঠক ও বিদ্বেষদুষ্ট সমালোচক এক মতাবলম্বী নয়। তবে পাঠ না করে' সমালোচক,—অনেককেই চোখে পড়ে আজকাল। পরিশেষে সজনীকান্ত বলছেন যে তাঁরই মত একচক্ষু হরিণ আরও 'কুড়ি বাইশ' জন আছেন। তাঁরা সবাই বাংলা সাহিত্যের "প্রবাসী" কিনা কে জানে? সে দলের পাণ্ডা নিশ্চয়ই লোহিতগাল সেরেস্তাদার। নয় কি?

সজনীকান্ত আধুনিক "অসৎ" সাহিত্যের দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি কবিতা রবীন্দ্রনাথের দরবারে পেশ্ করেছেন। তাদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অভিমত কি, তা এখনো জানা যায় নি। কিন্তু একটা প্রশ্ন করা যেতে পারে, সজনীকান্তের শিরোমণি মোহিতলালের একটি কবিতাও কি তুল্য সমালোচনার তৌলদণ্ডে "অশ্লীল" বলে' প্রতিপন্ন হবে না? "কটিতলে জন্ম-রাজধানী," আমারও খেলেনা আছে প্রেয়সীর সুচারু চুচুক," "নিশি নিশি গণিকাভবনে দুয়ার ঠেলিত এক পুরুষ প্রবর," "দেখি ওই অনাবৃত দেহের শ্মশানে প্রতি ঠাঁই আছে কোন কামনার সদ্য বলিদান," "নারী স্তোত্র" ইত্যাদি কিসের নমুনা? এ-সব নিশ্চয়ই শ্লীলতার নিদর্শন, কেননা এর কথক যে সজনীকান্তেরই শ্রদ্ধাভাজন কবি মোহিতলাল।

আচ্ছা, বহুদিন পূর্ব্বে প্রবাসীতে এক "শ্রদ্ধাভাজন" কবিকে ব্যঙ্গ করে' "আমি ও তুমি" নামে একটা নোংরা রচনা বেরিয়েছিল। সে কবি পুঙ্গবটি কে? লেখকই বা কোন ধুরন্ধর?

"বিস্মরণীর" প্রকাশক কে? "নারীস্তোত্র" "পান্থ" প্রভৃতি কবিতার ত' "শ্লীলতার" পরাকাষ্ঠা,—তবু প্রবাসীতে তা ছাপ্‌তে দেওয়া হল না কেন? "শনিবারের চিঠিতে "প্রাপ্ত পত্রের" লেখকের নজ্‌রুল ইস্‌লামের ওপর এই বিজাতীয় ক্রোধ কেন? নজ্‌রুলকে গালিগালি করতে গিয়ে তিনি পুনঃপুনঃ মোহিতলালের পক্ষ সমর্থন করছেন কেন? এর কি হেতু? লেখক খোদ্ মোহিতলালই নন্ তো? নইলে, তাঁর আকাশটা ঝাঁঝরের মত ঝিমিকি বাজে কিনা—একথা এত ব্যস্তসমস্ত হয়ে কে আর পুনরুল্লেখ করতে পারত!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ও শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায় দুজনেই নিশ্চয়ই খুব উঁচু দরের কবি। কেননা তাঁদের একাধিক কবিতাই কাব্যদীপালিতে স্থান পেয়েছে।

এ বল্‌ছে আমায় ছাখ; ও বল্‌ছে আমার দিকে ফিরে চা'। হেমেন্দ্রকুমার লিখেছেন—

বুক-পুকুরে হাঁপিয়ে ওঠা,
নিটোল দুটি সোণার লোটা।

হেমেন্দ্রকুমারের কবিতার নাচওয়ালী নিশ্চয়ই মাড়োয়ারী। তাঁর কবিতায় বদ্‌না বদনো বাল্‌তি গাম্‌লা কবে হাঁপাবে? হেমেন্দ্রলাল লিখেছেন—

দেহ চায় দেহটারে
কে না জানে বল্!

তার পরের লাইনটা এম্‌নি করে মেলানো যায়—

দড়ি ও কল্‌সী নিয়ে
পুকুরেতে চল্।

—:০:—

সাময়িকী

পরকে গাল দিয়ে নিজে বড় হওয়া যায় কি না জানি না!

মিস্ মেয়ো কিন্তু বাংলার বিধবা মেয়েদের নামে অযথা কুৎসা রটিয়ে প্রসিদ্ধ লাভ করেছেন খুব। জগৎ শুদ্ধ লোকই তাঁকে আজ চিনে ফেলেছে!

লিখেছেন তিনি, বাংলার বিধবা মেয়েরা সতী নয়! আর—ভারতের সনাতন বন্ধু ষ্টেটশ্‌ম্যান সে কথা শুনেই ভারতেরই হিতার্থে Gratis advice দিতে এগিয়ে এসেছেন!

মনে করেছেন মুমূর্ষু দেশবাসী প্রতিবাদ না করেই ও পদাঘাতটা হজম করে ফেলবে!

কেঁচো খুড়তে গিয়ে একবার বুঝি সাপই বা বের হয় তার বদলে। অযথা এই ঘৃণিত ও মিথ্যা উক্তির প্রতিফলে Statesman ও মিস্ মেয়োকে অনেক কিছুই সইতে হবে!

* * * * * *

পার্সি ব্রাউন সাহেবের যায়গায় এবার সরকারী কলা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হবেন শুনছি শ্রীযুত অসিত হালদার। কথাটা সত্যি ত?

* * * * * *

মদ আর তাড়িতে দেশ উৎসন্ন যেতে বসেছে। মহাত্মা গান্ধী সম্প্রতি এক মত্তনিবারিণী সভায় বলছিলেন—দেশের লোক যত শিক্ষিত এবং ধনী হচ্ছে ততই চরিত্রের দিক দিয়ে তারা শিথিল হয়ে পড়েছে। এটা কি পাশ্চাত্য শিক্ষার কুফল? মহাত্মাজী বলেন—দেশের সকলেই যদি চিরদরিদ্র হয়েও কোন রকম বেঁচে থাকে, এবং একবর্ণও লেখাপড়া না শেখে তাও বরং সহ্য যায় তবু এই মদ খাওয়া এবং চরিত্র হারানের মত অপরাধ মার্জ্জনা করতে পারি না!

দেশের বুক থেকে মদ আর তাড়ি তাড়াবার উপায় নেই কি কিছুই?

* * * * * *

বাংলার অনেক গুলা গাঙই হেজে মজে গিয়েছে। বেশী দিনের কথা নয়, বসন্ত রায় প্রতাপাদিত্যের সময়ও কালীঘাটের গঙ্গায় জাহাজ চলাচল করতে পারত। আজকের এই দুরবস্থার কারণ জানেন কি?

ভাগীরথী আর পদ্মা শত মুখী হয়ে সাগরে গিয়ে পড়ত। মোহানার মুখে সুন্দরবন—জঙ্গল হয়েই পড়ে ছিল। আজ কাল সেখানে চাষের খাতিরে ওদের সব মুখ গুলাই বেঁধে দিচ্ছে। ফলে নদীর স্রোত একেবারেই কমে গেছে। বছর কতক আবাদে ভাল রকমই চাষ হবে সত্যি, কিন্তু বাকী দেশটা চিরদিনের জন্য ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলিছে। সহরের ময়লা বয়ে নিয়ে যাবার জন্ত ড্রেনের প্রচলন আছে, সারা দেশের আবর্জ্জনা ধুয়ে নিয়ে যাবার জন্য তেমনি স্বাভাবিক, ভগবানের সৃষ্ট ড্রেন হচ্ছে এই নদী গুলা। নদী মজার ফলে, অজন্মা দুর্ভিক্ষ মহামারী ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌বে।

গঙ্গা মজে যায় যাক, আবাদের জমিদারেরা সোনা লুটছেন ত!

* * * *

রেল কোম্পানীরাও খরচ বাঁচাবার জন্ত অনেক সময় ছোটখাট নদী পেলেই মাটী দিয়ে বুজিয়ে অথবা পোল বেঁধে লাইন পেতে চলেছেন। এতেও তাদের স্রোত অবাধে বইতে পারে না। সব নদীর মুখ যদি খোলা থাকতে পেত, আজ উড়িষ্যায়, কাল উত্তর বাংলায়, পরশু বর্দ্ধমানে বান জাগতে পারত না!

এক একটা নদী বাঁধে, আর জননী জন্মভূমির পায়ে নূতন করে শৃঙ্খলের ঝঞ্ঝনা বেজে ওঠে!

জাতীয় চেতনা আমাদের জাগবে না ত!

* * * *

বোম্বাই থেকে বেরিয়েছিলেন ছজন যুবক, সে আজ বছর চারেকের কথা হল! তাঁদের মধ্যে তিনজনে সাইকেলে চড়ে জগতের সব দেশে ঘুরে এখন কলিকাতায় এসে পৌছেছেন। দিন দশেক বিশ্রাম নিয়ে তাঁরা এখান থেকে নিজের দেশে ফিরে যাবেন। এ পর্য্যন্ত তাঁরা ৪০০০০ মাইল উত্তীর্ণ হয়েছেন! এই আশ্চর্য্য সহিষ্ণু শক্তিমান ছেলে তিনটীর নাম বাপ্‌শোলা, হাকিম, আর ভুমগারা।

পুস্তক-পরিচয়

কহ্লার—কবিতা পুস্তক, মূল্য ৷৵০ আনা।

লেখক—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত।

কবি আজ বাঙলার ঘরে ঘরে। কিন্তু কবিতায় প্রাণ মুগ্ধ করিতে পারে এমন কবি কয়জন! কহ্লারে আমরা সেই সুন্দর মাধুর্য্যের আস্বাদ পাইয়াছি যা পাঠকের মনে স্থায়ী আনন্দ সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা রাখে। ছন্দকুশল এই কবির প্রতি কবিতায় যে মধু ক্ষরিয়া পড়িয়াছে, নিঃসংশয়ে বলিতে পারি তাহাতে ত্রুটি ধরিবার কিছু নাই ;—সুরুচি সঙ্গত তৃপ্তি ও সান্ত্বনায় ভরা।

কবিতাপরিপ্লাবিত দেশে এমনি কাব্যের সমাদর হইতে দেখিলে বুঝিব বাঙলার পাঠক ঝুটা হইতে সাচ্চা বাছিয়া লইতে শিখিয়াছে, বাঙালীর বিষণ্ণ জীবনে সুখ সঞ্চারের সম্ভাবনা হইয়াছে।

বধূর অবগুণ্ঠন, পৌষের অবেলায় স্নেহের আকর্ষণ, সন্ধ্যার আশা, নোলক প্রভৃতি কবিতা অপূর্ব্ব।

ত্রুটী স্বীকার ;

তাড়াতাড়ি ও সামান্য অসাবধানতার জন্য এই সংখ্যায় গোটাকয়েক ভুল থাকিয়া গিয়াছে। সেজন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত। পাঠকগণ দয়া করিয়া সেগুলি সংশোধন করিয়া পড়িবেন।

পাতা		পংক্তি		ভুল		শুদ্ধ	
৩ এর পাতায়		পংক্তিতে		"বিশ্বভারতীর অনুমত্যানুসারে" স্থলে বিশ্বভারতীর অনুমত্যনুসারে হইবে।			
” ” ”		২	” ”	"আটকোটী-$(x+y)$"	”	"আটকোটী $-(x+y)$"	”
” ” ”		৩	” ”	"পদ্মাবাণী বিতন্ত্রবীণা"	”	"পদ্ম। বাণী বিতন্ত্রবীণা"	”
১৯	” ”	১১	” ”	"তরুলতকীর্ণ-বন-বর্হিকুল"	”	"তরু-লতাকীর্ণ-বন বর্হি-করি-কুল	”
২০	” ”	১১	” ”	শক্তি ও করির ইকার উঠে নাই।			
২০	” ”	১৪	” ”	"তিগৃহ"	”	"প্রতিগৃহ"	”
৩০	” ”	১৩	” ”	"আজানাদের"	”	অজানাদের	”
৪০	” ”	৬	” ”	"নিরুপেক্ষ"	”	নিরপেক্ষ	”

—সম্পাদক।

Printed & published by Sj. Suren Bhattacharya from the Bela Printing Works,
14, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta.

দুটী প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়

১। লীগুসে এণ্ড কোং— ৩৩।২ বেণেসরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২। হাওড়া হোমিও হল ৪নং তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া।

চিকিৎসা করিতে হইলে ঔষধ সকল বিশুদ্ধ ও অকৃত্রিম হওয়া আবশ্যক, আজ কাল প্রায় অনেক জায়গায় বিশুদ্ধ ঔষধ পাওয়া যায় না। মফঃস্বলের চিকিৎসকগণ প্রায়ই বিশুদ্ধ ঔষধ পান না। বিশুদ্ধ ঔষধ না পাওয়ায় তাঁহাদিগকে চিকিৎসায় অনেক সময় অকৃতকার্য্য হইতে হয়। এই অভাব দূরীকরনার্থ আমরা বহু পরিশ্রম, যত্ন ও অর্থ ব্যয় করিয়া আমেরিকার বোরিক এণ্ড টেফেল্ নামক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুপ্রসিদ্ধ ঔষধালয় হইতে ঔষধ আনাইয়া সুদক্ষ লোকের দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া মফঃস্বলের অর্ডার সরবরাহ করিতেছি। আমাদের কোম্পানির ম্যানেজার বাবু হোমিওপ্যাথ গোল্ড মেডালিষ্ট একজন সুদক্ষ চিকিৎসক। তিনি নিজেই ঔষধ প্রস্তুত ও সরবরাহের সময় তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। মফঃস্বলের অর্ডার পাইবামাত্র আমরা অতি যত্নের সহিত সরবরাহ করি। ড্রাম /১৫, ৵০।

উক্ত দুইটী ডাক্তারখানায় আর একটী বিশেষত্ব—

উক্ত দুই কোম্পানীর মালিকগণ বিশেষ চেষ্টায় কলিকাতার একজন সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের সাময়িক উপস্থিতি লাভে সফল হইয়াছেন তাঁহার নাম ডাঃ জে, এন, ব্যানার্জী (যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী) এল্ এম্ এস্ ইহার বিশেষ পরিচয় আবশ্যক নাই, ইনি মেডিক্যাল কলেজের পাশ এবং ২৫ বৎসরের অভিজ্ঞ হাওড়ায় রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ বৈকালে ৬—৭টা পর্য্যন্ত এবং রবিবার প্রাতে ১০—১১টা পর্য্যন্ত রোগীগণকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দেন।

ইঁহার কলিকাতার বাটীর ঠিকানা, ১৮নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, টেলিফোন ২৭৪৯ বড়বাজার। হাওড়ার টেলিফোন ১৭১ হাওড়া।

পরিচালক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীপ্রণবদেব মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক—শ্রীরেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

বিষয় সূচী

বিষয় সূচী

বিষয় সূচী

ধূপছায়ার নিয়মাবলী।

মূল্য—

ধূপছায়ার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩৸৹ ও ষাণ্মাষিক ১৸৹, প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৹ আনা। নমুনার মূল্যও ।৹ আনা। বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ধূপছায়ার বৎসর গণনা করা হয়। মূল্যাদি কার্য্যাধক্ষের নামে পাঠাইতে হয়। ভিঃ পিঃতে কাগজ পাঠাইতে অনেক অসুবিধা সুতরাং আগে মণিঅর্ডারে টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হইলে, আমাদের ও গ্রাহকদের সকলেরই সুবিধা।

অপ্রাপ্ত সংখ্যা—

ধূপছায়া প্রতি বাংলামাসের ১লা প্রকাশিত হয়। সুতরাং কোন মাসের কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া ডাক বিভাগের উত্তরসহ সেই মাসের ১০ই তারিখের মধ্যে আমাদের নিকট অপ্রাপ্তি সংবাদ পৌছান আবশ্যক।

পত্রোত্তর—

রিপ্লাই কার্ড বা ডাকটিকিট না পাঠাইলে কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব নয়।

রচনা—

সকল রচনা সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। টিকিট দেওয়া থাকিলে অমনোনীত রচনা গল্প কবিতা ফেরৎ দেওয়া হয়। রচনা কেন অমনোনীত হইল তৎসম্বন্ধে সম্পাদক কোনও উত্তর দিতে অসমর্থ। ফেরৎ রচনাদি লেখকদিগের নিকট পৌছান সম্বন্ধে আমরা দায়ী নহি। কাগজের এক পৃষ্ঠায় মার্জ্জিন দিয়া ফাঁক ফাঁক করিয়া পরিষ্কার অক্ষরে রচনা না পাঠাইলে প্রকাশিত না হইবারই বেশী সম্ভাবনা।

বিজ্ঞাপন—

কোনও মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বের মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হয়। বিজ্ঞাপন বন্ধ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ব্লক ফেরৎ লইবেন। ব্লক কোন প্রকারে ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই, যদিও ব্লক যাহাতে না ভাঙ্গে সে সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন লওয়া হইয়া থাকে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিজ্ঞাপনে হার নিম্নে দিলাম।

নিবেদক—কার্য্যাধক্ষ—ধূপছায়া।
কার্য্যালয়—১৪নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আশ্বিন মাস হইতে "ধূপছায়া"র কলেবর বৃদ্ধি হওয়াতে বিজ্ঞাপনের হারের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিল।

বিজ্ঞাপনের হার।

প্রথম কভারের অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	...	...	৩০৲ টাকা
দ্বিতীয় ,, পূর্ণ ,,	...	...	৩০৲ টাকা
,, ,, অর্দ্ধ ,,	...	...	১৬৲ টাকা
তৃতীয় ,, পূর্ণ ,,	...	...	৩০৲ টাকা
,, ,, অর্দ্ধ ,,	...	...	১৬৲ টাকা
চতুর্থ ,, পূর্ণ ,,	...	...	৫০৲ টাকা
সাধারণ ,, পূর্ণ ,,	...	...	১৫৲ টাকা
সাধারণ ,, অর্দ্ধ ,,	...	...	৮৲ টাকা
,, ,, সিকি ,,	...	...	৫৲ টাকা
সূচীর নীচে অর্দ্ধ ,,	...	...	১০৲ টাকা
,, ,, সিকি ,,	...	...	৬৲ টাকা
টাইটেল পৃষ্ঠার সম্মুখের পৃষ্ঠা	...		১৬৲ টাকা
আরম্ভের সম্মুখের পৃষ্ঠা	...	...	১৬৲ টাকা

নিবেদক—
কার্য্যাধক্ষ—ধূপছায়া।

(মাসিক সাহিত্য পত্রিকা)

প্রথম বর্ষ, ২য় সংখ্যা ২য় খণ্ড

কার্ত্তিক, ১৩৩৪ সাল

সম্পাদক

শ্রীরেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

পরিচালক

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীপ্রণবদেব মুখোপাধ্যায়।

ধূপছায়া কার্যালয়

১৪নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রসাধন

মিঃ এ, ঘোষের সৌজন্যে

Bela P. W.

কার্ত্তিক ১৩৩৪।

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

প্রথম পত্র

শান্তি-নিকেতন
১১ই ফাল্গুন, ১৩৩৩

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি পেয়ে খুসি হলুম, বুঝলুম আমার পরে তোমার দরদ আছে।

দেশের লোকের কাছে পাওনা চুকিয়ে পেয়েছি কিনা সে আলোচনা করবার দিন ফুরিয়েচে।

বয়স ৬৬ বছর পার হ'ল। নগদ মজুরির জমা খরচের খাতা এখন বন্ধ করবার বেলা। ভাষা ও সাহিত্যের দরবারে বহুকাল হাজিরা দিয়েছি—সাধ্যমত যা করতে পেরেছি তা করেচি, আরো করতে পারলে আরো ভাল হ'ত সে কথা বলা বাহুল্য। সকলকে সমান খুসি করতে পারিনি, সে জন্তে যদি আক্ষেপ করতে হয় তাহলে আক্ষেপের আসর সরগরম হয়ে ওঠে—পালা গাইবার মজলিসে বিশ্ব ঝেঁটিয়ে দোহার জোটে। এও জানি—মুখের সামনে যাঁরা আমাকে বকশিস দিতে আসেন, পেছনে তাঁদের অনেকে তার থেকে বারো আনা কেটে রাখেন। তবু বিধাতার বিরুদ্ধে আমার নালিস করবার মুখ নেই—তিনি দিয়েছেন বিস্তর।

এর পরেও যদি আমি কাঙালপনা করি তবে সেটা নির্লজ্জতা হয়। আমার চেয়ে বড় লেখক যদি আমার দেশে দেখা দিয়ে থাকে তবে আমার গৌরবের কথা এই যে আমি তাদের পথ কেটে দিয়েছি। ঝরণা যেন নদীকে ঈর্ষা না করে,—কেন না নদীতে তারই সফলতা।

আমার দেশে আমার চেয়ে বড় আসুন—এই যেন আমি মনের সঙ্গে প্রার্থনা করতে পারি। অন্তকে খর্ব্ব করে যারা সুখ পায় তাদের দলে যেন ভুলেও আমার স্থান না হয়।

* * * *

মুকুলে হেমেন্দ্রকুমারের নাটিকা পড়ে খুসী হয়েচি। পূর্ব্বেও লক্ষ্য করে দেখেচি তাঁর কলমে প্রাণ আছে, রস আছে, ঐশ্বর্য্য আছে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিতীয় পত্র *

জোড়াসাঁকো
সোমবার

কল্যাণীয়েষু

তোমার শরৎ দাদার মনস্তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে আমি কোনো সংশয় প্রকাশ করতে সাহস করি নে। যদি কাউকে অপরাধী করতে হয় তো আমার জন্মনক্ষত্রকে। নিন্দা যখন আমার কপালে আছে তখন তোমার শরৎ দাদার মানব-চরিত্রজ্ঞান যতই থাক্ আমার সম্বন্ধে গলদ না করে তিনি থাকতে পারবেন না। অতএব তাঁকে আমি ক্ষমা করলুম্।

* * আমার কন্যার পীড়ার সংবাদ পেয়ে আমাকে কলকাতায় আসতে হয়েচে। শীঘ্রই পালাবার মতলবে আছি। ইতি—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নূতনের আবাহন

—শ্রীগিরিজাকুমার বসু

তোমার পায়ের সুরে
আনন্দিত এই পুরে
জাগে যেই প্রণয়-ঝঙ্কার—
তারি মাঝে বাজে কাণে
কুসুমের বাণে বাণে
অতনুর ধনুর টঙ্কার!
কোন্ বশীকরণের
ওই কালো নয়নের
বহে তারা, ধারা মাধুরীর
গলে যে সোহাগ-হার
পরাগে পরাগে তার
ইন্দ্রজাল হৃদয়-চুরীর।

উপরোক্ত পত্র দুখানি শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু মহাশয়কে লিখিত।

* দ্বিতীয় পত্রখানিতে যে মনস্তত্ত্বের উল্লেখ আছে তা কোনো সাহিত্য ব্যাপার সম্বন্ধে নয়, ব্যক্তিগত মান-অভিমানের দিক দিয়েই লেখা হ'য়েছে।——সম্পাদক

যে বিজিত বাঞ্ছিতের
ও চরণ অলক্তের
　　রাঙা রেখা করে হিয়া আলো—
স্ফুট প্রাণপদ্মে তার
মরমের প্রেম সার
　　অধরের উৎস-মুখে ঢালো।
গেহ, স্নেহ, দেহ তার
সকলের অধিকার
　　লহ লিখি অনুরাগ-রসে,
কোথা তুমি ছিলে বসি'
বল্লভেরে নিলে কষি'
　　যৌবনের কনক-নিকষে।

চির বসন্তের বাণী,
এস তুমি ওগো রাণী
　　স্বরগের আভাষের সম!
এস মঞ্জু শ্রীটি তার,
বহি' মকরন্দ-ভার
　　অনবদ্য, ধ্রুব, অনুপম!
ব্যগ্র বক্ষে, দীপ্ত মনে
তব শুভ আবাহনে
　　আকাঙ্ক্ষিত আছি দাঁড়াইয়া,
হে শোভনে, হে নূতন
দাও প্রীতি-আলিঙ্গন
　　বাহুবন্ধ দাও বাড়াইয়া।

"সাহিত্যধর্ম্ম" সম্বন্ধে দু'এক কথা

—অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন

বৈশাখের 'ধূপছায়া'তে আমি 'সাহিত্যের দান' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখি প্রারম্ভে তাহার সমাপ্তি ঘটে। স্থানাভাববশতঃ অতি সংক্ষেপে প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের স্বরূপ ঈষৎ উদ্‌ঘাটন করিতে তাহাতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম।

শ্রাবণের 'বিচিত্রা'তে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের ধর্ম্ম' প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহা লইয়া মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছে। ডাঃ নরেশচন্দ্র প্রমুখ লেখকগণ কবিকে অনুযোগ করিতেছেন।

কবি তাঁহার পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা লইয়া নির্ভীকচিত্তে যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার পূর্ব্বগভিমতের বিরোধী হইলেও, তাহাতে আমাদের বিস্মিত ও বিচলিত হইবার কোন কারণ দেখি না। মানুষ অভ্রান্ত নয়, পূর্ব্বধারণা ভ্রান্ত জানিলে তাহা অকুণ্ঠভাবে জ্ঞাপন করা ঔদার্য্য ও বীরত্বের ধর্ম্ম। তাহাতে আক্ষেপের বিষয় কি আছে?

আধুনিক সাহিত্যে 'বে-আব্রুতার' কথা লইয়াই যত বিপদ ও ববাদ। আব্রু বা বে-আব্রুর আদর্শটা লেখকের মনে। হিন্দু যাহাকে আব্রু মনে করে, মুষলমানের কাছে তাহা বে-আব্রু। আবার স্বাধীন তুর্কীও নাকি এখন তাহাদের স্বজাতীয়দের কাছে বে-আব্রু বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

সাহিত্যের বে-আব্রুটা কিরূপ? সমাজকে লইয়াই ত সাহিত্য; যিনি যে সমাজের অন্তর্ভুক্ত তিনি সেই সমাজের ছবি জ্ঞাতসারেই হোক্ বা অজ্ঞাতসারেই হোক, গ্রন্থাদিতে অঙ্কিত করিয়া থাকেন। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, হিন্দু সমাজেও এই পরিবর্ত্তন চিরকাল হইয়া আসিয়াছে ও এখনও হইতেছে। সমাজের উপর সময় সময় ব্যক্তির প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মতবাদের, নীতিসূত্রের ও আচার ব্যবহারাদির ও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সাহিত্য বিষয়েও এইরূপ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। ধর্ম্মবাদের পরিবর্ত্তনের সহিত সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোনস্থলেই বে-আব্রুতার লক্ষণ বিদ্যমান নাই; শীলতার অভাব তাহাতে কোথায়ও পরিলক্ষিত হয় না। এখনই বা কিরূপে এই বে-আব্রুতা আসিল?

ঈশ্বর গুপ্ত খাঁটি বাঙ্গালী কবি ছিলেন। তদ্ভিন্ন অন্যান্য খ্যাতনামা লেখকেরা প্রায় বিদেশীভাবে অনুপ্রাণিত। মাইকেল মধুসূদন দত্ত খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিতই ছিলেন কিন্তু তিনি গ্রন্থাদিতে প্রায় সংস্কৃতবহুল শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন, ভাবও যথাসাধ্য দেশীয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যেখানে বজ্র বা অশনি বলিলে চলিত, সেখানে অভিধান হইতে বাছিয়া বাছিয়া "দম্ভোলি, ইরম্মদ" প্রভৃতি অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, গ্রন্থের চিত্রগুলিও এখানকার মত করিয়া আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন, যদিও মধ্যে মধ্যে তাহা বৈদেশিক প্রভাব বশতঃ অন্যরূপ হইয়াছে। হেমচন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য লেখকগণের সম্বন্ধেও এই উক্তি প্রযুজ্য। দু'দশটা বিদেশীয় কথা বা ভাব বঙ্গসাহিত্যে প্রবেশ করিলে বিশেষ আশঙ্কার কারণ নাই। ভয় এখানে নহে, অন্যস্থলে।

আধুনিক সাহিত্যেও সংস্কৃতবহুল শব্দের প্রয়োগ প্রায় দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বলেখকদিগের যেমন দেশীয়ভাবে স্বদেশের অনুকূল করিয়া চিত্রাঙ্কনচেষ্টা ছিল, আধুনিকদিগের লেখাতে তেমনটী দেখা যায়না; তাহারা সাহিত্যে পূর্ণমাত্রায় বিদেশীয় ভাব পুরিয়া দিতে যত্নবান।

বিদেশীয় সভ্যতা যেরূপ দ্রুতগতিতে আমাদের আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে, তাহাতে আমাদের বৈশিষ্ট্য হারাইবার ভয় দেখা দিয়াছে। আহারে বিহারে আচারে বিচারে, বসনে ভূষণে, পোষাকে পরিচ্ছদে, কথা বার্ত্তায় ক্রমেই আমরা বিদেশীয় হইয়া উঠিতেছি। এখন সাহিত্যেও যদি আমরা

জাতীয়তা হারাইতে বসি, ভাবে চিন্তাতে কল্পনাতেও যদি আমারা বিদেশীয় হইয়া উঠি, তবে তাহা একটু ভয়ের বিষয় নহে ? এটা সমষ্টির উপর ব্যষ্টির প্রাধান্যের কথা নহে, ইহা হইতেছে আমাদের 'বাঙ্গালী'ত্ব লইয়া টানাটানি বাঙ্গালী জাতি নিজের বিশিষ্টতা ও মৌলিকতা হারাইয়া পাশ্চাত্য জাতির ক্ষুদ্র বিকৃত সংস্করণে পরিণত হউক এটা কাহারও নিকট কাম্য হইতে পারে না। হিন্দুত্ব ত' আমরা বহুদিন হারাইয়াছি। এখন যেটুকু অবশিষ্ট আছে, অদূরে তাহাও যেন হারাইতে বসিয়াছি।

ধর্ম্মজগতে ব্যষ্টি বা ব্যক্তির প্রভাব বহুবার লক্ষিত হইয়াছে ; সাহিত্য ক্ষেত্রেও যে তাহা দৃষ্ট হয় নাই বা এখনও হইতেছে না তাহা নহে; কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। ধর্ম্মে ব্যক্তির প্রভাবে মানবের তৎকালবিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তি শান্ত হয়, আরও উজ্জল হয়, মানুষের মন তত্তৎকালে এক প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া প্রবলতর শুদ্ধতর প্রভাবের অধীনে আসে। ধর্ম্মে মানুষের চিত্তবৃত্তি কখনও নীচগামী ও মলিন হয় না ;—সাহিত্যে কিন্তু তাহা হইবার সম্ভাবনা থাকে। বৌদ্ধ শঙ্কর চৈতন্য ধর্ম্মের ঢেউ এখানে বহিয়া গিয়াছে, তাহাতে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই ;—যে মালিন্য ও বিপদ উক্তকালে দেখা দিয়াছিল তাহা অপগত হইয়া মানুষকে উন্নত ও সমাজকে বিপদশূন্য করিয়াছিল।

ইয়োরোপে Idealistic ও Realstic বলিয়া দুইটী মতবাদ প্রচলিত আছে। তাহারা সেখানে যাহা করিতেছে, আমরাই বা এখানে তাহা করিব না কেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে "দুই সমাজ একরূপ নহে" মাত্র ইহা ছাড়া আরও কথা বলা যাইতে পারে।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি ? যশ, অর্থ প্রভৃতি অন্যান্য উদ্দেশ্যের বিষয় ছাড়িয়া দিয়া কেবল অপূর্ব্ব রসাস্বাদজনিত আনন্দের বিষয়টাই ধরা যাউক্। সাহিত্যে আমরা অপূর্ব্ব রস আস্বাদন করিয়া পরা নির্বৃতি লাভ করি। শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, শান্ত ও বাৎসল্য এই কয়টী রসের উল্লেখ দেখিতে পাই এবং সাহিত্যে ইহাদের কোন না কোনটীর রস আস্বাদ্য হয়। এখন প্রথমটী ছাড়া অন্যগুলির কথা পরিত্যাগ করা যাউক ; কারণ ঐ গুলিতে কাহারও কোন বৈষম্য নাই। যত গোল ঐ আদিরসকে লইয়া। সকল রসের মধ্যে ইহাই যেন প্রধান ও ব্যাপক। সকল রসেরই একটা স্থায়ীভাব আছে এবং তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য, বিভাব অনুভাব ব্যভিচারভাব, সঞ্চারীভাব প্রভৃতি অবান্তর ভাবও আছে। শৃঙ্গারের স্থায়ীভাব রতি। ফলত সংস্কৃতে এই রস সম্বন্ধে বিশেষ আদিরসের বিষয়ে সুন্দর প্রাঞ্জলভাবে, আবার কঠিন জটিলভাবে এত আলোচনা আছে যে জগতের অন্য কোন সাহিত্যে তাহা নাই।

সংস্কৃত সাহিত্যে শৃঙ্গার রসের ছড়াছড়ি এই অপবাদ প্রবাদ আছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এত মাতামাতিতেও সেখানে কোন স্থলেই শীলতার ব্যাঘাত দৃষ্ট হয় না। কেন ?

আজকাল একটা কথা উঠিয়াছে যে, পতিতাদের মধ্যেও যখন বিশুদ্ধ প্রেমের অসদ্ভাব নাই তখন তাহাও সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য। এ কথা কিছু নূতন নহে। সংস্কৃত সাহিত্যে অতি প্রাচীন নাটকও (মৃচ্ছকটিক) পতিতার (বসন্ত সেনার) প্রণয়ে উন্মত্ত নায়কের (চারুদত্তের) চরিত্র লইয়া গঠিত। কিন্তু কই কোনও দিনই ত কাহারো মনে তাহাতে শীলতার আঘাত লাগে নাই! উর্ব্বশী অপ্সরা, স্বর্ব্বেশ্যা ; তাহার প্রতি রাজা পুরূরবার অনুরক্তি মহাকবি (বিক্রমোর্ব্বশীতে) কি নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। তখন রাজারা ও তদ্দৃষ্টান্তে প্রজারাও অনেকে বহুবল্লভ ছিলেন। তাহাদের প্রণয়চিত্র কতস্থানে আমরা চিত্রিত দেখি ও আনন্দানুভব করি। অমরু নামা কবি তাঁহার অমরু শতক কাব্যে কী সুন্দরভাবে প্রণয় কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা পড়িলে আত্মহারা হইতে হয়। তাঁহার এক একটী কবিতা এক একটী ছবি। তাঁহার কৃতিত্ব এই যে কাব্যের সকল চিত্রগুলিই স্বকীয় স্ত্রীগণকে লইয়া রচিত।

শীলতার ভঙ্গ বা বে-আব্রুতা আসে অভিব্যক্তি করণে বা অঙ্কনের ভঙ্গীতে। পাপের চিত্র ত স্বভাবতঃই সম্মোহন, তাহাকে আরো সম্মোহন ও উজ্জল বেশ দিয়া মনে লালসার আকাঙ্ক্ষা দীপ্ত করা সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয় যাহাতে সেই পাপের মধ্যেও মধুর কোমল ভাবগুলি বিকশিত হয় সেই

দিকে কবির লক্ষ্য রাখা বিধেয়। পাপত আদর্শ নহে, হওয়াও বাঞ্ছনীয় নহে ; তাহা করিতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষ্মী আসিয়া কাব্যলক্ষ্মীকে লাঞ্ছিত করিবে, এটা মনে রাখা উচিত।

সংস্কৃতে শৃঙ্গার রসে নায়কের যেমন বহুবিধ ভেদ আছে, নায়িকারও তেমনি অসংখ্য প্রকার বিভাগ দৃষ্ট হয়। স্বকীয়া, পরকীয়া ও সাধারণী এই তিন শ্রেণীতে নায়িকারা প্রধানতঃ বিভক্ত। স্বকীয়া আবার মুগ্ধা, মধ্যমা ও প্রগল্‌ভা এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। পরকীয়ার দুই ভেদ পরোঢ়া ও কন্যকা। আবার উৎকণ্ঠিতা, প্রোষিতভর্তৃকা, কলহান্তরিতা, অভিসারিকা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা প্রভৃতি ভেদ বহুপ্রকার দৃষ্ট হয়। "চতুরধিকাশীতিবৃতং শতত্রয়ং নায়িকাভেদাঃ।" এক সংস্কৃত সাহিত্যেই কেবল এরূপ সূক্ষ্মভাবে ইহার আলোচনা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

স্বকীয়া সাধারণীর বিষয় লইয়া অনেক কবিরা লিখিয়াছেন, তাহাতে গোল নাই। গোল পরকীয়া লইয়া। কাব্যশাস্ত্র বিনোদের দ্বারা ধীশালীদের সময় অতিবাহিত হয় ইহা অনেকবিধ শ্রেয়ঃ আনয়ন করে ইত্যাদি সাহিত্যের সর্ব্বত্র স্তুতি কীর্ত্তন দেখিতে পাই। আবার যাহাতে মনে কুপ্রবৃত্তি উদ্রিক্ত না হয় সে জন্যে অসৎকাব্যের আলোচনা হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ বাক্যও দৃষ্ট হয়। ফলত সৎসাহিত্য মনুষ্যের যে কতরূপে মঙ্গলসাধন করে এবং অসৎসাহিত্যে মানব মনের যে কতখানি অধোগতি হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

যাহা লইয়া এত মতভেদ অলঙ্কার শাস্ত্রে সেই শৃঙ্গার রসের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

> "শৃঙ্গং হি মন্মথোদ্ভেদ স্তদাগমন হেতুকঃ।
> উত্তমপ্রকৃতি প্রায়ো রসঃ শৃঙ্গার ইষ্যতে॥
> পরোঢ়াং বর্জ্জয়িত্বা তু বেশ্যাং চানন্নুরাগিনীম্।
> আলম্বনং নায়িকাঃ স্যুর্দক্ষিণাদ্যাশ্চ নায়কাঃ॥
> * * * * *
> স্থায়িভাবো রতিঃ শ্যামবর্ণোহয়ং বিষ্ণুদৈবতং॥"

শৃঙ্গার শব্দের ব্যুৎপত্তি এই :—শৃঙ্গ অর্থ মন্মথোদ্ভেদ মন্মথের উদ্বোধ, তাহাকে কারণরূপে যে প্রাপ্ত হয় তাহাই শৃঙ্গার রস। "শৃঙ্গং ঋচ্ছতি, শৃঙ্গং অর্য্যতে অসৌ, শৃঙ্গং আরাতি ইতি বা।" এই রস প্রায় উত্তমপ্রকৃতিক অর্থাৎ ইহাতে উত্তম নায়কই প্রায় দৃষ্ট হয় ;—অধম নায়ক ইহাতে যে স্থান পায় না তাহা নহে, সেইজন্য প্রায় শব্দের প্রয়োগ, কিন্তু যে স্থলে তখন উহাকে ঠিক শৃঙ্গার রস বলা যায় না, উহা শৃঙ্গারাভাস নামে প্রযুক্ত হয়। পরোঢ়া ও অনুরাগ শূন্যা বেশ্যা ইহাতে বর্জ্জনীয়। এই উভয় বিষয়ক রস শৃঙ্গার নহে, শৃঙ্গারাভাস। বিভিন্ন প্রকারের নায়িকা ও দক্ষিণ প্রভৃতি নানাবিধ নায়ক ইহার আলম্বন, চন্দ্রচন্দন কোকিলরবাদি ইহার উদ্দীপন, ভ্রূবিলাসকটাক্ষাদি ইহার অনুভাব, জগুপ্সাদি ইহার ব্যভিচারীভাব, রতি স্থায়ীভাব—ইহার বর্ণ শ্যাম ও দেবতা বিষ্ণু। অমরুশতকের একটী শ্লোক দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে।

এই লক্ষণে দেখিতে পাইতেছি যে ইহার বর্ণ শ্যাম ও ইহার দেবতা বিষ্ণু। বিষ্ণু সত্ত্বগুণের দেবতা। ইহাতেও "স্তম্ভ রোমাঞ্চ বেপথু" প্রভৃতি সাত্ত্বিক গুণের কথা উল্লিখিত আছে। ইহাতে পরকীয়া বর্জ্জনীয়। পরকীয়া দুই প্রকার পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে:—(১) পরোঢ়া বা পরস্ত্রী ও (২) কন্যা। কন্যা (অনূঢ়া) পিতামাতা প্রভৃতির অধীন বলিয়া পরকীয়া নামে অভিহিত। এখানে সর্ব্বত্র আমরা, পরকীয়া অর্থে পরস্ত্রীই ব্যবহার করিতেছি। সংস্কৃত সাহিত্যে পরকীয়ার বিষয় কোথায়ও দেখিতে পাই না। কোন কোন পুরাণে পরকীয়ার যে কিছু কিছু কথা আছে তাহা ধর্ম্মের আবরণে সুরক্ষিত ও অধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ। কিংবদন্তী এই যে ব্যাসদেব মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা। তাহার পর সংস্কৃত কাব্যনাটকাদি রচিত হয়। পুরাণযুগের ধর্ম্ম প্রভাব ক্রমে কমিতে থাকিলেও সংস্কৃত সাহিত্যে অধর্ম্ম ভয়েই হোক বা অন্যকোন কারণেই হোক্ পরকীয়ার আদৌ স্থান নাই। দুচারিটী উদ্ভটশ্লোকে দৈবক্রমে তাহার দর্শন মিলিতে পারে, এই ভয়ে অসৎকাব্যের আলাপ একেবারেই নিষিদ্ধ হইয়াছে। জলবিহারাদি বর্ণনায় হয় অপ্সরা নয় গণিকা বা স্বকীয়া লইয়াই কবিরা সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

বৈষ্ণব সাহিত্যে পরকীয়ার উল্লেখ দৃষ্ট হয় কিন্তু আধুনিক সাহিত্যের পরকীয়ার সহিত তাহার বিভেদ

অনেক। সেখানেও ধর্ম্মের আবরণ দেখিতে পাই, ধর্ম্মের প্রাধান্য অপগত হইতে থাকিলেও পরে যে সব চিত্র দেখিতে পাই, তাহাতে আমরা রসের অপূর্ব্ব মাধুর্য্যেও রচনালালিত্যে মুগ্ধ হইয়া যাই—বে-আব্রুতার ভাব আসে না।

ধর্ম্ম বন্ধন এখন নিতান্ত শিথিল; একমাত্র সৎসাহিত্যই আমাদের প্রধান অবলম্বন, কেবল তাহাই এখন সমাজকে ধর্ম্মপথে লইয়া যাইবার প্রধান সম্বল। সাহিত্যই এখন লোকজীবনকে আলোকিত নিয়ন্ত্রিত ও শান্তিময় করিতে পারে, আর কিছুর উপর তেমন আশা ভরসা এখন নাই। অনেকে সাহিত্যের এই নবজাগরণকে আশার চক্ষে দেখিতেছেন। তাঁহারা মনে করেন যে শীলতারক্ষা না করিয়াও সাহিত্য আমাদের অভীষ্ট ফল দান করিবে, আধুনিক সাহিত্য সাধু উদ্দেশ্যেই অনুপ্রাণিত। ভাল কথা, আনন্দের কথা। কিন্তু ভবিষ্যত যে সকলের কাছেই চিরদিন অন্ধকারে আবৃত; কেহ কি আমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী এখন হইতে করিতে পারেন যে ভবিষ্যতে সাহিত্য ও সঙ্গে সঙ্গে সমাজ উভয়ই ভাল হইবে—আদর্শস্থানীয় হইবে? অনিশ্চিতকে ভিত্তি করিয়া ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আশায় যথেষ্ট-আচরণ বিধেয় একথা বলা দুঃসাহস।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এখন মিলিত হইতেছে—ইহাকে ঠেলিয়া রাখিবার কাহারও সাধ্য নাই। বাধ্য হইয়া আমাদের এখন পাশ্চাত্য প্রভাবের মধ্যে আসিয়া পড়িতে হয়, ইহা অপ্রতিবিধেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে পাশ্চাত্য আদর্শ যে পরিমাণে আমাদের মনকে অধিকার করিতেছে, সেই পরিমাণে আমরা প্রাচ্যভাব ও আদর্শ হারাইতে বসিয়াছি। দুই আদর্শই আমাদের তুল্যভাবে সেবনীয়। এমন বহু ব্যক্তি আছেন যাঁহারা কেবল নাম ভিন্ন সংস্কৃত কাব্য নাটকাদির সহিত পরিচিত নহেন, অনেকের নিকট আবার নামও অপরিচিত। অনেককে বাধ্য হইয়া এতকাল সংস্কৃত পড়িতে হইত, সে নিয়ম ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে এখন এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে অতি নিম্ন শ্রেণী হইতে সংস্কৃতকে একেবারে বাদ দিয়া সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া যশস্বী হইতে পারেন। ইহার ফল ভবিষ্যতে কিরূপ হইবে তাহাও ভাবিবার বিষয়। ধর্ম্মের খাম খেয়ালির জন্য, ধর্ম্মের উপর ক্রোধবশতঃ অমূল্য সংস্কৃত সাহিত্যকে বর্জ্জন করিয়া প্রতিশোধ লইবার বাসনা নিতান্তই মারাত্মক নহে কি?

জীবনে স্বাধীনতা যেরূপ দরকার অব্যভিচারও তেমনি দরকার। কোন শাসন সংযমে বদ্ধ না থাকা এবং পদে পদে অসহনীয় শৃঙ্খলভার বহন করা, উভয়ই কষ্টকর। লোক-শিক্ষা ও সংস্কারের ভার এখন একা সাহিত্যকেই লইতে হইবে উহা তাহার পক্ষে এখন সুকর হইবে। কারণ সাহিত্য কান্তার মধুর বচনের ন্যায় অলক্ষ্যে অনেক কার্য্য করিয়া থাকে এবং এখনও তাহাই করিতেছে। সমালোচক যতই চীৎকার করুন না কেন সাহিত্যের গতি ও তৎপ্রসূত ফলকে কেহ নিরোধ করিতে পারিবেন না।

দোষৈকদৃক্ প্রাচীনপন্থী উৎসাহহারা আশাহীনের দল ভবিষ্যতকে তমসাবৃতই দেখিয়া থাকেন; উদ্যমশীল তরুণহৃদয় নব্যপন্থী আশান্বিতেরা যদি সেই অন্ধকারের মধ্যে অস্ফুট আলোকরেখা দেখিয়া থাকেন তবে সবিনয়ে নিবেদন এই যে তাঁহারা যেন সেই আলোক রেখাকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাকে ফুটাইবার জন্যই প্রয়াস করেন, কারণ ধর্ম্মহীন সমাজ ও ধর্ম্মহীন সাহিত্য এ উভয়েরই অস্তিত্ব আশঙ্কাজনক ও বিপদ সঙ্কুল।

হারানো গানের রেশ টুকু বাজে ছিন্ন বীণার তারে

—শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়

দীপাবলী-জ্বালা বাসর-রাতিতে আঁধার ঘরের কোণে
জল-ভরা-আঁখি যে বিধবা মেয়ে কাঁদিছে সঙ্গোপনে,
আমি জানি তার বিফল বাসনা, গোপন বুকের ব্যথা,
জ্যোছনা-বিছানো ফুল-ফোটা-রাতে দিনের দরিদ্রতা !
আকাশের বুকে গতি-মন্থর পথচারী বারিবাহ
হেরি' সাহারার নয়ন-কুণ্ডে জ্বলে যে তৃষার দাহ,
চির পিপাসিত বঞ্চিত এই আমারো পরাণে ভাই,
সেই দাহনের আগুনের আঁচ দিবারাতি যেন পাই !
ভেবেছিনু মনে হয়ত ভুলিব প্রভাতের আলো-ফাগে,
ধূসর সাঁঝের সন্ধ্যা-মণিরে বরি' নেব অনুরাগে ;
ফাগুন-স্বপন ভুলিব পঊষে হু হু উত্তরী বায়ে,
দিনের রঙীন স্বপ্নখানিরে ভুলিব সন্ধ্যা ছায়ে,
অনাবৃষ্টির অভিশাপে শুকা যে নীবার মঞ্জরী
ভেবেছিনু মনে ভিজাব না আঁখি কভু আর তারে স্মরি' ;
যে তৃণ মরেছে জনমের ভুলে পথিক-পায়ের চাপে,
কোরকে যে ফুল গিয়াছে ঝরিয়া প্রখর দাহের তাপে,
বিপথা যে নদী মরুভূর বুকে হারালো পথের দিশা,
শোষিল অকালে জহ্নুর মত যাহারে জ্বালার তৃষা,
ভেবেছিনু তারে ভুলে যাব আমি স্মরিব না আর মনে,
আশা-হত যত ব্যথার প্রদীপ নিবাবো কক্ষকোণে

তবু যেন বারে বারে,

হারানো গানের রেশ টুকু বাজে ছিন্ন বীণার তারে !

অভিভাষণ *

—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এই সভাতে বছর দুই পূর্ব্বেতে আচার্য্য রায়ের একটিনি করি আমি। এবার আমার ডাক পড়েছে। যেদিন ছেলেরা ডাকতে গেল আমি প্রথমে অস্বীকার করে বললাম, বাপু তোমরা আমায় ডাক কেন? আমি তো বক্তা নই, বলতে পারিনে। আমি গিয়ে কি করব? তারা বলে আপনার বলে কাজ নেই, আপনি শুধু গিয়ে বসলেই হবে। আমি সেই ভরসায় এসেছিলেম,—আজ্‌কে এখন এরা আমায় ঠেলে তুলে বলে, এবার আপনার পালা!

আমি একটা কথা ভাবি, আমি তো বলতে পারিনে তবু এই ছেলেরা আমায় এত ভালবাসে কেন? আর বারম্বার আমায় ডাকই বা দেয় কেন? তা মনে করি আমি বলতে পারিনে বটে কিন্তু লিখেছি তো বিস্তর—পাতার পর পাতা। বইয়ের পর বই—ভালোমন্দ যাই হোক্, অনেক কিছুই আমার এই দীর্ঘ জীবনে আমি লিখে গেছি।

তারপর ভাবি তার সঙ্গে ছেলেদের যোগ কোথায়? কিসের জন্যে তারা আমায় এত আদর ক'রে ডেকে নিয়ে যেতে চায়? মনে হয় বোধ হয় আমার বলার কথাটা তারা বোঝে।

আমি একটা কথা অনেকবার অনেক রকম করে বলতে চেয়েছি। মেয়েদের বলতে চেয়েছি দেখ, তোমরা মানুষ—তোমরা সমস্ত প্রাণ দিয়ে এ কথাটা উপলব্ধি করবার চেষ্টা কর। নতুন কথা তো কিছু বলবার যো নেই, বলতে পারিনে। কাজেই সেই পুরোণো কথাটাই বারম্বার জোর দিয়ে আমি বলি—আমার সমস্ত মনের বিশ্বাস দিয়ে আমার সমস্ত প্রাণের শ্রদ্ধা দিয়ে সেই কথাটা বারম্বার বলবার চেষ্টা করি—যে তোমরা নিজেদের উপলব্ধি করবার চেষ্টা কর। ছেলেদের একথা বলি যে বহুকাল ধরে শুনে এসেছো এটা ভাল ওটা মন্দ ঠিক সে গুলো যে কি তার কোন অর্থ নেই। তোমরা নিজেরাই ভাবো, অহঙ্কার না করে ভাবো, ঈর্ষা না করে ভাবো, কার মধ্যে ভাল আছে, কার মধ্যে কি আছে।

তোমাদের এই তরুণ বয়স। মনের যৌবন। মনের তরুণতার একটা মস্ত নিদর্শন এই যে তা কেবল সম্মুখ দিকে চায়,—ভবিষ্যৎ তার কাছে সমস্ত। আর আমরা—বুড়ো যারা, তাদের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ভাববার আর কিছুই নেই, প্রায় সমস্তই অন্ধকার। আমরা এখন কেবল সেই অতীতের দিকে তাকিয়ে থাকি সেখানকার যা কিছু সুখ কিম্বা সৌভাগ্য অর্জ্জন করেছি লাভের দিক দিয়ে ক্ষতির দিক দিয়ে সেটুকু আমারা সামলাই। আমরা কেবল তা মনের মধ্যে চিন্তা করি তারা কেবল দেখে, চেষ্টা ক'রে। সেইখানে আমাদের সঙ্গে এই ছেলেদের তফাৎ।

আমি একশোবার করে বলেছি যা হয়ে গেছে হয়তো আছে তার মধ্যে অনেক সত্য কথা। কিন্তু তবুও এই তোমাদের সব চেয়ে বড় কথা নয় যে তাই তোমরা নির্ব্বিচারে মেনে নেবে। আবার নতুন ক'রে তোমরা ভাববে। যে জিনিষটা সত্য তা উপলব্ধি করতে শেখো। সেটা কেবল নিজেদের ভেতর দিয়ে, কথার ভেতর দিয়ে নয়, পরের বচনের ভেতর দিয়ে নয়,—নিজের মধ্য দিয়ে। প্রায়ই আমাদের বলতে হয়—একটা ফাঁকা কথা—তোমরা বাপু মানুষ হও। কিন্তু বলতে পারিনে যে মানুষ হবার পথ তোমাদের বন্ধ। মানুষ হওয়া যে কি শক্ত এবং তার কি পথ একথা বলবার যো নেই, বলিওনা বড়। একথাটা যখন তাদের বলতে পারিনে, তখন মনের মধ্যে একথাটা গুমরোতে থাকে। সভায় যখন এরা মিলে দাঁড়ায়, এসে বসে, তখনই বলে আমরা পথ চাই, নানা ভাবে, ভাষায়

* ইডেন হিন্দু হোষ্টেলে ১৩৩৪ সালের বাৎসরিক মিলনোৎসবে সভাপতির অভিভাষণ।

একথা তারা বলে, যে মানুষ হবার পথটা বন্ধ,—তাই বলে কি চুপ করে থাকব? তাও তো নয়? সেটা সব রকম করে চেষ্টা করতে হবে।

তারা অনেক সময় জিগ্‌গেস্ করে সেটা কি? মাঝে মাঝে বলি আত্মসম্মান—নিজের প্রতি সম্মান, নিজের ওপর শ্রদ্ধা। আমরা তোমাদের বলি না যে তোমরা মানুষ হবার চেষ্টা কর, কেননা তোমরা মানুষ। এটা তোমরা বিশেষ করে ভেবে দেখো মানুষ তো তোমরা বটে—মনুষ্যত্ব তোমরা হারাও যখন তোমাদের আত্মসম্মান ক্ষুন্ন হয়। এটা তোমাদের মধ্যে বড় কথা হোক যে যেমন করে পারি নিজেকে শ্রদ্ধা করবো এবং নিজেদের মানুষ বলে ভাবতে চেষ্টা করবো।

এর আর একটা পথ হচ্ছে এই মিলন,—এতগুলি ছেলে এখানে মিলেছে। একাজের যে এখন সময় আছে তা নয়। এরা বড় হয়ে নানা ভাবে নানা আকারে সুখেদুঃখে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়বে, তখন হয়ত তাদের এই সময়ের কথা মনে পড়বে।

মনে হল এটা মিলনের উৎসব এটা খুব একটা বড় পলিটিক্যাল সভা নয় কিম্বা একটা লেখাপড়ার সভা নয়,—ঠিক তা নিয়ে একটা হৈ চৈ হচ্ছে তা নয়। এশুধু একটা আনন্দ, একটা মিলন উৎসব, এই সামনে সিন্ খাটানো এখনি থিয়েটার আরম্ভ হয়ে যাবে।

আনন্দের কথা এই যে ছেলেরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এতগুলি কাজ করেছে, নিজেদের মধ্যে উৎসাহ দিয়ে এতগুলি প্রাইজ দিয়েছে, তাদের Sportsএর ভেতর দিয়ে লেখাপড়ার ভেতর দিয়ে এত কাজ করতে পেরেছে, থিয়েটার ও মিলনের উৎসব করেছে। আমার বক্তব্য ত' বলা হল। পূর্ব্বে বলেছি আমি বলতে একেবারে পারিনে। লোকে বিশ্বাস করে না যে, যে পাতা পাতা লেখে সে বলতে পারে না কেমন করে। কিন্তু বাস্তবিক তো কথা শুনে বুঝতে পেরেছেন যে বলতে আমি জানিনে। আর বলবার খুব বেশী নেই! আমি ছেলেদের আশীর্ব্বাদ করি যেন প্রতিবৎসর এ মিলনোৎসব উত্তরোত্তর সাফল্য লাভ করে।

অনন্তের যাত্রী

—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

বাদলের ধারা ধরার বুকে ঝর ঝর করে ঝরে পড়ছিল, রাস্তা দিয়ে হু হু করে জল ছুটছিল, খানা ডোবাগুলো ভরাট করে দিচ্ছিল।

গাছের পাতা জুড়ে টুপটাপ করে বড় বড় জলবিন্দু ঝরে পড়ছে, পাশে ডোবার ধারে কচুবনের মধ্য হতে বড় ব্যাংগুলো বিকটস্বরে বর্ষার আগমনীবার্ত্তা ঘোষণা করতে সুরু করেছে। বাবলা গাছে একটী দুটী করে কবে হতে হলদে রংয়ের ফুল ফুটতে সুরু করেছিল, এতদিন তার দিকে কারও দৃষ্টি পড়েনি; আজ বাদলার দিনে কালো মেঘে ছাওয়া আকাশের পানে তাকাতে গেলে আগেই দর্শকের চোখে পড়ে ফুলেভরা গাছের দিকে, মুগ্ধ বিস্ময়ে মন তার ভরে ওঠে। প্রবল বাদলায় একটী পাখীও আজ বাসা ছেড়ে বার হয় নি, ক্ষুধার প্রবল তাড়নে, বাইরের আকর্ষণ সব সয়ে তারা নীড়ের মধ্যে বসে আছে।

বিশেষ দরকারে পড়ে কদাচিৎ কেউ হাঁটুর উপর কাপড় তুলে মাথায় ছাতা দিয়ে, পথের এক হাঁটু জল ভেঙ্গে পথ

বেয়ে চলেছে। মাথার 'পরে কালো আকাশের একপ্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত চিকমিক করে বিদ্যুৎ ছুটে যাচ্ছে, কড়্ কড়্ করে এ প্রান্ত হতে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত মেঘ ডেকে চলছে, কোথায় গিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে তা কেউ জানে না।

রুগ্ন প্রকাশ ঘরের মধ্যে খোলা জানলার পাশে বসে তাকিয়েছিল পথের অবাধ জলস্রোতের পানে। তার মনে আজ এই বাদলের দিনে ভেসে উঠেছিল অনেক দিন আগের কথা।

হায় রে, সে অতীতের কথা কি ভুলবার? অন্তরের অন্তরতম স্থানে সে সব কথা জলন্ত অক্ষরে লেখা আছে যে, সমস্ত জীবনকালের মধ্যে সে স্মৃতি দূর হবে না। সুখের সে বাল্যকাল কবে চলে গেছে জীবনকালের মধ্যস্থিত কুড়িটা বছর বাদ দিলে সে ঠিক সেই অতীতের খেয়ালে ফিরে যায়।

দুনিয়া সে দিন তাকে প্রতারণা করতে সাহাস পাইনি কেন না তখন সে রুগ্ন ছিলনা, এমন করে উঠতে বসতে গেলে হাঁপাত না। জোর করে সে নিজের প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করে নিতে এগিয়ে জেত। সে দিনে ছল চাতুরী সে জানত না একমাত্র শান্তিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছিল।

আজ সেই অতীতের পানে তাকিয়ে সে বর্ত্তমান ভুলে যেতে চেষ্টা করে, মনে করতে চেষ্টা করে তার দেহে কোন রোগ নেই, সে তেমনই শক্তিশালী আছে। জোর করে সে রোগ যন্ত্রণা শারীরিক দৌর্ব্বল্য অগ্রাহ্য করে উঠতে যায়, হায় রে, মনে শান্তি আনলেও দেহ যে সে শক্তির অযোগ্য হয়ে পড়েছে। দাঁড়ালে হাঁটু তার কেঁপে ওঠে, সে ভুলতে পারে না, অতীত যা নিয়ে যাচ্ছে আর তা পাবেনা। দিন চলে গেছে, রেখে গেছে শুধু স্মৃতি।

হতভাগা আবার বসে পড়ে, দুইহাতে মাথাটা তার টিপে ধরে।

আকাশ পরিষ্কার থাকলে বিকেলে সে তার চাকরের সাহায্যে একটু বাইরে যায় বেড়াতে। বেশী দূর বেড়ানোর ক্ষমতা তার ছিলনা। ভোলা সঙ্গে একটা চৌকী নিয়ে যেত, যখন দেখত মনিব আর চলতে পারছে না তাড়াতাড়ি চৌকী পেতে দিত, সে বসে পড়ে হাঁপাত।

এক একদিন তার মনে হ'ত, এমন ভাবে বেড়ানোর চেয়ে না বেড়ানোই ভাল। তার নিজের ইচ্ছামত সে বেড়াতে পারে না। সবই তার যেন বাঁধা নিয়মের মধ্যে।

সময় সময় সে উত্তেজিত হয়ে উঠত, ভোলাকে যত খুসি গালাগালি করত, সময় সময় কাঁপতে কাঁপতে দুই একটা চড়ও বসিয়ে দিত। যেন তাকে এমনি ভাবে জড় করে রাখা ভোলার ইচ্ছা! সে যেন ইচ্ছে করলে মনিবকে মুক্ত করতে পারে!

ভোলা নীরবে সব সয়েও পড়ে থাকত। সেতো জানত মনিব কতখানি অসহায়, কতখানি নির্ভর করে। সে তো জানে দুনিয়া এই হতভাগ্য যুবককে সব দিয়ে আবার সব হতে বঞ্চিত করেছে, আজ একমাত্র ভোলা ছাড়া তার আর কেউ নেই। সে যতই গালাগালি দিক, যতই মারুক, ভোলা তবু পাশ ছাড়ত না; মা যেমন স্নেহার্ত্ত চোখে রুগ্ন সন্তানের পানে তাকিয়ে থাকেন সেও ঠিক তেমনি করে তাকিয়ে থাকত। সে যে একে হাতে করে মানুষ করেছে! কুস্তি, লাঠিখেলা ইত্যাদি শিক্ষা দিয়েছিল সেই যে! এক-দিন তার যে খোকাবাবু প্রবল শক্তিশালী বলে জন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, আজ সেই শক্তির অবসান হয়েছে বলে আর সকলের মত সেও কি ছেড়ে যাবে?

সে একদিনের কথা—প্রকাশকে বাগানে চৌকীতে বসিয়ে রেখে সে ঘরে ঢুকেছিল ওষুধ নিয়ে আসতে। হঠাৎ একটা আর্ত্ত সুর শুনে ছুটে এসে দেখেছিল প্রকাশের ঠিক সামনেই একটা উদ্যত ফণা সাপ; প্রকাশ আড়ষ্ট ভাবে বসেছিল। নিয়ত নিজের মৃত্যু কামনা করলেও সাপের বিষে জর্জ্জরিত হয়ে মরবার ইচ্ছা সে মোটেই করে নি।

ফণা তুলে সাপটা দুলছিল, ছোবল দেবে এমনি অবস্থা। পেছন হতে পা টিপে টিপে ভোলা এসে খপ করে দুইটী সবল হাতে তার ফণা এমন ভাবে চেপে ধরলে যা ছাড়ানোর ক্ষমতা সাপটার ছিল না। ভোলা জানত যদি সাপটা একটু নাড়া পেয়ে জানতে পারে তখনই সে প্রকাশকে কামড়াবে তাই নিজের জীবনের মায়া ছেড়ে সে সাপটাকে চেপে ধরেছিল। সাপ তার সমস্ত দেহ দিয়ে তার দুখানা হাত জড়িয়ে পিষছিল, সাপের পেষণে সে ভ্রূক্ষেপ করে নি।

তেমনি করে সাপ ধরে সে তখন ওঝার বাড়ী ছুটেছিল।

তারপর সন্ধ্যার সময় সে যখন ফিরে এসেছিল তখন প্রকাশের কি রাগ,—আমি মরতুম তাতে তোর কি হতো রে বেটা? তুই অমন করে পদে পদে আমার মরণ তাড়িয়ে বাঁচাচ্ছিস কেন? আমায় বাঁচিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুতা সাধা। ঘণ্টা ধরে ওষুধ খাওয়ানো, সঙ্গে সঙ্গে বেড়ানো, তারপরে সাপটা এলে তাকেও দূর করলি। হতভাগা আমায় বাঁচাতে তোকেই কে কামড়াত সেটা বুঝি জানিস নি? দূর হ, তোকে আমি জবাব দিলুম। অমন চাকরে আমার দরকার নেই। আমি মরব বেশ করব, তোর তাতে কি রে হতভাগা?"

ভোলা চুপ করে শুনে যেত। প্রকাশ যতই যা বলুক, ভোলা তাতে কাণও দিত না, যেন সে কাকে কি বলছে, এমনি ভাব দেখাত।

দুনিয়ার মানুষের যা কাম্য প্রকাশ তা সবই পেয়েছিল, তার মত পাওয়া মানুষে বুঝি পায় না; আবার যেমন করে সব হারিয়ে সে নিঃস্ব হয়েছে এমন তরও বুঝি কেউ হয় না।

হতভাগা প্রকাশ,—

ডাক্তার কলকাতায় থাকতে দিতে নারাজ,—হাঁপানী অত্যন্ত বাড়ে তাই তার পল্লীগ্রামের ত্যক্ত বাড়ীতে আসতে হয়েছে।

জীর্ণ বাড়ী,—আছে এই মাত্র সাড়া দিচ্ছে। প্রকাশের বাপ বাড়ী ছেড়ে কলকাতায় বাস করতেন, প্রকাশ আবাল্য কলকাতাতেই কাটিয়েছে। তার মনে পড়ে কবে কোন কালে একবার একটা দিনের জন্যে মাত্র এ বাড়ীতে সে এসেছিল।

গ্রামে সে কিছুতেই আসতে চায় নি, জোঁকের মত সে কলকাতাতেই পড়ে থাকতে চেয়েছিল, পারে নি কেবল ভোলার অত্যাচারে, এ জন্যেও সে ভোলার 'পর আন্তরিক বিরক্ত। লোকটা তার মিত্র যে নয় এ জানা কথা, শত্রুতা না থাকলে লোকে এমন করে?

নীরব নিঝুম গ্রাম খানি, চারিদিকে খালি সবুজ লতা পাতা গাছ, অদূরে ধানের ক্ষেত। এই নীরবতার পানে তাকিয়ে প্রকাশের প্রাণ আরও হাঁপিয়ে উঠত। সে কখনও কলকাতায় ফিরে যাবার জন্যে ভোলাকে পীড়ন করত, কখনও অনুনয় করত। ভোলা তার তর্জ্জন গর্জ্জনে, অনুনয়ে কিছুতেই দ্রব হত না, কথাও বলত না।

কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে সে প্রকাশকে, কিন্তু কেন? সেই নিষ্ঠুরা অরুণা, সে পথ দিয়ে চলে যাবে আর তার খোকা সে মুগ্ধ নেত্রে তার পানে তাকিয়ে থাকবে দীন ভিখারীর মত? না, সে খোকার আর কিছু বাঁচাতে পারে নি, মান বাঁচাবে, এমন ভাবে ভিখারী হতে দেবে না।

বুক ভরা ভালবাসার পরিণাম কি ভীষণ। কেউ জানতে পারে নি ঠিক এমনিটাই ঘটবে।

প্রকাশের বাল্য সঙ্গিনী অরুণা।

কে জানত সেই সরলা অরুণা আজ এমন হবে, যে প্রকাশকে একদিন সেই আশা দিয়েছিল তাকেই নিরাশায় ডুবাবে।

আর কেউ জানলেও প্রকাশ জানতে পারে নি তার আশা ব্যর্থ হবে, অরুণা তাকে পছন্দ করলেও বিয়ে করে জীবনের সাথী করতে পারে না কারণ বিলাসিনী অরুণার বিলাস বাসনা মিটাতে যে পরিণাম অর্থের প্রয়োজন প্রকাশের তা ছিল না। তার যা ছিল তা মানুষের কাম্য, অরুণার কাম্য নয়। প্রকাশের ছিল শক্তি সাহস, সুদৃঢ় সুঠাম দেহ, সুন্দর মুখ, বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ, ডিগ্রি, কিন্তু অরুণার চাই অর্থ।

তার মনের বাসনা প্রকাশ জানত, সে তাই প্রাণপণে বড় হওয়ার চেষ্টা করত। অরুণা একদিন স্পষ্টই বলেছিল "আমি তোমায় বিয়ে করতে পারি প্রকাশ কিন্তু একটা মাত্র বাধা যে তুমি অর্থশালী নও।"

প্রথমটায় প্রকাশ বুঝিয়ে তার মনের ভুল দূর করবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু অরুণা তার সে সব কথা কানে তোলে নি!

তাকে বছর খানেক অপেক্ষা করতে বলে প্রকাশ রাতারাতি বড়লোক হওয়ার চেষ্টায় বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গে রইল তার প্রিয় ভোলা।

টাটানগরে নিজের অধ্যবসায় বলে প্রকাশ শীঘ্রই

বেশ ভাল কাজ পেয়ে গেল। সকল কাজে সে জীবন মরণ অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যেত, যে যা না পারত সে তা করে ফেলত অক্লেশে। ভোলা তার জন্যে ভারি ভাবনায় পড়েছিল, খোকাবাবু কবে যে কোনও বিপদ ঘটিয়ে বসবে সে তাই ভাবছিল। কোন উপদেশ দিতে গেলে প্রকাশ হেসে উড়িয়ে দিত, নিজের বলিষ্ঠ বাহু দুটী, প্রশস্ত বুকখানা তাকে দেখাত।

কিন্তু অবশেষে ভোলার আশঙ্কাই ঠিক হল। বাসা হতে ভোলা খবর পেলে কারখানায় একটা বিষাক্ত গ্যাসে খোকা মুর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে, জ্ঞান করান যাচ্ছে না।

সে ধাক্কা অল্পে অল্পে সামলে যেতে না যেতে আবার একদিন একটা ভারি লোহা নিজের হাতে তুলতে গিয়ে প্রকাশের লাংস বিদীর্ণ হয়ে অবিরত রক্ত উঠতে লাগলো মুখ দিয়ে।

সেই হ'তে হাঁফানী ও মাঝে মাঝে রক্ত ওঠার উদ্ভব। কয়েক বছর মাত্র; এর মধ্যে সেই শক্তিশালী প্রকাশ একশ বছরের বুড়োর চেয়েও বেশী অসহায়।

তার স্বাস্থ্যের জন্যে ভোলা তাকে নিয়ে পশ্চিমে গেল। সেখান হতে প্রকাশ বহুকষ্টে নিজের অবস্থা বিবৃত করে অরুণাকে একখানা পত্র দিলে, একবার সে অরুণাকে দেখতে চায় একটীবারের জন্য অরুণা কি দেখা দেবে না?

দেখতে যাওয়া দূরে থাক, অরুণা পত্রের উত্তরও দিলে না।

পশ্চিমে প্রকাশের দিন কাটানো বড় কষ্টকর হয়ে উঠছিল, শরীরও ভাল হল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে ভোলাকে ডেকে বললে,—"আর কেন ভোলা, আমায় কলকাতায় নিয়ে চল, হয় তো সেখানে থাকলে আমি ভাল হব।"

ভোলা নীরবে চোখের জল গোপনে মুছে তাকে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে এল।

কলকাতায় ফিরেই প্রকাশ খবর পেলে কয়েক মাস আগে অরুণার বিয়ে হয়ে গেছে। তার স্বামী মিঃ দত্ত বিখ্যাত ব্যারিষ্টার। এঁকে প্রকাশ দুই একদিন নিমন্ত্রিত-রূপে আগে দেখতে পেয়েছে, কোনদিন স্বপ্নেও সে ভাবে নি মিঃ দত্ত অরুণাকে বিয়ে করবেন।

খবরটা পেয়ে তার মুখখানা ঠিক শবের মতই মলিন হয়ে গেল, সে খানিক স্তব্ধ ভাবে বসে রইল, তারপর উচ্ছ্বসিত ভাবে ডাকলে—"ভোলা—"

আজ ভোলার স্নেহকাতর বুক ছাড়া সে আর কোথাও লুকোনোর জায়গা পেলে না।

দুদিন যেতে সে ভোলাকে ডেকে বললে—"ভোলা একবার তাকে পাঁচ মিনিটের জন্যে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলে আসবি? বেশীক্ষণ নয়, বলিস—মাত্র পাঁচ মিনিট—"

ভোলা রুদ্ধস্বরে বললে, "যদি অরুণা-দি না আসে খোকাবাবু?"

আর্ত্তভাবে প্রকাশ বললে, "আসবে আসবে ভোলা, আমি পত্র লিখে দিচ্ছি, পত্র পেলেই সে নিশ্চয় আসবে।"

সে পত্র লিখতে বসল।

ভোলা বললে. "আর একবারও তো পত্র দিয়েছিলে?"

"তখন ওর বিয়ের গণ্ডগোল ছিল ভোলা, সময় পায় নি, কেমন করে যাবে বল দেখি; হয়তো আমার সে পত্রও পায় নি। না না, তুই তাকে তেমন হৃদয়হীনা ভাবিস নে ভোলা, আমি জানি সে আমায় কতখানি ভালবাসত; অতখানি ভালবেসে কেউ স্বইচ্ছায় আর একজনকে বিয়ে করতে পারে না। তার বাপ মায়ের জেদে পড়ে তাকে বিয়ে করতে হয়েছে এ কথা ঠিক। তা হোক, সে সুখী হোক, আমি শুধু একবার তাকে দেখব—আর দেখব না। আমি তার কাছ হতে অনেক দূরে সরে যাব, আর আসব না। এ সব কথা যেন তাকে বলিস নে, হয়তো কাঁদবে, কারণ সে আমায় বড় ভালবাসত।"

তাড়াতাড়ি পত্র দিয়ে সে ভোলাকে পাঠিয়ে দিলে।

বিকেলে ভোলা যখন ফিরল তখন তার মুখের পানে তাকিয়ে প্রকাশ দমে পড়ল, তবু আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, "কি ভোলা, আসবে কি?"

ভোলা অন্য দিকে ফিরে উত্তর দিলে, "না খোকাবাবু, অরুণা দি পত্রখানার সব একবার মাত্র চোখ বুলিয়ে সেখানা ছিঁড়ে ফেলে দিলে, তারপর আমার দিকে ফিরে বললে,

আমার যাওয়ার সময় নেই ভোলা, আমার অনেক কাজ।”

অরুণা যে কি বলেছে তা সে মুখে আনতে পারছিল না। হায় হৃদয়হীনা অরুণা, একজনের সর্ব্বস্ব তুমিই নষ্ট করেছ, মৃতপ্রায় প্রকাশকে লক্ষ্য করে এমন সব কটু কথা আর কোন নারীই বলতে পারে না। ভোলা সে সব কথা কেমন করে বলবে, কেমন করে জানাবে যাকে এখন● তুমি এতখানি ভালবাস সে আর তোমার নাম পর্য্যন্ত শুনতে চায় না?

প্রকাশ খানিক চুপ করে রইল, বোধ করি আঘাতের ব্যথাটা সামলে নিলে, তারপর বললে “সে সত্যি কথাই বলেছে, না—ভোলা? এখন সে স্বামীর স্ত্রী, একটা সংসারের কর্ত্রী, মুহূর্ত্ত সময় তার অমূল্য।”

একটুখানি চুপ করে থেকে সে বললে, “না হয় আমিই একদিন দেখা করতে যাব—কি বলিস ভোলা?”

অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে সে ভোলার পানে চাইল।

“সে দেখা যাবে” বলে মুখখানা ভার করে ভোলা চলে গেল।

তার পরদিনই যখন প্রকাশ বলে বসল—“দেখাই যদি করতে হয় তবে আজই চলনা কেন ভোলা—”

তখন ভোলা বিরক্ত না হয়ে থাকতে পারলে না, “আজই যাওয়ার কি দরকার খোকাবাবু? তার কত কাজ, দেখা করার কি সময় হবে?”

ব্যগ্রভাবে প্রকাশ বললে, “পাঁচ মিনিটের সময় হবে না ভোলা? আমি বলছি—হবে, আমি বসব না, শুধু দেখে সে সুখী হয়েছে জেনে চলে আসব। তুই একখানা গাড়ী ডেকে নিয়ে আয়, আমি আজ যাবই।”

তার সমস্ত মুখখানাতে এমন একটা করুণ ব্যগ্রভাব ফুটে উঠেছিল যা দেখে ভোলার চোখে জল আসছিল, সে একটা কথাও না বলে গাড়ী ডাকতে গেল।

গাড়ী এনে প্রকাশকে সন্তর্পণে তাতে উঠালে, নিজেও চলল সঙ্গে। ব্যাপারটা যা ঘটবে তা সে অনুমানেই বুঝতে পারছিল, কিন্তু মুখ ফুটে তা খোকার কাছে বলতে পারছিল না।

অনেক আশা নিয়েই প্রকাশ অরুণার দর্শনপ্রার্থী হয়ে তার দরজায় দাঁড়াল কিন্তু অরুণা দেখা করলে না। দাসীর হাতে একখানা শ্লিপ লিখে পাঠালে সে এখন বড় ব্যস্ত এখনই মিঃ রায়ের বাড়ী নিমন্ত্রণে যাচ্ছে, কাজেই দেখা করতে পারলে না। প্রকাশের বর্ত্তমান অবস্থার জন্যে সে অত্যন্ত দুঃখিতা—ইত্যাদি—ইত্যাদি।

প্রকাশের চোখের সামনে পৃথিবী তখন ঘুরছিল, ভোলা তাকে না ধরলে সে পড়ে যেত।

এরপর একদিন হঠাৎ অরুণাকে সে সামনে দেখতে পেয়েছিল। অরুণার দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্যে প্রকাশের উপর পড়েছিল, যেন দারুণ ঘৃণায় সে সঙ্কুচিতা হয়ে উঠছে। পাছে প্রকাশ ডেকে কথা বলে, এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি সরে গেল।

এত ভালবাসার কি নিদারুণ অপমান! প্রকাশ আজ রুগ্ন, শক্তিহীন, এ কার জন্যে? শুধু তার জন্যেই নয় কি? প্রকাশকে সেই না যেমন করে হোক অর্থ সংগ্রহ করতে বলেছিল! প্রকাশকে বিয়ে করবে এই প্রলোভন দেখিয়েছিল। হায় নারী! বিধাতার সৃষ্টি তুমি! তুমি যে দেবী, তুমি পিশাচী হলে কেমন করে?

তবু—তবু প্রকাশ সেই পথটার পানে চেয়ে থাকে! তবু সে তার রুগ্ন দেহ বহন করে শুধু তাকে বাইরে দাঁড়িয়ে একটী বার দেখে আসতে চায়, তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ভোলাকে কত না অনুনয় বিনয় করে। ভোলা তার কথায় কান দেয় না, নিজের মনে কাজ করে যায়।

ডাক্তার তাকে বেশী হাঁটতে নিষেধ করেছেন। ভোলা সতর্ক দৃষ্টিতে কেবল তাকে দেখত। একদিন ভোলা যখন বাজারে গিয়েছিল প্রকাশ তখন অতি কষ্টে পথ বেয়ে অরুণার বাড়ীর দিকে যাচ্ছিল।

ফেরবার সময় ভোলা দেখতে পেলে অরুণার ড্রিংরুমের ঘরে অর্গান বাজছে, তার সঙ্গে অরুণার গান শোনা যাচ্ছে, আর প্রকাশ গেটের বাইরে বসে দুই হাতে বুক চেপে ধরে অনবরত কাশছে।

একখানা গাড়ী করে ভোলা তখনই তাকে বাসায় আনলে। সেদিন অসুখ খুব বেড়ে উঠল, ডাক্তার সব শুনে

গোপনে ভোলাকে বলে গেলেন—এখান হতে অন্তত্রে না নিয়ে যেতে পারলে কোন দিন এমনি করে একা পথ চলতে গিয়ে হাঁপ এসে প্রাণ হারাবে।"

এরই জন্যে ভোলা দুদিনের নাম করে চিরদিনের জন্তে প্রকাশকে পল্লীগ্রামে নিয়ে এসেছে।

পল্লীগ্রামে এসে প্রকাশের অশান্তি দিন দিন বেড়েই চলেছে। তার এখানে থাকতে ভালো লাগে না—এ দেশ স্বাস্থ্যকর নয়, কলকাতায় থাকলে বরং দুদিন বাঁচত কিন্তু এখানে সে বাঁচবে না ইত্যাদি কথা নিয়ত তার মুখে, ভোলা চুপচাপ শুনে যেত, একটা কথাও বলত না। নেহাৎ যেদিন বড় অসহ্য হয়ে উঠত, সেদিন বেশ রুখে উঠে বলত —"তোমার সকল ভার যখন আমার হাতে তখন নিজের জন্যে অতটা ভাববার কিছুমাত্র দরকার নেই খোকা বাবু। তোমার মরা বাঁচা আমি দেখে নেব, মরণ তো ভয়ের কথা নয়। বেঁচে থাকা বরং আশ্চর্য্যের কথা, মরণ তো আছেই, এড়াতে পারে কে?"

প্রকাশ মনে মনে তার ওপর রাগত বড় কম নয়। তার মন এখন কেবল অতীত সুখের দিনগুলো খুঁজে বেড়াত কবে অরুণা কি বলেছিল, কবে অরুণা তাকে কি উপহার দিয়েছিল। সেই অরুণা যে একদিন তার হাত খানা টেনে নিয়ে বলেছিল,—"আমি জীবনে মরণে তোমারই! তোমারই জন্যে অপেক্ষা করব!" সে কেমন করে অন্যকে বরণ করে নিলে! অর্থের মোহ এতই বলবান! তা প্রেমকেও ভুলিয়ে দেয়! অরুণা একবার ভাবলে না প্রকাশ তাকে কতখানি ভালবাসে। তাকে লাভ করতে পারবে এই আশায় অর্থ উপার্জ্জন করতে গিয়ে তার এই দুর্গতি। সে রুগ্ন প্রকাশকে জীবনের সাথী নাই করুক, একবার চোখের দেখা দেওয়া, একটা কথা বলা, তাও কি পারলে না?

প্রকাশ নিজের চিন্তায় এত তন্ময় হয়ে থাকত, কোন দিন দেখতে চায় নি ভোলা কি করে খরচ চালাচ্ছে। আজ কয়টা বছর সে এমনি ভাবে পড়ে আছে, ঘরে যা কিছু ছিল বিক্রয় করে কিছুদিন চলেছে, তারপর কি করে চলছে সে তা একদিনও জানতে পারে নি।

গ্রামের দুই একটী লোক দেখা শোনা করতে আসতেন। তাঁদেরই মধ্যে একজন সেদিন জিজ্ঞাসা করলেন "সংসার চলছে কি করে," সেইদিন হঠাৎ প্রকাশের মনে আর সব চিন্তা দূর হয়ে এই চিন্তাটাই বিশেষ করে জাগল,—"তাই তো চলে কিসে।"

ভোলা সন্ধ্যার সময় নিয়মিত ওষুধ খাওয়াতে এল, প্রকাশ ওষুধ না খেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "হ্যাঁ রে ভোলা! আমি তো আজ দু'তিন বছর বিছানায় পড়ে আছি, ডাক্তারের ফি, ওষুধপত্র, পথ্য এ সব এখনও আমার চলছে কিসে? আমি তো জানি আমার আর কিছু নেই। আজ তোকে বলতেই হবে তুই টাকাকড়ি পাস কোথায়?"

ভোলা আশ্চর্য্য হয়ে খানিক তাকিয়ে রইল! তারপর উগ্র হয়ে বললে, "এসব ভাবনা তোমার মাথায় কে জাগিয়ে দিয়ে গেল খোকাবাবু, গাঁয়ের লোক বুঝি?"

মুখ ভঙ্গী করে প্রকাশ বললে, "তুই কি মনে করিস আমি কিছু ভাবিনে, কোনও খবর রাখি নে? অসুখ হয়ে আমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে তাই তোর ধারণা, না? আমি জানতে চাই এত টাকা তুই কোথায় পাস, কে তোকে দেয়?"

ভোলা অকস্মাৎ দীপ্ত হয়ে বললে, "যেখানেই পাই না কেন তোমার সে খবর নেওয়ার দরকার নেই খোকাবাবু! তুমি যতদিন থাকবে জেনো কোন ভাবনা তোমায় করতে হবে না। আমি যেখানেই যা পাই তোমার তাতে কি?"

"কি?—আমার তাতে কিছু না? আমি পথ্য করছি, ওষুধ খাচ্ছি, সব খরচ আমার, আর তুই বলরি তোমার তাতে কি? নেমক হারাম বেটা; তুই তো সব করতে পারিস, আমার গলায় ছুরিও দিতে পারিস।"

ভোলা নিঃশব্দে সরে গেল।

এর পর প্রকাশ অনেক অনুনয় বিনয় করে যখন জানতে পারলে ভোলা আজীবনকাল তার বাপের কাছে চাকরী করে যে বেতন জমিয়েছিল তাই থেকে তারই জন্যে ব্যয় করে যাচ্ছে তখন খানিকটা সে চুপ করে রইল, তারপর অকস্মাৎ দীপ্ত হয়ে উঠে বললে—"বেইমান! আমার বাপ যা তোকে দান করে গেছেন, তাই তুই আমায় খাওয়াচ্ছিস? কখখনো না, আমি তোর এ পয়সা খাব

না, না খেয়ে মরি সেও ভাল।”

ভোলা গরম হয়ে বললে, “তুমি ভাল হয়ে সব শোধ করে দিয়ো খোকাবাবু। চাকরের জিনিষ তুমি এমনি নেবে কেন, আমিই বা তোমায় দিয়ে তোমার বাপকে অপমান করব কেন? এখন না নিলে উপায় নেই খোকাবাবু, ভগবান দিন দেন, তুমি ভাল হয়ে আমার দেনা শোধ কোরো।”

প্রকাশ স্থির চোখে ভোলার পানে তাকিয়ে রইল। তার পর হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল, “আমার ভাল হওয়ার আশা আরও করিস্ ভোলা? মনে কর্,—যা তুই ব্যয় করছিস এ সব জলে ফেলা হচ্ছে। আমি আর যে ভাল হব না এ আমি বেশ জানছি। আমায় যেতেই হবে ভোলা, এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে,—তোকে ছেড়ে আমায় যেতেই হবে। কে জানে—সে দেশ অন্ধকারের রাজ্য। জানিনা সে পথ বেয়ে একা চলতে পারব কি না। তাই ভাবি ভোল, তুই তো আমার সঙ্গে যাবি নে, আমার মায়ের মত করে সর্ব্বদা বুকের আড়ালে চেপে রাখবি নে; আমি কেমন করে সে পথে চলব ভোলা? আমার যে এখনই মরতে ইচ্ছা করে না, আমার জীবনে যে কোন সাধ পূর্ণ হল না, প্রবল তৃষ্ণা বুকে নিয়ে হাহাকার করে একা আমায় চলতে হবে—”

সে ভোলার বুকের মধ্যে মুখখানা লুকালে, ভোলা বুঝলে সে চোখের জল ফেলছে।

দিন দিন প্রকাশের অবস্থা খারাপ হয়ে আসছিল, ডাক্তার একদিন এসে দেখে’ ভোলাকে গোপনে জানিয়ে গেলেন—যে দিনের ভয় তিনি করেছিলেন সে দিন এগিয়ে এসেছে, ভোলা এই সময়ে রোগীর যা কিছু আশা আছে তা মেটাতে পারে।

ভোলা নিঝুম ভাবে খানিক দাঁড়িয়ে রইল। এ জানা কথা, আর সকলের মত ভোলাও জানত এমন দিন আসবে যে দিন প্রকাশের জীর্ণ দেহে প্রাণপাখীকে সে ধরে রাখতে পারবে না—তার প্রাণপণ চেষ্টা ব্যর্থ করে সে দিনে এ ছেলেটা চলে যাবেই। জেনেও বিপদ এসেছে শুনে সে কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেল।

আগের দিন কাশতে কাশতে খানিকটা রক্ত উঠে প্রকাশ ভারি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল, তার আর চলবার ক্ষমতা ছিল না।

“ভোলা—”

ক্ষীণ কণ্ঠের ডাক,—ভোলার কাণে বেশ স্পষ্ট হয়ে পৌছাল। হাতের কাজ ফেলে সে ছুটে এল—।

“তা হলে আমায় এখানেই মরতে হবে ভোলা, আমায় শেষ একবার কলকাতায় নিয়ে যাবি নে?”

তার চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ করে জল ঝরে পড়ল।

ভোলা তার চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে বললে, “নিয়ে যাব খোকা বাবু, আজ বিকেলের ট্রেণে রওনা হব ঠিক করেছি। পালকী ঠিক করে এসেছি, গাড়ী করে তোমায় এখন নিয়ে যাওয়া হবে না ডাক্তার বলেছেন। এই তো এক ঘণ্টার পথ কলকাতা, চারটের ট্রেণে নিয়ে পাঁচটায় পৌছব। ডাক্তারকে কলকাতায় সুধীন ডাক্তারের কাছে পাঠিয়েছি একটা ঘর ঠিক করে রাখতে। গিয়েই সেখানে উঠতে পারব।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে প্রকাশ চোখ মুদলে,—“আঃ কত দেনা যে বাড়াস ভোলা; যতদিন না দেহটা ছাই হয়ে যায় আমার জন্যে তোকে অনেকই সইতে হবে।

সুধীন ঘোষ ডাক্তার, ইনি প্রকাশের বাপের বিশেষ বন্ধু ছিলেন, প্রকাশকে স্নেহের চক্ষে দেখতেন। তিনি প্রকাশের জন্যে একখানি ঘর ঠিক করে রেখেছিলেন, ভোলা প্রকাশকে নিয়ে সেই ঘরে উঠল।

সেই রাত্রে আবার হাঁপানী অত্যন্ত বেড়ে উঠল তার সঙ্গে বাড়ল কাশি, এবং পাঁজরের ফাঁকে যে সামান্য রক্ত শেষ বয়সে জীবনের মূলে শক্তি যোগাচ্ছিল তাও উঠতে লাগল। সকালে সুধীন বাবু দেখে ভয় পেলেন।

হাঁপাতে হাঁপাতে প্রকাশ বলছিল—“আর কিছু না, এক বার অরুণাকে যদি খবরটা দিতিস, ভোলা, আমি শেষ বিদায় নিচ্ছি জান্‌লে সে কি পাঁচ মিনিটের জন্যেও একবার আসবে না?”

ভোলা তার মানবোধ ভুলে অরুণাকে খবর দিতে ছুটল।

নিষ্ঠুরা অরুণা শুনে একটা নিঃশ্বাস ফেললে।

“এ অবস্থায় আমি গিয়ে আর কি করব ভোলা?

প্রকাশ আমার সামনে ইহজগৎ হতে চলে যাবে এ আমি দেখতে পারব না, সহ্য করতে পারব না। না, তুমি যাও ভোলা, আমি যাব না, দেখতে পারব না।”

ভোলার দুই চোখ দিয়ে আগুন উথলে পড়ছিল—যেন সেই চোখের আগুনে এই হৃদয়হীনা নারীকে সে দগ্ধ করতে চায়। সে কি বলতে গিয়ে হঠাৎ নিজেকে সামলে নিলে।

না,—কিসের জোরে সে অরুণাকে দুর্ব্বাক্য বলবে? প্রকাশ তার সর্ব্বস্ব—অরুণার কে? প্রকাশ চিরবিদায় নিচ্ছে, সে সামনে থেকে তাকে চিরবিদায় দিতে বাধ্য—কারণ তার জীবনসর্ব্বস্ব প্রকাশ, তাকে সে এতটুকু বেলায় কোলে নিয়ে এত বড় করেছে, আজ তাকে তফাতে রাখতে পারবে না। তার বুক চৌচীর হয়ে যাবে, তার বুকের রক্ত চোখ ফেটে বেরিয়ে পড়বে—সে তবু প্রকাশের মাথা কোলে নিয়ে বসে থাকবে—তারই মুদেআশা চোখ দুইটীর পরে দৃষ্টি রেখে।

সে যে বড় ভালবাসে—তাই ভালবাসার পাত্রকে এ সময়ে চোখের আড়ালে রাখতে পারবে না।

ভোলা ফিরে চলল।

পথ ফুরাতে চায় না—কতবার সে থেমে গেল; কতবার সে নিজের অজ্ঞাতে কত লোকের ঘাড়ে পড়ে গালাগালি গেল; ধাক্কা সইল। তার সকল উৎসাহ আজ নিবে গেছে আজ সে আর সে ভোলা নয়।

তখন প্রকাশের চোখ দুইটী চিরতরে মুদে আসছে, তবু সে প্রাণপণে চাইবার চেষ্টা করছে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, সে হাঁ করে বাইরের বাতাস নেবার চেষ্টা করছে।

তার মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিয়ে ভোলা ভাঙ্গাসুরে ডাকতে লাগল—খোকাবাবু আমার, শুনে যাও—জেনে যাও, যাকে তুমি ভালবেসেছিলে সে নারী দেবী নয়, সে রাক্ষসী, সে ডাইনি। পরলোকে তোমার পাশে তাকে পাওয়ার বাসনা নিয়ে যেয়ো না, পৃথিবীতে যার উদ্ভব তা পৃথিবীতে ফেলে রেখে দাও।”

কে তার কথা শুনবে, কে তার পানে চাইবে?

প্রকাশ এলিয়ে পড়ল, একটা কথা কইতে গেল—“অরুণা—”

প্রাণপণ শক্তির ফলে উঠল এক ঝলক গরম রক্ত,—ভোলার হাত কোল আর্দ্র করে দিলে।

চমকে উঠে ভোলা নাকে হাত দিলে, বুকে হাত দিলে, সব স্থির হয়ে গেছে।

“খোকাবাবু—খোকা—”

মৃতের মাথা উপাধানে নামিয়ে সে দাঁড়াল।

“মাগো—মা, খোকাকে তোমার কাছে, নিয়ে গেলে; এমনি করে জীবনটা তার পুড়িয়ে ছাই করে নিয়ে গেলে মা—? খোকা—খোকাবাবু—”

টলতে টলতে এসে সে প্রকাশের বুকের পরে মুখখানা রেখে আর্ত্তভাবে কাঁদতে লাগল।

অনন্ত সঙ্গীত

—শ্রীঅমরেশ রায়

তুমি কি শুনাবে মোরে গান? হে সুন্দর
ছন্দে, গানে ভরি দিবে আমার অন্তর
নিত্য নবসুরে! প্রভাত-আলোক মাঝে
শুনিব অপূর্ব্ব গীত-সুধা সন্ধ্যাসাজে

হেরিব বিচিত্র মধুরিমা,—এ হিয়ায়
বাজিবে মধুর ছন্দ। তোমার লীলায়
হে অনন্ত হে গোপন, এ কি এ বিস্ময়
সুন্দর নির্ভয় তুমি, তুমি মহাভয়
সীমাহারা অন্ধকার। তোমার সঙ্গীতে
যে সুর শুনাও মোরে অনন্ত ইঙ্গিতে—
সে সুর চলিছে নিত্য স্তব্ধতার গানে।
তাই আজি মন মোর তোমার ও গানে
আনন্দ লভিছে—স্তব্ধ নীরব বিস্ময়,—
সুদূরের স্তব্ধতারে বরিছে হৃদয়!

আচারে বিজ্ঞান

—অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিজ্ঞানের বয়স যতই বাড়িতেছে ততই দেখা যাইতেছে যে, আমরা যে সকল আচার মানিয়া চলি তাহা সমস্তই বিজ্ঞানসম্মত। যেগুলি এখনও একটু এদিক ওদিক হইতেছে সে গুলিরও যে পরে গতি হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কারণ আমরা যে সকল আচার মানিয়া চলি তাহার পনর আনা তিন পাই, পদী পিসীর বিধান; এবং এককালে এই এরোপ্লেন জেপলিন অপেক্ষা আমাদের পুষ্পক-রথ যখন অধিক শক্তিশালী, তখন বিজ্ঞান-চর্চ্চা আমাদের সনাতনী পদী-পিসীদের মধ্যে যে পরিব্যাপ্ত ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

(১) অষ্টমীতে নারিকেল খাইতে নাই, ত্রয়োদশীতে বেগুণ খাইতে নাই,—পঞ্জিকাকার শুধু তোমাকে জব্দ করিবার জন্য এ নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন নাই; ইহার বৈজ্ঞানিক কারণ আছে! কারণটা হইল এই যে, অষ্টমীর দিন নারিকেল খাইলে তুমি ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইবে। বলিবে, এই তো অষ্টমীর দিন ডাব খাইলাম, দেহ স্নিগ্ধ হইল, রোগাক্রান্ত হইলাম না তো? আরে, আজ না হউক, দু'দিন দু'বৎসর পরে হইবে—আর—তোমার জ্ঞান কতটুকু—there are many things in heaven and earth ইত্যাদি।

সে যা'ক, আসল বৈজ্ঞানিক কারণটা হইল এই,—চন্দ্র ঘুরিতেছে, পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে; ৯৷৫৩ মিনিট যখন হইল বাংলা দেশের সমস্ত নারিকেলের ভিতরের জলের উপর চন্দ্রের দৃষ্টি পড়িল, সেই জল বিষাক্ত হইয়া উঠিল। না—কথাটা বোধ হয় ঠিক হইল না—যত হিন্দুর বাগানে নারিকেল আছে, শুধু সেই নারিকেলের জলই খারাপ হইল, —না, তাও না, হিন্দুর বাগানেরও নয়, মুসলমানের বাগানেরও নয়—যাহার বাগানেরই হউক, নারিকেলটী যে হিন্দু (অবশ্য বিলাত ফের্ত্তা হিন্দু নয়) পরদিন বেলা ৮৷২৭ মিনিটের মধ্যে খাইবে সেই রোগাক্রান্ত হইবে; আবার ৮৷২৮ মিনিটে চন্দ্র তাহার দৃষ্টি তুলিয়া লইবে—ডাব জাতি মুক্তি পাইবে—বেকসুর তখন খাইয়া লও। কিন্তু সবুর—তুমি যদি বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মান তবে ১১৷৫৩ মিনিটের আগে খাইলে ব্যাধিগ্রস্ত হইবে।

সন্দেহ প্রকাশ করিও না—চন্দ্র সমুদ্রের জলে জোয়ার

ভাঁটা খেলায় আর নারিকেলের জলের কি কিছু করিতে পারে না? বলিবে, পুকুরের জল তো ঠিক থাকে, উহাতে তো জোয়ার ভাঁটা খেলে না; আরে—এঁদো পুকুরের জলের সঙ্গে ডাবের জলের তুলনা? যদি কাহারো সহিত ইহার তুলনা চলে তো ঐ বিশাল সমুদ্র নদনদীর সহিত। অতএব প্রমাণিত হইল, অষ্টমীতে ডাব খাইবার নিসেধাজ্ঞা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত।

(২) আর একটী ধর—উত্তর শিয়রে মাথা করিয়া শুইতে নাই। কেন জান? শুইলে শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হইবে। বৈজ্ঞানিক কারণটী কি শুনিবে? শরীরের রক্তে লৌহ আছে জান তো? চেঞ্জ হইতে ফিরিয়া আসিলে ডাক্তারেরা বলেন না—রক্তে লৌহের ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে? আচ্ছা, উত্তর দক্ষিণ লম্বা হইয়া শুইলে কি হইবে? রক্তের লৌহ গুলি পৃথিবীর চুম্বকাকর্ষণের ফলে বোঁ বোঁ করিয়া উত্তরে মাথার দিকে চলিয়া যাইবে;—মাথায় লোহা যাওয়া মানে, মাথা খুব ভারি হইয়া উঠিবে; মাথা ভার হওয়ায় তুমি অসুস্থ হইয়া পড়িবে। এখানে বাজে তর্ক উঠাইয়া লাভ নাই যে, লৌহের কোন দ্রাবকে এইরূপ হইতে দেখা যায় না। দেহস্থিত লৌহ ও তোমার 'টেষ্ট টিউব'-স্থিত লৌহ কি একই ভাবে চলিবে?—তোমার দেহের সহিত টেষ্ট-টিউবের তুলনা, করাই চলে না। টেষ্ট টিউবের মুখে ঢাল নাইট্রিক্ এসিড্, পোটাসিয়ম্ সায়ানাইড্—আর দেহের মুখে ধরে দাও ক্ষীর, সর, কারণ, সলিল। তবে!

(৩) এই আজকালই ডাক্তারেরা জানিতে পারিয়াছেন যে, জীবাণু দেহের মধ্যে ঢুকিয়া ব্যাধির সৃষ্টি করে। হাই তুলিলে তুড়ি দিতে হয়—এ ব্যবস্থা যাঁহারা করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঐ বৈজ্ঞানিক তথ্য অবগত ছিলেন। জীবাণুরা দেহের মধ্যে কোন রকমে ঢুকিতে পারিলেই ব্যাধির সৃষ্টি করিবে। ঢুকিবার একমাত্র পথ হইল মুখ-গহ্বর। এ মুখ-গহ্বরতো সব সময়ই বন্ধ রহিয়াছে, কখন খোলে না,—শুধু হঠাৎ খুলিয়া যায় যখন হাই উঠে; তখন বন্ বন্ করিয়া পোকারা মুখের ভিতরে ঢুকিতে যায়; দশ ফিট দূরে দাঁড়াইয়া তুড়ি দিতে থাক—পোকাগুলি ভয় খাইয়া আর মুখের দিকে অগ্রসর হইবে না, যেদিকে তুড়ি হইতেছিল সেই দিকে পিছু হটিতে থাকিবে। তুমি বাঁচিয়া যাইবে।

(৪) কিছুকাল পূর্ব্বে "ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডল"হইতে প্রকাশিত একখানি পুস্তিকায় দেখা গেল, "শনিবার ধোপার বাড়ী কাপড় দিলে রজকের দৈহিক তড়িৎ বস্ত্র মধ্যে অনুবিদ্ধ হইয়া আর্য্যহিন্দুর বসন একেবারে জীর্ণ করে।" এ দৈহিক তড়িতের কথা তো বিজ্ঞান আজ জানিতে পারিয়াছে; এখনও বিজ্ঞানের অনেক যুগ যাইবে তবে সে জানিবে যে, রজকের দেহের তড়িৎ উদ্ভূত হয়—শুক্রবার নয়—রবিবার নয়—শুধু শনিবার—এবং এই তড়িৎ জীর্ণ করে মুসলমানের লুঙ্গি নয়, সাহেবের পেণ্টেলুন নয়; শুধু আর্য্যের নামাবলি।

আমাদের আচারের মধ্যে এই সব বৈজ্ঞানিক মাহাত্ম্য দেখিয়া কবি যথার্থই বলিয়াছেন—

"উড়ুপ যোগে দু'দিন আগে হিন্দু যেত সিন্ধু পার,
মিসর পেরু চীন জাপানে ছুটতো লয়ে পণ্যভার;
*　*　*　*　*
—তাদের ধারা লুপ্ত হবে, থাকবে শুধু পঞ্জিকা।"

পথের পাশের ঝরা ফুল—

—শ্রীপ্রণব রায়

সহর-তলীর একটা ইতর বস্তি।.........

সারি সারি মেটে খোলার ঘর—বার্দ্ধক্যের ভারে জীর্ণ। ভাঙ্গা খোলার চালের ফাঁক দিয়া রৌদ্র উঁকি দেয়, বর্ষার ছাট্ আসে।—ঘরের স্যাঁৎসেঁতে মেজে ফুঁড়িয়া জল ওঠে।

......কিন্তু গরীবের আবার রৌদ্র-বৃষ্টি!

মাথা গুঁজিবার ঠাঁই হইলেই হইল।......

কি বর্ষা, কি শীত, কি গ্রীষ্ম—বারোমাসই সরু, নোংরা রাস্তাটা কর্দ্দমাক্ত হইয়া পড়িয়া আছে। এখানে সেখানে আবর্জ্জনার স্তুপ জড় করা।

এক পাশে একটা এঁদো শ্যাওলা-পড়া পচা-পুকুর। তাহারই দূষিত ভ্যাপ্সা-গন্ধের সঙ্গে আবর্জ্জনার দুর্গন্ধ মিশিয়া বস্তির বাতাসকে একেবারে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে।......

মাসিক সাড়ে-তিন টাকায় একখানা ঘর ভাড়া লইয়া একদিন দুলাল আসিয়া এখানে আস্তানা পাতিল।

সংসারে তাহার শুধু কিশোরী-বধূ চন্দনা।

দুলাল খিদিরপুর ডকে কুলি খাটায়।

রৌদ্রে ঝলসিয়া তাহার বর্ণ তামাটে গোছের হইয়া গিয়াছে। জিরাফের মত সে লম্বা, শীর্ণ। রোগা বলিয়াই হয়তো গলাটা একটু সরু দেখায়।

......চোখ দুইটা মাদক-মাহাত্ম্যে সর্ব্বদাই করমচার মত রাঙা। দুলাল লোকটা সৌখীন—প্রাণে সখ আছে।

মাথার পিছন দিকটা এবং ঘাড়ের চারিপাশ ক্ষুর-বুলানো হইলেও, সম্মুখের ঢেউ-খেলানো চুলে অপূর্ব্ব টেরির বাহার। গায়ের পাঞ্জাবিটা সেলাই-করা, ঘামের দাগ-ধরা হইলেও আদ্দির বটে।

দুলাল বিড়ি খায় না। খায় হাওয়া গাড়ী সিগারেট। অবসর-সময়ে গুন্‌গুন্ করিয়া থিয়াটারের নটীদের গান গায়।.........

দুলালের আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই এই নবাগতদের প্রতি বস্তির বাসিন্দাদের মনে কেমন একটা অনাবশ্যক কৌতূহলের উদ্রেক হইল।—বিশেষ করিয়া দুলালের কিশোরী-বধূ চন্দনার সম্বন্ধে। তাহাদের উৎসুক-চঞ্চল চোখে সেই কৌতূহলই প্রকাশ পায়। চন্দনার নিটোল দেহে প্রস্ফুট-যৌবনের সুষমা মাখা। বর্ণটা শ্যামল হইলেও বেশ মাজা-ঘসা।

......কিন্তু অবগুণ্ঠনের আড়াল হইতে তাহার মুখখানি দেখা যায় না। চন্দনা নাকি ভারি সতর্ক।

আশে-পাশের লোলুপ চঞ্চল চোখগুলি হতাশ হয়।......

দুলাল নিতান্ত মন্দ রোজ্‌গার করে না।

তবু কেন যে তাদের দৈন্য-দশা ঘোচেনা, তাহা ভাবিয়া লোকে আশ্চর্য্য হয়।

......বৌটির পরণে হলুদের ছোপ্-লাগা ময়লা কাপড়। ক'গাছি কাঁচের চুড়ি ছাড়া হাতে একগাছি করিয়া রূপার কাঁকনও জোটে না। পাড়ার লোকে ক্রমে আবিষ্কার করিল—দুলাল কোনদিন রাত্রে বাড়ী আসে না, কোন দিন বা বেশীরাত্রে ফেরে। এবং হপ্তাশেষে কোন স্থান বিশেষে নিশি-উৎসব সারিয়া, পরদিন প্রভাতে যখন গৃহে ফেরে, তখন তাহার পকেট-ভার আশ্চর্য্যরূপে লঘু হইয়া যায়!—

খোলার বস্তির গা ঘেঁষিয়া উঠিয়াছে এক মেস-বাড়ী।

—বাড়ীটা যেন যক্ষ্মা-রোগী।

দেয়াল হইতে চুণ-বালি খসিয়া পড়ে।

ক্ষয়-ধরা ইঁটগুলো দাঁত মেলিয়া হাসে।

পিছন দিকের দেওয়ালে ঘুঁটের প্রলেপ।

......বস্তির প্রবীণতম ব্যক্তিও এই বাড়ীটার বয়স নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হয় না।.........

দরজার পাশে একটা কালো-রঙের টিনের পাতে অস্পষ্ট সাদা অক্ষরে লেখা—প্যারাডাইস্ হোষ্টেল।

গরু যতই শীর্ণ হউক না কেন, গাড়ী টানিতেই হয়।

—তেম্‌নি কলিকাতার বাড়ী যত জীর্ণ হউক না কেন, তাড়া বহিতে হয় এবং ভাড়াটেরও অভাব হয় না।

জনকয়েক কেরাণী, ছাপাখানার কম্পোজিটর, দন্ত-মঞ্জন ও কেশতৈল বিক্রেতা, কর্ম্ম-প্রার্থী বেকার প্রভৃতি জন-পোনেরো পুণ্যাত্মা এই অপূর্ব্ব 'স্বর্গে' আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে।

দক্ষিণ কোণের ঘরটায় থাকে মহিম।

তরুণ ছোক্‌রা সে দীর্ঘায়তন, বলিষ্ঠ।

বি,এ পাশ দিয়া, এখন আইন পড়িতেছে।

ছেলে পড়াইয়া সে নিজের খরচ চালায়।

মাসে মাসে দেশেও কিছু পাঠাইতে হয়।

দেশে বৃদ্ধ অথর্ব্ব বাপ-মা আছেন, আর আছে আই-বুড়ো বোন কমলা।

গায়ে পড়িয়া লোকের সাহায্য করা মহিমের স্বভাব। সে জন্য মাঝে মাঝে পাড়ায় অপ্রিয় আলোচনা উপস্থিত হইয়া থাকে।

মহিম কিন্তু সে সব কথা গায়ে মাখে না।......অনাহুত ভাবে আসিয়া সে অসহায় রুগ্নকে সেবা করে। অভাব-গ্রস্তকে গোপনে অযাচিত ভাবে অর্থসাহায্য করে। দুলালের সম্বন্ধে পাড়ায় যে কৌতুহল দেখা গিয়াছে, তাহার ঢেউ আসিয়া যে মহিমের মনে লাগে নাই, এমন নহে, তবে সে বিষয়ে বেশী মাথা ঘামাইবার অবসর ও উৎসাহ তাহার নাই।

......একদা নিশীথে সহসা একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়া গেল।

নিশুতি রাত্রি।.........

সারাদিন পেটের ধান্দায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বস্তির ক্লান্ত মানুষগুলি নিঃসাড়ে নিদ্রা যাইতেছে।

লণ্ঠন জ্বালিয়া মহিম তখনও আইনের কূট সমস্যার মীমাংসায় ব্যস্ত ছিল।

সহসা একটা অস্ফুট আর্ত্ত-চীৎকারে তাহার গভীর চিন্তাগুলি সব এলোমেলো হইয়া গেল।

নিশীথিনীর নীরব বুক চিরিয়া যেন একটা চাপা গোঙ্‌রাণী............

বই রাখিয়া মহিম উঠিয়া পড়িল।

এই নিঝুম নিস্তরঙ্গ অন্ধকারের মাঝে কাহার এ আর্ত্ত-রোদন?

বোধ হইল শব্দটা দুলালের ঘরের দিক হইতে আসিতেছে। তিমির-রহস্যের মাঝে মহিম বাহির হইয়া গেল। দুলালের ঘরের ঝাঁপ্‌টা ঠেলিতেই খুলিয়া গেল।...

একটী অল্প-বয়স্কা কিশোরীর নিবিড়-কালো চুলের গোছা মুঠি করিয়া ধরিয়া, দুলাল মত্ত-জড়িত কণ্ঠে অশ্রাব্য গালাগালি করিতেছে।......মাতালের কবলে পড়িয়া অসহায় মেয়েটী থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।......সন্ধ্যার ম্লান অপরাজিতার মত মুখখানি......সজল-করুণ চোখদুটী.........

মহিম বাঘের মতো দুলালের টুঁটি টিপিয়া ধরিতেই, তাহার 'লাখ টাকা দামের' নেশাটা একদম মাটি হইয়া গেল। মুক্তি পাইয়া চন্দনা বসন সংযত করিয়া একপাশে সরিয়া গিয়া উচ্ছ্বসিত রোদন রোধ করিতে লাগিল।

যাইবার সময় মহিম দুলালের ঘাড় ধরিয়া বেশ করিয়া একটা ঝাঁকানি দিয়া, ক্রুদ্ধ কর্কশ কণ্ঠে শাসাইয়া গেল— "খবরদার! ফের যদি মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুলেচ তা হোলে.........”

রাত্রির তিমির পটে প্রভাতের অরুণ লেখা ফুটিয়া ওঠে।......সুপ্ত বস্তির বুকে জাগে প্রাণের সাড়া।

সরকারী-কলতলায় নিত্য-নিয়মিত কলহ-বচসা সুরু হয়। মন্নু ধোপা ময়লা কাপড়ের বস্তা লইয়া পচাপুকুরের ঘাটে হাজির হয়।

বাঞ্ছা উড়ে উনুন ধরাইয়া, বাসি বাদামী তেলে ফুলুরি ভাজিতে বসে। আশে পাশে লোভীলোলুপ ছেলের দল ভিড় করিয়া দাঁড়ায়।

নন্দ মিস্ত্রী টিনের ট্রাঙ্ক তৈয়ারী করে।

ভোর হইতেই, হাতুড়ি লইয়া ঠকাঠক্ করিয়া টিন পিটায়।

ঠিকালোকেরা যে যার কাজে বাহির হয়।

মহিম সরকারী কলে মুখ ধুইতে গিয়া দেখিল কালকের সেই অবগুণ্ঠনবতী বধূটী একটী মেটে কলসী লইয়া জল ভরিতে আসিতেছে।……বড় কুণ্ঠিত জড়সড় ভাব।

মহিম কলতলার একপাশে দাঁড়াইয়া ভিড়ের দরুণ অপেক্ষা করিতেছিল।

মেয়েটী কলসী ভরিয়া জল লইয়া, তাহার সম্মুখ দিয়া লজ্জা-সঙ্কুচিত পদে চলিয়া যাইবার সময় তাহার চোখে পড়িল——

মেয়েটীর বাঁ-হাতের মনিবন্ধে একটী সদ্যক্ষতের দাগ…… বোধ করি মাতাল স্বামীর প্রহার ঠেকাতে গিয়া কাঁচের চুড়ি ভাঙ্গিয়া হাত কাটিয়া গিয়াছে!

……আহা, অভাগী!

মহিমের তরুণ হৃদয় সম-বেদনায় ব্যথিত হইয়া উঠিল। মুখ হাত ধুইয়া মহিম মেসে ফিরিতেই, দন্ত-মঞ্জন ও কেশ-তৈল বিক্রেতা রাখহরি অপরিষ্কার দাঁতের পাটি বাহির করিয়া তাহাকে বলিল—"সুপ্রভাত মহিমবাবু……রাত কাট্‌ল কেমন ?"

মহিম বুঝিল গতরাত্রির ঘটনাটা আজ ভোর না হইতেই রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। কিন্তু রাখহরির কুৎসিৎ অর্থপূর্ণ হাসি দেখিয়া তাহার পিত্ত জ্বলিয়া গেল।

……কদর্য্য বস্তির মধ্যে বাস করিয়া লোকগুলোর মনও এমন নোংরা পঙ্কিল হইয়া গিয়াছে, যে কোনো ব্যাপার ভালো ভাবে গ্রহণ করিবার শক্তি ইহাদের নাই!……

গম্ভীর স্বরে "ভালোই" বলিয়া মহিম চলিয়া গেল।

কেরাণী উমাপতিবাবু হাঁপানির রোগী।

প্রাণপণে কাসি থামাইয়া, তিনি মহিমকে ডাকিয়া বলিলেন—"ভায়া, শুনচি নাকি কাল রাত্তিরে"……

কিন্তু কথা শেষ করিবার পূর্ব্বে তিনি প্রবল বেগে কাসিয়া ফেলিলেন।

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মহিম নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল। ……তাহার মনে পড়িতেছিল, ভাসা ভাসা, দুটী অসহায় করুণ চোখ………

* * * *

দিনে দিনে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়।

সম্বন্ধ নিকটতর হইয়া আসে।……

অবগুণ্ঠনের আড়াল ঘুরিয়া গিয়াছে।

মহিম জিজ্ঞাসা করে—"তোমার দেশ কোথায় ?"

চন্দনা বলে—"সে অনেক দূর—ফুলেরা গাঁয়ে"……

—"কে কে আছেন সেথায় ?"

—"অন্ধ বাপ, বিধবা দিদি আর ছোট ভাই……মা নেই! জন্মাবার তিনমাস পরেই হতভাগী আমি মাকে খেয়েছি"………

বলিতে বলিতে স্বর অশ্রুরুদ্ধ হইয়া ওঠে।

মহিম বলে—"দিন কতক বরং বাপের বাড়ীতেই কাটিয়ে এসো গে' আমিই না হয় পৌঁছে দেব'খন…… এখানে পড়ে পড়ে মাতাল স্বামীর মার আর কতদিন সইবে ?"

চন্দনা নিষ্প্রভ হাসি হাসে।

বলে—"দেশে গিয়ে অন্ধ বাপের বোঝা হোয়ে কি লাভ ?………বাংলার মেয়ে আমরা, পাথরেরও যা সয় না, আমাদের তাও সয়"…………

মহিম বোঝে. চন্দনার সেই হাসির নীচে অপরিসীম বেদনার রহস্য গোপন আছে।………

পাঁচুর মা বলিতেছিল—"তাও বলি বাছা—ছেলেটার ডব্‌কা বয়স, তুমিও সোমত্ত বৌ…… পুরুষের সঙ্গে এতটা মাখামাখি কি ভালো দ্যাখায় ?"

চন্দনা কাঠের মূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তিক্ত ঘৃণায় তাহার ন্যক্কার আসিতেছিল।………

অত্যন্ত বিশ্রী একটা মুখভঙ্গী করিয়া দুলাল বলিল—'ইয়ে—আবার সোহাগ করে পরের কাছে মনের দরদ জানানো হয়……ওর পেটে পেটে শয়তানী পিসী! দিন নেই, রাত নেই, যখন তখন ওই ছোঁড়াটার সঙ্গে ফুসফুস্ গুজ্‌গুজ্ চলচে……আমি ন্যাকা, কিছু বুঝি নে বটে ?"

আঁচলের খুঁট হইতে খানিকটা গুলের গুঁড়ো মুখে দিয়া, পাঁচুর মা বলিল—"কথায় বলে, মা'র চেয়ে যার দরদ বেশী —তা'রে বলে ডান!"

দুলাল একটা অতিশয় অশ্লীল গালাগালি দিয়া বলিয়া উঠিল "বলি আমার পরিবারকে মারব না তো কা'র পরিবারকে মারব ?······আমি না হয় একটু বদ্‌খেয়ালীই আছি আর ও ছোঁড়া বুঝি ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠিরের মামাতো ভাই !·········ছোঁড়াটাকে একদিন এমন ওষুধ দেব, যে বাছাধন তখন বুঝ্‌তে পারবেন—হ্যাঁ দুলালচাঁদ বড় সহজ লোক নয় !······দাঁড়াও তার ব্যবস্থা করচি"·········

রুদ্ধ আক্রোশে দুলালের রাঙা চোখ দুইটা হিংস্র শ্বাপদের মত জলিয়া উঠিল।

······মুক্ত নীলাকাশের পানে চাহিয়া, চন্দনা ভাবিতে-ছিল—ব্যর্থজীবনের এ দুর্ব্বহ ভার আর কতকাল বহিতে হইবে ? মা গো·········

* * * *

শীত শেষে বসন্তের বাতাস বহিতে সুরু করিয়াছে।

বস্তির একপাশে কৃষ্ণচূড়া গাছটার শুষ্ক-শাখা রাঙা ফুলে মুঞ্জরিত। সেইদিকে চাহিয়া, রুগ্না চন্দনা কত কি এলোমেলো কথা ভাবে।······তাহার চোখের সাম্‌নে যেন ভাসিয়া ওঠে—ঘনশ্যামল তরু-লতা ঘেরা একটী বুনো গাঁয়ের ছবি।

পায়ে-চলা মেঠো পথের ধারে তাহাদের সেই ছায়া-স্নিগ্ধ ক্ষুদ্র কুটীর খানি। সেখানে আছে তাহার বৃদ্ধ অন্ধ বাপ, ভাগ্যবঞ্চিতা বিধবা দিদি আর হাস্যময় চঞ্চল ছোট্ট ভাইটী।

দিদিকে সে বড় ভালো বাসিত—মা-মরা মেয়েটা দিদির কাছেই মানুষ হইয়াছে।

······তাই বার বার তাহার মনে পড়ে—দিদির স্নেহ-কোমল মুখখানি, বড় বড় মমতা-মধুর চোখ দুটী······

আর মনে পড়ে তাহার সেই চারুকে।

আহা, ভগবান যেন ওদের দু'জনকার সুখের নীড়টী কোনোদিন নষ্ট না করেন !

তাহার আগেই চারুর বিবাহ হইয়াছে।

বাপের বাড়ী আসিলে, চারু সখীর গলা জড়াইয়া, মৃদু-লজ্জা-রক্তিম মুখে তাহাদের নব-প্রণয়ের কত মধুর কাহিনী তাহার কানে কানে গুঞ্জন করিত।

······চারুর স্বামী চারুকে কত ভালোবাসে, কত আদর করে—তাহারই কথা······

শুনিতে শুনিতে সেও বিভোর হইয়া যাইত।

তাহার কুমারী হৃদয় কুঞ্জে তখন অনেক গোপন আশার মুকুল।

চোখে রঙিন স্বপ্ন।······

আর আজ·········

চন্দনার বেদনাক্ষুব্ধ হৃদয়ের তলে চাপা দীর্ঘশ্বাস গুমরিয়া ওঠে। পলাতক মনটা তবু হারানো অতীতের পিছনে ঘুরিয়া মরে।·········

ধারে ঝাঁপ ঠেলিয়া মহিম আসিল।

চন্দনা তাহার আগমন টের পায় নাই—মাটি-লেপা দেওয়ালের ক্ষুদ্র ফোকর দিয়া রৌদ্রজ্জ্বল নীলাকাশ-খণ্ডের পানে অনিমেষে চাহিয়াছিল।

ব্যথিত দৃষ্টিতে মহিম তাহার পানে চাহিয়া দেখিল—এই কয়দিনের রোগেই চন্দনা কত রোগা হইয়া পড়িয়াছে ! পূর্ব্বের সে শ্যাম স্নিগ্ধ লাবণ্যটুকু ঝরিয়া গিয়াছে। অযত্ন-শিথিল রুক্ষ এলো চুল বাতাসে উড়িতেছে।

······প্রভাতের ফুলটী যেন বিকালের রৌদ্রে নেতাইয়া পড়িয়াছে। বসন্তের এই উদাস-অলস দু'পহরে এই শীর্ণা দুর্ব্বল কিশোরীটীকে মহিমের বড় রিক্তা, বড় দুঃখিনী বোধ হইল।

আগাইয়া গিয়া সে কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"জরটা এখন কেমন আছে চন্দনা ?"

একটু উদাসসুরে চন্দনা বলিল—"সেই রমকই আছে"—

চিন্তাকুল মুখে মহিম আবার শুধাইল—"একটুও কমে নি ? ওষুধটা ঠিক খেয়েছিলে তো ?"

চন্দনা তেম্‌নি ম্লান হাসি হাসিল।

বলিল—"তোমার পয়সা বুঝি ভারি সস্তা হয়েচে ? কেন মিথ্যে ওষুধ কিনে আন বল তো ?······আমি আর ওষুধ খাব না"······তা'রপর ক্লান্তকণ্ঠে বলিল—"মেয়েমানুষের প্রাণ অত সহজে বেরোয় না"······

খানিক স্তব্ধ থাকিয়া, মৃদু অভিমান-ক্ষুব্ধকণ্ঠে মহিম বলিল—"আজ তোর মায়ের পেটের বড় ভাই থাক্‌লে, সে ঠিক

এমনি কোরেই তার রুগ্ন ছোট বোনটীকে ওষুধ খাওয়াবার জন্যে জোর করত" বলিতে বলিতে, তাহার চোখ ছাপাইয়া টপ্ টপ্ করিয়া করিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

অপ্রতিভ চন্দনা ব্যস্ত হইয়া অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"ওকি, ওকি......আমায় মাপ ক'রো দাদা, আর কখনো তোমার অবাধ্য হবো না"......

মহিম তাহার মাথায় সস্নেহে হাতখানি রাখিয়া বলিল—"লক্ষ্মী বোন্‌টী আমার, রোজ দু'বেলা ওষুধ খাস্......এখন আসি তাহলে"......

ঝাঁপ্‌টা বন্ধ করিয়া দিয়া বাহির হইতেই, সহসা দুই লাল-পাগড়ী বিস্ময় বিমূঢ় মহিমের হাত দু'খানা কঠিন দৃঢ় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিল.........অদূরে দাঁড়াইয়া দুলাল তখন মুখ টিপিয়া ক্রুর হাসি হাসিতেছিল।

মহিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ—সে নাকি চন্দনার উপর অত্যাচার করিয়াছে। দুলাল অনেক সাক্ষী যোগাড় করিল।—অবশ্য ঘুসের মহিমায়।

মহিমকে কেহ কেহ বলিল—চন্দনাকে হাজির করিয়া সাক্ষী দেওয়াও। মহিম বলিল—না। এই জঘন্য কুৎসিত ব্যাপারে কুলবধূ চন্দনাকেও জড়াইয়া বিচারালয়ের সহস্র লোকের লালসা-লোলুপ ও বিদ্রূপ-তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে তাহাকে টানিয়া আনিয়া সে তাহার অপমান করিতে পারিবে না। তাহার চেয়ে যাহা দণ্ড হয়, সে-ই তাহা গ্রহণ করিবে। বিচারে মহিমের পাঁচ মাসের জেল হইল।.........

জেলে বসিয়া—মহিমের মনে পড়ে ব্যথা-করুণ শঙ্কা-ম্লান দুটী চোখ......আর দিন গোনে।

......বাঙালী ঘরের বউ যে বড় অসহায়!......

পাঁচমাস পরে এক প্রভাতে মহিম মুক্তি পাইল।

অবসন্ন পা দুটোকে কোনমনে গৃহ অভিমুখে চালাইয়া দিল। বুকে উদ্বেগের ব্যাকুলতা।—

বস্তির সরু গলিটার মুখে পাড়ার শশীশেখরের সঙ্গে দেখা।

মহিমকে দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল—"আজই ছাড়া পেলে বুঝি?......আহা, আর একটা দিন আগে আস্‌তে যদি!... কাল রাত্তিরেই সব শেষ হোয়ে গ্যালো".........

বিকৃত শুষ্ক-কণ্ঠে মহিম শুধাইল—"কার কথা বল্‌চেন?"

—"ওই যে—দুলালের পরিবারের কথা......স্বামীটা একটা খুনে......ভরা পোয়াতী বৌটাকে লাথিয়ে মেরে ফেল্‌লে.........."

মহিম পড়িতে পড়িতে পাশের ঘরের দেওয়ালটা ধরিয়া সাম্‌লাইয়া লইল। তা'রপর টলিতে টলিতে চলিল—যেন কতকালের দুর্ব্বল রোগী।

......চোখের সম্মুখে তিমির-রাত্রির নিবিড় নিরন্ধ্র অন্ধকার......

পথের পাশে হলুদ-রঙের একটী ছোট ঘাস-ফুল কে যেন ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। সেই ছিন্ন ফুল-মঞ্জরীর পানে চাহিয়া সহসা মহিমের দু'চোখে জলে ভরিয়া উঠিল।......

......ওই ফুলটী যেন চন্দনা!

—"মেঘ চুম্বিত অস্তগিরির চরণ তলে"—

বিনিয়ান সাহেবের "চৈনিক চিত্র সংগ্রহ" হইতে। Bela P. W.

জন্মদিনে

—শ্রীমতী লীলা নন্দী

কিবা চাহি, কি কামনা করি তব লাগি
জানিতে বাসনা তব? কেমনে বোঝাই?
কি কামনা নাহি করি, আমি তাই ভাবি!
এ জগতে কোন শুভ কাম্য মোর নাই—
তোমা তরে! তাই আজ তব জন্মদিনে
ভারে ভারে আনে সবে কত উপহার,
কত না কামনা করি—আমি ভাবি মনে
সব দিতে পারি তারে কিবা দিব আর?
ভাষা তাই হার মানে, মৌন হয়ে রই;
শুভ ইচ্ছা উচ্চারিতে কথা বেধে যায়—
নূতন করিয়া আজ কিবা তারে কই—
এ জনম পূর্ণ যার শুভ-কামনায়!
গাঁথিয়া এনেছি শুধু গীতি-মালা-খানি
এই উপহার—এই অকথিত বাণী!

ব্রাহ্মণ

—শ্রীচন্দ্রশেখর আঢ্য

অতীতের পুণ্য দিনে, সাধনার স্নিগ্ধ মহিমায়
সুগম্ভীর, সুকঠোর হে ব্রাহ্মণ, প্রণাম তোমায়।
সৌম্য-মূর্ত্তি, কান্ত-কান্তি, তেজঃপুঞ্জ পুণ্য ললাটের
অধরে মধুর হাস্য, আনন্দের অনিন্দ্য নির্ঝর।
নেত্রতটে স্বপ্ন জাগে, অনন্তের পেয়েছ আভাস,
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ বিশ্ব, চেয়ে আছে অসীম আকাশ।
স্বচ্ছ-সরা সিন্ধুতীরে ঝঙ্কারিছে গন্ধময় গাথা,
সাম গান, বেদ গান, আনন্দের অভিনব কথা।
ঊর্দ্ধগত হোমশিখা লেলিহান চৌদিকে তোমার,
যোগযুক্ত হে যতীন্দ্র তুমি স্থির আনন্দে উদার।
সে দিন হারায়ে গেল, অস্ত গেল সে গৌরব রবি
গোধূলি চঞ্চল হ'ল, সন্ধ্যা এল, আঁধারের কবি।
জীর্ণ-বুক, শীর্ণ-মুখ হাহাকার নয়নে তোমার,
গত-গন্ধ হে নরেন্দ্র! হারাদিন মিলিবে আবার?

দরদিয়া

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

কেবল ক্ষুধা,—কেবল অভাব; কিন্তু তা সত্ত্বেও রসিক মনের রসের অভাব হয় না কোন দিন। ঠাট্টা মস্করাটা রাখাল অনেকখানি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

মাঝখানে বাড়ীউলির ঘর—খোলার ছাদ! ডাইনে বাঁয়ে দুখানা ঘরে দু'জন ভাড়াটে। বাম দিকের ঘরটাতেই অন্ধকারে চক্ষু বুজিয়া রাখাল ধনীর প্রাসাদের স্বপ্ন দেখে। লম্বা লিক্‌লিকে চেহারা, অস্থিসার মানুষটী—চক্ষু কোটরে ঢুকিয়াছে—তবু তিরিশ পার হয় নাই।

ডাইনের ঘরটাতে একটী বিধবা মেয়ে থাকে—জাতে নাকি বামুন; পাড়ায় কোন্ এক উকীলদের বাড়ী রাঁধিয়া যাহা পায় তাহাতেই সুখে দুঃখে দিন কাটায়—অবসর সময়ে তুলা পেঁজে, সুতো কাটে,—বাড়ীউলির সঙ্গে গল্পও করে।

এক বাড়ীতে থাকা,—উঠিতে বসিতে দেখা,—তাইতেই কথাটা আসটা কইতে হয় পুরুষ মানুষের সঙ্গে। উপায় নাই।

পরিচয় পুরাতন হইতে চলিল—তাই সময় বিশেষে মাথার কাপড়টা টানিয়া দিতেও আলিস্যি! লজ্জা করলে

চলে না—তাতে আবার রাখাল নূতন সম্পর্ক পাতাইয়াছে—ব্যান্।

বিবাহই হইল না—তা ছেলে মেয়ে,—তবু ব্যান্।

বামুনের মেয়ে মুখ টিপিয়া হাসে,—রঙ্গ করিয়া বলে—অতই যদি সাধ ত বড়ো সড়ো দেখে একটা বিয়েই করো না বাপু,—দুদশ বছর বাদেই সত্যিকারের ব্যান্ পাবে।

রাখাল হাসে না, গম্ভীর হইয়া বলে,—বুড়ো বয়সে আর অত সখ পোষাবে না, পাতানো ব্যানেই সত্যিকারের খেদ মিটিয়ে নিতে পারি।

ব্যান্ আর কিছু বলে না, কিন্তু চোখের তারায় হাসির রঙ্গ উছলিয়া উঠে।

সেদিন সন্ধ্যার আগেই আকাশ ভাঙ্গিয়া শতধারে বৃষ্টি নামিল। প্রবল বৃষ্টি! প্রলয়ের দেবতার উদ্দাম ও তাণ্ডব রুদ্রলীলা! বিদ্যুতের ঝিকিমিকি!

বামুনের মেয়ের ঘরের চৌকাঠে দাঁড়াইয়া রাখাল বলিল—চারটে পয়সা ধার দাও ব্যান্,—এ দুর্য্যোগে আর রেঁধে খেতে পারি নি—মুড়ি মুড়কিতেই সেরে নিই আজ রাতটা।

এমনি ধার সে দু'মাস ধরিয়া করিতেছে। শোধ হয় না—। হইবে কোথা থেকে? এক পয়সা আয় নেই, কিন্তু ব্যয়েরও অভাব নাই।

কোমরে বাতের জন্য কলের চাকরিটা ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। ব্যস্, তারপর তিন মাস চুপচাপ বসিয়া থাকা,—কাজও নাই, কর্ম্মও নাই—কপর্দ্দকশূন্য।

ধারেই যত দিন চলে—।

লোকও জুটিয়াছে ভালো! বামুন মেয়ের আঁচলে পয়সা বাঁধাই থাকে—কোন দিন না বলে না।

—কিন্তু আজ আর সে হাসির সহিত পান উপহার দিল না,—বদলে খুব শক্ত শক্ত দুটো কথা শুনাইয়া দিল।

বলিল—পান আকাশ থেকে পড়ে না?—তাই রোজ রোজ চাইতে আস। ধার ত করেছ এক কাঁড়ি, শোধবার নামটী নেই। তাও যদি বুঝতুম একটা কাজের চেষ্টায় আছ, তাও না; খালি বাড়ী বসে বসে মেয়ে মানুষের টাকায় খাবে আর ঘুমোবে কুনো আর কাকে বলে?

তারপর ফিস্ ফিস্ করিয়া আপনার মনেই বলে—হায় রে, তাও যদি সত্যিকারের আপনার কেউ হ'ত।

রাখাল নির্ব্বাক হইয়া কথাগুলা গিলিতে লাগিল। এমন ধারা ব্যবহার সে আজ অবধি ব্যানের কাছে পায় নাই—কাজেই একটু আশ্চর্য্য ঠেকিল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া, উঠানটা পার হইয়া, নিজের ঘরে আসিয়া সে তক্তাপোষে শুইয়া পড়িল।

সামনেই কুয়াতলার পাশে ন্যাড়া আমড়া গাছটা আঁকু পাঁকু করিয়া উঠিয়াছে সটান আকাশের দিকে। খোলা দরজা দিয়া অন্ধকারে সেটা দৈত্য বলিয়া মনে হইল। চোখ ফিরাইয়া লইয়া রাখাল একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

করুণ রাগিণীতে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকে। সাঁ সাঁ করে রাত্তির। চোখ ঘুমে ঢুলিয়া আসিবার আগে রাখাল শোনে, যেন পাশের ঘরে বাড়ীউলি কাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে—বলে, টাকা থাকলে বিয়ে করা স্বামীকেই লোকে ধার দেয় না, এ দেখি মেঘ না চাইতেই জল—তবু ভালো আজকে ছুঁড়ির মুখ ফুটেছে।

বৃষ্টি থামিল, কিন্তু প্রকৃতির রোষ থামিল না। উন্মত্ত গর্জ্জনে আকাশ খানা বুঝি চৌচির হইয়াই ফাটিয়া পড়ে!

প্রত্যহ খাইবার পর একটী করিয়া পান বরাদ্দ আছে ব্যানের কাছে। তাই রাখাল দাওয়ায় উঠিয়া ডাকিল—পান কই গো ব্যান্।

মাথায় কাপড় তুলিয়া বামুন মেয়ে বাহিরে আসিল বটে

গলির মোড়ে রামধন মিস্ত্রীর দোকান। ভাঙা ঘটি, বাটি বালতি, ষ্টোভ্ মেরামত করে। পুরাতন ঝরঝরে তোরঙ্গগুলাও রং মাখাইয়া ঝক্ ঝক্ করিয়া বিক্রী করে।

স্নান করিবার আগে ঐখানেই তামাকটা বিড়িটা অমনি মেলে। রাখাল আসিয়া বলে—কিছু যোগাড় হ'ল দাদা?

—কই আর হ'ল? চেষ্টায় ও আছি। বলিয়া রাম-

ধন হুঁকাটায় একটা টান মারিয়া রাখালের হাতে বাড়াইয়া দেয়।

হতাশের আশা, ছাড়িয়াও ছাড়ে না। মুখ কাঁচু মাচু করিয়া রাখাল বলে,—তোমার চেষ্টা দেখতে গিয়ে আমি যে এদিকে শ্রীঘরে চালান যাই রামু'দা।

—পাগল না ক্ষ্যাপা, বলিয়া রামধন হাপরে কয়লা ঢালিতে থাকে।

ঐ পর্য্যন্ত ! কাজ কর্ম্মের যোগাড় আর হয় না।

সেদিন মাথায় তেল ঘসিতে ঘসিতে রাখাল হাজির হইতেই রামধন বলিল—কবে খাওয়াচ্ছ বল ভায়া ?

উদ্‌গ্রীব হইয়া রাখাল শুধাইল—যোগাড় একটা হয়েছে নাকি দাদা ?

রামধন সোজা কথার মানুষ নয় ; খবরটা দিতে অনেক হেঁয়ালির সৃষ্টি করে, শেষকালে ঠিক কথাটাই বলে—ভায়রা ভাইয়ের চেষ্টা দাদা, একি বিফল হবার যো'টি আছে ?

ট্রাম কোম্পানীর কন্‌ডাক্‌টার্ ! বিস্ময়ে ও আনন্দে রাখালের চোখ বিস্ফারিত হ য়া উঠে—চোখের কোণে দুফোঁটা অশ্রুও চকচক্ করে হয়ত !

রামধনের হাত দুটা ধরিয়া রাখাল ঝাঁকি দিয়া বলিয়া উঠে—মাইনে পেলেই বৌদির হাতে খাড়ু গাড়িয়ে দেবো, দেখে নিও।

রামধন হুঁকাটা বাড়াইয়া দিয়া চোখ মিট্‌মিট্ করিয়া হাসে—জবাব দেয় না।

সেদিন বাড়ি ফিরিয়াই রাখাল বামুন মেয়ের দাওয়ার গিয়া উঠিল। কয়দিন আর দেখা সাক্ষাৎ ছিল না—রাখাল অভিমানে ইচ্ছা করিয়াই এড়াইয়া চলিয়াছে। আজ কিন্তু আগেকার কথা কিছুই মনে পড়িল না,—মনের আলোয় অভিমানের আঁধার কাটিয়া গিয়াছে বোধ হয়।

—আজকে তো পান না নিয়ে উঠছিনা ব্যান, বলিয়া রাখাল দাওয়ার উপরই জাঁকাইয়া বসিল।

তরুণী পানে রাঙ্গা অধরখানি টিপিয়া টিপিয়া হাসে—ধারের কথা আর উত্থাপন করে না। বলে—কি ভাগ্যি আমার যে একমাস পরে আবার মনে পড়লো,—একেই বলে পাতানো সম্বন্ধ !

রাখালের মাথাটা ঘুলাইয়া উঠে ! তাই ত ! এতদিন অভিমান করাটা, ভুল হইয়া গিয়াছে। ব্যান্ ও বড় মিথ্যা কথা বলে নাই।

শেষে বিনাইয়া বিনাইয়া বলে—রাগ করো না ব্যান্, কাজের চেষ্টায় পাগলা কুকুরের মত ছুটে বেড়াচ্ছিলুম,—এইবার তোমার ধারটার সব শুধে তবে অন্য কথা,—বলিয়া রাখাল ড্যাব্‌ড্যাব্ করিয়া চায়।

বামুন মেয়ে এবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া ফেলে—বলে—যেমন এতদিন শুধেছ।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার কথার ভোল্ অন্যদিকে ফিরাইয়া লয়।

কয়দিনের পান দোক্তা সেদিন রাখাল সুদে আসলেই ফিরাইয়া পায়।

দিনের আলো হাসিয়া লুটোলুটি খায়,—পাখীরা কিচির্ মিচির করে। রাখাল গট্‌মট্ করিয়া চলে।

খাকীর পোষাক পরিয়া, মাথায় টুপি চড়াইয়া রাখাল ট্রামের পা দানিতে চাপিয়া দাঁড়ায়। একহাতে টিকিটের বাণ্ডিল, অন্যহাতে ফুটা করিবার যন্ত্র—বুকে ব্যাগ ঝোলে।

রাখাল গর্ব্বিত চোখে চারিদিকে চায়—ভাবে সকলেই বুঝি তাহার দিকে চাহিয়া আছে ! যেন অন্য জগতে বিচরণ।

ইচ্ছা হয় আরসিতে নিজের চেহারাখানা একবার দেখিয়া লইতে। ট্রামের জানলার কাচে সে অভাব মিটাইয়া লয়। হঁ্যা, মানাইয়াছে বটে !

ইন্‌স্পেক্‌টার্ হাঁকে—কি হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ ? —এধারে টিকেট কাটনা এসে।

ছাড়ানো মন একত্রিত হয়। রাখাল হাঁ হাঁ করিয়া আগাইয়া আসে।

—কিসের টিকিট, কালিঘাটের? দু'আনা লাগবে!

—তা জানি, বলিয়া আরোহী তাচ্ছিল্যের সহিত পয়সা ফেলিয়া দেয়।

তখনও খেয়ালের ঘোর সম্পূর্ণ কাটে নাই বোধ হয়। তাই অ বেগের মাথায় কালিঘাটের বদলে হাইকোর্টের টিকিটই কাটল য হো'ক।

আ রো হী চমকাইয়া উঠিল—এ টিকিট কে চেয়েছে?

ও হ ! রাখাল দাতস্থ হইল—কিন্তু সে ট্রামে হাইকোর্টের আরোহী আর মিলল না। ট্যাক্ থেকেই দু'আনা গেল।

এবার থেকে একটু দেখিয়া শুনিয়া রাখাল টিকিট কাটে। তবুও প্রতিদিনই একটা না একটা গোলমাল হইয়া যায়।

আর একদিন টিকিট কাটিতে ভুল হইল, কিন্তু সেদিন রাখালের দোষ ছিল না—আরোহীই ভুল বলিয়াছে।

কিন্তু বাবু নিজের ভুল মানিতে চাহিলেন না, রাগিয়া গিয়া বলিলেন—আমি করলুম ভুল, আর তুমি কুড়ি টাকা মাইনের চাকর হ'য়ে একেবারে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির বনে গেছ না?

রাখাল অনুযোগ করিল,—মিছামিছা কথা ঘুরিয়ে নিলে --কথা শেষ না হইতেই বাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন—কী, আমি মিছে কথা বলেছি, শালা ছুঁচো কোথাকার!

রাখালের রক্ত গরম হইয়া উঠিল, বলিল—মুখ সামলে কথা ক'বেন বাবু!

তবে রে শালা—ঘুসি পাকাইয়া বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু অন্যান্য আরোহীর মধ্যস্থতায় সেদিন ব্যাপারটা ঐখানেই থামিয়া গেল।

আর একদিন!

একটী বাবু টাকা দিয়া টিকিট চাহিলেন। রাখাল বাজাইয়া দেখিল—অচল! তাছাড়া টাকাটার একধারে একটা কাটার দাগ! ফিরাইয়া দিয়া রাখাল বলিল—টাকাটা বদলে দিন বাবু!

—কেন বাপু, এটা অচল কোন খানটায় দেখলে?

রাখালের বেশী বাক্ বিতণ্ডা করিতে ইচ্ছা ছিল না। শুধু কাটা দাগটা দেখাইয়া, টাকাটা বাজাইয়া শুনিয়া দিল।

আর এক বাবু টাকাটা দেখিতে চাহিলেন—তারপর মতামত ব্যক্ত করিলেন—উনি তো আর টাকা ঘর থেকে তৈরী করে আনেন নি অচল কিসে হ'ল শুনি?

চমৎকার যুক্তি!

গাড়ীর সকল আরোহীই টাকাটা দেখিলেন,—শেষে পূর্ব্বোক্ত বাবুর পক্ষেই সায় দিলেন! ট্রামে এই সব ব্যাপারে বাঙ্গালী বাবুদের অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য জনক একতা দেখিয়া রাখাল হতাশ হইয়া পড়িল।

নিরুপায়!

সামান্য কুড়ি টাকা মাহিনা থেকে একটী টাকা গুণ'গার দিতে হইলে এই সব দীনদরিদ্রের কতখানি বুকের রক্ত ঢালিতে হয় তাহা এই সব ধনী বাবুদের কাহারও মাথায় একটী বারও উদিত হইল না।

অথচ যাহারা সায় দিতে গিয়া পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন তাহাদের টাকাটা লইয়া বদলাইয়া দিতে বলায় চুপ হইয়া গেলেন।

গেঁট্ হইতে আবার একটী টাকা খসিল।

মোহ কাটিয়াও কাটিতে চাহে না। চাকরী,—সোণার চাকরী! কিন্তু সেদিন সত্য সত্যই কাটিল।

অন্যদিনের মতোই অন্য মনস্ক ভাবে চারিদিক দেখিতে দেখিতে রাখাল চলিয়াছে—ট্রলির দড়ি হাতে। মোড়ে ট্রাম থামিতে না থামিতেই রাখাল ঘণ্টা বাজাইয়া দিল।

ট্রাম তখন চলিয়াছে—এমন সময় ছুটিতে ছুটিতে কোন ক্রমে লাফাইয়া উঠিয়া এক কুম্ভীরকায় ভুঁড়িওয়ালা গোলগাল মোটা লোক রাখালের দিকে ঘুসি বাগাইয়া আসিল। রাখালের খেয়াল হইল—ডাকাত! খানিকটা সরিয়া গিয়া

সে আত্মরক্ষা করিল। মোটা লোকটী রুক্ষস্বরে কহিল—কণ্ডাক্‌টার্‌গিরি ফলাতে এসেছ শালা? প্যাসেঞ্জার না উঠতেই ঘণ্টা? নম্বর নিকালো আবি।

টাল সামলাইতে না পারিয়া রাখাল চীৎপাত হইয়া পড়িল, ফুটপাথের পাশটায়। একটা ভাঙ্গা বোতলের কুচি লাগিয়া রগের খানিকটা ছিঁড়িয়া গেল। পা'টা মুচকাইয়া ভাঙ্গিয়াই বা গেল বুঝি!

* * * * *

এবং তারি ফলে পরদিন কোর্টে দশটী টাকা জরিমানা দিয়া রাখাল শুষ্কমুখে বাহির হইয়া আসিল।

বুক ঠেলিয়া একটা রুদ্ধ আবেগ বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছে। জোরে নিশ্বাস ফেলিয়া রাখাল ফুটপাথের একপাশে আসিয়া দাঁড়াইল! সামনে অজস্র গাড়ী ঘোড়া ছুটিয়াছে—যেন একটা স্বপ্ন!

হঠাৎ চোখ পড়িয়া গেল, সেই মোটা লোকটারই উপর, হাঁস ফাঁস করিয়া চলিয়াছে। রাখালের দিকে দৃষ্টি পড়ায় লোকটা দাঁত বাহির করিয়া হাসিল।

রাখালের রক্ত গরম হইয়া উঠিল, চীৎকার করিয়া কহিল—টাকা দশটা ব্যাঙ্কে জমা রেখে দেবেন, বুঝলেন? —মেয়ের বিয়েতে কাজে লাগবে।

—কী যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা,—মোটা লোকটা হুড়মুড় করিয়া রাখালের ঘাড়ে পড়িল।

অনেক রাত্রে পায়ে তেল মালিস করিতে করিতে বামুন মেয়ে বলিল,—সেই যে বলে না, যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্য লোকের লাঠি বাজে—ঠিক তাই! তালপাতার সেপাই, উনি গেলেন ট্রাম চালাতে।

রাখালের মুখে কী যেন একটা তৃপ্তি ও অবসাদের হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে,—চোখে কিন্তু ফোঁটা কয়েক জল চক্ চক্ করিতেছে—ঝরিয়াই বা পড়ে বুঝি! উদাসকণ্ঠে সে বলিল—তোমার ধার আর শোধ করা হ'ল না ব্যান্।

বামুনের মেয়ে হাসে—তেমনিই মুখটিপে হাসি,—অন্ধকারে রাখালের চোখে পড়ে না।

ঘরের ভিতর দরদী দু'টী প্রাণীকে ঘিরিয়া অনন্ত স্তব্ধতা বিরাজ করে—বাইরে রাত্রির দীর্ঘছায়া ঘুমন্ত সহরটার উপর পড়িয়া পড়িয়া ঘুমায়!.........

নীলকণ্ঠ

—পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর—

—নয়—

প্রিয়নাথ কিছুদিন আগ্রায় ছিলেন। রোজ একটীবার অপরাহ্নে তাজমহলে বেড়াইতে যাইতেন। যমুনার ধারের দিকে সেইখানে মেয়েকে কাছে লইয়া বসিয়া নদীর প্রবাহ দেখিতেন। ভাবিতেন, এই যমুনার তীরে মমতাজ চির-নিদ্রায় ঘুমাইয়াছিল। সাজাহান প্রেমময়ী দয়িতার পাশটীতে আপনার দেহ রাখিয়াছে,—মৃত্যুর মাঝে আজ দুই আত্মা স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া এক হইয়া মিলিয়াছে। এই যমুনারই বুকে কানু ও রাধা, প্রেমের খেলা খেলিত, আজ তাহারা অনন্ত শয়নে অনন্ত মিলনের বাঁধনে বাঁধা পড়িয়াছে। মৃত্যু কখনও তাদের ভালবাসার এই নিগড় ভাঙিতে পারে নাই!

তবে কেন এমন হয়? দু'দিনের পিপাসা মিটিল না,—আশা সাধ কিছুই পূর্ণ হইল না,—এই যে কালবৈশাখী আসিয়া অভাগিনী বালিকার সুখের ঘর ভাঙ্গিয়া দিল,—কেন? এ কোন্ মায়াবীর খেয়াল? বিধাতা কেন এত নিষ্ঠুর? হৃদয় এমন মরুময় শ্মশান হইয়া গেলে, মানুষ বাঁচে কেমন করিয়া?

প্রিয়নাথ সুলতার মুখের দিকে চাহিয়া তাকাইতে পারেন না! একে সে স্বামীর বিয়োগে কাতর, তার উপর মাকেও হারাইয়াছে। নিজের মর্ম্মান্তিক কষ্ট ভুলিয়া প্রিয়নাথ ভাবেন সুলতাকে কেমন করিয়া বাঁচাইবেন!

যমুনার জল আপন মনে কাঁদে—গায়—হাসে। তাহার শ্রবণে যখন যার হৃদয়তন্ত্রীর যে সুরটী আসিয়া ঝঙ্কার তুলিত, আজ তার করুণ রেশটুকুই শুধু জাগিয়া আছে! কোন সুরে শ্যামের 'রাধা নামে সাধা বাঁশী' বাজিত, কোন সুরে মমতাজের কণ্ঠগীতি প্রেম-যোগী সাজাহানের প্রাণে মূর্চ্ছনা তুলিত, আজ যমুনা তা ভোলে নাই। পাগলিনীর বুকের বীণায় অতীতের চির আদরের সেই সুরগুলি প্রতিধ্বনি তুলিতেছে!

ওই অফুরন্ত ভালবাসার নন্দনকাননে শত পারিজাত নিত্য ফুটিয়া সুরভি বিলাইতেছে, আকাশে দেবকন্যারা তাহাদের সমাধির ধারে হীরা মাণিকের আলো জ্বালিয়া দিতেছে, অপ্সরীরা জ্যোৎস্নার পোষাক পরিয়া আনন্দে নাচিতেছে ও গাহিতেছে! উহাদের মাঝখানে সুলতার ছোট বুকের ব্যথাটুকু স্থান পায় কই? যমুনা রাধা শ্যামের সুখ দুঃখের কথাই ভাবে, সে প্রেমের রাণী মমতাজের কথাই জানে—কিন্তু আজ যে মেয়েটী তাহার দিকে চাহিয়া এক বিন্দু সহানুভূতি আকাঙ্ক্ষা করিতেছে তাহার কষ্ট সে কি কিছু বোঝে?

সুলতা কাঁদিয়া বলিল, "বাবা! ভাল লাগছে না! পালিয়ে চল তুমি এখান থেকে!"

প্রিয়নাথ মথুরা গেলেন, বৃন্দাবন গেলেন, হরিদ্বার গেলেন। দিল্লী জয়পুর আজমীঢ়—কোথাও দুজনের কাহারও মন টিকিল না। কোথাও স্বোয়াস্তি নাই। শেষে এক দিন আবার বাংলায় ফিরিতে মনস্থ করিলেন। পথিমধ্যে মতলব পরিবর্ত্তন হইল। বৈদ্যনাথ জংসনে নামিয়া পড়িলেন। জেসিডিতে নির্জ্জন দেখিয়া একটী বাঙ্গলো ভাড়া করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

সুলতাকে থান কাপড় পরিয়া, হাত খালি করিয়া বেড়াইতে দেখিতে প্রিয়নাথ মরমে মরিয়া যাইতেন। এক দিন আর সহিতে না পারিয়া বলিলেন, "মা! যে কটা দিন আমি বেঁচে আছি, তোর এ মলিন বেশ আমি দেখতে পারব না। আমার কথা তোকে শুনতেই হবে। তোর চোখের জল মুছিয়ে আমি আবার তোকে তেমনি করে সাজাব। বিধাতার শাস্তি আমরা মাথা পেতে নিয়েছি। কিন্তু আর কাঁদতে পারি না। তাঁর রাজ্যে সবাই আনন্দে কালাতিপাত করছে, আমরাই শুধু চোখের জলে জীবনের পাতাগুলো ভিজিয়ে যাব—এ আদেশ তাঁর হতে পারে না। আনন্দময়ীর রাজ্যে আমরাও জোর করে হাসব। বুক ভেঙে গেলেও হাসি ভুলব না। বিধাতা মায়ের মত শাসনদণ্ড হাতে নিয়ে যতই প্রহার করবেন, আমরা চেঁচিয়ে বলব লাগছে না। আমরা কাঁদব না একটুও। আমরা বলব আমরা আনন্দময়ীর সন্তান—কাঁদতে জানি না। হেরে কাঁদা আর মৃত্যুর মধ্যে তফাৎ নেই!"

প্রিয়নাথ সুলতার কোন আপত্তি শুনিলেন না। সে আবার সাড়ী পরিল। পিতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য সে তাহার গহনার বাক্স পুনর্ব্বার খুলিয়া চুড়ী ও হার বাহির করিয়া পরিল। সেদিন হইতে আর সে চুল রুক্ষ ও এলায়িত করিয়া রাখিত না। প্রিয়নাথ তাহার জন্য জুতা কিনিয়া দিয়াছিলেন। বিকাল হইলেই প্রসাধন সারিয়া সে পিতার সহিত বেড়াইতে যাইত। প্রথম কয়েকদিন তাহার মন কেবলি বিদ্রোহ করিতেছিল। ভাবিত সমস্ত ফেলিয়া দেয়। হিন্দুর মেয়ে হইয়া একি অনাচার সে করিতেছে? এই সব কথা মনে হইলে সে সন্ত্রস্ত হইত। পরক্ষণে সে যখন পিতার প্রসন্ন মুখের দিকে চাহিত, তার আর কোন আপত্তি থাকিত না। ক্রমে সমস্তই সহজ ও অভ্যস্ত হইয়া আসিল। তাহার যে স্বামী নাই,—এই বিলাস ও লালসা যে বিধবার পক্ষে গর্হিত কাজ, সে সব কথা আর মনে হইত না। ক্রমে তাহার নিজের ইচ্ছার গতিও কেবলি আনন্দ খুঁজিয়া বেড়াইত। মাঠের মধ্যে চঞ্চলা হরিণীর মত সে ছুটাছুটি করিত। কোনও দিন দিঘড়ার পাহাড় দেখিতে বন ভাঙ্গিয়া মনের উচ্ছ্বাসে ছুটিয়া চলিত, কোনও দিন বা খাল বিল অতিক্রম করিয়া নন্দনে বেড়াইতে যাইত। কোনও দিন দেওঘর অথবা তপোবন পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিত। দু'একবার ত্রিকুট পর্য্যন্ত হাঁটিয়া বেড়াইয়া আসিল। পিতা

ও কন্যা কাহারও যেন আর ক্লান্তি বা অবসাদ নাই। গ্রামের কাহারও সঙ্গে তাঁহারা মিশিতেন না। একটী ভৃত্য পর্য্যন্ত ঘরে থাকিত না। পিতা আপনি সকাল বেলা বাজার করিয়া আনিতেন, সুলতা রাঁধিত। ঘরের সমস্ত কাজ দুইজনে আপনারা সমাধা করিতেন। ইংরাজী বাঙ্‌লা সংস্কৃত বই ভাল যাহা যাহা আছে প্রিয়নাথ কিনিয়া আনিতেন; নিজে পড়িতেন ও ব্যাখ্যা করিয়া মেয়েকে বুঝাইয়া দিতেন। ক্রমে সুলতারও ব্যুৎপত্তি জন্মিল। দুই বছরের সাধনার পর সে আপনি অনেক বই পড়িয়া বুঝিতে পারিত! তাঁহারা আর নিজেদের অসুখী মনে করিতেন না। এইরূপে তৃতীয় মানবের সখ্যতা না চাহিয়া দুইজনে পরম আনন্দে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। কাহারও নিন্দা বা স্তোক শুনিতে হয় না। কেহ সহানুভূতি দেখাইতে আসে না। তাঁহাদের সুখে হিংসা করিতেও কেহ নাই। এমনি করিয়া জন্মভূমি ভুলিয়া সমাজ ভুলিয়া, শাস্ত্রের প্রচলিত বিধান না মানিয়া এই দুইটী মানুষ সকলকে ফাঁকি দিয়া প্রকৃতির লীলা ভূমিতে আনন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

নন্দন পাহাড়ে উঠিতে গিয়া প্রিয়নাথ একদিন অসাবধানে পড়িয়া আহত হইলেন। সুলতা এই অভাবনীয় বিপদে ভয়ে অভিভূত হইয়াছিল। সাহায্য করিবার সেখানে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তখন সন্ধ্যার বেশী বিলম্ব ছিল না। সুলতা কাঁদিয়া ফেলিল। প্রিয়নাথ কোনও ক্রমে উঠিয়া বসিলেন। অনেক স্থানে ক্ষত হইয়া গিয়া রক্ত ঝরিতেছিল। সুলতার কাঁধে ভর করিয়া দাঁড়াইতে গিয়া আবার বসিয়া পড়িলেন। সুলতা তাহাকে কেমন করিয়া বাড়ী লইয়া যাইবে ভাবিয়া পাইল না।

ভাগ্যক্রমে সেই সময় কয়েকটী বাঙালী যুবক পাহাড় দেখিয়া নামিতেছিল। তাহাদের দেখিয়া সুলতা কিছু সাহস পাইল। কিছুক্ষণ পরে তাহারা অপেক্ষাকৃত নিকটে আসিলে সুলতা সাহায্য প্রার্থনা করিল। যুবকেরা তাহার কাতরোক্তি শুনিয়া ও প্রিয়নাথকে আহত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া ছুটিয়া কাছে আসিল। নলিন বলিয়া তাহাদের মধ্যে একজন বলিষ্ঠ যুবক ডাক্তারী কলেজের ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িত। সে আপনার সঙ্গীদের সাহায্যে যাহাতে প্রিয়নাথের বিশেষ কিছু ব্যথা না লাগে এমনি উপায় অবলম্বন করিয়া নিম্ন ভূমিতে নামিয়া আসিল। এক খানি প্রাইভেট মোটর দেওঘর হইতে ফিরিতেছিল। যুবকেরা তাহার অধিকারীকে অনুরোধ করিয়া প্রিয়নাথকে বাড়ী রাখিয়া আসিবার বন্দোবস্ত করিল। গাড়ীতে নলিন সুলতাদের সঙ্গে গিয়াছিল। অন্য যুবকেরা সুলতার কাছে ঠিকানা শুনিয়া, পদব্রজে আসিল। নলিন সেই রাত্রে স্থানীয় ডাক্তারখানা হইতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার সরঞ্জামাদি লইয়া আসিল। মর্ফিয়া ইন্‌জেকশনেরও ব্যবস্থা করিল। প্রিয়নাথ কিছুক্ষণের জন্য যন্ত্রণা ভুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

যুবকেরা আপনাদের বাসায় চলিয়া গেল। যাবার সময় নলিন সুলতাকে বলিল "আপনি ভয় পাবেন না। আমরা আবার কাল সকালে এসে দেখে যাব।"

সুলতা কৃতজ্ঞ নয়নে তাহাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাইয়া বলিল "একটু মনে রাখবেন। আমার এখানে সাহায্য করবার কেউ নেই! ভাগ্যিস্ আপনাদের আজ দেখতে পেয়েছিলুম। তা নইলে হয়ত সেখানেই সমস্ত রাত বসে কাটাতে হত!"

দিন দুই তিন নিয়মিত ভাবে যুবকেরা সকলেই প্রিয়নাথকে শুশ্রূষা করিতে আসিয়াছিল। তারপর একদিন কেবলমাত্র নলিন আসিল। বলিল "আর যারা ছিল সকলেই বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। আমারও ছুটী ফুরাইয়াছে শুধু আপনার পিতার একটু ভাল অবস্থা না দেখিয়া যাইতে পারিতেছি না।"

সুলতা কি বলিয়া ধন্যবাদ দিবে ভাবিয়া পাইল না। এই যুবকের উদার সহৃদয়তায় সে মুগ্ধ হইয়াছিল!

প্রিয়নাথের ক্ষত শুকাইয়া আসিল। কিন্তু তিনি আর চলাফেরা করিতে পারিলেন না। পক্ষাঘাতে ডান পা অবশ হইয়া পড়িল।

নলিন একটী ভৃত্য সন্ধান করিয়া আনিয়াছে। ডাক্তার ডাকা কিম্বা ঔষধ ও খাদ্যদ্রব্যাদি বাজার করিবার জন্য তাহাকে অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছিল। নলিন কলিকাতা হইতে ভাল ডাক্তার আনিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিল। সকল ব্যবস্থা ঠিক করিয়া দিয়া নলিন বলিল "এবার আমায় না

ফিরলেই নয়। যখনই বিশেষ দরকার পড়বে আমাকে 'তার' করে জানাবেন। সুবিধা ক'রতে পারলে আমি নিশ্চয়ই ছুটে আসব।"

নলিন্ যাবার আগে প্রিয়নাথকে প্রণাম ক'রল।

প্রিয়নাথ নলিনকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, বলিলেন "ভগবান তোমাকে সুখে রাখুন। জীবনের পথে যে কাজ বেছে নিয়েছ, এমনি পরোপকার দেখাতে পারবার অনেক সুযোগ পাবে। প্রার্থনা করি সামনের পরীক্ষায় সফল মনোরথ হও।"

নলিন চলিয়া গেলে যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, সুলতা এক দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল।

প্রিয়নাথ ও সুলতার আবার দিন চলিতে লাগিল। অদৃষ্টকে ফাঁকি দিয়া তাঁহারা সুখী হইবেন ভাবিয়াছিলেন, অদৃষ্ট আর একবার বিদ্রূপ করিয়া বলিল "আনন্দ করবে না? আনন্দময়ীর সন্তান তোমরা!"

প্রিয়নাথ নিজের জন্য কাতর হইলেন না ক্রমে তাঁর দুইটী পা' অবশ হইয়া পড়িল। তিনি ভাবিলেন তাঁহার দিন ত গুণতির মধ্যে আসিয়াছে, সুলতার কি পরিণাম হইবে? সে কেমন করিয়া কি অবস্থায় দিন কাটাইবে। সুলতার ভাবনা ভাবিয়া তিনি ব্যাকুল হইলেন।

একবার ইচ্ছা হইল, সুলতাকে বৃন্দাবনের কাছে পাঠাইয়া দিবেন। ইহা মনে করিতেই তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। সেখানে নিত্য নিখিলের সহস্র স্মৃতি নূতন করিয়া জাগিবে, সুলতা ত' তাহা সহিতে পারিবে না। যে ব্যথা ভুলিতে এত দূরে পলাইয়া আসিয়াছে, আবার তাহাতেই দগ্ধ হইবার জন্য ফিরিয়া যাইলে অভাগী বাঁচিবে না।

নলিনকে কয়েক দিনের জন্য কাছে পাইয়া প্রিয়নাথ তাহাকে ভাল বাসিয়াছিলেন। ছেলেটী বড় সৎ। যে কদিন সে ছিল সুলতাকে তাঁহার জন্য কিছুই ভাবিতে হয় নাই। নলিন চলিয়া যাইবার পর হইতে সুলতার অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন। অবশ্য তাঁহার জন্য মেয়ের ভাবনা ও উদ্বেগ খুবই হওয়া সম্ভব সেটা আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু সুলতা এখন প্রায়ই অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। সময়ে সময়ে রাস্তার দিকে চাহিয়া কাহার যেন প্রতীক্ষা করে। প্রিয়নাথ ভাবিলেন সম্ভবতঃ সুলতা নলিনকে ভাল বাসিয়াছে। প্রিয়নাথ শঙ্কিত হইলেন। মেয়ের সুখের জন্য ত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য্যের পথ ফেলিয়া দিয়া ভোগের আয়োজন সাজাইয়াছিলেন, মনে খটকা লাগিল ঠিক করিয়াছেন কি? আজ মলয়ের পরশে সুলতা শিহরিয়া উঠে। পূর্ণিমার জ্যোছনা তাহাকে ভুলাইয়া এই বাহ্য জগৎ হইতে মায়া তরণী বাহিয়া কল্পনা রাজ্যে ভাসিয়া যাইবার পথ দেখাইয়া দেয়! পাখীর গানে তাহার হৃদয়ে মূর্চ্ছনা রণিয়া উঠে। যৌবন তাহার যত কিছু প্রলোভন আছে তাই দিয়া সুলতাকে প্রলুব্ধ করিতেছে। সুলতাকে ত্যাগের মন্ত্র তিনি শেখান নাই। সে আজ কেমন করিয়া আপনাকে সামলাইবে!

প্রিয়নাথ ভাবিয়া কূল কিনারা পাইলেন না!

—দশ—

প্রিয়নাথের আর বাঁচিবার আশা ছিল না। ছ'মাসের মধ্যে শরীর যেন বিছানার সহিত মিশিয়া সমান হইয়া গিয়াছে। উঠিয়া বসিতে পর্য্যন্ত পারেন না। সুলতা আহার নিদ্রা ভুলিয়া সেবা করিতেছে। এক একবার মনে হয়, এ সময় নলিন যদি কাছে থাকিত হয়ত পিতার কষ্ট লাঘব করিবার জন্য প্রাণ দিয়া খাটিত! সে থাকিলে হয়ত পিতা শেষ জীবনে একটু শান্তি পেতেন! সুলতা তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু হায়! সে যে নিতান্তই দুর্ব্বল ও অসহায়। সে একা কি যে করিবে ভাবিয়া না পাইয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছে!

নলিন বার দুই চিঠি লিখিয়া প্রিয়নাথের সংবাদ জানিয়াছিল। গত চিঠিতে লিখিয়াছিল, তাহার পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে, শেষ হইলেই তাঁহাকে দেখিতে আসিবে।

সুলতা গত কয়েকদিন হইতেই তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল।

একদিন দুপুর বারোটার সময় নলিন উপস্থিত হইল। সুলতা অশ্রুসিক্ত লোচনে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, "আর বুঝি বাবাকে বাঁচানো গেল না।"

নলিন তাহাকে প্রবোধ দিয়া বলিল "হতাশ হবেন না। যতক্ষণ শ্বাস আমাদের যুঝতে হবে। অন্ততঃ মরিবার

সময় যাতে শান্তি পান সেটুকু চেষ্টাও করতে হবে। চল দেখিগে তিনি কেমন আছেন।"

নলিন কাছে আসিলে প্রিয়নাথ প্রথমে চিনিতে পারিল না। অর্দ্ধস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে ?"

"আমি নলিন !"

"ওঃ ! এসেছ তুমি ? বস ! ভাল করে কাছে সরে এসে বস !"

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া প্রিয়নাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল আছ নলিন ! তোমার মা ভাল আছেন ?"

"হাঁ, আমরা সবাই আপনার আশীর্ব্বাদে ভাল আছি।.........আমি আর যে কিছুদিন আগে আসতে পারলুম না কাকা ! বড় দুঃখ হচ্ছে !........."

"আর বাবা ! এ ত' সুখের কথা ! যে যাতনা অন্তরে বাহিরে ভুগছি, তিনি দয়া করে ডাক দিয়েছেন এ ত' মুক্তি ! আনন্দ ! যাক্ তুমি এসে পড়েছ, আমি আর একটী ভাবনা থেকে নিশ্চিন্ত হলুম। নলিন !"

'কি কাকা ?'

"আমার মায়ের ভার তোমাকেই দিয়ে যাচ্ছি। তার আর কেউ নেই। দয়া করে তাকে দেখ, যেন অসহায় ও একলা পেয়ে মন্দলোকে তার অনিষ্ট না করতে পারে। তোমার পরিচয় বিশেষ কিছুই আমি জানি না। শুধু যতটুকু জেনেছি, বুঝেছি তোমার মত সৎ পরোপকারী দেখতে পাওয়া যায় না। সুলতাকে তোমারই বোন ব'লে কাছে ডেকে নিও। তুমি আমার মায়ের তত্ত্বাবধানের ভার নিলে সে সৎপথে থেকে জীবনের বাকী দিনগুলা কাটিয়ে দিতে পারবে। আমার অনুরোধ তুমি রেখ' ! টাকাকড়ির অভাব তাকে কখনও পেতে হবে না। আমার যা ব্যাঙ্কে আছে তাই থেকে একজন লোকের সারাজীবন স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে। বরং উদ্বৃত্ত থেকে দান-ধ্যানও করতে পারবে। তবু তোমাকে বলছি এই জন্যে, যে যদি চোখের সামনে রাখ আর মাঝে মাঝে দেখাশোনা কর—"

নলিন বলিল "আমাকে এত কথা আপনার বলতে হবে না কাকা ! সুলতার জন্য নিশ্চিন্ত থাকুন। যাতে বিন্দুমাত্র কষ্ট না পেতে হয় তাকে আমি তা করতে দেব না। তাঁর সমস্ত ভার আমি নিলুম। আপনাকে কিছুই ভাবতে হবে না। ভগবানের নাম করুন তিনিই সকলকে দেখবেন। আমরা কিছুই করতে পারি না। তবু মানুষের যা কর্ত্তব্য আমি পালন করতে দ্বিধা করব না—।"

প্রিয়নাথ আরও একমাস বাঁচিয়া ছিলেন। মৃত্যুর আগে পর্য্যন্ত তাঁর জ্ঞান সম্পূর্ণ ছিল। মরিবার আগে একদিন সুলতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "যত দুঃখই পাও মা ! আনন্দময়ী মাকে ভুল' না। ভগবানে বিশ্বাস রেখে ন্যায় ও সত্য পথে থেকো।"

নলিন তাহার পরিচয় দিয়াছিল, সে কায়স্থ। বাড়ীতে তাহার মা আছেন, একটী অবিবাহিত বোন আছে, দুইটী ছোট ভাই আছে। সে নিজে বিবাহ করে নাই।

একদিন সে প্রিয়নাথকে বলিল "আপনি সুলতার বিবাহের কোনও কথা তুলেন নাই। এ বিষয়ে কিছু ঠিক করেছেন কি ?"

সুলতার বৈধব্যের কথা নলিন কিছু জানিত না। তাহাকে সে কুমারীর বেশেই দেখিয়াছে, অন্য রকম মনে করিবার কারণ কখনও ঘটে নাই।

প্রিয়নাথ নলিনের কথায় যারপরনাই অভিভূত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। মুখে বলিলেন "বিবাহ না করলে তাঁকে তোমার তত্ত্বাবধানে রাখতে যদি ভার বলে মনে কর,——দরকার নেই !—"

নলিন ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল "না ! কাকাবাবু ! আমি তেমন কথা বলছি না। আমি শুধু আপনার অনুমতি কি জানতে চাইছিলুম।"

প্রিয়নাথ বলিলেন "আমার মত ?——আমার মত কিম্বা অনুমতি——কিছু নেই। তবে......যদি কখনো তার ইচ্ছা হয়——আমি——আমি কোন নিষেধ জানিয়ে যাব না......যদি......—"

প্রিয়নাথের কথা ভার হইয়া পড়িল। নলিন সবটুকু ভাল বুঝিতেও পারিল না। মনে করিল এ বিষয়ে তিনি এখনো কিছু ঠিক করেন নাই। হয়ত, কোনও কারণে সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তিনি কন্যার সহিত এই

নির্জ্জনে বাস করিতেছিলেন। এবং সুলতাকে শিক্ষা দিয়াছেন যাহাতে সে বিবাহ বন্ধনে ধরা দিয়া পুনর্ব্বার না সংসারের মাঝখানে ঝাঁপিয়া পড়ে! তবে যদি কখনো স্বতঃ ইচ্ছা হয় প্রিয়নাথের তাহাতে অমত নাই।

তাহাদের এই কথা বার্ত্তার সময় সুলতা উপস্থিত ছিল। নলিন দেখিল তাহারও চোখ দুটী ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এ বিষয়ে প্রিয়নাথের কাছে সে আর কোনও দিন কোন কথা উত্থাপন করে নাই।

প্রিয়নাথের মৃত্যুর পর প্রায় মাস খানেক নলিন জেসিডিতে রহিল।

সুলতা নিজেকে ইহার মধ্যে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইবার চেষ্টা করিয়াছিল। পিতার মৃত্যুতে প্রথমে যারপর নাই কাতর হইয়াছিল। ক্রমে যখন মনে হইল এবার সে একা—বিপুল পৃথিবীর মাঝে একা তাহাকে পথ করিয়া চলিতে হইবে, সে একবার চারিদিকটা চাহিয়া দেখিল। ঘন কুহেলি অন্ধকার তাহার ভবিষ্যতকে যেন ঘিরিয়া রহিয়াছে। সে কি করিবে কিছুরই ঠিক পাইতেছে না। নলিনের দিকে চাহিল—সে বলিতেছে, 'ভয় নাই; আমার পিছনে এস, অন্ধকার দূর হইয়া আলো জ্বলিবে দেখিবে, আমাকে বিশ্বাস কর, তোমার কিছুই ভাবনা থাকিবে না।' সুলতা কাতরকণ্ঠে নলিনকে বলিল "আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি আমায় পথ দেখিয়ে দাও। তোমায় সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস করছি। তুমি যেখানে যেতে বল যাব! যা করতে বল করব!"

নলিন তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল "তুমি এত দূরে থাকলে তোমার দেখা শোনা করা আমার ঠিক সুবিধা হবে না। যত দিন না আমি আমার নিজের ব্যবসায় সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্ত কিছু করছি, আপাততঃ আমার সঙ্গে কলিকাতায় আমার মায়ের কাছে চল। যদি তোমার আপত্তি থাকে মাস খানেকের জন্য এখানেই তোমার থাকতে হবে। আমি ফের আসব। ততদিন তোমার সঙ্গে থাকবার জন্য বিশ্বাসী মেয়ে লোকের সন্ধান নিচ্ছি—!"

সুলতা ভীত হইয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "না—না—আমায় একলা রেখে যেও না। বরং তুমি যেখানে নিয়ে যাবে——আমার আপত্তি নেই।"

নলিন সুলতাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতার অভিমুখে চলিল।

—এগার—

নলিনের মায়ের নাম সারদা।

সুলতাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি নলিনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটী কে?—যার অসুখের কথা চিঠিতে লিখেছিলি, তাঁরই?"

নলিন বলিল "হাঁ; মা! দুর্ভাগ্যের কথা তিনি [illegible]ন না। মরবার সময় অনুরোধ করে গেলেন যাতে সুলতা সৎসঙ্গে থাকে এবং সুখে থাকে।"

সারদা বলিলেন "তাঁরা কি জাত?"

নলিন বলিল "সুলতার বাপের নাম প্রিয়নাথ মিত্র। আচারে সন্দেহ থাকিলেও লক্ষ্য করেছি দেব-দ্বিজে প্রগাঢ় ভক্তি ছিল কাজেই মনে হয় হিন্দু—ব্রাহ্ম নন।"

সারদা জিজ্ঞাসা করিলেন "এতদিন বিবাহ দেন নাই, কারণ কিছু শুনেছ?"

নলিন বলিল "না মা! হয়ত তেমন গূঢ় কারণ কিছু নেই। জিজ্ঞাসা করেও কিছু জানতে পারিনি।"

সারদা বলিলেন "যাই হোক্ বেশ লক্ষ্মীশ্রী আছে বলেই মনে হচ্ছে। তোরও যেমন বয়স হয়েছে, ঠিক মানায়!"

নলিন বলিল "আমার সঙ্গে?.........না—মা! তেমন কিছু বল না। তাহলে বড় নীচ মনে করবে। আমাকে বিশ্বাস করে এসেছে—। আমিও তার বাপের কাছে কথা দিয়েছি——তার বিয়ের জন্য কোনদিন চেষ্টা করব না। সম্ভবতঃ চিরকুমারী থাকার আদেশ তিনি দিয়ে গিয়েছেন। মনে হয় সংসার তাঁকে কোনও বিষয়ে খুব গভীর ব্যথা দিয়েছিল, তাই মর্ম্মাহত হয়ে মেয়েকে সংসার থেকে দূরে রাখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যদি কখনো সুলতার নিজে হতে ইচ্ছা হয় তবেই তার বিবাহে আমি মত দেব। আমি তাকে ঘরে আশ্রয় দিয়ে প্রতারণা করতে পারব না।"

সারদা বলিলেন "পাগল ছেলে। তাই বলে আইবুড়ো মেয়েকে চিরকাল ঘরে থাকতে দিবি?—লোকে কি বলবে?"

নলিন উত্তর করিল "লোকের কথা লোকে জানে মা। আমাদের সে কথায় কাজ কি? আমরা আমাদের কর্ত্তব্য করে গেলেই হল।"

সারদা বলিলেন "সে তখন দেখা যাবে। নে' হাত পা ধো'। আমি খাবারের যোগাড় করিগে!"

একদিন সারদা সুযোগ বুঝিয়া সুলতার কাছে তাহার 'গোপন কথা' জানিবার ইচ্ছায়, তার জন্মস্থান, দেশের কথা বাপ মায়ের কথা সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। সুলতার কথায় তার বিবাহ করিবার অনিচ্ছার কথা কিছুই প্রকাশ হইল না। একবার তিনি স্পষ্ট করিয়া এই প্রশ্নটাই জিজ্ঞাসা করিলেন। সুলতা অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিল। তাহার এতক্ষণে মনে পড়িল সে এক মস্ত ভুল করিয়া বসিয়াছে। নলিন তাহাকে কুমারী বলিয়া জানিত, ইহার ইঙ্গিত সে আগে একদিন পাইয়াছিল। সেদিন সুলতা তার নিজের মনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল বলিয়া তাহার ভুল ভাঙে নাই। তারপর নলিনের সহিত তাহাদের বাড়ী আসিবার সময় তাহার হয়ত উচিত ছিল প্রকৃত সত্য জানাইয়া বিধবার মত থান পড়িয়া আসা। কিন্তু এ সম্বন্ধে তাহার এতটুকুও খেয়াল হয় নাই। সারদার প্রশ্নে তাহার চমক ভাঙিল। একথাও মনে পড়িল সে যদি আজ সত্য কথাটা জানায় এতদিন সমস্ত অপ্রকাশ রাখিয়াছে বলিয়া সকলে অনেক রকম সন্দেহ করিবে। সে বড় ভীষণ লজ্জা! তার চেয়ে সুলতা ভাবিল গোপনে নলিনের কাছে সমস্ত আগে বিবৃত করিয়া উপস্থিত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাহার পরামর্শ লইবে। ততক্ষণ যে কথাটা কেহ না জানিয়াছে, তা উল্লেখ না করাই ভাল। এই সব ভাবিয়া সুলতা উত্তর করিল, "বাবা নিষেধ করে গিয়েছেন, তাছাড়া আর কোনও কারণ নেই।"

সারদা বলিলেন "ঠিক নিষেধ তিনি করেন নি। বলেছেন যদি তোমার ইচ্ছা হয় তাঁর নিষেধ নেই।"

সুলতা আরও সঙ্কুচিত হইয়া মৃদুস্বরে প্রতিবাদ করিয়া বলিল "না—না—সে বড় লজ্জা—ছিঃ—।"

সারদা বুঝিলেন বিবাহের কথায় প্রথম প্রথম যেমন সকল মেয়েরই লজ্জা হয়, ইহাও তাই, তিনি হাসিয়া বলিলেন "আর—নলিন নিজে যদি তোমাকে বিয়ে করতে চায়? লজ্জা করনা তুমি। আমি তার মা। আমি তাকে লক্ষ্য করে বুঝেছি সে তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসে। মুখ ফুটে বলে না কিন্তু আমি বুঝি তোমাকে না পেলে—সে বড় মনঃকষ্ট পাবে। তোমার অন্তরের কথা দ্বিধা না করে জানাও। তোমার অমতে এ বিষয়ে আর কোনও দিন কিছু উল্লেখ করব না। তুমি যেমন আমার মেয়ের মত ঘরে এসেছে তেমনই থাকবে। তৃতীয় ব্যক্তি কখনো একথা জানতে পারবে না। নলিনকেও আমি বলব না—।"

নলিন তাহাকে ভালবাসে এই কথা শুনিয়া সুলতার সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইল। নলিন নিজে যদি তাহাকে বিবাহ করিতে চায়,—সেই আশার অতীত স্বপ্ন যেন মূর্ত্তি লইয়া সারদার কথার ভিতর দেখা দিল। এক মুহূর্ত্তের জন্য বিভোর হইয়া এই কল্পনায় গা ভাসাইয়া দিল। পরক্ষণে মনে পড়িল—না—তা হয় না। বিধবা সে! আপনাকে গোপন করিয়া এই প্রতারণা করিতে পারিবে না। নলিন একথা যেদিন জানিবে, তার ছদ্ম সরলতার মুখোষ খুলিয়া সত্যিকার নিষ্ঠুর ছবি সে যখন দেখিবে, তাহাকে ঘৃণা করিয়া দূর করিয়া দিবে। তবে যদি সমস্ত জানিয়া—লোকাচার ও সমাজ না মানিয়া নলিন তাহাকে কামনা করে সে না বলিতে পারিবে না। ইহাতে হয়ত তার ধর্ম্ম জাতি সমস্তই রসাতলে যাবে, হয়ত তাহার শত জনমের পুণ্য বা পাপের যদিই কিছু থাকে সব নষ্ট হইবে, তবু সে কুণ্ঠিত হইবে না। ভালবাসার কাছে সে তাহার ইহকাল পরকাল সমস্ত জলাঞ্জলি দিবে।

সুলতা অশ্রুবিজড়িত স্বরে উত্তর করিল "মা ওকথা বল' না।—তা হবার নয়।—আমি যে বড় অভাগী মা!"

—ক্রমশঃ—

রূপশিখা

—শ্রীঅরিন্দম বসু

প্রথম দৃশ্য

শ্রাবস্তির উ

নিকটে শীর্ণকায়া স্রোতস্বিনী—তীরে গগনস্পর্শী বিরাট শ্বেত সৌধ।

অধিকারী—শ্রেষ্ঠিপ্রধান নন্দ।

প্রাসাদের পশ্চাদ্ভাগে বিস্তৃত উদ্যান—পুষ্পাচ্ছাদিত কুঞ্জ বিতানে শোভিত। অদূরে উদ্যানসীমায় ঘন কৃষ্ণচূড়াশ্রেণী।

শ্রেষ্ঠিপুত্রী উৎপলবর্ণা পুষ্পচয়ন করিতেছেন। তাহার পরিধানে—স্বর্ণোজ্জ্বল বারাণসী সাড়ী; মুখমণ্ডলে—সুগন্ধি অঙ্গরাগ, এলায়িত কেশগুচ্ছে—অস্ত-রবির ক্ষীণ রক্তাভা। অপরূপ মূর্ত্তি।

কুঞ্জান্তরালের শুভ্র মর্ম্মর বেদীর উপর সায়াহ্ন-সূর্য্যের সোণালী-আভা তখন অপূর্ব্ব মায়া রচনা করিয়াছে।

উৎপলবর্ণা একাকী।

সম্মুখের নদী বক্ষে ভাসমানা ক্ষুদ্র তরণীটি ধীরে ধীরে নিকটবর্ত্তী হইতেছিল।

আরোহী—একটী তরুণ যুবক।

ক্রমশঃ তরণী উদ্যান সংলগ্ন হইল। শ্রেষ্ঠিকুমারী সস্মিত মুখে অগ্রসর হইতেই নৌকারোহী অধীর হইয়া বলিলেন—আর কতদিন এমন করে চলবে উৎপল?—এই গোপন অভিসার যে আমার কাছে দুঃসহ হয়ে উঠ্‌ছে।

—আমি তো বলেছি উত্তীয়—পিতাকে বলে দেখো, তিনি তোমার আশা অপূর্ণ রাখ্‌বেন না।

যুবক সহসা বিচলিত হইয়া উঠিলেন—তাহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল। দন্তে দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া মনে মনে কহিলেন—পিতার সেই সর্ব্বস্বাপহারী দস্যুর কাছে ভিক্ষুকের মত তার কন্যা প্রার্থনা করিবে—ধিক্ এমন আকিঞ্চনে।

পরে মুখ তুলিয়া চিন্তিতভাবে বলিলেন—

—হুঁ, বল্‌বো, কিন্তু তার পূর্ব্বে একটী কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করতে চাই উৎপল,—তুমি কি আমার সঙ্গে—

উত্তীয় ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন—তাহার মুখ হইতে আর কোন কথাই বাহির হইল না। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া অন্যমনস্কভাবে বলিয়া উঠিলেন—না থাক্,—সেকথা আজ নয়—

—থাক্‌বে কেন,—তোমায় বলতে হবে। আমার কাছে গোপন কর্ব্বার কি আছে তোমার?

—গোপন! হ্যাঁ, গোপন বই কি—কিন্তু আজ নয়। আমায় ক্ষমা করো—সে কথা আর একদিন বলবো তোমায়।

শ্রেষ্ঠিপুত্রী নিরুত্তর রহিলেন।

—আসি উৎপল,—আজ শুক্লা চতুর্দ্দশী, সন্ধ্যার অনতি-বিলম্বে রাজপ্রাসাদে আমার আহ্বান হয়েছে—বোধ হয় জানো।

উৎপলবর্ণা মুখ তুলিয়া বলিলেন—

হ্যাঁ, জানি। কিন্তু এই পরিপূর্ণ সন্ধ্যা,—পুষ্প-গন্ধ-ঘন এই কুঞ্জবিতান—

—দেখেছি উৎপল, কিন্তু আমি হৃতসর্ব্বস্ব বিদেশী বণিক—নিজেকে ভুলতে পারিনে কিছুতেই। অন্ততঃ আজকের মতো বিদায় দাও—পরে রাজ-দরবারে যদি—

—কিন্তু এইজন্যই কি এক অখ্যাতনামা, নিঃস্ব বণিক-পুত্রকে—শ্রেষ্ঠিপুত্রীর কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া রুদ্ধ হইয়া গেল।

উত্তীয়ের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল কিন্তু মুখে সেই উত্তেজনা প্রকাশ করিলেন না,—বলিলেন—

—ভুল বুঝো না উৎপল—আগামী প্রতিপদে আবার

সাক্ষাৎ হবে,—সেদিনই তোমায় সব খুলে বল্‌বো—আজ থাক্।

ধীরে ধীরে তরণীর মুখ ফিরিল।

পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় নদীবক্ষ ঝিকি মিকি করিতেছিল। ক্ষুদ্র তরণীটি তাহারই উপর দিয়া নাচিয়া চলিয়াছে।

বহুক্ষণ উৎপলবর্ণা একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়াছিলেন। পরে তরণী অদৃশ্য হইয়া গেলে একটী দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিলেন—কি সুন্দর এই যুবক অথচ কি অদ্ভুত তাহার প্রকৃতি!

প্রতিপদ।

সন্ধ্যার ম্লান ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছিল।

মালতী-কুঞ্জের অন্তরালে মর্ম্মর বেদীতে উপবিষ্ট দুইটী তরুণ তরুণী।

একজন বেসালির বণিক তনয়,—উত্তীয়।

আর অন্যজন ষোড়শ বর্ষীয়া কিশোরী—উৎপলবর্ণা।

—কাল শ্রেষ্ঠি সমীপে উপস্থিত হয়েছিলাম,—অনুমতিও পেয়েছি,—তবে সর্ত্ত আছে একটী।

—কি সে সর্ত্ত উত্তীয়?

—আমি হৃতসর্ব্বস্ব,—তাই যতদিন না উপযুক্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হই, ততদিন আমাকে তোমার পিতৃগৃহে অবস্থান করতে হবে।

—এমন কি কঠিন সর্ত্ত! এতে আপত্তি কিসের উত্তীয়? পিতার অধীনে, তাঁর নির্দ্দেশ মতো বাণিজ্য করো, দেখ্‌বে দু'দিনেই তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়ে উঠেছো।......এতে তুমি সম্মতি দাওনি বুঝি?—সত্যি এ তোমার অন্যায়।

উত্তীয় মনে মনে জ্বলিয়া উঠিলেন—ভাবিলেন—তিনিও ঐশ্বর্য্য গর্ব্বে একদিন এম্‌নিই গর্ব্বিত ছিলেন,—শুধু অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আজ রিক্ত,—কপর্দ্দকহীন। কিন্তু তার জন্য দায়ী কে? দস্যুদলের সাহায্যে শুক্ল নিশীথে কে তার পিতার বাণিজ্য-বেসাতি লুণ্ঠন করে নিয়েছিল?—হ্যাঁ, সে ঐ শ্রেষ্ঠিপ্রধান নন্দ।......এই যে মর্ম্মর প্রাসাদ,—প্রতি অণু পরমাণুতে যার সেই লুণ্ঠিত ঐশ্বর্য্যের দীপ্তি জ্বল্‌ জ্বল্‌ করছে—দেখে আজ চোখ ঝল্‌সে আসে।

—কি ভাব্‌ছো উত্তীয়?

—ভাব্‌ছি......হ্যাঁ,—সেদিন একটা কথা বলতে গিয়ে, —আর বলা হয়নি তোমায়,—আজ সেই কথাটাই বল্‌ছি—

—থাক্, আমি শুনতে চাইনে আর।—কিন্তু তুমি এমন করে উঠ্‌ছো কেন উত্তীয়? থেকে থেকে সমস্ত শরীর কাঁপছে,—তোমার কি অসুখ হ'য়েছে কিছু?

—অসুখ!—হাঁ, হ'য়েছে বৈকি,—দেহ-মন জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। কি বুঝ্‌বে তুমি কিসের এই কম্পন!—ঐ শ্বেত-সৌধ,—পুষ্পগন্ধি এই উদ্যান;—এই বিলাস ব্যসন,—লক্ষ হীরার এই কঙ্কন-কিঙ্কিনী,—হীরক কণ্ঠী,——নিমেষে উৎপলবর্ণার দুই বাহু ধরিয়া উত্তীয় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—কার?—কার ঐশ্বর্য্যের এই অভিনব আয়োজন?

ভয়ে বিস্ময়ে মুহূর্ত্তকাল নির্ব্বাক থাকিয়া শ্রেষ্ঠিপুত্রী বলিলেন—একি বল্‌ছো তুমি? কি হয়েছে, এমন কর্‌ছো কেন?

সহসা একটা আশঙ্কা মনে জাগিতেই মনে মনে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। পর মুহূর্ত্তে উত্তীয়ের কঠোর বাহুবন্ধন হইতে নিজেকে সজোরে মুক্ত করিয়া লইয়া কহিলেন—

—তুমি কি সুরা—

অট্টহাস্য করিয়া উত্তীয় বলিলেন—

—হ্যাঁ, সুরা,—কিন্তু এই সুরার উৎস কোথায় জানো? —এই বুকের ওপর হাত দিয়ে দ্যাখো,—সেখানে কিসের আগুন জ্বলছে!—কিসের প্রতিহিংসা আমায়—

ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।—পরে কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব শান্ত করিয়া বলিলেন—না,—এ কি বল্‌ছি আমি!—আমায় ক্ষমা করো উৎপল,—সত্য বল্‌ছি, আমি প্রকৃতিস্থ ছিলাম না।

উৎপলবর্ণা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে উত্তীয়ের মুখের পানে চাহিলেন।

—কি দেখ্‌ছো উৎপল?

—কিছু নয়।

—আমায় বিশ্বাস করতে পারো নি ?……কাছে এসো বসো,—আরো—

উৎপলবর্ণা সরিয়া গিয়া পূর্ব্বস্থানে বসিতেই উত্তীয় দুই হস্তে তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া বলিলেন—

—ঐ দেখো, মেঘের আড়ালে চাঁদের লুকোচুরি খেলা—দেখতে দেখতে তলিয়ে গেলো,……কি সুন্দর !—

শ্রেষ্ঠিপুত্রী নিরুত্তর রহিলেন।

—তোমার পিতা আজ মিথিলায় গমন করেছেন,—না ? তার সঙ্গে কাল দেখা করে তোমায় প্রার্থনার কথা বলেছিলাম। কিন্তু তার নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তে তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিতে না পেরে এক পক্ষ কাল সময় চেয়েছি,—তিনিও মঞ্জুর করেছেন।—বলেছেন—আমার প্রত্যাবর্ত্তনের পর সপ্তাহকালের মধ্যে তোমার অভিমত ব্যক্ত করতে হবে। আমি স্বীকৃত হয়েছি,—কিন্তু কি উত্তর দেবো,—

উৎপলবর্ণা সাগ্রহে উত্তীয়ের মুখের পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন,—কি ? শুনি।—

—এখনো স্থির করিনি।…আচ্ছা, সত্যি করে বলব উৎপল,—তুমি আমায় ভালোবাসো ?……

—সে কথা বলে লাভ ?

—লাভ, আছে বৈকি,……বলতে হবে তোমায় !

—অনেক দিনই তো শুনেছো।

—আজও না হয় আবার শুনবো।—বলো—

—বলেছি তো—হ্যাঁ ব্যাস !

—খু-ব ?

—যাও,—জানি নে !

—তবে থাক্……কিন্তু আমার সঙ্গে তুমি যেতে পার উৎপল ?

—কোথায় ?

—যেখানে নিয়ে যাব আমি। উদ্যানের নীচে মর্ম্মর সোপানে তরণী বাঁধা আছে—যাবে ?

—শুনি কোথায় ?

—আমি তো অনেক দিনই বলেছি—আমি নিঃস্ব। কিন্তু দুটী প্রাণীর স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের জন্য যতটুকু সামর্থ্য, —আমার তা আছে। যেখানেই যাই আমরা পরম সুখে থাকবো।

—সেখানে তো এমন মর্ম্মর প্রাসাদ,—এমন উদ্যান—

—হ্যাঁ, তা নেই। কিন্তু এখানে যে আমার দেহ মন জ্বলে যায়,—সহস্র বৃশ্চিক দংশন আমায় উন্মাদ করে তোলে —এক মুহূর্ত্ত তিষ্ঠিতে পারি নে।……

অভিমানে উৎপলবর্ণা গুম্‌রিয়া উঠিলেন। ধীরে ধীরে উত্তীয়ের আলিঙ্গন মুক্ত হইয়া বলিলেন—

—আমাদের ওপর তোমার যখন এত ঘৃণা……

—ঘৃণা বই কি উৎপল,……পরস্বাপহারী যে দস্যু, তার কৃপাদত্ত অন্নে প্রতিপালিত হওয়া কি তুচ্ছ ঘৃণা !…… জানো না তুমি,—বেসালির রাজপ্রাসাদ হ'তে নগরের দরিদ্রতম প্রজার পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত, কতখানি সম্ভ্রম, কত বড় সম্মানের সহিত একদিন শ্রেষ্ঠি উত্তমের নাম উচ্চারিত হ'ত। আমি তারই হতভাগ্য পুত্র। ভাগ্য দোষে আজ আমার সে ঐশ্বর্য্য গরিমা নেই কিন্তু দেশে আজো আমার যে গৌরব, যে প্রতিপত্তি আছে,—তার কাছে নন্দ শ্রেষ্টির নাম সুনাম অতি তুচ্ছ।……

—পিতাকে এমন কটুক্তি,—এমন অপমান কর্ব্বার কি অধিকার আছে তোমার ?—এই মুহূর্ত্তে আমি উদ্যান ত্যাগ করে চললাম। আমার মতিভ্রম হয়েছিল তাই তোমার মত একজন——

—বলো, বলো, থামলে কেন ?—তোমার মত একজন ——কি ?

—হ্যাঁ, অকৃতজ্ঞ, পিতৃবৈরী,—তার কাছে নিজের দেহ মন সমর্পণ করেছি !

—ভুল বলছো।—আমার কাছে ঐ দেহ মন সমর্পণ করোনি,—তোমার পিতৃ-শত্রুর কাছে করোনি,—করেছো তার সৌন্দর্য্যের কাছে। লালসার তাড়নায় স্বেচ্ছায় তুমি নিজেকে আহুতি দিয়েছো।……মনে পড়ে কি উৎপল, তোমার সঙ্গে আমার সেই প্রথম পরিচয় !……এই নিরঞ্জনা-তীরে মাধবী কুঞ্জের ঐ অন্তরালে বসে মালা গাঁথছিলে তুমি, ……পদতলে তটিনীর উচ্ছল বারি ধারা বিচিত্র নর্ত্তনে ছুটে চলেছিল।……নদী বক্ষে নৌকারোহী আমি……সে

দিন অবাক্ হয়ে সেই দৃশ্য দেখ্‌ছিলাম। সহসা চোখে চোখে কখন মিলন হল,—মুগ্ধ হয়ে তুমি এক দৃষ্টে আমার মুখের পানে চেয়ে রইলে……ফুলের মালা অলক্ষ্যে তোমার হাত হ'তে খ'সে নদীর জলে পড়ে গেল।……সেই দিন হ'তে দেখতাম, ঐ স্থানে বসে তুমি যেন প্রতীক্ষা করছো। বলো উৎপল, কেন তোমার সেই আকুলতা…মনে পড়ে কি ?…

—মিথ্যা কথা।

—কিন্তু এই তার শেষ নয়! একদিন তোমার পাশ দিয়ে আমি যখন ঐ তমাল বনের দিকে যাচ্ছিলাম তখন সহসা স্বেচ্ছায় স্খলিত পদ হ'য়ে সোপান জলে তুমি লুটিয়ে পড়েছিলে।……আমি ভেবেছিলাম বুঝি সত্যি!……সেই মুহূর্ত্তে তাই জলে ঝাঁপ দিয়ে অতি যত্নে তোমায় তুলে নিয়ে ঐ প্রাসাদ অভ্যন্তরে রেখে আসি। সেদিনই প্রথম তোমার ও তোমার পিতার সহিত আমার পরিচয়। কিন্তু এই স্বেচ্ছায় জলে পড়্‌বার ছলনায় আমি যদি সেদিন—

—ছলনা! কক্ষনো নয়—মিথ্যা কথা—

—সত্য মিথ্যা আমি জানি উৎপল—থাক্ সে কথা কিন্তু এখুনি না তুমি বলেছো—তুমি আমায় ভালবাসো।… …বুঝলাম কেমন সে ভালবাসা—কত গভীর তোমার সে অনুরাগ। আমার সামান্য একটা অনুরোধ,—তারই জন্য এত কথা!……এমনি তোমার গরব। পারো যদি তবে জিজ্ঞাসা করো সুন্দরী শ্রেষ্ঠা চন্দাকে……ঘৃণায় চোখ বুজলে যে!……সত্যি বল্‌ছি সে বুঝিয়ে দেবে তোমায়—কি সে অনুরাগ,……যার জন্য সে তার যথাসর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠিতা হবে না। তবু সে পতিতা,—তোমার মতো——

উত্তীয়ের কথায় শ্রেষ্ঠিকুমারী রোষে, ক্ষোভে জ্বলিয়া উঠিলেন। তাহার বক্ষ স্পন্দন দ্রুত হইতে লাগিল। ক্ষণ কাল দন্তে দন্তে ওষ্ঠদ্বয় চাপিয়া ধরিয়া পরে তীব্র কণ্ঠে কহিলেন—

—একথা বলতে তোমার কুণ্ঠা হ'ল না—আমি যাবো একটা ঘৃণিতা পতিতার কাছে প্রেমের মূল্য কষতে—

—প্রয়োজন হ'লে যাবে বৈকি,……সে পতিতা বটে, কিন্তু ঘৃণিতা নয়। তার অনুগ্রহ লাভের জন্য আজ শ্রাবস্তী, বেসালি, কোশল—অস্থির, উন্মত্ত।

—কিন্তু সে বেশ্যা—

—হ্যাঁ, স্বীকার করি; কিন্তু ভেবে দেখেছো কি উৎপল,—যদি আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ না হয়, তবে তোমার অবস্থা—

উত্তীয়ের কণ্ঠস্বর মুহূর্ত্তে কাঁপিয়া রুদ্ধ হইয়া গেল।

—কি এতদূর ?

ক্ষোভে, অপমানে দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া শ্রেষ্ঠিপুত্রী তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া প্রস্থান করিলেন।

ক্ষণকাল এক দৃষ্টে প্রস্থানপরায়ণা উৎপলবর্ণার পানে চাহিয়া থাকিয়া আপন মনেই উত্তীয় বলিয়া উঠিলেন—কিসের অন্যায়? ঠিক বলেছি। কিন্তু এই কি আমার আশা?……এই জন্যই কি পিতৃ-অপমানের কথা ভুলে গিয়ে শ্রাবস্তিতে ঘুরে বেড়াচ্ছি।……না, এর প্রতিশোধ চাই,……ভেবোনা নন্দ, ভেবোনা উৎপল। উত্তীয় কাপুরুষ,……সে তার পিতৃ-অপমানের প্রতিশোধ নেবেই।

চিন্তিত মনে উত্তীয় নদী তীরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

—ক্রমশঃ—

বৈষ্ণবকবি জ্ঞানদাস

—শ্রীক্ষেত্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

যুগধর্ম্মের বিচারে কবিতার গতি নিরীক্ষণ বা সমাজ-শক্তির কূটতর্কে কবির স্বাতন্ত্র্য বুঝাইবার চেষ্টা না করিয়া মোটামুটিভাবে এখানে কবির কবিতার আলোচনা এবং তাহার ভিতর দিয়া কবির হৃদয় কেমন বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করা যাক্।

জ্ঞানদাস একজন বৈষ্ণব কবি; সুতরাং তাঁহার কবিতার আদ্যন্তে একটী তরল, সহজ, অসঙ্কুচিত বাল্য-মাধুরী বিজড়িত। ইহার ভিতর পাণ্ডিত্যের গাম্ভীর্য্য নাই—আছে কেবল সাদা বুদ্ধির শান্ত বিকাশ। মুণীন্দ্র-নাথের তূর্য্যধ্বনি বা অক্ষয়কুমারের শঙ্খনাদ জ্ঞানদাসের কাব্যে নাই। কৈশোর-চাপল্যের ব্যঞ্জনাস্বরূপ কৃষ্ণ-রাধিকার নূপুর-নিক্কণ ইহার শব্দে শব্দে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সমস্ত কাব্য বালসুলভ ধরাধরি—ছুটা-ছুটির একটী জীবন্ত ছবি। বাল্যময় এই সহজ সারল্য বৈষ্ণবকবিদিগের একান্ত নিজস্ব।

রাধার কঙ্কণ ও মঞ্জরী শিঞ্জনে এবং বনমালীর বংশীলীলায় তাঁহার কবিতাগুলি মধুর কোমল স্বপ্নের মত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ছন্দ স্বপ্নময় শব্দবিন্যাস স্বপ্নময়—তাঁহার কাব্যপ্রাণ একটী মোহনস্বপ্ন। তাঁহার কবিতা পড়িতে বসিলে বর্ত্তমানের নির্দ্দয় প্রত্যক্ষতা, মানবতার কঠোর প্রেরণা, জগতের বজ্রদৃষ্টি কিছুই মনে থাকে না—চতুর্দ্দিকে আভীর রমণীগণের এমন একটী কলহাস্য এবং নূপুরনিক্কণ উছলিয়া উঠে, যেন তাহাতে তন্দ্রাশিথিল হইয়া মোহনস্বপ্নে বিভোর হইয়া যাইতে যায়।

জ্ঞানদাসের লেখায় দুইজন কবির প্রভাব বড় বেশী:—একজন জয়দেব, অপর বিদ্যাপতি। তাঁহার কাব্যের ভিতরে এই উভয় কবির ছায়াই বেশ ঘনীভূত, অনেকস্থলে তিনি উক্ত কবিদ্বয়ের বর্ণনাভঙ্গী সশব্দ অনুকরণ করিতে ছাড়েন নাই, যাহা হউক, এই অনুচিকীর্ষা কিন্তু নিন্দনীয় নহে; কারণ ইহার ভিতরে তাঁহার বিশাল স্বাতন্ত্র্য জাজ্জ্বল্যমান। অনুকৃতি যেখানে প্রাণহীণ অনুকৃতি সেখানেই নিন্দার বিষয়; কিন্তু ইহার ভিতরে যেখানে প্রাণময় সুস্থ-তা ও স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া উঠে, সেখানে ইহা প্রশংসার বিষয়। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি অসাধারণ—অনুভূতি সুন্দর; তাই তাঁহার অনুকৃতিও মহান্।

আমাদের সমালোচনার সুবিধার জন্য তাঁহার কাব্য সমগ্রকে আমরা এই কয়ভাগে বিভক্ত করিব। ইহার প্রথম ভাগ—নায়িকার পূর্ব্বরাগ; দ্বিতীয় ভাগ—নায়কের পূর্ব্ব-রাগ; তৃতীয় ভাগ—রাধাকৃষ্ণের বাল্যলীলা; চতুর্থ ভাগ—তাহাদের কৈশোর মিলন; পঞ্চম—সম্ভোগলীলা; ষষ্ঠ—বিবাহিতা বিরহিনী রাধার গৃহবাসজ্বালা, তাঁহার অভিসার ও কুঞ্জ মিলন; সপ্তম—কৃষ্ণের প্রবাসগমনে রাধার বিরহ; অষ্টম—রাধার মাথুর ও নবম—যুগলের ভাব সম্মিলন।

খণ্ডকবিতার বিন্যাস নৈপুণ্যে ও রচনা পারিপাট্যে একটী সমগ্র কাব্যের সৃষ্টি হয়। বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে জ্ঞানদাসের কবিতার এই বিন্যাসকৌশল ও লিখনভঙ্গী আমার কাছে বেশ একটু বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। ছবির প্রত্যেক রেখাটীর মত প্রত্যেক খণ্ডকবিতাটী সমগ্র প্রকাশকের উপাদান করিয়া সংযত ও স্বাভাবিকভাবে সাজানতেও বহুকালের সাধনা ও বিচারশক্তির অপেক্ষা রাখে। জ্ঞানদাসে সে সাধনা ও সামর্থ্য আছে। তাই তাঁহার কাব্য পূর্ণাঙ্গ প্রাণময়। রচনার অসংযমে ও বিচারহীনতায় বিদ্যাপতির কাব্য অসম্পূর্ণ—চণ্ডীদাসেরও রচনা সম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয় না।—জ্ঞানদাস কাব্যের এই সম্পূর্ণতাটুকু বেশ উপভোগ্য।

ইঁহার নায়ক-নায়িকার পূর্ব্বরাগইতিহাস সেই মামুলী

কথা। তবে একটা দেখিবার জিনিষ আছে। ইহাতে বিদ্যাপতির চাপল্যও নাই আর চণ্ডীদাসের গাম্ভীর্য্যও নাই—আছে তাঁহার নিজের একটা বিশেষ স্বাভাবিকতা। কিশোরী রাধা বয়োধর্ম্মে রূপের পদে প্রাণ বিকাইল। 'জল ভরিতে' আসিয়া যমুনা পুলিনে 'তরুমূলে' কালা কানুর প্রথম সাক্ষাৎকার—লাভ। আহা, সে কি রূপ। রাধিকা 'সইকে' সেইকথা বলিতেছেন——

যে রূপ দেখিনু সই
স্বরূপে তোমারে কই
জল ভরিতে বিসরিনু।

আড়ম্বর হীন এই কয়টী সাদা কথায় রূপের মোহনশক্তি ও নিজের স্বপ্ন মোহ কেমন পরিষ্কার বলা হইল। তারপর সেই রূপের ও নিজের মোহের একটু বিস্তৃত বিবরণী—

একে সে কালিন্দীকূল,
ত্রিভঙ্গিম তরুমূল
সজল জলদ শ্যামতনু,
জল ভরিয়া যাই
ফিরিয়া ফিরিয়া চাই
হাসি হাসি পূরে মন্দ-বেণু।
জল ফেলিয়া যাই
লোকলাজে ভয় পাই
কি করিব কিবা লয় মনে।

বেশ সহজ ও সরল কথা। মোহের ইতিহাস এইরূপেই হয়। এইরূপে প্রাণের ভিতরে একটা বিরাট্ পিপাসা জাগিয়া উঠে, অথচ লোকলাজভয়ে উদ্দাম হইয়া পড়ে না। ভবিষ্যতে প্রেমের ইহাই বর্ত্তমান মূর্ত্তি। ইহার ভিতর চাপল্য বা গাম্ভীর্য্য কিছুই থাকিতে পারে না। চাপল্যে মোহ 'ইয়ারকি' হইয়া উঠে এবং গাম্ভীর্য্যে মোহ মারা যায়। কবি মোহনীয়তায় এখানে মোহ ফুটাইয়াছেন। এই মোহনীয়তাকেই আমি কবির পূর্ব্বরাগের স্বাভাবিকতা বলিয়াছি।

রাধা এবং কৃষ্ণের বাল্যলীলার অধ্যায়ে কবির একটা বিশেষ কৃতিত্ব ফুটিয়াছে। নিপুণকবি ইহার ভিতর তাঁহার নায়কনায়িকার ভবিষ্যৎটা বেশ ফলাইয়া তুলিয়াছেন। বলিতে কি এই অধ্যায়টাই তাঁহার সমগ্র কাব্য সৌন্দর্য্যের মেরুদণ্ড।

তারপর রাধাকৃষ্ণের কৈশোর মিলন ও সম্ভোগ লীলা। এইখানে জ্ঞানদাস জয়দেবের অসংযম ও বিদ্যাপতির চাপল্য প্রকটীকৃত করিয়া তুলিয়াছেন। চণ্ডীদাসের এইখানে সার্থকতা। তিনি এই বিষয়ে যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়াছেন।

ষষ্ঠভাগে বিবাহিতা বিরহিনী রাধার গৃহবাস জ্বালা। রাধার বিবাহ হইল—আয়ানের গৃহে গিয়া রমণী আপনার বাল্যকালের সেই সরল স্বাচ্ছন্দ্য হারাইয়া ফেলিল—'ঘর হইতে আঙ্গিনা' তাহার 'বিদেশ' হইয়া পড়িল; বন্দিনী বিহঙ্গিনীর মত চোখের জলে মনের আগুণ বাড়াইতে লাগিল। বিরহে সেই মধুর মোহের এইবার প্রেমে পর্য্যবসান। সে প্রেম অতি সুন্দর; সংযত, শান্ত, পবিত্র। বিদ্যাপতির আকুতির ইহাতে কিছুই নাই চণ্ডীদাসের পাবিত্র্যের ইহাতে অনেকখানি আছে। রাধিকা বলিতেছেন

সইলো, পিরীতি দোসর ধাতা।
বিধির বিধান সব করে আন
না শুনে ধরম কথা।—

—যথার্থ প্রেমের যথার্থ ব্যাখ্যা। যথার্থ প্রেম সমাজ ধর্ম্মে পদাঘাত করে, কারণ সে যে দোসর ধাতা'—নিজেই নিজের গতির নিরূপক ও নিয়ামক। কিন্তু এ প্রেম স্বার্থশূন্য হয় না—বড়াল কবির প্রেমের মত ইহা 'মহাস্বার্থময়'। এ প্রেম কিছু চায়। বাঞ্ছিত সন্ধানে দ্বিপ্রহর নিশায় রাধার অভিসার যাত্রা সে বিষয়ের জলন্ত উদাহরণ। প্রেমের এই আকাঙ্ক্ষাটী, আমার মতে, মানবের মানবতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। নিষ্কাম প্রেম কেমন যেন অর্থহীন বলিয়া মনে হয়।

জ্ঞানদাসের রাধার প্রেমের আর একটী দেখিবার জিনিষ—তন্ময়তা। রাধিকা 'আপনার দুটী আঁখি নিবারিতে নারে'। 'সে কালা কানু আন্ নাহি দেখে!' একদিনের কথা বলি। আয়ান ঘরে আসিল; রাধিকা 'কালিয়া দেখিল তারে!' তারপর—রাধিকা বলিতেছেন—

বন্ধুর ভরমে আয়ানের সনে
মনের কথাটী কই।
হাসিয়া হাসিয়া আয়ান বলে
মুঞি তোমার বন্ধুয়া নই।

বড় সোজা কথা নহে। বাঞ্ছিতজ্ঞানে কৃষ্ণ সর্পকে আলিঙ্গন করা একা বিল্বমঙ্গলেই সম্ভব হইয়াছিল। প্রেমের এই গভীর তন্ময়তা কবি বেশ সুন্দর ও স্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন।

মানবীর প্রেম কি না, রাধিকার প্রেমে তাই বেশ একটু অভিমান আছে। এই অভিমান সন্নিবেশে কবি বেশ সুকৌশলে রাধা প্রেমকে মধুর ও মনোহারী করিয়া তুলিয়াছেন। এই অভিমানের কথা একটু বলিব। শ্রীমতী যখন আয়ান-গৃহিণী তখন শ্যামরায় তাঁহার বাড়ীর পাশ দিয়া চন্দ্রাবলী কি বিশাখা, কি এমনি কোন একজনের বাড়ী যাইতেন। তাঁহার উদ্দেশ্য কি ছিল তিনিই জানেন। অভিমানিনী রাধার কিন্তু তাহা সহিল না। তাই তিনি তাঁহার সখীকে বলিতেছেন

সই, কত না রাখিব হিয়া
আমার বঁধুয়া আনবাড়ী যায়
আমারি আঙিনা দিয়া।
যেদিন দেখিব আপন নয়নে
আন জন সঙ্গে কথা
কেশ ছিঁড়ে ফেলি বেশ দূরে করি
ভাঙিব আপন মাথা।

ইহা মানবীর মানবীয় অভিমান। বাঞ্ছিত পরনারীতে আসক্ত—কোন প্রেমিকা ইহা সহ্য করে? রাধিকার এই মিষ্ট অভিমান জ্ঞানদাসের কাব্য সৌন্দর্য্যের সর্ব্বস্ব।

তারপর কৃষ্ণের প্রবাস গমনে রাধার বিরহ। সে বিরহের ব্যাখ্যা হয় না। কবির দুইটী পদ উদ্ধৃত করিয়া দিব, রসজ্ঞ পাঠক বুঝিয়া লউন। শ্যামকে উদ্দেশ করিয়া রাধিকা বলিতেছেন

মাধব কৈছন বচন তোহার।
আজি কালি করি দিবস গোঙাইতে
জীবন ভেল অতি ভার।
পন্থ নেহারিতে নয়ন অন্ধাওল
দিবস লিখিতে নখ গেল,
দিবস দিবস করি মাস বরষ গেল
বরিখে বরিখ কত ভেল।
আওব করি করি কতপর বোধব
অব জীউ ধরই না পার
জীবন মরণ অচেতন চেতন
নিতি নিতি ভেল তনু ভার।

কয়টী কথায় জীবনের মূলোচ্ছেদী বিরহ ব্যথা জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

পরিশেষে কবি রাধিকার মাথুর ও প্রিয় সম্মিলন দেখিয়া কাব্য খানিকে সম্পূর্ণ করিয়াছেন। প্রিয় সম্মিলনে রাধিকার

বঁধুয়া আর কি ছাড়িয়া দিব।
এ বুক চিরিয়া যেখানে পরাণ
সেখানে তোমারে থোব।
ও চাঁদ বদন সদা নিরখিব
সুখ না চাহিব আর
তোমা হেন নিধি মিলাওল বিধি
পূরিল মনের সাধ।

—উক্তিটী সেই আনন্দ-বাসরের মিলন গৌরবটী অমর করিয়া দিয়াছে। তোমা হেন নিধিকে 'বিধি মিলাওল'—আমার 'মনের সাধ পূরিল' -আমি আর সুখ চাহিব না'—ইহা প্রেমদর্শনের ভিত্তি। কবি সাদা কথায় সহজ ভাবে প্রেমের এই দর্শন আমাদের নিকট পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছেন। তিনি আমাদের নমস্য।

আর দু একটী কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সারা গ্রন্থটীর ভিতরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বেশ 'চোখোচোখি' সাক্ষাৎ দুইবার ঘাট—একবার তাঁহার পূর্ব্বরাগে আর একবার সম্ভোগ মিলনে। পূর্ব্বরাগে তিনি ফুটেন নাই; সম্ভোগ লীলায় তাঁহার একটী দূষিত মূর্ত্তি পাইয়াছি। মোটের উপর কাব্যে কৃষ্ণের চরিত্র ফুটে নাই। শুধু জ্ঞানদাস নহে, সমস্ত বৈষ্ণব কাব্যেই এই ব্যাপার। রাধিকা সর্ব্বস্ব বৈষ্ণব কবি রাধা লইয়াই ব্যস্ত—শ্রীকৃষ্ণকে

দিকে ফিরিয়া চাহিবারও অবকাশ পান না। কেন যে তাঁহারা ইঁহাকে উপেক্ষা করেন, বুঝিতে পারি না; আর এ উপেক্ষাও যে নিতান্ত নিরর্থক হইয়াছে তাহা নহে—কাব্যের ইহাতে যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ইঁহার চরিত্রটি ফুটিয়া উঠিলে সৌন্দর্য্য সম্পদে কাব্যখানি গরীয়ান ও মহীয়াণ হইয়া উঠিত। পূজারাণীর পূজার সঙ্গে সঙ্গে উপাস্য দেবতার মোহন মূর্ত্তিখানি বিকশিত হইয়া উঠিলেই না দর্শকের কাছে আরাধনার ছবি সম্পূর্ণ হয়।

হৃদয়কে রাধিকা সাজাইয়া প্রিয় বঁধুয়ার পদে সাধক বৈষ্ণবের এই আত্মনিবেদন মধুর মোহন সুন্দর। প্রার্থনা করি যুগে যুগে বাঙলার কাব্যোদ্যানে বৈষ্ণবহৃদয় রাধিকার নূপুর নিক্কণ যেন চিরকাল বাজিতে থাকে। জীবন মধুর হইবে, চিত্ত মধুর হইবে, চরিত্র মধুর হইয়া উঠিবে।

চিঠির জবাব

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

সখি,

পেয়েছি আজ ক'দিন হল তোমার প্রথম পত্র।
তাহার মাঝে আলোর রেখায়
তোমার হাতের লেখায় একটি ছত্র—
তোমার মনের পথটি দেখায় একটি পথিক বাক্য—
আমার মনে করায় সুধাসৃষ্টি!
চিঠির মাঝে পেলাম যেন তোমার স্নেহের স্যাক্ষ্য;
একটি কথা হয় কি এতো মিষ্টি?
লিখচো এ কোন্ খেয়ালে এতো দূরের জনে——
—তোমার কথা সদাই পড়ে মনে!

সত্যি পড়ে? কিম্বা লেখার লেখা
শুধুই কালির রেখা?
এমন আমার কিই বা আছে, তোমায় আমি দিলাম কি এমন,
আমায় মনে পড়বে অকারণ।
হয় যদি একথা নেহাৎ বাজে
তবু এযে বাজে বুকের মাঝে—
বাজে নতুন মধুর দুখে, বিধুর বেদনায়;
বাজে মনের মনে,
বাজে স্বপ্নে বাজে জাগরণে,
বাজে আমার জীবন যোড়া বিপুল চেতনায়!

কিন্তু যদি সত্যি মনে পড়ে—
আমার সে সুখ কোথাও নাহি ধরে!
নাহি ধরে এই জীবনে,
নাহি ধরে এই ভুবনে,
নাহি ধরে লোকে লোকান্তরে!
নাইক যাহার এমন কিছু সত্যি তারে তোমার মনে আসে?
কেবল কবি,—কেবল ভালোবাসে
যে অভাগা—ভাগ্যেরে তার দুষি,—
দিল তোমায় অনেক ব্যথা হয়তো কিছু খুশি;
তারেই তোমার হঠাৎ পড়ে মনে
যখন তুমি কাটাও বঁধুর সনে!

কিন্তু তোমায় আমার মনে পড়ে
আজ বাদলের অশ্রান্ত ঝর্ঝরে!
চেয়ে দেখি ঐ গগনের সজল নয়ন কোণে,
যেমন আমার উথলে ওঠে তোমায় পড়ে মনে!
অন্তরে সাধ যায়,
তোমায় যদি—......
মনের কথা মনে রাখাই ভালো,
দিনের নদীর স্রোত যবে ফুরালো
তোমার ছায়ায় ভরা এ বাদলায়!

নিশীথ রাতে হঠাৎ ভাঙে ঘুম
চেয়ে দেখি সারা ভুবন ব্যথায় কী নিঃঝুম্‌!
চেয়ে দেখি দূরের তারার দিকে
চোখের নির্ণিমিখে
অমনি মনে ভেসে ওঠে একটি সাঁঝের ছবি—
যেদিন তোমার কবি
তোমায় ভালোবেসে দিল প্রথম পূজার চুম্‌!
আরেক দিনের কথা মনে পড়ে
যেদিন তুমি এলে আমার ঘরে
গভীর নিজন রাতে,
চাঁদের আলোয় বস্‌লে বারান্দাতে—
দাঁড়িয়ে আমি ছিলাম তোমার পাশে,
বাঁধনহারা বসন্ত বাতাসে,
হাতটি তোমার ছিল আমার হাতে!
তোমার মুখে চেয়ে
প্রশ্ন আমার জাগ্‌ছিল মন ছেয়ে
সত্যি কে যে বেশি মোহন—ইহা,
আকাশের চাঁদ কিম্বা আমার প্রিয়া!
মাতাল হয়ে হঠাৎ মোহের ক্ষণে
কি করেচি আজ তা পড়ে মনে;
শুভ্র তোমার ঐ ললাটে দিলাম বিজয়টীকা
আমার প্রাণের হোম-আরতির শিখা!
রাগ করোনি, সেদিন ভালবেসে
আমার আদর নিলে মধুর হেসে!...

এমনি অনেক দিনের কথা, মনে পড়ে যখন ছিলে হেথা—
অনেক নেশা মেলামেশা অনেক তৃষা সুখ দুঃখের ব্যথা,
অনেক আঘাত, অনেক সোহাগদান
অনেক অভিমান!
অনেক খেলা অনেক অবহেলা!
কতদিনের হৃদয় পাওয়ার কী আনন্দ;
কতদিনের রাগ-করে-সেই কথাবন্ধ;
একলা ঘরে চুপটি ক'রে থাকা অশ্রু-রাঙা,—
তেম্‌নি নিজে যেচে সেধে বন্ধুর মান ভাঙা!
প্রতিদিনই নতুন ক'রে স্নেহের নতুন সৃষ্টি—
রূপসাগরের অরূপ কমল
একে একে খুলেচে তার একশোটি দল—
পরিমলের সেই কাহিনী আজকে লাগে মিষ্টি!

অনেক দিনের অনেক কথা হল অনেক লেখা,
তোমার পাশে আছেন প্রিয়, হেথায় আমি একা—
মনের মাঝে জাগ্‌লো যাহা তাই কলমের মুখে
বাহির হল তোমার চোখের দেখা পাওয়ার সুখে!
হয়তো তারা দেবে তোমায় অনেক ব্যথার স্মৃতি
—ছন্দে গাঁথা এযে ব্যথার গীতি—
ইহার তরে সখি,
আমায় ক্ষমিবে কি?
এই মিনতি তোমার কাছে মাঝে মাঝে খবর তোমার দিয়ো,
চিঠির মাঝে একটুখানি
রেখো মৌন সুরের বাণী—
একলা পথে চলা আমার হয়তো তাতে করবে রমণীয়!
দীর্ঘ চিঠির প্রান্তে এসে হেথায় টানি ইতি—
এরই সাথে রইল কবির প্রীতি।

জলস্রোতের ঘূর্ণিপাকে

—শ্রীজ্যোৎস্নানাথ চন্দ

প্রথম পল্লব

জীবনটা কী ?………

আজ সীমাহীন য়্যাতলান্তিকের প্রত্যেকটা ঢেউ যেন আমার মুখের পানে তাকিয়ে ওই একই প্রশ্ন করছে।

সত্যি, জীবনটা কী ?……

এই যে মায়াময়ী ধরিত্রীর বুক চেয়ে চলেছি এর শেষ কোথায় !……যৌবনের লক্ষ কামনা পায়ে পিষে এই যে শালের বনে ক্ষ্যাপা হাওয়ার মতন ছুটে চলেছি এর শেষ কোথায়…যতই মনকে আমার প্রশ্ন করি ততই এর জটিলতা বেড়ে চলে ! কোন অজানায় আমার এই যাত্রার যবনিকা পড়্বে……কে জানে !……

একে একে চোখের সুমুখে ভেসে উঠ্‌ল অতীতের শত-স্মৃতি-বিজড়িত দিন গুলি। বর্ত্তমানের গণ্ডী পেরিয়ে তারা এখন অতীত ইতিহাসের সামিল্ হয়ে গিয়েছে। দিনের পর দিন পিছু ফেলে এগিয়ে চলেছি……সে চলার নেশা ঘুচ্‌বে কোন্ রক্ত-সন্ধ্যায় ?……

মনে পড়্‌ল যেদিন ঝরণা বল্‌লে——তোমাকে আমার জীবনের জালে জড়িয়ে নিতে চাইনে, চারু ! আমার মনের কোণে অনেক খুঁজে দেখলুম্ কিন্তু আমার সত্যিকারের আমিতে তোমায় পেলুম্ না।……

উঃ! গর্‌গর্ করে তোতাপাখীর মতন অবাধে কথা গুলো বলে যেতে পার্‌ল ?……বুকটা কেঁপে উঠ্‌ল না……গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে এল না !……

সুন্দর সোজা জবাব।

হেঁয়ালিতে পড়লুম। ঝরণার মুখ দিয়ে বেরুলো…… আমার সত্যিকারের আমিতে তোমায় পেলুম্ না! উদ্বেল যৌবনের সিন্ধু-তীরে সেদিন আচম্‌কা থম্‌কে দাঁড়ালুম্।

হায় নারী……মনটা আমার বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌ল ! আমার এই বুকভরা প্রেমের প্রতিদান দিলে এম্‌নি করে ?……

বল্‌লুম——ঝর্‌ণা, চাই কি তার আগে আমার এই পাঁজর গুলোর ওপর দু'ঘা হাতুড়ী বসিয়ে দাও !……

হাঃ! হাঃ! হেসে উঠ্‌ল সে।

কী তীব্রতা……কতটা ঝাঁঝ্ মেশানো তাতে।……

জাগ্রত যৌবন-প্রভাতে আনন্দের অনবদ্য আলোর পরিবর্ত্তে সেদিন সেখানে নেমে এল অমানিশার অন্ধকার ! জীবনের স্রোত খেঁই হারিয়ে উল্টোমুখো হয়ে বয়ে চল্‌ল।

*　*　* সে সপ্তাহেই প্যারীর পানে ছুট্‌লুম্। পৌছুতেই বরাতগুণে একটা কাজও জুটে গেল বইয়ের দোকানে !……প্যারীর জীবন অদ্ভুত…যেন একটা স্বপ্ন-পুরী ! এঁদেশের ভেতো বাঙ্গালীর মতন ওরা প্রাণ-হীন নয়, জীবনটাকে ওরা সুদে আসলে ভোগ করে নেবার কস্‌রৎ জানে। হাঁ, একটা দেশ বটে !…… পিয়ানোতে যদি কোথাও প্রাণ থাকে তো সে প্যারীর পিয়ানোয় !……কিন্তু প্যারীর আনন্দ আমার জীবনের একটুও এদিক্ ওদিক্ কর্‌তে পার্‌লে না।……দিনের বেলা দোকানে কাজ করে বিকেলের দিকে ক্লান্ত শরীরটাকে কোন রকমে টেনে হিঁচ্‌ড়ে সীনে'র পারে নিয়ে যেতুম্।

সীন্ তো নয় যেন গঙ্গা !……

ভুল……ভুল……ঝর্‌ণা একটী মস্ত ভুল করে জীবনটাকে আমার মাটী করে দিলে ! কিন্তু সে ভুলের নেশায় সে যে এখন মাতাল।……নিখিল ভুবন যেনো আমার পানে চোখ ঠেরে চাইছে !

ঝর্‌ণা !……চোখের জলে জামা ভেজে। ঠেকিয়ে রাখা যায় না। ভেবেছিলুম্ দেশ ছেড়ে এখানে নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রেখে ঝর্‌ণার কথা ভুল্‌ব……কিন্তু হল না তা।

ছাপার লেখা ভোলা যায় কিন্তু মনের লেখা যে অক্ষয় হয়ে আঁকা রয়েচে স্মৃতির সবুজপত্রে !

জ্যোৎস্না-রাত্রে সীনের পারে বসে বসে দেখতুম্ নদীর জলে ঝর্ণার কমনীয় মুখখানি, বিদ্যুতের মতনই দীপ্তিভরা চোখ দুটী চল চল করছে! যে সর্ব্বনেশে স্মৃতি আমায় শ্যাম্লা বাঙ্লার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে তাকে হাজার ছুঁড়ে দিলেও আমায়ই আঁকড়ে ধরে থাকে।

* * * ভালো লাগ্ল না বেশীদিন প্যারীর আব্হাওয়া! চলে গেলুম্ মার্সাঁই-য়ে! যেদিন দেখলুম্ পকেটের শেষ কপর্দ্দকটীও নিঃশেষ হয়ে এসেচে সেদিন মনে করলুম্ না খেয়েই মরতে হবে।......

কেন, কখন যে কি হয় কে তার কৈফিয়ৎ দেবে!

চাক্‌রী জুটে গেল একটা জাহাজে...টিকিট-কালেক্টরের চাক্‌রী।

চাক্‌রী তো নয় যেন সাঁতার-না-জানা লোকে অথই জলে ঠাঁই পাওয়া!

জীবনের আর এক ধাপ।

দিনের পর রাত, আর রাতের পর দিন......খাড়াবড়ি থোড়, থোড়বড়ি খাড়া!

কাজের অবসরে ডেকে চেয়ার ফেলে সমুদ্রের পানে চেয়ে থাকতুম্ আর নয়তো কেবিনে গিয়ে ডায়েরী নিয়ে বসতুম্!

না-ভালো না-মন্দ......এই জীবন।

দ্বিতীয় পল্লব

একটা 'ট্রিপ' দিয়ে মার্সাঁই-এ আমাদের জাহাজ সবে এসে পৌছেচে!

টুপিটা মাথায় চাপিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে দাঁড়ালুম্ নিজের নির্দ্দিষ্ট জায়গাটীতে।

যাত্রীর দল হল্লা করে চলেছে।

একটা টিকিটের তারিখটা ভালো বোঝা যাচ্ছিল না, একটু চেষ্টা করে পড়্‌ছিলুম। হঠাৎ নারী-কণ্ঠে কে যেন বল্লে———মঁসিয়ে, আমাদের এই দু'খানা টিকিট নিন্ তো!......

পরিচিত গলা......চমকে চাইলুম্!

এ কী? ঝর্ণা যে!

কথা বল্‌তে গেলুম্ স্বর বেরুলো না।

কথাটা গুলিয়ে গেল......ঝর্ণার দিকে মিনিট দুয়েক্ অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইলুম্।

পেছনে ও কে দাঁড়িয়ে ঝর্ণার?

ওঃ! বুঝেচি ঝর্ণা শৈবালকেই বিয়ে করেছে।

ও কিন্তু আমায় চিন্‌তে পারে নি...কী করে পারবে? বাঙ্লার চেনা চারু আর আজকের এই চারুতে যে অনেক তফাৎ রয়ে গেছে! সীমাহীন পৃথিবীর বুকে এই যে আলেয়ার মতন ছুটে বেড়ানো...এই যে আহারে-অনাহারে বসুন্ধরার বুকে ঝড় বাদলের ভেতর দিয়ে পলে পলে জীবনী-শক্তিটাকে পিষে মার্‌ছি এ কার জন্যে?......সেই ঝর্ণাই আজ আমায় চিন্‌তে পারলে না!.........

থুথু দিয়ে জিভ্‌টাকে একটু ভিজিয়ে নিয়ে অনেক কষ্টে বল্লুম—আমায় চিন্‌তে পার্‌লে ঝর্ণা?......

ঝর্ণার মুখে কিন্তু কোনো ভাবান্তরই দেখলুম্না। একটু হেসে শুধু বল্লে—ওঃ! চারু দেখ্‌চি যে...তা সবুজ বাঙ্লার কোল ছেড়ে য়ুরোপের কালোজলে সাঁতার কাট্‌চো যে!.........

* * * জীবনটাকে তুমি আমার ব্যর্থ করে দিলে আবার বল্‌ছ কি না বাঙ্লা ছেড়ে কেন য়ুরোপে এলুম্। দুঃখের বিলাশ-সম্রাট করে আজ আবার কি না বলা হচ্ছে আনন্দের সিংহাসন কেন ছেড়ে এলে!......

ঝর্ণা বোধ হয় পণ করেছিল মানুষের বুক কত সইতে পারে তাই পরোখ্ করে দেখ্‌বে। মুখে একটু মৃদুহাসি নিয়ে বল্লে——তা, চারু, এঁকে চিন্‌লে নিশ্চয়ই। ইনি আমার স্বামী ব্যারিষ্টার মিঃ শৈবাল সেন!......

টুপি তুলে সেনকে অভিবাদন করলুম্।

ঝর্ণা বল্লে তারা মার্সাঁই-য়ে নেমেই ফ্রান্সের দক্ষিণ দিক্‌টাতে বেড়াবে।

সেনের মুখের দিকে চেয়ে সে বল্লে——তা, চারুই যখন আমাদের জাহাজের লোক তখন দুদিন জাহাজে থেকেই না হয় এ জায়গাটাকে দেখে অন্য কোথাও যাওয়া যাবে। কী বল?

......সেন ঘাড় নাড়্‌লো।

আমি বললুম্—স্বচ্ছন্দে! আমার কেবিন্ তো এক রকম খালি পড়ে রয়েচে। ওখানে থেকো।......

ঝর্‌ণা ধন্যবাদ দিয়ে সম্মতি জানাল। তারপর তারা দুজন শহর দেখ্‌বে বলে বেরিয়ে গেল। সারা গা আমার ঘেমে উঠেছিল...উঃ! বাঁচলুম্ এদের হাত থেকে অন্ততঃ কয়েক ঘণ্টার জন্যে। কাজ শেষ করে বেশ বদ্‌লে নিয়ে ডেকের ওপর একটা ইজি চেয়ারে শুয়ে পড়লুম্। চোখে পড়ে গেল যে পথ দিয়ে ঝর্‌ণা ও শৈবাল গেছে... সে পথের মাটী যেন ওদের পায়ের পরশ পেয়ে আরো রাঙা হয়ে উঠেচে! একরকম ভালই চলেছিল দিনগুলো ...হঠাৎ একটা ঝড়ো হাওয়া এসে মনটাকে উতলা করে দিয়ে গেল। তিন্‌শো পঁয়ষট্টি দিনের বছর......ফুরোয় তো ফুরোয় না!

রাত দুটে !

চারদিক নিস্তব্ধ। যেন জগতের প্রলয়ের দিন ঘনিয়ে এসেচে।

সারা আকাশ মেঘে ছেয়ে গেছে, যেন কাল বোশেখীর ঝড় উঠ্‌বে! অন্ধকারের দানব তার দুটো ডানা দিয়ে পৃথিবীটাকে ঢেকে রেখেচে।......

জাহাজের সব লোক আরামে ঘুমুচ্ছে...... কেবল আমিই আজ জেগে আছি। শুধু আমার জীবনটাই কী এত সৃষ্টি ছাড়া? ওদের কারুর জীবন কী আমারই মত আগুনে পুড়ে যায় নি?......এই যে কোটী নর-নারী তাদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে চলেছে সবাই তারা কী সুখী?......

সেদিন জাহাজের ক্যাপ্টেন কথায় কথায় বল্‌লে—রয়, নিজের জীবনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলো না। জানো তো Eat, drink and be merry for to-morrow we die!.........

সত্যিই কী তাই!.........থিওরী তো অনেকই হল কিন্তু সেই সব থিওরীর ধাপে ধাপে সমানে পা রেখে কি মানুষ তার নিত্যিকার জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করতে পারে?.........অসম্ভব.........ভেবেছিলুম যা পাইনি তাতো পাইনি, তা নিয়ে আর মাথা ঘামাবো না কিন্তু তা হল কই! হঠাৎ ঝড়ো-হাওয়ার উদয় এল ঝর্‌ণা, পুরোণো-দিনের বাণী আজ আবার নতুন করে পৌঁছুলো ফরাসী-দেশে প্রবাসী একটা বিরহী বাঙালী তরুণের কাছে। স্মৃতির দেউলতলে যে কাহিনী সুপ্ত ছিল সে আজ আবার তরুণ প্রভাতের অরুণ আলোয় সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে চাইল......... মাতাল মদের নেশায় মাতাল হয়ে উঠ্‌ল।

এই তো অত-করে-আঁকড়ে-ধরা জীবন!.........

মানুষ চায় বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্মতিসেবের সঙ্গে পা মিলিয়ে মিলিয়ে চল্‌তে কিন্তু জীবনের স্রোত সে দণ্ডী পেরিয়ে এদিক ওদিক্ ছুটে চলে। প্রাপ্তি ও বিচ্ছেদ, সুখ ও দুঃখ ওরা সব হাত ধরে পাশাপাশি চলেছে আর মানুষ সে পিচ্ছিল পথে সাবধানী হয়ে চলেছে।

নারীর প্রেম?

ওটা একটা মস্ত চোখের নেশা নইলে ঝর্‌ণা আজ আমারই সুমুখে দাঁড়িয়ে নির্ব্বিকার চিত্তে আমার সঙ্গে তার স্বামীর পরিচয় করিয়ে দেয়! পৃথিবীর বুকটা একটু কেঁপে উঠ্‌ল না.........সাগরের জল একটু দুলে উঠ্‌ল না!......

আমার জীবনটা মাটী করে দেবার কে সে? যে জীবন দিতে পারে না সে জীবন নিতে পারে না। যে কৃত্রিমতার মুখোস্ সে পরেছিল আজ তা তার মুখ থেকে খসে পড়ে গেছে কিন্তু আমার জীবনটা যে নষ্ট হল আমি তার শাস্তি চাই.........শিরায় শিরায় রক্ত আমার টগ্‌বগ্ করে নেচে উঠ্‌ল! পকেটের Six-chambered revolverটায় হাত দিলুম্.........ভরা রয়েচে সেটা। আস্তে আস্তে গেলুম্ ঝর্‌ণার কেবিনের পাশে। ফ্লাস্ লাইট্‌টা জেলে দেখলুম্ দু'জন দু'জনকে ধরে শুয়ে রয়েচে!.........

.........হাতে নিলুম্ রিভলবারটা।

কেঁপে উঠ্‌লো হাতটা একবার.........তারপর......... চেপে দিলুম ট্রি'গার। গুড়ুম্! গুড়ুম্!.........ব্যস, দুজনকেই দিলুম শেষ করে, অব্যর্থ লক্ষ্য!.........আমার জীবন নিয়েছো আমি তোমার জীবন নিলুম্.........

* * * * একী? উঃ! এ কী করলুম্ আমি?.........আমার ঝর্‌ণা. তাকে?.........চোখ ফেটে আমার কান্না বেরুলো!

ঝর্‌ণা.........ঝর্‌ণা.........

গুলি লেগে Skullটা তার একেবারে গুঁড়িয়ে গেছে তবু তার অতল কালো-চোখ দুটো আমার পানে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে রয়েচে ঠিক্ তেমনি করে যেদিন প্রথম তাকে ধ্বরড়ীতে দেখেছিলুম!.........সারা গা থেকে জল ঝর্‌তে লাগ্‌ল...... ভয়ে মুখ শুকিয়ে উঠ্‌ল! ছুটে সেই বীভৎস কেবিনের বাইরে চলে এলুম.........নিজের মাথা লক্ষ্য করে ট্রিগার চাপ্‌লুম, কান ঘেঁসে গুলি চলে গেল। ঠিক জায়গায় পৌঁছুলো না! তারপর.........উঃ! তারপর কিছু জানিনে।

* * * * *

হিমেল্ হাওয়া লেগে শেষ রাত্রির দিকে জ্ঞান হল। পরদিন ভোরে পালিয়ে গেলুম নিউ ইয়র্কে.......পুলিশ ধর্‌তে পার্‌লনা। আজও তাই পৃথিবীর বুকের ওপর ছন্নছাড়া এই জীবনের ভার বয়ে বেড়াচ্ছি। পাগল হয়ে সেদিন যা করেছিলুম্ আজ তার জন্যে অনুতাপ হচ্ছে। কী হল আমার লাভ তাতে? তার হাত থেকে রেহাই পেলুম কোথায়?...........

ওই নীল-আকাশের পানে তাকিয়েও তাতে আঁকা রয়েচে সেই একই বিরাট্ জিজ্ঞাসা—জীবনটা কী?... ...

তোমার সভায় যখন হবে

—শ্রীমণি দেবী

তোমার সভায় যখন হবে গুণীর গানের শেষ
সুদূর পারে মিলিয়ে যাবে মধুর সুরের রেশ—
সন্ধ্যা-তারা উঠ্‌বে ফুটি নীল-নীলিমার গায়,
সাঁঝের আভায় জগৎ যখন রাঙিয়ে দিয়ে যায়—
তখন আমায় ডাক দিওগো তোমার সভাতলে,
গাইব প্রাণের গানটী আমার আকুল নয়নজলে!
পূজারী সব পূজার তরে গাঁথ্‌বে যখন মালা,
রঙ্‌ বেরঙের ফুলের ভারে সাজ্‌বে বরণ-ডালা—
প্রীতির ঝর্‌ণা বইবে বুকে ফুট্‌বে মুখে হাসি,
মুখর হবে সভা-গৃহ উঠ্‌বে বেজে ব্যকুল বাঁশি—
তখন আমি একটী পাশে রইব মলিন মুখে,
সবার শেষে আমায় তুমি স্থান দিও গো বুকে!
পাপ্‌ড়ি-ছাড়া ফুল দুটী মোর স্থান দিওগো পায়ে,
একটু খানি আশা দিও হাসির মৃদুল্ বায়ে—
এতটুখানি পরশ দিও, দিও আলিঙ্গণ,
দুঃখ-ভরা আঁধার রাতের সুখের সুস্বপন!

সম্পাদকের বিপদ

শ্রীরেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদকের বিপদ লিখতে বসে এত বিপদে যে পড়তে হবে তা আমরা ভাবিনি। আশ্বিনের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে' পাঠক মহলে এক অপরিসীম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সম্পাদকের বিপদের বিষয় সবিশেষ অবগত না হওয়া পর্য্যন্ত জনকতক পাঠকের দেখছি—'চোখে নাই ঘুম' ইত্যাদি। চিঠির পর চিঠি এসে তাড়া লাগাচ্ছে—ব্যাপার কি ?

এ সব দেখে শুনে মনে হ'ল মাথা ব্যথাটা একলা শুধু—আমাদেরই নয়।

সিমলা পাহাড় থেকে আমাদের পুরাণো বন্ধু কমল দা' লিখেছেন,—"ছ'মাস সম্পাদক হয়েই কী বিপদ ঘনিয়ে তুলেছ এরই মধ্যে ? অর্থের অনটন, না বন্ধু বিচ্ছেদ, কিম্বা...... কী বলত! ভেবে কিছুই ঠিক না করতে পেরে আমি ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। ফেরত ডাকেই খবর জানাবে!"

আমাদের আদ্যিকালের উকিল মশাই—আমাদের আপদে বিপদে সহায় মজঃফরপুরে বেড়াতে গিয়েছেন—তিনি সেখান থেকেই খবর পেয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, "বাপু হে, গোড়া থেকেই বারণ করেছিলাম, কাগজ চালানর মত ঝকমারী কাজ আর নেই, তখন ত শুনলে না!......যাই হোক, আগে ব্যাপারটা কি এখন বলত! সিডিশন না ডিফেমেশন ? ভয় পেও না তোমরা, আমি যতদিন রয়েছি। এক মাসের মধ্যেই আমি ফিরে গিয়ে তোমাদের মোকর্দ্দমার তদ্বির করব......"

কিশোরগঞ্জ হতে একটী মহিলা গ্রাহিকা সম্পাদকের বিপদ জেনে সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন এবং লিখেছেন "আমি আপনাদের অপরিচিত তবু পত্রিকার সম্পর্কে আপনাদেব বন্ধু বলেই মনে করি। জানবেন, আপনাদের বিপদে আমাদেরও চঞ্চল করে তুলেছে! আপনাদের কি বিপদ জানতে পারি কি ? পারিবারিক কোন বিভ্রাট ঘটেছে ? যাহাই হোক্ ভগবানের কাছে আপনাদেরই সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করি।"

বেশ! তবু এইটুকু বুঝলাম—জগতে আমাদের জন্যে সুখ দুঃখে সহানুভূতি জানাবার লোক আছে! মনে ভারী আনন্দ হচ্ছে, একথা চিঠিতে পড়ে! এই সমবেদনা আন্তরিক হোক্ অথবা মৌখিক হোক্ কিছু যায় আসে না! সে কথা যাচাই করে দেখবারও দরকার নেই। আমাদের জন্যে আর একটী লোক ভাবে, এ কথা মনে করতেও চিত্ত প্রফুল্ল হয়!

চিঠি ক'খানার উত্তর লিখে দিলাম। এইবারে আসল ভাবনা—লেখাটা আরম্ভ করা যায় কি বলে!

প্লট কিছুই মাথায় আসছে না যে! টেবিলের উপর বেতের ঝুড়িতে যে সব লেখা এসে পড়ে রয়েছে সেইগুলা নিয়ে নাড়া। । করছি যদি সেই থেকে কিছু প্লট তৈরী করতে পারি।

অন্যমনস্ক হয়ে একটী কবিতা পড়ছিলাম,—জনাই থেকে শ্রী...মুখুজ্জে লিখে পাঠিয়েছেন। কবিতার সঙ্গেই একখানা চিঠি। চিঠিখানা পড়লাম।

"......লেখা নিয়মিত দেবারই চেষ্টা কর্ব্ব,—একটা প্রতিশ্রুতি মত পাঠালাম। বারান্তরে অন্য লেখা পাঠাইবার ইচ্ছা রইল। প্রয়োজন মনে হলে "ধূপছায়া" আমার ঠিকানায় পাঠাবেন। আমি লেখার বিনিময়ে—'নবযুগ', 'আত্মশক্তি', 'উদ্বোধন', 'বিশ্ববাণী', 'প্রগতি', 'হিন্দু', প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকা গুলি পেয়ে থাকি। 'মাসিক বসুমতী' প্রবাসীতেও বোধ হয় আমার লেখা পেয়েছেন!

শিক্ষিত প্রধান জনাই গ্রামে ধূপছায়ার প্রচার হোক এইটাই আমি চাই! এখানে প্রত্যেক কাগজেরই প্রচার আছে। এখানে সাত আট শত ঘর কুলীন ব্রাহ্মণের বাসা। পণ্ডিতমণ্ডলী ও গ্রাজুয়েটের জন্য এই গ্রাম প্রসিদ্ধ। এখানে সাহিত্যিক অনেকেই আছেন—শ্রীযুক্ত নারায়ণ ভট্টাচার্য্য, আশুতোষ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ঔপন্যাসিকগণের বাড়ী জনাই। উপরন্তু সুবিখ্যাত সন্দেশ বিক্রেতা 'ভীমনাগে'র জন্মস্থান ও

র্দ্দিষ্টান জনাই। এখান হইতে সে সন্দেশ তৈয়ারী শিখে আর প্রসঙ্গ। অধিক আর কি লিখিব। নিবেদন ইতি……"

চিঠিখানার আদ্যন্ত পড়ে, এপিঠ ওপিঠ নেড়ে চেড়ে দেখলাম—না, নিমন্ত্রণের কথাটা কোথাও লেখা নাই। ব্রাহ্মণ মানুষ আমরা দুজনেই স্বভাবতঃই একটু ভোজন প্রিয়! সন্দেশ পাওয়া যায় জনাই-এ, এর সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক বা সম্বন্ধ একটু সুমিষ্ট ও সরস রকমই হবে ভেবেছিলাম; কিন্তু হায় রে দুর্ভাগ্য!

আশাহত হয়েই মুখুজ্জে মহাশয়কে লিখে জানালাম—আপনার কবিতাটী 'সন্দেশ' অথবা 'মোহন ভোগ' অথবা অমনই কোন কিছুর আদর যাঁদের কাছে, তাঁদের কাছেই পাঠাবেন!

আর একটী কবিতা।—লেখক শ্রী……মিত্র। প্রথমেই একখানি কার্ড। ইংরাজীতে লেখা,— * *

* * * MITTRA
* * para lane, Sobhabazar
CALCUTTA

Visiting hours
7 A. M. to 9 A. M.

অতঃপর পরিচয় লিপি।—যথা,—ছদ্ম ও আসল নামে সুপ্রসিদ্ধ মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র সমূহের লেখক :—

* * * MITTRA
(Gold medalist)

Recent publications in real name আসল নামে প্রকাশিত আধুনিক লেখা :—

আলোর দিনের ডাক (কবিতা)
" * * " আষাঢ় ১৩৩৪
"সন্ধ্যা" (কবিতা)
" * * " ৩ ভাদ্র ১৩৩৪

ছদ্ম নামে প্রকাশিত :—

প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী, মানসী ও মর্ম্মবাণী [এবং কোন কাগজে যে নয় তা জানা নেই।—সঃ]

বোলপুর থেকে শ্রীযুক্ত……চক্রবর্ত্তী, মিত্রজা মহাশয়কে জানিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথ নাকি তাঁর কবিতা পড়িয়া অত্যন্ত প্রীত হয়েছেন—এবং আরও কত কি!

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ নাকি স্বয়ং লিখেছেন যে মিত্রজা মহাশয়ের কবিতা তাহার ভাল লেগেছে……ইত্যাদি।

সার্টিফিকেট এবং টেষ্টিমনিয়াল সঙ্গে দিয়ে কবিতা পাঠাতে হবে! এ যে চাকরী খালিরও অধম হয়ে দাঁড়াল দেখছি; লেখা ভাল কি মন্দ আর দেখবার প্রয়োজন নেই। কার কটা প্রশংসা পত্র আছে তাই দেখে লেখা পছন্দ করতে হবে! তাহলেই হয়েছে!

সত্যিই তাই, সেদিন আর একটা লেখা হাতে এসেছিল। একটী গল্প। লেখক গল্পের সঙ্গে পুলিসের ডেপুটী কমিশনার মিঃ ব্যানার্জ্জির চিঠি পাঠিয়েছেন……"শ্রীমান……কে আমি জানি। একটী সচ্চরিত্র উদীয়মান লেখক। ওঁর গল্প ছাপলে আমি অত্যন্ত খুসী হব।"

মহা সমস্যার কথা! স্যার "আর্ এন্" এর প্রশংসা পত্র আগে গ্রাহ্য করতে হবে কিম্বা চ্যাপমান সাহেব যার হয়ে চিঠি লিখে জানিয়েছেন, তাঁর দাবীই আগে শুনতে হবে!

বাসন্তীতে একবার এক তরুণ লেখিকা একটী গল্প পাঠিয়েছিলেন। লেখিকার নাম কুমারী……বসু।

ভেতরে লেখিকার পিতা foot noteএ লিখেছেন,—"লেখিকার বয়স গত বৎসরে পনের ছিল, আশ্বিনে ষোলতে পড়েছেন।……"

বিজয়রত্ন বাবুও foot noteটীর পাশে আর একটী মন্তব্য লিখে পাঠালেন—"ইহাতে আমার দরকার নেই!"

এ রকমও ঘটে থাকে।

আর একখানি চিঠি পড়ি শুনুন। এবার গল্প; কবিতা নয়। লেখক শ্রী……অধিকারী। অধিকারী মহাশয় গল্প লিখিতে বসেও কবি হবার লোভনীয় আশা ত্যাগ করতে পারেন নি। তাই মুখবন্ধেই লিখেছেন—

"ধূপ-সৌরভ বেদী 'পর বাজে
মঙ্গল শাঁখ ঘন।
জাগে অরুণের মহা হোম-শিখা
নবীন উদ্বোধন।"

এইবার সেই চিঠি—

সম্পাদক মহাশয়েষু…

"ধূপছায়া" তরুণের অর্ঘ্য থালি।

এখানে তাদের হোমাগ্নি জ্বলে।

তাই এই হোমাগ্নিতে তরুণেরই একটা অবিকশিত পরিম্লান ফুল পাঠালাম……পূজার জন্ম……তরুণের মিলন-বেদী তলে। ইতি—

আহা! লিখতে কার না সাধ হয়? কিন্তু গল্প লেখকের চেয়ে কবি হওয়াই নাকি বাজারে সহজ। তাই এই "অবিকশিত পরিম্লান" ফুলের অধিকারীকে কবি হওয়ার পথে আমরা বাধা দিতে পারলাম না।

কিন্তু 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান'র রোগ কারুর আছে কি না জানেন কি? আমাদের ত সেই এক ষ্টীমার কোম্পানীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঠাকুর বাড়ীর লোকেদের বিনি পয়সার যাত্রীদিগকে আহার্য্য প্রদানের কথা ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছে না। কিন্তু আপিসে এ রকম ধরণের ব্যাপারও ঘটে গেল।

সেদিন আফিসে বসে আমরা যে যার কাজে ব্যস্ত—সহসা এক পরিপাটী ভদ্র বেশধারী আগন্তুকের প্রবেশ হল। এসেন্সের গন্ধে ঘর ভরপুর। শুনলাম তিনি লেখক, কবি—একাধারে সব। কেবল সম্পাদকের দল তাঁর প্রতিভা বুঝল না এই যা দুঃখ। আমরা ক্রমে অবহিত হলুম। যদি তাঁর প্রতিভা বুঝবার আমাদের আগ্রহ থাকে ত অচিরেই আগন্তুক মহাপুরুষের মহিমায় আমাদের গ্রাহক সংখ্যা কোন নির্দ্দিষ্ট গতিতে বর্দ্ধিত হবে। তাহার প্রতিশ্রুত ভাবী গ্রাহক-গণের তালিকা সমেত কবির ভাবী পুস্তকের খাতাখানি আমাদের হাতে এল।

ঝুড়ি হাতড়াতে বসে সে খাতাখানি হাতে পড়ায় ঘটনাটা মনে পড়ল।

লিখতে বসেছিলাম "সম্পাদকের বিপদ"। লেখার প্লট না পেয়ে সম্পাদকের ঝুড়ি হাঁটকেই বেড়ালাম! পাঠকেরা নিশ্চয়ই অধৈর্য্য হয়ে উঠেছেন! কিন্তু কি করব বলুন, নিজ গুণের ক্ষমা করতে হবে আজ। কেননা সম্পাদকের সম্পদই বলুন, আর বিপদই বলুন সে ঐ "ঝুড়ি"ই!

দিনে দিনে সরস্বতীর দপ্তর ভারী হয়ে উঠছে। মাসে মাসে আমাদের খোরাক যোগাড় করে নিতে হবে, ওই ঝুড়ির মধ্যে থেকেই।

আর এই বাছাই করা কি সোজা কাজ মশাই! যেন এক্‌জামিনের খাতা পরীক্ষা করতে বসা গেছে!

লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে কতগুলি জিনিষের প্রতি তা জানেন কি? তবে বলি শুনুন—

এক নম্বর:—লেখার ওজন! সব জায়গায় জিনিষের কেনা বেচা করতে হলে দেখতে হয়, যাতে সেটা ভারী হয় এবং বেশী পাওয়া যায়!—লেখা পত্রের ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক উল্টা। আমরা চাই লেখা যত ছোট হবে ততই ভাল। থলের মধ্যে হাতি পোরা ত আর সম্ভব নয়।

দু' নম্বর:—লেখক বা লেখিকার নাম! লেখকের নাম সম্বন্ধে বিবেচনা করবার সময় আমাদের দেখতে হয় দুদিক থেকে।—প্রথম, বাজারে লেখকের নাম লোকে কেমন পছন্দ করে; দ্বিতীয়, লেখকের নাম যদি জগদ্বিখ্যাত অথবা অন্ততঃ বঙ্গ বিখ্যাত না হয়, তখন দেখতে হবে নামের মাধুর্য্য। আনকোরা নতুন লেখক বা লেখিকার মধ্যে নাম যাঁদের শুনতে ভাল তাঁদেরই দাবী সর্ব্বাগ্রে গ্রাহ্য। এই সঙ্গে এটুকুও বলে রাখি, সম্পাদকের মধ্যে অনেকেরই একটু একটু দুর্ব্বলতা আছে। মহিলা সম্পাদকেরা সাধারণতঃ বীরত্ব ব্যঞ্জক পুরুষের নামই বেশী পছন্দ করেন; আর পুরুষ সম্পাদকেরা মহিলা লেখিকাদের মোলায়েম নাম দেখলেই আগে লেখা পছন্দ করেন। এই সব দেখে শুনে অনেক তরুণ এবং নূতন লেখক মহিলাদের নাম নিয়ে লিখতে আরম্ভ করেছেন। শরৎ বাবুর মত লোকও অনিলা দেবীর নাম গ্রহণ করেছিলেন।

নামের সঙ্গে বয়সটাও যদি জানা থাকে—সেইটাও একটু আধটু লেখা বাছাই করতে সাহায্য করে। এক মাত্র বিজয়রত্ন বাবুই বোধ হয় সম্পাদক-কুল-মধ্যে ষোড়শী লেখিকার ষোল বছর বয়সটা পছন্দ করেন নাই। তা নইলে যতদূর জানি ষোল বছর বয়স যে সব লেখিকার তাদের লেখা অন্যান্য প্রায় সকল সম্পাদকের কাছেই first preference পান।

Foot note অর্থাৎ পাদটীকা :—লেখা বাছাইএর ব্যাপারে "লেখকের" বয়সের হিসাবটা প্রায় কেহই খোঁজ নেন না। মহিলা সম্পাদকের এ সম্বন্ধে মনের খবরটা কিছু আমরা জানতে পারি নি!

তিন নম্বর :—সার্টিফিকেট অর্থাৎ প্রশংসা পত্র। এ সম্বন্ধে আমরা আগে কিছু বলেছি এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন!

চার নম্বর :—পত্রিকার মধ্যে জায়গার স্বচ্ছলতা।

পাঁচ নম্বর :—লেখকের তাগাদা এবং অনুরোধ পত্র!

ছ নম্বর :—লেখার গুণ অর্থাৎ merit। প্রচলিত পত্রিকা গুলির মধ্যে তিন চারিটী আদর্শ দাঁড়িয়েছে। কাজেই সম্পাদকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন রূপ ধারণ করে।

(ক) দু এক খানা পত্রিকার সম্পাদক বেশী পছন্দ করেন সেই সব লেখা যার মধ্যে থাকবে বস্তীর গল্প, বেশ্যা পল্লীর ইয়ারকি ইত্যাদি। (খ) দু একজন চান—বৈধ ও অবৈধ সব রকম প্রেমের কাব্য এবং গল্প। সেই সঙ্গে ভুতুড়ে গল্প এক আধটা দিয়ে সাজি ভর্ত্তী করেন! সাধারণ মেয়ে মহলে এই শ্রেণীর সম্পাদকের খাতির খুব বেশী। (গ) দু একটী সম্পাদক তাঁর কাগজের মধ্যে প্রেমের নাম গন্ধও পছন্দ করেন না। তাঁরা ধর্ম্মের গোঁড়া ভক্ত। তাঁদের কাগজ অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধদের জন্তই। বেদের ভাষ্য, শঙ্কর দ্বৈত্যবাদী কিম্বা অদ্বৈতবাদী, জগদীশ্বর সাকার কিম্বা নিরাকার এই সব প্রশ্নেরই আলোচনা তাঁদের কাছে মিলবে (ঘ) বাকী দু একজন আছেন যাঁরা সকলের চেয়ে উদার। তাঁরা লেখার মধ্যে জাত মানেন না। প্রেমের গন্ধ অথবা বৈষ্ণবের গোঁড়ামি—যে জিনিষটা রচনার মধ্যে ভাল ফুটে ওঠে সবই আদর করে নেন।

এই এত দিক দেখে তুলাদণ্ডে ওজন করে লেখা বাছাই করা যে কত ভ [illegible]পদ তা কেবল ভুক্তভোগী মাত্রই বোঝেন।

এবং এর পারিশ্রমিক আমরা পাই কি?

একদল লেখককে আমাদের অনিচ্ছাতেই, ও অজ্ঞাতসারে শত্রু করে ফেলি। দু একজনকে বন্ধু বলেও কাছে পাই,—কিন্তু তার সংখ্যা কতই বা হবে?

একদল গ্রাহকও আমাদের প্রতি চটে ওঠেন ক্রমশঃই। যাঁরা শুধু প্রেমের গল্পই চান আমাদের কাগজে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা দেখলেই রেগে ওঠেন। যাঁরা একটু গোঁড়া গোছের, প্রেমের গন্ধ পেলেই মারতে আসেন। যাঁরা বৃদ্ধ, নূতন লেখকের তাজা প্রাণের আঁকা ছবি দেখলেই ক্রুদ্ধ হন। আর যাঁরা 'নূতন দলের' পথিক, সাহিত্যে ধর্ম্ম ব্যাখা মোটেই পছন্দ করেন না।

একই লেখা, কেহ নাক সিঁটকে ফেলে দেন, কেহবা অন্তরের প্রীতি দিয়ে বরণ করে নেন।

সম্পাদকের বিপদ জিনিষটা কি বোঝাতে চেষ্টা করেছি। আমাদের এ লেখাটা গল্পও নয়, কবিতাও নয়, প্রবৈজ্ঞানিক অথবা গুরুগম্ভীর প্রবন্ধও নয়, কিম্বা রঙ্গরসও নয় এইটাকে আপনারা শুধু একটা মিনতি অথবা আর্জ্জি বলে মনে করতে পারেন। লেখক এবং পাঠক সকলকার দরবারেই আমাদের এই আর্জ্জি পেশ করছি। অনিচ্ছা সত্বেও যাঁদের মনে দুঃখ বা কষ্ট দিতে হয় তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। কয়েকটী লেখকের লিখিত পত্র হতে দু একটী অংশ গ্রহণ করে এই লেখাটার মধ্যেই কিছু বিদ্রূপ করেছি। আমাদের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, তাঁদের সত্যই শ্লেষ করি। লেখক বলেই সম্পাদকের কাছে দীনতা দেখান'—তাঁদের নিজেদেরই কাছে খারাপ মনে হওয়া উচিত। তাঁদের এই দীনতায় সম্পাদকদেরও লজ্জিত হতে হয়। আমরা উপরোক্ত মুখুজ্জে মহাশয়, মিত্রজা বাবু প্রমুখ লেখকদিগকে এই রকম দীনতা পরিহার করবার জন্য অনুরোধ করি। আমরা সকলকেই বন্ধু হিসাবে কাছে পেতে চাই।

লেখা বাছাই করবার সময় ছ'নম্বর নিয়মের (ঘ) চিহ্নিত অংশটুকুই আমরা মেনে চলবার চেষ্টা করি। যে লেখা আমাদের কাছে ভাল লাগবে তাই আমরা ছাপব। লেখক নামজাদা কিম্বা তরুণ, অথবা লেখার মধ্যে নিছক প্রেমই আছে কিম্বা ধর্ম্ম ব্যাখার কথা আছে এ সব বিবেচনা করবার চেয়ে আমরা শুধু এই টুকুই বেশী করে দেখতে চাই যে, লেখার মধ্যে সত্যি প্রাণ আছে কি না; লেখক হৃদয় দিয়ে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করতে পেরেছেন কি না।

সওদা

চিরাচরিত গতানুগতিক পথ সাহিত্যের পথ নয়। স্রোত যেখানে পরিপূর্ণতা ও প্রচুরতার প্রাবল্যে অস্থির হয়ে উঠেছে, সে তীর অতিক্রম করবেই। নব নব শাখা-উপশাখায় তার প্রাণ প্রবাহকে প্রসারিত করে দেবেই। সেইখানেই তার জীবন গতির কৃতার্থতা। সাহিত্য তেমনি একটা বহমান স্রোত। কখনো কখনো ফেনমুখর,—কখনো শ্যামাঞ্চলা গ্রাম্যবধূ,—কখনো শ্বলদঞ্চলা বৈরাগিনী ভৈরবী। নব নব ভঙ্গী, নব নব তার প্রকাশ। দাগ-ফেলা রাস্তার ওপর দিয়ে যে গরুর গাড়ী চলে, বাঁধা পথে—তা ধর্ম্ম হতে পারে, সাহিত্য নয়।

সাহিত্যের পক্ষে শাশ্বত যদি কিছু থেকে থাকে, ত' সে জীবন। বিরাট প্রকৃতি থেকে অনুতম জীবাণুটি পর্য্যন্ত। সেই জীবনকে দেখ্‌বার জন্যে কোনো নির্দ্দিষ্ট একটা দৃষ্টি-কোণ নেই। যার খুসী সে রঙীন কাচের চশ্‌মার ভেতর দিয়ে দেখেছে,—কারো যদি খুসী হয় সে সাদা চোখেই দেখ্‌বে। দেখার ভুল নিয়ে কথা নয়,—দেখ্‌তে পারা নিয়েই কথা।

কত লোককেই দেখি,—একের সঙ্গে অপরের কত ভেদ,—কথায় পোষাকে ব্যবহারে আকৃতিতে উচ্চারণে। কত প্রাদেশিকতা!—কত স্বেচ্ছাতন্ত্রতা!—তেম্‌নি যুগে যুগে কত লেখকের কত লেখন ভঙ্গীর তারতম্য। বঙ্কিমের ভাষা,—আর 'চতুরঙ্গে'র, 'তিন পুরুষে'র। বীরবল,—শরৎচন্দ্রের ষোড়শী—অতি-আধুনিক কথা-সাহিত্যিকগণ।

বিদ্যাসাগরী যুগের কেউ রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে—বাইরে'র ভাষা শুনে কি বল্‌তেন? হয়ত হাততালি দিয়ে,—বাঃ, বেড়ে হচ্ছে, বলে' সম্বর্দ্ধনা কর্‌তেন না!

না করলেও রবীন্দ্রনাথ প্রাণের দুরন্ত দুর্ব্বার বেগে ভাষার স্থূল জড়ত্ব ভেঙ্গে খরসান অসির মত দেদীপ্যমান হয়ে আছেন।

তেমনিই—

কবিতা অক্ষর গুণে পা মেপে মেপে চল্‌বে, গল্প প্যারা ও পরিচ্ছেদ ভাগ করে' বস্‌বে, কথোপকথন উল্টো কমার সাঙ্কেতিক চিহ্নের মধ্যে বস্‌বে,—এই ত' ছিল ভাষার সনাতন পদ্ধতি।

কি সুন্দর!—লিখ্‌তে গিয়ে কী সুন্দর! লিখ্‌বার কি দরকার ছিল?

তারপরে আবার,—বড়ো, ছড়ো, কতো, দেখা, গেল!

ভাষার ওপর দৌরাত্ম্য নতুন নয়। ভাষা ভূমির মত সর্ব্বংসহা। যত চাষ, তত অবাদ।—

ছিল ব্যাঙ, পেট ফুলে হতে চায় কচ্ছপ।

বাংলা সাহিত্য আধুনিক সাহিত্যিকদের লেখার মোহে পড়ে' নষ্ট হতে বসেছে—এই ওঁর ধারণা। ওঁর ধারণা তো আরো অনেক কিছু,—ধান গাছে তক্তা গজায়! ওঁর ধারণাতেই যেন সমস্ত কিছু চল্‌ছে,—যেন উনিই রবীন্দ্রনাথকে ধারণ করে' আছেন। বাহন যেন।

অভিজাত পত্রিকা বিচিত্রায় নব কীর্ত্তি—দুর্ব্বা!

এবার থেকে নিশ্চয়ই দূর্ব্বা আর পূজায় লাগ্‌বে না। অভিজাতদের খাদ্য বলে' নির্ব্বাচিত হবে।

নরেশচন্দ্রের সাহিত্য ধর্ম্মের সীমানা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার চমৎকার উত্তর।—শুধু ঐ টুকু পর্য্যন্তই।

আধুনিক সাহিত্যিকরা শিক্ষাদীক্ষাহীন,—সাধনা নেই।—প্রৌঢ় শিক্ষকের এই মত। শিক্ষকপুঙ্গবেরই বা কতটুকু সাধনা আছে? কয়খানা গ্রামার পড়েছেন?

'কড়ি ও কোমলে'র রবীন্দ্রনাথের কতটুকু সাধনা ছিল? শেলি যখন Queen Mab লিখেছিল?

একদিনে নয়;—বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়, ঐকান্তিক ও দৃঢ় নিষ্ঠা, গভীর অনুশীলন। সাহিত্যের দরবারে একটু সবুর করতেই হয়, অত উদ্‌ভ্রান্ত হলে চলে না। আমরা তো আজো সবুর করে' আছি,—মোহিতলালের বুক পকেটে আগের চেয়ে দু' একটী ভালো ও পাকা কবিতা দেখ্‌তে পাব।

গীতাঞ্জলির জন্য বহুদিন সবুর করতে হয়েছিল পৃথিবীকে, সবুর করতে হয়েছিল যোড়শীর জন্য।

বঙ্গবাণীতে শরৎচন্দ্রের উক্তি ও উত্তরায় রাধাকমলবাবুর 'সাহিত্যের নব কলেবর' পড়ে' আশ্বাস হচ্ছে।

আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে আশান্বিত ও গৌরবান্বিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে,—রবীন্দ্রনাথ যে দরজা খুলে দিয়েছিলেন সেই খোলা দরজা দিয়ে আধুনিক সাহিত্যিকদের হাত ধরে' একেবারে একেবারে একটা সুবিস্তীর্ণ উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে এসে দাঁড়িয়েছি! নমস্কার। নবদিবসের সূর্য্য!

—:•:—

ঘরে বাইরে

বিজয়ায় প্রীতিনমস্কার।

জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে যাঁহাদের ভালবাসা পেয়ে ধন্য হয়েছি, তাঁহাদিগকে নমস্কার করি। ভাগ্যবিপর্য্যয়ে যাঁহাদিগকে দুঃখ দিয়াছি এবং যাঁহাদের কাছ হ'তে কারণে হোক অকারণে হোক ঘৃণা এবং অবজ্ঞা পেয়েছি তাঁহাদিগকেও নমস্কার করি।

গ্রাহক অনুগ্রাহক শত্রুমিত্র সবাইকেই আমাদের ভালবাসা জানাই।

আজিকার এই মহামানবের সাগরতীরে মিলনের যে গান বেজে উঠছে মানুষের প্রাণের পরতে পরতে, তাহার মঙ্গলমধুর রেশটুকু অমর হয়ে প্রতিধ্বনিত হোক আমাদের নূতন বছরের প্রতি নূতন দিনে,—প্রতি নূতন কাজে।

বড় ছোটর দ্বন্দ্ব মিটে যাক্, চিরদিনের জন্যে। জাতিভেদের বিদ্বেষবহ্নি ধুয়ে মুছে যাক্। সব ভাই এক ঠাঁই হোক্।

সম্প্রতি গোলদীঘির ধারে শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষের সভাপতিত্বে শ্রীযুত সত্যেন্দ্র মিত্র, ডাঃ জে, এম্, দাশগুপ্ত, শ্রীযুত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি অনেকগুলি বক্তা দেশের

দেশনেতা মিলিত হয়ে কালীঘাটের পাণ্ডাদের বহুবিধ অত্যাচার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। কালীঘাটের হালদারেরা ৺মায়ের মন্দিরটাকে তাঁহাদের নিজস্ব সম্পত্তি বলে মনে করেন। এবং যাত্রীদের উপরও তাঁহাদের যথেচ্ছ অত্যাচার করবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে এই বলে কায়ে-কর্ম্মে নিদর্শন দেখাতে চান। হালদারদের এমনি সব নানা-রকম অন্যায় কার্য্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টি করবার জন্য একটী প্রস্তাব ঐ সভায় গৃহীত হয়েছিল।

কর্পোরেশনের মিটিংএও একজন মাড়োয়ারী সদস্য এ সম্বন্ধে এক প্রস্তাব দাখিল করেছেন। তিনি বলেন, কালীঘাটের হালদারেরা মন্দির যদি তাঁদের নিজস্ব সম্পত্তি এবং সাধারণের উহাতে কোন সর্ত্ত নাই এই কথা বলতে চান, তাহলে এবার হতে মিউনিসিপ্যালিটী কালীঘাট মন্দিরের দরুণ তাহার আয়ের অনুযায়ী ট্যাক্স দাবী করুক।

তাছাড়া কাহারও নিজস্ব বাড়ীতে ছাগ বা অন্য কোনও পশু নিয়মিত ভাবে হত্যা করা আইনে দূষনীয়—এই জন্যে নিয়ম জারী করে দেওয়া হোক কালীমন্দিরে আর কেহ কর্পোরেশনের অনুমতি বিনা কোনও পশু বলি দিতে পারবে না।

সম্প্রতি ডাঃ শ্রীমতী ডোরোথী লোগান নামে এক ইংরাজ মহিলা ইংলিশ চ্যানেল সাঁতার দিয়ে পার হয়েছেন বলে যে খবর এসেছিল সে ব্যাপার সম্পূর্ণ আজগুবি বলে শোনা যাচ্ছে।

ডাঃ লোগান নিজেই একথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন—ইংলিশ চ্যানেলে যখনই যাহারা সাঁতার দিতে চেষ্টা করে, সরকার এবং সাধারণের পক্ষ থেকে সমস্ত ব্যাপারটা ঠিক-ঠিক হচ্ছে কিনা নজর রাখবার কোনই ব্যবস্থা হয় না। এরই ফলে জুয়াচুরী করাটা মোটেই অসম্ভব নয়। তাই দেখাবার জন্যই ডাঃ লোগান, ১০ই অক্টোবর, রাত্রি ৭-৪০মি'র সময় কেপ্ গ্রিজ্ নেজ্ হতে সাঁতার দিতে আরম্ভ করেন। সেদিন চ্যানেলে জোয়ার ছিল ভীষণ। ঘণ্টা দুই সাঁতার দেবার পর ডাঃ লোগান এক নৌকায় চড়ে বসেন। পরের দিন সকাল সাড়ে ছ'টার সময় তিনি আবার জলে নেবে সাঁতার দিতে থাকেন। তখন আর মাত্র ঘণ্টা খানেক সাঁতার দিয়েই তিনি তীরে উঠতে সমর্থ হয়েছিলেন।

ডাঃ লোগান সত্যই সাঁতারে উত্তীর্ণ হয়েছেন বলে তাঁকে দেড়লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু তিনি হাসতে হাসতে সমস্ত টাকাই ফেরৎ দিয়েছেন।

সভ্যজগতের দরবারে কালা আদমির অপমান আর একমাত্রা সুরু হয়েছে। জোহানস্বুর্গে, টাউন কাউন্সিল থেকে চেষ্টা হচ্ছে যাতে সেখানকার ট্রাম গাড়ী গুলোতে এসিয়াবাসী কালা আদমীদের জন্য সাদা চামড়ার সভ্য লোকেদের কাছ হতে অস্পৃশ্য বলে দূরে আলাদা করে বসবার জন্য বাধ্য করা হয়!

ট্রান্সভাল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সভা থেকে বারম্বার এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়েছে। কিন্তু দৃক্পাত কেহই করে নি।

করবেই বা কেন? পরাধীন এবং হীনবীর্য্য জাত, জগতের ইতিহাসে কবে কোন্‌কালে সভ্যশ্রেণীদের সঙ্গে এক আসন পেয়েছে?

সাদা চামড়ার সব অপমানই তাই নীরবে সহ্য করে যায়!

মেডিকেল কলেজের তিনটী ছাত্র, শ্রীযুত গোরাচাঁদ নন্দী, শ্রীযুত সমর ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত সীতাংশু সরকার সাইকেলে কাশ্মীর ভ্রমণে বার হয়েছেন। তাঁহাদের ভ্রমণ কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ আমরা যত শীঘ্র সম্ভব 'ধূপছায়াতে' প্রকাশ করব।

—:০:—

Printed & published by Sj. Nripendra nath Banerjee from the Bela Printing Works,
14, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta.

আপনাদের ব্লক কোথায় করান।

লাইন ব্লক, কলার ব্লক ও হাফ্‌টোন ব্লক যদি করাতে চান তবে আমাদের নিকট হইতে করাইয়া লউন। কল্লোল, নওরোজ, শিশুমহল, আলপনা ও এই পত্রিকার এবং অন্যান্য সাপ্তাহিকের যাবতীয় ব্লক আমরাই করিয়া থাকি। পারদর্শী লোকদ্বারা পরিচালিত। এবার হইতে আপনাদের সমস্ত ব্লক আমাদের দ্বারা করাইয়া লইবেন। কাজে ও দামে সন্তুষ্ট হইবেন।

রেট্ কার্ড ও অন্যান্য বিষয়ের জন্য পত্র লিখুন।

ম্যানেজার—ইষ্ট এণ্ড এনগ্রেভিং কোং

৬২।১এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পরিচালক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীপ্রণবদেব মুখোপাধ্যায়।

ধূপছায়া

সম্পাদক—শ্রীরেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

যখন সাঁজের ঘোরে
হেমন্তের ঘন কুয়াশায় সারা আকাশ ছাইয়া
ফেলে তখন প্রিয় পরিজনে পরিবৃত হইয়া
সেই অবসরটুকু কাটাইবার

শ্রেষ্ঠ উপাদান আমাদের
এই গ্রামোফোন

যাহা আমাদের এই সুলভ তথা সম্ভ্রান্ত বাদ্যমন্দিরে—যেমনটী চান তেমনটিই পাইবেন। পছন্দ করিয়া বাছিয়া লইবার জন্য ৫০০ শত গ্রামোফোন আপনার ইঙ্গিতের অপেক্ষায় আছে। রেকর্ড আছে প্রায় ২০,০০০ তদুপরি প্রতিমাসে নূতন নূতন রেকর্ড প্রকাশিত হইতেছে। ১১২৷৷০ টাকা মূল্যের একটি সুন্দর গ্রামোফোন আজীবন আপনাকে আনন্দ প্রদান করিবে। একবার শুভাগমন পূর্ব্বক দেখিয়া যান।

পত্র লিখিলে সচিত্র ক্যাটালগ পাঠাই।

টেলিগ্রাম—
CHANDIFLUT
CALCUTTA.

এন, বি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স

গ্রামোফোন ও বাদ্যযন্ত্রের সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত দোকান—
১ সি, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিফোন,
কলিঃ—৫৩৭৫

কলিকাতা হোটেল লিঃ

মির্জ্জাপুর স্কোয়ার নর্থ, কলিকাতা।

মফঃস্বল হইতে আগত রাজা, মহারাজা, নবাব, জমিদার এবং সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণের বসবাসের আদর্শ নিকেতন।

প্রাসাদ তুল্য নূতন পঞ্চতল অট্টালিকা, দক্ষিণে উন্মুক্ত ময়দান, বৈদ্যুতিক আলো ও পাখা এবং মূল্যবান আসবাবে সুসজ্জিত গৃহ, উৎকৃষ্ট আহারের ব্যবস্থা সকলকেই তৃপ্তি দান করিবে।

চব্বিশ ঘণ্টা জল সরবরাহের জন্য মোটর-পাম্প এবং সকলের সুবিধার জন্য টেলিফোন সংযুক্ত আছে।

শ্রেণীভেদে প্রত্যেকজনের দৈনিক চার্জ্জ

১০৲, ৬৲, ৪৲ ও ২৷৷০

টেলিগ্রাম "ক্যালহোটেল"

টেলিফোন ৬০৩ বড়বাজার

কাজের লোক হ'তে হলে

কাজের কথায় পূর্ণ

আর্থিক-উন্নতির সহায়ক, অভিনব পাক্ষিক পত্র

কাজের মানুষ

এর গ্রাহক হউন। ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প সম্পর্কে এরূপ বিশদ আলোচনা আর কোন পত্রিকায় হয় না। ভারত ও ভারতের বাহিরে নানাস্থানের কর্ম্মখালির সংবাদ থাকে, বিখ্যাত সকল জাতির প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীগণের অভিজ্ঞতার খাঁটী কথার আলোচনা হয়।

সডাক বার্ষিক মূল্য দুইটাকা, ৩০শে অগ্রহায়ণের মধ্যে গ্রাহক হইলে একটাকায় পাইবেন।

সম্পাদক—শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক।

টাকা ম্যানেজার "বিজয়া প্রেস" ১২ করিস চার্চ্চ লেন, কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইবেন।

বিষয় সুচী

বিষয় সূচী

বিষয় সূচী

ধূপছায়ার নিয়মাবলী।

মূল্য—

ধূপছায়ার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩।৵০ ও ষাণ্মাষিক ১৸০, প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। নমুনার মূল্যও ।০ আনা। বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ধূপছায়ার বৎসর গণনা করা হয়। মূল্যাদি কার্য্যাধক্ষের নামে পাঠাইতে হয়। ভিঃ পিঃতে কাগজ পাঠাইতে অনেক অসুবিধা সুতরাং আগে মণিঅর্ডারে টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হইলে, আমাদের ও গ্রাহকদের সকলেরই সুবিধা।

অপ্রাপ্ত সংখ্যা—

ধূপছায়া প্রতি বাংলামাসের ১লা প্রকাশিত হয়। সুতরাং কোন মাসের কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া ডাক বিভাগের উত্তরসহ সেই মাসের ১০ই তারিখের মধ্যে আমাদের নিকট অপ্রাপ্তি সংবাদ পৌছান আবশ্যক।

পত্রোত্তর—

রিপ্লাই কার্ড বা ডাকটিকিট না পাঠাইলে কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব নয়।

রচনা—

সকল রচনা সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। টিকিট দেওয়া থাকিলে অমনোনীত রচনা গল্প কবিতা ফেরৎ দেওয়া হয়। রচনা কেন অমনোনীত হইল তৎসম্বন্ধে সম্পাদক কোনও উত্তর দিতে অসমর্থ। ফেরৎ রচনাদি লেখকদিগের নিকট পৌছান সম্বন্ধে আমরা দায়ী নহি। কাগজের এক পৃষ্ঠায় মার্জ্জিন দিয়া ফাঁক ফাঁক করিয়া পরিষ্কার অক্ষরে রচনা না পাঠাইলে প্রকাশিত না হইবারই বেশী সম্ভাবনা।

বিজ্ঞাপন—

কোনও মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বের মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হয়।

বিজ্ঞাপন বন্ধ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ব্লক ফেরৎ লইবেন। ব্লক কোন প্রকারে ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই, যদিও ব্লক যাহাতে না ভাঙ্গে সে সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন লওয়া হইয়া থাকে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিজ্ঞাপনে হার নিম্নে দিলাম।

নিবেদক—কার্য্যাধ্যক্ষ—ধূপছায়া।
কার্য্যালয়—১৪নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

আশ্বিন মাস হইতে "ধূপছায়া"র কলেবর বৃদ্ধি হওয়াতে বিজ্ঞাপনের হারের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিল।

বিজ্ঞাপনের হার।

প্রথম কভারের অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	...	...	৩০৲ টাকা
দ্বিতীয় „ পূর্ণ „	...	...	৩০৲ টাকা
„ „ অর্দ্ধ „	...	...	১৬৲ টাকা
তৃতীয় „ পূর্ণ „	...	...	৩০৲ টাকা
„ „ অর্দ্ধ „	...	...	১৬৲ টাকা
চতুর্থ „ পূর্ণ „	...	...	৫০৲ টাকা
সাধারণ „ পূর্ণ „	...	...	১৫৲ টাকা
সাধারণ „ অর্দ্ধ „	...	...	৮৲ টাকা
„ „ সিকি „	...	...	৫৲ টাকা
সূচীর নীচে অর্দ্ধ „	...	...	১০৲ টাকা
„ „ সিকি „	...	...	৬৲ টাকা
টাইটেল পৃষ্ঠার সম্মুখের পৃষ্ঠা	...	...	১৬৲ টাকা
আরম্ভের সম্মুখের পৃষ্ঠা	...	...	১৬৲ টাকা

নিবেদক—
কার্য্যাধ্যক্ষ—ধূপছায়া।

(মাসিক সাহিত্য পত্রিকা)

প্রথম বর্ষ, ২য় খণ্ড ৩য় সংখ্যা

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ সাল

সম্পাদক

শ্রীরেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

পরিচালক

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীপ্রণবদেব মুখোপাধ্যায়।

ধূপছায়া কার্য্যালয়

১৪নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গোষ্ঠবিহার ।

শ্রী প্রফুল্লকুমার ঠাকুরের সৌজন্যে

Bela P. W.

গোষ্ঠবিহার

বাঁশীর সঙ্কেত সদা নাম নিয়ে

গোঠেতে গোধন রাখি।

তোমার কারণে এ পথে ও পথে

সদাই ছলেতে থাকি॥

* * * *

বঁধুয়া আর কি ছাড়িয়া দিব।

এ বুক চিরিয়া যেখানে পরাণ

সেখানে তোমারে থোব।

—:০:—

[অগ্রহায়ণ ১৩৩৪]

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

তৃতীয় পত্র

ওঁ

কল্যাণীয়েষু—

আমি তোমাকে "কৈফিয়ৎ" সম্বন্ধে যা বলেছিলুম সেটা যাকে বলে কথার কথা—ও নিয়ে মনের মধ্যে নাড়া চাড়া করা কিছু নয়। বিধাতা আমাদের দুঃখ পাবার শক্তি দিয়েছেন, সেটা একটা বড় শক্তি, এইজন্যেই অকারণে তার অপব্যয় করা অকর্ত্তব্য।

তাল গাছে একটা জিনিষ আছে সেটা হচ্চে তার ফল, আর একটা জিনিষ আছে যেটা তার পাতা। ফলে আছে রস, পাতায় আছে মর্ম্মর ধ্বনি। ফলটা সর্ব্বদা মজুত থাকে না, পাতা সর্ব্বদাই থাকে। আমাকে যদি তাল গাছ বলে কল্পনা করতে পার তাহ'লে জানবে আমার কবিতা হ'ল ফল, আর গান গুলো হ'ল পাতা। যখন কেউ আমার কাছে এসে তার মাসিক পত্রপুট অগ্রসর করে ফল প্রার্থনা করে তখন সে জিনিষটা হাতের কাছে নেই বলে পাতা দিয়ে সম্পাদকের ফল কামনা পূর্ণ করা আমি ফাঁকি বলেই জানি। বিশেষ চেষ্টা করি ফাঁকি না দিতে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হয়ে ওঠে না।

তুমি যখন যমুনার জন্যে কিছু চাইলে তখন কিছুর মত কিছু হাতে না থাকাতে প্রথমটা তোমাকে শূন্য বিদায় করা গেল, তার পরে তোমার দুঃখ নিবৃত্তির ইচ্ছাটা মনে উদয় হওয়াতে তোমাকে ডেকে পাঠিয়ে ঝুলি ঝেড়ে যা ছিল উজাড় করে দিলুম। এইখানেই পঞ্চমাত্রের যবনিকা পতন হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আবার কেন এন্‌কোর? ইতি—
১৮ আশ্বিন ১৩৩০।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শান্তিনিকেতন

চতুর্থ পত্র

ওঁ

কল্যাণীয়েষু—

মেলায় দূর থেকে তোমার মত চেহারার একটী লোক'কে দেখে হঠাৎ মনে হল তুমি এসেছে, তারপরে খোঁজ করে তোমার নাগাল পাওয়া গেল না। সে তোমার মায়া মূর্ত্তি হতে পারে অথবা তোমার সত্তার আভাস দেখিয়ে আর কেউ আমাকে ছলনা করে গেল।

তুমি কবি হয়েও আইন মানো বিধি এটা সহ্য করতে পারলেন না, তাই তোমাকে শাস্তি দিলেন—এজন্যে আর কাউকে তুমি দায়িক কোরো না।

শরীরের কথা চর্চ্চা করতে চাইনে। কখন্ কোথায় ঘুরপাক খেতে যাব সে আলোচনাতেও সুখ পাইনে। ইতি ১৫ পৌষ ১৩৩০।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৬, দ্বারকানাথ ঠাকুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

পঞ্চম পত্র

ওঁ

কল্যাণীয়েষু—

এখন আমার তপোভঙ্গ করলে চল্‌বে না। মনটাকে খুচ্‌রো করে ভেঙ্গে আমি সাত যায়গায় ছড়িয়ে দিতে আর পারব না—আমার সে শক্তির প্রাচুর্য্য নেই। যে আগুণটুক আছে তাতে যজ্ঞ করা চল্‌বেনা—একটা কোনো ঘরের কোণে একটি আলো জ্বালা চল্‌তে পারবে। আমার পক্ষে এখন সেই যথেষ্ট।

শৈলজানন্দ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে আমার অগোচরে ফিরে গেছেন শুনে আমি বড় দুঃখিত হয়েচি। তাঁর যে দুয়েকটি লেখা আমার চোখে পড়েচে তার রচনার বিশিষ্টতা দেখে আমার আনন্দ হয়েচে। কল্লোলে আমি অত্যাধুনিকের স্তব মন্ত্রপাঠ করব বলে যে গুজব উঠেচে সেটা আমি কোন মতেই বিশ্বাস করতে পারিনে। আমার যত দূর জানা আছে তাতে এটাকে অমূলক বলে বোধ হচ্চে। অবশ্য গুজবের মূল কোনো না কোনো স্থানে আছে কিন্তু আমার মধ্যে নেই। তার বেশি হলফ করে বলতে পারিনে। ইতি ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আশা

—শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

নেই সে অতীত, শুধু আজ মনে
তাহারি লাগি'
মধুস্মৃতিভরা বেদনার রেখা
র'য়েছে জাগি';
আছে ফুল, কেহ রাখে না তাহায়
মালিকা গাঁথি'
দূরে গেছে আজ প্রাণের দোসর
কত না সাথী!

মনে হয়, যদি সে সুখের দিন
ফিরিয়া আসে
ঝ'রে-পড়া এই মানস-কুসুম
ভরিবে বাসে।
মলিন অধরে ফুটিবে আবার
হাসির রেখা—
জীবন-পর্ব্ব নূতন করিয়া
হইবে লেখা।

ভবিষ্যতের শোনা যায় যেন
চরণ-ধ্বনি,
শোণিতে শিরায় চমকে আশার
সঞ্জীবনী,
সুধা-পরসাদ লভিয়া তাহার
কণ্ঠ ভরি'
নব প্রভাতেরে জীবন আবার
ল'বে কি বরি'?

নাট্য জগতে টলষ্টয়

শ্রীক্ষেত্রপাল দাস ঘোষ

টলষ্টয়কে আমরা ঔপন্যাসিক, এনার্কিষ্ট, সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষাতত্ত্ববিৎ হিসাবেই জানিয়া আসিয়াছি। বিশেষ ভাবে তাঁহাকে জানিয়া আসিয়াছি উপন্যাস লেখক বলিয়া—"Anna Karenina" ও "Resurrection"এর কুশলী স্রষ্টা বলিয়া। বাংলার স্কুল কলেজের ছেলেরা অন্ততঃ এই বই দু'খানা পড়িয়া রুষসাহিত্যে টলষ্টয়ের হাতে উপন্যাস কতটা শক্তিশালী ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছিল তাহা খানিকটা নিশ্চয় উপলব্ধি করিয়াছেন এবং আমাদের মধ্যে প্রভূত সাহিত্যানুরাগী মাত্রেই জানেন টলষ্টয়, টুর্গেনিভ, অ্যাটন্ চেকভ ও ডষ্টয়ভেসিক শুধু রুশসাহিত্যে নয়, সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যে উপন্যাসের আদর কতটা বাড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ভারতবর্ষে এমন কি বিলাতেও আজ পর্য্যন্ত শতকরা নব্বই জনই জানেন না—টলষ্টয় নাট্য-কার হিসাবেও জগতে শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা শুধু উপন্যাসের ভিতর দিয়াই ফুটিয়া ওঠে নাই; নাটকের ঘটনাবৈচিত্র্য, নির্বাধ কথাস্রোত ও চরিত্রাঙ্কনের মধ্যেও তাহার ছাপ্ বেশ সুস্পষ্ট হইয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গুণীর আদর বুঝিয়াছে শুধু ইউরোপ। প্যারী, বার্লিন, ব্রুশেলস্ এই সব সহরে টলষ্টয়ের নাটক দেখিবার জন্য রঙ্গ মঞ্চে যেরূপ ভিড় হইয়াছে তাহা অন্য কোথায়ও বড় একটা শোনা যায় না। কত লোক সমস্ত দিন সমস্ত রাত দাঁড়াইয়া টিকিট কিনিতে না পারিয়া দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে। কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সবাই একবাক্যে টলষ্টয়ের অভিনব নাট্য-প্রতিভা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—টলষ্টয়ের জীবদ্দশায় লণ্ডনের কোন ভাল থিয়েটারে তাঁহার কোন 'প্লে' হয় নাই। লণ্ডনে তাঁহার প্রথম 'প্লে' হয় তাঁহার মৃত্যুর নয় বৎসর পরে। অবশ্য লণ্ডনে, His Majesty's Theatreএ "Resurrection" ও "Anna Karenina" তাঁহার জীবদ্দশাতেই অভিনীত হইয়াছিল। কিন্তু সে দু'খানি উপন্যাস এই উপন্যাস দু'খানিকে নাট্যা-কারে পরিবর্ত্তিত করিতে টলষ্টয় নিজে কোন প্রয়াস পান নাই। কারণ তাঁহার বিশ্বাস ছিল নাটক হিসাবে রঙ্গমঞ্চে ঐ বই দু'খানির ভাল অভিনয় হইবে না। টলষ্টয়ের নিজের লেখা নাটক যেখানি প্রথম লণ্ডনে অভিনীত হইল তাহাও তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত। এবং সেখানি তাঁহার শ্রেষ্ঠ নাটকও নয়। টলষ্টয় সেখানি অসমাপ্ত অবস্থাতেই রাখিয়া গিয়াছিলেন। বইটীর নাম "জীবন্মৃত" (The Live Corpse)—"ক্ষতিপূরণ" (Reparation) নাম দিয়া এখানি অভিনীত হইয়াছিল। ইংলণ্ডবাসীর গভীর অজ্ঞতাই যে এই অনাদরের একমাত্র কারণ সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। তবে টলষ্টয়ের নাট্য প্রতিভার কদর বুঝিয়া ছিলেন শুধু একজন মনীষী—বার্ণাড শ (Bernard Shaw) তাঁহার কষ্টি পাথরে খাঁটি সোণা বলিয়াই টলষ্টয়ের নাটক গুলি উৎরাইয়া গিয়াছে। তাই আজ ইংলণ্ডে নাট্যকার হিসাবেও টলষ্টয়ের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই প্রবন্ধে টলষ্টয়ের নাটকগুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার সাহস পাইয়াছি।

টলষ্টয়ের প্রথম নাটক The First Distiller ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। নাটকের গল্প তাঁহারই The Imp and the crust বলিয়া একটী ছোট গল্প হইতে লওয়া। যদিও এই ছোট নাটকখানি একটা উদ্দেশ্য লইয়াই রচিত হইয়াছিল তথাপি এজন্য আর্টের দিক দিয়া ইহার কোন ক্ষতিই হয় নাই। দরিদ্র চাষার সুখশান্তিভরা জীবনের উপর হঠাৎ মদের উন্মত্ত নেশা আসিয়া তাহাকে যখন একটা তাণ্ডব আনন্দে ও বিরাট নৈরাশ্যে অভিভূত করিয়া তোলে, সেই নির্ম্মল জীবনের সহজ সরল

সুখগুলি যখন একটা উষ্ণ বাতাসে ফুলের পাপড়ির মতই শুকাইয়া যায়, তখন আমরা নাটকের উদ্দেশ্য কি তাহা ভুলিয়া যাই—শুধু চোখের সামনে দেখিতে পাই রঙ্গীন নেশার অন্তর্নিহিত কঠিন কঙ্কাল—তার বিকট মূর্ত্তি, সয়তানের ছাদে গড়া। আর্টের ভিতর দিয়া নাট্যকারের প্রাণের কথা যদি আমাদের প্রাণে আসিয়া লাগে তাহাতে ক্ষতি কিছু নাই, বরং তাহাতেই আর্টের পূর্ণ-বিকাশ,—গৌরব।

টলষ্টয়ের দ্বিতীয় নাটকখানি The Power of Darkness (পাপের প্রভাব) একখানি উঁচু দরের নাটক। দরিদ্র চাষার ঘরে পাপ ও দুঃখের নিখুঁত ছবি হৃদয়গ্রাহী করিয়া আঁকা। শত বাধা বিঘ্ন সন্দেহ ও দ্বিধার মধ্যেও মানুষের চরিত্রের উপর টলষ্টয়ের আস্থা চিরদিনই অটুট ছিল, তাই নাটকের পরিসমাপ্তিতে এই জমাট কালো অন্ধকারের বুকের ওপরেও পবিত্রতা ও আশার আলো আসিয়া পড়িয়াছে, মানুষের জীবন হইতে পাপের ছাপ মুছিয়া গিয়াছে, নূতন আশার আলো লইয়া, পুণ্য পথের রেখা দূরে দেখা দিয়াছে। বার্ণাড শ এই নাটকখানি সম্বন্ধে টলষ্টয়কে নিজের অভিমত দিয়াছিলেন। "I remember nothing in the whole range of drama that fascinated me more than the old soldier in Your Power of Darkness. To me the scene where the two drunkards are wallowing in the straw and the older rascel lifts the younger one above his cowardice and selfishness, has an intensity of effect that no merely romantic scene could possibly attain." St. Joanএর রচয়িতার হাত হইতে এত বড় প্রশংসোক্তি টলষ্টয় ব্যতীত অন্য কোন নাট্যকার আজও পান নাই।

এই নাটকখানির সর্ব্বপ্রথম অভিনয় হয় প্যারী নগরীতে। আজ প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক Emile Jola (এমিল্ জোলা) তাঁহার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন যাহাতে নাট্যামোদীগণ এই বইখানির প্রকৃত রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হন; তিনি রিহার্শালের সময় কেবলই বলিতেন "একটুকুও বাদসাদ দিয়োনা—একটী অক্ষর, একটী বর্ণও না, যেমনিটী আছে, ঠিক তেম্নিটীই থাক, তাহলে এটী ভাল ভাবে উতরে যাবেই।" কার্য্যকালে তাহাই হইল, সমস্ত প্যারী নগরী আবেগে ও প্রশংসায় পাগল হইয়া উঠিল, এবং একই সময়ে প্যারীর তিন তিনটী রঙ্গালয়ে "পাপের প্রভাবের" অভিনয় চলিতে লাগিল।

এইখানে গল্পের ঘটনাগুলি অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিব। অনীষা দরিদ্র চাষা রমণী, সমৃদ্ধ কৃষক স্বামীর ঘরে যখন আসে তখন শুধু স্বামীকেই আসিয়া পাইল না, তাহার সপত্নীকন্যা অ্যাকুলীনার সঙ্গেও ঘর করিতে হইল। অনীষা নিকিটা নামে এক চাষীর প্রেমে পড়িয়া স্বামীকে বিষ খাওয়াইয়া হত্যা করিল এবং নিকিটাকে বিবাহ করিল। কিন্তু দুশ্চরিত্র নিকিটা অ্যাকুলীনারও সর্ব্বনাশ না করিয়া ছাড়িল না এবং তাহাদের এ অবৈধ প্রণয়ের ফলে শীঘ্রই একটী শিশু ভূমিষ্ঠ হইল। লোকলজ্জার ভয়ে অনীষা ও নিকিটা এই নিরপরাধ অসহায় শিশুকে হত্যা করিয়া পাপের পশরা পূর্ণ করিল। আরো কত কি ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়া গেল যা শুধু কল্পনা পর্য্যন্ত করিতে গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে। যে নৃশংস হত্যার তাণ্ডব এই নাটকখানিতে চলিয়াছে তা শুধু সেক্সপীয়রের "ম্যাকবেথেই" দেখিতে পাই যদিও বই দু'খানির ঘটনাবলী একেবারে বিভিন্ন। কিন্তু মানুষ ও ঈশ্বরের উপর টলষ্টয়ের এত স্থির বিশ্বাস ছিল যে পাপকে বিজয়ীর নিশান উড়াইয়া অবাধে চলিয়া যাইতে দিতে তাঁহার মন সরিল না। তাই যবনিকার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে অনুতপ্ত নিকিটা পিতার নিকট সকল দোষ স্বীকার করিতেছে এবং ধর্ম্মভীরু বৃদ্ধ পিতা তাহাকে বলিতেছেন "ভগবান তোকে ক্ষমা কর্ব্বেন, তুই নিজে তোর দিকে চেয়ে দেখিস্‌নি, তাই ব'লে কি তিনি তোকে দয়া কর্ব্বেন না? নিশ্চয় কর্ব্বেন।" পাপের গাঢ় অমানিশা কাটিয়া গেল, আশার তরুণ আলো পরম তৃপ্তিভরে তার গায়ে আসিয়া ছড়াইয়া পড়িল আমরাও যেন পুণ্যের দুন্দুভি শুনিয়া আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম।

"পাপের প্রভাবের" পরের খানি হইতেছে টলষ্টয়ের কৌতুক নাটক—"শিক্ষার ফল" Fruits of Enlighten-

ment. এই বইখানিতে অলস কর্ম্মহীন শিক্ষিত ধনী সমাজের উপর শ্লেষ ও কশাঘাত হাসিঠাট্টার ভিতর দিয়া অবিশ্রান্তভাবে চলিয়াছে। কি করিয়া তাহাদের লক্ষ্যহীন জীবনের দিনগুলি কৃত্রিম প্রণয়, ঘোড়দৌড়, জুয়াখেলা, থিয়েটার, তাসখেলা থিওসফি (Theosophy) ও প্রেতাত্মা আনিবার ব্যর্থ চেষ্টায় কাটিয়া যায় তাহা নিপুণ শিল্পী দক্ষতার সহিত আমাদের চোখের সামনে ধরিয়া উনবিংশশতাব্দীর রুশ আভিজাত্যের উপর একটা তীব্র বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দিয়াছেন। টলষ্টয় এই বইখানিতে আর একটা কাজ করিয়াছেন। রুশের দরিদ্র কৃষকরা একটু জমির অভাবে কী ভয়ানক কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিত তাহা এই বইখানি পড়িলে অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। নাটকের মোটামুটি ঘটনা এই—

গ্রাম হইতে বৃদ্ধ কৃষকেরা তাহাদের জমিদারের সহিত দেখা করিতে সহরে আসিয়াছে। সেখানে তাহারা তাহাদের প্রভুপত্নীও জমিদার ভবনের উদ্ধত ভৃত্যদের কাছে অনেক লাঞ্ছিত হইল; অবশেষে তাহারা তাহাদের থিওসফিষ্ট জমিদার লিওনিড্ ফেডোরিকের নিকটে কম্পিত বক্ষে নিবেদন করিল—যাহাতে গ্রামের সবাই শাকসব্জী লাগাইবার জন্ম ও গরুবাছুর পালন করিবার জন্য এক এক টুকরা জমি পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা তিনি করুন্। তাহারা আরও বলিল, তাহারা বত্রিশ হাজার রুব্‌ল্ দিতে প্রস্তুত, তবে সম্প্রতি চার হাজার রুব্‌লের বেশী দিবার উপায় তাদের নাই, বাকী টাকাটা কিস্তিতে কিস্তিতে তাহারা দিয়া যাইবে। লিওনিড্ রাজী হইলেন না এবং একসঙ্গে সব টাকা না দিতে পারিলে চলিয়া যাইতে বলিলেন। কৃষকেরা কাঁদিয়া ফেলিল, প্রভুকে স্মরণ করাইয়া দিল পূর্ব্ব বৎসর তিনি কিস্তিবন্দিতে জমি বিক্রী করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন এবং আরো বলিল এই চার হাজার রুব্‌ল্ সংগ্রহ করিতেই তাহারা ধারে কর্জ্জে ডুবিয়াছে, কিন্তু জমি না পাইলে তাহাদের বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইবে না। লিওনিডের মনটা খানিকটা নরম হইল। তিনি বিবেচনা করিয়া উত্তর দিবেন বলিয়া ভূত প্রেতের সঙ্গে পরামর্শ করিতে নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। প্রভুপুত্র ভাসিলি লিওনিডিক আসিয়া কৃষকদিগকে আরো টাকা দিবার জন্য চাপাচাপি করিতে লাগিলেন, কারণ তাঁহার টাকার বড় দরকার—তিনি "কুকুর সমিতির" প্রেসিডেন্ট হইয়াছেন, সভার প্রথম অধিবেশনের দিন বন্দুবান্ধবগণকে একটা বড় হোটেলে "লাঞ্চে" নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। টাকা না পাইলেই তাঁহার নয়। গত সপ্তাহে মা'র নিকট হইতে যে টাকা নিয়াছিলেন তাহা কুকুর কিনিতে ও ঘোড়দৌড়ে সব ফুরাইয়া গিয়াছে।

কৃষকদিগকে টাকার বিষয়ে আরও মুক্ত হাত হইতে উপদেশ দিয়া তিনি পিতার নিকট যদি কিছু পাওয়া যায় সেই আশায় চলিলেন। প্রভুকন্যা তাঁহার সঙ্গীত শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে আসিয়া কৃষকদিগকে 'অদ্ভুত জানোয়ার' বলিয়া গালি দিয়া চলিয়া গেলেন।

লিওনিড্ তাঁহার থিওসফির প্রভাবে জানিতে পারিলেন কিস্তিবন্দীতে জমি দেওয়া উচিত হইবে না—তিনি কৃষকদের প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন। গরীব বেচারীরা তাহাদের অবশ্যম্ভাবী দুর্দশার কথা লিওনিড্‌কে জানাইতেছে এমন সময়ে প্রভুপত্নী তাঁহার ডাক্তারের সহিত কথা কহিতে কহিতে নীচে হল ঘরে নামিয়া আসিলেন। তাঁহার বদ্ধমূল ধারণা যে তাঁহার শরীর অত্যন্ত খারাপ, তাঁহার চির আতঙ্ক পাছে রোগ হয়, এবং সেই জন্য তাঁহার একটা স্থির সঙ্কল্প ছিল যে রোগের বীজাণু কিছুতেই তিনি গৃহে প্রবেশ করিতে দিবেন না তাই কৃষকদের দেখিয়া তাঁহার আপাদ মস্তক জলিয়া গেল। এই নোংরা চাষাগুলো কোথায় রাত্রি কাটাইয়াছে কে জানে, তাহাদের ছিন্ন মলিন বস্ত্রে বীজাণু নিশ্চয় থরে থরে সাজানো রহিয়াছে—এই সব বলিতে বলিতে জমিদার-পত্নী ক্রমেই আরো বেশী উত্তেজিত হইতে লাগিলেন এবং ডাক্তারের নিকট হইতে ঘর বাড়ী ধোওয়াইবার প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ নিয়া রাগে চীৎকার করিতে লাগিলেন। কৃষকরা ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

এই বিপদে তাহাদের বন্ধু জুটিল একজন—পরিচারিকা ট্যানিয়া। ট্যানিয়া ও খানসামা সাইমন্ পরস্পরকে ভাল বাসিত এবং যে কৃষকগণ লিওনিডের কাছে আসিয়াছিল

তাহাদেরি মধ্যে একজন সাইমনের পিতা। ট্যানিয়া জানিত এই বিবাহে সাইমনের পিতার আপত্তি ছিল, কারণ পিতার একটা ভয় সহরের মেয়েকে পুত্রবধু করিয়া সে খুসী হইবে না। ট্যানিয়া বৃদ্ধদের লাঞ্ছনা ও দুর্দ্দশা দেখিয়া মনে বড় ব্যথা পাইয়াছিল এবং তাহার মত বুদ্ধিমতীর এটুকু বুঝিতেও বাকী রহিল না সাইমনকে বিবাহ করিবার এই তার এক মাত্র সুযোগ। যদি কৃষকদের এই জমি যে কোন প্রকারে দেওয়াইতে পারে—একবার কৃষকদের দলিলে প্রভুকে দিয়া স্বাক্ষর করাইতে পারে তাহা হইলে বিবাহের আর কোন বাধা থাকিবে না; কারণ তাহা হইলে সাইমনের পিতা ট্যানিয়ার ওপর খুশী হইয়া মত দিবেন। তাহার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল। তাহার প্রভু ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করেন, তাহাদের পরামর্শ লইয়া সব কাজ করিয়া থাকেন। তাই সে ঠিক করিল সে নিজেই ভূত সাজিয়া অন্ধকার ঘরে এই দলিলে প্রভুর স্বাক্ষার করাইয়া লইবে। এই বুদ্ধি আঁটিয়া সাইমন্ ও লিওনিডের বিশ্বাসী প্রভুভক্ত অনুচর বৃদ্ধ থিওডোর আইভানিচের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সে-রাত্রির জন্য ট্যানিয়া কৃষকদের রান্না ঘরে খাইবার ও থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিল। সাইমনের বৃদ্ধ পিতা ট্যানিয়ার যত্নে মনে মনে খুব খুশী হইতেছিল এবং কাজ হাঁসিল করিতে পারিলে তাহাকে পুত্রবধু বলিয়া সর্ব্বান্তঃকরনে আশীর্ব্বাদ করিবে এই আশাও দিল।

রাত্রে থিওসফিষ্টের ঘরে "Seance" বসিয়াছে—ভূতপ্রেত আসিতে পারে এবং তাহাদিগকে আমাদের চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় ইহাই লিওনিডের প্রকাণ্ড গবেষণা,—এই জন্য আজ তিনি বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সব রকম শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আসর বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। ট্যানিয়া সাইমনের সাহায্যে বৈঠক বসিবার পূর্ব্বেই বড় পর্দ্দার আড়ালে লুকাইয়া ছিল। ঘর অন্ধকার হইবামাত্র সে সশরীরে উপস্থিত হইয়া লিওনিড ও অন্যান্য ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলাগণকে চুল ধরিয়া আঁচড় কাটিয়া চীৎকার করিয়া অস্থির করিয়া তুলিল। নিওলিড বলিতে লাগিলেন— "খুব জবর মিডিয়াম্। তাই আজ প্রেতাত্মা এভাবে দেখা দিয়েছে।" সবাইকে নাস্তানাবুদ করিতে করিতে হঠাৎ জমির দলিলখানা লিওনিডের সম্মুখে টেবিলে ফেলিয়া দিয়া ট্যানিয়া প্রভুর মাথায় টোকা মারিতে লাগিল।

কী অদ্ভুত পদার্থ তাঁহাদের সামনে পড়িল তাহাই ভাল করিয়া দেখিবার জন্য লিওনিড সেটি লইয়া বাইরে গেলেন। বাতি জ্বালিয়া তিনি দেখিলেন—চাষাদের সেই দলিল! তিনি ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—কৃষকদের দলিল সই না করায় প্রেতআত্মারা রাগ করিয়াছে। তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ সই করিয়া দিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ট্যানিয়াও পর্দ্দার আড়ালে সোফার তলে অন্তর্হিত হইল। যদিও সাইমনের প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বী দুশ্চরিত্র ভৃত্য গ্রেগরী ট্যানিয়া প্রকাণ্ড ফাঁকির কথা প্রভুপত্নীর কাছে ব্যক্ত করিয়া দিল, তবু লিওনিড ও তাঁহার প্রফেসর বন্ধুর থিওসফিতে বিশ্বাস একটুও টলিল না। কৃষকেরা সাইমন ও ট্যানিয়াকে লইয়া পরম আনন্দে গ্রামে ফিরিয়া গেল।

আমি এই নাটকখানির ঘটনাবলী একটু বিস্তৃত ভাবেই বর্ণনা করিয়াছি; তাহার কারণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত রুশ সমাজের অবস্থা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা যায় না এবং হাস্য রসের অবতারণা বিষয়েও টলষ্টয়ের যে বেশ হাত ছিল তাহারও আভাস পাওয়া যায় না। পাঠকগণ যদি বইখানি নিজেরাই পাঠ করেন, তাঁহারা পরম তৃপ্তি লাভ করিবেন। কৌতুক ব্যঙ্গ হিসাবে বইখানি সকলের নিকটই আদর পাইবে। অবশ্য আর একটী জিনিষও তাঁহাদের চোখে পড়িবে। সেটি টলষ্টয়ের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি। যে রুশ আভিজাত্যকে শ্লেষ ও বিদ্রূপের বাণে তিনি অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলেন বিংশ শতাব্দীতে তাহা ধ্বংস পাইয়াছে। টলষ্টয়ের অসাধারণত্ব—তিনি রুশ আভিজাত্যের ধ্বংসের কারণ গুলি ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দেই বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

(বারান্তরে সমাপ্য)

স্মৃতির কাঁটা

—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

যে জন গেছে চলে ফেরে না সে ত আর,
মরমে রেখে যায় দারুণ হাহাকার!
দিনের পরে দিন কাটে যে নিশিদিন
হইল তনু ক্ষীণ পরশে বেদনার—
তাপিত হিয়া হতে নামে না মেঘভার!

কেন রে ঝরে পড়ে অঝোর আঁখিজল—
বুঝি না কোথা তার উৎস কোথা তল।
পাপিয়া ডেকে মরে কুমুদদল ঝরে।
কি যেন মনে পড়ে শুভ্র নিরমল—
ফুটে কে ছিল যেন স্নিগ্ধ শতদল!

বরষা নেমে আসে ধরণী-হিয়া'পর—
রাত্রি-দিন শুধু ঝরিছে ঝর্ ঝর্!
অশনি ডেকে উঠে মত্ত বায়ু ছুটে,
নিখিল পড়ে টুটে আঁধার চরাচর!
হিয়া যে কেঁপে ওঠে দারুণ থরথর্!

আকুল কেশপাশে ঢাকিয়া তনু খান
বিরহী বধূ চাহে তৃষিত পথপান!
প্রবাসী প্রিয়জনা স্মরিয়া উন্মনা
সফল বাঞ্ছনা খুঁজিছে সারা প্রাণ;
বাহিরে ঝম্ ঝম্ বরষা গাহে গান।

কি যেন মনে পড়ে এমনি একদিন
এমনি নিশারাতে থামিল তার বীণ!
জগতে যত হাসি ভালো সে বাসাবাসি
হৃদয় উচ্ছাসি' মরমে হ'ল লীন,
জীবন হ'ল চির শান্তি সুখ হীন!

যখন গেছে চলে ফিরিবে না সে আর
এ ভার বোঝা বহি' কি হবে মিছে আর?
দেবতা-হীন গৃহ রহে না রমণীয়
গেছে সে প্রাণপ্রিয় স্নেহের পারাবার,
পরাণ ভরে তাই শূন্য হাহাকার!

বিদ্যুৎ

—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

(১)

বৌদিদি, আজ থেকে বাইরে পড়বার ঘরেই আমার বিছানা করে দিতে বোলো !

কেন ঠাকুরপো ?

ভেতরে বড় গোলমাল, আমার ভালো লাগে না।

আচ্ছা তাই হবে।

নীরদ বাইরে চলিয়া গেল। বিমলা বসিয়া ভাবিতে লাগিল, কেন অল্প দিনের মধ্যে স্নেহের দেবরের এতটা পরিবর্ত্তন ঘটিল।

বিমলা যখন বধূরূপে এ সংসারে প্রথম আসিয়াছিল, তখন হইতেই সমবয়সী দেবরটী তাহাকে স্নেহপাশে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার পর দীর্ঘ দশবৎসর কাটিয়া গিয়াছে, কোন দিন উভয়ের মনের ভাবের একটুও ব্যতিক্রম ঘটে নাই। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে যেন সব কিরূপ গোলমাল হইয়া গিয়াছে। নীরদ পারত পক্ষে আর বিমলার সংশ্রবে আসিতে চাহে না। সমস্ত দিন বাইরের ঘরেই কাটাইয়া দেয়। এতদিন তবুও রাত্রে ভিতরের ঘরে শয়ন করিতে আসিত, এইবার তাহাও বন্ধ করিয়া দিল। এত বিরাগের কারণ যে কি, বিমলা তাহার কিছু ধারণাই করিতে পারিল না।

রাত্রে বিমলা স্বামীকে ধরিয়া বসিল, তাহার একা সংসার করিতে আর মোটেই ভাল লাগিতেছে না, এইবার নীরদের বিবাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ক্ষীরোদ উত্তরে জানাইল যে, ভ্রাতার বিবাহ দিতে তাহার কোন আপত্তি নাই, তবে সে বিবাহ করিতে রাজি হইবে কি না! সেইটাই সন্দেহের বিষয়। কেন এমন সন্দেহ আসিল, জিজ্ঞাসা করাতে, ক্ষীরোদ বলিল, নীরদের বন্ধুবান্ধবের মারফতেই সে সকল বিষয়ের খবর পাইয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংশ্রব হওয়াতে ভ্রাতার মনে কামিনী কাঞ্চনের উপর বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। আইন পাশ করিয়া যে, নীরদ ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করিবে, তাহাও বিশ্বাস হয় না।

সকল শুনিয়া বিমলা দুঃখ মিশ্রিত বিদ্রূপের স্বরে বলিল, 'ব্রহ্মচারী হয়েচেন, সেইজন্যে আমার সংশ্রবও আর সহ্য হয় না।' ক্ষীরোদ লক্ষ্য করিল যে, বিমলার চক্ষে জল দেখা দিয়াছে।

পড়িবার ঘরে চেয়ারে বসিয়া নীরোদ কিসের চিন্তা করিতেছিল, সেই জানে। খট্ করিয়া দরজায় শব্দ হইতে পিছন ফিরিয়া দেখিল যে, খোকা একখানি ফটো হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারিতেছে। অন্য সময় হইলে হয়ত তাহাকে বকিয়া বাড়ির মধ্যে যাইতে বলিত, কিন্তু ফটোখানি দেখিবার লোভে নীরদ খোকাকে আদর করিয়া নিকটে আসিতেই বলিল। খোকা যখন আসিয়া কাকাবাবুর কোলে উঠিয়া বসিল, কাকাবাবু তখন ফটো লইয়াই ব্যস্ত হইল। কার যে ফটো নীরদ তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিল না। নীচে নাম লেখা রহিয়াছে—'বিদ্যুৎ'। বিদ্যুতের মতই রূপসী বটে! চতুর্দ্দশী কিশোরী এমন সুন্দর ভঙ্গীতে দাড়াইয়া আছে যে, তাহার তুলনা নাই। চক্ষের দৃষ্টি কি সুন্দর! নীরদ একবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল, খোকা যে কখন তাহার কোল হইতে নামিয়া গিয়াছে, তাহা সে জানিতেও পারে নাই।

এত শীঘ্র যে এরূপ সৌভাগ্য লাভ হইবে, তাহা নীরদ কল্পনাও করে নাই। সেদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেই দেখিল, রাণু ও খোকাকে সঙ্গে লইয়া কে একজন তাহার আলমারীর বইগুলি নিরীক্ষণ করিতেছে। নীরদের পদ শব্দে অপরিচিতা ফিরিয়া দাঁড়াইতেই সে বিস্মিত হইয়া গেল। ফটোতে ও সম্মুখের আকৃতিতে যে কোন প্রভেদ নাই—সেই অতুলনীয় দাঁড়াইবার ভঙ্গী, সেই মনোহারিণী দৃষ্টি। নীরদ কি বলিবে বা কি করিবে কিছুই

স্থির করিতে না পারিয়া নিজের চেয়ারখানা টানিয়া বসিয়া পড়িল। বিদ্যুৎ খোকাকে কোলে করিয়া লইয়া ও রাণুর হাত ধরিয়া নীরবে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

কয়দিন ধরিয়া যাহার ফটো লইয়া নীরদ কতই না জল্পনা কল্পনা করিয়াছে, তাহাকে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে নিজের ঘরের মধ্যে দেখিতে পাইয়া তাহার পুলকের আর অন্ত রহিল না। বিদ্যুতের পরিচয় জানিবার জন্য তাহার মন অস্থির হইয়া উঠিল। কিন্তু কি করিয়া যে কথাটা বিমলাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তাহা সে স্থির করিতে পারিল না।

নীরদ ব্যস্তভাবে বাড়ির ভিতর গিয়া ডাকিল—বৌদিদি!

কেন ঠাকুরপো?

আমার পড়্‌বার ঘরে কেন সকলে যায়?

কে যায় ঠাকুরপো?

এই যে সব এখনি গেছিল!

ওঃ, ও যে বিদ্যুৎ আমার মামাত বোন, তোমার পড়বার ঘর দেখতে চাইলে, তাই রাণু নিয়ে গেছিল।

তোমার মামাত বোন!—বলিয়া নীরদ ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া আসিল। আসিবার সময় শুনিল, বিদ্যুৎ বলিতেছে, 'দিদি উনি আমার ওপর রাগ করলেন?'

(৩)

বৌদিদি—

কি ঠাকুরপো?

সেদিন বড় অপরাধ হয়ে গেচে!

কিসে অপরাধ হো'ল ঠাকুরপো?

ও রকম তেড়ে এসে বল্লুম, তোমার মামাত বোন কি মনে করলেন বলতো?

কি আবার মনে করবে?

তাঁকে ত একরকম অপমানই করা হয়েচে, বল্‌তে গেলে। সে জন্যে আমাকে তাঁর কাছে মাপ চাইতে হবে।

তোমার যেমন কথা, তার আবার অপমান কি করে হো'ল?

না বৌদিদি, তুমি ঠিক বুঝবে না, আমাকে মাপ চাইতেই হবে। তা না হোলে আমি স্থির হতে পারবো না।

বিমলা এবার হাসিয়া উত্তর করিল—একবারে অস্থির হয়ে পড়লে ঠাকুর পো!

বৌদিদি, তোমার সব কথাতেই ঠাট্টা, তুমি বিষয়ের গুরুত্ব মোটে বুঝতে পার না।—বলিয়া, আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই নীরদ বাহিরে চলিয়া গেল।

* * *

বিমলার ঐকান্তিক চেষ্টায় তিন মাসের মধ্যেই বিদ্যুতের সহিত নীরদের বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেল। ফুলশয্যার রাত্রে বিমলা ভাল করিয়া নীরদকে বলিয়া দিয়াছিল, যেন তাহার অপরাধের মাপ চাহিতে ভুল না হইয়া যায়। কিন্তু বিদ্যুৎ মাপ করিয়াছে কি না, পরদিন প্রাতে সে কথা বিমলা উভয়ের কাহারও নিকট আদায় করিয়া লইতে পারে নাই। উৎসবের আনন্দের মধ্যে ক্ষীরোদ বিমলাকে পরিহাস করিয়া বলিয়াছিল, তাহার শক্তির তুলনা নাই, ব্রহ্মচারীকে সে অতি সহজেই সংসারী করিয়া ছাড়িয়াছে। বিমলা হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল, যে, শক্তি তাহার নয়, বিদ্যুতের!

বিবাহের এক মাস পরেই বিদ্যুৎ স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছে। নীরদকে এখন আর বড় বাহিরের পড়িবার ঘরে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নীরদ কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়াই একদিন বিমলাকে বলিল—'বৌদিদি, বাইরের ছোট টেবিলটা আর একখানা চেয়ার আমার শোবার ঘরে দিতে বোলো। একজামিন আসচে, বাইরে বড় গোলমাল, ভেতরেই ভাল পড়া হবে।'

'তাতো হবেই ঠাকুরপো, এখনিই ব্যবস্থা করতে বলচি'—বলিয়া, বিমলা আর নিজের হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না।

একটি ভ্রমণ কাহিনী

—শ্রীরেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়

বন্ধুবর রাসগৌর ও শৈলেনকে বললাম, দেওঘর যাই চল।

সেদিন শনিবার, ৮ই অক্টোবর, বাংলা মতে একুশে আশ্বিন।

শৈলেন বললে—আসছে রবিবার পর্য্যন্ত থাকতে পারি তার বেশী নয়!

তথাস্তু, তাতে আপত্তি নেই, বেরিয়ে ত' পড়।

জেসিডিতে এর আগের বারে 'যোগেন্দ্র-ভবনে' গিয়ে ছিলাম, খোঁজ নিয়ে জানলাম এবারে too late, কোন বাড়ীই পাওয়া যাবে না।

রাসগৌর বেঁকে বসল—বাড়ী না পেলে যেতে পারি না।

বললাম—ধর্ম্মশালা রয়েছে।

কল্পনায় ও জল্পনায় কেবল মিছামাছি দিনই কেটে যেতে লাগল। ওরা কেউ রাজী হল না।

আমি একাই বেরিয়ে পড়লাম।

সেদিন বৃহস্পতিবার—বাংলা মাসের ছাব্বিশে।

বাড়ী না পাওয়া যায়, কিম্বা ধর্ম্মশালাতে থাকবার ব্যবস্থা ভাল না থাকে দুটো রাত্রি না হয় ট্রেণেই কাটিয়ে আসব, তবু যাওয়া চাই!

এ কাহিনীটী ঐ দেওঘরেরই ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

কথাটা শুনে কলিকাতাবাসী সকলেই নাসিকা কুঞ্চিত করবেন—মাত্র দু শ মাইল পথ, দিনে গিয়ে ফিরে আসা যায়, ওর আবার ভ্রমণ বৃত্তান্ত!

তাহলে কৈফেয়ৎ একটা দেওয়া দরকার।

ভ্রমণ অনেকেই করেন—এবং উদ্দেশ্যও অনেকের অনেক রকম থাকে। কিন্তু কেহ কি একাধারে কবি, ঐতিহাসিক ভৌগলিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি যত গুলি ইক্ মিক্ (Cooker বাদে) আছে সবাইকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন কোন্ দিন? যদি গিয়ে থাকেন—আমার এই অবতারণা বাহুল্য। কিন্তু যদি না গিয়ে থাকেন, বিনীত অনুরোধ, বেড়াতে বেরোলে, এমনি বন্ধু-বান্ধব জুটিয়ে নিয়ে চোখ খুলে চলবেন, তাহ'লে সামান্য মধুপুরের মধ্যেই অনেক মধুর সন্ধান মিলবে। আমার এটুকু অহঙ্কার ভেবে আমাকে ভুল বুঝবেন না—আমি কেবল একটা নতুন ধরণের ভ্রমণের sample অর্থাৎ নমুনা দিতেছি মাত্র।

তা' ছাড়া আর একটা কথা এখানে বলা দরকার!

দিল্লী লাহোর—একটু দূরে বলে তাদের ভ্রমণ কাহিনী সম্বন্ধে সকল পাঠকেরই একটু পক্ষপাতিত্ব আছে জানি।

রেলের জনিটা যদি বাদ দিই—দিল্লী লাহোরের ভ্রমণ বৃত্তান্তই বলুন আর চুঁচুড়া চন্দন নগরের ভ্রমণ কাহিনীই বলুন—তফাৎ কিছু নেই।

দিল্লী লাহোর যেতে রেলে যতখানি পথ যেতে হয় তার মধ্যে দ্রষ্টব্য হয়ত বেশী কিছু থাকে না; কিন্তু যেটুকুও থাকে তার কথা কেউ বলতে যত্ন নেন না।

এক—পায়ে হেঁটে বেড়ান হয়, সে কথা স্বতন্ত্র। সে ক্ষেত্রে দূর দেশান্তরে যেতে হলে পথেও অনেক কিছু চোখে পড়ে, স্বীকার করি।

রেলে চড়ে ভ্রমণ করে আসার সময় কিন্তু দিল্লী লাহোরও যা'—শ্রীরামপুরও তাই। সব ক্ষেত্রেই রেলপথের আদত ব্যাপার গুলা প্রায় একই থেকে যায়।

ভ্রমণ করতে বার হলে—রেলপথেরও সামান্য কিছু বলবার আছে ত!

আমার এই ভ্রমণ কাহিনাটার মধ্যে মাত্র ঐ রেলপথেরই

সৃষ্টি করল এমন এক দ্বন্দ্ব শক্তি (couple অর্থাৎ two নগণ্য ব্যাপার গুলা বেশী করে লিখে দিয়েছি। রেলপথেরই বৃত্তান্ত যখন—সে ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য আমার সিমলা যাওয়াই হোক আর মধুপুর যাওয়াই হোক তাতে কি যায় আসে?

পূজার ছুটী।

আনন্দময়ী মা এসেছিলেন, আবার কৈলাসে ফিরে গিয়েছেন।

বিয়োগ দুঃখে ব্যাকুল হয়েই যে আমি তাঁকে খানিকটা এগিয়ে দেবার জন্য রেলে চড়ে বেরিয়ে পড়তে চাই, একথা আপনারা ভাবতে পারেন।

অথবা শ্রদ্ধেয় ডক্টর বনবিহারী বাবুর বর্ণিত ৺মায়ের ম্যালেরিয়ারূপিনী মশকবাহিনী মূর্ত্তির * প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে বাংলা ছেড়ে পালাবার পথ খুঁজছি, সেটাও সত্যি হতে পারে।

ঠিক আসল কারণটা যে কি, আমি নিজেই বলতে পারি না। তবে মনের মধ্যে যুগপৎ হর্ষ (নূতন দেশ ভ্রমণের কল্পনায়) এবং বিষাদ (খরচের কথা ভেবে), ভয় (ট্রেন কলিশন, গাঁট কাটার উপদ্রব ইত্যাদি কারণে) এবং সাহস (অভয়ার অভয়বাণী শুনে) এমনি উল্টোধরণের প্রবৃত্তি গুলার তুমুল দ্বন্দ্ব বেধে গিয়েছিল। এই বিরুদ্ধ তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত এবং তদানুসঙ্গিক বিক্ষোভ ও আলোড়নের ফলে দেহের উত্তাপ (heat energy) এবং মনের উষ্ণ বাষ্প (steam) বর্দ্ধিত হয়ে এই একবচনান্ত উত্তম পুরুষটীকে চঞ্চল করে তুলেছিল!

তেজ (energy) জিনিষটা নষ্ট হতে পারে না কিছুতেই। তবে রূপান্তর গ্রহণ করতে পারে। মানব হৃদয়ের অন্তর্নিহিত (potential) শক্তিও চলন্ত (kinetic) শক্তিতে পরিবর্ত্তিত হয়! কাজেই চাকা ঘুরতে থাকে এবং মানুষ অবহেলেই পথ মাঠ প্রান্তর অতিক্রম করে চলে।

তবে দেহ ও মন দুটা পদার্থ এক নয়। কাজেই তাদের গতি-শক্তির হারও (rate of motion) সমান নয়। দেহ যতক্ষণে তল্পিতল্পা বেঁধে ট্রাম, বাস্ এবং চরণযুড়ী চড়ে টলতে টলতে ভিড় ঠেলে কোনও ক্রমে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে পৌছেছিল, মন ততক্ষণ এরোপ্লেনের অপেক্ষাও শীঘ্রগতি রথে চড়ে আগ্রার তাজের মাথা হতে দিল্লীর কুতবের শীর্ষে লাফ (high and long jump) দেবার চেষ্টা করছিল!

রাত আটটার পর ছাড়বে—দানাপুর এক্সপ্রেস।

ষ্টেশনেই দাঁড়াবার যায়গা ছিল না, তা গাড়ীতে উঠে যে কি দেখব বুঝতেই পারছিলাম। গাড়ীর ভিতরে উঠতে পেরেছিলাম সত্যি। দাঁড়াতে পারি নি—কিন্তু আমরা শুয়েছিলাম না বসেছিলাম কি মনে করছেন বলুন ত'?

প্রকৃতপক্ষে সে এক অবস্থা—দাঁড়ানও নয়, বসাও নয়, শোয়াও নয়। দাঁড়াতে হলে—মানুষের ভারকেন্দ্র (centre of gravity) হ'তে লম্বমান (perpendicular) রেখাটী দুটী পায়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে (base area) যেখানেই হো'ক পড়া চাই। আমাদের দেহটীকে লক্ষ্য করে নিম্নলিখিত কয়েকপ্রকার শক্তি (force) আকর্ষণ করছিল; যথাক্রমে তাহাদের নাম—(ক) আমি যে দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিলাম তা' থেকে ১১৭½° ডিগ্রী একটী কোণ করে, সামনের অভিমুখে চলন্ত ট্রেণের গতি, এ ছাড়া দু' পাশের দিকে দোদুল দোলাটাও (lateral motion) ছিল, (খ) আমার নিজেরও তাড়াতাড়ি সামনে যাবার আগ্রহ জনিত প্রবল তাড়না (due to মনের potential energy), (গ) চতুঃপার্শ্বস্থ বিভিন্ন দেশ-গামী নানা শ্রেণীর ও জাতির মানুষদিগের বিভিন্নমুখী (of different direction) পেষণ শক্তি, (ঘ) কামান গর্জ্জনবৎ হট্টগোলের দারুণ শব্দ তরঙ্গের, শ্রবণেন্দ্রিয়ের পর্দ্দায় ঘাত প্রতিঘাত, (ঙ) চোখের সামনে সরিষা ফুলের অদৃশ্য চুম্বকশক্তি (magnetic force) (চ) কোট নামক গাত্র বস্ত্রের পকেট নামক অঙ্গটীর প্রতি গাঁটকাটা নামক কর্ম্মীদিগের গোপন অভিসার-বাসনা (ছ) ঘর মুখী জাতি বিশেষের তৈল স্পর্শ বর্জ্জিত কেশ ও দেহের এবং তদুপরি সাত পুরু ময়লা শোভিত পরিচ্ছদের সুগন্ধি (জ) বিষ্যুৎবারের বারবেলার দৃষ্টিকটুত্ব, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই এতগুলি বিভিন্ন আকর্ষণ সম্মিলিত হয়ে মিলনের আইন (theorics of equilibrium) অনুসারে

* আশ্বিন সংখ্যা (পৃষ্ঠা ৩) "ধূপছায়া" দ্রষ্টব্য।

equal forces acting in opposite directions) যার টানে স-মাথা দেহ কেবলই বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরতে থাকল ! [দ্রষ্টব্য (Ref) :—A couple cannot keep a body in equilibrium, for it tends to rotate the body]

খানিকক্ষণ পরে যখন এই অবস্থাটাই ধাতস্থ হয়ে গেল তখন একবার চারিপাশটার দিকে চেয়ে দেখলাম।—যাঁদের সঙ্গে রাত কাটাতে হবে তাঁদের প্রকৃতিটা বুঝে নেবার বাসনা একটু হয়েছিল।

সঙ্গী আরোহীদের প্রত্যেকেরই bedding ইত্যাদি করে এক একটি বিরাট বোঝা। যাঁরা আগে উঠেছেন বোঝার জায়গা এবং নিজের জায়গা দুই-ই রিজার্ভ করে রেখেছেন—সম্ভবতঃ বিনা মাশুলে। কেননা অধিকাংশই দেখলাম ইণ্টারবাবুরা—রেল আফিসে চাকরীর অজুহাতে পাশ নামক 'ফ্রি প্রবেশ পত্র' যোগাড় করেই চলেছেন।

রেলে যাতায়াতের পথে এই ফ্রি পাশটার সম্বন্ধে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা জন্মেছে, একটু বলে রাখি !

পাশ শ্রেণীভেদে চার রকমের চলিত আছে। নেহাৎ কুলিবেহারাই তৃতীয় শ্রেণীর পাশ পাবার যোগ্য, নইলে ১১৫।২০ টাকা বেতনের কম মাইনার বাবুরা সকলেই মধ্যম শ্রেণী পেয়ে থাকেন। একটু বেশী বেতন হলে—দ্বিতীয় শ্রেণী বরাতে জোটে। বিশেষ হোমরাও চোমরাও হতে পারলে তবেই প্রথম শ্রেণীর অধিকারী হওয়া যায়। রেলের বাবুরা সাধারণতঃ বছরে তিনবার পাশ পেয়ে থাকেন। পূজার ছুটীতে একবার বাড়তি পাশ কারও কারও অদৃষ্টে মেলে।

ইণ্টার পাশের কথাটাই বলি, কেননা আমাদের কামরাতে আর কোনও শ্রেণীর পাশের বাবু ছিলেন না।

বর্দ্ধমানে টিকিট দেখাবার সময় এঁরা সবাই বার করলেন এক একখানা লাল চিরকুট।

কারও পাশে লেখা, "নিজে, স্ত্রী, এবং দুটী ছেলে অমনি যেতে পাবেন হাওড়া থেকে আগ্রা পর্য্যন্ত।

এমনি প্রায় সকলেই !

কেউ বা একলাই চলেছেন।

আর এক রকমের রেলের বাবু অথবা, বাবুর আত্মীয় আছেন যাঁরা তৃতীয়াংশ টিকিট পান অর্থাৎ আদত ভাড়ার তিন ভাগের ভাগ ভাড়া দিলেই তাঁদের চলে।

আমাদের কামরাটাকে একটা ছোটখাটো মালগুদাম বললে অত্যুক্তি হবে না।

এক-পা-খোঁড়া জন ডিকি নামে এক ফিরিঙ্গি ছোকরা ছিল। পাঁচ সাতজন মাড়োয়ারী ব্যবসাদার। একটী ব্রাহ্ম মহিলা, স্বামী শাশুড়ী ও একটী মেয়ে সঙ্গে নিয়ে দেওঘর বেড়াতে চলেছিলেন। ইউনিভারসিটী কোরের অন্তর্ভুক্ত জনৈক সৈনিক পুরুষ ছিলেন। হিন্দুস্থানী পুলিস কনষ্টেবল জন তিনেক ছিল। ইত্যাদি ইত্যাদি। সকলের নাম ধাম ও পেশার তালিকা দেওয়া বাহুল্য।

মেঠাইওয়ালা হাঁকছে 'চাই বর্দ্ধমানের সীতাভোগ মিহিদানা।'

একটা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রশ্ন মনে জাগল—জনকনন্দিনী সীতার জন্মদেশ ছিল মিথিলা, শ্বশুরবাড়ী ছিল অযোধ্যায়, পঞ্চবটী বনে এবং রাবণ রাজার দেশেতেও তিনি tour করেছিলেন, শেষজীবন তাঁর কাটে বাল্মীকির তপোবনে—এত দেশে গিয়েছেন কিন্তু বর্দ্ধমানে আসবার নাম ত কখনো শুনিনি ? সীতা দেবীর ভোগ রান্না হ'ত বর্দ্ধমানে—অথচ—আমি ত' কিছু মীমাংসা করতে পারলাম না।

বর্দ্ধমানে একবার নেবে অপেক্ষাকৃত খালি আছে দেখে আর একটা কামরায় গিয়ে হাজির হলাম।

এ গাড়ীখানাতে একটু বসবার জায়গা পেয়েছিলাম ; এবং পাশের ভদ্রলোকদিগের সঙ্গে আলাপ করবারও ফুরসৎ হয়েছিল।

কাছেই এক দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বল্লেন "কতলোকের সঙ্গে দুদণ্ডের জন্য মিশছি, আবার ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে। জীবনের রঙ্গমঞ্চে কেউ কাছে আসছে কেউ সরে পড়ছে। কারও ভাব-গতিক বোঝা যায় না।"......

একটু সম্ভ্রম দেখিয়ে নমস্কার জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম

—"মহাশয় আপনি কোথা থেকে আসছেন কোথায়ই বা যাবেন ?"

পণ্ডিতজী একটু চোখ মুদে ভাবলেন, পরে বললেন মালিক যিনি ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন তিনিই বলতে পারেন।"

"কোথা থেকে আসছেন—আপনি নিজে জানেন না ?"

"আমি আসছি ? কে বললে ? আমি কে ? অনন্ত ব্যোমরাজ্যে পৃথিবী ঘুরছে, পৃথিবীর একটু করে মাটী নিয়ে আমার এই দেহ——ক্ষণিক, নশ্বর। পঞ্চভূতের যে কটা কণিকা আমার দেহ তৈরী করেছে, জগতের পথে ঘুরতে ঘুরতে একবার তারা মিশেছে আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে অনন্ত কালের জন্যে। সুতরাং আমার দেহের স্বাতন্ত্র্য বলে কিছু নেই ত! পৃথিবী যখন ছিল না। আমার দেহের এই কণা গুলা ছিল সূর্য্যের বুকে। সূর্য্য যখন ছিল না— তখন এরা ছিল মহাসূর্য্যের বুকে। মহাসূর্য্য যখন ছিল না তখন এরা ছিল নীহারিকার বুকে। আর নীহারিকা যখন ছিল না তখন এরা ছিল ব্রহ্ম-সৃষ্ট অণ্ডের মাঝখানে। তারও আগে এরা ছিল অনন্ত শূন্যে। অনন্ত শূন্য হতে ব্রহ্ম নিজে উদ্ভূত হয়েছেন, এবং ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। অনন্ত শূন্য হতে আমার এই দেহ কণা গুলি জন্ম নিয়েছে, বলতে পার অনন্ত শূন্যে গিয়েই এরা ফের মিলবে। আবার দেহ ছেড়ে যদি আত্মার কথা বল……..."

"রাম, রাম, রাম, রাত দুপুরে আত্মা পরমাত্মার তর্ক থাক পণ্ডিতজী। মাপ করবেন আমাকে আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। কোথা থেকে আপনার দেহ মহাপ্রভু এসেছেন তাই আগে বুঝে নি' তারপর আত্মার ভাবনা পরে হবে………"

Mechanies এর পাতাগুলা মানসপটে কল্পনা করে দেখলাম নীহারিকা পর্য্যন্ত পৌছতে পারি, তারপর…… ব্রহ্ম……ব্রহ্মের অণ্ড……না, ওর বেশী আর মাথায় আসে না। সুতরাং পণ্ডিতজীকে আর অধিক না বিরক্ত করে সামনের দিক দৃকপাত করলাম।

দুজন মাড়োয়ারী। একটীর গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী মাথায় জরির সিল্কেমোড়া পাগড়ী, পায়ে পাম্পসু, চেহারাও বেশ নাদুষ নুদুষ, ভুঁড়িটী গণেশদাদার মতই; আর অপরটী একেবারে উল্টোধরণের, রোগা ঢেঙা, ময়লা সার্ট গায়ে, পায়ে নাগরা চটি। দুজনকার মাঝখানে একটী ছোট্ট, এই বড় জোর আধমন টাক ওজনে বোধ হয় হবে, টাকা এবং নোটের বাণ্ডিল চটের থলেতে মোড়া;—আর একটী বেশ বড় রকমের মোট, ভাল একখানা দামী রঙচঙে কাপড় দিয়ে ঢাকা সোণা রূপার অলঙ্কার দিয়ে সাজান…… !

হঠাৎ কিন্তু……ওকি……বড় পুঁটুলিটী যেন জীবন্ত বলেই মনে হচ্ছে। মাঝে মাঝে ওটা যে আপনা হতেই নড়ছে…… !

আশ্চর্য্যত !

একটু কৌতূহলী হয়ে ওদিকে চেয়েছি দেখে দুজন মাড়োয়ারীই সমস্বরে মৃদুকণ্ঠে জানালেন "বাবু সাহেব, ওটী আমার জানানা !"

• সত্যি ? না এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে। একগলা অবগুণ্ঠন। পোষাকে ও অলঙ্কারে নানা সজ্জায় সজ্জিত বাক্স পেটীকার মত। মেয়েদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসেন নি, চোখের আড়াল হয়ে গেলে ঘোমটা খুলে বাইরের হাওয়া আর আলোর দিকে যদি ভুলে চেয়ে বসে! অথবা আর কি কারণ থাকতে পারে জানি না। তাঁর কথা আমাদের বলবার কিছুই নেই। ভারতীয়দেব যে সব জাতের মধ্যে পুরুষের তুলনায় নারী একেবারে সাইফার (শূন্য)—ইনিও তাঁহাদেরই একজন। তার উপর আবার ২৩ জন পুরুষের মাঝখানে এসে পড়ে হয়ত বা এঁর দাম Minus এ গিয়েই দাঁড়িয়েছে।

গাড়ীতে একটা হাসির হর্‌রা পড়ে গেল। দুজনেই বলেন—আমার জানানা! বেশ মজার কথা ত! জানানা বলতে পরিবার স্বয়ং বোঝায় অথবা পরিবারস্থ যে কোন ব্যক্তিকেই বোঝায় সেই নিয়ে অন্যান্য আরোহীদের মধ্যে তর্ক বেঁধে গেল।

আমাদের এক্সপ্রেশ্‌ 'থানা'র ধারে দাঁড়াবার মত নীচমনা ছিল না; তবে 'পানাগড়ে'র খাতির রেখেছিল।

তারপর রাণীগঞ্জ।

টালিগঞ্জে যেমন টালি বিক্রয় হয়, রাণীগঞ্জে তেমনি রাণী বিক্রয় হয় নাকি ?

রাত তখন দুপুর, গঞ্জটা দেখে আসা গেল না।

আসান-সোল—আসামের সোল মাছ গুলা বানের ভয়ে এই খানে পালিয়ে এসেছে তাই থেকেই বোধ হয় ও অদ্ভুত নামের উৎপত্তি! রেল কোম্পানী এরকম 'ম'লিখতে গিয়ে 'ন' অনেক যায়গাতেই লিখেছে! অতএব এ ব্যাখ্যাটা চলতেও পারে!

বর্দ্ধমানে সীতাভোগের কথা শুনেছিলাম—এবারে আবার সীতারামপুর। পুর কথাটা পুরীর অপভ্রংশ। সীতা ও রাম এখানে পুরী কিনে খেয়েছিলেন।

সন্দেহ বাড়ছে! হতেও পারে সীতা রামের দেশ ভ্রমণের সম্পূর্ণ সঠিক বিবরণ আজও জানা যায় নি! বাড়ী ফিরেই সাহিত্য পরিষদে একবার ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করে পাঠাতে হবে—যদি তাঁরা কোন সন্ধান রাখেন।

মিহিজামে গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। এটা জামের সময় নয়, আপশোষ হচ্ছিল খুব।

জামের সময় নয়, জাম তাড়িয়ে কি হবে, তাই জামতাড়ায় আর গাড়ী দাঁড়ায় নি।

তারপর মধুপুর। মৌমাছির প্রসাদ হুল ও মধু দুইই এখানে।

মুটে মজুরের মত মাড়োয়ারীটী টাকার ঝোলা কাঁধে করে নাবলেন—পশ্চাৎ মাড়োয়ারী রমণীটী ও তৎপশ্চাৎ অপর মাড়োয়ারী। টাকা ও রমণীর প্রভু কোন জন এখনও বোঝা গেল না।

আমাকে মধুপুরে নামতে হয়েছিল।

রাত তখন আড়াইটে।

ভোর পাঁচটায় গিরিডির গাড়ী।

তৃতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীদের বসবার ঘরে দেখলাম—অন্ততঃ শ দুই তিন প্রাণী তোফা শুয়ে ঘুমাতে লেগেছে।

রেল কোম্পানীকে বলিহারী!—তিনটে সাড়ে তিনটের সময় গিরিডির গাড়ী ছাড়লে ভোর বেলা গিয়ে পৌঁছান যেত, কিন্তু যাত্রীদের সুখ এঁরা ত ভুলেও দেখবেন না। কাজেই বসে অথবা শুয়ে অথবা দাঁড়িয়ে যেমন করেই হক মাঝে রাস্তাতেই থাকতে হবে—এই আড়াই ঘণ্টা সময়!

তাও যদি গাড়ীটা প্ল্যাটফরমের ধারে এনে রাখত। যাই হোক্, সাড়ে ছটার সময় কোনও ক্রমে গিরিডি পৌঁছান গেল।

একটা দোকানে কিছু জলযোগ করেই বেড়িয়ে পড়লাম—উশ্রী দেখতে যাব। এর আগেরবারে যখন এসেছিলাম—সব দেখা হয়েছিল—মায় পরেশনাথ পর্য্যন্ত, উশ্রীর প্রপাত বাদ পড়ে গিয়েছিল। এবারে কিন্তু কলিকাতা থেকে দুদিনের জন্য এসেছি শুধু উশ্রীর প্রপাতটাই দেখতে।

এক হাতে একটা চারসের ওজনের ব্যাগ—ভেতরে আছে একখানা কাপড়, একখানা গামছা, একটা গেলাস, এবং একটা টাইম টেবল।

আর একহাতে Hunger.—

হাতে Hunger আশ্চর্য্য হচ্ছেন, নয় কি? ওটা ক্ষুধার ইংরাজী নয়—Knut Hamson এর Hunger নামে বই!

একেলাই চলেছি পদব্রজে।

খোলা মাঠ কখনো বা বন জঙ্গলের মাঝ দিয়ে পথ।—মাথার উপর সূর্য্যদেব তেতে উঠ্ছেন। ভ্রূক্ষেপ নেই।

সামনে যাকে পাই জিজ্ঞাসা করি—আর কতদূর?—পেছনে চেয়ে দেখি পণ্ডিতজী নেই ত', নইলে আবার আর কতদূর শুনেই এক লেকচার সুরু করে দেবেন।

জিজ্ঞাসা করতে করতে সাত মাইল সাড়ে সাতমাইল গেছি, সামনে দেখি নদী বক্ষ! এ পারের পথ শেষ ওপারে আবার আরম্ভ! পার হতে যাচ্ছি—এমন সময় আর এক সাঁওতালের সঙ্গে দেখা। সে বললে পথ ভুলেছি।

সে আমায় ফিরিয়ে নিয়ে আনল ৬½ মাইল পোষ্ট পর্য্যন্ত। সেইখানে থেকে বড় রাস্তা ছেড়ে মাঠ ভেঙ্গে বন জঙ্গল ভেঙে পথ আরম্ভ।

এই যায়গাটাতে সরকারের উচিত একটা Arrow-mark বসিয়ে রাখা। নইলে অনেকেরই পথ ভুল হতে পারে! গাড়ী করে আসতে হলে এই খানে গাড়ী রেখে, হেঁটে অগ্রসর হতে হয়।

পথ এমনি দুর্গম—একলা চলা শক্ত।

ভাগ্যক্রমে তিনজন বিহারী যুবক জুটে গেল। নাম তাঁদের যথাক্রমে, ডি. লাল, থি. লাল, এন্ দুবে।

তাঁরা সকলেই আগে অনেকবার প্রপাত দেখতে গিয়েছিলেন, কাজেই পথ চিনতে কষ্ট হল না আর।

মাইল দেড়েক জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে হ'ল!

প্রপাতের দৃশ্য না দেখলে বর্ণনা করে বোঝান শক্ত। (—এটুকু কাব্যি।)

ঘণ্টা তিন চার ধরে এ পাথর হতে ও পাথর ছুটে বেড়ালাম। মূল উৎস দেখ্‌লাম। বিহারী তিনজনে বড় একখানা পাথরে নাম লিখে এলেন; আলাদা এক যায়গায় তিনটী বাড়তি নাম লিখলেন, লাবণ্য প্রভা শৈল। বললেন —ওঁরা আমাদের বন্ধুদের স্ত্রী। আসতে পারেন নি, কিন্তু যদি কখনো আসেন দেখবেন—তাঁদের স্মৃতি আগে হতে লিখে রাখা হয়েছে।

প্রপাতের জলে অনেক্ষণ ধরে স্নান করা গেল।

বিহারী যুবকদিগের অনুরোধে তাঁহাদের জলখাবারে কিঞ্চিৎ ভাগও বসালাম।

তারপর ফেরার পালা।

ফিরতে বড় কষ্ট হয়েছিল—রোদের জন্যে।

ষ্টেশনে ফিরলুম—প্রায় তখন চারটে।

ব্যাগটা ষ্টেশন মাষ্টারের জিম্মায় রেখে আবার একবার সহরটা বেড়িয়ে এলাম। সেই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত!

আদত সহরটা ভালো লাগলো না আমার। স্বাস্থ্যের জন্য হাওয়া বদলাতে লোকে আসেন, কিন্তু এখানকার মিউনিসিপ্যালিটী Sanitation রক্ষার জন্য কিছুই ভাল বন্দোবস্ত করেন নি।

রাত্রিটা মধুপুরে এসে প্রথম শ্রেণীর বসবার ঘরে শুয়ে কাটালাম।

জেসিডিতে গেলাম—রাত আড়াইটের গাড়ীতে।

এখানে গাড়ীতে অরুণ আর বিশ্বনাথের সঙ্গে দেখা।

অরুণ গেল সিমুলতলায়—বিশ্বনাথ আমার সঙ্গেই দেওঘরে চলল।

জেসিডি থেকে দেওঘরে গেলাম—তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে।

এখানে ব্যাগটা ষ্টেশনমাষ্টারের কাছে left luggage করে সহরে গেলাম।

সারাদিন একবার দেওঘরে ও একবার জেসিডিতে কাটল।

জেসিডিতে ডাক্তার সতীশবাবুর সাদর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম।

দেওঘরে আবার সন্ধ্যার সময় ফিরে—রাত দশটা পর্য্যন্ত ঘুরে বেড়ালাম।

দেওঘর গিরিডির চেয়ে সর্ব্বাংশেই ভাল লাগল। এখানে আহার্য্যের অবস্থাও ভাল, বাড়ী ঘরও সুন্দর।

দেওঘরে লক্ষ্য করবার জিনিষ আছে অনেক গুলি, কয়েকটীর নাম এখানে দিলাম। (ক) প্রথমতঃ—কুলীদের মাল বইবার জন্ত দাবী অসম্ভব বেশী! মোট পিছু আট আনার কম কথা কয় না তারা। (খ) ভিখারী এবং পাণ্ডার সংখ্যা দুইই অত্যধিক। (গ) বাংলা দেশে যাঁরা পর্দ্দানশীল মেয়ে, এখানে তাঁরা স্বামী, ভ্রাতা, অথবা অন্ত পুরুষের সঙ্গে ঘোমটা খুলে প্রকাশ্যে বেড়াতে দ্বিধা করেন না। তাঁরা অনেকেই জুতাও পায়ে দেন। আবার দেশে ফেরবার আগে জুতাজোড়াটা পেঁড়াবাক্সের মধ্যে লুকিয়ে ফেলেন। এই জুতা প্রসঙ্গে একটা একেবারে আশ্চর্য্য জিনিষ দেখেছি,—মেয়েরা ভেজিটেবল সু পরে বৈদ্যনাথের মন্দিরে ঠাকুর দেখতে যান। (ঘ) বিকাল বেলা নন্দনকাননের হাওয়া সকলেরই নিত্য ভোজ্য—তা না হলে দিনটা বৃথা গেছে বলেই গণ্য হয় (ঙ) পরের সঙ্গে আলাপ করিবার আকাঙ্ক্ষা মেয়ে এবং পুরুষ সকলেরই একটু বেপরোয়া গোছের। অধিক ব্যাখা নিষ্প্রয়োজন। (চ) জেসিডি মুর্গীর জন্য এবং দেওঘর পেঁড়ার জন্য প্রসিদ্ধ। দ্রষ্টব্য—পেঁড়া বলতে টিন-নির্ম্মিত বাক্স পেটিকা মনে করবেন না। ইহা এক প্রকার খাদ্য বিশেষ।

শনিবার রাত্রে দেওঘর হতে ফিরলাম—। রবিবার সকালে আবার এই কলিকাতায়!

দারিদ্র্য

—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

হে দারিদ্র্য ! বিজয়ী সম্রাট !
বিশ্ব জুড়ি' পাতিয়াছ তব রাজ্য পাট ।
তোমার বিজয় বহি' দিগ্ দিগন্তর
ছুটিয়াছে রুদ্র ভয়ঙ্কর
দুর্ভিক্ষ, তোমার সেনাপতি
ঝঞ্ঝাগতি
ছুটিয়াছে রক্ত মাখা তব দৃপ্ত বিজয় শকট ।
আকাশের শূন্য সীমা-তট
করি ক্ষুব্ধ ভগ্ন কণ্ঠে উঠে আর্ত্তনাদ ।
তুমি জয়োন্মাদ,
প্রচণ্ড বিক্রমে হানি' তীব্র অগ্নি বাণ
সৌন্দর্য্যের লীলাকুঞ্জ করেছ শ্মশান ।
মৃত্যু তব বিজয়-ঘোষক ।—মৃত্যুঞ্জয় তুমি ।
তোমার প্রসাদ লভি' বিশ্ব আজি মৃত্যু-মুখী নীল মরুভূমি !
তারি বুকে করেছ স্থাপন
কঙ্কালে গঠিত তব রাজ সিংহাসন ।
মোরা তব আজ্ঞাবহ প্রজা,
উড়াইয়া ছিন্ন কন্থা ধূলি-ধূম্র দীর্ঘ জয়ধ্বজা
জীবনের দাবদগ্ধ রুক্ষ মরুপথে
কোন মতে
চলিয়াছি রাত্রি দিন
তোমার আদেশ বহি' চির ক্লান্তি-হীন ।
মনুষ্যত্ব, মহত্ব, পৌরুষ,
অন্তরের রত্নাগারে যা কিছু জৌলুষ
মানুষের মহান্ সর্ব্বস্ব
তব কোষাগারে প্রভু, দিয়াছি রাজস্ব ।

তোমার এ রাজসূয় মহা যজ্ঞানলে
পলে পলে
দিতেছি আহুতি
স্নেহ, প্রেম, ক্ষমা, ভক্তি,—হৃদয়ের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ অনুভূতি !
তব রাজ্যে শিখিয়াছি গূঢ় রাজ নীতি
মিথ্যার প্রশ্রয় আর প্রবঞ্চনা প্রীতি ।
অভাব সে ভগবান,
তার কাছে নাহি কোন শাসন-সম্মান ।
ভুলিয়াছি অনায়াসে নরকের বীভৎস সে বিভীষিকা ভয় ।
বুভুক্ষার জয়
গাহি মোরা উচ্চ কণ্ঠে জীবন্ত পিশাচ !—
সে আওয়াজ
শুনি ঈশ্বরের কর্ণে লাগে তালা
ঝরে অশ্রু—অন্ধকার মহাশূন্যে নীহারিকা মালা !
আনন্দ সে নির্ব্বাসিত তব রাজ্য হতে—সুন্দরের করেছ সৎকার
নিভায়েছ হাসি-গান,—বিধাতার মুখে তুমি দিয়াছ ফুৎকার !
হে সম্রাট !
ব্যাপি' তব সাম্রাজ্য বিরাট
আর্ত্ত আর্ত্তনাদে
লক্ষ কোটি মানবাত্মা মাথা খুঁড়ে কাঁদে ।
সৃষ্টির উদ্দেশ্য তুমি করি' ছারখার
দিকে দিকে হানিতেছ হে রুদ্র দুর্ব্বার !
তোমার শাসন কশা সুতীব্র তড়িৎ
মানি আমি একমাত্র তুমি স্রষ্টাজিৎ ।

মহীধর বাবুর চিঠি

—শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সেন

পরম শ্রদ্ধাস্পদ—

শ্রীযুক্ত বাবু ঘনশ্যাম রায় চৌধুরী মহাশয়

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু।

মহাশয়,

আপনার পত্র পাইয়া বিস্তারিত সংবাদ অবগত হইলাম। আপনার কন্যার সহিত আমার পুত্র শ্রীমান্ ধরণীধরের বিবাহ প্রস্তাব করিয়াছেন। আপনার প্রস্তাবে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। আপনি আমার পাল্টি ঘর, সুতরাং আপনার সহিত কার্য্য করিতে আমার কোন আপত্তি হইবার কারণ নাই। বিশেষতঃ আপনার কন্যার যে ফটো পাঠাইয়াছেন, আসলের সহিত যদি তাহার সম্পূর্ণ মিল থাকে, তবে মেয়েটি যে সুন্দরী তাহাতে সন্দেহ নাই। দরকার হইলে, মেয়ের কোষ্ঠী পাঠাইবেন লিখিয়াছেন। তাহার আবশ্যক নাই। মানুষের জন্মমুহূর্ত্ত জানিতে পারিলে তাহার সারা জীবনের ভাগ্যটার একটা মানচিত্র অভ্যাস করা যায়,—এ কুসংস্কার আমার নাই। যাহারা কোষ্ঠী বিচার করিয়া বিবাহ দেয়, তাহাদের পুত্র কন্যারাও যখন বিপত্নীক ও বিধবা হয়, তখন ও জিনিষটা যে একটা বুজরুকি তাহা আহাম্মকেরও বুঝা উচিৎ। আবার যে জাতিটা বর্ত্তমানকালে সর্ব্বপ্রকারেই লক্ষ্মী-সরস্বতীর স্নেহ-ভাজন, তাহারা ঠিকুজি-কোষ্ঠীর কোন ধার ধারে না। অতএব, ঠিকুজি-কোষ্ঠী বা ঐ জাতীয় অন্য কিছু পাঠাইবার দরকার নাই।

আপনার প্রস্তাবিত বিবাহ-সম্বন্ধে আমার যে অভিপ্রায়, তাহা নিম্নে লিখিতেছি। আপনি ধীর ভাবে আমার সমস্ত কথাগুলি বিচার করিয়া, পত্রের উত্তর দিবেন।

বিবাহ পণ-প্রথার বিরুদ্ধে আজকাল অনেক কথা শুনিতে পাই। আমি যে এই প্রথার বিশেষ পক্ষপাতী, তাহা নহে। এই জন্য আমি যখন তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করি, তখন পণ বাবদ এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করি নাই। প্রথম পক্ষে বিবাহের সময় অবশ্য কিছু লইয়াছিলাম। কিন্তু তখন আমার পাঠ্যাবস্থা, টাকার বিশেষ প্রয়োজন ছিল;—সত্য কথা বলিতে কি, তখন স্ত্রী অপেক্ষা টাকারই আমার দরকার ছিল বেশী, এবং বিবাহও করিয়াছিলাম সেই জন্যই। তা সে বিবাহে এমন কিছু লই নাই যাহাতে আমার সেই পক্ষের শ্বশুরের ভিটা মাটী বন্দক দিতে হয়। তিনি যাহা আমাকে দিয়াছিলেন, তাহা সুখতের দ্বারাই কর্জ্জ করিতে পারিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহেও কিছু লইয়াছিলাম। তাহার কারণ, তখন আমি নূতন ওকালতিতে বসিয়াছি। আসবাব-পত্র এবং কতকগুলি বহি কিনিবার জন্য আমার বিস্তর টাকার প্রয়োজন হয়। জানেনই ত, এ ব্যবসায়ে ভেক্ না হইলে ভিক্ মিলে না। তাই, এবারেও আমি সম্ভবমত কিছু গ্রহণ করিয়াছিলাম। এই সকল কথা দ্বারা আমি ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাই যে, চালাইতে পারিলে ছেলের বিবাহ দিয়া মেয়ের পিতার নিকট হইতে পণ স্বরূপ কোন টাকা না লওয়াই সঙ্গত। আমার নিজের আচরণও কখনও বিপরীত হয় নাই, আশা করি এ কথাটা আপনি স্বীকার করিবেন।

লোকে জানে আমার বিস্তর টাকা আছে, ওকালতি করিয়া আমি ব্যাঙ্কে দু'চার লাখ টাকা জমাইয়াছি,—ইহাই লোকের ধারণা। কিন্তু যাহারা এ সব কথা বলে তাহারা একটা কথা ভুলিয়া যায় যে, যাহার টাকা আছে তাহার টাকার দরকারও আছে। ভগবান্ বিনা প্রয়োজনে কাহাকেও কিছু দেন না। তিনি যখন আমাকে টাকা দিয়াছেন, তখন টাকার আমার নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। আমার প্রয়োজনটা যদি অন্যায় বা অধর্ম্মের হইত, তাহা হইলে ভগবান্ আমাকে তৎসাধনোপযোগী অর্থ দিতেন না,—ভগবানের প্রতি এ বিশ্বাসটুকু আমি এখনও হারাই

নাই, এবং যতদিন বাঁচিয়া থাকিব আপনাদের আশীর্ব্বাদে হারাইবও না। আমি বহুদিন ধরিয়া লক্ষ করিয়া আসিয়াছি, নাজীরপুরের জমিদারগণের সম্পত্তিটা বুঝি আর থাকে না;—আজ হউক, কাল হউক, নিলামে তাহা উঠিবেই। তখন যেমন করিয়াই হউক, ওটা আমার কিনিতেই হইবে। তাহাতে কত টাকা লাগিবে, কে বলিতে পারে? ব্যাঙ্কে আমার যাহা আছে তাহাতে যে কুলাইবে এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। হয়ত আমার সে সময় কিছু কর্জ্জও করিতে হইবে। সুতরাং ব্যাঙ্কে আমার যাহা আছে, এই হিসাবে তাহা একরূপ না থাকারই সামিল। অতএব, যাহারা আমার টাকা আছে বলিয়া হিংসায় জ্বলিয়া মরে, আমি যে তাহাদের অপেক্ষা একটুও ধনী নই—এ সোজা কথাটা কেন তাহারা বুঝে না তাহা আমি মোটেই বুঝিতে পারি না।

অতএব, আপনি যে লিখিয়াছেন আমি সঙ্গতি-সম্পন্ন লোক, কার্য্যটি অন্য হিসাবে বাঞ্ছনীয় হইলে দেনা-পাওনার কথা উঠিবার সম্ভাবনা নাই;—সেটা আপনার ভুল ধারণা। এইধারণাটা আপনার মন হইতে দূরীভূত করিবার উদ্দেশ্যেই আমি এত কথা লিখিলাম। এখন আপনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, পুত্রের বিবাহ দিয়া যতটা পারি, পণ গ্রহণ আমার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। বিশেষ, আপনার যখন অর্থ দিবার সঙ্গতি আছে, তখন কেন দিবেন না! আর যাহা দিবেন, তাহা ত অপাত্রে দেওয়া হইবে না;—আপনার কন্যা-জামাতাকেই তাহা দেওয়া হইবে। এরূপ দানে অপার তৃপ্তি,—অন্ততঃ আমিত এইরূপই বুঝি। আপনি নিষ্ঠাবান হিন্দু, আপনি ত জানেন যে কন্যা সম্প্রদান সম্বন্ধে শাস্ত্রকারের স্পষ্ট বিধান এইরূপ—'দেয়া বরায় বিদুষে ধন-রত্ন-সমন্বিতা।' আপনি জমিদার, ভূসম্পত্তির আয় আপনার নিতান্ত কম নহে, এতদ্ব্যতীত দাদনেও আপনার বিস্তর টাকা খাটিতেছে। সুতরাং সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া, যাহা দিলে আপনার মত বড় মানুষের মর্য্যাদা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকে, পণ সম্বন্ধে আমি সেইরূপ একটা তালিকাই পাঠাতেছি।

আমার পুত্র শ্রীমান্ ধরণীধর এম্-এ পাস করিয়া এবার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়াছে,—আশা করি, এ সংবাদ আপনি অবগত আছেন। সে যে সুপুরুষ ও স্বাস্থ্যবান্ এই পত্রসহ প্রেরিত ফটো হইতেই তাহা আপনি জানিতে পারিবেন। আমাদের আর্থিক অবস্থা যেরূপ, সে সম্বন্ধেও যে আপনি কিছু না জানেন, তাহা নহে। সুতরাং এরূপ ঘরে-বরে কন্যা দিতে পারাটা যে জন্মান্তরীন তপস্যার ফল ও অত্যন্ত গৌরবের বিষয়, তাহাতে কি আর সন্দেহ হইতে পারে? আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, বিবাহের জন্য তাহার এযাবৎ ছাপ্পান্নটি প্রস্তাব আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বোত্তম যে প্রস্তাবটি আসিয়াছিল, সেটি স্বীকার করিলে আমি শ্রীমানের বিবাহ দিয়া সর্ব্বরকমে প্রায় তেত্রিশ হাজার টাকা পাইতে পারিতাম। কিন্তু তাহাতে আমার দায় সংকুলান হয় না, কাজেই "সবুরে মেওয়া ফলে" এই প্রবাদের উপর অচলা আস্থা রাখিয়া আমি সে প্রস্তাবটিও প্রত্যাখান করিয়াছি। আপনার প্রস্তাবটি সপ্তপঞ্চাশত্তম। আমি হিসাবের বহি খতাইয়া দেখিয়াছি, শ্রীমানের জন্মাবধি তাহার প্রতিপালন, লেখাপড়া ও রোগ চিকিৎসায় জন্য আমার এযাবৎ সর্ব্বসাকুল্যে ১৭৩৯৪।৶ টাকা ব্যয় হইয়াছে। আজকাল ছেলেরা পিতা মাতার টান যত না টানে, বিবাহের পর শ্বশুর শ্বাশুড়ীর টান টানে তার চেয়ে অনেক বেশী। এখনকার দিনে কন্যা-জামাতার উপর যতটা জোর চলে, পুত্র-পুত্রবধূর উপর ততটা চলে না। অতএব, শ্রীমানের জন্য আমি যে এই টাকাগুলি ব্যয় করিয়াছি, তাহার ভাবী শ্বশুরের নিকট হইতে আমি তাহা ন্যায়ত, ধর্ম্মতঃ ও বর্ত্তমান্ দেশাচার অনুসারে দাবী করিতে পারি। তবে আমি এইটুকু বলিতে পারি যে, এই টাকাটার সুদ আমি গ্রহণ করিব না;—সেটা ভালও দেখায় না, এবং তাহাতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। আজিকালিকার বাজারে এতটা ত্যাগস্বীকার যে খুবই বিরল, অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই তাহা স্বীকার করিবেন।

অনেকদিন হইতে ইচ্ছা আছে, শ্রীমান্‌কে কলিকাতায় আমি একখানি দ্বিতল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিব। কিন্তু আমার বর্ত্তমান্ অবস্থায় তাহা সম্ভব নহে। আমি তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছি, সুতরাং দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান সম্বন্ধে একটা পাকা বন্দোবস্ত করিয়া না রাখিলে ভবিষ্যতে আমার

শ্রীমান ও শ্রীমানের ক্লেশ হইতেও পারে। এরূপটা যে হইবেই, আমি এমন কথা বলি না ;—কিন্তু বুদ্ধিমান্ লোকের সব দিক দেখিয়া শুনিয়া কাজ করা উচিৎ। তাই, যেমন করিয়াই হউক, শ্রীমানের জন্য কলিকাতায় একটা দ্বিতল গৃহ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তা এ ভারটি দয়া করিয়া আপনার গ্রহণ করিতেই হইবে। এটা আমার দাবী নয়, আপনার ভাবী জামাতার পক্ষ হইতে এটা আমার আব্দার!—কিন্তু এ আব্দার রক্ষা না করিলে, আপনার প্রস্তাবে আমার সম্মতি দেওয়া সম্ভব হইবে কিনা তাহাতে গুরুতর সন্দেহ আছে।

গহনা সম্বন্ধে আমার কিছুই বক্তব্য নাই,—আপনি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া আপনার কন্যাকে যাহা দিবেন, আমি তাহাই যথেষ্ঠ মনে করিব। আমার বিশ্বাস আছে, এ বিষয়ে আপনি অবিবেচনা করিবেন না। আপনি জমিদার, আপনার দরাজ প্রাণ;—সুতরাং এ বিষয়ে আপনার নিকট চাহিয়া যাহা পাইব, না চাহিয়া তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী পাইব। তবে একটা কথা আপনার জানা থাকিলেও আর একবার স্মরণ করাইয়া দিতে চাই ;—গহনা সম্বন্ধে আজকাল সোণারূপার ব্যবহার একরূপ উঠিয়া গিয়াছে, পাড়াগেঁয়ে লোকই এখন ওগুলি ব্যবহার করে। রাজধানীতে এখন বড় বড় ঘরে গহনা বলিতেই হীরা-জহরৎ এবং মণি-মুক্তা বুঝায়। আমার কয়েকজন রাজা ও বড় বড় ধনী মোয়াক্কেল আছেন, বিবাহান্তে আমার পুত্রবধুকে তাঁহারা নিশ্চয়ই আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন ;—সুতরাং তাঁহাদের নিকট যাহাতে আমি লজ্জা না পাই, আশা করি শ্রীমতীকে গহনা দিবার কালে সে বিবেচনা অবশ্যই করিবেন।

ছেলেকে দান-সামগ্রী সম্বন্ধে আমি আর কি বলিব? এ বিষয়ে আপনি যাহা সঙ্গত মনে করেন, তাহাই করিবেন। তবে কিনা অনেক সময়ে দেখা যায়, কুটুম্বে কুটুম্বে যে মনোমালিন্য হয়, তাহা এই সকল বিষয়ে দেনা-পাওনা লইয়া। তা, আমার এমন নীচ প্রবৃত্তি নয় যে, এ বিষয়ে আপনার নিকট ইহার অপেক্ষা আর অধিক কিছু লিখিব।

আপনার ঐ একটিমাত্র কন্যা, অন্য কোন সন্তান নাই, লিখিয়াছেন হইবারও আর সম্ভাবনা নাই ; সুতরাং আপনার অবর্ত্তমানে আপনার যাবতীয় স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি আপনারই কন্যা-জামাতা পাইবে। আমিও তাহাই বিশ্বাস করি। কিন্তু মানুষের মন ত!—কখন কি খেয়াল হয়, তাহা বলা যায় না, অতএব, আপনাকে শালগ্রাম স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, আপনি এজীবনে দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করিবেন না, দত্তক পুত্র গ্রহণ করিবেন না এবং আপনার জামাতার বিনা সম্মতিতে আপনার সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ দায়বদ্ধ বা দান বিক্রয় করিবেন না তা শুধু শালগ্রাম স্পর্শ করিয়া এ প্রতিজ্ঞাটা করিলেই চলিবে ;—এ জন্য কোন রেজেষ্ট্রীকৃত দলিলের আবশ্যক নাই। ভদ্র-লোকের কথায়ই বিশ্বাস,—দলিল কি তার চেয়েও বড়?

অন্যান্য বিষয়ে যা কিছু কথা, তা মেয়েরাই বুঝেন ভাল। ওকালতি করিয়া আমি চুল পাকাইয়াছি বটে, কিন্তু সাংসারিক বিষয়ে আমার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা খুবই কম ;—একরূপ নাই বলিলেই হয় শ্রীমানের গর্ভধারিণী নাই, আমার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী নাবালিকা—তিনি কিই বা জানেন? অতএব, আমার তৃতীয় পক্ষের শাশুড়ীর সহিত আলোচনা করিয়া অন্যান্য বিষয়ে আপনাকে পরে লিখিব।

সর্ব্বশেষে একটি কাজ আপনাকে অবশ্যই করিতে হইবে, যদি এ সম্বন্ধটা ঘটে তবে সে অনুরোধটি আপনাকে রক্ষা করিতেই হইবে। পণ ইত্যাদি বাবদ আপনি আমাকে যাহা দিবেন, তাহা লোক-সমাজে কখনও প্রকাশ করিতে পারিবেন না। পক্ষান্তরে এ বিষয়ে আমার কিছুই দাবী ছিল না, এই কথাই আপনাকে প্রচার করিতে হইবে। আপনার আরও প্রকাশ করিয়া দিতে হইবে যে, আপনার প্রদত্ত সামগ্রীগুলি গ্রহণ না করিলে আপনি অন্তরে নিতান্ত ব্যথা পান, তাই অনিচ্ছাসত্বেই আমি সেগুলি গ্রহণ করিয়াছি। এ সম্বন্ধে ইংরাজি ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রগুলিতে যাহাতে আমার প্রশংসাসূচক মন্তব্য প্রকাশ হয়, তাহার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। এ জন্য যদি সম্পাদক মহাশয়গণ কিছু দাবী করেন, তবে সে দাবীটা আপনিই পূরণ করিবেন ;—আমি না হয় মন্তব্য গুলি নিজেই লিখিয়া দিব। আমার এ সব কথা বলিবার উদ্দেশ্য কি, তাহা সরল ভাবেই

আপনাকে খুলিয়া বলিতেছি। গত বৎসর এই মহানগরীতে বিবাহে পণ প্রথার বিরুদ্ধে যে মহতী সভা হইয়াছিল, আমিই তাহার সভাপতিত্বের কার্য্য করিয়াছিলাম এবং তাহাতে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলাম তজ্জন্য আমার বেশ একটু সুনামও হইয়াছিল। পুত্রের বিবাহে প্রকাশ্য ভাবে পণ গ্রহণ করিয়া আমি সে যশটুকু নষ্ট করিয়া দিয়া দুর্নাম কিনিতে চাই না। অথচ, এই বিবাহে পণ গ্রহণ না করিলে যে আমার কতটা বিপন্ন হইতে হয়, তাহা এই পত্র পড়িয়াই বুঝিতে পারিয়াছেন।

পত্রান্তরে আপনার কুশল সহ মতামত জানাইয়া অনুগৃহীত করিবেন। নিবেদন ইতি

বিনয়াবনত—

শ্রীমহীধর মজুমদার।

পুনশ্চ—এই পত্রের বিষয় আর কাহারও নিকট প্রকাশ না হয়, ইহাই আমার প্রার্থনা।

আঁস্তাকুড়ের আশপাশ

—শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

একটাকে ডাকে খুবড়ী, আর একটাকে নেড়া;—একটা ছেলে আর একটী মেয়ে।

ভোরের আলোয়—কাজের জগৎ—প্রাসাদ-পৃথিবীর যখন ঘুম ভাঙ্গে না—আঁস্তাকুড়ের ধারটীতে তখনই দুটীকে দেখা যায়। হাতে একটা করিয়া টুকরী ত' থাকেই। বাছিয়া বাছিয়া না পোড়া কয়লার টুকরা, দু একটা সিগারেটের ছবি, কচিৎ দু একটা ক্যালেণ্ডার তাস—এই সব কুড়াইয়া চুপড়ি ভরতি করে। আগে যে পৌছায় তারই লাভ!

একটা ডাষ্টবীনের ধারেই আঁস্তাকুড়। মাঝে মাঝে দু' একটা বড় বাড়ী হইতে ভোজের এঁটো পাতা, গেলাস, খুরী ......আসিয়া সেটাকে সমৃদ্ধ করে। সেদিন ভোরের বেলায় পথের ধারে দুটী ছেলে মেয়ের ভিতরও উৎসবের কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। কোলাহল-শ্রান্ত নিদ্রিত অট্টালিকায় দরিদ্রের সে ভোজের খবর পৌছায় না; ঘুম ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই ডাষ্টবীন খালি হইয়া যায়।

যে সরু পথটার গায় ডাষ্টবীনটা কদাকার ক্ষত-চিহ্নের মত পড়িয়া আছে, তার ঠিক অপর প্রান্তেই একটা বড় বাড়ী। নীচের ঘরটায় এক শীর্ণ ধবধপে বুড়া স্যাকরা দোকান খুলিয়াছে। একটা সাকরেদও আছে।

মধ্যে মধ্যে খুবড়ী নেড়ার ভিতর—ডাষ্টবীনের পাশে খুনসুটি যখন বসিয়া উঠে, বুড়া তখন ধমক দেয়—বলি ও বেটাবেটীরা, তোদের জ্বালায় দোকান কি তুলে দিতে হবে? চেঁচানির চোটে খানিকটে সোণাই বেশী গলে গেল......।

গোলমাল থামে। নেড়া খুবড়ী চলিয়া যায়—হয়ত অন্য এক আঁস্তাকুড়ের উদ্দেশে।

রঙীন মিস্ত্রীর সেই বাড়ী, সেই দোকান ঘর।

মিস্ত্রীর ছেলে প্রিয় উপর হইতে নীচে আসিয়া সাকরেদকে জিজ্ঞাসা করে, বাবা তোমায় কোথা' পাঠিয়েছিল ছকু পিসে?

ছকু জবাব দেয় না। হঠাৎ অত্যন্ত এবং অনাবশ্যক মনোযোগের সহিত চুঙ্গীটার ভিতর দিয়া কাঠ কয়লায় ফুঁ পাড়িতে সুরু করে। প্রিয় বরাবর ঐ প্রশ্নই করে। অগত্যা ছকু বলে, ইস্‌প্লেণ্টে—

——কোথায়? এসপ্লানেডে—?

হ্যাঁ; ওই এসপেলাটেনই হ'ল। সাহাদের দোকানে।

প্রিয় পিতার উদ্দেশ্যে দুই চারিটা অপ্রিয় কথা অস্পষ্ট কণ্ঠে বলিতে বলিতে উপরে উঠিয়া যায়।

ভারি সৌখীন মানুষ মিস্ত্রী, নামটির মতই মনটা রঙীন। বয়েস কালে চরিত্র দোষ ছিল—প্রকাশ্যে, এখন সেটা নিত্য নিয়মিত তাই অপ্রকাশ্যে। পান-দোষটা আজও লাগিয়াই আছে। তবে ছকু এবং প্রিয় ছাড়া অন্যে ঐ খবর সঠিক জানে না। রঙীন বলে, শরীরটে ঠিক রাখার জন্যেই ঔষধার্থে ব্যবহার করা নইলে……মিহি কালাপাড় ধুতিটি, রঙীন গেঞ্জিটি……গলায় সরু সোণার হারটিও বোধ করি ওই শরীর ঠিক রাখিবার উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করিতে হয়। চোখে নীল কাঁচের চশমাও একটা মধ্যে মধ্যে দেখা দেয়। কাণে যে তুলাটুকু গোঁজা থাকে—সেটা হইতে বেশ মিষ্টি একটা গন্ধ বাহির হয়।

রঙীনের ফরমাস খাটিতে ছকু দিবারাত্র পরিশ্রম করে। দোকানের কাজ এবং ঔষধ আনিতে 'ইস্‌প্লিন্টে' যাওয়া ছাড়া ছকুকে আরও কতকগুলি কাজ করিতে হয় যার জন্য পাড়ার দু' চার জনে তাহাকে স্ত্রীলোকের দালাল বলিতেও কুণ্ঠা বোধ করে না। প্রিয়ও এই কারণে পিসের উপর বিশেষ প্রীত নয়।

প্রিয় বলে, বাবাকে তুমিই ত' উচ্ছন্নে দিলে পিসে!

পিসে মুখ বুজিয়াই থাকে। উদরান্নের সংস্থান করিতে তাকে শালার শরণাপন্ন হইতে হয়, শালার সুখ সুবিধার জন্য সে আপনার মনুষ্যত্বকেও গলা টিপিয়া মারিয়াছে, এ অপবাদের সে কি উত্তর দিবে?

দোকান ঘরের ধুলা বালির সঙ্গে কখনো কখনো এক আধটা কাঁচের টুকরা, কুচো সোণা পথে গিয়া পড়ে। সেই অপরাধে ছকু যখন রঙীন মিস্ত্রীর কাছে লাঞ্ছনা গঞ্জনা উপহার পায়, খুবড়ী এবং নেড়ার মধ্যে তখন কলহ বাধিয়া যায়। খুবড়ী নেড়ার হাত ধরিয়া বলে, দে' না' ভাই, নীল কাঁচটা দোকানে দিয়ে আয়। লোকটার কি খোয়ারই কচ্চে।

নেড়া মুখ গম্ভীর করিয়া বলে, দরদ থাকে, দে' আয়না নিজে। খুবড়ী নীলার টুকরাটি লইয়া দোকানের দোরে গিয়া বলে, একটা নীল কাঁচ মিললো বাবু—

মিস্ত্রী হাত বাড়াইয়া ছকুকে দ্বিগুণ উৎসাহে ভ'ৎর্সনা করে। খুবড়ী ভয়ে ভয়ে একটা হাত দোকানের ভিতর বাড়াইয়া দিয়া বলে, একটা পয়সা দাও বাবু, তোমার জিনিষ খুঁজে দিলাম। রঙীন চিমটা দিয়া একখণ্ড তপ্ত অঙ্গার তুলিয়া ধরিয়া বলে,……নে' হারামজাদী, হাত পাত। জানিস, পুলিশে না দিয়ে ছেড়ে দিয়েছি,—

খুবড়ী কাঁদিতে কাঁদিতে পালায়। তাই দেখিয়া নেড়া দূর হইতে হাসে। বুকের জ্বালাটা খুবড়ীর চোখের জলে ঠাণ্ডা বোধ হয়। বলে, দাতা নিমাই পাল ঠাউরে ছুটেছিলি —কেমন হ'ল ত। ছকু আপন মনে গজ গজ করে. নিত্যি নতুন মেয়ে মানুষের সন্ধান দাও, তা'তে বড় খুসী! তারপর কাজ বাগালেই……রাত্রে লুকাইয়া বউকে চিঠি লেখে।—

শালার চাকরী, সুখের আর অন্ত নেই। দিবারাত্র খেটেও মন পাই না। ওর মন না পেলেও, যে মেয়ে মানুষটাকে ওর মনে ধরে তাকে জোগাড় করতে হয়ই। দেয়ত বারটি টাকা; আব এক বেলা খেতে। এরি জন্যে এত পাপ!……বেশী কিছু দিলে হয়ত……থাক্ সে কথা। তোর কথাতেই তোর ভায়ের কাছে আসা।……

আজ আড়াই বছর তোদের দেখিনি, নয়?

খোকার গালে আমার নাম করে চুমু দিস।—

আরও আড়াই বৎসর কোথা দিয়া উড়িয়া যায়। মিস্ত্রীর দোকানে জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলা চলে—ঠিক তেমনি। সোণা রূপার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনও পোড়ে। সোণা-গলানো আগুণে মানুষের চোখের জল নিমিষেই শুকাইয়া উঠে। আঁস্তাকুড়ের ধারেই একদিন ছেলেমেয়ে দুটীর পরিচয়, তারা প্রতিদিন তেমনিই জঞ্জাল ঘাঁটে। সেই জঞ্জাল ঘাঁটার ফাঁকে—দুটী ছেলেমেয়ের গোপন বুকে ভগবান একদিন অম্লান মণির আলো জ্বালিয়া দেন। দুজনের কেহই সেটা ঠিক করিয়া বুঝিতে পারে না।

খুবড়ী কি রহস্যে-স্নিগ্ধ চোখ মেলিয়া নেড়ার মুখ চায়; সে দৃষ্টির সাথে চোখ মিলাইতে নেড়ার বুক কাঁপে…যেন ভয় হয়। হাত বাড়াইয়া সে খুবড়ীর ছেঁড়া আঁচলটা ধরিতে যায়…………

রঙীন মধ্যে মধ্যে খুবড়ীকে ডাকিয়া. কোনো দিন একটা

আধলা, কোনো দিন একটা পয়সা দান করে। বলে, বড় দুঃখী ছকু, তাই না ভোর বেলায়—শীত নেই, বৃষ্টি নেই··· রোজ ছুটে আসে।······নিক, নিক ; আমার অভাব কি! ছকু হাসিতে হাসিতে বলে, কিন্তু রঙীন ভাই ছেলেটাকেও ত' কিছু দেওয়া উচিত। ওকে কি তোমার খুব বড় মানুষ বলে মনে হয় ?

রঙীন ভিজা গামছায় মুখ রগড়াইতে রগড়াইতে বলে, ছেলেদের সবাই দেয়, তারা নিজে উপায়ও করতে পারে, কিন্তু······মেয়েদের কেউ না!

ছকু চুপ করে মনে মনে হিসাব করিয়া দেখে, পাথর খুঁজিয়া দিয়া থুবড়ী যখন তপ্ত অঙ্গার পুরস্কার পাইবার যোগ্য বিবেচিত হইয়াছিল—তখন তার বয়স আর কত! বার, তেরোর বেশী নয়। তারপর প্রায় তিনটা বচর কাটিয়াছে। দয়া প্রদর্শনের কারণ ঘটিয়াছে বৈকি!

কারণ হয়ত থুবড়ী নিজেই।

প্রিয় জিজ্ঞাসা করে, ছকু পিসে, বাবা আজ কাল একটু ভাল হয়েচেন নয় ?·· ···কৈ, আজ কালত' রাতে কোথাও যান না!

—না। আমাকেও খোঁজ খবর নিতে বলেন না। নিজেই হয়ত সন্ধান করচেন······তাই, মাইনেও আমার কিছু কমবে শুনচি।

ছকু বলে, বাবা আজকাল গরীব দুঃখীকে পয়সা দেন। শিগ্‌গির টাকাও দেবেন শুনচি।—

বলিয়া ছকু হাসে।

প্রিয় বলে, না, পিসে হাঁসি নয়। বাবা আজকাল রাত থাকতে উঠে জপ আহ্নিক করেন।

ছকু বলে, করলেই ভাল। সময় ত' অনেক আগেই হয়েছিল।

সেদিন দোকানে আসিতে ছকুর একটু বিলম্ব হইয়া গেল। রঙীন বিনাইয়া বিনাইয়া বলিলেন, ভায়া, সুখী মানুষ তোমরা, খাটুনী তোমাদের ধাতে সইবে না। তাই বলি········দেশেই যাও। দেখচো ত' ব্যবসার মন্দা বাজার, কোনো শালা যদি পাণ দেওয়া নক্‌সা-কাটা গহনা গড়াবে!—সবাই সাদামাটা জিনিষ চাইছে। এদিকে স্যাকরার ব্যবসা মাটী।········তবেই বোঝ ভাই, এ' বাজারে নিজের চলেনা, তোমায় কি করে পুষি!········ রাত্তিরে ভাবছিলুম, দোকানটা তুলেই দেব। নিরিবিলি ঘরটাতে পূজা, আহ্নিকের বেশ সুবিধে হ'বে।········

ছকু কোন উত্তর দিল না। ছয় বৎসর পরে, সেইদিনই কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

* * * *

রাত্রির অন্ধকার-বুকে দিনমানের অস্পষ্ট আলো লজ্জা-ভীরু বধূটীর মতই নিঃশব্দে নামিতেছিল।

রঙীন একেলা বসিয়া দোকানঘরে ইষ্টনাম জপ করিতেছিল।

·········রাস্তার ধারে থুবড়ী একেলা আসিয়া জঞ্জাল ঘাঁটিতেছিল। নেড়া এখনও আসিয়া পৌছায় নাই।······

·········রঙীনকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া থুবড়ী শিহরিয়া উঠিল·········যেন ভূত দেখিয়াছে! রঙীনের কামাতুর মুখখানা—ক্ষুধিত হিংস্র পশুর মত ভীষণ, ভয়াবহ! মিস্ত্রী কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য সহজ করিয়া ডাক দিল, থুবু—শোন্।

থুবড়ী কহিল, না—

রঙীন কাছে আসিয়া কহিল, একটা টাকা নে' সন্দেস খাস। কেলবি ত' চুরি করেচিস বলে পুলিশ ধরিয়ে দেব।···

মিস্ত্রী হাত ধরিয়া টান দিতেই থুবড়ী চীৎকার করিয়া উঠিল,·········না, আমি যাব না।·········

তারপর ভোরের সেই নিদ্রিত পল্লীর মধ্যে ক্ষীণ কণ্ঠের একটী 'মাগো······' ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। দিনের আলো তখন অন্ধকারকে গ্রাস করিয়াছে।

পথের ধারে জনারণ্য! একটা মেয়ে নাকি ঊর্দ্ধশ্বাসে রাস্তা দিয়া ছুটিতেছিল—ভোরের নির্জ্জন পথে একটা ঘোড়ার গাড়ী সবেগে তার উপর দিয়া ছুটিয়া গেছে।·········

নেড়া শূন্যমনে ঘরে ফিরিতেছিল। থুবড়ী আজ আসে নাই! পথে ভিড় দেখিয়া ঠেলাঠেলি করিয়া সেও ঢুকিতে চেষ্টা করিল।·········কপ্‌নি-পরা ছেলেটাকে কেহ ভিড়ের মধ্যে ঢুকিতে দিল না। নেড়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

ভিড় কমিয়া গেলে নেড়া ভিতরে ঢুকিল।·········

মেয়েটা যেন চেনা চেনা! মুখের উপর দিয়া গাড়ীর একটা চাকা চলিয়া গিয়াছে ঠিক বোঝা যায় না।······তবু, চিনিতে এতটুকু কষ্ট হইল না।·········দশ বৎসর একসঙ্গে ছাই ঘাঁটিতে আসা, দশটী দীর্ঘ বৎসরের মৌন আত্মীয়তা! নেড়া দেখিল,·········থুবড়ীর আড়ষ্ট মুষ্টিবদ্ধ হাতের কাছেই একটা টাকা—রক্তে রাঙা।

মুঠি হইতে পড়িয়া গেছে—

চারিপার্শ্বের জনতা তখন আবার অগণ্য হইয়া উঠিয়াছে। কেহ বলিল, ছেলেটাকে সরাইয়া দাও, ও আবার কে! কেহ বলিল, টাকাটা মারবার লোভে, বুঝেচ?·········

নেড়া টাকার দিকে আর ফিরিয়াও চাহিল না। থুবড়ীর আড়ষ্ট রক্তমাখা একটা হাত মুখের কাছে আনিয়া বলিল, রাগ করিস নে ভাই, আমিও গাড়ীর তলা দিয়েই তোর কাছে যাব।·········

আঁস্তাকুড়ের আশপাশে নেড়া দু'দিন উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরিয়া বেড়াইল।·········কয়লার টুক্‌রা, ছেঁড়াছবি, তাসের চেয়ে অনেক বড় কিছু একটা যেন সে খুঁজিয়া বেড়ায়। থুবড়ী সত্যই নাই, এটা সে কোনমতেই বিশ্বাস করিতে পারে না।·········

তারপর সেখানেও তার দেখা মেলে না। হয়ত; গাড়ীর তলাদিয়া এতদিনে সে থুবড়ীর কাছেই পৌছিয়াছে।

—•::—

বিস্মরণী

—হুমায়ুন কবির

আজ প্রভাতে সবার সাথে মিলতে চাহে হৃদয় আমার,
সবায় ভালো বাস্‌তে চাহে হিয়া,
সকল ধরা আলোয় ভরা পুলক জাগে চিত্তে আবার
রবির সোনার কিরণসুরা পিয়া।
পুব আকাশে হেলায় ভাসে আলোক-উজ্জল দীপ্ত বরণ
দুয়েকখানি স্বচ্ছ লঘু মেঘ,
আজকে আমার পড়ছে আবার বহুদিনের পরে স্মরণ
বহুদিনের বিস্মৃত আবেগ।
আজকে মনে ক্ষণে ক্ষণে জাগে আমার সুপ্ত আশা
ভুলে-যাওয়া স্বপন চোখে লাগে,
পুষ্পে-মেশা গন্ধ-নেশা আমার হিয়ায় খোঁজে ভাষা
বিস্মৃত দুখ নূতন করি' জাগে!

ব্যথা কত স্বপন মত ঘুমিয়েছিল হিয়ার কোলে
আজকে তারা আবার জেগে ওঠে,
ফুলের বুকে নীরব সুখে গন্ধ ঘুমায় মর্ম্মতলে
রবির হাসির পরশ পেয়ে ফোটে।
মনের তলে দলে দলে গোপন কথা বাহির পানে
আলোর লাগি আসে ছুটি আজি
সবারে তাই কহিতে চাই, "এস আজি আমার প্রাণে
হর্ষে আমার হৃদয় ওঠে বাজি!"
আলোর মাঝে হাসির সাজে আমরা সবে দাঁড়াব আজ
দুখের ছায়ায় রইব নাক আর,
আপন মনে ফুলের বনে পথ হারাব গানেরি মাঝ
বইব নাক কঠোর কাজের ভার!
নয়ন ভরে অশ্রু ঝরে হৃদয় কুসুম ধূলির তলে
ব্যথার আঘাত সহি লোটায় নিতি,
নিয়ত হায় মুছে যে যায় সুখের স্বপন চোখের জলে
শুকায়ে যায় প্রাণের পুলকগীতি।
আজ প্রভাতে আলোর সাথে ক্ষণিকতরে যদি জাগে
সুপ্ত পরাণ আবার হরষভরে,
মনের ভুলে ফুলে ফুলে পরাণ ভরি' ফাগুণ লাগে,
গানের ধারা আবার যদি ঝরে,
আপন ব্যথা ব্যাকুলতা যদি ভুলি ক্ষণিকতরে,
শান্তি যদি মনের ভুলে পাই,
ভুলেই যদি হৃদয়নদী আবার বাঁচে নূতন করে'
ভুলের হরষ না হয় হ'ল ভাই!

'অনাদি ক্ষুধার সেই অনির্ব্বাণ-জ্বালা—'

—শ্রীপ্রণব রায়

ছোট একখানি খোলার বাড়ী।—মাটি-লেপা দেয়াল।

বার্দ্ধক্যগ্রস্থ বৃদ্ধের মত সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে।

ভয় হয়, এই বুঝি মুখ থুব্‌ড়িয়া পড়ে।

তাহারই একটা কুঠ্‌রীতে মাসির হোটেল।

ভিতরটা কালিতে ঝুলে অন্ধকার।

তাহারই মধ্যে রান্না খাওয়া চলে।

একজন উৎকল দেশীয় ঠিকা-পাচক দু' বেলা রাঁধিয়া দিয়া যায়। তার গলার ঘর্ম্মমলিন নোংরা উপবীতটী না দেখিলে, তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া চিনিবার জো নাই।

লোকে বলে, মাসি যত্ন-আত্তি করিতে জানে।

মাসি হাসে।

বলে, কেনই বা কোরব না?......হাজার হোক্ ভদ্দর-লোকের ছেলেরা তো সব......কষ্ট কি দিতে পারি?

আবার বলে, মাসে এগারো ট্যাকা কি বেশী হোল বাবু? ধর গিয়ে কলাইয়ের দাল, মাছের ঝোল আছে, দু' খানা ভাজা-ভুজিও আছে, তার ওপর আম্‌ড়া কি চাল্‌তের টক্......

বাবুরা সেই শ্বাসপ্রশ্বাসহীন অন্ধকূপে নির্ব্বিকার চিত্তে দু'বেলা আহার করে।

মাসি কাছে বসিয়া খাওয়ায় তদারক করে, আর দুটী ভাত দিক্ বাবু?......ঝোলটুকু ফেল্‌বেন না......আর এক খানা ভাজা দেবে?

খাওয়া সারিয়া আঁচাইয়া আসিতেই মাসি পান আগাইয়া দেয়। বাবুরা চিবাইতে চিবাইতে বলে, আসি মোক্ষদা, বেলা হোল।

সে এক হেমন্তের নিঝুম দু'পহরে, সবুজ চেক্-র‍্যাপার মুড়ি দিয়া একটা মেয়ে আসিয়া মাসিকে প্রণাম করিল।

বড় বড় করুণ চোখ দুটী তুলিয়া বলিল, মাসি আমি তোমার বোন্‌ঝি।

মাসি বিস্ময়ে—অবাক চোখে তার মুখের পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, ওমা তুই! কুসুম!

নতমুখী মেয়েটী বলিল হ্যাঁ মাসি, আমি পোড়াকপালী।

......স্মৃতির একটা রুদ্ধ দুয়ার খুলিয়া গ্যালো......।

কুসুমের মায়ের সঙ্গে মাসি 'গঙ্গাজল' পাতাইয়াছিল।

কুসুম তখন ছোট্টটী।

কুসুমের শ্বশুরবাড়ী সেই ময়নামতী গাঁয়ে।

শাশুড়ি কিন্তু বউকে দু' চক্ষে দেখিতে পারে না।

স্বামীটীও মাতাল, গেঁজেল।

নারীর ইহ-পরকালের ওই রুদ্র দেবতাটীর নির্ম্মম পুরস্কারের চিহ্ন কুসুমের সারা অঙ্গে আঁকা আছে।

কিন্তু দেহের ব্যথা, ও আর কতটুকু!

অন্তর-ব্যথা জানেন শুধু অন্তর্যামী।......

মাসি শুধাইল, কেমন করে হেথায় এলি কুসুম?

কুসুম বলিল, তাড়িয়ে দিলে মাসি।......কি অপরাধ কোরেছিনু জানিনে......শাশুড়ি-সোয়ামী মিলে মেরে-ধরে ......আমার নামে কলঙ্ক রটিয়ে দূর কোরে......

কথা শেষ করিতে পারে না।

ফুলের পাপ্‌ড়ির মতো পাৎলা ঠোঁট দু'খানি থর্ থর করিয়া কাঁপে।

ডাগর চোখে অশ্রু-বাদল নামে।

মাসি তার চিবুকটী তুলিয়া ধরিয়া সুন্দর মুখ খানির পানে চাহিয়া রহিল। বলিল, কাঁদিস্ নে মা, কাঁদিস্ নে...... আমার কাছে থাক্, সুখে থাক্‌বি......

অশ্রু-সজল চোখ দুটী তুলিয়া কুসুম বলিল—সুখ আমার কপালে নেই মাসি।......

কুসুমের সম্বন্ধে পাড়ায় আজকাল বিশেষ কৌতূহলের সঞ্চার হইয়াছে।

বয়সটা তার কাঁচা।

দুরন্ত নিটোল গড়ন ভরা-যৌবনের জোয়ার তার দেহের তট ছাপাইয়া উছলিয়া ওঠে। বর্ণটাও বেশ উজ্জ্বল।

সিঁথির মাঝে সরু একটী সিঁদুর-রেখা আঁকিয়া, টানা ভ্রূ-যুগের মধ্যে ছোট্ট একটী খয়েরের টিপ্ পরিলে মুখখানা বড় সুন্দর দেখায়!

বিষ্ণুচরণ চোখ নাচাইয়া বলে, আর শুনেচ হে কেদার, মাসির হোটেল আজকাল বেশ জাঁকিয়ে উঠেচে যে······

কেদার মুচ্‌কি হাসিয়া বলে, তা আর জানিনে ব্রাদার! ······এই চোখ দুটো অনেক খবর রাখে······

বাবুদের খাওয়ার সময়টা অকস্মাৎ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। ভাতের গ্রাস মুখে তুলিয়া পরম নিশ্চিন্ততার সহিত চিবায়। ধীরে সুস্থে খাওয়া দাওয়া সারিয়া, পকেট হইতে দেশলায়ের কাটি বাহির করিয়া দাঁত খুঁটিতে থাকে।

—যেন কোন ব্যস্ততাই নাই!

অবসরের ফাঁকে ফাঁকে উৎসুক-চঞ্চল চোখগুলি ঘরের চারি পাশ ঘুরিয়া আসে।

কুসুম কিন্তু বড় একটা বাহিরে আসে না।

আড়ালে বসিয়া পান সাজে।

বাবুদের মুখে পানের সুখ্যাতি আর ধরে না।

গলির মোড়ে লম্বা দোতলা একখানা ব্যারাক।—ভাড়া টানিতে টানিতে যেন অথর্ব্ব গরুর মত ক্লান্ত হইয়া ধুঁকিতেছে। নোনা-ধরা ইট গুলা যেন ঘুন-ধরা পাঁজরা।

ব্যারাকটাকে মানুষের চিঁড়িয়া খানা বলিলেই চলে।

নানা পেশার নানা রকমের লোক একত্র হইয়া এখানে বাস করে।

এক তলায় দোকান।

বিশুর মনিহারী দোকানে বিড়ি সিগারেট হইতে গায়ে মাখিবার গন্ধ-সাবান, তরল আল্‌তার শিশি পর্য্যন্ত সবই মেলে।

পাশের ঘরে কেষ্ট স্যাক্‌রা চোখে সুতো-বাঁধা চশমা পরিয়া, প্রদীপ জালিয়া দিবারাত্র ঠুক্‌ঠাক্ করে।

দোতলার প্রথম ঘরখানায় থাকে কেদার।

প্রেসের কর্ম্মচারী সে।

দ্বিতীয়টায় বিষ্ণুচরণ।

বিষ্ণুচরণ ভাঙ্গা-ঘড়ি মেরামতের মিস্ত্রি।

তার পাশের ঘরখানা ভাড়া নিয়াছে দুটী ছোক্‌রা।

কোন এক 'ওয়ার্ক-সপে' তাহারা কাজ করে।

সারাদিন খাটিয়া, সন্ধ্যার সময় ইঞ্জিনের কালিতে কালো হইয়া ফিরিয়া আসে।

কোণের শেষ-ঘরখানা দখল করিয়াছে রাধাকান্ত।

ব্যারাকের বাসিন্দাদের মধ্যে তারই অবস্থা বেশ একটু শাঁসে জলে।

ট্রাম-রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া সে সকাল-বিকাল দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজ ফেরি করে।

বলে, স্বাধীন ব্যবসা করি···কোন শালার চাকর নই···

ইতিপূর্ব্বে সে নাকি স্বপ্নাদ্য কবচ ও দাদের মলম বাহির করিয়াছিল। কিন্তু টিক্‌টিকি বেটাদের জ্বালায় কি ব্যবসা করিবার জো আছে! কিছু টাকা জরিমানা দিয়া, সেবারকার মত ব্যবসায়ে ইস্তফা দিতে হইয়াছিল।······

বিড়ি-বার্ডসাই হইতে মদ-গাঁজা—রাধাকান্ত কিছুই বাদ দেয় না। নেশা-ভাং করিয়া চেহারাটা চোয়াড়ে হইয়া গিয়াছে।

ঘোড়ার মত লম্বাটে কদাকার মুখ।

রাধাকান্ত মাসীর হোটেলের বাঁধা খদ্দের।

মাসি তাহাকে খুব স্নেহ-যত্ন করে।

রাধাকান্তের খাইতে আসিতে বেলা হয়, মাসি ভাত আগ্‌লাইয়া বসিয়া থাকে।

সেদিন তার খাওয়ার পর, মাসি কুসুমকে বলিল, বাবুকে পান দিয়ে আয়—য়া।······

কুসুম বলিল, আমি পারব না, তুমি যাও।

—আ মরে যাই! লজ্জাবতী-লতা! বলিয়া মাসি তাহাকে ঠেলিয়া পাঠাইয়া দিল।

কুসুম গায়ের কাপড় যথা-সম্ভব সম্বৃত করিয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া পান দিতে আসিল।

...সুগৌ'র নিটোল হাতে সবুজ রেশমা চুড়ি বেশ মানাইয়াছে।......নবোদ্ভিন্ন-যৌবন যেন বসনের শাসন মানে না!

রাধাকান্তের লালসা-লোলুপ চোখ দুটো ওৎ পাতিয়া চাহিল। পান চিবাইতে চিবাইতে, অন্তরাল-বাসিনীকে শুনাইয়া শুনাইয়া মাসিকে বলিল, অনেক যায়গায় পান খেয়েচি মাসি, কিন্তু এমন মিষ্টি পান—বুঝলে কিনা কোথাও খাই নি।

বলিয়া হ্যা হ্যা করিয়া বিশ্রী হাসি হাসিল।

মাসি বলে, অমন সোয়ামীর মুখে আগুন!...... সে যদি তোর খোঁজ না নেয়, তুই-ই বা তার জন্যে হেদিয়ে মরিস্ ক্যানো?......তোর আবার ভাতের ভাবনা কুসুম! এমন.........

কি যেন বলিতে গিয়া মাসি থামিয়া যায়।

কুসুম সাত-পাঁচ কিছুই বুঝিতে পারে না।

তবু মনের আকাশে একটা অনির্দিষ্ট সন্দেহ ও ভয়ের মেঘ ঘনাইয়া ওঠে।

—একদিন পিঁড়ি তুলিতে গিয়া কুসুম একখানা নোট পাইল। একটু আগে রাধাকান্ত খাইয়া গিয়াছে।......

মাসিকে ডাকিয়া বলিল, বাবু বোধ হয় হারিয়েচে মাসি ......একখানা নোট কুড়িয়ে পেলুম।......

বিজ্ঞতার হাসি হাসিয়া মাসি বলিল, তা পাবে বৈকি মা, এই তো পাবার বয়স......তোমাদের বয়সে আমরাও অমন কত কুড়িয়ে পেয়েচি......

কুসুমের সমস্ত মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াই, বিবর্ণ হইয়া গ্যালো।

......নোটখানা ছুঁইতেও তার ঘৃণা বোধ হইতেছিল...

রাধাকান্তের ঘর হইতে সে দিন মাসির তলব আসিল।

ফরমায়েস শুনিয়া মাসি বলিল, সে তুমি ভেবনি বাবু, আমি ঠিক পোষ মানিয়ে দেব'খন......এই মুকি'র হাত দিয়ে কত এলো, কত গ্যালো......

ফিরিয়া আসিয়া মাসি কুসুমকে শুধাইল, তা' হোলে কবে আস্‌তে বোল্‌ব মা?

কুসুম অবাক্।

বলিল, কাকে আস্‌তে বোল্‌বে মাসি?

মাসি হাসিয়া বলিল, নেকী! বাবুকে কবে আস্‌তে বোল্‌ব না?

কুসুমের সর্ব্বাঙ্গ বিদ্যুৎ-শিখার মত কাঁপিয়া উঠিল।

মাসির পা দুটী চাপিয়া ধরিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, ও আমি পারব না মাসি......

আঁচলের খুঁট হইতে নোট দু'খানা খুলিতে খুলিতে মাসি মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গীতে বলিল, পের্‌থম পের্‌থম সব্বারই অমন বাধ-বাধ ঠ্যাকে বাছা, দু'চারদিন বাদে আবার গা-সওয়া হোয়ে যায়!......তা বোলে হাতের লক্ষ্মী এখন পায়ে ঠেল্‌লে আখেরে পস্তাতে হবে......।

কিন্তু এমন সব সারগর্ভ কথার একটাও কুসুমের কানে প্রবেশ করিতেছিল কি না, কে জানে।

বিবর্ণ মুখে নিশ্চল হইয়া সে বসিয়াছিল।

—যেন প্রাণহীন একখানি পাষাণ-প্রতিমা!......

নিস্তব্ধ রাত্রি।......

বস্তির ঝামেলা থামিয়া গিয়াছে।

কেষ্ট-স্যাক্‌রা ঠুক্‌ঠাক্, থামাইয়া, দোকান বন্ধ করিয়া অনেকক্ষণ ঘরে ফিরিয়াছে।

সারাদিনের খাটুনির পর পরিশ্রান্ত মানুষগুলি গাঢ় সুপ্তিতে অচেতন।

......অন্ধকার......

পাতাল-পুরীর গহ্বরের মত গহন, নিবিড়।

মাসির ঘরের দুয়ারে সন্তর্পণে টোকা পড়িল।

কুসুমের তরল তন্দ্রা ছুটিয়া গ্যালো।

মিনতি-ব্যাকুল স্বরে-বলিল, তোমার পায়ে পড়ি মাসি, যেও না……দুয়ার খুলিতে খুলিতে মাসি ঝঙ্কার দিল, আর ঢং করিস্ নে।

অন্ধকারে সহসা সাপের মত দুটো কঠিন-বাহু……

কুসুম চিৎকার করিতে গিয়া দেখে, মুখ বাঁধা।

লালসা-মত্ত ক্ষিপ্ত পশুর সঙ্গে অসহায় নারী……

কতক্ষণ যুঝিবে!

কুসুমের সারা অঙ্গ বিবশ হইয়া অসিল।

তারপর মূর্চ্ছা………

ভোরের আলোয় কুসুম জাগিয়া দেখে তার নিষ্কলঙ্ক নারীত্বের শুভ্র ফুলটী লালসার পাঁকে কলুষিত হইয়া গিয়াছে।……

মাসি আসিয়া বলে, তোর কপাল ফিরিয়ে দেব লো কুসুম!…… সোণা দিয়ে তোর গা যদি মুড়ে দিতে না পারি, তখন আমায় বলিস্………

কুসুমের চোখদুটা শুধু জ্বালা করিয়া ওঠে।

খর-রৌদ্র-তপ্ত মরুর বুক হইতে অগ্নি-কণা ঠিক্‌রিয়া পড়ে।

সেই আগুনই তো মরুর অশ্রু-হীন রোদন!

•

দিন যায়, রাত আসে।

তার তিমির-রহস্যের অন্তরালে দেহ লইয়া লালসার বীভৎস লীলা চলিতে থাকে।……

পাড়ায় কি একটা কানা-ঘুসা চলিতেছে।……

বিষ্ণুচরণের ঘরে সেদিন জমাট মজ্‌লিশ বসিয়াছিল। কেদার বলিতেছিল, মাসির হোটেলে আমার খাওয়া আর পোষাবে না‥ …

সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িল।

কেদার বলিল, হাজার হোক্ বামুনের ছেলে তো, জাত তো আর দিতে পারি নে…এই চোখদুটা অনেক খবর রাখে দাদা……এম্‌নি করিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া হেঁয়ালি গাহিয়া, সকলের কৌতূহল পুরামাত্রায় উস্কাইয়া দিয়া, ইঙ্গিতে-ভঙ্গিতে কেদার ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল।

ব্যাপারটা এই—

কাল অনেক রাত্রে প্রেসের কাজ সারিয়া কেদার ঘরে ফিরিতেছিল, গলির মোড়ে আসিতেই সহসা দেখিতে পাইল, কে একটা লোক চাদর মুড়ি দিয়া মাসির হোটেল হইতে সাঁ করিয়া বাহির হইয়া গ্যালো। ফিকা জ্যোৎস্নায় লোকটাকে ভালো করিয়া ঠাহর হইল না বটে, তবে অত রাত্রে লোকটা যে মহাভারত শুনাইতে আসে নাই, ইহা সত্য।

রাধাকান্ত এতক্ষণ সব শুনিতেছিল।

এখন গম্ভীর ভাবে আগাইয়া গিয়া বলিল, গোড়া থেকেই জান্‌তুম, ও সব মেয়ে মানুষ বড় সোজা নয় মশাই……কাঁচা বয়স, ছুরৎ আছে, ও নষ্ট-চরিত্তির না হোয়ে যায়ই না……যেখানেই বাবা এতখানি ঘোম্‌টার বহর, তারি তলায় খেম্‌টা নাচ, বুঝ্‌লেন কি না……

একদিন শোনা গ্যালো, কুসুম তার বোনের বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছে।

মাস দেড়েক বাদে কুসুম আবার যখন ফিরিল, তখন তার পূর্ব্বের সে স্নিগ্ধ লাবণ্য আর নাই।

চাঁপার মত অমন সোণার কান্তি কালি হইয়া গিয়াছে। নিটোল দেহটী বিশীর্ণ, কণ্ঠা-বাহির-করা।

গোধূলির মত ম্লান এই মেয়েটী সারাক্ষণ কি যেন ভাবে। হয়তো ভাবে, পুরুষের নিষ্ঠুর স্বেচ্ছাচার নারী আর কতদিন মুখ বুজিয়া সহ্য করিবে?

নীরব নিশীথে হাওয়ার দোলায় অশ্বত্থের পল্লবে পল্লবে মৃদু-মর্ম্মর জাগে।

কুসুমের মনে হয়, যেন দূর হইতে কার অস্ফুট কান্না ভাসিয়া আসিতেছে—মা—মা—

বিনিদ্র চোখদুটী তার জলে ভাসিয়া যায়।

……মনে পড়ে, প্রভাত-পদ্মের মত সুন্দর কচি একটী নষ্ট-শিশুর-মুখ……

প্রায়শ্চিত্ত

—শ্রীতমাললতা বসু

মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়ে শরীরটা ভাল বোধ না হওয়ায় প্রাকটিস্ করতে আরম্ভ করবার আগে একবার কোথাও ঘুরে আসবার মতলব করে বেরিয়ে পড়লুম।

জগদীশপুর জায়গাটি বেশ স্বাস্থ্যকর। জল হাওয়া বেশ ভাল। স্থানটিও বেশ নির্জ্জন, বেশী লোকের বসবাসও এখানে নেই। সেই জন্যে এই যায়গাটিতে এসেই আস্তানা গাড়লুম। সঙ্গে এল আমার পুরান চাকর বেচারাম। আর একটি উৎকল দেশীয় বামুণ। সন্ধ্যার সময় গ্রাম ছাড়িয়ে নির্জ্জন নদীর ধারটিতে গিয়ে রোজ বসে থাকতুম।

সেদিন পূর্ণিমা চারিদিক জ্যোৎস্নায় ভরে গেছলো। আমি তন্ময় হয়ে নিজের মনে গান করছিলুম, কখন যে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, তা হুঁস ছিলনা।

হঠাৎ একটি নারী কণ্ঠের আর্ত্ত চীৎকারে আমার তন্ময়তা ভেঙ্গে গেল।

বিস্মিত হয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখে, যেদিক থেকে আওয়াজ এসেছিল, সেই দিক লক্ষ্য করে ছুটে গিয়ে দেখি দুজন দুষমণ চেহারার সাঁওতাল একটি নারীর মুখে কাপড় বাঁধছে। আমি পেছন থেকে গিয়ে তাদের বেশ দুঘা উত্তম মধ্যম দিয়ে দিলুম। তারা প্রথমটা রুখে এসেছিল কিন্তু এই ভেতো বাঙ্গালীর বাহুবল দেখে ভেবড়ে গিয়ে সরে পড়লো বোধ হয় প্রথমটা তারা এতটা আশা করেনি।

যাই হক্ তারা চলে যেতে আমি বিপন্না নারীর মুখের বন্ধন খসিয়ে দিতে চাঁদে আলো এসে তার মুখের ওপর পড়লো।

তরুণীর আলু থালু একরাশ কালো চুলের মধ্যে মুখখানি যেন একটি সদ্য ফোটা পদ্ম ফুলের মত শোভা পাচ্ছিল। সে মুখ খানিতে কি সরলতা মাখা, এ যেন এ পৃথিবীর নয়! এর এই ক্ষীণ দেহটিতে যেন বাতাসের ভর সইবে না, মনে হয়।

বাঁধন হারা হয়েই তরুণী সঙ্কুচিতা হয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর একবার মাত্র ত্রস্ত আঁখি দুটি তুলে আমার দিকে চেয়ে দেখে, নত মুখে বললে "আপনি আজ আমার যে উপকার করলেন, তা চিরদিন মনে থাক্‌বে কি বলে যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো তা ভেবে পাচ্ছিনা।"

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম "সবি ভগবানের দয়া আমি উপলক্ষ্য মাত্র। আপনার বাড়ী কোথায়? চলুম রেখে আসি!"

"ওই যে আমাদের বাড়ী, ওই দূরে দেখা যাচ্ছে।"

"তবে চলুন, আপনাকে পৌছে দিয়ে আসি।" বলে একটু এগিয়ে গেতেই দেখি, তরুণীর পিতা ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে আসছেন। তরুণীকে দেখে বললেন "কি হয়েছে মা রমলা, তুমি কি চেঁচিয়ে উঠেছিলে। আমি চীৎকার শুনে তাড়াতাড়ি আসছি। ইনি কে মা?"

তরুণী নতমুখে বললে "আমি জ্যোৎস্নায় বাগানে বেড়াতে বেড়াতে এধারে খানিকটা এগিয়ে এসেছি এমন সময় দুজন লোক এসে আমার মুখে কাপড় বেঁধে ফেলে। আমি ভয়ে চীৎকার করে উঠি, ইনি নদীর ধার থেকে শুনতে পেয়ে এসে তাদের মেরে আমায় উদ্ধার করেন।"

তরুণীর মুখে সব শুনে তিনি এগিয়ে এসে আমার দুটি হাত ধরে সজল চক্ষে করুণস্বরে বললেন "বাবা, তুমি যে আমার কি উপকার করলে তা বলে আর কি জানাবো। আমি বৃদ্ধ প্রাণভরে তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি, ভগবান তোমার মঙ্গল করুণ। বলে আমার মাথায় হাত রাখলেন।"

"তাঁর স্নেহমাখা কথা ও শুভ্র সৌম্য চেহারা দেখে আমি ভক্তিতে শ্রদ্ধাতে নত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম, বললুম "আপনার আশীর্ব্বাদ আমি মাথা পেতে নিলুম।"

রমলার পিতা, বিপিন বাবু, আমায় কিছুতে ছাড়লেন না, তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। তাঁর নির্জ্জন বাংলোখানি

ভারি সুন্দর। বাড়ীর চারদিক ঘেরে সুন্দর একটি ফুলের বাগান। নানা রকম ফুলে ভরে আছে।

বিপিন বাবু, আমায় চা খাবার না খাইয়ে ছাড়লেন না। চা খাবার পর রাত হয়ে যাচ্ছে বলে সেদিনের মত বিদেয় নিয়ে বাড়ী ফিরলুম।

তারপর তাঁর অনুরোধে রোজই তাঁর বাড়ীতে যেতে হতো। তিনি বলতেন "বাবা, এই নির্ব্বান্ধব পুরীতে একা থাকি, যতদিন এখানে আছ রোজ একবার করে এ বুড়োর কাছে এসো।"

তাঁর সে সস্নেহ অনুরোধ রাখতে রোজই একবার করে যেতে হতো। তাঁর কাছে শুনলুম তিনি তাঁর মা হারা এই মেয়েটিকে নিয়ে বাস করেন। পুরাতন বৃদ্ধ রামদাস ও বৃদ্ধা ঝি বামার মা থাকে, সেই রমলাকে মানুষ করেছে। বিপিন বাবু কয়েক বৎসর যাবৎ এখানে বাস করছেন, দেশের বাস তুলে দিয়ে, দেশে যাবার ইচ্ছাও নেই। কেন, কি জন্যে এ নির্জ্জন বাস, তা তিনিও বলেন নি, আমিও জিজ্ঞাসা করি নি।

এমনি প্রত্যহ যেতে যেতে তাঁদের সঙ্গে আমার খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। বিপিন বাবু আমায় পুত্রের মত স্নেহ-যত্ন করতেন।

রমলাও শুভ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন আমার ললাটে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে আমায় তার ভ্রাতৃস্থানীয় করে নিলে। এবং নিজের ভায়ের মতই মনে করতো। আমায় রমেনদা বলে ডাকতো, কোন রকম লজ্জা সঙ্কোচ করতো না, ছোট বোনটির মতই আদর আবদার করতো। গান শোনাবার জন্যে আবদার করতো। নূতন গানের সুর শিখে নিত। বইয়ের শক্ত মানে বুঝতে না পারলে বুঝে নিত। বিপিন বাবুর একটা ঘরে আলমারি ঠাসা নানা রকমের বই ছিল, এই গুলি ছিল তাঁর এই প্রবাস জীবনের সঙ্গী। রমলারও বহি পড়িবার দারুণ ঝোঁক। সে এ বয়সেই অনেক বাঙ্গালা ইংরাজি সংস্কৃত বই পড়ে ফেলেছিল, সে ছিল বিদুষী। তার মত রূপ লাবণ্যময়ী গুণবতী তরুণী সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। তাছাড়া সে ছিল, ভারি সুশীলা ও সরলা, তার বয়েস বাড়লেও তার মন ছিল একটি দশ বছরের বালিকার মত। সংসারের কপটতা ছলনা, তার সে পবিত্র হৃদয়টিতে কোন ছাপ ফেলতে পারে নি। তার ভাবটি ছিল বড় নম্র, মনটিও ছিল বড় কোমল! ক্রমে ক্রমে তার রূপ গুণে আমি তার প্রতি আকৃষ্ট হোয়ে পড়ছিলুম। ভুলে গেছিলম, সে আমার পর।

বিপিন বাবুর সঙ্গে নানা রকম শাস্ত্র আলোচনা, তর্ক বিতর্ক হয়। রমলাও তাতে যোগ দেয়। এমনি করেই আমাদের প্রবাসের দিনগুলি বেশ সুখে সচ্ছন্দেই কেটে যাচ্ছিল।

সেদিনও পূর্ণিমা। জ্যোৎস্নার চারিদিক প্লাবিত হয়ে যাচ্ছিল, বাতাসের সঙ্গে মহুয়া ফুলের ও আর নানা রকম ফুলের সুগন্ধ মিশে প্রাণ উতলা করে দিচ্ছিল, চাঁদের আলোয় দিন মনে করে জানা অজানা কত পাখী ডেকে উঠছিল। তখন বিপিন বাবু তাঁর ঘরটিতে বসে তন্ময় হয়ে একটি বই পড়ছিলেন। আমি আর রমলা বাগানে নদীর ধারটিতে পাশাপাশি বসে গল্প করছিলুম। মাথার ওপরের বকুল গাছ থেকে হাওয়ায় ফুল ঝরে ঝরে আমাদের মাথায় পড়ছিল।

রমলা বললে "কি সুন্দর, এই বকুল ফুলগুলি রমেনদা, ভারি মিষ্টি গন্ধটি।"

আমি হেসে বললুম "হাঁ রমলা বকুল ফুলের গন্ধ চমৎকার। তাইতো আমি রোজ এই ফুলের মালা গাঁথি।"

আমি বললুম "মালা গেঁথে কি কর রমলা।"

ক্ষণেকের জন্যে রমলার মুখখানি মলিন হয়ে গেল, পরক্ষণেই সে হেসে বললে "আমার দেবতার পূজো করি।"

আমি বিস্মিত হয়ে বললুম "তোমার দেবতা, ঠাকুর আছে তুমি পূজো কর তাতো জানতুম না। তোমার ঠাকুরকে কোন দিন দেখিনি। একদিন দেখিও।"

রমলা বললে "আচ্ছা তোমায় দেখাবো রমেন দা, সময় হলেই দেখাবো।"

রমলা বললে "রমেনদা একটা গান শোনাও না।"

তার অনুরোধ এড়াতে না পেরে তাকে একটা গান শোনালুম। শেষে বললুম "রমলা তুমিও আমায় একটি গান শুনিয়ে দাও।"

রমলাও আচ্ছা বলে তার সুধাময়ী কণ্ঠে গান ধরলে। "এই করেছ ভালো নিঠুর এই করেছ ভালো।"

আমি তন্ময় হয়ে গান শুনছিলুম। গান শেষ হতেই চেয়ে দেখি রমলার চোখে জল। আমি বিস্মিত হয়ে ভাবলুম, রমলার এ দুঃখের গান গাইবার কারণ কি? তার কোমল প্রাণে কি এমন ব্যথা। আমি কিছুই ভেবে পেলুম না। আমি স্থির থাকতে না পেরে রমলার হাতটি সস্নেহে নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললুম। এমন জ্যোৎস্না রাত্রে যখন চারিদিক আনন্দে ভাসছে এমন সময় এ দুঃখের গান কেন গাইছ রমলা?"

"দুঃখের গানই আমার ভাল লাগে রমেনদা।"

'না রমলা, তোমার মুখে ও দুঃখের গান মোটেই শোভা পায় না। তুমি নিজে আনন্দময়ী, তুমি সকলকে আনন্দ দাও, হাসাও। তবে তুমি নিজে কেন দুঃখের গান গাও। তোমার দুঃখের গান আমার সহ্য হয় না। রমলা, তোমার কি দুঃখ আমায় খুলে জানাও। আমি প্রাণ দিয়ে তা' দূর করবো।"

"আমার দুঃখ একমাত্র ভগবান ছাড়া কেউ বুঝবে না রমেনদা।"

"আমি বুঝবো, রমলা, তোমায় আমি বড় ভালবাসি তাই তোমার মনের কথা, আমার জানতে বাকী নেই। তুমি যদি অনুমতি দাও রমলা, তবে তোমার বাবার অনুমতি নিয়ে তোমায় আমি বিয়ে করবো।"

রমলা বাণ-বিদ্ধ হরিণীর মত চকিতের ন্যায় উঠে দাঁড়িয়ে বললে "চুপ করো, করো রমেনদা। ছি, ছি ওকথা তুমি বলো না, ওকথা শোনাও যে আমার পাপ। রমেনদা, রমেনদা, আমি যে বিধবা ভাই।" বলেই সে আঁচলে মুখ ঢেকে ত্রস্ত পদে গৃহের দিকে ছুটে চলে গেল।

হায়! হায় হতভাগ্য আমি না জেনে না শুনে একি করে বসলুম। ক্ষণিকের ভুলে ক্ষণিকের উত্তেজনায় সরলা কোমলা দুঃখিনী রমলাকে কি আঘাতই করে বসলুম। ছি, ছি, আমার পুরুষত্বে ধিক্। আমি নরাধম পিশাচ, যে দেবী আমায় ভাই বলে অসঙ্কোচে ছোট বোনটির মতই আদর আবদার করতো, তার সে বিশ্বাস আমি রাখতে পারলুম না। তার এ কি প্রতিদান দিলুম। আমি লজ্জায় ঘৃণায় তখনিই বাড়ী ফিরে গেলুম। সেদিন আর সেখানে গেলুম না। দুদিন পরে বিপিন বাবুর চাকর রামদাস এসে বললে "বাবু, আপনাকে জরুরী ডেকেছেন, দিদির বড় জ্বর। আজ তিন দিন থেকে।"

অগত্যা আমার যেতে হলো। বিপিনবাবু আমায় দেখে বালকের মত কেঁদে ফেললেন। বললেন "বাবা রমলাকে বুঝি আর বাঁচাতে পারলুম না, মা আমার বুঝি ফাঁকি দিয়ে চলে যায়। মার জন্যেই আজ আমার এই বনে বাস। এই রমলার কত সাধ করে বিয়ে দিয়ে কিছুদিন পরে তার স্বামীকে বিলেত পাঠাই। বাছা আমার পড়া শেষ করে দেশে ফিরচে পথে জাহাজ জলমগ্ন হয়ে মারা যায়। সেই শোকে রমলার মা মারা গেলেন। কচি মেয়েকে বিধবার বেশ পরাই নি, লেখা পড়া শেখাই এই সব নিয়ে দেশে নানা ঘোট করে লোকে আমায় এক ঘরে করে। তারপর—তার পর বলতে বুক ফেটে যায়—দেশের যে জমিদার নরপিশাচ তাঁরও দৃষ্টি পড়ে আমার মার ওপর? তখন দুঃখে তাপে ঘৃণায় আমার মাকে বাঁচাবার জন্যে দেশ বাড়ী সব ছেড়ে এই নির্জ্জন বনে এসে বাস করছি, লোকালয়ে যেতে আর ইচ্ছা ছিল না। হায়, মার জন্যে এত করেও মাকে রাখতে পারলুম না।" বলে বিপিনবাবু কেঁদে উঠ্‌লেন।

আমার বুক তখন যাতনায় অনুশোচনায় ভেঙ্গে পড়ছিল। তবুও সব ব্যথা বেদনা চেপে রেখে আমি ডাক্তার আমার কর্ত্তব্য কাজ করতে হল, তাঁকে প্রবোধ দিয়ে শান্ত করে, রমলাকে দেখতে গেলুম। গিয়ে দেখ্‌লুম রমলা বৃন্তচ্যুত ছিন্ন কুসুমের মত ভূলুণ্ঠিতা—জ্ঞানহারা। দেখে আমারও চোখ শুকনো রহিল না। সেদিন রমলার সারাদিন জ্ঞান হলো না। রাত্রে বিপিনবাবুর অনুরোধে এবং নিজের কর্ত্তব্যবোধেও বটে, আমার সেখানেই থাকতে হলো।

গভীর রাত। বিপিনবাবু পাশের ঘরে নিদ্রামগ্ন, বুড়ি ঝি—রামার মা, ঘরের মেঝেয় নিদ্রামগ্ন, আর আমি দুর্ভাগ্য নিদ্রাহীন চোখে রমলার মুখপানে চেয়ে বসে আছি, ভাব্‌ছি এ তরুণীর হত্যার কারণ ত আমি।.........

কিছু পরে রমলার জ্ঞান হোল, সে চেয়ে দেখলে, খানিক ক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে বললে "এই যে রমেন দা তুমি এসেছ?" আমি বালকের ন্যায় কাঁদতে কাঁদতে বললুম

রাসলীলা ।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার ঠাকুরের সৌজন্যে

Bela P. W.

রাসলীলা

নাচত শ্যাম-সঙ্গে ব্রজনারী।

জলদ পুঞ্জ জনু, তড়িত লতাবলী

অঙ্গ ভঙ্গ কত রঙ্গ বিথারী॥

নাচত নটিনী গায় নট শেখর

গাওত নটিনী নাচ নটরাজ।

শ্যামের গৌরী গৌরী সঙ্গে শ্যামর

নব জলধরে জনু বিজুরী বিরাজ।

——:o:——

"হাঁ বোন রমলা আমি এসেছি, আমার অপরাধ ক্ষমা করো বোন, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও।"

"ছি রমেনদা, তুমি এমন অধীর হচ্ছ কেন? ক্ষমাই বা চাচ্ছ কেন? তোমার তো কোন দোষ নেই ভাই? সবি আমার অদৃষ্ট। যাই হ'ক্ ভাই, আমার ওপার থেকে ডাক এয়েছে। বাবা, আমার স্নেহময় বাবা, আমার জন্যই সব ত্যাগ করে এই বনবাসে আছেন, তাঁকে দেখো রমেনদা, ছি ভাই তুমি অত অধীর হলে, তাঁকে কে দেখ্‌বে। আমার বুক কেমন করছে, বাবাকে একবার ডাক না রমেনদা।" আমি তাড়াতাড়ি চোখ মুছে নিজেকে সংযত করে নিয়ে বললুম "এই ঔষধটুকু খাও রমলা আমি তোমার বাবাকে ডেকে আনছি।" সে মৃদু হেসে বললে "আর ওষুধ কি হবে রমেনদা, তুমি বাবাকে ডাকো।"

আমি বিপিন বাবুকে ডেকে আনতে তিনি এসে রমলার পাশে বসলেন,—রমলা তাঁর হাত ধরে বললে, "বাবা, আমি চললুম, আমার সব অপরাধ ক্ষমা করো।" বিপিন বাবু বালকের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে বললেন। "রমলা, মা আমার তোর এ বুড়ো ছেলেকে কার কাছে দিয়ে যাচ্ছিস মা।"

রমলা বললে "ভগবান আছেন বাবা তিনিই তোমায় দেখ্‌বেন। আর এই রমেনদা আছেন। ইনিও তোমায় দেখ্‌বেন। রমেনদা ভাই বাবাকে দেখো, শেষ অনুরোধ রেখো।

বিপিন বাবু অধীর হয়ে কাঁদ্‌তে লাগলেন। রমলা বললে "বাবা তুমি শোওগে আমি ঘুমুচ্ছি? রমেনদা বাবাকে শুইয়ে এসো।

আমি বিপিন বাবুকে ঠাণ্ডা করে পাশের ঘরে শুইয়ে রেখে আবার এসে রমলার পাশে বসলুম। রমলা বললে "বাবাকে শুইয়ে এলে রমেনদা, বেশ করেছ। বাবা আমার এ মৃত্যু দৃশ্য দেখতে পারবেন না তাই নিয়ে যেতে বললুম। আর আমার দেরী নেই। রমেনদা, আমার শেষ আশা পূর্ণ কর। তুমি আমার দেবতা দেখতে চেয়েছিলে ওই পর্দাটা সরিয়ে দেখো আমার দেবতা, আমার দেবতাকে আর ওই খড়মটা আনো।"

আমি রমলার কথামত দেয়ালের পর্দা সরাতেই দেখলুম, একটি প্রকাণ্ড পাথরের থাক্। তার ওপর একখানি সিংহাসনে একটি সহাস্য মুখ যুবকের ফটোখানি বকুল ফুলের মালায় প্রায় ঢেকে আছে। দুপাশে ধূপদানীতে ধূপ, ফুলদানীতে ফুলের তোড়া, নিচেয় একজোড়া খড়ম। আজ আমি বুঝলুম, রমলার দেবতা কে, রমলা কার চরণ পূজা করে। দু'চোখভরে জল এল, উদ্দেশে সাধ্বীসতী রমলার চরণে মাথা নত করলুম। দেবী, দেবী, আমায় ক্ষমা করো, আমি তোমায় বুঝতে পারিনি।

ছবিটি খড়মটি পেয়ে রমলার মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌লো, সে ফটোটি অনিমেষে চেয়ে দেখে বুকে, রাখলে, বললে "রমেনদা ওই দেখ, আমার দেবতা এসেছেন, রথ নিয়ে আমি চললুম, বিদায়!" বলে কপালে খড়মজোড়া ঠেকিয়ে প্রণাম করে চোখ বুজলে,—যেন ঘুমিয়ে পড়লো!

আমি পাগলের মত ছুটে গিয়ে নাড়ী দেখলুম। সব শেষ! সতী সাধ্বী সতীলোকে চলে গেছেন। আমার চীৎকারে বিপিন বাবু উঠে এসে আছড়ে পড়লেন। হাহাকারে ঘর ভরে উঠ্‌ল। আমি বুকের ব্যথা চেপে রমলার শেষ অনুরোধ রক্ষে করে বিপিন বাবুকে শান্ত করলুম।

রমলার শেষ কাজ করতে ও সঙ্গে যেতে হলো আমাকে। রমলার চিতার আগুনে তার স্বামী, তার দেবতার ফটোখানি ও খড়ম দুটি ফেলে দিলুম। তারপর সব শেষ। বিপিন বাবুকেও বেশীদিন এ শোক সহ্য করতে হলো না। তিনি কন্যার পথ অনুসরণ করলেন। মারা যাবার সময় দিয়ে গেলেন ৫০হাজার টাকা ও তার ঘর বাড়ী, দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য রমলার নামে। বিপিন বাবুর শ্রাদ্ধশান্তি চুকলে তার বাড়ীতেই দাতব্য চিকিৎসালয় তৈরী করলুম। নাম দিলুম, "রমলালয়"।

আর গরীব দুঃখীর চিকিৎসা ও দেখাশোনার জন্যে আমিই রইলুম সেখানে—তাদের ডাক্তার হয়ে। দেশে আমার কেউ ছিলনা। দেশে গেলুম না। চাকর মাঝে মাঝে তাড়া দিতো বাড়ী ফিরতে। আমি নীরব শুনতুম। ছোটবোন কমলা, চিঠি লিখ্‌তো "দাদা বাড়ী এসো বিয়ে থা করো।" আমি লিখ্‌তুম "এখনও সময় হয়নি, হলেই যাবো।"

হয় তো জানে না যে তার দাদা কত বড় পাপী হত্যাকারী, সে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে আজীবন অশ্রুজল দিয়ে।.........

দুঃখ

—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন

দুঃখ তুমি কবে কোন্ অতীতের প্রথম প্রভাতে
ধরায় করিলে পদার্পণ,
একত্রে ধরার সাথে আমোদে খেলাতে দিনে রাতে
করিয়াছ শৈশব যাপন,
তখন কি সুখে ছিলে, এখনি বা সুখে তার চেয়ে
আছ কি বল ত মন খুলে ?
অতীত মোহন, মোহস্বপ্নচ্ছায়া দূরত্বের পেয়ে',
তাই ত সকলে তাতে ভুলে।
তখন আছিলে শীর্ণ, বলবান্ এখন কিশোর,
বিলাস-ব্যসনে ক্রমে মতি,
শিষ্ট শান্ত হবে কিসে ? শৈশব সঙ্গিনী ধরা ঘোর
অবিবেক-শাপে রতা অতি ;
নিত্য নব নব তার প্রকৃত কল্পিত অন্তহীন
অভাবের দারুণ পেষণে,
তোমার অসীম স্ফূর্ত্তি হর্ষোৎসাহ উদ্যম নবীন
প্রতিদিন জেগে উঠে মনে।
রহিয়াছে উল্লাসের দীপ্তালোক-রঞ্জিত বিস্তৃত
তব দীর্ঘ ভবিষ্যত্ পথ,
উজ্জ্বল লাবণ্য আরো তব রাগে হরষ-নিঃসৃত,
হেরি' পূর্ণ নিজ মনোরথ ;
ক্রমে যুবা প্রৌঢ় বৃদ্ধ, ভোগ শক্তি সমান প্রবল,
অতি অতি বৃদ্ধ যবে হবে,
ধরার প্রলয় হলে, হারাইয়া প্রধান সম্বল,
কেমনে কোথায় তুমি রবে ?
কেহ কহি', "পুরুষার্থ আত্যন্তিক নিবৃত্তি দুঃখের",
তোমারে মারিতে চাহে তারা ;
মুষ্টিমেয় এই দল কাণ্ডাকাণ্ডহীন পণ্ডিতের,
ভাবে যে ভবকে তারা কারা ;
সে দলের এই সুর বদলিতে সুরু হইয়াছে,
তুমি নিত্য, মিথ্যা নহ আর,
তোমারে মারিত যারা, তারাই মরিতে বসিয়াছে,
ভয় নাই আর মরিবার।
এস দুঃখ এস তবে ভক্ত তোমা' ডাকে সবিনয়ে,
হৃদয়ে বিরাজ এসে সুখে,
অধীন সেবকে ছাড়ি' যেও না নিষ্ঠুর বাম হয়ে,
সুখ শান্তি সব মোর দুখে ;
অরুন্তুদ করাঘাত তব সত্য কিন্তু বড় পথ্য, মিত্র কায
করে সে, তোমারে তাই মানি,
অন্তরের অন্তস্তল দগ্ধ করি', শিরে হানি' বাজ,
দেখায় সত্যের মূর্ত্তিখানি।
পুণ্য-পাপ-কর্ম্মফল সুখ দুঃখ, শাস্ত্রের বচন,
হয় হোক্ ক্ষতি কিবা তার,
তোমার প্রভূত্ব গর্ব্ব খর্ব্ব করে কে জন এমন
পুণ্যব্রত আছয়ে ধরায় ?
পূর্ব্বজন্ম টেনে আনি' তৃপ্ত হই প্রাক্তন সংস্কারে,
প্রাণ কিন্তু পুড়ে হয় ছাই,
মর্ম্মেতে প্রসৃত পটু বিষরস শমিতে কে পারে ?
আত্মজ্ঞান অকালে হারাই।
ফণিফণামণিতুল্য সুখ সুদুর্লভ, দুঃখরাশি
পুঞ্জীভূত চারিদিকে হেরি',
জন্মজরারোগমৃত্যু বিরহ বেদন জ্বালা, আসি'
রহে নরে অবিরত ঘেরি' ;
প্রতি পদে প্রতিকূল ঘটনার আবর্ত্ত ভৈরব
গ্রাসিতে বিবৃত করে মুখ,
প্রতিকূল-বেদনীয় যাহা কিছু দুঃখ তাহা সব,
অনুকূল-বেদনীয় সুখ।

এরূপে চলেছে নিত্য সৃষ্টির অনাদি কাল হ'তে,
সুখ-দুখ-সংগ্রাম মহান্,
ইহার বিরতি কোথা? বদ্ধ জীব দুঃখ-দাসখতে,
ইহা হ'তে নাহি পরিত্রাণ,

সুখে দুঃখ দুঃখে সুখ প্রতিষ্ঠিত, দুই তুল্যরূপ,
জানে যে সেই ত সুচতুর,
লভে সে অমৃত শান্তি, শোভে যেন নরমাঝে ভূপ,
ভাবি' উভে আশীষ্ বিধুর।

সাধনা ও সিদ্ধি

—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

নীলরতন মদটাকে জীবনের সাধনা করিয়া লইয়াছিল। তার বন্ধুরা তাকে যতই মদ ছাড়াইবার জন্য চেষ্টা করিতেন ততই তার রোখ চড়িয়া যাইত। মদের রূপগুণ, নেশার মাধুর্য্য সম্বন্ধে বিবিধ বক্তৃতা করিয়া সে হুইস্কি ঢালিয়া বন্ধুদের চাখিয়া দেখিতে অনুরোধ করিত। ইহাই ছিল তার বন্ধুদের অনুরোধের সাধারণ জবাব।

বাড়ীতে যদিও তার অভিভাবক কেহই নাই—অভিভাবক থাকিবার বয়স তার অনেকদিন হইয়া গিয়াছে,—তবু আত্মীয় বন্ধুদের উৎপাতে তার নেশার একাগ্র সাধনায় বড় বিঘ্ন হইতে লাগিল। এমন দিন যায় না যেদিন তার দিব্য জমাট নেশা কোনও না কোনও উৎপাতে ছুটিয়া না যায়। সুতরাং নিরঙ্কুশ ভাবে নেশার একনিষ্ঠ সেবা করিবার জন্য সে কলিকাতায় উঠিয়া আসিল। কলিকাতায় অনেক সুবিধা—কেহ উৎপাত করিবার নাই, আর ভাল মাল যথেষ্ট পাওয়া যায়। ইচ্ছা হইলে হোটেলে গিয়া দশ রকম চাখিয়া দেখা যায়, বাড়ী বসিয়া কেশকে কেশ সাবাড় করিয়া দেওয়া যায়।

কলিকাতায় সে একটা বাসা ভাড়া করিল। একজন রসজ্ঞ গোমস্তা নিযুক্ত করিল—সে বোতলকে বোতল চুরি করিয়া ফেলে বটে কিন্তু জিনিষটার কদর বোঝে। একটা চাকর রাখিল, তারও ওবস্তুতে বিশেষ আপত্তি নাই। পরম আনন্দে সে বাস করিতে লাগিল। বন্দোবস্ত সব ঠিক করিয়া সে একাধিক্রমে এক সপ্তাহ পরিপূর্ণরূপে টং হইয়া কাটাইয়া দিল, ইহার মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও জমাট নেশা একটুকুও হালকা হইতে দিল না।

সাতদিন পর একদিন নেশার একটু ছুট গেল। সারা সকালটা সে এক ফোঁটা মদ ছুঁইল না।

তার বাড়ীর সামনে রাস্তা, তার ওধারে খান কয়েক এক তলা বাড়ী, তার ওধারে আবার রাস্তা, তার ওপারে আর একখানা বাড়ী—সেই বাড়ীর ছাদের উপর তার নজর পড়িল একটি মেয়ের উপর। বসন তার সুসংবৃত ছিল না। নীলরতনের সঙ্গে চোখাচোখি হইবামাত্র সে লজ্জিত হইয়া বসন সংবৃত করিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু যাইবার সময় একবার পিছন দিকে চাহিয়া একটা কটাক্ষ হানিয়া গেল।

সুন্দরী?—না তা নয়। যৌবন তার? সেও বুঝি টলমল। তবু নীলরতনের চোখ পড়িয়া রহিল সেই বাড়ীর উপর। আবার তাকে দেখা গেল—আবার—ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। অভিজ্ঞ নীলরতনের বুঝিতে বাকী রহিল না যে মেয়েটি তার মোহিনী শক্তির কাছে ধরা পড়িয়াছে। সে ক্ষেপিয়া উঠিল।

আয়োজন উদ্যোগে তিন দিন কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিন রাত্রে বন্দোবস্ত অনুসারে নীলরতন সে বাড়ীর দুয়ারের কাছে আসিয়া তিনটা টোকা দিল।

মেয়েটা দুয়ার খুলিয়া দিল। নীলরতন তাকে টানিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া ট্যাক্সিতে পুরিল।

মেয়েটা চীৎকার করিল না, কিন্তু ভয়ে নীলরতনের বুকের ভিতর মিলাইয়া গেল। "একি! একি! আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্চ? আমার বড্ড ভয় পাচ্ছে—ওগো আমায় ছেড়ে দাও"—এমনি করিয়া সে মৃদুস্বরে মিনতি করিল।

"কোনও ভয় নেই" বলিয়া নীলরতন পকেট হইতে ফ্লাস্ক বাহির করিয়া মেয়েটার মুখের কাছে ধরিল।

ভয়ে মুখ সরাইয়া মেয়েটা বলিল, "ওকি?—মদ! সর্ব্বনাশ!"

কিন্তু নীলরতন ছাড়িল না, খানিকটা মদ তার মুখে ঢালিয়া দিল, অবশিষ্ট নিজে নিঃশেষ করিল। তার উদরে তখন ওবস্তুর মোটেই অভাব ছিল না।

অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া নীলরতন তাকে লইয়া বাড়ীতে ফিরিল।

মেয়েটা অর্দ্ধমৃতের মত বিছানার উপর পড়িয়া বলিল, "হায়, হায়, কি হবে আমার?—ওগো আমার একি সর্ব্বনাশ ক'রলে।"

নীলরতন টলিতে টলিতে তার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া তার মত স্খলিত কণ্ঠে বিবিধ প্রকারে তাকে সান্ত্বনা দিল—আবার মদের বোতল তার মুখের কাছে ধরিল, অত্যন্ত অনিচ্ছায় সে নারী পান করিল—সেও মাতলামী সুরু করিয়া দিল।

নীলরতন তখন দুয়ার বন্ধ করিয়া বলিল, "কোনও চিন্তা করো না—আমি গরীব নই—রাণী হ'য়ে থাকবে তুমি। দেখবে?"

বলিয়া নীলরতন তার সিন্দুক খুলিল। কতকগুলি নোটের তাড়া। এক পাঁজা রূপার বাসন, এক কাঁড়ি মোহর দেখাইল। নেশায় বিভোর নারী এক একবার চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল মাত্র।

দুই হাতে মোহরগুলি তুলিয়া নীলরতন সে মেয়েটির মুখের উপর ছড়াইয়া দিল। নেশার ঘোরে মেয়েটা হাত পাতিল, কিন্তু সে মোহরের মুষ্টি ধরিতে পারিল না।

তারপর নীলরতন আর একটা বোতল খুলিল—মেয়েটাকে আর এক পাত্র খাওয়াইল, আর দেখিতে দেখিতে ক্রমে সে বোতলটা নিঃশেষ করিল। তারপর নীলরতন একদম অচেতন হইয়া পড়িয়া গেল।

সকাল বেলায় যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন নীলরতন হাত বাড়াইয়া বোতলটা টানিয়া মুখের কাছে ধরিল—দেখিল বোতলটা শূন্য। বিরক্ত হইয়া উঠিয়া সে চারিদিক চাহিল, কোথাও কেহ নাই।

খোঁজ করিয়া দেখা গেল একটাও মদের বোতল অবশিষ্ট নাই।

রাত্রের কথা তার কিছু মনে হইল না।

সে ব্যাকুলভাবে ঘড়ির দিকে চাহিতে লাগিল। যখন দেখিল দশটা বাজে তখন সে ছুটিল মদের দোকানে যাইবার জন্য। পকেটে হাত দিয়া দেখিল টাকা কম আছে। সিন্ধুক খুলিয়া দেখিল———কিছুই নাই!

বজ্রাহত নীলরতন কিছুই বুঝিতে পারিল না। কাল রাত্রে ঐ মেয়েটাকে লইয়া ট্যাক্সি করিয়া বেড়াইতে গিয়াছিল। তারপর—হাঁ বোধ হয় তাকে এ বাড়ীতে আনিয়াছিল—তারপর? কিছু মনে নাই।

মাথায় হাত দিয়া নীলরতন বসিয়া পড়িল।

* * * *

সকাল বেলায় সে মেয়েটা তার বাড়ীতে হাসিয়া গড়াগড়ি যাইতেছিল। তার মার কাছে সে বলিতেছিল—"শালা মাতাল ভেবেছিল আমাকে দু'ঢোক হুইস্কি খাইয়ে একেবারে কাবু ক'রেছে! অমন কত হুইস্কির সাগর পার ক'রে দিয়েছি তা' তো সে জানে না।"—ইত্যাদি।

নীলরতন অনুসন্ধানে জানিল যে মেয়েটি কুলবধূ নয়।

কিন্তু উপায় কিছুই নাই। কুলবধূর মানরক্ষার জন্য নীলরতন তার বিশ্বস্ত গোমস্তা ও চাকরকে পর্য্যন্ত সব গোপন করিয়া গভীর রাত্রে চাবী খুলিয়া বাড়ী ঢুকিয়াছিল। একটা সাক্ষী পর্য্যন্ত নাই।

পরের দিন, তল্পীতল্পার যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা লইয়া নীলরতন দেশে ফিরিয়া গেল।

এখন আর সে মদ খায় না।

———

সরাইখানা

—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

মনে পড়ে এক জুলাই-মধ্যাহ্নে নাইম্‌স্ থেকে ফিরছিলুম। কী ভীষণ গরম! প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের আকাশ-ব্যাপী অনলবৃষ্টি! ধূসর ঝল্‌সানো পথ যতদূর দৃষ্টি যায় সোজা চলে গেছে। দু'ধারে কোথাও অলিভ্‌ গাছের বাগান, কোথাও পত্রলেশবিবর্জ্জিত ওক গাছের সারি। ছায়ার লেশমাত্র নাই। মাঝে মাঝে এক একবার শুধু তপ্ত হাওয়ার মৃদু শিহরণ—অদূর জঙ্গল থেকে ভেসে-আসা দু' একটা অজানা পাখীর কর্কশ-কাতর আকাশভেদী আর্ত্তনাদ—যেন ঐ অগ্নি-পরশেরই হতাশ প্রতিধ্বনি!

উষর মরুভূমির মাঝ দিয়ে চলেছি—বিরাম বিহীন;—কখন এই সুদূর যাত্রার অবসান হবে কে জানে! সারা শরীর ঘর্ম্মাক্ত ক্লান্ত। কতক্ষণ এই ভাবে পথ চলায় সময় কাটল মনে নেই। হঠাৎ অদূরে কতকগুলি ছোট ছোট সাদা বাড়ী পথের ধূলো থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়েই যেন চোখের সামনে ভেসে উঠল। মনে বেশ একটু আনন্দ হ'ল। এতক্ষণে বুঝি এইবার একটু বিশ্রামের অবসর মিল্‌বে। যাই হোক অগ্রসর হ'য়েই চল্‌লুম। ক্রমে ছোট বাড়ীগুলি বড় হ'য়েই দেখা দিলে—শুনলুম সেণ্ট ভিন্‌সেণ্টের আস্তানা। বেশী কিছু নয়,—পাঁচ ছ' খানি ইজারাদারের গৃহ, রাঙ্গা ছাদ-ওয়ালা খানকয়েক লম্বা লম্বা গোলঘর, এলোমেলোভাবে সাজান ডুমুর গাছের তলায় একটী জলহীন মৃৎপাত্র আর পল্লীর একেবারে শেষ উপান্তে দু'টী সরাইখানা, পথের দু' ধারে সামনা সামনি মুখ করে চুপ চাপ চেয়ে আছে।

সরাইখানা দু'টাই একটু অদ্ভুত রকমের। এত বেমানান-ভাবে বিসদৃশ যে প্রথম দৃষ্টিতেই চোখে পড়ে। ওধারের সরাইখানা প্রকাণ্ড ও নূতন! জীবনের আশা উদ্যমে ভরা! উঠোনে অশ্বতর ও গাড়ীর ভিড়। চালকেরা ছায়ায় বিশ্রাম করছে, কতক্ষণে সন্ধ্যার মুখে সূর্য্যের তাপ একটু কমবে সেই আশায়। সরাইখানার ভিতরে গোলমাল হৈ চৈ শব্দ সাড়া লেগেই আছে। কেউ চীৎকার করে বাজী রাখছে, কেউ বা উত্তেজনাবশে টেবিল বাজাতেই বসে গেছে। তা' ছাড়া কাচের গ্লাসের ঝনঝনানি, বিলিয়ার্ড বলের ঠকাঠক্, জুতার মস্‌মস্—সব মিলে হাট বাজারের সামিল করে তুলেছে। সমস্ত হট্টগোল চাপা দিয়ে কে রাসভ-বিনিন্দিত স্বরে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হ'য়ে মনের আনন্দে তান ধরেছে—বাড়ীখানাই বুঝি বা ভেঙ্গে পড়ে গানের দাপটে!

রাস্তার অপর পাশের সরাইখানাটী এর ঠিক বিপরীত। সেখানে জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই। সব নীরব নিথর! যেন রূপকথার ঘুমন্তপুরী—আলপিনটী পড়্‌লেও শোনা যায়। বাড়ীখানি জীর্ণ,—প্রবেশ পথে ঘাস গজিয়েছে; জান্‌লা গুলি ভাঙ্গা, স্থানে স্থানে আইভিশাখায় ছেয়ে গেছে। ঘর দোর সব অপরিষ্কার। সমস্ত দৃশ্যটা এতদূর দারিদ্র্যমাখা যে দেখ্‌লেই সহানুভূতি জাগে, মনে হয় ঢুকে কিছু খেয়ে যাই—যদি এতে এদের একটুও দুঃখ ঘোচে।

প্রবেশ করলাম। প্রথমেই একখানা লম্বা ঘর। যেন কতকালের পরিত্যক্ত আবাস—কত অবসাদই না এর মধ্যে গুম্‌রে মরছে। জান্‌লাগুলির একটারও পরদা নাই। খান-কয়েক জীর্ণ টেবিল এধারে ওধারে ছড়ানো। তার উপর ধূলিপড়া গুটীকয়েক ভাঙ্গা গ্লাস, একটী হল্‌দে রঙের কৌচ্‌, একটা ডেস্ক,—যেন কতযুগের স্বপ্নে বিভোর—কোথাও জীবনের সাড়া নাই। কেবল এক ঝাঁক মাছি সুযোগ বুঝে এই পরিত্যক্ত ঘরে আস্তানা নিয়েছে; কড়ি বরগার পাশে কার্ণিশের ফাঁকে, ভাঙ্গা গ্লাসের মধ্যে এখানে সেখানে চারি-দিকে অসংখ্য মাছির উপদ্রব—যেন মাছির রাজ্যে এসে পৌছেছি।

ওধারের কোনে জান্‌লার পাশে কে একজন বসে রয়েছে না? অগ্রসর হয়ে ভাল করে চেয়ে দেখ্‌লাম, সত্যই ত—একজন প্রৌঢ়া মহিলা এক জীর্ণ চেয়ারে বসে কি ভাবছে।

বিষাদ-ভরা দৃষ্টি তার চলে গেছে জানালার বাইরে কোন্ সে অনন্তের সন্ধানে।—যেন সারা জগতের হিসাব নিকাশ চুকিয়ে ওপারের আলোর পথ পানে বসে আছে।

এই পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ কর্‌তে প্রথমটা সঙ্কোচ হ'তে লাগ্‌ল। কিন্তু না করেও ত উপায় নেই। তাই অতি সন্তর্পণে একবার ডাক্‌লুম। কিন্তু স্বপ্নসূত্র তার তখনও ছিন্ন হয় নি—আমার ডাক শুন্‌তে পেলে না। দ্বিতীয়বার তাই ডাক দিলুম, মসিয়ে—

এবার রমণী ফিরে চাইলে। আহা! যেন শোক আর দারিদ্র্যের নিখুৎ প্রতিমূর্ত্তি। চোখের কোলে কালি পড়েছে। কপালে বলি রেখার দাগ। গায়ের রং জলে গেছে। বয়স খুব বেশী বলে মনে হল না, কিন্তু এই বয়সেই চোখের জল পড়ে পড়ে আর দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝে দেহ লোল-চর্ম্ম, মুখ সাদা বিবর্ণ ফ্যাকাশে।

চোখ মুছে রমণী মৃদুস্বরে বললে, আপনার কি দরকার?

—এই দুপুর রোদে চল্‌তে চল্‌তে সামনে সরাইখানা দেখ্‌লাম,—তাই খানিক বিশ্রাম করে কিছু খেয়ে যাব।

রমণী কিন্তু উঠল না। মূঢ়ের মত বসে রইল। যেন আমার কথা একবর্ণও বোঝে নি।

আমি আর থাকতে পারলুম না। একটু জোর করেই বলে ফেললুম, আচ্ছা, আমার কি ভুল হচ্ছে? এটা কি সরাইখানা নয়?

রমণী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললে।

—হাঁ, সরাইখানাই বটে। কিন্তু আপনি আর সকলকার মত ঐ সামনের বাড়ীটায় গেলেন না কেন? ওটা ত এখানকার চেয়ে ঢের বড় আর জমকালো।

—হঁা, একটু অতিরিক্ত রকমেরই। ও আমার সহ্য হয় না। আমি বরং এখানেই নিরিবিলি কিছু খেয়ে যাই।

উত্তরের অপেক্ষা না করে আমি সামনের একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লাম।

এতক্ষণে বুঝি তার সন্দেহ দূর হল—আমি এখানে খাব! দেখ্‌লুম রমণী তাড়াতাড়ি উঠে ব্যস্তসমস্তভাবে টেবিল পরিষ্কার, গ্লাস ধোয়া, মাছি তাড়ান প্রভৃতি কাযে লেগে গেল। মাছির ঝাঁক এতকালের নিরুপদ্রব বাসস্থানটী বুঝি হাত ছাড়া হয়ে যায় ভেবে পরিষ্কৃত জিনিষপত্রের মধ্যে অবাধে যথেচ্ছাচার করে যেন জানিয়ে দিলে যে তারা অত সহজে ছাড়বার পাত্র নয়।

মহিলাটীর একটী বিষয় লক্ষ্য করে বিস্মিত হলাম। কাজের ফাঁকে ফাঁকে রমণী মাঝে মাঝে চুপচাপ স্থির হয়ে চেয়ে থাকে—কাজে মন নেই। হতাশের মত ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে এদিক্ ওদিক্ চায়, যেন কতকালের দুঃস্বপ্ন হ'তে এই সবেমাত্র জেগে উঠেছে!

অতঃপর অপরিচিতা রান্নাঘরের দিকে গেল। বড় বড় তালা খোলার শব্দ কানে এসে লাগ্‌ল। রুটীর বাক্স বা'র করা, থালা ধোয়া,—আহার্য্য সম্বন্ধীয় প্রত্যেক খুঁটীনাটী কাযের শব্দও আমার কান এড়াল না। কিন্তু তবু সেই মাঝে মাঝে হতাশার দীর্ঘশ্বাস, বুকচাপা হাহাকার—কত মর্ম্মভেদী বেদনার অভিব্যক্তি!

প্রায় আধঘণ্টা বসবার পর রমণী এক ডিস্ আঙ্গুর, কত কালের শক্ত বাসি রুটী কয়খানা আর এক বোতল পচা মদ আমার টেবিলের উপর রেখে গেল।

—আপনার খাবার প্রস্তুত,—

চমকে চাইলুম। দেখিমহিলাটী পূর্ব্ববৎ নিজের চেয়ারে জানলার পাশটিতে গিয়ে বসেছে।

খেতে খেতে জিজ্ঞেস্ করলুম, আপনার এখেনে বড় একটী কেউ খেতে আসে না, নয়?—উৎসুক নেত্রে তার দিকে চাইলুম।

প্রথমে কিছুই বলিতে চায় না। পরে শুনলুম—

না মশাই, কেউ এখেনে আসে না। অথচ একদিন ছিল যখন আমাদের নইলে কারুর এক দণ্ডও চল্‌ত না। শীকার ফেরৎ কত বাবুই না এখেনে খেয়ে গিয়েছে। তখন এত ভিড় হত যে সমস্ত দিন জোগান দিয়ে কুলিয়ে উঠ্‌তে পারতুম না। কিন্তু এখন দিন কাল সব বদলে গেছে। সামনের ঐ ওরা আসা অবধি আমাদের ব্যবসা একেবারে মাটী। কেউই আর এখেনে আসতে চায় না। যারা আসে সব ও বাড়ীতে যায়। তা যাবে নাই বা কেন বলুন? আমাদের বাড়ীত আর ওদের মত চক্‌মিলানো নয়। আর আমিও তেমন আগের মত লোকেদের যত্ন

করে খাওয়াতে পারি না। আমার কি আর সে আশা আছে, না উদ্যম আছে ?—সব একেবারে জলাঞ্জলি দিয়েছি। আহা বাছারা !—তারা চলে যাওয়া থেকেই ত আমার এই দশা। এখন তাদের ভাবনা, তাদের কথাই আমার দিন রাতের স্বপ্ন হয়েছে। আর কিছু ভালো লাগে না।......

সামনের বাড়ীটায় দিন রাত হাসির হর্‌রা লেগেই আছে। কত লোকজন আস্‌ছে, যাচ্চে, গোলমাল হৈচৈ ......আমি বসে বসে সব দেখি। আর্লে থেকে এয়েছে ওবাড়ীর মেয়েটী—প্রাণে সখ আছে, দিনরাত আমোদ করছে, দামী জড়োয়া পোষাক পরে বেড়াচ্ছে। এ অঞ্চলের সমস্ত লোকের সঙ্গেই তার ভাব। তাই সকলে ওর কাছেই খেতে আসে। আমার এখেনে লোকে আসবে কেন ? আমি নিজের শোকে নিজে মরছি। আমার দেখ্‌বার আর কে আছে ?......

রমণী থাম্‌ল। কণ্ঠের স্বর তার বড় করুণ, বড় মর্ম্মভেদী !

হঠাৎ রাস্তার ওধারে একটা ভীষণ হট্টগোলে চমক ভাঙ্গল। চেয়ে দেখি, সামনের সরাইখানার মালিক ধূলায় লুটিয়ে পড়ে দৌড়চ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে চাবুকের সপাসপ্‌, শকট-চালকের বাঁশি, আর এক পাল মেয়ের চীৎকার। আর সমস্ত গোলমাল ছাপিয়ে উঠ্‌ছে সেই রাসভনিন্দিত ভীষণ চীৎকার—সঙ্গীত সাধনায় ছলে। এখেনে এসেই এই অপূর্ব্ব সঙ্গীতের মহিমায় কানে তালা লাগবার জোগাড় হয়েছিল। এতক্ষণ চুপচাপ থেকে আবার সেই! কী উচ্চস্তরেরই না গায়ক !

সঙ্গীত শুনেই মহিলাটী চম্‌কে উঠল, লক্ষ্য করলুম। সারা অঙ্গ বুঝি কাঁপছে। কোন ক্রমে সাম্‌লে নিয়ে, ধীরে ধীরে বল্‌লে,—শুনতে পাচ্ছেন ? উনিই আমার স্বামী মিঃ জোস্‌। কেমন লাগছে গানটা, বেশ নয় ?

ভারী বিস্ময় ঠেক্‌ল।

—কি ! উনি আপনারই স্বামী ? উনিও বুঝি ও বাড়ীতে যান ?

—আপনার কি রকম মনে হয় বলুন তো ?—দেখ্‌লুম রমণীর চোখে জল।—মানুষের ধর্ম্মই বুঝি এই। তারা লোকের গোমড়া মুখ দেখতে পারে না। আহা ! বাছাদের জন্যে আমার এক দণ্ডও শান্তি নাই ! তারা চলে যাওয়া থেকে আমি দিনরাতই কাঁদছি। সমস্ত বাড়ীটা যেন খাঁ খাঁ করছে। কি আর কর্‌ব। কিন্তু জোসের এ সব সহ্য হবে কেন ? তিনি এখন নতুন আমোদ পেয়েছেন, তাইতেই মসগুল। আমার দিকে ফিরে চাবার কি আর তাঁর অবসর আছে ?—ঐ দেখুন, আবার চলেছেন উনি !

রমণী স্থির, নিশ্চল ! যেন পাথরে খোদাই করা। অশ্রুর মুক্তা ঝরে পড়ছে গাল বেয়ে ! তার জোস্‌ আগের মতই রাস্তা দিয়ে গান গেয়ে চলেছে আর্লের মেয়েটীর হাত ধরে'। *

আগামী সংখ্যায়

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়ের শিল্প-মঞ্জরী (বেবি ফ্রক তৈয়ারী করার প্রণালী)

ও

কাজী নজরুল ইস্‌লামের কবিতা।

* Alphonse Daudet থেকে।

রূপশিখা

—শ্রীঅরিন্দম বসু

দ্বিতীয় দৃশ্য

অপরাহ্ণ কাল।

নগরের প্রধান রাজপথপার্শ্বে বিস্তৃত তমালবন।—তন্মধ্যে বিরাট মর্ম্মর ভবন।

সেদিন বর্ষা-উৎসব। জনসমাগমে রাজপথ আচ্ছন্ন,—মুখর। নগরের আবালবৃদ্ধ নর-নারী বিচিত্র বেশভূষণে সুসজ্জিত হইয়া রাজপ্রাসাদে উৎসব-সম্মিলনীতে গমন করিতেছে।

রাজপথের অনতিদূরে ক্ষুদ্র পণ্যশালা। তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটী যুবক এই জনস্রোত দেখিতেছিলেন। তাহার প্রশান্ত মুখচ্ছবি,—বিস্তৃত নয়ন,—দীর্ঘায়িত দেহের স্বর্ণাভ তণিমা-গতি-মন্থর জনতাকে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিল।

পথশ্রমক্লান্তা তরুণীরা অস্ফুটকণ্ঠে তাহার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতেছিল—হাঁ, অপরূপ সুন্দর বটে!

কিন্তু যুবক উদাসীন। থাকিয়া থাকিয়া তিনি অনুসন্ধিৎসু-দৃষ্টিতে সম্মুখের তমালবনস্থিত মর্ম্মর ভবনের শূণ্য বাতায়ন পথে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন।

ক্রমশঃ জনস্রোত কমিয়া গেল। যুবক সন্তর্পণে তমালবনে প্রবেশ করিলেন।

প্রাসাদের অভ্যন্তর-পথে রক্ত-রাগ-রঞ্জিত বিস্তৃত সোপান-শ্রেনী। যুবক সোপান বাহিয়া উপরে উঠিলেন। সম্মুখেই অগুরু-কুমকুম্-গন্ধামোদিত বিলাস কক্ষ। তন্মধ্যে চন্দন-গন্ধি শেজ। তদুপরি অর্দ্ধশয়ানা একটী তন্বী-তরুণী।

তরুণীর দৃষ্টি বাতায়ন বহির্দেশে নিবদ্ধ—স্থির, অনিমেষ।

যুবকের আগমনধ্বনি কর্ণগোচর হইল না।

যুবক দেখিলেন—তাহার নীলাম্বরীর স্বর্ণাঞ্চল বক্ষচ্যুত হইয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে। এলায়িত মেঘ-কৃষ্ণ কেশদাম শিথান বাহিয়া কক্ষতল স্পর্শ করিয়াছে।

ডাকিলেন—চন্দা!

—কে?

মুখ ফিরাইতেই সুন্দরীশ্রেষ্ঠা চন্দা অবাক হইয়া গেলেন। পলকহীন দৃষ্টিতে যুবকের পানে চাহিয়া ভাবিলেন—একি স্বপ্ন না সত্য!

—কি দেখ্‌ছো চন্দা—এমন অসময়ে আমায় দেখে তুমি সত্যি করেই আশ্চর্য্য হ'য়েছো,—না? যেখানে কুবের সদৃশ শ্রেষ্ঠি-কুমার এবং ধন-জন-শালী রাজপুত্রগণের শুভাগমন হ'য়ে থাকে সেখানে সামান্য একজন দরিদ্রের গোপন প্রবেশ—হাঁ,—আশ্চর্য্যের কথাই বটে। সত্যি, আজ আমি কপর্দ্দকহীন,.........তোমার দর্শনীর সঙ্গে স্বর্ণমুদ্রা আমার নেই। কিন্তু একদিন—

—না, কোন কিন্তু নয় উত্তীয়। দর্শনী আজ আমার নয়,—দর্শনী তোমার। আমার এমন কি সৌভাগ্য যার জন্য অযাচিতরূপে তোমার দেখা পেলাম। এ অনুগ্রহের দর্শনী দিতে গেলে যে আমার ধনভাণ্ডারের সমস্ত রত্ন দিয়েও তার উপযুক্ত সংখ্যা পূর্ণ হবেনা। কিন্তু দয়া করে যখন এসেছো বন্ধু.........

চন্দা সসম্ভ্রমে উত্তীয়ের হস্তাকর্ষণ করিয়া পালঙ্কে বসাইলেন।

—ভুল কোরনা চন্দা,......আমি তোমার প্রেমের অভিসারে আসিনি আজ—এসেছি নিজের স্বার্থের চেষ্টায়,—নিতান্ত প্রয়োজন বোধে——

—কি তোমার স্বার্থ?—কি সে প্রয়োজন উত্তীয়?

চন্দার বক্ষ হইতে নিঃশব্দে একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া গেল।

—তোমার কাছে একটা জিনিষ চাইতে এসেছি,—অবশ্য তার যথার্থ মূল্যই তোমায় দেবো,—তবে—

—শুনি, কি সে মহার্ঘ জিনিষ,—যার জন্য এই উজ্জ্বল দিবালোকে একটা ঘৃণিতা পতিতার গৃহে ছুটে এসেছো।

—বেসালির আম্র কাননে তোমার একটী বিলাস ভবন

আছে। তোমার কাছে আমি জানতে এসেছি, যদি তুমি আমার কাছে বিক্রয় করো, তবে তার যথার্থ মূল্য দিয়ে আমি ক্রয় করতে রাজী।

—এই কথা!

—হ্যাঁ, চন্দা, এই কথা!.........বলো দেবে?

ক্ষণকাল চন্দা কি যেন ভাবিলেন—পরে নিম্নস্বরে বলিলেন,—তোমায় অদেয় আমার কি আছে উত্তীয়? শুধু বেসালির কেন, যদি তুমি গ্রহণ কর তবে এই মুহূর্ত্তে এই বিশাল মর্ম্মর-প্রাসাদ সহ আমার যাবতীয় ধনসম্পত্তি তোমাকে অর্পণ করতে প্রস্তুত।

—এর অর্থ?—আমাকে দরিদ্র বলে আজ পরিহাস ক'রোনা চন্দা।

—পরিহাস নয় উত্তীয়,—এ আমার প্রাণের কথা।...... সত্যি, তুমি নেবে,—বল?

উত্তীয় ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—

—না, বেশ্যার দান.........

—হুঁ,—বুঝলাম।

নতমস্তকে চন্দা ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন।—পরে সহসা মুখ তুলিয়া বলিলেন,—

—ঠিক বলেছো। আমি ঘৃণিতা বেশ্যা..........রূপ-যৌবন বিক্রয় করেই জীবন ধারন করে থাকি—তাই আমার ব্যবসা। কিন্তু বাস-ভবন বিক্রয় করে অর্থোপার্জ্জন—এমন সময় তো আজো আসেনি বন্ধু, যে তাই করতে হ'বে।

—তবে আমি ফিরে যাবো?

—কি উপায়? আমার দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলবো!

উত্তীয় ধীরে ধীরে দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। চন্দা সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। কিন্তু তাহার সোপান শ্রেণীতে অবতরণ করিবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে ডাকিয়া বলিলেন—

—শুনে যাও উত্তীয়—আর ক্ষণকাল অপেক্ষা করো—

উত্তীয় কাণ পাতিয়া শুনিলেন—পরে পূর্ব্বস্থানে গমন করিয়া করিয়া বলিলেন—

—বিক্রয় তো তুমি কর্ব্বেনা...তবে আর কেন?...কিন্তু ভেবে দ্যাখো চন্দা—বিনিময়ে তুমি লক্ষমুদ্রা একদিন পেতে।

মুহূর্ত্ত খানিক উত্তীয়ের মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া চন্দা মৃদু হাসিয়া বলিলেন—

—ঐশ্বর্য্যের মোহ কি আজো আমার আছে বন্ধু?

উত্তীয় কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন।

—তবে ডাক্‌লে কেন?—আশা যখন—

—হ্যাঁ আছে। শোনো, তোমার দর্শনীর মূল্য স্বরূপ বেসালির সেই বিলাস-ভবন তোমায় আমি আজ হতে দান করলাম্।

উত্তীয় বিস্মিত হইয়া চন্দার মুখের পানে চাহিলেন।

—আমার দর্শনী!

—হ্যাঁ, তোমার দর্শনী। আজ এই পতিতার গৃহে শুভ পদার্পণের জন্য তোমার ন্যায্য সম্মান।

—আশ্চর্য্য বটে!......কিন্তু এ দরিদ্রের ওপর তোমার এত অনুগ্রহ কিসের চন্দা?

—একদিন তাই ভাবতাম যে দরিদ্রের ওপর আবার কিসের অনুগ্রহ!.........কিন্তু সে গরিমা আমার ভেঙ্গে গেছে.........সে ক'বে জানো?

—না।

—একদিন গোপনে তুমি আমার পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করেছিলে......মনে পড়ে?

—হ্যাঁ পড়ে? সেদিন বসন্তোৎসব......শ্রেষ্ঠিপুত্রীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত পুষ্প চয়ন করিতে গিয়ে তোমার উদ্যান-রক্ষীর হাতে ধরা পড়ি। সে আমাকে তোমার নিকটে নিয়ে আসে।

—আমি সেদিন তোমায় দেখে চমকে উঠেছিলাম,—ভেবেছিলাম, এক সামান্য নাগরিক যুবকের এত রূপ। সেই মুহূর্ত্তে তোমাকে আহ্বান করে আমার প্রমোদ-কক্ষে নিয়ে আসি।......এই সে কক্ষ,—কিন্তু সেদিন ছিল বসন্তের সৌন্দর্য্য-সম্ভারে উজ্জ্বল......সদ্য ছিন্ন চম্পক-মল্লিকায়, বিচিত্র লতা-পত্রে কক্ষদেশ সমাচ্ছন্ন......আর আজ?...... বিশুষ্ক-দল-পদ্মের মতো শ্রী হীন, ক্লিন্ন।......যেখানে একদিন পরিপূর্ণ বাসনার উচ্ছল-উৎস ছুটেছিল,—আজ তা নৈরাশ্য-কল্পনায় মরু-ধূসর হ'য়ে উঠেছে।......কিন্তু কেন?...কেন

আমার এ নির্লিপ্ত ?...যদি রূপৈশ্বর্য্যের মোহই আমার থাকতো—না থাক্ সে কথা।......তারপর আমি তোমায় সযত্নে এই পালঙ্কে বসিয়ে দিই। মনে মনে ভাবি সার্থক আজ আমার বসন্তোৎসব।......সে কী উন্মাদনা! তোমার সৌন্দর্য্য পিপাসায় আমি তখন অধীর, উন্মত্ত। নিমেষে লালসার তীব্র লিপ্সা আমার সারা দেহে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে গেল —আমি সমস্ত ভুলে গেলাম।......মুহূর্ত্তে আমার উচ্ছ্বসিত যৌবন-পসরা নিয়ে তোমায়,আলিঙ্গন করতে উদ্যতা হ'লাম, —কিন্তু তুমি হেলায় প্রত্যাখান করলে,......স্পর্শ-সুখ-লালসায় স্তিমিত নয়নে গ্রীবা তুলে ধরলাম,—ঘৃণায় তুমি মুখ ফিরিয়ে নিলে। গৃহে যার অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী স্ত্রী, তাকেও চোখের ইঙ্গিতে হেলায় জয় করেছি।—আর সামান্য একটি দরিদ্র যুবক,—তারই কাছে সেদিন প্রত্যাখ্যাতা হ'লাম।......সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা চন্দার এমন অপমান!... মনে হতেই রোষে, ক্ষোভে আহতা ফণিনীর মত গর্জ্জে উঠে, সেই মুহূর্ত্তে তোমায় গৃহ হতে নিস্কাষণ করে দিলাম।...... কিন্তু মনে শান্তি পেলামনা। বিশ্বাস কর্ব্বে উত্তীয়...... সেই শুভ মুহূর্ত্তে আমি যেন এক নূতন মানুষ হয়ে গেলাম। —গত রজনীর অপমানের ব্যথা কোথায় সরে গেল।...... আমার সুপ্ত নারীত্বকে জাগিয়ে দিলে তুমি......সেইদিন হ'তে তোমায় আমি অন্তরের পূজা-মন্দিরে অভিষেক করলাম।......আমার ভেতরে কি আজ তার কোন লক্ষণ, কোন পরিবর্ত্তনই দেখ্‌তে পাচ্ছোনা তুমি ?

—হাঁ, পেয়েছি চন্দা। তারপরও তোমার সঙ্গে আমার যখন দ্বিতীয়বার দেখা হয়—রাজকুমারের সেই জন্মতিথি উৎসবে—তখনই দেখেছি।......তোমার সেই বিলাস-বসন, সেই মণি-দীপ্ত দেহাভরণ—সব তুমি পরিত্যাগ করেছো। আমি বুঝেছি সে আমারই জন্য। শুধু কি তাই ?......তুমি আমারই জন্য গোপনে অজস্র অর্থব্যয় করে রিক্তা হ'তে চলেছো। মনে আছে,—সেদিন নন্দশ্রেষ্ঠির উদ্যান হতে প্রত্যাবর্ত্তন-পথে সন্দেহে কোটাল হস্তে ধরা পড়ি। তুমি তখন নদীতে তরণী-বিহার করিতেছিলে। আমাদের সেই সামান্য গণ্ডগোল তোমার কর্ণগোচর হওয়াতে তুমি কৌতূহল-পরবশ হয়ে তৎক্ষণাৎ তরণী তট-সংলগ্ন করে একজন অনুচরকে ঘটনা জানতে প্রেরণ করো। পরে তার মুখে আমার সংবাদ পেয়ে সেই নিশীথেই অগণিত মুদ্রাসহ তোমার গৃহরক্ষীকে কোটাল-সমীপে যেতে আদেশ করে ছিলে। সেই উৎকোচ ফলে আমি নিদারুণ অপমান হতে রক্ষা পাই।......তারপর আজ রাজপ্রাসাদে এই যে আমার অবারিত-দ্বার,—সে কার চোখের ইঙ্গিতে ?...... আমি জানি চন্দা, তার মূলে তোমার অপরূপ রূপ-লাবণ্য ও অপরিমিত অর্থবল। তুমি অস্বীকার করতে পার্ব্বে না—

—কিন্তু স্বীকার করেই কি লাভ আছে কিছু ?

—আছে বৈকি,—তোমার লাভ, তুমি-আজ স্পষ্ট করে জানলে—আমি অকৃতজ্ঞ। এ কি তোমার কম লাভ—কম সান্ত্বনা। নইলে.........

—সান্ত্বনা! ঠিক বলেছো।......কিন্তু সে সান্ত্বনা তোমার অকৃতজ্ঞতা ভেবে নয়। সান্ত্বনা আমার—যে আমি তোমার সামান্য উপকার করতে পেরেছি। এই টুকুই আমার পরম সৌভাগ্য—নইলে যার জন্য আজ বিলাস-বাসনা ত্যাগ করতে বসেছি,......যার জন্য চন্দার সৌন্দর্য্য-পিয়াসী অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ধন-কুবেরগণকে ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছি,......যার স্মৃতি-পূজা করে নিজের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা নির্ব্বাণ করেছি,—তার জন্য আমি কি-না করতে পারি যদি সে তা' গ্রহণ করে!

—একজন দরিদ্রের ওপর এত তোমার অনুরাগ—এতখানি তার গভীরতা। সত্যি চন্দা, পূর্ব্বে তা' কোনদিনই ভাবিনি—আজই প্রথম প্রত্যক্ষ কর্‌ছি।

—তবু আমি ঘৃণিতা নারী—তোমার স্পর্শলাভের যোগ্যা নই!

চন্দার এই শ্লেষ এবং অভিমানের কথা উত্তীয়ের প্রাণে আঘাত করিল। ক্ষণকাল তিনি চিন্তান্বিত থাকিয়া পরে ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন—

—অবশ্য সতীত্বের গর্ব্ব বলে তোমার কিছুই নেই কিন্তু তোমার মনুষ্যত্বের—তোমার নারীত্বের যে মর্য্যাদা, সে তো তুচ্ছ নয় চন্দা।......আমাকে ক্ষমা ক'রো তুমি—তোমার এই একনিষ্ঠ প্রেমের প্রতিদানে আমি তোমায় অনেকদিনই

অপমান করেছি,—আমার সে অপরাধ ভুলে গিয়ে-বলো-আমায় তুমি ক্ষমা কর্ব্বে ?

উত্তীয় আগ্রহে তাহার হস্তধারণ করিতেই চন্দা তাহার পদতলে উপবেশন করিয়া বলিলেন—

—উত্তীয়, প্রিয়তম—আমি সামান্যা নারী···তোমাকে ক্ষমা করতে পারি এমন কি শক্তি আছে আমার ?······আজ আমি ধন্যা,—কৃতার্থ আমার জীবন।

—জানিনে চন্দা, পুরুষ একসঙ্গে তার দুই অনুরাগিণীকে ভালো বাসতে পারে কি না !······কিন্তু যদি পারতো, তবে বোধ হয়—

চন্দা বসিয়াছিলেন—সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া উত্তীয়ের একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—

—বলো উত্তীয়—থামলে কেন ?···তবে বোধ হয় কি ?

—সে সুখী হইতেই পারতো······অনুশোচনার জ্বালা এমন করে আর সইতে হ'ত না।······বলো চন্দা, আমার কাছে যদি তোমার কিছু কাম্য থাকে—

—কাম্য—হ্যাঁ, একটী আছে বটে।

—বলো, কি সে ?—আমি যথাসাধ্য পূর্ণ করতে চেষ্টা কর্ব্বো।

চন্দা কি একটা কথা বলিতে গেলেন কিন্তু পারিলেন না। তাহার ওষ্ঠ কাঁপিয়া গেল—ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল। তিনি মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন।

উত্তীয় বিস্ময়াকুল কণ্ঠে বলিলেন,—

—সে কি চন্দা !—সে কথা বলতে তোমার সঙ্কোচ কিসের ?

বলিতে গিয়া প্রথমে চন্দা ইতস্ততঃ করিলেন, পরে সহসা অতি পরিষ্কার কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—

—তাইতো, কিসের সঙ্কোচ ?···শোন উত্তীয়, শুধু একবার আমাকে তোমার আলিঙ্গন-স্পর্শে ধন্যা হ'তে দিয়ো, এই আমার জীবনের এক মাত্র কামনা···আমি শুধু দেখ্‌তে চাই, তুমি ঘৃণা করে——

—বুঝেছি চন্দা, বেশ, তাই হবে। আগামী নবমী তিথিতে আমরা বেসালি যাত্রা কর্ব্বো। সেই বিলাস ভবনে তোমাকেও আমি আমন্ত্রণ করছি।

—কিন্তু শ্রেষ্ঠিকুমারী তোমার সঙ্গিনী,—সে প্রমোদ-ভবনে আমাকে এমন কি প্রয়োজন ?

—প্রয়োজন আছে বৈকি।

উত্তীয় মনে মনে বলিলেন,—দেখাতে চাই তাকে—কি এমন সে নারী,—যার গর্ব্বে আমাকে সে উপেক্ষা করে ······আমার দারিদ্র্যকে বিদ্রূপ করে চলে। বোঝাতে চাই তাকে—আমার অধিকারে যে প্রাসাদ, তা' সমস্ত শ্রাবস্তী নগরেও দুর্ল্লভ······আর—আর জানাতে চাই তাকে—সমস্ত পৃথিবী যাকে কামনা করে,—সেই রূপসী-শ্রেষ্ঠা যৌবন-মত্তা চন্দা আমার অনুগ্রহ লাভে লালায়িতা।······তার সৌন্দর্য্য, তার গরিমা, তার মর্য্যাদাভিমান কৌশলে খর্ব্ব করে আমি তার নূতনরূপ দেখতে চাই। সকল রূপে তাকে জানিয়ে দিতে চাই—উত্তীয় তার চেয়ে হীন নয়।

—কি ভাবছো ?

—ভাব্‌ছি যা'—তার প্রত্যক্ষরূপ তুমি বেসালির মর্ম্মর প্রাসাদেই দেখ্‌তে পাবে।······এর ভেতরেই দিবালোক ম্লান হয়ে এলো—তবে এখন আসি চন্দা।—যত শীঘ্র পারো, তুমি বেসালি-যাত্রার উদ্যোগ ক'রো।

উত্তীয় কক্ষ হ'তে বহির্গত হইলেন। তাহার পশ্চাতে সন্ধ্যাপ্রদীপ হস্তে চন্দা দ্বার পর্য্যন্ত অনুসরণ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

রচনা প্রতিযোগিতা

সামান্য দরিদ্র অবস্থা থেকে মানুষ কেমন করে অধ্যবসায়ের বলে জগতে খ্যাতিলাভ করতে পারে এমনি কর্ম্মবীরের জীবনকথা বড়গল্প অথবা উপন্যাসের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে হবে। পয়লা চৈত্রের মধ্যে রচনা ধূপছায়ার সম্পাদকের কাছে পৌছান চাই। যাঁর লেখা ভাল হবে তাঁকে আমাদের অন্যতম পরিচালক শ্রীপ্রণবদেব মুখোপাধ্যায় একটী স্বর্ণপদক পুরস্কার দিবেন।

নীলকণ্ঠ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নলিন কলেজে ডাক্তারী চাকরী পাইয়াছে। তাছাড়া মাঝে মাঝে দুচারজন লোকের বাড়ীতেও তাহার ডাক আসে।

নিজের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া সে সুলতার কথা ভাবিতে লাগিল। যখনই সে সুলতাকে দেখে তার আপনার দেহের শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ খেলিয়া যায়। যতই ভাবে, সুলতার চিন্তা যেন একটা নেশার মত তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে থাকে। হয়ত সুলতা তাহার এই ক্ষুধিত প্রাণের আকাঙ্খার কথা কিছু জানে না, অথবা পাষাণীর মত সব বুঝিয়াও সে মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে প্রতিদানে একবিন্দু করুণাদানেও এই মরুতৃষা শীতল করিবে না—কোন মীমাংসাই নলিনের মনে জাগে নাই। নলিন ভয়ে সন্তর্পণে চোরের মত লুকাইয়া, সুলতার রূপচ্ছবি যতটুকু পায় দেখে,—যতটুকু কথা শুনিতে পায় তাহারই জন্য উদ্গ্রীব হইয়া থাকে। কোন দিন নলিন আহারের পর দুপুরবেলা আপনার পড়িবার ঘরে বসিয়া ডাক্তারী মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাইতেছে, সুলতা নিঃশব্দে আসিয়া তাহার টেবিলের উপর পান ও জল রাখিয়া চলিয়া গেল, যাবার সময় তাহার চুড়ির রিণিঝিণি নলিনের শ্রবণকুহরে অপূর্ব্ব শব্দ তরঙ্গ' সৃষ্টি করিল। নলিন চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। দুয়ার অতিক্রম করিয়া সুলতা চলিয়া যাইবার সময় তাহার শাড়ীর পিছনের খানিকটা শুধু চকিতের মত দেখা গেল। হয়ত আবার কোনও দিন 'নন্দন কানন' অথবা গড়ের মাঠ হইতে বেড়াইয়া একটু সকাল সকাল বাড়ী ফিরিতেছিল,—সুলতা তখন তাহার বিছানা ও পড়িবার টেবিল গুছাইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতেছিল, নলিনের উপস্থিতি সে লক্ষ্য করে নাই,—নলিন কয়েকমুহূর্ত্ত পিছন হইতে চুরি করিয়া তাহার যৌবনোজ্জ্বল রূপটুকু ভাল করিয়া দেখিয়া লইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। এই রকম করিয়া সুলতা তাহার নিজের অজ্ঞাতসারে নলিনের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া ফেলিল।

একদিন রাত্রে সুলতা ছাদে দিনের বেলায় শুকাবার জন্য রেখে আসা কাপড় তুলিতে গিয়াছিল। নলিনের মা সেদিন অসুস্থ ছিলেন বলিয়া তাড়াতাড়ি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। নলিন চোরের মত ধীরে ধীরে সুলতার পশ্চাৎ অনুধাবন করিল। সুলতা তাহাকে হঠাৎ দেখিয়া ভীত হইয়াছিল। নলিন কাতর হইয়া বলিল "গোল কর'না সুলতা। তোমার ভয় পাবার কোন কারণ নেই। আমি তোমায় ক'দিন ধরে একটা কথা বলব বলে অবসর খুঁজে বেড়াচ্ছি। তুমি তা শুনে আমায় উত্তর দিতে হয় দিও না হয় চলে যেও।"

সুলতা স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

নলিন বলিতে লাগিল "সুলতা! আমি সেকথা তোমায় না বলতে পেরে প্রাণে মরে যাচ্ছি বুঝতে পারছনা কি তুমি? তুমি—পাষাণীর মত এত দূরে কেন থাক? আমি তোমায় আরও কাছে আমার অন্তরের মাঝখানে পেতে চাই কেন তুমি ধরা দেবে না? আমি তোমায় ভালবাসি। তোমায় বিবাহ করে সুখী হতে চাই। তুমি কি তোমার বুকের মাঝে আমার আকুল বেদনার প্রতিধ্বনি বুঝতে পারছ না? তুমি কি এতই নিষ্ঠুর?"

সুলতা কি সত্যই সেই বেদনা বুঝিতেছে না? তা নয়! নলিনের কথা শুনিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। কি করিয়া সে বুঝাইবে তাহারও বুকে এমনি গভীর ব্যথা গুমরাইয়া মরিতেছে। সুলতা ভাল করিয়া বুঝিয়াছে—সে নারী! যৌবনের রাজ্যে সে আজ রাণী। মলয় তাহাকেই চন্দনের পাখা দিয়া বাতাস করে যায়। নীল আকাশের তারা তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকে। বসন্তের পাখী তাহারই গান গেয়ে বেড়ায়। রাণী সে। তাহারই রাজটীকা পরাইবার জন্য মদন সম্মুখে দাঁড়াইয়া।

কিন্তু তবু ত সে ভুলিতে পারে না——সে বিধবা। প্রেম বা ভালবাসায় তাহার কোন অধিকার নেই। বুঝি বা সে প্রতারণা করিয়াই এই রাণীর আসন দখল করিতে চায়!

সুলতা বলিল "শুনবে তুমি? সব আজ বলব। সমস্ত শুনেও কি তুমি আমায় ভালবাসতে পারবে?"

নলিন ব্যগ্র হইয়া বলিল "বল সুলতা! বল! বল, কি তুমি বলতে চাও!"

সুলতা বলিল "তুমি জান না—আমি·········বিধবা!"

"বিধবা·········?"

'সত্য! তাই! কেন, সে কথা এতদিন জানাতে পারিনি, সব বললে তুমি বিশ্বাস করবে। এর পরেও কি তুমি আমায় ভালবাসতে পারবে?'

সুলতা তাহার জীবনের বিষাদময় কাহিনী এক এক করিয়া সমস্ত জানাইল।

নলিন খানিকক্ষণ চুপ করিয়া মাথা নত করিয়া ভাবিতে লাগিল। পরে বলিল, "সুলতা!"

সুলতা বলিল "বল যা বলবে। আমার যা বলবার জানিয়েছি। ঘৃণা করতে চাও কিম্বা তাড়িয়ে দেবে—বল—!"

"সুলতা—আজ সব জেনে, সব শুনে আমি তোমায় ডাকছি। আজ·········!"

সুলতা অশ্রুরুদ্ধস্বরে বলিল "পারবে নলিন দা?··· ····· বিশ্বের যত লাঞ্ছনা মাথা পেতে নিয়ে·········পারবে?"

"পারব সুলতা! দেবতা সাক্ষী করে আজ তোমায় আমায় বাহুর ডোরে নিবিড় বাঁধনে বাঁধতে চাই। তুমি আমার লাঞ্ছনা নও। বিধাতার দান বলেই তোমায় মাথা পেতে নিচ্ছি।"

"মাকে কি বলে বোঝাবে?"

নলিন কুণ্ঠিত হইয়া বলিল "এইটুকু তোমাকে স্বীকার করতে হবে। আমি বলছি যে একথা কখনো মাকে জানতে দেব না। তিনি শুনলে কিছুতেই মত দেবেন না। ······রাজী নও তুমি?"

"না!!!"

সুলতার কণ্ঠস্বরে নলিন চমকিয়া উঠিল। বলিল "মায়ের তিরস্কার সইতে পারব না। অথচ······তুমি নিষ্ঠুর হলে···"

নলিন কথা শেষ করিতে পারিল না। রুদ্ধ আবেগে তাহার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করিয়া রহিল।

চারিদিকের গম্ভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কোথায় যেন কোনও পাখীর বাসায় হঠাৎ শাবকদিগের মৃদু কলরোল শোনা গেল।

নলিন বলিল "তোমাকে আমি চাই। এর জন্য মায়ের তিরস্কার—তাও না হয় সইব। কিন্তু······কি তোমার স্বার্থ সুলতা! মায়ের কাছ থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করে—মায়ের বুকে অমোঘ ব্যথা জাগিয়ে—আমাদের সুখ স্বচ্ছন্দ শান্তি ভেঙে দিয়ে—কোন্ অভীষ্ট লাভ হবে?······তার চেয়ে এই ভাল নয়? তোমার ইতিহাস তৃতীয় ব্যক্তি কেহ কখনো জানিবে না। মা তোমাকে আদর করে বরণ করে নেবেন! অতীতের স্মৃতি সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে······তুমি······ এই ভাল নয়? বল সুলতা—এই ভাল নয়?"

"তা হয় না!"

"তবে ···তোমার জন্য মাকে ভুলব। তবু······ আবার মিনতি করে বলছি। একবার ভেবে দেখ। আমাদের এই মিলন যদি মায়ের অভিশাপ বুক পেতে নেয়—সইতে পারব না। একদিন বুঝবে—জ্বলবে—সুখী হবে না—! সত্যের অচল আসনে দাঁড়িয়ে—ও রকম নিষ্ঠুর হয়ে চাইলে হবে না। মানুষ আমরা। মানুষের পৃথিবীতে নেবে এস।"

"তা হয় না—নলিন দা! মিথ্যাকে সত্য বলে প্রশ্রয় দিলে যে সুখের কল্পনা তুমি করছ এক ফুৎকারে সব নষ্ট হয়ে যাবে। অন্যায়ের কখন জয় হয় না। আজ মাকে যদি ছলনা করি, কাল কিম্বা দুদিন পরে যখন তিনি জানতে পারবেন······?

"সেদিনের কথা ভেবে আজ কেন কষ্ট পাই? আর যদিই তিনি জানেন আমাকে তুমি বিশ্বাস কর আমি সেদিন সকল শাস্তি ও লাঞ্ছনা স্বীকার করব।"

সুলতা নিরুত্তর, দেখিয়া নলিন আবার বলিল "তা হয় না সুলতা?······"

"না······! পারব না!" এই বলিয়া সুলতা মুখ ফিরাইয়া লইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া অবশেষে ঘৃণা ভরে বলিল "এর চেয়ে মৃত্যু ভাল।"

তাহার সত্যনিষ্ঠ পিতার অন্তিম আশীর্ব্বাদের কথা মনে পড়িল—। যত প্রলোভনই থাক সত্য কখনো ত্যাগ করিবে না!

নলিন বলিল "বেশ তাই হবে !……আমাদের মিলনের পথে পৃথিবীর ও মায়ের অভিশাপ একমাত্র পাথেয় হোক। ভগবান করুন আমরা যেন সইতে পারি।"

—বার—

"কি বলছিস নলিন—তুই সুলতাকে বিয়ে করবি ?"

নলিন বলিল 'হাঁ মা ! সে সব কথা যখন প্রকাশ করে বলল, আমি সমস্ত জেনে তাকে স্বীকার করিছি—"

"নলিন ?"

"মা ! আমি তোমার অবাধ্য হয়েছি ! আমি বংশের কুলাঙ্গার। হয়ত আমার অপরাধ এত বেশী যার জন্য তুমি কিম্বা বিধাতা কেহই আমাকে ক্ষমা করবে না। সমস্তই জানি। তবু মা, আমি বিরত হব না। তুমি অভিশাপ দেবে আমি তা মাথা পেতে নেব। তুমি ঘৃণা করবে—মুখ ফিরিয়ে নেবে—আমি তাও সইব।……"

"পাগল হস নি নলিন। সব শুনে আমি সুলতাকে ঘরে স্থান দেব না ভাবছিস্—সে ভয় করিস নি। আমি তাকে আমার কাছটীতে লুকিয়ে রাখব। তোরা অবুঝ হয়েছিস্—কিন্তু আমি—তোদের মা !—আমি তোদের অধঃপাতে যেতে দেব না। তুই যেখানেই থাকিস্ তার সঙ্গে কথা কইতে পাবি না !……"

"মা বলেছি ত আমি—আমি তা পারব না। সুলতাকে না পেলে আমি মরে যাব !"

"মরবার ভয়ে অশাস্ত্রীয় কাজ করবি ? মায়ের অবাধ্য হয়ে বেঁচে থাকতে চাস ? নিজে না মরে মাকে মারবি ?"

"মা !……সত্যিই তুমি নিষ্ঠুর। বেশ ! তোমার কথাই শুনব। আমি মরে গিয়ে ও মৃত্যুর পরে তাকে পাবার সাধনা করব ! তুমি জান না মা তোমার লাঞ্ছনা সহেও কত দুঃখে আমি সুলতাকে গ্রহণ করতে চেয়েছিলুম ! সুলতা আমাকে পাগল করেছে ! তাকে যখন বললুম—তোমাকে জানতে দেব না যে সে বিধবা—সে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে বলেছিল এর চেয়ে মৃত্যু ভাল ! মাকে প্রতারণা করে সে স্বর্গও চায় না। সে বলেছিল সব জেনে সব লাঞ্ছনা—সহে যদি আমি তাকে গ্রহণ করতে চাই, তবেই সে ধরা দেবে। যার বুকে এত তেজ মা, সে যাই হোক আমি তাকে দেবতার চেয়ে কম মনে করি না।"

"কিছুতেই শুনবি না ?"

"মা ! তবে চলে যাই ! তোমার আদেশে মৃত্যু বেছে নিলুম। তোমায় কত কষ্ট দিয়েছি, যদি পার ভুলে যেও। পাষাণী হলেও যদি কোন দিন তোমার চোখ থেকে অভিশাপের বদলে ক্ষমার অশ্রু ঝরে' নরক বা যেখানেই থাকি মনে করব স্বর্গের চেয়েও সুখে আছি।

"দাঁড়াও নলিন ! আমি তোমার মৃত্যু চেয়েছি এই কথা বারবার বলে আর আমায় দগ্ধ করিস নি। মায়ের জ্বালা কত তা তোরা বুঝিস্ না। আমায় একটু ভাবতে সময় দে। আমি কিছুই ঠিক করতে পারছি না কি বলব। সমস্ত পৃথিবী যেন আমার চোখের সামনে ঘুরছে।…"

সারদা সুলতাকে ডাকিলেন।

"মুখ নীচু করে থেক না মা। আমি তোমার সমস্ত কথা শুনেছি। তোমার নিজের কোন দোষ নেই। বরং নলিনের কাছে সব খুলে বলে সুবুদ্ধির কাজ করেছ। তোমার এই সরল সত্যনিষ্ঠার জন্য আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করছি। ……নলিন। তোদের এই মিলনে আমি আর অমত করব না। ভগবান তোদের সুখে রাখুন। আমি তোদের মা—তোদের ইচ্ছায় বাধা দেব না। তোরা সুখে থাক এই আমি চাই। তোদের সুখের জন্যই আমি তোদের বিচ্ছেদ সইব। আমার কাছে আমার ধর্ম্ম আমার বংশমর্য্যাদা আমার শাস্ত্র খুবই বড়। কিন্তু তাদের চেয়েও বড় আমার ছেলের সুখ !……"

সুলতা ও নলিন সারদাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় দিল।

সারদা বলিলেন "কিন্তু……তোদের মঙ্গল আমার কাছে সব চেয়ে প্রিয় হলেও—আমি আমার ধর্ম্মকে ক্ষুণ্ণ করতে পারব না। আমার স্বামীর পিতৃপুরুষের ধর্ম্ম নষ্ট করতে পারব না। আমার স্বামীর বংশ গৌরব অবহেলা করিবার অধিকার আমার নেই।……"

নলিন বলিল "কি বলছ মা ?"

সারদা বলিলেন "আমি আমাদের দেশের বাড়ীতে ফিরে

চললুম। সেখানে আমার স্বামীর ভিটায় আমি তোদের বরণ করে ঘরে নিতে পারব না। তোরা মাঝে মাঝে আমার কথা মনে করিস!......’,

নলিন রুদ্ধস্বরে বলিল “মা!”

“না—নলিন। এর অন্যথা হয় না। আর কোন উপায় নেই। আমি নিত্যদিন ভগবানের কাছে তোদের মঙ্গল প্রার্থনা করব। যদি কখনো কালীঘাটে ৺মাকে দর্শনের জন্য আসি, তোদের একবারটী দেখে যাব। ভগবান করুন তোদের না দেখে থাকার কষ্ট আমাকে বেশী দিন সইতে না হয়।”

সারদার অপর ছেলে দুটী নলিনের কাছেই রহিল। দেশে গেলে তাদের পড়াশোনার বিস্তর অসুবিধা এইজন্য তিনি আপত্তি করিলেন না। একমাত্র কন্যা প্রতিভার হাত ধরিয়া তিনি দেশে চলিয়া গেলেন।

নলিন বলিল “বিবাহের জন্য মাকে ছাড়তে হল। ধর্ম্মকেও ছাড়তে হবে। হিন্দুধর্ম্ম আমাদের এই মিলনে অনুমতি দেবে না।”

সুলতা বলিল “ধর্ম্ম অনুমতি দেবে না নয়। বরং বলতে হবে সমাজ আমাদের চায় না। ধর্ম্ম শুধু কতকগুলা আচার নিয়েই পর্য্যাপ্ত নয়। সমাজ আমাদের না চাইলেও আমরা ধর্ম্ম ছাড়ব না।”

নলিন বলিল “তা কেমন করে হয়?—আমরা ধর্ম্ম না ছাড়লেও,—কোন পুরোহিত ত আমাদের বিবাহে মন্ত্র পড়বে না।”

সুলতা বলিল “তাতেই বা ক্ষতি কি? আমাদের মিলনে মায়ের আশীর্ব্বাদ পেয়েছি এটা আমাদের কম লাভ নয়। তাছাড়া আমরা যতদিন সত্যের মর্য্যাদা রেখে চলব—যতদিন ন্যায় অন্যায় বিচার করে ভগবানে ভক্তি অচলা রেখে সোজা পথে চলব—তিনিও আমাদের মায়ের মতই আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করবেন। আমাদের মায়ের মত তিনিও আমাদের প্রাণের সত্য অনুভব করবেন। আমাদের ভালবাসার মিলন তাঁর চোখের দৃষ্টিতে পবিত্র হবে। সর্ব্বংসহা পৃথিবী আমাদের বুকে করে নেবেন।......”

নলিন বলিল “লোকাচার আমরা না হয় নাই মানলুম। কিন্তু আমাদের সন্তান—যদি কখনো হয়—তাকে লোকের অবজ্ঞা থেকে বাঁচাবার জন্য—কোন একটা অনুষ্ঠান করা দরকার নয় কি?”

সুলতা বলিল “মিথ্যা অনুষ্ঠানের সার্থকতা কি? সন্তান যদি মানুষ হয়—ধর্ম্ম ও সত্যের অমর্য্যাদা কোন দিন না করে—মানুষের তার বাড়া পরিচয় কিছু দরকার নেই। সে যদি জগতের কাছে বুক ফুলিয়ে বলতে পারে—সে মানুষ—সে ভগবানের আশীর্ব্বাদের মাঝে জন্ম নিয়েছে—সেই টুকুই তার যথেষ্ট!”

সুলতার কথার অর্থ নলিন বুঝিল। অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সে প্রশংসমান নেত্রে সুলতার দিকে চাহিল। ভাবিল এতটুকু বয়সে ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের এমন সুন্দর তত্ত্বজ্ঞান সে কেমন করিয়া শিখিল? সে যা বলিতেছে—ইহা যদি সত্যি না হয়—জগতে সত্য বলিয়া আর কিছু নেই। নলিন সম্পূর্ণ সম্মতি দিল।

তাহাদের বিবাহ হইয়া গেল। শালগ্রাম সামনে সাক্ষী করিয়া নিজেরাই পুঁথি হইতে মন্ত্র পড়িল। ব্রাহ্মণ পুরোহিত কেহ আসিলেন না। অবশ্য কোনও আচার বা অনুষ্ঠান করা হইল না। শাঁখও বাজিল না। প্রেমের দেবতা নিজে পুরোহিতের আসনে বসিয়া সত্যের নির্ম্মল বাঁধনে তাহাদের দুইটী হৃদয়কে মিলাইয়া দিল।

—তের—

বিলাতে বছর খানেক থাকিয়া একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে আগে কোনও খবর না দিয়াই গোপাল দেশে ফিরিল। বলা বাহুল্য বারিষ্টারী বা আই সি এস কিছুই পড়া তার ঘটে নাই। নূতন দেশে নূতন বন্ধু ও বান্ধবী অনেক জুটিলেও সে মনঃস্থির করিতে পারে নাই। তাহার মনে হইত সব ফাঁকা। নীরজার চিঠি,—তার আকুল ভাষা—তাহাকে সর্ব্বদা চঞ্চল করিত। সে প্রাণ ও মন দিয়া অনুভব করিয়াছিল নীরজাকে ভালবাসে। নীরজা পরস্ত্রী তবু তাহার কথা চিন্তা করিতে, ও তাহার স্বপ্নে বিভোর হইতে তাহার বড় আনন্দ হইত। কখনও বা মনে হইত এরকম চিন্তা করা পাপ। গোপাল এই পাপের জন্য যে কোনও

শাস্তি সহিতে প্রস্তুত ছিল। নীরজার চিঠিতে সে বুঝিত—নীরজাও তাহাকে ভাল বাসে। এক বছরের অদর্শনে নীরজা তাহারই মত ব্যথিত। নীরজাকে দর্শন করিবার আকর্ষণ তাহাকে দেশে ফিরাইয়া লইয়া গেল।

পিতার জন্যও তাহার নিষ্ঠুর অন্তঃকরণের এক কোণে হয়ত একটু মমতা তখনো ছিল। তিনি কেমন আছেন দেখিবার জন্য গোপাল সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার কাছে গিয়াছিল। বৃন্দাবন তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। সেখানে সমাজ লইয়া কিছু গোলমাল উঠিলে বৃন্দাবন পরিতোষের সহিত ব্রাহ্মণ বিদায় ও যাগযজ্ঞ এবং প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানাদি করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিলেন। গোপাল দিন পনের বাড়ীতে থাকিয়াই তিক্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। নীরজাকে দেখিবার জন্য সে ছটফট করিতেছিল। তাছাড়া এই এক বছরের মধ্যে দিন যাপনের যে ধারাটী তাহার অভ্যাস হইয়াছে পল্লীগ্রামে তদনুসারে চলা বিশেষ সুবিধা জনক নয়। সে পিতাকে বলিল কিছুদিন কলিকাতায় গিয়া থাকিবে। পুত্রের ঘরে থাকিতে নিতান্ত আপত্তি দেখিয়া বৃন্দাবন ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন কিন্তু তার ইচ্ছায় বাধা দেন নাই। বলিলেন প্রতি শনিবার একটীবার করে তোকে বাড়ীতে এসে থাকতে হবে। বুড়ো বাপ বাঁচে কি মরে একটু খোঁজ রাখিস।"

গোপাল স্বীকার করিয়া গেল আসিবে। সে প্রথম দু এক সপ্তাহ কথা শুনিয়াছিল। শেষে বাড়ী আসা দূরে থাকুক—চিঠি লেখা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিল। দুমাস ছমাসে হয়ত বা কোনও দিন তার অনুগ্রহ হয়, একদিন সকালে আসিয়া বিকালের মধ্যেই চলিয়া যায়। বৃন্দাবন ভয় দেখালেন মাসিক টাকা আর পাঠাইবেন না। ইহাতে সে জবাব দিল না। হাজার অবাধ্য হলেও মোহ বশে স্নেহের দুর্ব্বলতায় তিনি টাকা না পাঠিয়ে থাকিতে পারিলেন না। আহা! না খাইতে পাইয়া মরিবে? সে আসিতে যদি নাই চায়—কি আর করিবেন? তাঁর অদৃষ্ট! বুড়ো বয়সে শেষের দিন কটা সুখে স্বচ্ছন্দে ছেলে ও বউ লইয়া, অতিবাহিত করিবেন,——তা তাঁর অদৃষ্ট নাই, কি হবে!

গোপাল কলিকাতায় আসিয়া সুরথ ও নীরজার সহিত দেখা করিতে শীঘ্র গেল। দেখিল নীরজা রোগে জীর্ণ হইয়া এত বিবর্ণ হইয়াছে যে আর যেন চেনা যায় না। তাহার পূর্ব্বের শ্রী আর কিছু ছিল না। সুরথের শরীরেও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন দেখিল। গোপালকে দেখিয়া সে ভাল করিয়া কথা কহিল না। বন্ধুকে এত দিন পরে কাছে পাইয়া সে একবার জোর করিয়া হাসিতে চাহিল। তাহার শীর্ণ অধরোষ্ঠে সে ভাণ করা হাসি মুহূর্ত্তেই মিলাইয়া গেল। লক্ষ্য করিল সুরথ তাহার কাছ হইতে আপনার বুকের ক্ষত লুকাইয়া রাখিতে চায়। গোপাল কিছু বুঝিতে পারিল না। আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিল এমন কি ব্যাপার ঘটিল যাহার জন্য বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারে না?

প্রশ্নের সমাধানের জন্য গোপাল নীরজার দিকে চাহিল। সেও ত আর হাসিতে পারে না। কেন? গোপাল আসাতে সে কি তবে সুখী হয় নাই? সেই অটুট স্বাস্থ্য—অনাবিল শান্তি অতুল সৌন্দর্য্য কে হরণ করিল? কেন সে আজ তেমনি করিয়া স্নেহ ও ভালবাসার সহিত তাহাকে কাছে ডাকিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছে?

নীরজাকে জিজ্ঞাসা করিল "এত অসুখ তোমার বৌদি আমায় একটীবারও লেখনিত?"

নীরজা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল "নিত্য অসুখ লিখে কেবল ভাবনা বাড়ানো বই ত নয়! যাক্, তুমি ভাল আছ?"

"ভাল আছি বৈকি!.........কিন্তু আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না বৌদি!—কেন এমন হলো?"

"ঠাকুরপো! মাথাটা একটু টিপে দাও ত! আঃ তোমার হাত বেশ ঠাণ্ডা। আমি উঠতে পারছি না—সুভাষ কোথায় গেল—একবার ডাক না! তোমার জন্য চা গরম করে দেবে!"

সুভাষ কাছেই বসিয়াছিল। দিদির কথা মত চা করিতে গেল।

"একটা কথা বলব ঠাকুরপো?"

"বল—কি জানতে চাও?"

"চিঠিতে যেমন লিখতে—সত্যিই কি আমার জন্ম তোমার তেমনি মন কেমন করত ?"

"মিথ্যা বলবনা বৌদি। যদি কারও জন্ম সেখানে থাকতে না পেরে ছুটে এসে থাকি ত'—সে তুমি! তোমার স্নেহ—তোমার আশীর্ব্বাদ——আমার এক গৌরব !"

"ভালবাসা জিনিষটা কি বলতে পার তুমি ? কেন একজনকে না দুদিন দেখলে প্রাণ এমন উচাটন হয় ?"

বাহিরের ঘরে সুরথ এতক্ষণ বসিয়া কি একখানা চিঠি লিখিতেছিল। ডাক বাক্সে ফেলিয়া দিয়া সে নীরজার কাছে আসিল। নীরজার শেষের কটা কথা সে শুনিয়াছিল। নীরজার দিকে চাহিল—সে স্থির শান্ত। তাহার পাণ্ডুর মুখে চঞ্চলতার চিহ্নমাত্র নেই।

গোপাল উত্তর দিল জানি না বৌদি! হয়ত—এ এক কোন মায়া, যার প্রভাবে বন্ধু বন্ধুর অভাবে, পিতা পুত্রের অদর্শনে, স্বামী স্ত্রীর বিচ্ছেদে এত কাতর হয় যে সমস্ত পৃথিবী তাদের কাছে শূন্য বলে মনে হয়। আশ্চর্য্য এই মায়ার প্রভাব। দেখনিকি বাছুর হওয়ার পর মায়ের প্রাণ সন্তানের জন্ম—কাতর হইয়া কতনা ছটফট করিতে থাকি। যতক্ষণ হয় নাই এই ভালবাসা তার কোথায় ছিল ? অথচ এক মুহূর্ত্তে কি আশ্চর্য্য মোহেই না সে চঞ্চল হয়ে পড়ে! মানুষের মধ্যেও তেমনি। স্নেহ ভক্তি প্রেম ভালবাসা মনে হয় এই মায়ারই রূপান্তর।"

সুরথকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া নীরজা বলিল "এই বিছানার উপর আমার সামনে এসে বস—না হয়—"

সুরথ একটা চেয়ার টানিয়া আনিয়া তাহাদের কাছে বসিল। সে এই রকম গভীর হইয়া চুপ করিয়া রহিয়াছে দেখিয়া যদি নীরজা কিছু মনে করে এই জন্য সে হেসে গোপালকে ঠাট্টা করিয়া বলিল "ভালবাসার লেকচার ঝাড়ছিস্! প্রেমে পড়েছিস্ বুঝি? কোনও—শ্বেতাঙ্গিনী—ষোড়শী—সুন্দরী—

গোপাল হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল "যাক্—বাঁচলুম এতক্ষণে; তোমার ভাবগতিক দেখে আমি ত অবাক্ হয়ে গিয়েছিলুম—না জানি কি দোষ করেছি। ভাল করে কথাই কইছিলে না। তবু হেসে ঠাট্টা করলে—মনটা অনেক হাল্কা হয়ে গেল।"

কয়েকদিনের মধ্যে নীরজা সুস্থ হইল। কিন্তু গোপাল যতক্ষণ তাহার কাছে আসে সে আর তেমন করিয়া কথা কয় না। গোপালের সান্নিধ্য এড়াইবার জন্য সে নিয়ত চেষ্টা করে। গোপাল আসিলে সুরথও কেবল পালাবার সুযোগ দেখে। তাহাদের এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনে গোপাল শঙ্কিত হইল। সেও তারপর হইতে আর ইচ্ছা করিয়াই নীরজাদের দেখিতে যাইত না। সে না গেলে নীরজার ভৃত্য আসিয়া—তাহার অসুখ হইয়াছে কিনা, কেন সে যায় না,—সেদিন যাইবার সুবিধা হইবে কিনা—এই সব কথা জিজ্ঞাসা করিয়া যায়। গোপাল না যাইলে নীরজা কাতর হয় ইহা বুঝিতে পারিল কিন্তু আবার গেলেও সে সঙ্কোচ বোধ করে। গোপাল আকাশ পাতাল ভাবিয়াও কারণ বুঝিতে পারিল না!

—চৌদ্দ—

গোপাল বিলাত যাবার সময় থেকেই সুরথের সন্দেহ হইয়াছিল যে তাহার প্রতি নীরজার ভালবাসা ঠিক বন্ধু বা ভাই এর যতটা প্রাপ্য তার সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। গোপালের অদর্শনে নীরজা যার পর নাই ব্যথিত হইয়াছিল। ক্রমশঃই নীরজা গম্ভীর হইতেছিল। কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা কয় না। উদাস নৈরাশ্যের চিহ্ন তার স্বতঃ প্রফুল্ল মুখখানিকে মলিন করিয়া দিয়াছিল। গোপালের একখানি চিঠি পাবার প্রত্যাশায় সে কতনা ব্যাকুল হইয়া প্রতীক্ষা করিত। কৌতূহল বশতঃ গোপালের দু একখানা চিঠি নীরজাকে না দিয়া সুরথ গোপনে পড়িয়া দেখিয়াছে তাহাতেও সেই ব্যর্থতার আকুল প্রতিধ্বনি।

নীরজা ভাবিয়া ভাবিয়া অসুখে পড়িয়াছিল। মাঝে মাঝে কখনও বা সে অত্যধিক জ্বরের ঝোঁকে প্রলাপ বকিবার মত গোপালের নাম করিয়া চীৎকার করিয়াছে। নীরজা গোপালের প্রতি তাহার এই আকুল ব্যগ্রতা যাহাতে সুরথের দৃষ্টি আকির্ষণ না করে তার জন্য নিয়ত প্রয়াস

পাইয়াছে। গোপাল পুনরায় ফিরিয়া আসিলে নীরজা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিল। সে প্রকাশ্যে তাহার এই প্রফুল্লতা কাহাকেও দেখিতে দেয় নাই। বাহিরে সে গোপালকে বরং ইহার ঠিক উল্টা ভাবই দেখাইয়াছে। কিন্তু সুরথকে সে ফাঁকি দিতে পারে নাই। সুরথ তাহার মনের কথা পড়িতে ভুল করে নাই। নীরজার ভাব পরিবর্ত্তন দেখিয়া সুরথ অত্যন্ত ব্যথিত হইল। সে ভাবিল নীরজা ও গোপাল পরস্পরকে ভালবাসে। তারা পরস্পরকে পাইলে সুখী হইত। তাহাদের প্রগাঢ় ভাল বাসার মাঝখানে বিঘ্নস্বরূপ দাঁড়াইয়া থাকিতে সুরথ ইচ্ছা করিল না। সে স্থির করিল আপনি সরিয়া গিয়া তাহাদের মিলনের বাধা দূর করিয়া দিবে। সুরথ গোপনে চুক্তি পত্রে সই করিয়া পল্টনের দলে যোগ দিল।

সুরথের অন্তরের কথা কেহ বোঝে নাই। লোকে জানিল রাজ সরকার জোর করিয়া তাহাকে সেনাদলে ভর্ত্তী করিয়া লইয়াছে। নহিলে অভিভাবকহীন বাড়ীতে যুবতী স্ত্রীকে কেবল মাত্র বালক সুভাষের কাছে রাখিয়া তাহার কি স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যাওয়া সম্ভব?

সুরথ যাবার দিনে গোপালকে বলিল "জানি না ভাই ফিরতে পারব কি না। নীরজা ও সুভাষকে তুমি দেখ'। দরকার হলে তোমাদের দেশের বাড়ীতে তোমার বাপের কাছে নিয়ে যেও। আমার অভাবে তারা কষ্ট না পায়!"

গোপাল সুরথকে বিদায় আলিঙ্গন দিয়া বলিল "যত টাকা লাগে, কিছুতেই কি তোমার যাওয়া বন্ধ হয় না?"

সুরথ বলিল "না ভাই। আর ফেরা যায় না। নীরজাকে ফেলে যেতে আমার কি কষ্ট হচ্ছে তা তোমায় কেমন করে বলব। অনেক চেষ্টা করেছি ফেরার কোন উপায় নেই।"

নীরজা বলিল "আমার উপর রাগ করেই কি এই পথ তুমি বেছে নিলে? আমি তোমাকে সুখী করতে পারিনি—তাই? আমার সকল অপরাধ তুমি ক্ষমা কর। তুমি যেওনা। তার চেয়ে এস আমরা পালিয়ে যাই—সুদূর [illegible]—"

সুরথ বাধা দিয়া বলিল "পাগল হয়োনা নীরজা। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর যেন অক্ষত হয়ে ফিরে আসি।"

নীরজা সুরথের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল "আমায় ক্ষমা কর—ক্ষমা কর! আমি তোমার মনের ব্যথা সব বুঝেছি। আজকের দিনটিতে আমাকে ক্ষমা কর। তুমি কি বুঝতে পারছনা আমার কি কষ্ট আজ সইতে হচ্ছে?"

সুরথ বিচলিত হইল। তবে কি মিথ্যা সন্দেহে নীরজার উপর রাগ করিয়াছিল? গোপালের চেয়ে তাহাকে সে ত কম ভালবাসে না—এ কথা কি সে বোঝে নাই? কিন্তু হায়! আর যে সময় ছিলনা! কালও যদি নীরজা এ কথা বলিত! না—আর কোন উপায় নেই। তাহাকে যেতেই হবে! না হলে চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে তাহার জেল পর্য্যন্ত হইতে পারে।

সুরথ কাঁদিল। নীরজাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল "ভগবানকে ডাক নীরজা—যেন ফিরে আসি!"

নীরজা আর কোনও বাধা দিল না। সুরথ দুঃখিতচিত্তে সেনাদলের মধ্যে আপনার স্থানে গিয়া দাঁড়াইল।

বাসোরা হইতে সুরথের প্রথম চিঠি আসিল। সে গোপালকে লিখিয়াছিল—সামনের মৃত্যুর আহ্বান সে শুনিয়াছে। জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া সে সংসারের সকল ভাবনা হইতে নিশ্চিন্ত হইতে চায়। গোপাল তাহার বন্ধু। সুরথ যদিই না ফেরে দুমুঠা ভাতের জন্য নীরজাকে যেন পথের কাঙালিনী না হইতে হয়! গোপাল যদি তার ভার নেয়—সুরথ হাসি মুখে জগৎথেকে বিদায় লইতে পারিবে।"

সুরথের দ্বিতীয় এবং হয়ত 'শেষ' চিঠি আসিল আ[illegible]র উপান্ত প্রদেশ হইতে। সে নীরজাকে লিখিয়াছিল,—

"কল্যাণীয়াসু

নীরজা! দুটো প্রকাণ্ড বাহিনী আজ সামনাসামনি মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে পরস্পরের আক্রমণ প্রতীক্ষা করছে। বুঝতে পারছি আজ আমার জীবনের শেষ দিন। আজকের দিনটীতে তোমার কাছে আমি বলতে চাই, জীবনে যে ভুল করেছি, তোমার দয়াদ্র অন্তঃকরণ তাকে যেন ক্ষমা করতে পারে! তোমাকে সন্দেহ করেছিলুম সে ব্যথা ভুলে যেও। তোমায় আগে ঠিক এমনি করে চিনতে পারি নি। তুমি ভালবাসতে জান, যাকে আপনার বলে ভাব সরল ভালবাসার বাঁধন দিয়ে বাঁধতে চাও। এমনি চোখেই তুমি গোপালকে দেখেছিলে। আজ আমি স্পষ্ট বুঝেছি মোহ লালসা কিছুই তোমার হৃদয়ে কখনো জাগেনি। তাদের চেয়ে তোমার স্থান অনেক উঁচুতে। আমাকেও ত তুমি ভালবাসতে। ক্ষমা করবে না কি তুমি? তোমাকে অবিচার করবার প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করলুম। তবু কি ক্ষমা পাব না? তুমি ত নিষ্ঠুর নও! ভাবছি যদি কোন রকমে এই মৃত্যুর গ্রাস হতে মুক্তি পেতুম! আজ জীবনটাকে ফিরে পেয়ে তোমার সামনে টেনে নিয়ে যাবার জন্য ছটফট করছি। যদি কোনও উপায় থাকত! পার নাকি নীরজা তোমার শক্তির প্রভাবে আমাকে উদ্ধার করতে? শক্তিময়ীর অংশে তোমাদের জন্ম। সাবিত্রী ত তোমাদেরই মত ছিল। সে যদি পেরেছিল তুমি কেন পারবে না? সাবিত্রীর মতই যমের হাত থেকে আমায় ছিনিয়ে নিয়ে চল। মরতে এত ভয় হচ্ছে সে কথা তোমায় কিছু লিখতে পারছি না। জানি না তুমি আমার এই চিঠি পাবে কিনা। হয়ত যখন পাবে আমি ইহ জগতে আর থাকব না। সে কথা ভাবতে পারছি না। নিজে সাধ করে ফাঁসীর দড়ি গলায় নিয়েছি। আমি আমার ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়েছি এই কথা স্মরণ করে আমার স্মৃতির উদ্দেশে দুবিন্দু অশ্রুবর্ষণ কর। কি আর বলব? ভগবান তোমাকে রক্ষা করুন। ইতি

আশীর্ব্বাদক—

"সুরথ"

—পনের—

"বৌমা।"

মালতী পাশের ঘরে দুধ জ্বাল দিতেছিল। তপ্ত কড়াটা নামাইয়া বাটিতে দুধ ঢালিতে ঢালিতে সেখান থেকেই উত্তর করিল "যাই বাবা!"

বিছানার উপর রোগে কঙ্কালসার হইয়া বৃন্দাবন শুইয়াছিলেন। যৌবনে এমন দিন ছিল যখন তাঁর সুস্থ ও সবল হাত দুখানার জোরে মত্তমাতঙ্গ পর্য্যন্ত পরাজিত ও বন্দী হইয়া পদতলে লুটাইয়া পড়িত। আজ কালের করাল বদন তাঁর উঠিয়া বসিবার শক্তিটুকুও গ্রাস করিয়াছে।

মালতী দুধের বাটি ও একখানা রেকাবী করিয়া বেদানা আঙুর আপেল নেসপাতি প্রভৃতি সাজাইয়া আনিয়া শ্বশুরের কাছটীতে বসিয়া বলিল "এইটুকু খেয়ে নাও বাবা! উঠে বসতে কষ্ট হয়, যেমন আছ থাক, আমি তোমার মুখে তুলে দিচ্ছি।"

খাওয়া শেষ হইলে বৃন্দাবন জিজ্ঞাসা করিলেন "আজও তার কোন চিঠি আসেনি বৌমা?

মালতী বলিল "কলকাতা থেকে কোন খবর আসেনি বাবা!"

বৃন্দাবন ব্যথিত ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন "কেন গোপাল কি তবে চিঠি পেলে না? তুই ভাল করে লিখে দিয়েছিলি ত আমার অবস্থা ক্রমশঃই কাহিল হয়ে পড়ছে? আর বাঁচবনা বেশীদিন, এই অন্তিম সময় একবারটী যদি তাকে কাছে দেখতে পেতুম! আচ্ছা বৌমা! তুই কি কিছু বুঝতে পেরেছিস কেন সে আসে না? আমার উপর আমারই কোনও তিরস্কারে সে কি অভিমান করেছে? সামান্য তুচ্ছ অভিমান করে কেউ কি তার বাপকে ভুলে গিয়ে তার অন্তিম আহ্বানে একবারটীও সাড়া না দিয়ে থাকতে পারে? কি বলিস মা—চুপ করে রইলি কেন? তবে কি তার কোনও অমঙ্গল—কিম্বা সে বেঁচে আছে ত?

মালতী আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া বলিল "না বাবা! মন্দ খবর কিছু জানিনা—তবে—"

বৃন্দাবন উদগ্রীব হইয়া বলিলেন "তবে—? কি বলছিস

বৌমা? স্পষ্ট করে বল। মন্দ নেই—ভাল আছে—তবে—তবে কি এমন কিছু সন্দেহ করছিস্—যার চেয়ে তার মন্দ থাকাটাও সুখের বিষয় হত?"

মালতী উত্তর দিতে গিয়া থামিয়া গেল। খানিক স্তব্ধ থাকিয়া অবশেষে অত্যন্ত সংকোচের সহিত জিজ্ঞাসা করিল "আমার অভাবটা দুদিনের জন্ত সইতে পারবে বাবা? তোমার এসময় এখান থেকে যেতে আমার মন সরছে না। তবু—ভাবি, হয়ত তোমার সাধ অপূর্ণ থাকত না।"

বৃন্দাবন মালতীর কথাটা ঠিক বুঝতে পারিলেন না। সে দুদিনের জন্ত যেতে চায়! কোথায়? কেন? চারটী বছরের মধ্যে সে কখনও একটী দিনের জন্ত কাছছাড়া হয় নাই। তার বাবা আজও কাশীতে আছেন। তাঁর কাছেও মালতী একদিনের জন্ত যেতে চায় নি। আর, কোথাও তার যাবার যায়গা ছিল না। তবে কার কাছে সে যেতে চায়। ছেলে নিজে পছন্দ করিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল, অথচ একটী দিনের জন্তও তাহাকে প্রীতির চক্ষে দেখে নাই? ছেলে চলিয়া গেলে মালতীকে পাইয়া বৃন্দাবন সকল কষ্ট ভুলিয়াছিলেন। মালতী একাধারে তাঁর ছেলে ও মেয়ের অভাব পূর্ণ করিয়াছে। এখন অথর্ব্ব হইয়া পড়িবার পর বৃন্দাবন, শিশু পুত্রের মতই মালতীর উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া আছেন।

এই স্থবিরের একমাত্র অবলম্বন—অন্ধের যষ্ঠী—মালতী আজ দুদিনের জন্ত স্থানান্তরে যাইবে বলাতে বৃন্দাবন ভয় পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন মা? একথা বলছ কেন!"

মালতী ধীরে ধীরে বলিল "হয়ত—আমি আছি বলেই উনি আসছেন না। নইলে না আসবার কোনও কারণ আছে বলে মনে হয় না!"

বৃন্দাবন বিস্মিত হইয়া বলিলেন "তাই কি? সে কি পালিয়ে বেড়াচ্ছে? আমার ওপরই শুধু অভিমান করে নি——তোর মত সোণার লক্ষীকে অবহেলা করছে——এমনি সয়তান সে?

মালতী মৃদুস্বরে বলিল "আমাকে বিয়ে করেই তিনি অসুখী—একথা বুঝতে পেরেছি!"

বৃন্দাবন বলিলেন "তোকে বিয়ে করেছে বলে যদি অসুখী হয়ে থাকে তার মত লক্ষীছাড়া ভূভারতে কেউ কোথাও নেই। আমি এদিক দিয়ে ব্যাপারটাকে কখনো ভাবিনি। অন্তরকম মনে করতুম!"

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করিয়া রহিলেন। মালতী কিছুক্ষণ পরে বলিল "আমাদের গ্রামের বাড়ীতে মধুর মাকে সঙ্গে নিয়ে দিন দুইচারের জন্য যাই—আর—"

বৃন্দাবন বাধা দিয়া বলিলেন "তাই যাও! ছেলে গেছে, নিখিল গেছে,—এবার তুমিও যাও! আমি না খেতে পেয়ে দম আটকে মরে থাকি!"

মালতী বলিল "তাই কি আমি বলছি বাবা? দুদিনের জন্ত সমস্ত বন্দোবস্ত করে রেখে যাব। মধু রইল 'যদি একটীবার আসেন—তাই—।"

বৃন্দাবন বলিলেন "না বৌমা! সে হতে পারে না! গোপালকে না দেখে আমার যদি এতদিনই কেটে গেছে—বাকী কটা দিনও যাবে। তাছাড়া এ রকম কুলাঙ্গারকে আর ডাকতেও ইচ্ছা হয় না।.........তুই কিন্তু আমায় ছেড়ে যাসনি মা। একটা দিনের জন্যও যেতে দেব না। যে কটা দিন বাকী আছে তোর মুখ দেখে বেঁচে থাকব। তুই-ই আমার ছেলে। তুই আমার সব।......বৌমা?"

"কি বাবা?"

"একটা কথা ভেবে বড় কষ্ট পাচ্ছি মা। গোপাল মানুষ হল না। আমার এত সাধের বাগান ঘর সমস্ত আমি মারা গেলে দুদিনে ধ্বংস হয়ে যাবে। ছেলেটা কিছুই রাখতে পারবে না। আমার ভিটেয় সন্ধ্যা প্রদীপটী পর্য্যন্ত হয়ত জলবে না। তোকে কষ্ট দেবে। হয়ত তাড়িয়ে দেবে। তুইও বেশী দিন বাঁচবি না। না খেতে পেয়ে—অনাদরে লাঞ্ছনায় মরে যাবি। তিরিশটা বছর—ধরে পায়ে হেঁটে মোট বয়ে—লাঙ্গল চষে—হাটে গিয়ে ফিরি করে জিনিষ বেচে কত কষ্টে এই যে সম্পত্তি টুকু করেছি—তোরা দুটীতে একত্র থেকে যাবজ্জীবন বসে খেলেও কষ্ট পেতিস না। গোপালের হাতে দুটো দিনও যাবে না। তোকে গাছতলায় ফেলে দিয়ে এসে ও আমার শ্মশান ভূমির উপর দাঁড়িয়ে তাণ্ডব নৃত্য করবে। গৃহ দেবতা দিনের মধ্যে এক বিন্দুও জল গণ্ডুষ পাবেন না!——"

(ক্রমশঃ)

সওদা

হায় রে মহিষ ছাল—

ঘোলা কল্লোল আর কালো কালি-কলমের খেয়ে খোঁচা,
বোঁচা নাক নিয়ে অশোক কাননে এলে তুমি ছুটে চোঁচা।
হায় রে মহিষ ছাল,
দাম্ভিকতার রম্ভা চুষিয়া কাটাইবে কত কাল!
নবযুগ-কালাপাহাড়, তোমারে পেলাম আজিকে, হায়
নিশি নিশি আর ছয়ার ঠেলোনা পড়িবে নর্দ্দমায়।
গজকচ্ছপ ক্যাব্লাকান্ত ভজে তোমা' বারো মাস,
নিঃসরণীর পোষ্যপুত্র বোকা বি, এ (ক্যান্‌ভাস)।
সজনীর কাঁধে সোজা—
ঘাড় গুঁজে কত চেঁচাবে কবিতা,—বোদা চোখ আধ বোজা।
ঢাকাই মোল্লা কে কবে বলেছে 'বিদ্রোহী' কবি চুরি
করেছে তোমার লেখা, তাই নিয়ে যত হীন বাহাদুরি।
হায় রে ক্ষুদ্র মন,
বদন-ব্যাদান খুব করিয়াছ পড় এবে ব্যাকরণ।
সুশীল বালক—ক্ষেপিয়া উঠেছে তব অখাদ্য খেয়ে,
পরনিন্দার পিপে তুমি পেঁচো, খেয়ো কথা এক ঘেয়ে।
খাও গে শুক্‌নো চিরা,
তব আনন্দে যোগ দিল যত ভূত প্রেত যোগিনীরা॥

ও ছুয়ো দোদুল—

—শ্রীহুতাশ হালদার

ও ছুয়ো দোদুল, মধুল তোমার প্যারডি কি সুন্দর,
কাব্য প্রাসাদে তুমি টিক্‌টিকি, সেজেছ ছুছুন্দর!
তোমার লেখার পিছে
গয়লা-গলির ড্রেণের মশারা নিয়ত গুঞ্জরিছে।
কি লাল দেখিয়া মোহিত হয়েছ হে মোর সজনি, ধনি,
মাণিকতলার খালে কবে পেলে মণি সে বিস্মরণী!
কথার তফিল্ কাহিল নেহাৎ, নাহিক কাব্যবোধ,
শুধু প্যারডির প্যারেডে করিছ ভারতীর খোসামোদ।
তোমার মগজে ভাই,
কত না কবির পাতের কুড়ানো এঁটো-কাঁটা খুঁজে পাই।
রঙের ভড়ংএ ভাঁড়ামি করগো হঠাৎ চটকদার,
লঙ্কায় সেই অশোকের শাখে কত দোলা খাবে আর!
জানো না কি মনে মনে,
পচা গেঁদেলের ঝাড় তুমি হায়, শেফালি যুথির বনে।
বিলকুল সব কবিকুল ভাই হ'ল ত কাবার কাবু,
পিওনের প্যাণ্ট্ ফেলে চলে' এসো, সাজিবে ভদ্র বাবু।
শোন কথা চুপে চুপে
পটুলির পিসী টালার নালায় সেদিন মরেছে ডুবে।

Freud এর শাস্ত্রে 'Ædipus Complex' বলে কোনো complex আছে কিনা মোহিতলালের বন্ধু, অতএব স্তুতিকারক ডাঃ সুশীলকুমারই বলতে পারেন, কিন্তু মুদির দোকানের হিসাব যে রাখে বা যে প্রুফ্ কাটে, সে ব্রণলোভী মক্ষিকার মত ঘা চেটে বা ধাঙড়ের মত নোংরা ময়লা ঘেঁটে স্বাস্থ্য সমালোচনা করবার আস্পর্দ্ধা রাখে,—এও একটা complex নিশ্চয়ই।

ড্রেণ্-ইন্‌স্পেক্টর শনিবারের পিওনদের মারফৎ বড় রুচি-বাগীশ বররুচি বড়ুয়ার চিঠি পড়্‌লাম। দেশের সঙ্গে পরিচয় জাতির সঙ্গে হৃদয়ের যোগ, জীবনটাকে ভালো করে' দেখ্‌বার অবকাশ—সবই হয়েছে এই চুনো চিংড়ী মাছটির, আর তাঁর কালাপাহাড় বন্ধুর! 'যা কিছু লেখা হচ্ছে তার সবই যে টিকবে এমন কিছু নয়.'—তবে এত ভয় পাবার কি আছে? গোলমাল যখন আপনিই থাম্‌বে তখন তাঁর অত

গলাবাজি না করলেও ক্ষতি ছিল না। অন্য দুই ডাঃএর মত তিনিও শনিবারের পিওনদের মাসিক পাঁচ টাকা করে বক্‌শিস্ দিলে পারেন।

সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি—মাষ্টারে মাষ্টারে পিস্‌তুতো ভাই। মোহিতলালের কাব্য-সমালোচক ডাঃ সুশীল কুমার দে।

'অঙ্গারং' তো ভুল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'ত্বং অগমঃ?'—এ যে একেবারে নিজের হাতে লেখা। আশা করি শনিবারের চিঠির মণি মুক্তায় এ দৃষ্টান্তটি যথোপযুক্ত স্থান পাবে।

আমরাও সম্প্রতি অবগত হলাম বুড়ি প্রবাসীকে তার বাহাত্তুরে পাওয়ার উপলক্ষ্যে সম্বর্দ্ধনা করবার জন্যে গড়ের মাঠে এক বিপুল সভা হবে! সর্ব্বাগ্রেই অভিজাত পত্রিকা বিচিত্রার পক্ষ থেকে শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘটক মৃত্তিকা থেকে কিছু দূর্ব্বা ছিন্ন করে বুড়ির পাদবন্দনা করবেন। তৎপরে শ্রীমান্ অশোক চট্টোপাধ্যায় প্রবাসীতে মুদ্রিত লালন সা ফকিরের "নারীর তবে কি হয় বিধান" গানটী গলা কাঁপিয়ে গাইবেন। গান সাঙ্গ হলে মাণিকতলা খালের পক্ষ থেকে শ্রীমোহিতলাল মজুমদার তাঁর "নিশি নিশি গণিকা ভবনে"র কবিতাটী কালাপাহাড়ী ঢঙে আবৃত্তি করবেন। আবৃত্তি করতে করতে তাঁর মুখ বেগ্‌নী ও চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত হয়ে আসবে। যে কথা পুরুষের মুখে নারী কখনো শোনে নি—সেই জায়গাটা আস্‌তেই ভাবাবেশে তাঁর মূর্চ্ছা হবে, নিষ্ঠীবন ত্যাগ পর্য্যন্ত আর হবে না। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ডাঃ দে শোক সুরু করবেন—

দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র পুরুষপ্রবরঃ॥

গড়ের মাঠ শ্রীসজনীকান্ত দাসের অতীব প্রিয়স্থান। সভার সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্য্যন্ত তিনি সভামণ্ডপে শুধু গড়াগড়ি দেবেন। এবং সভা শেষে শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়ের নব শিক্ষালব্ধ সিংহলী নৃত্য দর্শকমণ্ডলীর নয়নরঞ্জন করবে। শ্রীযোগানন্দ দাস চোখের বালি থেকে কয়েকটী মণিমুক্তা চয়ন করে' সভাস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে বণ্টন করে' দেবেন। সভা সাঙ্গ হলে ধাত্রী শ্রীমতী সুনীতিবালা চাকি উলুধ্বনি করবেন। পরে—ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ইত্যাদি।

ঘরে বাইরে

স্যার প্রভাস ও নবাব মোশারফ হোসেন—এবারে বাংলার মন্ত্রী হয়েছেন।

শাসন সংস্কার সম্পর্কিত রয়াল কমিশনের সদস্যগণের নামও ঘোষণা করা হয়েছে। এঁদের চেয়ারম্যান হবেন স্যার জন সাইমন। বাকী সদস্যের নাম যথাক্রমে—লর্ড বার্ণহ্যাম, লর্ড ষ্ট্রাথকোনা, অনারেবল ই, সি, জি, ক্যাডোগ্যান, মিঃ ষ্টিফেন ওয়ালস্, কর্ণেল জর্জ্জলেন ফক্স, ও মেজর অ্যাটলী।

গত আটবছরের কাউন্সিলের কাজের হিসাব এঁদের কাছে দেখাতে হবে। আমরা ঘরের ব্যাপার যতখানি জানি তাতে কাগজে কলমে রেকর্ড, সরকারের যাই থাক, নিম্নলিখিত কয়েকটী চির স্মরণীয় কাজ এই সময়টার মধ্যে ঘটেছে।

(ক) সরকার অন্ততঃ তেষট্টিবার মন্ত্রী নিয়োগ করেছেন, সদস্যেরা বাষট্টিবার উত্তর দিয়েছেন আমরা মন্ত্রী চাই না। শেষবারের উত্তরটা আজও জানা যায়নি, কিন্তু আশা করা যায় এর চেয়ে ফল অন্যথা হবে না। ভবিষ্যতের কথা অবশ্য কেহ বলিতে পারে না। তবু এটাও স্বীকার করতে হবে—

(খ) উপরোক্ত জেদাজেদির পাল্লায় দেশের কোটী কোটী টাকা অকারণ নষ্ট হয়েছে। এবং

(গ) আট বছর ধরেই কাউন্সিল যখন মন্ত্রী চাই কি চাই না সেই মীমাংসা নিয়েই ব্যস্ত রইল, তার অবকাশে প্রজার হিতসাধন করবার উদ্যোগ আয়োজনের মোটেই অবসর পাওয়া গেল না। জনহিতকর কাজ কর্ব্বার দায়ীত্ব —শুধু এই মন্ত্রীদেরই। জনমত মন্ত্রীদেরই যখন স্থায়ী হতে দিচ্ছে না, এর জন্য দেশের কাজ যদি না হয় প্রজারা নিজেই নিজেদের মঙ্গল চায় না এই কথাটাই বুঝতে হবে!

(ঘ) বাংলার অনেকগুলি যুবক ও প্রৌঢ় অর্ডিনান্সের দোহাই দিয়ে ধরা পড়ে জেলে পচ্ছেন।—প্রকাশ্যে বিচার করে এঁদের অপরাধের শাস্তি দেওয়া হলে লোকে কিছুই বলত না।

(ঙ) হিন্দু মুসলমানের ঘরোয়া ঝগড়া বেড়েছে। ফলে চারিদিকে খুন খারাপিও চলছে। প্রকাশ্য ছোরাছুরি ও লাঠির যুদ্ধ, এবং গুপ্তি হত্যাও আছে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রমুখ অনেক গুলি দামী জীবন চিরনির্ব্বান পেয়েছেন।

আমাদের ভবিষ্যত নির্ভর করছে রয়াল কমিশনের রিপোর্টের উপর। তাঁরা উপরোক্ত ঘটনা গুলি পর্য্যবেক্ষণ করে দেশের অবস্থা ফেরাবার কোন ব্যবস্থা করবেন কি?

গত মাসে আমরা মেডিকেল কলেজের যে তিনজন ছাত্রের সাইকেলে কাশ্মীর যাত্রার সংবাদ দিয়েছিলাম, তাঁরা সম্প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন। তাঁদের ভ্রমণ কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ আমরা আগামী সংখ্যায় জানাব।

'ইণ্ডিয়ান ডেলি মেল' পত্রিকা খবর দিয়েছেনে—ভারত সচিব সরকারী টাকায় ৫ হাজার খণ্ড Mother India বই ৭৫০০০ টাকা দিয়ে কিনে বিলাতে গণ্যমান্য রাজনৈতিক দলের অনেককে বিনা মূল্যে বিতরণ করিতেছেন।

রবীবাবু সম্প্রতি যাভা প্রভৃতি দ্বীপগুলি বেড়িয়ে দেশে ফিরেছেন। বেড়াতে যাবার আগে 'সাহিত্য ধর্ম্ম' নামে এক প্রবন্ধ লিখে তিনি বিচিত্রাতে ছাপিয়ে ছিলেন। তাই নিয়ে শ্রীনরেশ সেন গুপ্ত, শ্রীশরৎ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন বিদ্যারত্ন, শ্রীমহেন্দ্র রায়, ও শ্রীদ্বিজেন ভাদুড়ী প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের ধুরন্ধরেরা পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। যাঁকে নিয়ে মারামারি তিনি এখন ঘরে ফিরে এসেছেন ও'! আমরা প্রতীক্ষা করে রয়েছি তিনি নিজে তাঁর বিরুদ্ধ সমালোচনা গুলি সম্বন্ধে কি কৈফেয়ত দেন শোনবার জন্যে।

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা একাদশী হিন্দুর পক্ষে এক স্মরণীয় দিন।—এই তিথিতেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। প্রত্যুষে অর্জ্জুন সমবেত যোদ্ধৃবৃন্দের দিকে লক্ষ্য করে যখন দেখলেন আপনার আত্মীয় বান্ধবদের সঙ্গেই তাঁকে সমরে নামতে হয়েছে, মর্ম্মাহত হয়ে তিনি যুদ্ধ হতে বিরত হবার সঙ্কল্প করলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন— ধর্ম্মের নামে যুদ্ধ করছ তুমি, এতে জ্ঞাতিনাশের আশঙ্কায় পশ্চাদ্‌পদ হলে চলবে না। তাছাড়া তুমি নিজে কর্ম্ম করে যাবে সত্য ও ধর্ম্মের বিজয় পতাকা উড়িয়ে নিয়ে চলবে, ফলাফলের ভার ভগবানের ওপর ছেড়ে দাও! শ্রীকৃষ্ণের সেই সময়কার উপদেশ গুলি সঙ্কলিত হয়ে গীতার সৃষ্টি হয়েছে। গীতা হিন্দুর সব চেয়ে বড় শাস্ত্র। গীতার জন্ম তিথি উপলক্ষে এই দিনটাতে হিন্দু মাত্রেরই উৎসব আয়োজন করা উচিত। গীতার জন্ম তিথি উৎসব দুয়েকটী স্থানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে শুনেছি। কিন্তু জাতীয়তার প্রেরণা অনুসারে ইহায় সার্ব্বজনীন প্রসার ও আদর পাওয়া উচিত। আমরা হিন্দু মাত্রেরই এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

একটি নিবেদন

শ্রী:তিভাজনেষু

আশ্বিন মাস থেকে কার্য্যাধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই ধূপছায়ার সম্পাদকত্বের দায়ীত্বও ছেড়েছিলাম।

আমার এই সঙ্কল্প দেখে আমার অনেকগুলি বন্ধু এ সম্বন্ধে আমার কৈফিয়ত জানতে চেয়েছেন। এবং অযথা সন্দেহও প্রকাশ করেছেন ধূপছায়ার সঙ্গে হয়ত বা আমার মত বা স্বার্থের অমিল ঘটেছে।

কথাটা মোটেই সত্যি নয়।

ধূপছায়ার কার্য্যাধ্যক্ষ এবং সম্পাদকত্বের আসন আমি ছেড়েছি একেবারে ব্যক্তিগত কারণে। আপাততঃ নিজের কয়েকটা কাযে আমি এত বেশী ব্যাপৃত হয়ে পড়েছি যে পত্রিকা পরিচালনার গুরুভার আমাকে বাধ্য হয়েই ছাড়তে হয়েছে। এখন কিছুদিনের জন্য আমি নিজেকে বাহিরের সকল প্রকার কাযকর্ম্ম হতে আলাদা রাখতে চাই।

তবু একথাও ঠিক যে আমার ঘরোয়া কাজের ফাঁকে যতটুকু অবসর পাই ধূপছায়ার মঙ্গলের জন্যই সে সময়টার সদ্ব্যবহার করে থাকি। ধূপছায়ার উন্নতি কামনা আমার প্রাণের ও মনের সাধনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইহা আমার গৌরবেরই কথা বলে ভাবি।

আশা করি আমার এই বিনীত নিবেদনটীর পর ধূপছায়ার অনুগ্রাহকবর্গের কেহই আর আমাকে ভুল বুঝবেন না।

আপনাদিগকে আমার অন্তরের ভালবাসা জানাই। ইতি

বিনীত

সুরেন ভট্টাচার্য্য

পুস্তক পরিচয়

পরিণাম :— অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম্, এ প্রণীত একখানি সামাজিক উপন্যাস। আর ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং প্রকাশিত।

উপন্যাসখানি আদ্যন্ত পড়িয়া বুঝিলাম শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার দার্শনিকের দৃষ্টি লইয়া আমাদের সমাজের কয়েকটী জটিল সমস্যা সমাধান করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য সর্ব্বাংশেই সফল হইয়াছে। অথচ বইখানির মধ্যে কোথাও দার্শনিকের কূটতর্ক বিশদ ভাবে বর্ণিত নাই। সুতরাং মেয়েদের পর্য্যন্ত ইহা পড়িতে মোটেই কষ্ট হয় না। ভাষা বেশ সহজ ও সরল। বিনোদ ও রমার চরিত্র বেশ আদর্শ ভাবেই চিত্রিত হইয়াছে। প্রমথ আত্মকৃত পাপের উপযুক্ত শাস্তি পাইয়াছে ; শচীনও শেষ জীবনে অনুশোচনা করিয়া সন্ন্যাসী হইল। সব চরিত্রগুলিই বেশ জীবন্ত বলিয়া মনে হয়। পাঠক পাঠিকাগণ নির্ব্বিচারে এই বইখানি পড়িলে আমোদ পাইবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

[ত্রুটী স্বীকার :—এই সংখ্যার ১২৩ পৃষ্ঠার ১ম লাইন—'সৃষ্টি করল এমন এক দ্বন্দ্ব পক্তি (couple অর্থাৎ two)' ওখানে না বসে ১২৪ পৃষ্ঠার ১ম লাইনের উপরে বসিবে। ১২৪ হইতে ১২৭ পৃষ্ঠাও ভুলক্রমে ২২৪, ২২৫ ইত্যাদি বলিয়া ছাপা হইয়াছে।]

Printed & published by Sj. Nripendra Nath Banerjee from the Bela Printing Works,
14, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta.

সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার
ইন্দু মাধব মল্লিকের, (এম.এ, এম.ডি, বি.এল)
ইক্-মিক্ কুকার
সমগ্র ভারতে আড়াই লক্ষ ইকমিক প্রচলিত ও সমাদৃত
ইহাতে অতি সহজে ভাত, ডাল, তরকারী, মাংস প্রভৃতি
সকল রকম আমিষ ও নিরামিষ খাদ্য ১ ঘণ্টার মধ্যে
এক সঙ্গে আধপয়সার কয়লা, গুল বা কেরোসিনে
বিনাক্লেশে রান্না হয়। দশঘণ্টা রাখিলেও খাদ্য
ধরিবার বা পুড়িবার ভয় নাই। আধুনিক ইকমিকের
বহুবিধ নুতন নুতন প্রণালী ও উন্নতি সাধনের বিস্তৃত
বিবরণ জানিবার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন
আফিষ
৮৫৯ বড়বাজার
কারখানা
কলিকাতা
টেলিফোন নং ৩৯৮৪
ম্যানেজার ইক্‌মিক্ কুকার
২৯নং কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

পরিচালক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীপ্রণবদেব মুখোপাধ্যায়।

ধূপছায়া

সম্পাদক—শ্রীরেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

প্রতি সংখ্যা।০ আনা। বার্ষিক ২৷৵০ আনা।

সাপ মার্কা ! সাপ মার্কা !! সাপ মার্কা !!

সর্ব্বজন প্রশংসিত

এম, সি, এ, কে, পাল কোং'র

সাপ মার্কা

বালতী ও বাথ টব

ব্যবহারে একমাত্র উপযোগী

প্রত্যেক দোকানে পাওয়া যায়

সোল এজেন্ট—**পাল এণ্ড কোং,**

হার্ডওয়ার মার্চেন্ট এণ্ড জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স

২১।৩, হ্যারিসন রোড, বড়বাজার, কলিকাতা।

ফ্যাক্টরী—২০নং উল্টাডাঙ্গা রোড, কলিকাতা।

Proprietress—S. K. ROY.

ডালমিয়া এণ্ড কোং

পি।৮৩।সি, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড

হারমোনিয়াম, অর্গ্যান ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র

প্রস্তুত কারক ও বিক্রেতা

আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত। সুরমাধুর্য্যে, স্থায়ীত্বে,

গঠন পারিপাট্যে ও সুলভে অদ্বিতীয়।

জিনিসের তুলনায় মূল্য আশাতীত সুলভ

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বিজ্ঞান জগতে নূতন আবিষ্কার

১৫০০ ফুট আমেরিকান এভার রেডি ফোকাসিং

আপনি কি আমেরিকান "এভার রেডি" সার্চ্চ লাইট দেখিয়াছেন? ইহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যদি অন্ধকারে চোর, ডাকাত ও হিংস্র জন্তুর হাত হইতে বাঁচিতে চান, এভার রেডি লাইট আপনার বন্ধুর কাজ করিবে। সুইস টিপিলে উজ্জ্বল আলো চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হইয়া বহুদূর দেখা যাইবে, যখন ইচ্ছা জ্বালাইতে পারিবেন। মূল্য ৮০০ ফুট ১২৲, ৩০০ ফুট ৭৲; ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইপ মূল্য ৪৲ টাকা হইতে ১০৲। পত্র লিখিলে ক্যাটলগ পাঠান হয়। অর্ডারের সহিত ২৲ টাকা অগ্রিম পাঠাইলে ভিঃ পিতে মাল পাঠাই।

মহামায়া এজেন্সি,

৮৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ক্যামেরা এবং ফটো' সংক্রান্ত সর্ব্ববিধ জিনিষই আমরা সরবরাহ করে থাকি।

ফটো এন্‌লার্জ করাতে অথবা প্লেট ও ফিল্‌ম্‌ ডেভেলপ করাতে হলেও আমাদের কাছে আসবেন।

দেশী ও বিলাতী সকল প্রকার অকৃত্রিম ঔষধ, পেটেণ্ট ঔষধ, সুগন্ধি এসেন্স, ও অন্যান্য ফ্যান্সি জিনিষ আমাদের কাছে পাবেন।

মফস্বলের অর্ডার আমরা অত্যন্ত যত্ন সহকারে সরবরাহ করে থাকি।

অর্শ রোগের একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য মহৌষধ HADENSA প্রাপ্তিস্থান—

O. N. Mookerjee & Sons.

19, Lindsay St. (below Clock Tower)
and 157, Dhurrumtolla Street

দ্বিতীয় বর্ষ **উত্তরা** আশ্বিনে বর্ষ আরম্ভ

সম্পাদক—শ্রীঅতুল প্রসাদ সেন, শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী (সহ)

আকার—প্রবাসী, ভারতবর্ষের অনুরূপ, পৃষ্ঠা ৮০ হইতে ১০০। একখানি করিয়া রঙিন ছবি। একবর্ণের অনেকগুলি।

প্রতি সংখ্যায়—বিখ্যাত লেখকদের ৩।৪টি করিয়া বড় গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, রসসাহিত্য, সমালোচনা, স্বরলিপি ইত্যাদি থাকে। **প্রবাসী-বাঙালী, আহরণী, সপ্তধারা, সঙ্কলন** বিভাগ গুলি এই পত্রিকার বিশেষত্ব।

পত্র সহ ৵১০ পয়সার ডাকটিকিট পাঠাইলে একখানা উত্তরা পাঠান হয়। আজই গ্রাহক হউন, বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৷৹

উত্তরা কার্য্যালয়—লক্ষ্ণৌ

বিষয় সূচী

বিষয় সূচী

এবার বড়দিনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার

একটি গ্রামোফোন

আপনার আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য আজই কিনিয়া রাখা

কর্ত্তব্য। তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

এস্ এন্ ভট্টাচার্য্য

গ্রামোফোন, সাইকেল, হারমোনিয়াম বাদ্যযন্ত্র ও

ফুটবল প্রভৃতি খেলার সরঞ্জাম বিক্রেতা।

৬নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(মাসিক সাহিত্য পত্রিকা)

প্রথম বর্ষ, ২য় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা

পৌষ, ১৩৩৪ সাল

সম্পাদক

শ্রীরেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

পরিচালক

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীপ্রণবদেব মুখোপাধ্যায়।

ধূপছায়া কার্য্যালয়

১৪নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শীত-বিহার

প্রফেসার উইলিয়াম রথেনষ্টীনের সংগ্রহ হইতে।

Bela P. W.

আমি সৃজি আকাশ কুসুম

—শ্রীঅজিতকুমার দত্ত

হে বন্ধু, তোমরা রচ মহা-সৌধমালা,
আমি সৃজি আকাশ কুসুম।
তোমাদের গৃহে হোক উৎসবের দীপ্ত দীপ জ্বালা,
আমার বেদনা দিয়া আমি রচি আনন্দ-কুসুম।
আমার ব্যর্থতাখানি সার্থক করিয়া লই মনে,
ব্যথার কণ্টক 'পরে বক্ষ রাখি গাহি যদি গান—
সকলের অবজ্ঞায় জগতের অজানিত কোণে,
তাহে তব কেন অভিমান?

তোমরা পেয়েছ হাসি-আলো-ভালোবাসা,
প্রেয়সীর রক্তাধর-রঞ্জিত চুম্বন,
জগত তোমার বক্ষে জাগায়েছে নব নব আশা,
চন্দ্রালোক উজলেছে তব কুঞ্জবন।
মোর শুষ্ক রিক্ত শাখে কল্পনায় ফুটাই মুকুল
সে কি এত বেশি অপরাধ?

আমার দুঃখেরে যদি আনন্দ বলিয়া করি ভুল—
তুমি কেন সাধ তাহে বাদ?

জানি সব মিথ্যা কথা, মোরে কেহ বাসে নাই ভালো
সবে চলে গেছে অহঙ্কারে,
জানি, কভু শরতের স্নিগ্ধ চন্দ্র আলো
প্রবেশ মাগেনি মোর দ্বারে।
তবু যদি কল্পনায় জগতের অবজ্ঞারে ভুলি
আমার প্রিয়ারে আমি সাজাই কুসুমে,
যদি মোর কুরূপেরে রূপ দিয়া সাজাইয়া তুলি,
আমারি সৃজিত প্রিয়া যদি মোরে চুমে,—
তাতে তুমি দিয়ো নাক বাধা
তাহে তুমি সাধিয়োনা বাদ।
মিথ্যা হাসি মাঝে আমি ডুবায়েছি মোর সত্য কাঁদা
সে কি এত বেশি অপরাধ?

ভবিষ্যৎ

—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

মাষ্টার না জল্লাদ……?

গণিয়া গণিয়া বেত মারে—পঁচিশ ঘা।

ভাবি, স্বর্গের যমদূত হয়ত না জানি কাহার শাপে মর্ত্ত্যে আসিয়া মাষ্টার হইয়াছে!

ললিতের চোখ দিয়া কিন্তু একবিন্দুও জল পড়ে না।

কাতরোক্তি……?

ফুঃ……

ও ত মেয়ে মানুষে করে।

সপাং সপাং করিয়া বেতের শব্দ উঠে……

বীরের ভঙ্গীতে বুক ফুলাইয়া ললিত হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

কাঁপেও না সে একটিবারও।

আমরা দেখিয়া অবাক হই।

মাষ্টারেরও বোধ হয় চমক লাগে।

ঘণ্টা বাজে।

একজনের পর আর একজন……

আসন কখনও খালি থাকে না।

এবারে মাষ্টার নয়—পণ্ডিত। বুড়া মানুষ, নাকের ডগায় দড়ি-বাঁধা পিতলের চশমা।

ঝিমায়……

আমরা বসিয়া বসিয়া কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিই।

বুড়া পণ্ডিত গ্রাহ্যও করে না।

দেখি, ললিতের হাতটি কাল-শিরা পড়িয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে।

বলি,—বড্ড লেগেচে তোর, না ভাই?

ললিত ঠোঁট উল্টাইয়া বলে,—ওঃ! ভারি ত লেগেচে! ঘোড়ার ডিম! ও রকম বেত আমি একদমে একশ' ঘা খেতে পারি।

কথাটা অসম্ভব মনে হয় না।

প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকি।

ললিত বলে,—জানিস, বারো বছরের ছেলে বাদল লড়াই করেছিল বাদশা আলাউদ্দীনের সঙ্গে! গুলির ওপর গুলিবৃষ্টি, বন্দুকের আওয়াজে আকাশ কালো, কামানের ধোঁয়ার অন্ধকার, বুক চিরে তার বিদ্যুতের মত ঝিলিক-হানা হাজারো যোদ্ধার হাজারো তলোয়ার! তারই মাঝে ঘোড়ায় চড়ে বুক ফুলিয়ে লড়াই দেচে বাদল—বারো বছরের ছোট্ট ছেলে! আমি ত তবু তার চেয়ে এখন এক বছরের বড় রে। বুঝলি?

কি যে বুঝি তাহা ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু, তাহার রক্ত-জমা ফুলা হাতখানার দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠি।

বলি,—বড্ড কাল-শিরে পড়েচে যে ভাই।

ললিত পকেট হইতে একখানি রুমাল বাহির করিয়া দেয়।

বলে,—আচ্ছা, এইখানা ভিজিয়ে আন দিকি কল থেকে। জল-পটি বেঁধে দিলে জমা-রক্তটা সরে যাবে'খন।

ভাবখানি দেখিয়া মনে হয়, ব্যথাটা যেন উহার নিজের নয়—আমারই!

রুমালটি হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াই। হাঁকি,—May I go out, sir?

ঝিমাইতে ঝিমাইতে বুড়া পণ্ডিতও ইংরাজি বলে,—Yes।

ফুটবল ম্যাচ……

থার্ড ক্লাসের সহিত সেকেণ্ড ক্লাসের।

এই দুইটা ক্লাসের মধ্যে একটা অজানা আক্রোশ অনেকদিন হইতেই ধোঁয়াইতেছিল, আজ সহসা যেন বাতাস পাইয়া জ্বলিয়া উঠিল।

—ফাউল।

রেফ্রি বাঁশী বাজায়।

সেকেণ্ড্ ক্লাসের একটি ছেলে সেই যে বসিয়া পড়ে উঠিয়া আর খেলিতে পারে না।

আঘাতটা নাকি সাঙ্ঘাতিকই।

আর একটি ছেলে চোখ রাঙাউয়া বলে,—Take care,

ললিত হাসিয়া বলে,—No need to show your red eyes, my friend।

কথায় কথায় কথা বাড়িয়া উঠে……

শেষে মুখোমুখি হইতে হাতাহাতি!

পটাপট্ করিয়া ছাতার বাঁট ভাঙে,—পায়ের জুতা আকাশে উড়ে,—জামা-কাপড় ছিঁড়িয়া ফর্দা-ফাই!

দর্শকও ছুটে—খেলোয়াড়ও ছুটে।

প্রাণ বাঁচাইতেই প্রাণান্ত প্রায়!

খেলা আর হয় না।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠে।

দেখি, বিজয়ী বীরের মত বুক ফুলাইয়া ললিত তখন ঘরে ফিরে। মাথায় তাহার রুমাল বাঁধা,—রক্তে সেখানা টক্‌টকে লাল।

সঙ্গী পাইয়া সাহসী হই……

খিরীষ গাছের কোটর হইতে বাহির হইয়া ডাকি,—ললিত! ও ললিত!

ললিত ফিরিয়া দাঁড়ায়।

কাছে আসিলে হাসিয়া বলে,—কিরে এতক্ষণ তুই ছিলি কোথা?

আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া দিই।

ললিত তেমনি হাসি-মুখে বলে,—ঐ খিরীষ গাছে! পালিয়ে এসে লুকিয়েছিলি বুঝি?

লজ্জিত হইয়া নতমুখে বলি,—হ্যাঁ।

ললিত আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলে,—দূর বোকারাম! ব্যাটাছেলের কি পালাতে আছে রে?

দেখি, রুমাল ভিজিয়া কপালের পাশ দিয়া টক্‌টকে রক্ত তখনও গড়াইয়া পড়ে।

বলি,—খেল্‌তে গিয়ে তুমি অমন মারামারি কর কেন ভাই?

ললিত হাসিয়া বলে,—দূর পাগল! ওকি আর মারা-মারি রে?……ও হ'ল যুদ্ধু! জানিস, নেপোলিয়ান বরফ দিয়ে দুর্গ তৈরী করে যুদ্ধু যুদ্ধু খেল্‌ত। আমাদের দেশে বরফ নেই,—তাই আমরা ফুটবল নিয়ে যুদ্ধু যুদ্ধু খেলি।

দেখে নিস্ শঙ্কর, আমিও একদিন নেপোলিয়ান হব—নিশ্চয়ই।

নেপোলিয়ানকে কখনও দেখি নাই, তাহার জীবনীও কখনও পড়ি নাই।—কিন্তু তবুও যেন কেমন মনে হয়,—নেপোলিয়ান ছেলে বেলায় অমনিই ছিল হয়ত!

অঙ্কের মাষ্টার জিজ্ঞাসা করে,—ললিত তোমার অঙ্ক হয়নি কেন?

ললিত মিথ্যা বলে না;

অম্লান বদনে উঠিয়া উত্তর দেয়,—অঙ্ক কষতে আমার ভাল লাগে না সার, তাই।

মাষ্টার রাগিয়া চীৎকার করিয়া উঠে,—Stand upon the bench.

ললিত দ্বিরুক্তি না করিয়া বেঞ্চের উপরে উঠিয়া দাঁড়ায়।

মাষ্টার পিছন ফিরিয়া বোর্ডের গায়ে খড়ি দিয়া অঙ্ক বুঝায়;—ললিত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া জিব বাহির করিয়া তাহাকে ভেংচি কাটে—পুরা পঁয়তাল্লিশ মিনিট—অবিশ্রান্ত!

বলি,—পড়াশুনো তুমি কর না কেন ভাই, এমনি করে ঠায় দাঁড়িয়ে থাক্‌তে কি তোমার কষ্ট হয় না?

ললিত হাসিয়া বলে,—দূর গঙ্গারাম! কষ্ট হবে না কেন? কিন্তু তবু ঐ কষ্ট যে আমাকে সইতে হবে রে!

একটুখানি থামে।

তাহার পর আবার আস্তে আস্তে আরম্ভ করে,—জানিস্, শিবাজীও ছেলেবেলা এমনি ধারা মোটেই লেখাপড়া কর্‌ত না। রাত্রিদিন শুধু ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াত—মহারাষ্ট্রের পথ-ঘাট সব চেনবার জন্তে। আমার

ঘোড়া নেই কিন্তু তবুও আমি ঘুরে বেড়াই পায়ে হেঁটে—কলকেতা আর ভবানীপুরের গলি-ঘুঁজি সব চেনবার জন্তে! দেখিস্, এবারে আর দাক্ষিণাত্যে নয়—বাংলায়—আমি হব তোদের শিবাজী।

বিস্মিত দৃষ্টিতে ললিতের মুখের দিকে চাহিয়া থাকি।

দীপ্ত ডাগর জ্যোতি ভরা দু'টি কালো চোখ……

ঐ চোখের দিকে চাহিয়া মনে হয়, ও যেন কিসের স্বপ্ন দেখে—রাত্রিদিন।

মানুষ যেন স্রোতের তৃণ…………

অবস্থার ঢেউয়ে ভাসিয়া চলে—দেশ হইতে দেশান্তরে।

জীবনটা যেন শুধুই চলা………

একটুখানি বিশ্রামের অবসর কোন খানে বুঝি ইহার একেবারেই নাই!

দীর্ঘ কুড়িটি বৎসর………

ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্তি আসে………

কিন্তু অবকাশ কই?

মা বলেন,—পাহাড়ী দেশ আর ভাল লাগে না শঙ্কর, চল্ দিনকতক কলকেতায় যাই।

আমারও মনটি যেন কিসের আকর্ষনে নাচিয়া উঠে। এই রুক্ষ পাহাড়ী দেশের শুষ্ক নীরসতা সত্যই আর ভাল লাগে না। বাংলাদেশের স্নিগ্ধ মধুর শ্যামলিমা যেন মনে-মনে আমায় হাত ছানি দিয়া ডাকে!

বলি,—সেই ভাল মা, চল দিন কতক কলকাতা থেকেই ঘুরে আসি।

সুদূর প্রবাসের দু'দিন-পরিচিত বন্ধুগুলির নিকট হইতে বিদায় লই।

ষ্টেসন পর্য্যন্ত তাঁহারা আগাইয়া দিতে আসেন।

গাড়ী ছাড়িয়া দেয়।

রুমাল দুলাইয়া তাঁহারা তাঁহাদের অন্তরের শেষ প্রীতি-সম্ভাষণটুকু জানাইয়া দেন।

চলন্ত গাড়ীর জানালায় বাহিরে মুখ বাহির করিয়া রুমাল দুলাইয়া প্রত্যুত্তর দিই।

কলিকাতা………

ঠিক যেন মাটি আমার!

হউক ইট্-কোঠা আর ট্রাম-মোটরে ঠাসাঠাসি……

তবু যেন কেমন বড় ভাল লাগে………

মনে হয় বহুদিনের পরে আমি যেন আমার হারানো মায়ের স্নেহ-পবিত্র সুকোমল কোলটিতে আবার ফিরিয়া আসিলাম।

আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধু-বান্ধবের ভিড় লাগিয়া যায়।

আমারও ছুটাছুটির অন্ত নাই……

চায়ের নিমন্ত্রণ রাখিতে ট্রাম কোম্পানীর কাছে বুঝিবা আমার যথা সর্ব্বস্বই বিকাইতে হয়!

সেদিন পায়ে হাঁটিয়াই ফিরিতেছিলাম……

সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ প্রায়।

ফুট্পাথরেরর ধারের ধারে লাইট্ পোষ্টের মাথায় গ্যাসের আলো।

হঠাৎ পথে তাহার সহিত দেখা।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একটুখানি আমার মুখের দিকে চাহিয়া খপ করিয়া সে আমার হাত দুইটি ধরিয়া ফেলে।

—শঙ্কর!

চিনিতে কষ্ট হয়, কিন্তু ভুল হয় না।

—ললিত!

ললিত হাসিয়া বলে,—এত শীগ্গির চিনে ফেল্লি রে?

পরণে একটা দুর্গন্ধ চওড়া পাড় সাড়ী, গায়ের কোর্টটাও তেম্নি ময়লা, মইসে-ধরা, পিঠের কাছে খানিকটা কাটিয়া গিয়াছে, কালে একটি বাঁট ভাঙা ছেঁড়া ছাতি, পায়ের জুতা জোড়াটা যে পথের মুচি গুলার লোলুপ দৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া কেমন করিয়া এতদিন চলিতেছে তাহা একটা ভাবিবার বিষয়।

আশ্চর্য্যই বটে!—এত শীগ্গির বোধ হয় যেন না চেনাই আমার উচিত ছিল।

ললিতের মনটি কিন্তু খুশীর আলোয় ভরিয়া উঠে। তাহার মুখ দেখিয়া তাহা বেশ বুঝিতে পারি।

মনে হয় যেন নিবিড় কালো মেঘের কোলে একটুখানি সোনার রৌদ্র চিক্ চিক্ করে!

বলে,—তারপর, কেমন আছিস ভাই? ওঃ! কত কাল পরে দেখা! প্রায় বিশ বছর হবে—নারে?

বলি,—হ্যাঁ তুমি কেমন আছ ভাই?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ললিত বলে,—আমার আর থাকাথাকি কি ভাই! মরিনি শুধু বেঁচে আচি—এই পর্য্যন্ত।

একটুখানি থামে।

আপনাকে বোধ হয় সামলাইয়া লয়।

পরে আবার জিজ্ঞাসা করে,—এতদিন কোথা ছিলি রে? এত লোকের সঙ্গে দেখা হয়—সেই ছেলেবেলাকার বন্ধু সব—কিন্তু কই তোর সঙ্গে ত দেখা হয়নি একটি দিনও।

বলি,—আমি ত এখানে এতদিন ছিলুম না ভাই।

ললিত বলে,—ওদের সঙ্গে দেখা হ'লে কিন্তু তোর কথাটাই আমার সব চেয়ে আগে মনে পড়ে শঙ্কর। জানিস্, আমি যখন ক্লাসে পড়াশুনো করতুম না তখন তুই আমাকে কি বল্‌তিস—মনে পড়েরে আর সে সব কথা?

পড়ে বৈকি!

কিন্তু সে কথা তুলিয়া এখন আর ফল কি!

ললিত হাসে।

ঐ হাসিটা কিন্তু ওর মুখে বড় বেমানান্ দেখায়।

বলে,—আমি কিন্তু সে কথা গুলো ভুলিনি আজো। তোদের শিবাজী আজকাল কি করে জানিস্? ত্রিশ টাকা মাইনের বার্ড কোম্পানীর হিসেব রাখে!

বলিয়াই সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠে।

মনে হয়, ওটা যেন ঠিক হাসি নয়,—একটা বুকফাটা কান্না!

আলোচনার গতিটা উল্টাইয়া দিতে চাই।

বলি,—তোমার বাড়ীর সব ভাল আছেন ত ললিত?

ললিত বলে,—চল্ আমার বাড়ীতে। ভাল আছে কি মন্দ আছে দেখেও আসবি আর বিকেল বেলার চাটা না হয় ওখান থেকেই খেয়ে আসবি। সত্যি শঙ্কর, এত দিন পরে কিন্তু তোকে ছেড়ে দিতে আমার মোটেই ইচ্ছে হচ্চে না।

জিজ্ঞাসা করি,—তোমার বাসাটা এখান থেকে কত দূর হবে ভাই?

ললিত বলে,—বেশী দূর নয়, বরং খুবই কাছে। মাত্র তিন মিনিট। এই বাঁ-হাতি গালিটার মধ্যে খান ছয়েক বাড়ী পরেই।

অগত্যা বলি,—আচ্ছ বেশ, তাই চল। আজকের চাটা না হয় তোমার ওখানেই খেয়ে আসা যাবে।

দুর্গন্ধ ভরা অন্ধকার গলি।

মাটি-লেপা অন্ধকূপ………

সোর খুঁছড়ি!

বাহিরে বাসিবার ঘর নাই………

কাজেই অন্দরে মহলে একেবারে শুইবার ঘরে আনিয়াই বসায়।

অন্ধকার কোণে ক্ষুদ্র একটি মাটির প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলে।

অগোছাল-অপরিচ্ছন্ন ঘর খানি।

হ্যারিকেনের চিম্‌নীটা ভাঙা, টেবিলটাতে পায়া, চেয়ার-হাতল দুইটা একেবারেই নাই………

অসহ্য অভাবের একটা মর্ম্মান্তিক কাতরতা সমস্ত ঘর-খানি ভরিয়া যেন নিঃশব্দে হাহাকার করিয়া কাঁদে!

মেঝেটাতে বোধ হয় আঙুল টিপিলেই জল উঠে—এমনি ঠাণ্ডা!

অদূরে একখানি ভাঙা তক্তাপোষ ময়লা একটি ছেঁড়া কাঁথায় দশ-এগার বৎসরের একটি কঙ্কালসার ছেলে জ্বরের যন্ত্রনায় শুধু পড়িয়া পড়িয়া ছট্‌ফট্ আর গোঙায়।

জামা কাপড় ছাড়িয়া ললিত বলে,—ঐটি আমার বড় ছেলে। ওর নাম রেখিচি কি জানিস্?—বাদল! লড়াই সুরু হয়ে গেচে শঙ্কর, কিন্তু ওর প্রতিদ্বন্দ্বী বাদশা আলাউদ্দীন নয়—তার চেয়েও ভয়ঙ্কর……

ঠাণ্ডা মেঝের ভিজা মাটির উপরে বসিয়া একটি পনের ষোল বছরের মেয়ে পান সাজে।

ঘরের কোণের দীপশিখাটির মতই অমনি করুণ, অমনি ম্লান!

মেয়েটি অবিবাহিতা।

ললিত বলে,—এইটি আমার বড় মেয়ে—কৃষ্ণকুমারী। আর জন্মে এ জন্মেছিল রাজপুতনায়, রাজার ঘরে;—এ জন্মে বাংলা দেশে, আমার কুঁড়েয়।

বলিয়াই সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠে।

কী মর্ম্মান্তিক ওর ওই হাসিটা!

বলে,—প্রণাম কর মা। ইনি তোমার কাকাবাবু হন।

মেয়েটি গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করে।

আমি তাহার রুক্ষ কোঁকড়া চুলগুলির উপর হাত দুইটি রাখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকি।—কি বলিয়া যে আশীর্ব্বাদ করিব তাহা যেন ভাবিয়া পাই না!

ললিত বলে—যাও ত মা, আমাদের জন্যে দু'কাপ চা তৈরী করে আনদিকি।

মেয়েটি নীরবে চায়ের সরঞ্জাম লইয়া বাহির হইয়া যায়।

একটু পরেই দেখি, মূর্ত্তিমতী ব্যথার মত একটি নারী…

কোলে একটি শীর্ণরুগ্ন খোকা,—হাঁফাইয়া হাঁফাইয়া শ্বাস টানে—মনে হয় যেন ধুঁকিতেছে।

ললিত বলে,—এই আমার স্ত্রী। বাপ-মায়ে ওর নাম রেখেছিল জুঁই, আমি কিন্তু বদলে রেখেচি যোসেফাইন। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাই;—বুঝ্লি? আর ওর কোলের ঐটি হল আমার ছোটছেলে—ম্যাক্সুইনি।—না খেয়েই ওকে মরতে হবে নিশ্চয়ই।

বলিয়াই আবার হাসে।

সেই হাসি!

তাহার পর তাহার স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলে,—এঁরই নাম শঙ্করবাবু যোসেফাইন। আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু। এক সঙ্গে আমরা এক ক্লাসেই পড়েচি অনেক দিন।

যোসেফাইন স্নিগ্ধ মধুর একটু হাসিয়া বলে,—আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বড় খুসী হলুম শঙ্কর বাবু। আপনার নাম উনি প্রায়ই করেন। আপনি নাকি ছেলেবেলা ওঁকে লেখাপড়া করবার জন্যে অনেক উপদেশ দিতেন।

ললিত হাসিয়া উঠে।

বলে,—ও ছিল তখনকার দিনে আমার একটি খুদে অভিভাবক।

যোসেফাইন বলে,—বলুন আপনি। আমি আসচি এক্ষুনি। দেখবেন, আমার অনুপস্থিতির সুযোগ পেয়ে পালাবেন না যেন কিন্তু।

বসিয়া থাকি।

ললিত গল্প করে……

কেমন করিয়া বি, এ পরীক্ষায় সে ফেল হইল,—তারপর মায়ের অনুরোধে কেমন করিয়া সে বিবাহ করিতে বাধ্য হইল,—পরে চাকুরীর উমেদারীতে কেমন করিয়া কত বৎসর লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া শেষে এই খানে তাহার অদৃষ্ট একটু প্রসন্ন হইল—এই সব!

একটু পরেই দেখি কৃষ্ণকুমারী আসিয়া ঘরের মেঝেটি ঝাঁট দিয়া একধারে দুই খানি হাতে বোনা কার্পেটের আসন পাতিয়া রাখিয়া যায়।

ভাবি, এ আবার কিসের আয়োজন!

কিন্তু সন্দেহ যাহা করি ঘটেও ঠিক তাহাই।

আসন দুইখানির সম্মুখে একটু পাশে চায়ের পেয়ালা দুইটী রাখিয়া কৃষ্ণকুমারী সরিয়া দাঁড়ায়।

পিছনে তাহার যোসেফাইন! হাতে তাহার দুইটি রেকাবীতে খান কয়েক লুচি ও একটু তরকারি।

রেকাবী দুইটি আসন দুইখানির সম্মুখে নামাইয়া রাখিয়া মিষ্টি করিয়া একটু হাসে।

বলে,—বসুন।

বলি,—এ সব আপনি কি করেচেন?

যোসেফাইন কিন্তু তেমনি হাসি-মুখে বলে,—কি আর এমন করেচি বলুন ত!

ললিতের দিকে ফিরিয়া বলি,—বাড়ীতে পেয়ে আমার ওপরে এমন অত্যাচার করবে জানলে আমি কিন্তু তোমার এখানে কিছুতেই আসতুম না ভাই!

ললিত হাসিয়া বলে,—ভদ্রতাটা ত বজায় রাখ্তেই হবে শঙ্কর,—তা দেনা করেই হোক, আর চুরি করেই হোক। নে ওঠ,—খাবি চল্।

পাশাপাশি বসি—আমি আর ললিত।

যোসেফাইন বসিয়া হাওয়া করে……

আমাকেও।

অনেক রাত্রে বাড়ীতে ফিরি।

দেখি, মা তখনও আমারই জন্য জাগিয়া বসিয়া আছেন।

লজ্জিত হই।

মা বলেন,—এত রাত হল কেন রে? খাবার জুড়িয়ে যে জল হয়ে গেচে!

বলি,—থাক্‌গে। আজ আর আমি কিছু খাব না মা।

মা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠেন।

বলেন,—কেন রে? তোর শরীর……

বলি,—না মা। শরীর আমার ভালই আচে। তবে পথে আজ এক ছেলেবেলাকার বন্ধুর সঙ্গে দেখা—কিছুতেই ছাড়লে না সে—চায়ের নাম করে বাড়ীতে নিয়ে গে খুব কিছু খাইয়ে ছেড়ে দিলে।

—তাই ভাল।

মা নিশ্চিন্ত হইয়া বলেন,—তবে আর রাত করিস্ নি যেন—শুয়ে পড়্‌গে যা।

বলি,—তুমিও কিন্তু শোও গে মা, আর রাত করো না যেন।

মা দেখি কথার অবাধ্য নন; লক্ষ্মী মেয়েটির মত আস্তে আস্তে তাঁহার নিজের ঘরটিতে যাইয়া শুইয়া পড়েন।

আমার চোখে কিন্তু ঘুম আসে না একেবারেই।

বাহিরের বারান্দায় ইজি চেয়ারটিতে শুইয়া অন্ধকারের দিকে চাহিয়া চুপ্‌টি করিয়া পড়িয়া থাকি।

নিস্তব্ধ নিরন্ধ্র অন্ধকার……

বহুদূর হইতে একটা এক ঘেয়ে ঝিঁঝিঁর শব্দ ভাসিয়া আসে……

মনে হয়, অন্ধকারের অন্তরালে পৃথিবীর নিরুদ্ধ নিপীড়িত অন্তরাত্মা যেন গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদে।

মনটা যেন কেমন একটা অজানা ব্যথার অশ্রু-নিষেকে ভিজিয়া ভারি হইয়া উঠে!

পড়িয়া থাকি……

কত কথাই না পড়ে……

সেই বাদল, নেপোলিয়ান, শিবাজী……

আর এই কৃষ্ণকুমারী, যোসেফাইন ও ম্যাক্‌সুইনি……

অন্ধকার আকাশে অগণ্য নক্ষত্র পুঞ্জ……

ঐদিকে চাহিয়া চাহিয়া আমি যেন উহাদের একটা অর্থ খুঁজিয়া পাই!

মনে হয়, উহারা যেন নক্ষত্র নয়—অনন্ত কোটী ব্যর্থ মানবাত্মার ব্যথার প্রতীক—দিনের আলোয় দেখা যায় না, শুধু রাতের অন্ধকারে দপ্‌ দপ্‌ করিয়া জ্বলে!

চিরকুমারের অভিযোগ

—শ্রীকমলকুমার সান্যাল

সংসার সুখে বঞ্চিত হয়ে সংসারী লোকদের দুর্বলতা লক্ষ্য করেই আমি অনেক কাল কাটিয়ে দিয়েছি—মনকে শুধু প্রবোধ দেবার জন্যে।

স্বামী-স্ত্রীর বাগ্‌যুদ্ধ দেখে যে আমি কখনও বিশেষ বিচলিত হয়েছি, তা নয়; আমি আমার লোকাচার বিরুদ্ধ সঙ্কল্প ঠিক ক'রেই রেখেছিলাম, তার অনেক আগে থেকে,—তার চেয়ে ঢের গুরুতর কারণে এমন কি স্বামী স্ত্রীর দ্বন্দ্ব যে আমার সঙ্কল্পকে একটু দৃঢ়তর করতে পেরেছিল, তাও আমি বলতে পারি নে। গৃহস্থের ঘরে যা সব চেয়ে আমার বেশী বিরক্তিকর লাগে, তা ঝগড়া নয়,—তা একেবারেই আলাদা জিনিষ। সেটি হচ্ছে তাদের ভালবাসার বাড়াবাড়ি!

উঁহুঁ; ঠিক বেশী ভালবাসাও নয়; ওতে আমার কথা স্পষ্ট হল না। কেন না, ওতে আমার বিরক্ত হবার আছে কি? স্ত্রী পুরুষ যে পরস্পরকে কাছে কাছে রেখে মিলনের সুখটুকু পুরো মাত্রায় ভোগ করবার জন্যে দুনিয়ার আর সবখানি থেকে নিজেরা পৃথক হয়ে থাকে, তাতে এই প্রমাণ হয় যে তারা বাঁকী দুনিয়াটার তুলনায় পরস্পরকেই বেশী আদরনীয় মনে করে।

কিন্তু আমার নালিশের বিষয় হচ্ছে এই, যে তারা তাদের ঐ পক্ষপাত বিচারটিকে এমন অসঙ্গোপনে দেখিয়ে বেড়ায়, এমন নির্লজ্জভাবে সেটিকে তারা অনূঢ় আমাদের চোখের সামনে এনে ধরে, যে একদণ্ডকালও যদি তাদের সঙ্গে থাকা যায়, তা হলে আকারে ইঙ্গিতে তারা ভাল করেই বুঝিয়ে দেবে যে,—তাদের পক্ষপাতিত্বের ভেতর তোমার ঠাঁই নেই। এখন, এমন কতকগুলি বিষয় আছে যা শুধু আভাসে বা ধর্তব্যের মধ্যে থাকলে তেমন অসন্তোষের কারণ হয় না, কিন্তু যা প্রকাশ করলে বেজায় বিশ্রী ঠেকে। যদি কেউ তার আলাপী কোনও অমহিলাকে সাদাসিধা-চেহারা বা সাদাসিধা-সাজগোজ পরা দেখে সটান গিয়ে বলে যে 'তুমি রূপে বা ঐশ্বর্য্যে আমার উপযুক্ত নও, আর সেই হেতু আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারি নে,' তা হলে সেই অশিষ্টতার পুরস্কার হচ্ছে তাকে উত্তম মধ্যম জুতিয়ে দেওয়া। তথাপি, সে ব্যক্তি যে সুযোগ. সুবিধা সত্ত্বেও কখনও ঐরকম প্রস্তাব উত্থাপন করা আবশ্যক বোধ করে নি, এতে ঐ প্রস্তাবটিকেই বিনাবাক্যে স্বীকার করে নেওয়া হয়। কথা-বলার মতই স্পষ্টভাবে মহিলাটি তা বুঝে নেন; যদিও কোনো স্থির-মস্তিষ্ক স্ত্রীলোকই তার জন্য বিবাদ করতে প্রস্তুত হবেন না। সেইরূপ, আমাকেও কোন দম্পতীর বলা উচিত নয় যে আমি তাঁদের প্রণয়াস্পদ নই, এবং সেই জন্য অতি দুর্ভাগা,—তা সে মুখের কথাতেই বল আর কথার মত পরিষ্কার চাহনির দ্বারাই বল। আমি জানি আমি অভাগা, সেই যথেষ্ট; সকল সময় এমন মনে-করিয়ে-দেওয়ার অপেক্ষা আমি রাখি নে।

পাণ্ডিত্যের আড়ম্বরে বা ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরে ব্যথা খুবই দেয় বটে; কিন্তু তার একটা সুফল থাকতে পারে। যে পাণ্ডিত্যের বড়াইয়ে উপস্থিত আমার অপমান হল, তা হঠাৎ আমার কাজে লেগে যেতেও পারে। আর বড়লোক যে, তার প্রাসাদে ও চিত্রশালায়, উদ্যানে বা প্রমোদকাননে, ক্ষণেকের তরেও আমার একটু ভোগদখলের সুযোগ আছে। কিন্তু দাম্পত্য প্রেমের আড়ম্বরে ভাল বলবার তেমন কিছুই নেই; ওটা একেবারে আগাগোড়াই খালি অপমান!

বিয়ে জিনিষটা যত ভাল আখ্যাই দেওয়া যাক, ও একটা একাধিপত্য, তাও আবার এমনি যে অন্যের মনে তাতে অত্যন্ত ঈর্ষার সঞ্চার করে। সচরাচর লোকে একটা কিছু বিশেষ অধিকার পেলে অপরকে তা জানতে দিতে চায় না, পাছে আর কেউ তা দেখে আপত্তি করে। কিন্তু বিয়ে করা

একচেটে রাজত্বের সব চেয়ে অপ্রীতিকর দিক্‌টাই লোকে অন্যের চোখের সামনে দেখিয়ে বেড়ায়।

কোনও নব-পরিণীত প্রণয়ি-যুগলের মুখমণ্ডলে—বিশেষ ক'রে প্রণয়িনীর মুখমণ্ডলে আত্মপ্রসাদের যে পূর্ণ প্রতিচ্ছবিটি দেখতে পাওয়া যায়,—আমার কাছে তা অত্যন্ত আপত্তিকর, এতে মনে হয় আমাকে বলে দেওয়া হচ্ছে, যে প্রণয়িনীটির ভাগ্য ঠিক হয়ে গিয়েছে, তাঁকে পাবার আর কোন আশাই আমার নেই। আরে আমার আশা নেই সে ত সত্যি কথা!—হয় ত কোন আকাঙ্খাও নেই আমার! আগেই কিন্তু ব'লেই রেখেছি, এ হচ্ছে সেই শ্রেণীর সত্য যা' ধরে নেওয়াই উচিত, প্রকাশ করে বলা উচিত নয়।

অনূঢ় আমাদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে এই সব বিয়ে-করা লোকে যে সকল ভাবের আতিশয্য দেখান, তাতে যদি আর একটু বুদ্ধিশুদ্ধির পরিচয় থাকত, তা হলে সেগুলো সত্যিই অসহ্য হ'ত একেবারে। বিবাহিতের স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁরাই যে সমধিক অভিজ্ঞ একথা স্বীকার আমাকে করতেই হবে—যদিও তাঁদের সঙ্গসুখ থেকে অব্যাহতি পাবার সৌভাগ্য আমার আজ পর্য্যন্ত ঘটে নি কখনও। কিন্তু এতেই তাঁদের উদ্ধত প্রকৃতি শান্ত হবার নয়। যদি একক-লোক কেউ তাঁদের সামনে অতি সামান্য বিষয়েও কোনো মতামত প্রকাশ করতে সাহস করে, তা হলে তৎক্ষণাৎ তাকে অনভিজ্ঞ বলে চুপ করিয়ে দেওয়া হবে! এমন কি, কলকাতার বাজারে ডিমের যোগান দিতে হলে তার জন্যে মুরগী পুষতে হয় কেমন করে, সেই প্রসঙ্গে আমি দুর্ভাগ্য বশতঃ আমার পরিচিত একটি বিবাহিত যুবতী হ'তে ভিন্নমত হয়েছিলাম বলে নিঃসঙ্কোচে তিনি আমাকে এই ব্যঙ্গোক্তি করলেন যে আমার মত বুড়ো আইবুড়ো কেমন করে' এই সব বিবাহিত-জীবন-রহস্য জানতে পারে,—অথচ তামাসার চরম এইটুকু যে তিনি তাঁর নতুন 'বিবাহিত'-আখ্যা লাভ করেছেন তখন এক পক্ষেরও ওপরে নয়।

আবার এই বিবাহিত-জীবগুলির যখন সন্তানাদি হয়—(সন্তানাদি [illegible] তাদের হবেই থাকে;—কবি বলেছেন 'বিয়ে হলেই [illegible] আসে [illegible]')—তখন তাদের [illegible]—এ পর্য্যন্ত যত কিছু বলেছি সে সব তার কাছে কিছুই নয়! শিশু-সন্তানের বিরলতায় কি রকম অসদ্ভাব, এ যখন উপলব্ধি করা যায়—যখন দেখতে পাওয়া যায়, পথের ধারে, অলিতে গলিতে ছেলেপুলের কি বিষম ভিড়—আবার যখন দেখা যায় যে সাধারণতঃ গরীবের ওপরেই ষষ্ঠিদেবীর কৃপা সমধিক, তা ছাড়া' কোনো বিবাহই যখন প্রায় নিষ্ফল যায় না—যখন ভাবা যায় যে কত সন্তান বড় হয়ে দুঃশীল ও কুপথগামী হয়। শেষে বাপ মায়ের সাধের আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়ে অভাব ও অপমানের তাড়নায় মরণকে পর্য্যন্ত স্বেচ্ছায় আলিঙ্গন করে—তখন এ আমি সারা জীবন ভেবেও ঠিক করতে পারি নে যে ছেলে হওয়ার মধ্যে গর্ব্ব অনুভব করবার কি থাকতে পারে। যদি বাস্তবিকই তারা একটি কন্দর্পের অংশ বিশেষই হত আর বছরে একটির বেশী না জন্মাত, তা হলে হয় ত কথা ছিল; কিন্তু এতই সহজে যখন তারা মেলে—।

মেয়েরা আবার ছেলে-হওয়া নিয়ে পুরুষদের চেয়েও বেশী গৌরব করে,—থাক্ তার সম্বন্ধে আমি আর কিছু বলব না। সে বিষয়ে স্বামীরাই একটু সতর্ক হোন্। কিন্তু আমরা, অবিবাহিতেরা ত আর স্ত্রীর দাস হবার জন্যে জন্ম-গ্রহণ করি নি, আমরা কেন আমাদের 'ভক্তি-অশ্রু-সলিল-সিক্ত' অর্ঘ্য তাঁদের চরণে এনে দেব?

বাইবেলের একটি স্তোত্রের একস্থলে আছে, "যোদ্ধার হাতে যেমন ধনুর্ব্বাণ, গৃহস্থের ঘরে শিশুসন্ততিতেও তেমনি। শিশু-সন্ততি-রূপ বাণে যার তূণ পরিপূর্ণ, সে ব্যক্তি সুখী।" আমি এতে খুব সায় দিই; কিন্তু নিরস্ত্র আমাদের ওপর যেন তাঁদের তূণ নিঃশেষিত না হয়, এই আমার অনুরোধ। খোকাখুকীরা বাণতুল্য হোক, কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু তাদের দিয়ে যেন আমাদের বিদ্ধ না করা হয়। সচরাচর দেখছি এসব তীরের আবার দুটি করে' ফলা থাকে—অন্ততঃ একটি ফলাও যাতে ব্যর্থ সন্ধান না হয়ে ফিরে আসে। ধর যেমন ছেলেপিলের বাড়ীতে এসে তুমি তাদের কোনো খবর নিলে না (তুমি হয় ত অন্য কিছু চিন্তায় ব্যস্ত আছ এবং সেই জন্যে শিশুর সরল প্রণয়ে মুগ্ধ হবার অবসর পাচ্ছ না) তা হলে তোমার বদনাম বেরিয়ে যাবে তুমি কলহপ্রিয় এবং অপ্রকৃত। আবার যদ তুমি খোকাখুকীদের মধুর আলাপে

সন্তুষ্ট হয়ে তাদের সঙ্গে খেলতেই লেগে গেলে, তা হলে দেখবে তাদের অন্য ঘরে পাঠাবার জন্যে নানারকম অকাট্য যুক্তি বেরুতে থাকবে। হয় ত শুনবে খোকারা ভারী চঞ্চল ও বাচাল, না হয় শুনবে অমুক বাবু ছেলেপিলে পছন্দ করেন না। শিশুরূপী বাণের এই দুটী ফলা; এর একটিতে তোমাকে বিঁধবেই বিঁধবে।

চ্যাংড়া ছোঁড়াগুলোকে একটু খেলা দিলেই যদি তাঁদের কষ্ট হয়—তাতে যদি তাঁদের আশঙ্কার কারণ থাকে, তা হলে না হয় নাই খেলা দিলাম! কিন্তু শুধু শুধু—বাদ বিচার না করে একদল ছেলেকে—ন' দশজনকে—জোর করে ভালবাসতে হবে—শিশুরা স্বভাবতঃ মধুর প্রকৃতি বলে, তাদের সকলকেই সমান আদর করতে হবে—এ আরও অসঙ্গত আব্দার, এ অসহ্য!

কথায় বলে, 'আমায় ভালবাস ত আমার কুকুরকেও ভালবাস!' কিন্তু কার্য্যতঃ এটি পালন করা কি সব সময়ে সম্ভব? বিশেষতঃ যদি খেলাচ্ছলে কুকুরটিকে লেলিয়ে দেওয়া হয়,—তোমায় কামড়িয়ে দিতে বা জ্বালাতন করতে? তবে কুকুর কিম্বা তার চেয়ে কোনো জিনিষ—স্মৃতিচিহ্নের মত কোনো অচেতন পদার্থ—যথা, ঘড়ি, আংটী, গাছ বা দূরপ্রবাসী বন্ধুর সঙ্গে শেষ মিলনের স্থানটি—এ সবকেও বরং কোন রকমে ভালবাসা যেতে পারে, কেন না যা আমার বন্ধুকে মনে করিয়ে দেয়, তাও আমার কাছে আদরের জিনিষ; খালি এইটুকু এর মধ্যে দেখবার, যে স্মৃতিচিহ্নটি স্বয়ং নিরপেক্ষ এবং কল্পনার অনুরঞ্জন যোগ্য কিনা। কিন্তু শিশুর একটা প্রত্যক্ষ চৈতন্য আছে,—একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে;—তাদের স্বভাবের মাধুর্য্য বা পরুষতা তাদের নিজস্ব, আর সেই নিজস্ব স্বভাবের তারতম্য অনুসারেই তারা স্নেহ অথবা বিরাগের পাত্র বিবেচিত হয়ে থাকে, শিশুপ্রকৃতিকে অপর কারও আনুসঙ্গিক মাত্র মনে করে' সেই-মত তাকে স্নেহ বা ঘৃণা করা চলে না, সেটা এমনই বাস্তব জিনিষ! ঠিক মেয়েমানুষ বা পুরুষমানুষের মতই নিজস্ব বৈশিষ্টের দ্বারা ছেলেরা আমাকে আকৃষ্ট করে। তুমি হয় ত বলে বসবে "বয়সের একটা আকর্ষনী-শক্তি আছে ত! শৈশবের মাধুর্য্যে মন মুগ্ধ না করে কার?"

এই জন্যেই কিন্তু আমি শিশুদের সম্বন্ধে বিশেষ রকম সূক্ষ্ম বিচার করে' থাকি। আমি জানি ও বুঝি যে প্রকৃতির মধুরতম দান হচ্ছে মধুর স্বভাব শিশু—এমন কি মধুরচরিতা অবলা শিশুজননী হ'তেও সে দান মধুরতর! কিন্তু যে জিনিষের জাতিগত বা শ্রেণীগত সৌন্দর্য্য যত বেশী, সেই জাতি বা শ্রেণীর মধ্যে সেই জিনিষের নিজস্ব সৌন্দর্য্যও তত বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয়। টগরফুলের রূপগুণের ইতর বিশেষ কেউ লক্ষ্য করে না বটে; কিন্তু গোলাপের বর্ণ ও গন্ধ সুন্দর ও সুমিষ্ট হওয়া দরকার। মেয়ে ছেলেদের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সর্ব্বদাই আমি একটু বেশী খুঁৎখুতে।

বিরোধের শেষ এইখানেই নয়। ছেলেদের প্রতি তোমার আদর, অনাদর সম্বন্ধে কোনো কথা হবার আগে, তাদের বাপ মায়ের সঙ্গে অন্ততঃ চেনাশুনোও করা চাই ত। অর্থাৎ তাদের বাড়ীতে গিয়ে দেখাসাক্ষাৎ, মেলামেশা,—এটা চাই। কিন্তু ছেলের বাবা যদি তোমার বাল্যবন্ধু হন,—তুমি যদি স্ত্রীর দিক থেকে না এসে, তাঁর দলভুক্ত অনুচর না হয়ে,—বাড়ীতে ঢুকে থাক,—এমন কি তাঁর বিয়ের সম্বন্ধ হবার আভাস পর্য্যন্ত পাবার পূর্ব্বে থেকে যদি তুমি খোকার বাপের পুরানো বন্ধু হও এবং তখন থেকেই যদি তোমাদের প্রগাঢ় প্রণয় হয়ে থাকে,—তা হলে সাবধান! তোমার বন্ধুত্বকাল একান্ত অনিশ্চিত! সম্বৎসরের মধ্যেই তুমি দেখবে তোমার পুরানো বন্ধুটি ক্রমশঃ তোমার প্রতি ভিন্নমূর্ত্তি অর্থাৎ বীতরাগ হচ্ছেন এবং শেষ পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদের সুযোগ খুঁজছেন। আমার যে সব আলাপী বন্ধু আছেন—তার মধ্যে যাঁদের নিষ্ঠার ওপর আমি বিশেষ আস্থা রাখ্‌তে পারি এমন সকলের সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব হয়েছে তাঁদের বিয়ের পর। এরকম বিয়ের পরে কার' বন্ধুত্বও আবার একটু বুঝিয়া শুঝিয়া স্থাপন করা চাই—তবেই তা বন্ধু-পত্নীর সহ্য হবে। কারণ, স্বামী স্ত্রী উভয়ের মত না জেনে, যে, কেউ একজন নিরীহ ভদ্রবেচারা এসে স্বামীর সঙ্গে বন্ধুত্বের পবিত্র বন্ধনে বদ্ধ হতে সাহস পাবে,—নাই বা হ'ল তখন তাঁর যুগলের সঙ্গে পরিচয়, অথবা নাই বা তখন থাকুন স্বামী স্ত্রী একজায়গাতে—এটি অত্যন্তই দুঃসহ। চিরকাল বন্ধুত্বই হোক, আর সবাই আগে

এমন অতি পুরাতন সৌহৃদ্যই হোক, প্রত্যেকটিকেই তাঁদের যুগলের অনুমোদন চিহ্নে চিহ্নিত করবার জন্যে তাঁদের নবপ্রতিষ্ঠিত কর্ম্মশালায় প্রেরণ করতে হবে,—ঠিক যেমন সম্রাট তাঁর জন্ম-পূর্ব্বের,—যখন কল্পনাতেও যাঁর স্থান ছিল না, সেই সময়কার কোনো পুরানো রাজার নামাঙ্কিত মোহরকে প্রত্যাহার করে নেন নিজের রাজত্বে চালাবার জন্যে নিজের নামাঙ্কিত করতে। কিন্তু হায়রে! আমার মত মরচে-ধরা ধাতে নতুন নাম ছাপতে যাওয়া যে কি বিড়ম্বনা, তা আর বলে কি হবে?

স্বামীর প্রীতি থেকে তোমাকে বঞ্চিত করে, তোমায় যে স্ত্রীরা তাড়িয়ে দেবেন,—তার পন্থা একটি নয়, অসংখ্য! একটি হচ্ছে, তুমি যা বলবে তাতেই বিস্ময়ের ভাণ করে হেসে উঠা, যেন তুমি একটি মাথা পাগলা লোক. তোমার সব কথাই উদ্ভট! এমন অবাক্ হয়ে তাঁরা সে সময় চেয়ে থাকবেন যে শেষ পর্য্যন্ত তাঁর স্বামীটি-যিনি ইতিপূর্ব্বে হয় ত তোমার বিচারশক্তির ওপর শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, তোমার গ্রাম্যতাবর্জ্জিত, মার্জ্জিত রসিকতার তারিফ করে' তোমার বুদ্ধিবৃত্তি ও আচার ব্যবহারের একটু আধটু ত্রুটি নজরেই আনতেন না তিনি ক্রমশঃ সন্দেহ করতে আরম্ভ করবেন যে তুমি কেবল ভাঁড়ামিই করতে পারবে এই পর্য্যন্ত, তুমি বাল্য বয়সেরই উপযুক্ত বন্ধু, মেয়ে মহালে আলাপ করবার মত তুমি নও! এই পন্থাটির নাম দেওয়া যেতে পারে অবাক-চাওয়ার পন্থা! আমার পেছনে এইটিকেই বেশীর ভাগ কাজে লাগান হয়েছে।

এর পর অতিশয়োক্তি বা ব্যাজস্তুতির পন্থা। তার মানে, স্ত্রী যখন দেখলেন যে তুমি স্বামীর বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র, প্রগাঢ় অনুরাগ বশেই তিনি তোমার প্রতি সমাদর করে থাকেন, এবং সে অনুরাগ সহজে বিচলিত হবার নয়, তখন তিনি তোমার প্রতি কথা ও প্রতি কার্য্যের এমন অতি মাত্রায় গুণকর্ত্তীন সুরু করে দেবেন যে স্বামী বেচারী মনে করতে বাধ্য হবেন যে অতটা সুখ্যাতি তাঁর স্ত্রীর মুখ থেকে তাঁর বন্ধুর চেয়ে তাঁরই প্রাপ্য বেশী এবং তখন তিনি তাঁর স্ত্রীর অপূর্ব্ব সরলতায় মুগ্ধ হয়ে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ অন্তঃকরণে চেষ্টা করবেন, বন্ধুপ্রেমের আতিশয্য লোপ করবার জন্যে। অবশেষে তোমাকে যেখানে নামিয়ে দিবেন সেখানে দেখবে তোমার যত্ন, আদরের পরিণাম এমন সঙ্কুচিত, সীমাবদ্ধ ও লোকাচার সঙ্গত হয়েছে যে স্বামীর সহিত একযোগে তোমার সঙ্গে সখ্যস্থাপন করতে স্ত্রীর পক্ষে আর কোনো দ্বিধার কারণ থাকবে না।

আর একটি পন্থা হচ্ছে—(বন্ধুবিচ্ছেদের মত মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার জন্যে ছলনার ত আর অন্ত নেই!)—কি কারণে স্বামীর সঙ্গে প্রথম তোমার বন্ধুত্ব হয়েছিল—একেবারে অনিন্দ্য অকপটতার ভাব দেখিয়ে তা ভুলে যাওয়া। যদি তোমার সখ্যস্থাপনের মূল হয়ে থাকে তোমার নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ, তা হলে তোমার কথাবার্ত্তায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অভাব কল্পনা করে' স্ত্রীটি বলে উঠবেন "হাঁ গো! মনে হচ্ছে যেন তুমি অমুকবাবুকে একজন সেরা রসিক বলে বর্ণনা করে ছিলে?" অথবা তোমাদের বন্ধু-প্রণয় হয়ত ঘটে থাকবে তোমার বাক্যালাপের কোনো-রকম মাধুর্য্য বশতঃ, সে কারণ চরিত্রের হয় ত লক্ষ্য করে নি কেউ,—তা হলে তোমার শিষ্টাচারের একটু বৈলক্ষণ্য দেখেই স্ত্রীটি চীৎকার করে উঠবেন "হাঁ গা! অমুকবাবু কি তোমার এই রকম শান্ত শিষ্ট?" একবার এক সুশীলা মহিলার সঙ্গে আমার এই বলে একটু বাদানুবাদ হয়েছিল যে তিনি আমাকে যথেষ্ট খাতির যত্ন করেন নি, যদিও আমি তাঁর স্বামীর পুরাণো বন্ধু, তিনি তখন অকপট চিত্তে আমার নিকটে বলেছিলেন যে বিয়ের আগে তিনি লোকের মুখে—প্রায়ই আমার কথা শুনতেন, শুনে আমার সঙ্গে আলাপ করতে তাঁর ইচ্ছা হয়, কিন্তু আমাকে দেখবার পরই তাঁর সব কল্পনা মাটি হয়ে যায়। তার কারণ, তিনি আমাকে যে ভাবে বিচিত্র হতে শুনেছিলেন, তা হ'তে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে আমি একজন সুশ্রী, দীর্ঘকায়, বীরপুরুষ (প্রকৃত পক্ষে যদিও আমার চেহারা ঠিক এর উল্টো)। কথাটি সারল্যের পরিচয় ছিল বলেই আমি আর মহিলাটিকে জিজ্ঞাসা করলাম না, যে তাঁর স্বামীর অপেক্ষা এত উচ্চতর রূপের আদর্শ তিনি তাঁর বন্ধুর সম্পর্কে কল্পনা করলেন কেমন করে'? কেন না, বন্ধুর—আমার দেহের দৈর্ঘ প্রস্থ আমারই সমান; তিনি লম্বা জুতো সমেত ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি,

আমি বরং তার চেয়ে আধ ইঞ্চি লম্বা বেশী। তা ছাড়া, অঙ্গসৌষ্ঠবেই বলুন আর আকার ইঙ্গিতেই বলুন, বীরত্বের লক্ষণ তাঁর চেহারাতেও যত, আমারও তদ্রূপ।

বিয়ে করা লোকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে গিয়ে এত সব নিগ্রহ আমাকে সহ্য করতে হয়েছে। সেই রকমারী যন্ত্রনার বিস্তৃত বিবরণ দিতে যাওয়া বৃথা চেষ্টা। সুতরাং এস্থলে সধবা স্ত্রীদের একটি সাধারণ দোষের উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হব। সেটি হচ্ছে এই যে তারা অপর লোকের সঙ্গে ব্যবহার করে অপরলোকের মত, অর্থাৎ স্বামীর সঙ্গে করে লৌকিকতা আর আমার মত অনাত্মীয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। যেমন, সেদিন রাত্রে অর্দ্ধেন্দুবাবুর বাড়ী ফিরতে দেরী দেখে তাঁর স্ত্রী হেমনলিনী আমাকে আমার নিয়মিত খাওয়ার সময়ের দু ঘণ্টা পর পর্য্যন্ত অভুক্ত রেখেছিলেন, পাছে স্বামীর অনুপস্থিতিতে তাঁর বন্ধুকে খাইয়ে দিলে স্বামীর প্রতি অশিষ্টতা করা হয়। আসলে কিন্তু এতে শিষ্টাচারের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'ল; কারণ— লৌকিকতার সৃষ্টিই এই জন্যে যে কেউ যেন অসম্মানে ক্ষুণ্ণ না হন। সামান্য বিষয়ে একটু যত্ন করে গুরুতর ব্যাপার থেকে যাতে মনটাকে ফিরিয়ে রাখা যায় এই জন্যেই না লৌকিকতার প্রয়োজন? হেমনলিনী যদি আমার লুচিগুলি গরম রাখবার ব্যবস্থা করতেন ও পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা না দেখিয়ে যথাকালে আমাকে খেতে-বসিয়ে দিতেন, তা হলেই তাঁর যথার্থ শিষ্টরীতি পালন করা হ'ত। বিনয় নম্র ব্যবহার ও যথোচিত ভক্তিশ্রদ্ধা কর—এর চেয়ে পতিভক্তির ভাল লক্ষণ আর কি থাকতে পারে দুনিয়ায়, আমি জানিনে। সেই জন্যেই আমাকে বলতে হচ্ছে যে সেদিন আমি একান্ত সদ্‌বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে যে সন্দেশ জোড়াটির দিকে সাগ্রহ দৃষ্টি দিচ্ছিলাম, আমার ন্যায় অযুগ্ম ব্যক্তির অপরিপক্ক ক্ষুধার পক্ষে পাওয়াবই সমধিক উপযোগিতা ব্যাখ্যা করে 'শিখর বাদিনী' যে সেই সন্দেশ জোড়াটিই স্বামীর পাতে দিলেন, এতে তিনি তাঁর ভোজন বিলাসিতারই পরিচয় দিলেন। সেইরকম, কোনো স্ত্রীলোক যদি আমায় যথেষ্ট অপমান করেন, তাহলে তাও আমি মার্জ্জনা করতে পারি নে। সেদিন যখন ——যাক্, আর কথায় কাজ নেই।

প্রত্যেক সধবা স্ত্রীর জন্যে একটি করে মিথ্যা নাম রচনা করতে আর প্রবৃত্তি হচ্ছে না। এই বেলা তাঁরা তাঁদের আচার ব্যবহার শুধ্‌রে নিতে সুরু করুণ, নচেৎ আমার এই বলা রইল যে তাঁদের সমস্ত নাম-ধাম সঠিক প্রকাশ করে দিয়ে তাঁদের আমি একবার স্থির মত দেখে নেব। *

* ইংরাজী হইতে

তুমি কাছে নাই—

—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

তদন্ত করি বসন্তে কিবা তদন্তে বরষায়
এ মরু-ডাঙায় এসেছিনু কবে, ভুলিয়া গিয়াছি হায়।
হয়ত বা আশ্বিনে
শহেলি শেফালি ডাক দিয়েছিল শফেদি মেঘের দিনে।
তুমি কাছে নাই বুঝিনু যেদিন সেদিনই জন্মলাভ,
রবির রবাব ছিঁড়ে গেছে বটে,—তিমির আবির্ভাব।
তুমি কাছে নাই, আর নাই কাছে আকাশের কাশফুল,
কাম-বেদানার দানা নাই, আছে বেদনার গুগ্‌গুল।
অতন্দ্র চন্দ্রিকা
নয়নের জলসত্র খুলেছে, কুহকের কুহেলিকা!
জন্ম লভিল অশোকগুচ্ছ তোমার মুখের মদে,
তব পদাঘাতে মুদিত কুমুদ ফুটেছে হৃদয়-হ্রদে।
তোমায় পাইনি তা'য়
সারা শরীরেতে উশীর শিহরি' জন্ম লভিতে চায়।
পাইনি তোমায় তাই ত' ধরণী শ্যামল, আকাশ নীল,
নটেশের পায়ে নূপুর হইয়া বেজে চলে এ নিখিল।
তোমারে পাইনি বলে'
প্রতি রজনীর তিমির-সায়রে তারকা উঠিছে জ্বলে'॥

—:•:—

তিন শত্রু

—শ্রীরেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়

বিনয় গুপ্ত সিভিল সার্জ্জেন, সরকারী ডাক্তার। নাম ডাক এবং হাত যশ দুই-ই আছে। বড় লোক।—দরাজ বুক।—চেহারাটাও বেশ, সুন্দর এবং বলিষ্ঠ।

চালচলন সাহেবের মতই। সাহেব হবার দুটো দোষও আছে তাঁর চরিত্রে। লোকটা একের নম্বর বদরাগী—এবং মাতাল।

তবে, মদ খেতেন গোপনে, খুব অন্তরঙ্গ কেহ ছাড়া জানতও না! অসামাল হন নি কোনদিন।

গোবিন্দ তাঁর ছেলের প্রাইভেট টিউটর এবং ডাক্তার খানার কম্পাউণ্ডার।

ডাক্তারখানার কাজ দশটা পাঁচটায়। মনীষকে পড়াতে হয় সকালে দু' ঘণ্টা।—সপ্তাহের কোন দিন ছুটী নেই।

লোকটা এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত পড়েছিল। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ। আজও বিয়ে করে নি।

ভোর না হতেই মনীষের বাড়ী এসে হাজির হয়।

মনীষের নাম ধরে ডাক দেয়।—একবার, দুবার, তিন বার—।

হয়ত তাতেও মনীষের সাড়া পাওয়া যায় না।

বিনয় বাবু সকাল বেলাটা ঘোড়ায় চড়ে ঘণ্টা খানেক ধরে বেড়িয়ে আসেন!

প্যাণ্টকোট পরে হয়ত বা তখন জুতার ফিতা বাঁধছিলেন. তারপরই চা আর কেক খেয়ে বেরুবেন।

মাষ্টারের হাঁক ডাক শুনে ছেলের শয়ন কক্ষে হাজির হয়ে দেখেন তখনো তার ঘুম ভাঙে নি।

লোহার 'নাল' পরানো বুটের দুটা ঠোকর—তাই যথেষ্ট।

'বাবাগো' 'মাগো' বলে চীৎকার করে ছেলে লাফিয়ে ওঠে।

বাপ চেঁচিয়ে ওঠেন—কান্না? হারামজাদা বেটা, কাঁদতে লজ্জা করে না? ফের কাঁদবি ত জুতিয়ে মেরে ফেলব। বেলা দুপুর পর্য্যন্ত ঘুম! পড়তে বসবে কখন?

মনীষ চোখ মুছে বই খুঁজতে থাকে।

বিনয়বাবু দুটো মিনিট অপেক্ষা করে পুনর্ব্বার রুখে উঠে ছেলের কাণ ধরে টেনে বলেন,—বেটার চৈতন্য কি জাগবে না? বিছানা থেকে উঠে মুখ হাত ধো তারপর প্রাতঃকৃত্য সেরে আয়—

আরও দশ পনেরো মিনিট কাটে।

মনীষ ফিরে এসে শ্লেটখানা নেয়, শৈশব পাঠ, ভূগোল পরিচয় এবং বেঙ্গল রীডার তিন যায়গায় পড়ে ছিল খুঁজে বার করতে আরও দশ মিনিট যায়; কিন্তু পেন্‌সিলটা গেল কোথায়? শ্লেট পেন্সিল?

মাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে পেন্সিল জানিস আমার?

মা বলে না, আমি কি করে জানব?

না, কেউ জানে না কিচ্ছু!

ব'লে, আলমারীর তলায় বিছানার নীচে এ ঘরে ও ঘরে ওলট পালট করে দেখে, কোথাও খুঁজে পায় না।

মাষ্টার আবার হাঁক দিয়ে ডাকে এখনও সময় হল না? ওরে মনীষ! বেলা যে দুপুর হতে চলল!

মনীষ তখন পেন্সিল খুঁজতে গিয়ে পেঁড়া খোলে, বাক্স নামায়, সৃষ্টির জিনিষ ছড়িয়ে ভেঙে একেক্কার করে দেয়।

মা রাগ করে বলে ওঠেন, ওরে সর্ব্বনেশে, দস্যি, 'ব্যাগত্বা' করি ভাঙিস্ নি ফেলিস্ নি সব জিনিস, দেখ দেখি কাঁচের গেলাসটা ভেঙে ফেললি!

বিনয় বাবু তখন চা পাননি বলে বেরোননি। গোলমাল শুনে মনীষের ঘরে আবার ছুটে আসেন।

মনীষ বাপের সামনে থেকে পালাবার জন্যই পেন্সিল না নিয়েই মাষ্টারের কাছে হাজির হয়।

সেখানেও নিস্তার নেই।

এক ঘা বেত কষিয়ে দিয়েই শিক্ষা গুরু হাঁক দেন,—এত দেরী হল যে ?

মনীষ উত্তর দেয় না।

আবার আর এক ঘা বেত পিঠে পড়ে।

অগ্রাহ্য আমাকে ? কথার উত্তর নেই ? বল্ কি করছিলি এতক্ষণ !

মনীষ আর চুপ করে সইবে না সঙ্কল্প করে উঠে দাঁড়ায়।

গোবিন্দ মাষ্টার আবার বেত উঁচু করে হাঁকেন যাচ্ছিস কোথায় ?

মাষ্টারের হাতের বেত অতর্কিতে কেড়ে নিয়ে মনীষ দু'আধখানা করে ভেঙে ফেলে। দাঁড়িয়ে থেকেই বলে,—পড়ব না আমি !

ছাত্রের এত বড় স্পর্দ্ধা দেখে গোবিন্দ ভয়ঙ্কর উগ্র হয়ে ওঠেন।

মনীষের বাপও তখন হয়ত চা খেয়ে বাইরে এসে গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছিলেন। হাঁক দিয়ে বলেন,—মেরে ফেল মাষ্টার ! মেরে ফেল একেবারে ! ও রকম অকাল কুষ্মাণ্ড কুলাঙ্গার ছেলে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল।

গোবিন্দ রুখে উঠে মনীষকে ধরতে আসবার আগেই সে ছুটে বাহির হয়ে যায়।

এ রকমটা প্রায় প্রতিদিনই ঘটে থাকে।

জন্মদাতা পিতা জন্ম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের জীবন গঠনের দায়ীত্বও নিয়েছেন।

শিক্ষাদাতা গুরু বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র গঠনটাও শিক্ষা দেন।

দশ বছরের বালক হাঁপিয়ে ওঠে। অত্যাচার যা সহে গেছে। তবু নিত্য দিন ত' বরদাস্ত হয় না। তাই বিদ্রোহ করেও দেখে।

অন্তঃপুরে আড়াল হতে দরদী মা সবই দেখতে পান। ওই বুটের লাথি ও বেতের প্রহার শিশুর কোমল বুক ভেদ করে তাঁর প্রাণেও এসে আঘাত দেয় !

কিন্তু অসহায় তিনি !—সন্তানকে আড়াল করে রেখে বাঁচার ক্ষমতা তাঁর নেই !

অবোধ বালক মাকে বোঝে না।

প্রকাশ্যে মার হাতে প্রহার খায়নি সে কোন দিন, কিন্তু মনোমত কাজ না করলেই বকুনি খেয়েছে বিস্তর।

ভাবে মাও তার শত্রু।

শুধু খেলার বস্তী।

মুচি কামার কষাই—এদেরই বাস।

মনীষের অন্তরঙ্গ বন্ধু সেখানেও আছে অনেকগুলি।

বাড়ী থেকে পালিয়ে সে ওদের দলে গিয়েই মেশে। মুচির ছেলের সঙ্গে বসে জুতো সেলাই করতে শেখে। কামারের হাফর খানায় গিয়ে হাতুড়ী পেটে। কষাই-এর ছেলের সঙ্গে মিশে মুর্গী জবাই করে।

পরের বাড়ী থেকে লুকিয়ে ঘোড়া খুলে চড়তে শেখে।

বাঁটুল দিয়ে পাখী শীকার করে।

ওখানে সে সরকারী ডাক্তার সাহেবের ছেলে নয় ! ওই ছোট জাতেদেরই একজন।

যে দিন বাড়ী থেকে খেয়ে না আসে হামিদ কিম্বা ভুতোদের বাড়ী গিয়ে পান্তা ভাত কেড়ে নিয়ে খেতে বসে। অথবা পরের বাগান থেকে চুরি করে কাঁচা পেয়ারা কলা অথবা মুলো খেয়েই থাকে।

বাপ যে পথ দিয়ে যাতায়াত করেন, সে পথ পারতপক্ষে মাড়ায় না।

বিনয়বাবু স্বকার্য্যে যেতেন আসতেন রুটিন মাফিক। মনীষের তা অজানা ছিল না।

যদিই বা তাঁর যাতায়াতের পথে কোন দিন আটকে পড়ে যায়, আসবার সময়টাতে কোন একটা গাছের শিকড়-ডগালে উঠে বসে থাকে, বাপ চলে গেলে নেবে আসে।

রাত হলে যখন বোঝে বাপ খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছেন খিড়কীর দোর খুলে লুকিয়ে বাড়ী ফেরে।

মা কিন্তু উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন, ভাতের থালা সামনে করে পথের পানে চেয়ে।

ছেলে মাকেও ফাঁকি দিয়ে অলক্ষ্যে লুকিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় শুতে যায়।

মা জানতে পেরে ডাকেন—খাবি আয় লক্ষ্মীটী! আমি বলে দেব না ওঁকে! তোর কোন্ ভয় নেই!

দুমিনিটেই ছেলে যেন ঘুমিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, নড়ে না মোটেই।

পাঁচবার দশবার অনুরোধ করেও যখন ওঠে না, মা আর কি করবেন, অগত্যা তিনিও ছেলের পাশটীতে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

তাঁর নিজেরও খাওয়া হয় না।

ভাবেন মোটেই ঘুমুবেন না, যতক্ষণ না ছেলে স্বেচ্ছায় উঠে খেতে চাইবে। কিন্তু তন্দ্রা এসে পড়ে।

ঘণ্টা দুই একটু ঘুমিয়ে নিয়েই হঠাৎ ফের জেগে উঠে ভাতের থালার দিকে চেয়ে দেখেন—ছেলে চুপিসাড়ে উঠে নিজেই খেতে বসেছে।

তিনি জেগেছেন জানতে পেরে—ছেলে যদি খাওয়া ফেলে উঠে পড়ে তাই ঘুমিয়ে থাকবারই ভান করে পড়ে থাকেন।

ছেলের খাওয়া হয়ে গেলে আঁচিয়ে সে ফের শুলে তবে উঠে নিজেও দুটী মুখ দেন।

দিনে যদিই পালায় রাতে কিন্তু মনীষ রোজই বাড়ী ফিরত।

একদিন কিন্তু দৈনন্দিন ইতিহাসের ধারা একটু বদলে গেল।

রাত বারটা বেজে গেলেও মনীষ বাড়ী ফিরল না—মা ত' ভেবেই অস্থির।

স্বামীর কাছে গিয়ে বললেন—ওগো,—ওঠোনা তুমি, মনীষ এখনও ফিরল না, দেখনা কি হয়েছে!

—এলোনা তা আমি কি করব? ও ছেলে অমনি করেই একদিন মরবে!

—বালাই ষাট্! তোমার কি একটুও মায়া দয়া নেই?

—দেখ রাত দুপুরে বিরক্ত কর'না বল্‌ছি। আমি ও ডাণ্ডাপিটের জন্যে একটুও ভাবি না। ভাববও না!

মনীষের মা ফিরে আসেন! দুয়ার খুলে আকুল প্রতীক্ষায় বসে থাকেন।

মনীষের বাপ বলেন—কি আপদ! একটুও নিশ্চিন্ত থাকবার যো নেই! সবাই সমান।

বিরক্ত ভরে নেপালী দরওয়ান জঙ্গবাহাদুরকে ডাকিয়ে লাঠি ও লণ্ঠন হাতে করে পুত্রের অন্বেষণে পাঠালেন।

সে বেচারী ত ঘণ্টা দুই এ পাড়া সে পাড়া খুঁজে এসেও কোন সাড়া পেলে না।

মা ত' অস্থির হয়ে পড়লেন।

হঠাৎ খাটের তলা থেকে কে যেন একবার কাশলে।

বাপ এসে চেয়ে দেখে ভাবলেন—হতভাগাটা এইখানে লুকিয়ে শুয়ে রয়েছে আর আমরা সারা দেশ খুঁজে মরছি।

টেনে বার করে এনে চটাপট মার চলতে থাকল। মাথায়—পিঠে—সর্ব্বাঙ্গে, বিরাম নেই।

আজ কিন্তু মাও চুপ করে থাকতে পারলেন না। ছেলেটাকে টেনে হাত ছিনিয়ে সরিয়ে আনবার জন্য এগিয়ে যেতে—উগ্রমূর্ত্তি স্বামী তাঁকেও ঠেলে ফেলে দিলেন। মনীষ সেই সময়টা ফাঁক পেয়ে ঘর হতে ছুটে পালাল।

বিজয়বাবু জঙ্গবাহাদুরকে বললেন, যা এখনি ধরে নিয়ে আয় গে!

প্রভুর কথা তামিল করতে যাবার অত্যধিক আগ্রহে নেপালী দরওয়ান হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল।

সে উঠে আবার দৌড়তে আরম্ভ করবার আগেই মনীষ অদৃশ্য হয়ে পড়ল।

বিনয়বাবু চেঁচিয়ে বললেন—কোন ওজর শুনব না। ধরে নিয়ে আসা চাই-ই। একটা দশ বছরের ছেলে তোমাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালালে—তোমাদের আস্ত রাখব না বলে দিচ্ছি।

পাহাড় ভেঙে মনীষ ছুটল।

পাহাড়ের উপান্তে জঙ্গল কোথাও শাল তমাল, কোথাও

নল-খাগড়া। তারই ভিতর সে এমন ভাবে লুকিয়ে পড়ল, আর কেউ তার খোঁজ পেল না।

সে জঙ্গলটার মধ্যে সাপ-খোপের কথাই নেই ছোট খাটো বাঘ ভাল্লুকও থাকত। তা ছেলেটার কি ভয় ডর আছে!

সকাল হয়ে যাবার পর দিনের আলোয় মনীষকে খুঁজে পাওয়া গেল।—গা হাত পা ছড়ে গিয়েছে; সম্পূর্ণ জ্ঞানও নেই, যেন উন্মাদ পাগল। আপনিই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু টাল সামলাতে পারল না, এব্ড়ো খেব্ড়ো পাথরের ঢিপিতে পা পিছলে পড়ে গেছল।

জঙ্গবাহাদুর তাকে কোলে করে বাড়ী ফিরল।

বাপ কেঁদে অস্থির হয়ে বললেন—ফিরিয়ে এনেছিস? কিন্তু মনীষ আমার কথা কচ্ছে না কেন? মাণিক, মনীষ, একটীবার অভিমান ভুলে কথা কও বাবা!

মা বললেন—ওরে হতভাগিনীর অন্ধের যষ্টি, চোখের তারা,—আমি তোকে লুকিয়ে রেখে দেব আর কেউ তোকে মারবে না বকবে না,—একবার চোখ তুলে চা,—একবার কথা কও—

বাপ ভাবলেন—বুঝি সব শেষ হয়ে গিয়েছে। ছেলেটী অভিমান করে চিরকালের জন্য ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে।

নিজে ডাক্তার তবু তাঁর ধৈর্য্য মানছিল না, নিজেরই সহকারী ডাক্তারদের খবর দেওয়ার জন্য যাচ্ছিলেন—দোরের সামনে গোবিন্দর সঙ্গে দেখা।

—মনীষ উঠেছে কি ডাক্তার বাবু? কাল সে আমাকে যে নাকাল দিয়েছিল! ঘড়ি দেখতে শিখব বলে আমার পকেট থেকে ঘড়িটা তুলে নিয়ে ভেঙে দিয়েছে। আমি আপনাকে বলে দেব ভয় দেখাতে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বললে—আমি কেয়ারও করি না বাবাকে!

এ সময় গোবিন্দর মুখে মনীষের নামে নালিশের কথা শুনে বিনয়বাবুর আপদ মস্তক জ্বলে যাচ্ছিল। কিন্তু একথাও মনে হল—আহা, ও বেচারীরই বা দোষ কি! হয়ত কোন খবরই জানে না!

—ঘড়িটা ভেঙে দিয়েছে? আচ্ছা সারিয়ে দেব'খন! কিন্তু হাঁ! বুঝতে পারছি, তাইতেই বাছা সারাদিন পালিয়ে পালিয়ে বেরিয়ে রাতে বিছানার তলায় লুকিয়ে শুয়েছিল,··· পাছে জানতে পেরে মারি কিম্বা বকি!······গোবিন্দ!—মনীষ আমাদের সকল শাসনের পাল্টা জবাব দিয়ে গেছে! আর সে তোমাকে কিম্বা আমাকে জ্বালাতে আসবে না!···

—সে কি কথা! কেন কি হয়েছে তার?

—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না এখন!—তুমি এখন বাড়ী যাও, কিম্বা,—এস ত একবার, আমি ত গায়ে হাত দিয়ে কিছু বুঝতে পারলাম না, একটুও গরম ঠেকল না। নাড়ীও বইছে মনে হল না। তুমি একবার গায়ে হাত দিয়ে দেখবে এস ত!

গোবিন্দ নিতান্তই হেয়—সামান্য একটা কম্পাউণ্ডার।

আজকার বিপদে সেও এক মস্ত অবলম্বন। ডুবন্তে বসে লোকে যেমন খড়ের কুটিটা পেলেও আঁকড়ে ধরতে চায়।

গোবিন্দ বাড়ীর মধ্যে এসে ডাকল—মনীষ!

মনীষের মা মনীষকে কোলে করে ছিলেন। গোবিন্দ বাড়ীর মধ্যে আসতে, তিনি মাথার কাপড়টা একটু বেশী করে টেনে দিলেন।

গোবিন্দ বলিল—মা! আমিও আপনার ছেলে, আমাকে লজ্জা পাবেন না।

মনীষের মা বললেন—এস বাবা! আমার মনীষকে ডাক! বল তাকে পড়ার সময় বয়ে যাচ্ছে, কত আর ঘুমোবে।

গোবিন্দ মনীষের কপালে হাত দিয়ে দেখল—একেবারে ঠাণ্ডা নয় ত! হাত দেখেও বুঝল—নাড়ী বইছে ঠিক তবে ক্ষীণ। বললে—ভয় নেই ডাক্তার বাবু, মনীষ বেঁচে আছে, আপনি উতলা হবেন না!

—বেঁচে আছে? সত্য বলছ? কই আমি ত নাড়ী পেলাম না! দেখি আর একবার·········না না আমি দেখতে পারব না······যদি একেবারেই শেষ হয়ে থাকে······ সন্দেহ হচ্ছে বেঁচে আছে······ওইটুকুই ভরসা···আশা······

—আমি মিথ্যা বলছি না ডাক্তার বাবু। আপনি ব্যাকুল হলে চলবে কেন? উপস্থিত কর্তব্য যা করুন। ঠাণ্ডা লেগে দাঁত কপাটি লেগেছে।···মা! একটু আগুন

করে সেঁক দেবার ব্যবস্থা করুন। আমি ততক্ষণে স্যালাইন ইন্‌জেকসনের জন্য তৈরী করি।

আধ ঘণ্টাটাক পরে মনে হল—মনীষ হাতটা বুঝি একবার নাড়লে। চোখের পাতাও দুবার খুলে আবার বুজোলে।

মনে মনে কি যেন বিড় বিড় করতে লাগল।

বাপ বললেন—আর আমি বকবনা মাণিক। ভাল করে চোখ মেলে চেয়ে দেখ! আমার ওপর অভিমান করিস্‌নি মনীষ!

মনীষ হাতের আঙুল দেখিয়ে গুণ্‌ছিল——এক, দুই, তিন।

অস্ফুট স্বরে বলছিল—জয় বিজয় ভগবানকে শত্রুরূপে চেয়েছিল, তিনি তখন তিন জন্ম নেবেন বলেছিলেন! কথক ঠাকুরের কাছে শুনেছি, ভগবান শত্রু হয়ে তিন মূর্ত্তিতেই জন্ম নিয়েছেন।.........

—গোপাল! মাণিক! মনীষ! চুপ করলে কেন আর একবার কথা কও। আমি তোর মা!

তেমনি অস্ফুট স্বরেই যেন বলল—মা?......তুই মা?... মাথাটায় একটু হাত বুলিয়ে দে না মা!......আঃ তোর হাত কি ঠাণ্ডা!......কেমন জুড়িয়ে যাচ্ছে।......

কিন্তু তারপরেই আবার গম্ভীর নিস্তব্ধতা! যেন প্রাণহীন, মূক!

হয়ত বা এবারে চিরকালের জন্যই।

স্বপ্ন যখন সত্য হয়

—শ্রীসুনীলকুমার ধর

—এক—

—হাত ছাড় মা ডাক্‌ছেন......

জোর আরম্ভ করে......কিন্তু নরম হাত, খুবই নরম—ব্যথা লাগে।

—আঃ লাগে যে হাত ছাড় না—

তরুণী যুবকের দিকে তাকায়। কটাক্ষে তার, ক্রোধের চেয়ে লজ্জার রেখাই বেশী ফুটে ওঠে। হাসির ক্ষীণ রেখাটী তখনও ঠোঁট দুটীর প্রান্তে লেগে ছিল......

তরুণ যুবক হেসে বলে—ছাড়তে পারি এই সর্ত্তে, যে একটু পরেই আবার আসবে......

অর্থপূর্ণ চাহনি।

এলোমেলো কাপড় গুছিয়ে নিয়ে তরুণের দিকে আর একটী কটাক্ষ কোরে—তরুণী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।...... প্রদীপের শিখার মত সে সুন্দর।

তরুণ এক শিল্পী। বাপ মায়ের অনেক চেষ্টাতেও তার বি-এ, ডিগ্রী পাওয়া হয় নি তাই তাঁরা তার বিয়ে দিয়ে সংসারী কোরেছেন—পাছে খেয়ালী ছেলেটী কোনদিন 'লোটা-কম্বল' ও আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ে!

বেরিয়ে যে সে পড়ে না এমন নয়। বাইরের ডাক সে কোন দিনই প্রত্যাখ্যান করে না। বাইরের আলোয়, বাতাসে ...সব কিছুতেই সে যেন কার মধুর স্পর্শ পায়...তাই তার শিল্পী মন তাকে ছাড়তে চায় না! ইচ্ছা হয় তুলির টানে মূর্ত্তি দিয়ে আঁকে, কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও তার রূপ সে ধ্যানে আনতে পারে না...তাই আঁকি আঁকি করে চিরকালই তার না-আঁকা থেকে গেছে।

নাম তার অমিয়। তরুণী কিশোরী, তার স্ত্রী, নাম পারুল।

কিছুক্ষণ পারুলের অপেক্ষায় থেকে সে তার আঁকার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে বসে।

অর্দ্ধেক আঁকা একখানা ছবি। ছবিখানা একটা নদীর; সে যেন তার সব ভালবাসা, ব্যাকুলতা নিয়ে প্রিয়তমের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়! কিন্তু প্রিয় তার, বার বারই তাকে প্রত্যাখ্যান ক'রে ফিরিয়ে দিচ্ছে। এ আঘাত নদীর সয় না, অভিমানে ফিরে আসে, বুক-ভরা তার বেদনা, চোখ ব'য়ে তার অশ্রু ঝরে···মুখে তার না-পাওয়ার চিহ্ন আঁকা।

কে এসে চোখ টিপে ধরে। কে যে তা আর অমিয়র বুঝ্‌তে বাকি থাকে না। কিন্তু মন তার তখন এ সবের বাইরে···বেদনা ও সহানুভূতির রসে ভরা।···তাই বেশ একটু বিরক্তির সুরে বলে,—ছাড় পারুল, চোখে লাগে। আর এটাকে আজ শেষ করতেই হবে, কাল দেবার দিন······

তার এই আদরকে এম্‌নি ভাবে প্রত্যাখ্যাত হ'তে দেখে অভিমানে পারুলের চোখ দুটী বুজে আসে। ঠোঁট দুটী একবার নড়ে ওঠে। কিন্তু অপর পক্ষ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায় না। মুখ থেকে তার বেরিয়ে আসে,—আচ্ছা, থাক তোমার ছবি নিয়ে···আমি চল্লাম······আর যদি কখনও······

অশ্রুধারা মুক্তার মত টল্‌মল্‌ করে ওঠে···কিন্তু শিল্পী একবার তাকায়ও না···একটী কথাও বলে না······

অভিমানিনী চলে যায়···কিন্তু 'চৌকাঠ' পার না হ'য়েই আবার ফিরে আসে—ছবিখানা ত দেখা হয় নি! ছবিখানায় এমন কি আছে যার জন্য স্বামী তার আদরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। দেখে এক নারীর ছবি। মোটেই সে বিস্মিত হয় না কারণ সে এই রকমই একটা কিছু আশা করেছিল! ইচ্ছা হয় টান মেরে ফেলে দেয়—কিন্তু স্বামীর তন্ময়তা দেখে সে সাহস পায় না। ঘরের বাইরে নিজের কাজে চলে যায়।

ছবির খুব প্রশংসা। ছবি যে বোঝে, যে না বোঝে সকলেই বলে, হ্যাঁ, একখানা ছবি—এম্‌নি নইলে আর হাত! —অমিয়র এই বশঃস্রোতের ক্ষীণ সুরটুকু যে পারুলের কাণে এসে বাজে নি এমন নয় কিন্তু তা'তে না জানি কি মাখান—আনন্দের চেয়ে জ্বালা বেশী।

রাতে শু'য়ে অমিয় ডাকে—পারুল। পারুল তখনও আগেকার দিনের কথাটুকু ভুলতে পারে নি—জবাব দেয় না।

অমিয় আবার ডাকে—পারু।

কাঁদনের সুরমিশানো রুদ্ধস্বর এসে কাণে বাজে—আমাকে কেন! অমিয় বুঝ্‌তে পারে ওখানে একটা প্রলয় হ'য়ে গেছে।—এই যে মেয়েটি সুখ দুঃখের মত তাকে জড়িয়ে আছে—তার সুখদুঃখ-অভিমানের দিকে তাকানো কি তার উচিত নয়? কিন্তু কোথায় যে অনুচিত হ'য়েছে মনের কাছে অনেক হিসাবনিকাশ চাওয়া সত্ত্বেও উপযুক্ত উত্তর পায় না! অভিমান ভাঙ্গানোর অমোঘ অস্ত্র-স্বরূপ সে আচম্‌কা তার মুখে একটা চুমু এঁকে দেয়—মুখে খেলে দুষ্টু একটু হাসি।

পারুল বলে—ইস্‌—এখন যে বড়······ছবি তোমার সময়টুকু ঘিরে নিতে পারে আর—এখন এসেছেন······

অভিমান তার বলার কথাকে ফুট্‌তে দেয় না—ঠোঁটের প্রান্তে এসে থেমে যায়······

অমিয় হো-হো ক'রে হেসে ওঠে—হাসি তো নয় যেন পারুলের বুকে ছুঁচ বেঁধে।

দৃঢ়ভাবে বাহুর ভিতর আবদ্ধ ক'রে নিয়ে অমিয় বলে—পাগ্‌লি,······এইটুকুতেই এত! দুবছর আগে আমি যখন কলেজ পালিয়ে উপরে চিলের ঘরে বসে ছবি আঁকতাম—রাত জাগতাম—ছবির নেশায় না বলে বাড়ী ছেড়ে চলে যেতাম—তখন তুমি কোথায় ছিলে, রাণি!

পারুল তার স্বামীকে বেশ ভালভাবেই চেনে······

খেয়ালী স্বামীর এলোমেলো ভাবকে বেশী উথ্‌লে উঠ্‌তে না দিয়ে—তার মুখে হাত চাপা দিয়ে পণ্ডিতি সুরে বলে—থাক্ থাক্, খুব হ'য়েছে—এখন মশায় চুপ্‌ ক'রে শোবেন, না, না? রাত ত আর নেই ব'ল্লেই হয়······

মেঘ কেটে যায়! মৃদু হেসে অমিয় বলে—গলা শুকিয়ে গেছে, ভিজিয়ে না নিলে ঘুম আসবে না।

একটু হেসে পারুলও স্বামীর দিকে ভাল ক'রে মুখ ফিরিয়ে দেয়—অমিয় সুধা নিতে কসুর করে না……

সময় সময় ঝগড়ার যে পাতলা মেঘ খানা এদের মনের আকাশে ঘনিয়ে আসে—এম্‌নি ভাবে হাসির ঝড়ে কোথায় যে উড়ে যায় পরমুহূর্ত্তে আর তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। হাসির ফুল তুল্‌তে তুলতে দুজনে ঘুমিয়ে পড়ে।

—দুই—

রাজবাড়ী থেকে ডাক এসেছে—ছবি আঁকার জন্য। খেয়ালী রাজা রাজস্বের অর্দ্ধেক খরচ করেন এই ছবি আর বইএর পিছনে। গরীব প্রজা থেকে বড় বড় অমাত্য পর্য্যন্ত সকলের মুখে এই একই কথা—রাজার এ সব বাজে খেয়াল কেন!—রাজার মত হওয়া দরকার। সবই অদ্ভুত—মনের কূল-কিনারা পাওয়া ভার।

পারুলের অনেক ছোট বড় অনুরোধ-উপরোধ, বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে তবে অমিয় তার কাছ থেকে ছুটি পায়। ছাড়তে কি চায়, সে কি করুণ মিনতি-ভরা অনুরোধ!—না গেলে কি চলে না?

আবার তখনই দুষ্টুমি ক'রে বলে—সেখানে ত আমি থাকবো না, বেশ ফুর্ত্তি করবে—কেউ বকবে না, বিরক্ত ক'রবে না.—আর রাজারাজড়ার বাড়ী দুই একটা রাজকন্যাও যে নেই……কি একটা কঠিন রহস্য ক'রতে যায়, কিন্তু অমিয় তা প্রকাশ করবার আগে থামিয়ে দেয়। বলে, আমি যাবো না—এত অবিশ্বাস! মুখে মৃদু হাসি। পারুল আবার অনুরোধ করে, না, ওগো তুমি ভালয় ভালয় এস। বিদেশ-বিভূঁয়ে যাওয়ার আগে আত্মীয়-স্বজন আপনার জন থাকলে এমনি করে—তা বলে কি তাদের কথায় কাণ দিতে আছে? না গেলে এত টাকা লোকসান, আর মা বাপই বা কি মনে করবেন—তা বলে কিন্তু এক মাসের বেশী থাকতে পাবে না…

চোখ দুটী ছল ছল করে।

অমিয় চলে যায় কিন্তু সুখের নীড়টি ছেড়ে মন আর সরতে চায় না……কিছুদূর গিয়ে মোটর থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখে—জানলায় তখনও দুটী সজল চোখের চাহনি তার দিকে তাকিয়ে আছে……

—তিন—

শিল্পীর আগমনে রাজ্যে সাড়া পড়ে গেছে। রাজা নিজে তার তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত। ভগবান্‌কে ত আমরা সকলে দেখ্‌তে পাই নে—শিল্পীই ভগবান্। রাজার মতে। শিল্পী বুঝ্‌তে পারে যে রাজা খেয়ালী, কিন্তু মনে একটু দাগ নেই—সকলের কাছে সমান—তা, কিবা ধনী, কিবা গরীব। এর জন্য কেউ বা ভালবাসে, কেউ বা বাসে না।

রাজার আদেশ শিল্পীকে আঁকতে হবে—এক ধনী পরের রক্তজলকরা অর্থস্তূপের উপর ব'সে আছে—আর এক দীন অনাহারী ভিখারী একটি পয়সার প্রার্থী হ'য়ে তার সাম্‌নে এসে নিজের দুঃখের দীর্ঘ ইতিহাস বলে যাচ্ছে—শুধু একটা পয়সার জন্য! কিন্তু ক্রূর ধনী পিশাচের বুকে ত এর একটু দাগও গিয়ে ব'সছে না—কাণেও ঢুকছে কিনা সন্দেহ। মনে মনে সুদ কসতে ব্যস্ত; হাতে তার হরিনামের মালা—সুদ কষার সব চেয়ে ভাল শুভঙ্করী।

একে একে ব'লে যাচ্ছে—একটি ছেলে চার দিন হ'ল একটু ওষুধ না খেয়ে মারা গেছে—মেয়েটার আজ দু'দিন আবার জ্বর—ফুটপাথের উপর পড়ে আছে। কিন্তু সব মিছে—তার সব বলা, অশ্রুঝরা সবই বিফল। যাবার সময় শুধু এইটুকু ব'লে গেল—জন্ম জন্ম তুমি যেন এম্‌নি টাকার গাদার উপরে ব'সো—স্নেহ মায়া মমতা যেন তোমার বুকে কোন দিন কোন সময়ের জন্য ঠাঁই না পায়—মরবার সময়ও তোমার মুখের শেষবুলি যেন এই টাকাই হয়—জন্ম জন্ম পাষাণ হ'য়ে জন্মিয়ো……

চারখানা ছবিতে সব শেষ করতে হবে।

শিল্পী আঁকে। রাজা ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে থাকেন, দেখেন কেমন ক'রে সে তুলির টান দেয়।

শিল্পী এক একটা টানা দেয় আর রাজা বিস্ময়ে ব'লে ওঠেন—ওকি শিল্পী……এ তোমার বড় অন্যায়……চোখের চাহনি স্ত্রীর মত কেন ক'রলে? মুখখানা যে……

ছবি শেষ হয়। রাজা দেখে বলেন, তুমি কোন দিন একে দেখেছ?

শিল্পী হাসে। বলে, মনে মনে অনেক দিনই……

রাজা বলেন, তোমার ত এখন যাওয়া হবে না, শিল্পী, আমার যে আরও ছবি আঁকতে হবে………

পারুলের কথা মনে পড়ে—একমাস ত কবে হয়ে গেছে, অথচ রাজার অনুরোধ—উভয় সমস্যা………

চিঠি লেখে। কয়টি কথা—

"আমার পারুল,

যাবার জন্ম মনটা পাগ্‌লা ঘোড়ার মত ক্ষেপে উঠেছে, কিন্তু রাজা বেশ পাকা সওয়ারের মতই তার রাশ ধ'রে রেখেছেন—কি করি! শীঘ্র যাবো, আর পনরদিন পরে যাবই। চিঠি দিও। একটা জিনিষ দেখে তুমি আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবে—আমার পারুল ওখানে, কিন্তু আমি এখানে ব'সে তার বর্ত্তমান অবস্থা ছবিতে এঁকেছি। আসি। ভালবাসা নিও। তোমারই অমিয়।"

একে একে পনরদিন চ'লে যায়—আরও কত……

পারুল চিঠিখানা পড়ে আর কাঁদে। চিঠি লেখে—আসি আসি ক'রে তিনমাস কেটে গেল তবুও কি তোমার আসার সময় হচ্ছে না………বুঝি, আমাকে তোমার ভাল লাগে না।

নিজে না থাক্‌লে কি কেউ রাখতে পারে? ইস্, তা আর হয় না। এই সেবার মাসীমার বাড়ী গিছ্‌লাম, তখন ত তুমি ক'লকাতায়। আট দিনের কড়ার—কিন্তু তুমি বাড়ী এসেছ শুনেই ত একদিন থেকে চলে এসেছি। কত লোকে কত কি ব'ল্লে, ঊষা কতই না ঠাট্টা ক'রলে—আর তোমার আসা হয় না?

পারুলের মাসীর বাড়ী শ্বশুর বাড়ী থেকে দুক্রোশ।

চিঠির উত্তর আসে, শীঘ্রই যাচ্ছি।

পারুল মনে মনে নিজের সঙ্গে অমিয়র ভালবাসার তুলনা করে আর কাঁদে।

দিন যায়।

অমিয় একখানা করে ছবি আঁকে আর রাজা আর একখানা আঁকার জন্ম এমনিভাবে তাকে অনুরোধ করেন যে তা এড়ানো বড় কষ্ট………

হোন্ রাজা। অমিয় ব'লেছে, এইখানা তার এখানকার শেষ ছবি আঁকা………যত অর্থই কেন রাজা দিন না সে তারপর একদিনও থাক্‌বে না।

—চার—

অমিয় দেশে ফেরে। সঙ্গে তার প্রচুর অর্থ, কপালে সাফল্যের রাজটীকা। মন তার চঞ্চল। প্রায় পনরদিন সে পারুলের চিঠি পায় নি। কোন অমঙ্গল আশঙ্কা সে করতে পারে না—কেন না মা বাবা রয়েছেন অসুখ বিসুখ কিছু হ'লে তাঁরা নিশ্চয়ই লিখ্‌তেন। বাড়ী পৌঁছায়। তখন সবেমাত্র পৃথিবী গোধূলির ধূসর ঘোমটাটুকু মুখের উপর টেনে দিয়েছে।

দরজায় ঘা দেয়—বুকে আশা—এখনই বুঝি দুখানা রাঙ্গা হাত দরজা খুলে দেয়। দরজা খুলে যায়! পাশে শুক্‌নো মুখে বুড়ো বাপ দাঁড়িয়ে—! ছেলেকে দেখে ব্যাকুলভাবে ব'লে ওঠেন—তুই এসেছিস্—ভগবান………আর কোন কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরোয় না। অমিয় হতভম্ব হ'য়ে যায়—এ কিসের পূর্ব্বাভাস—বাবার মুখ শুক্‌নো কেন—বাড়ীর চারিদিক্ যেন ছম্‌ছম্ ক'রছে………অমঙ্গল আশঙ্কায় বুকটা তার কেঁপে ওঠে।

অপরাধীর মত কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে—কই, ঘরে ত কেউ নেই—ঐ যে শয্যা খালি—ইজি-চেয়ারেও ত কেউ ব'সে নেই—না, না, তা কি সম্ভব! ঐ যে আল্‌মারির পাশে কে সরে গেল না?—ছুটে যায়—কিন্তু কোথায় কে? ঘরের আলোটা মিট্‌মিট্ ক'রে জ্বলে

পারুলের নাম করে মা কেঁদে ওঠেন।

অমিয় চীৎকার ক'রে বলে ওঠে, কি, পারুল নেই! অসম্ভব! অমিয় ছুটে মায়ের কাছে যায়। ছেলেকে দেখে মায়ের শোক যেন আরও বাড়ে—আরও জোরে কেঁদে ওঠেন—

বেশ শান্তস্বরে সে জিজ্ঞাসা করে, কবে গেল, মা…।

আজ পাঁচদিন—

কি হ'য়েছিল, মা—এই ব'লে অমিয় তার মায়ের মুখের দিকে তাকায়—কি করুণ সে চাহনি!

ওরে তাত আমি জানি না·········মার আমার শরীর খারাপ······মনে ক'রলাম তুই বাড়ী থেকে আসা অবধি ঐ রকম—ও কিছু নয়, দুদিন পরে সেরে যাবে। পরশু সকালে অনেক বেলা হ'য়ে গেল তবুও মাকে ঘর থেকে বেরুতে না দেখে কেমন সন্দেহ হ'ল—কর্ত্তাকে ডেকে দরজা ভাঙিয়ে দেখি—সব শেষ—

আস্তে আস্তে সে মায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে যায়!—ছেলের উদাসী ভাব দেখে মায়ের মন শঙ্কায় কেঁপে উঠে—আজকালকার ছেলে যদি আত্মঘাতী হয়! তাড়াতাড়ি বলেন, তুই পুরুষ, তোর দুঃখ কি। একমাসের মধ্যেই তার চেয়ে ঢের সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে দেবো—

অমিয় কিছু বলে না, শুধু একটু হাসে—কি করুণ! মা'র কান্না তখনও থামে নি।

পথের এই শ্রান্তি তারপর আচম্‌কা এই শোকের বেগ তাকে পাগল ক'রে তোলে—দেহ আর চলে না—পা টলে—পড়ে বুঝি। কোন রকমে নিজের ঘরে গিয়ে সোফাটায় বসে। মনে তার চিন্তার ঝড়—তার আদি নেই, অন্ত নেই! সবই এলোমেলো। সমস্ত স্মৃতিগুলো যেন একেবারে মনের পটে ফুটে উঠ্‌তে চায়—ঠেলাঠেলি করে—পাগল ক'রে তুল্‌বে নাকি!

পারুল, একি ক'রলি, পাষাণী······।

আস্তে আস্তে বুকপকেট থেকে একখানা ছবি বা'র করে·········

একি! পারুল এত রোগা হয়ে গেছে—চোখের কোণে কালি পড়েছে।·········

ভয়ে বিস্ময়ে সে শিউরে ওঠে—কই এর আগে ত এ ছবিখানার চেহারা এ রকম দেখি নি······। কেন আমি সব জেনে অন্ধ হয়েছিলাম, মূর্খ আমি, কি ক'রেছি······কেঁদে ওঠে। না, ছবি আর আমি আঁক্‌বো না—আমি যে ছবিই আঁকি না কেন তার পিছনে একটা না একটা অমঙ্গল থাকেই, আমার তুলিতে কি বিষ আছে?

পাষাণী, যাবার সময় আমায় একি দাগা দিয়ে গেলি! এই দেখ সব ফেলে দিচ্ছি—তুলি, রং; তুই ফিরে আয়—ওরে ফিরে আয়·········

নিঝুম রাত। দু একটা নিশাচর পাখী ডেকে ওঠে—কি কর্কশ সে চীৎকার! অমিয় কাঁদে! ছম্‌ছমে রাত। তার কান্নার সুর তারই কাণে এসে বাজে! ······নিজের সুর শুনে নিজেই চম্‌কে ওঠে······

পাশের ঘরে মা কেঁদে কেঁদে এই মাত্র চুপ করেছেন। সব নিশুতি······অমিয় আস্তে আস্তে গিয়ে পূবের দিকের জানালাটা খুলে দেয়। মুখ বাড়িয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকায়—কোণের শুকতারাটা তখন জ্বলজ্বল্ ক'রছে ······মনে হয় ঐ যেন তার হারিয়ে-পাওয়া প্রিয়া আকাশের গায়ে গায়ে ফুটে আছে······

ছেলে বেলায় শোনা গল্পের মত তার মনে হয়—মানুষ পৃথিবী থেকে চলে গিয়ে আকাশের গায়ে তারা হোয়ে ফুটে থাকে! অবিশ্বাস কোর্‌তে পারে না—এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তারার মিটিমিটি চাহনি দেখে মনে হয় ও যেন তারই পারুলের! আকাশের বুক চিরে পৃথিবীর বুকের উপর শিশির ঝ'রে পড়ে—মনে ভাবে ঐ বুঝি তার প্রিয়া কাঁদ্‌ছে······

মা, পাগল হলাম নাকি!······কিন্তু এ পাগ্‌লামিটুকু ত ছাড়তে পার্‌ছি নে—তা হলে আমি কি নিয়ে থাক্‌ব······

জানালার ধারে দাঁড়িয়ে তার বাকি রাতটুকু কেটে যায়···

ভোর না হোতেই মা এসে ঘরে ঢোকেন—সে কি সান্ত্বনার ছড়া! ছেলের মুখের দিকে নজর প'ড়তেই বুঝ্‌তে পারেন—সারারাত তার না ঘুমিয়ে কেটেছে। পাশে দাঁড়িয়ে গায় হাত বুলাতে লাগেন! অশ্রুর রুদ্ধ বাঁধ ভেঙে যায়—চোখ বেয়ে দরদর কোরে ধারা নেমে আসে······ মায়ের চোখও অনার্দ্র থাকে না······অনেক বুঝানোর পর অমিয় স্নান কোর্‌তে যায়। বাগানের ভিতর দিয়ে পথ! পথের পাশে চাঁপাতলায় আসতেই সে থম্‌কে দাঁড়ায়! মনে পড়ে যায় যাবার আগেকার দিনের বিকেলের কথা! পা আর চলে না······

আমাকে কি বাঁচ্‌তে দিবি নে, অমি।

মায়ের কথার উত্তর দেয় না—
তাড়াতাড়ি পথ বেয়ে চ'ল্‌তে থাকে।

দিন যায়।

রাজার সভায় অমিয় একখানা ছবি দিয়ে গেছে—বলেছে এই তার শেষ দান। মখমলে ঢাকা। তার অনুরোধ সে সেখান থেকে না যাওয়া পর্য্যন্ত যেন ছবির ঢাকা খোলা না হয়……

রাজার বিশ্বাস আছে ছবি খারাপ হ'তে পারে না। জিজ্ঞাসা করেন কত দাম?……বিনীত সুরে অমিয় বলে—এটা আমার রাজাকে উপহার……। রাজা বলেন,—তা কি হয়, কিছু অর্থ চাই বই কি? অমিয় উত্তরে জানায় না, রাজা অর্থ আমার চাই নে, জগতে আমি একা—নিজের জন্ম এই বুক্‌টায় প্রচুর আছে। শিল্পী পিছন ফেরে। রাজা হেসে বলেন,…খেয়ালি, জগেতের সব চেয়ে দুঃখী।

ছবি খোলা হয়।

এ কি! এযে শিল্পীর চেহারা—আকাশের গায় ওটা শুকতারা নয়! ও কি করুণ চাহনি! শিল্পী ওরকম ব্যগ্রভাবে ওরদিকে তাকিয়ে আছে কেন? ঐ যেন শিল্পীর চোখের পলক পড়্‌ল—অশ্রু ঝ'রে পড়লো না?

ফুলের বুকে পড়ে মধু!

রাজা কেঁদে ওঠেন—এ কি ছবি দিয়ে গেলে, শিল্পী… এ রাখার মত উপযুক্ত যায়গা ত আমার নেই……

কি লেখা রয়েছে না?

—এক শিল্পী এক রাজার খেয়ালের ছবি আঁক্‌তে গিছ্‌ল। ছবি আঁকে রাজার মনের মত হয়—কারণ শিল্পীও ছিল খেয়ালি। খুব প্রশংসা পায়।

রাজা একদিন ব'ললেন—আচ্ছা শিল্পী—এমন ছবি কি তুমি আঁক্‌তে পার না—যাতে উপরের 'জীব' পৃথিবীতে আসার জন্য ব্যগ্র লালায়িত, প্রমাণিত হয়?

তাই এই ছবি।

শুক্‌তারা চাইছে পৃথিবীতে নেমে আস্‌তে—যেখানে আসা তার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। তার বুকের বিরাট ক্ষুধা চোখ মুখে প্রকাশ পাচ্ছে—কিন্তু সে মুখের উপর এমন একটা বেদনার ছাপ আঁকা আছে…যা পৃথিবীর চোখে মনে হয় করুণ বড় করুণ………

"রক্ত করবী"র যৎকিঞ্চিৎ

—শ্রীজ্যোৎস্নানাথ চন্দ

"সুন্দরের হাতে রঙের তুলি দিয়েছে বিধাতা।…মালতী ছিল, মল্লিকা ছিল, ছিল চামেলী; সব বাদ দিয়ে এ ফুল কেন বেছে নিলে?" রক্ত-করবী পড়্‌তে গিয়ে যে প্রশ্নটা আমার মনে প্রথম জেগেছিলো সেটা এই! রক্ত-করবীকে ফুলের বাঙ্‌লা যুগে যুগে শক্তির প্রতীক বলে জেনে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ জীবনকে এই রক্ত-করবীর জালে জড়িয়ে এমন চমৎকার করে প্রকাশ করেছেন যে সে প্রকাশের ঐশ্বর্য্য হয়তো তাঁর কল্পনাকেও হটিয়ে দিয়েছে। নন্দিনীর গলায় রক্ত-করবীর দোলন্ দেখে অধ্যাপক বিস্মিত হয়ে বল্লেন—"তা আমাকে ওর একটী ফুল দাও, শুধু ক্ষণকালের দান ওর রঙের তত্ত্বটা বোঝ্‌বার চেষ্টা করি"—আর সত্যি করেই জীবনের প্রত্যেকটী তত্ত্বর সাথে জড়িয়ে রয়েছে মানুষের এই "রঙের তত্ত্ব" বোঝবার স্পৃহা। জীবন যেখানে গানের রঙে, খুসির রঙে রাঙা হয়ে রয়েছে রক্ত-করবীর অধ্যাপক সেইখানে খুঁজচেন তার মনের মানুষটীকে। গন্ধে-গানে লীলায়িত এই নিখিলের নন্দিনীর ভিতরে রবীন্দ্রনাথ যে সুবিপুল চেতনার রাজ্যটীতে টেনে এনেছেন সে রাজ্যটীর কিঞ্চিৎ ভালো করে বুঝ্‌তে হলে "বিশ্বের বাঁশীতে নাচের

যে ছন্দ বাজে সেই ছন্দেরই" ছোপ্ দিয়ে রাঙিয়ে নিতে হয় মনোরাজ্যটাকে নইলে "সহজের থেকে প্রাণের যাদুটুকু কেড়ে আন্‌তে পারিনে" আমরা। নন্দিনীর গলার রক্ত-করবীর একটা ছোট্ট পাপ্‌ড়ি কত জনাই না চাইলে কিন্তু নন্দিনী ফুল না দিয়ে কেবল বলছে—"তুমি নিজকে সবার থেকে হরণ করে রেখে বঞ্চিত করেছো, সহজ হয়ে ধরা দাও না কেন ?" সহজ হয়ে, "অনবকাশের উজান ঠেলে" এসেছিল শুধু একজন—সে রঞ্জন ! কিন্তু কী করে নন্দিনীর মনোহরণ করলে ? এ প্রশ্ন হয়তো চিরদিন, চিররাত্রি অজানা থেকে যাবে।

আমাদের বিংশ শতাব্দীর যন্ত্র-সভ্যতা-দীপ্ত যুগে যে লড়াইটা সুরু হয়েছে সেটা এক কথায় বলতে গেলে "জোর" ও "যাদু"র যুদ্ধ !

মানুষের মনকে যিনি নেপথ্য থেকে যুগে যুগে রঙের আগুণ জ্বালিয়ে জোয়ান্ করে তুল্‌ছেন তাঁর শুধু দুটী কথায় ফুটে উঠেচে এই "জোর" ও "যাদু"র তফাৎ।

"পৃথিবীর নীচের তলায় পিণ্ড পিণ্ড পাথর, লোহা, সোণা সেইখানে রয়েচে জোরের মূর্ত্তি। উপরের আর একটুখানি কাঁচা মাটীতে ঘাস উঠেছে, ফুল ফুট্‌ছে—সেইখানে রয়েছে যাদুর খেলা ! দুর্গমের থেকে হীরে আনি, মাণিক আনি , সহজের থেকে ঐ প্রাণের যাদুটুকুকে কেড়ে আন্‌তে পারিনে !" কী করেই বা পারবে ? জোর দিয়ে সোণা-রূপোর চাকতি জড়ো করা যায়, মন জয় কর্‌তে হলে চাই প্রাণের যাদু ! ধরণীর ঘরে ঘরে রূপোর চাকতি নিয়ে মানুষ খাব্‌লে খাচ্ছে কিন্তু প্রাণের পরশ সেখানে নেই—তাই তো এল বলশেভিজ্‌ম্, কম্যুনিজ্‌ম্ আর নিহিলিজ্‌ম্ ! জীবন যেখানে রূপোর আঙুল নাড়ায় ওঠে-বসে প্রাণের রস সেখান হতে ঠেলে বেড়িয়ে আসে তুঁতের রসের মতন তেঁতো হয়ে। এ যুগের মানুষ কল-কব্জার পাল্লায় পড়ে হাঁপিয়ে উঠেছে ; তারা চাইছে প্রাণের যাদু একান্ত ভাবেই যা তাদের মানুষ হিসেবে ভগবানের কাছে পাওনা। "আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি......তোমার মত একটী ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্ব্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে সরুর পরিসরই বাড়্‌ছে ঐ একটুখানি দুর্ব্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন কর্‌তে পার্‌ছে না। নেপথ্যের যে এই কান্না, এ কার কান্না ? হীমের গরমে চোখের মণি সেঁৎলে গেছে, মদের নেশায় রূপোর চাক্‌তি দেউলের পরোয়াণা জাহির করেছে—এক কথায় মানুষের সহজ জীবনের স্বচ্ছন্দ আনন্দের আবাসটাকে ভেঙ্গেচুড়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এই industrialism এর বিরুদ্ধে কান্না আজ রুশ থেকে ভারতের ভরতদেরও অতিষ্ঠ করে তুলেছে, একবার দুচোখ তুলে ওপরের আকাশটার দিকে চাইবার শক্তি নষ্ট করে দিয়েছে। নেপথ্য থেকে নন্দিনীকে প্রশ্ন করা হল—"আমার শক্তিতে তুমি খুসি হও, নন্দিন্ ?" নন্দিনী বলে "ভারি খুসি লাগে। তাইতো বল্‌ছি আলোতে বেড়িয়ে এসো, মাটীর ওপর পা দাও, পৃথিবী খুসি হয়ে উঠুক !"

"রূপের মায়ার আড়ালে অপরূপ" নন্দিনীর মুখের কথা আজ বিশ্বের কথা......জোরের সঙ্গে মেশাতে হবে যাদু! কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবি......এ সমাধান বিশ্বের খুসি বহন করে আসুক্ কিন্তু কবির খুসির খেসারৎ কই ? নন্দিনী জোরের মায়ায় মুগ্ধ কিন্তু তবু বল্‌ছে—"সোণার পিণ্ড কি তোমার ঐ হাতের আশ্চর্য্য ছন্দে সাড়া দেয় যেমন সাড়া দিতে পারে ধানের ক্ষেত ? রাজা, বলতো পৃথিবীর এই মরা-ধন দিন রাত নাড়াচাড়া কর্‌তে তোমার ভয় হয় না !" ধনী তার ধনাগারের রত্ন বহর ঘেঁটে মনে করে জীবনের রূপ-রস ও আনন্দকে সে মুঠোর মধ্যে পুরেছে কিন্তু সাধ্যকারের সম্পদ্ যে কোন্ ফাঁকে বেড়িয়ে পড়ে সে তা হাজার হাৎড়েও খুঁজে পায় না। "পৃথিবী আপনার প্রাণের জিনিষ আপ্‌নি খুসি হয়ে দেয় "কবিদের, দেয় তাদের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির পথ বাৎলে ; কিন্তু পঙ্গু হয়ে রইলো যাদের জীবন, রসকে যারা কসিয়ে দিলে তারা আসে নন্দিনীর কথায় "অন্ধকার থেকে একটা কাণা রাক্ষসের অভিসম্পাত নিয়ে।"

মণীন্দ্রলালের "রমলা"র ইঞ্জিনীয়ার যতীন্, তুর্গেনিভের "ফাদার্স এণ্ড্ চিলড্রেণে"র বিরাট্ মানুষ বাজারোভ্—আরও এমনি অনেক, সবাই তারা খুল্‌তে চেয়েছিলো

"বিধাতার সেই বন্ধ মুঠো" কিন্তু সত্যি করে খুল্‌তে পেরেছিলো কী? পারেনি তাদের কেউই, কেনো না, যে সোণার কাঠির স্পর্শে মায়া-পুরীর রাজ-কন্যার ঘুম ভেঙ্গে যায়, যে sesame আওড়ালে আলিবাবার ধন দৌলতের দরজা খুলে যায় সে চাবি তারা পায় নি। জীবনের সিন্ধুকটাকে যন্ত্র দিয়ে খোলা যায় না, যা দিয়ে যায় সে "প্রাণের যাদু"! জোরের দেব্‌তা নন্দিনীকে বল্‌ছেন——"যে দান বিধাতার হাতের মুঠির মধ্যে ঢাকা, সেখানে তোমার চাঁপার কলির মতো আঙুলটী যতটুকু পৌছোয়, আমার সমস্ত দেহের জোর তার কাছ দিয়ে যায় না।" এযুগের কমার্শীয়ালিজ্‌ম্‌' এর নেতার কাছে এ সত্য আজও এসে পৌছয়নি। "god is god, man is man" থিওরী আঁকড়েই আজ গোটা পৃথিবীর মানুষের মনুষ্যত্বটী নিলেমে চড়েছে·········actualism এর বালাই দিয়ে চড়াও হচ্ছে বিধাতার রাজ্য। ফরাসীর ছেলে বার্গস (Bergson) নিয়ে এসেছেন তাঁর "গতিবাদ" জীবনের চলার পায়ে পরিয়ে দিয়েছেন তাঁদের থিওরীর শিকল··· কিন্তু এই থিওরীর শিকল ভেঙ্গে যে বড়ো জীবনটী পড়ে রয়েচে তার খোঁজ পেয়েচে ক'জনা? "নীল চাঁদোয়ার নীচে" জীবনকে আজ বিষিয়ে দিয়েছে টাকার দালাল। এই বিষের ব্যথায়ই "রক্ত-করবী"র বিশু চল্‌ছে—"একদিকে ক্ষুধা মার্‌ছে চাবুক, তৃষ্ণা মার্‌ছে চাবুক, তারা জ্বালা ধরিয়েছে—বল্‌ছে, কাজ করো! অন্যদিকে বনের সবুজ মেলেছে মায়া, রোদের সোণা মেলেছে মায়া, ওরা নেশা ধরিয়েছে—বল্‌ছে ছুটী, ছুটী!" এই যে একটা জীবনের দুমুখো টান তাকে রূপো লেলিয়ে নিয়ে যায় কাজের দিকে "তাদের" না আছে আকাশ, না আছে অবকাশ "তাই ওরা" বারোঘন্টায় সমস্ত হাসি-গান সূর্য্যের আলো কড়া করে চুঁইয়ে নেয় এক চুমুকের তরল আগুনে।" মার্কিণ ধর্ম্ম-যাজক Van Dyke এর একটা চমৎকার উক্তি উদ্ধৃত কর্‌বার লোভ সম্বরণ কর্‌তে পার্‌লুম্‌ না আমি। তিনি বল্‌ছেন······many honest folk dislike these emotions so much that they shut their eyes and walk through the world with their heads in the air, breathing a little atmosphere of their own, and congratulating themselves that the world goes very well now." কথাটা Sunday school-spirit এই বলা হয়েছিল কিন্তু ভেতরের ব্যাপারটা আর একটু ব্যাপকতর বলেই আমার বিশ্বাস। যারা শুধু ওপরের দিকেই হেঁটে চলেন তাঁদের চোখে এ সব পড়ে না, এক চুমুকের তরল আগুণের আঁচ তাঁদের কাছে পৌছয় না. কিন্তু জীবন-পথের পাপ্‌ড়ির দুটো পিঠই যাঁরা দেখেন তাঁরা জানেন কী নিবিড় নিপীড়নেই ওরা ছোটে খোলা মদের আড্ডায়।

Capitalist এদের গলায় যে ফাঁসির দড়ি লট্‌কে দিয়েছে তারই ভেতর থেকে ওরা গায়

তোর প্রাণের রসতো শুকিয়ে গেল ওরে,
তবে মরণ রসে নে পেয়ালা ভরে।
সে যে চিতার আগুণ গালিয়ে ঢালা,
সব জ্বলনের মেটায় জ্বালা,
সব শূন্যকে সে অট্ট হেসে দেয় যে রঙীন্‌ করে!

বিশু যখন বল্লে "সর্দ্দার কেবল যে ফের্‌বার পথ বন্ধ করেছে তা নয়, ইচ্ছেটা শুদ্ধ আটকেছে। আজ যদি বা দেশে যাও টিঁকতে পার্‌বেনা, কালই সোণার নেশায় ছুটে ফিরে আস্‌বে, আফিম্‌খোর পাখী যেমন ছাড়া পেলেও খাঁচায় ফেরে" তখন যে ও কথা শুধু বিশুর কথাই এ তো মনে হয় না, খড়্গপুরের কুলি থেকে গোটা পৃথিবীর মজুরদের মনের কথা সেঁধিয়ে যাওয়া পাঁজর ঠেলে নির্ম্মম ভাবে বেড়িয়ে এসেছে। বিশু আবার বলে "গাঁয়ে ছিলুম মানুষ এখানে হয়েছি দশ পচিশের ছক্‌। বুকের ওপর দিয়ে জুয়ো-খেলা চল্‌ছে।" ধরিত্রীর চারকোণা সরগরম করে যখন কলের বাঁশী ডাকে তখন কি আর হুঁস্‌ থাকে এই ছকেদের——ছোটে ওরা, "সোণার তাল গুলো যে মদ তারই নেশায়। ওরা তো মানুষ নয়, এক একটা বাজ-পড়া চুঁটো তাল গাছের সামিল্‌ জীবন যাদের রূপোর চাকৃতির পায়ের তলায় ডিগ্‌বাজী খাচ্ছে নিত্যি তিরিশ দিন। তিন্‌শো পয়ষট্টি দিনের বছর! তবুও ফুরসুৎ নেই একটা দিন; কাজ ফুরোয় তবু overtime পেছন থেকে টানে—খাটো, তবল পয়সা দেব! হঠাৎ একদিন

দেখে জীবনকে যে জুয়োর কাছে বিক্রী করেছে সে শরীরের তাগৎ কম্‌তে না কম্‌তেই কাঁচকলা দেখিয়ে বিদেয় দিচ্ছে—নিজের বুকে হাত দিয়ে দেখে সেখানে রয়েচে শুধু গোটা-কয়েক্ শক্ত হাড়! আজ পৃথিবী জুড়ে মজুরদের, যারা আমাদের নরম তুলতুলে শরীরটাকে নিজেদের রক্ত জল করে গড়ে তুলছে, তাদের গোঙানি শুনতে পাচ্ছি। আজ যারা মানুষ তারা বলুক্ "বিশ্বের মর্ম্মস্থানে যা লুকানো আছে তা ছিনিয়ে নিতে চাই, সেই সব ছিন্ন প্রাণের কান্না।" আজ বিশ্বের নন্দিনী "রক্ত-করবী"র নন্দিনীতে এসে বলছে—"কিসের আর্ত্তনাদ?" মুখচোখে তার প্রাণের লীলা আর পিছনে কালো চুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তেজ ঝরণা। নেপথ্য থেকে জবাব আসে——"তুমি জানোনা আমি কত শ্রান্ত!" সত্যিই রূপোর পেছনে ছুটে ছুটে এ যুগের পৃথিবী বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের ওস্তাদ্ পড়ুয়া অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন Rabindra nath tagore and his Philosoply নামক পুস্তকে কবির এই Commercialism এর প্রতি ঘৃণার কথা উল্লেখ্ করেছেন। অধ্যাপক লিখ্‌চেন—"Rabindra nath does not want India to worship efficiency and machinery and build her fabric on fear and discipline, but wishes her to practise the love that gives but does not grasp, and build on the stable foundations of freedom and good will. (Tagore and his Philosophy P. 294.) কমার্শীয়ালিজম্ আজ কাজের নাম দিয়ে আমাদের বাজে করে ছেড়ে দিয়েছে। "রক্ত-করবী"র অধ্যাপক বলছেন—"সকল্প-সরোবরের পাথরটাতে চাড় লেগেছে, তলটা ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে এসেছে।" আজ বালটিক্ থেকে অ্যাডিভস্টক্ পর্য্যন্ত প্রশ্ন শুনতে পাচ্ছি "বস্তুবাগীশ, এ কোন্ জায়গায় আমাকে আনলে, আর কি কর্‌তেই বা আনলে?" আজ কমার্শীয়ালিজম্ এর আওতায় ছেলে মার্কিণকে জিজ্ঞেস্ কর্‌লে সে শুধু বল্‌বে—we stagger and reel! মানুষ আজ যে সমাজে বাস করছে পুরুষ ও নারী তার দুটী পা। খনি থেকে মণি খুঁড়ে বের করে পুরুষ, নারী আড়াল থেকে যুগে যুগে প্রীতির পাত্রটী বহন করে পুরুষের মুখে অমৃতের আস্বাদন দিচ্ছে। আজ এই যন্ত্র-সভ্যতা-দীপ্ত বিংশ শতাব্দীর চারদিকে দেখ্‌চি ষ্টীয়ারিং হুইল থেকে ট্রিগারে তাদের পড়েছে হাত——অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের কথায় "we have unsexed them"! আর একবার আপ্‌না থেকে আমাদের চোখ পড়ে নন্দিনীর দিকে। কোন খানে তার এতটুকু খোঁচ নেই—স্রষ্টার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। নন্দিনীর personal individualism কবির কালির আঁচড়ে লোপ পেয়ে গেছে, সেখানে এসে দেখা দিয়েছে communal individualism. অধ্যাপকের কথায় বল্‌তে হলে বল্‌ব "পৃথিবীর প্রাণভরা খুসি খানা নিজের সর্ব্বাঙ্গে টেনে নিয়েছে, ঐ আমাদের নন্দিনী!" ডাঃ তারকনাথ দাশ তাঁর Wastage of man-power নামক বইয়ে মানবীয় জীবনের দাম কমে যাবার যে কথাটা উল্লেখ করেছেন আমাদের কবির কলমে তা জীবন্ত হয়ে কথা কইছে। "রক্ত-করবী"র রাজা বল্‌ছেন "আমি যৌবনকে মেরেছি, এতদিন ধরে আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে কেবল যৌবনকে মেরেছি। মরা-যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেছে।" আজ বাঙালীর যৌবন, তথা বিশ্বের যৌবন দেউলে হতে বসেছে, টাকার পায়ে বিকিয়ে দিয়েছে তার জীবন। আজ আমার দেশের নন্দিনীরা "রক্ত-করবী"র নন্দিনীর কথায় আমাদের বলুন "বীর আমার, নীলকণ্ঠ পাখীর পালক এই পরিয়ে দিলুম্ তোমার চূড়ায়। তোমার জয়-যাত্রা আজ হতে সুরু হয়েছে। সে যাত্রায় বাহন আমি। হাতে সেই আমার রক্ত-করবীর মঞ্জরী।"………

"রক্ত-করবী"র মঞ্জরী আসুক্ বহন করে নবীন্ রেনেসাঁসের বার্ত্তা!

——:০:——

কাল বৈশাখী

—শ্রীসুরেন ভট্টাচার্য্য

লোকে বলে এইটুকু ব্যাপারকে অত বড় করে না দেখলেও চলে! এবং এ রকমত' হামেশাই ঘটে থাকে, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই!

যদিও জাতে বৈদ্য, আমি নিজে চাষ করে', মাথার ঘাম পায়ে ফেলে,' দিন গুজরান করি।—এটা যেন মস্ত অপরাধ আমার! আমাকে ওরা কেহ ভদ্রলোক বলে মানেই না।

দুলাল গুপ্ত সান্ত্বনা দিতে আসে, বলে,—ভেবে আর কি করবি বল রতন? বেটীকে ঘরে ফিরে নিতে পাববি না ত' আর,—যেখানেই থাক্।

রুক্ষস্বরে জবাব দিই;—বাড়ী ছিলুম না নইলে দেখে নিতুম বেটাদের! এখনও যদি খবর পাই একবার……

আমার পিছনে থেকে তারিণী খুড়ো এবং দীনু দা' চুপি সারে পরস্পর ইসারা করে কথা কচ্চেন,—আমি ত এক হতভাগা, খেতে পাই না, বৌকেও খেতে দিতাম না, কোন্‌দিন আমার ঘরে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরত তার চেয়ে পালিয়ে বেঁচেছে!—

সকলকার সব তিরস্কার, প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা, এবং প্রকাশ্য সহানুভূতি আমি শুনতে শুনতে মহা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

বিরক্ত হয়ে বললাম,—আমার ওপর যারা বেইমানী করেছে, আমি প্রতিশোধ দিতে ভুলব না। আপনাদের সহৃদয়তার জন্য ধন্যবাদ! আমি দাঁড়িয়ে থেকে আপনাদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে আপনাদের মূল্যবান সময়ের অপব্যবহার করব না। আপনাদের কাহারও সাহায্য না হলেও চলবে। আমি দুর্ব্বল নই। এই দুঃখে আমি কাতর হয়ে মুয়ে পড়ব না নিশ্চয়!……

তারিণী খুড়ো বললেন,—সে ত ভাল কথাই রতন! আমরাও তাই বলছিলাম! পুরুষ মানুষ, চোখের জল ফেলা এবং হা-হুতাশ করা তোমাদের সাজে না! কিন্তু এটাও বারণ করি বাবাজী, তোমার ভালর জন্যই বলি, গোঁয়ার্ত্তুমি করে কিছু একটা করে বস' না। মুসলমান গুণ্ডাদের এই সামান্য ব্যাপার উপলক্ষ্য করে ক্ষেপিয়ে তুল' না। ওরা সাংঘাতিক জাত! শেষ কালে আবার তোমার পাপে আমাদেরও প্রাণ সংশয় করে তুলবে,—

—কিন্তু কাকা, মুসলমানদের হোক অথবা যারই হোক এ সব অন্যায় অত্যাচার প্রশ্রয় দিয়ে গেলেও ত চলবে না! এর জন্য দাঙ্গা হাঙ্গামা বাঁধে তাতেই বা ক্ষতি কি, একটা চিরকালের জন্য মীমাংসার দরকার হয়ে পড়েছে।

কেনারাম দাস আমার কথা শুনে একটু যেন গরম হয়েই বলল,—দেখ্ রতনা, তুইই যেন আজ বাড়ী ছিলি নি, আসতে রাত হয়েছে, এবং আমারও হয়েছে পায়ে বাত দৌড়তে পারি নি! বাকি এই এত গুলো জোয়ান, এরা কি ঘুমিয়ে ছিল সবাই? তখন সবে ত' সন্ধ্যে, আমি সবে মাত্র গরুটাকে বেঁধে দুধ দোহাবার চেষ্টা দেখছি……

দুলাল ক্ষেপে উঠে জবাব দিলে,—কেনা, আমাদের কাছে আর তুই সাহস দেখাস নি! যথেষ্ট হয়েছে! আমরা ঘুমিয়েছিলাম—নয়! মোছলমান মোছলমান করছিস্—মোছলমানে ধরে নিয়ে গেছে দেখেছিস্ কেউ নিজের চোখে? মোছলমান গ্রামে ডাকাতি করতে এল আমরা টের পেলুম না কেউ!

আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম—আসে নি? তবে নিজের চোখে দেখেছ সব বলছিলে এতক্ষণ?

এখন আর কেউ স্বীকার করে না!

তাহলে নূতন করে সমস্যা—শ্যামলী গেল কোথায়?

যেখানেই যাক্, আমার নিজের যেখানে দায়ীত্ব সে ব্যাপারে কেউ আমাকে নিষ্কৃতি দেবে না!

শ্যামলীর কথা আমি একলাই ভাবি সে,'—তাকে নিয়ে

আর কারও মাথা ধরে নি! সে কোথায় গেছে, এবং অতঃপর তার সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য, উপস্থিত আর কিছুই মীমাংসা যখন হল না, সবাই দাবী করে বসল, আমায় প্রায়শ্চিত্ত না করলে জাতে নেওয়া হবে না।

শ্যামলী বার হয়ে যাওয়ার অপরাধটা যেন আমারই!

বিস্মিত হয়ে তাদের দিকে চেয়ে রইলাম, বললাম—আমি দেব? কারণ?

দীনু দা বললেন—জাত গেছে তোর, জানিস্ না? ন্যাকা সেজেছেন টাকা দেবার ভয়ে!

—চুলোয় যাক্ জাত, টাকা দেব না! জোচ্চোর তোমরা,—আমার দুঃখে সাহায্য করতে কেউ এগিয়ে আসবে না, জাত গেছে এখন টাকা দেও! ঝাঁটা মারি অমন জাতের মুখে!

দুলাল গুপ্ত, তারিণী খুড়ো, দীনু দা যে যেখানে ছিল সবাই হক্‌চকিয়ে গেল আমার কথা শুনে! জাত চাই না বলে সমাজকে অপমান করেছি, আমার এত বড় সাহস এঁরা প্রশ্রয় দিতে পারেন না!

একটা দস্তুর মত মারামারি বাঁধবার সুযোগ হচ্ছিল।

একা আমি অতগুলা লোকের সঙ্গে যুঝবার আশা করাটা পাগলামী, তবু চেঁচিয়ে বললাম—ভয় দেখাচ্ছ কি তোমরা? মারবে আমায়? বেশ সাহস থাকে এগিয়ে এস—

কিন্তু কি জানি কি ভেবে সামনে দাঁড়িয়ে লড়বার প্রশস্ত পথটা ওঁদের পছন্দ হল না।

দুলাল বল্লে—এত বাড় সইবে না রতন! পচে মরবি!

দীনু দা বল্লে—মানুষের চিরকাল সমান যায় না! আমাদের অবহেলা করে গ্রামে কি করে বাস করিস্ দেখ্‌ব......

তারিণী খুড়োও সায় দিলেন—বেটা অধঃপাতে গিয়েছে! একলাই পচে মরুক, ওর কোন কথাতেই আর আমরা আসছি না—

আমি বুড়ো আঙুল নেড়ে জবাব দিলাম—আমার বয়ে গেল!

দুলালরা গজ্ গজ্ করতে করতে চলে গেল যে যার আস্তানায়। মায় কেনারাম পর্য্যন্ত।

একজন শুধু দাঁড়িয়ে ছিল তখনও,—ভট্‌চায বাড়ীর মিলন। তাঁর দিকে এতক্ষণ আমাদের কারও লক্ষ্য পড়ে নি।

বাকী সবাই চলে যেতে মিলন এগিয়ে এলেন।

বল্লাম—একি মিলন বাবু, আপনারা যে আমার ঘরে—এই রাত দশটার সময়—

মিলন বললেন—পথ দিয়ে যেতে যেতে ঝগড়া শুনতে পেয়ে কৌতূহল হয়েছিল; কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন ত?

—আপনারা ছেলে মানুষ, বুঝবেন না। আমাদের ঘরোয়া দুঃখের কাহিনী!...

—ঘরে বিপদ যখন স্বজাত এবং আত্মীয় কুটুম্বদের শত্রু করে তুললেন। বাইরের শত্রুর সঙ্গে যুঝবেন কি করে? কটা টাকা ফেলে দিলেই ত পারতেন!

—খামকা টাকাই বা দিতে যাব কেন? দোষ করি নি, অন্যায় করি নি,—

—আপনার স্ত্রী ফিরে এলে তাকে ঘরে ফিরে নিতে পারবেন?

—এখনও বলতে পারছি না। অমনি হয়ত পারব না! তবে যদি ভাল থেকে ফিরে আসতে চায় তাকে ফের তাড়িয়ে দিতেও পারব না! অনেক রাত হয়ে পড়ছে—আপনি বাড়ী যান এখন। চলুন আপনাকে এগিয়ে দি। ঐদিকেই আমাকেও যেতে হবে একবার সমরবাবুর সঙ্গে দেখা করব—

—বেশ ত' চলুন না! আমি এর মধ্যেই বাড়ী ফিরব না। সমর দা' এ ব্যাপারে আমাকে কি পরামর্শ দেন শুনতে চাই!—

মিলনকে সঙ্গে নিয়ে সমরের বাড়ী হাজির হলাম।

সমর আপন মনে গীতা পড়ছিলেন। আমাদের দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—এত রাত্রে কি মনে করে আসছেন?—এই যে মিলনও এসেছ, খবর ভাল ত?—কিন্তু রতনদা', আপনাকে এত বিমর্ষ দেখ্‌ছি কেন? ব্যাপার কি?

যা ঘটেছে বললাম।

সমর আশ্চর্য্য হয়ে বললেন,—বৌদিকে পাওয়া যাচ্ছে না? সে কি? পাড়ার কেউ খবর দিতে পারলে না—

—খবর দেওয়া দূরের কথা বরং আমায় এক ঘরে করেছে সকলে মিলে,—

—কেন ?

—আমার জাত গিয়েছে, ফের জাতে উঠতে হবে—

—কত টাকা চায় ?

—সে কথাটা জানায় নি, সম্ভবতঃ পাঁচ গণ্ডার কম কাজ সারা যাবে না—

—তা টাকা দিয়েছেন ত ?

—না দিই নি, ইচ্ছে নেই—তা ছাড়া ক্ষমতাও নেই—

—তাই বলে কি স্বজাতির সঙ্গে ঝগড়া বাধাতে হবে ? কর্জ্জ করে দেখুন, না হয় অক্ষমতা জানিয়ে কিছু কম সমে যদি রফা হয়—

—সমরবাবু, আপনার কাছে উপস্থিত বিপদে কর্ত্তব্য জানতে এসেছিলাম!—আপনিও কি বলেন—ওদের অন্যায় দাবী মেটাতেই হবে আমাকে ?

—তা হবে বৈকি! দল ছাড়তে নেই! মানুষের ভুল বিশ্বাস একদিনে দূর করা যায় না। দলের ভেতর থাকতে হলে অনেক সইতে হয়। আপনার নিজের অপরাধ নেই জানি, তবু ওদের সংস্কারের দাবীটাও মেটাতে হবে।—

—অন্যায় জেনেও ?

—হাঁ, তাই হবে! প্রথমে চেষ্টা করব ন্যায় আর সত্য কি তারা বুঝুক। না যদি বোঝে, তখনই তাদের বিরুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করলে চলবে না। নিজের স্বার্থের চেয়েও বড় করে ভাবতে হবে আমার দেশের মঙ্গল। এর জন্য নিজের যতখানিই হক ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। আজকে যে কথা তারা বোঝেনি কাল তা শুনতে পারে! আগে হতেই তাদের যদি শত্রু করে দূরে সরিয়ে দিই—ব্যবধান দিনে দিনে বেড়েই চলবে!

—তাহলে, আপনার বৌদির খোঁজ এবং ভাবনা ছেড়ে দিয়ে ওদের দাবীটাই আগে মেটাতে চেষ্টা দেখি ?

—রতনদা আপনি কি আমার কথা অবিশ্বাস করছেন ?

—সত্যি কথা বলতে কি সব সময়ে বিশ্বাস রাখতেও পারি না। আমার স্বাধ ছেলের দাবীর চেয়ে বড় দাবী হল আমার জাতি কুটুম্বদের যারা বিপদের দিনে সাহায্য করতে আসবে না কিন্তু ফেরে পড়লে চেপে ধরে আমার গলায় ছুরি বসাতেও দ্বিধা করে না।

—তবে আমার কাছে এসেছেন কেন? পরামর্শ যদি নাই নেবেন, নিজে যা ভাল বোঝেন করুন!

—আচ্ছা, তবে, তাই করব! চললাম! আসুন মিলনবাবু,বাড়ী যাবেন ত ?

সমর বললেন—ওর বাড়ী ত কাছেই, আমিই রেখে আসছি!

উদ্ভ্রান্ত হয়েই মাঠ প্রান্তর অতিক্রম করে চলেছি।

শুক্লপক্ষের দ্বাদশী কি ত্রয়োদশী;—আকাশে জ্যোৎস্না ছিল। চারিদিক নিস্তব্ধ। ভাবলাম মুসলমান পাড়ার দিকে যাই।

কিন্তু হঠাৎ এক বাঁশ বাগানের ধারে আর্ত্তনাদ শুনতে পেলাম।

শ্যামলী নয়ত ?

সন্দেহাকুল চিত্তে সেই দিকেই ছুট্‌লাম।

চোখের সামনে যা দেখলাম—আপাদ মস্তক জ্বলে উঠ্‌ল আমার। পাঁচজন পুরুষ আর—

একটা বড় ইটের টুকরো নিয়ে মারলাম একজনের কপালে। লোকটা চীৎকার করে উঠে বসে পড়ল। বাকি কজনেই আমার দিকে ছুটে এল।

আমি একাই পথ রুখে দাঁড়ালাম। আমার লাঠির সামনে ওরা কেউ এগিয়ে আসতে পারল না। মার খেয়ে অবশেষে তারা সবাই পালিয়ে গেল।

ও পাঁচজনের মধ্যে চারজন হয়ত মুসলমান সত্যি, বাকি একজনকে কিন্তু সন্দেহ হল—লোকটাকে চিনি এবং মুসলমানের পোষাকে এলেও ও আমাদেরই স্বজাত।

হয়ত ওই লোকটাই মূল দোষী, মুসলমান গুণ্ডাদের টাকা দিয়ে সঙ্গে করে এনেছে!

ওদের ভাবনা ফেলে রেখে শ্যামলীর দিকে চাইলাম। মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিল। গায়ে হাত দিতে মনে হ'ল একেবারে মরে নি। কাপড়ে এবং মাটিতে রক্তের দাগ।

জ্ঞান আর ফিরবে কি না জানি না, তবু তার অবসন্ন দেহ কাঁধে তুলে নিয়ে বাড়ী ফিরলাম।

অভাগিনীর মাথাটা কোলে করে বসেছিলাম—কিন্তু নিতান্ত অসহায়। মুখখানি মুছিয়ে দিয়ে পাখার বাতাস করতে লাগলাম।

আমার মনে হল মানুষ বড়ই দুর্ব্বল। প্রাণ দিয়ে আমরা ভালবাসতে পারি, কিন্তু ভালবাসার গণ্ডী দিয়ে অন্তরতম দয়িতকে মরণের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা হতে লুকিয়ে রাখতে পারি না।

দুবছর মাত্র এক সঙ্গে ঘর করেছি।

আমরা দুজনেই ছন্নছাড়া, আমাদের আর কেউ ছিল না। আমাদের দরিদ্রের সংসারটার মাঝখানে রাজরাণী হয়ে ছিল। হয়ত যত্ন করতে পারি নি, সময়ে খেতে পায় নি, ভাল কাপড় কিম্বা গহনা পরতে পায় নি, তবু যতটুকু পেয়েছে তাইতেই যেন কত সুখী! একদিনও একটু বেদনা জানায় নি। মনের এতটুকু গ্লানি ছিল না! গরীবের ঘরে অভাগিনী কত কষ্টই সহে গেছে, চিরদিন মুখ বুজে ছিল, একবারও প্রতিবাদ জানায় নি।

এই জীবনটার মধ্যে দুটী মেয়েকেই শুধু ভালবেসেছি। শ্যামলীর সঙ্গে বাসন্তীকেও মনে পড়ে। প্রথম যৌবনে বাসন্তীকে জীবন সঙ্গিনী করবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলাম, সেখানেও গরীব বলে ফিরে আসতে হয়েছিল। আজ শ্যামলীকে হারাতে বসেছি, একই কারণে। আমি গরীব, তাই আমাকে অত্যাচার করবে সকলে। আমার মুখ ফুটে বলবার অধিকার নেই। স্বজাতিরাও ত্যাগ করে,—রাজার দরবারেও কেঁদে পড়লে বিচার পাই না! আমি গরীব, তাই আমায় একঘরে করেছে। ডাক্তারকে ডাকলেও আসবে না। পুলিসে খবর দিলে জীবন্ত অবস্থায় কোন সাহায্য কর্ব্বে না, মরে গেলে মৃতদেহটা নিয়ে কেটে চিরে সৎকার করবে।

তাছাড়া বাঁচলেই বা কি করবে?—তখন সমাজধর্মীদের আস্ফালন! যে মেয়ে একবার বেরিয়ে গেছে, দোষ তার থাক আর নাই থাক, সমাজের বুকে তার স্থান নেই। এই বিস্তৃত জগৎটার মাঝখানে তাদের একলা চলতে হবে—

রাত কেটে গেল।

তখনও শ্যামলীর জ্ঞান নেই।

মিলন এলেন খবর নিতে। আমাদের দেখেই চমকে উঠে বললেন—একি রতন দা?—কিন্তু বেঁচে আছেন ত? বিপদের সময় আপনি জ্ঞান হারাবেন না যেন, আমি ডাক্তার ডেকে আনছি—

—না ভাই, ডাক্তার দরকার হবে না। তাছাড়া ডাকলেও আমার বাড়ীতে কেউ আসবে না। আপনি এসেছেন—লোকে জানতে পারলে আপনাকেও নিন্দে করবে—

—করুক গে,—কিন্তু ডাক্তার আসবে না কে বললে? আমি ডেকে আনছি—

—না মিলন বাবু, ছেলেমানুষী করবেন না। ডাক্তার ডাকতে বারণ করবার আমার অন্য কারণ আছে।

—অন্য কারণ? কি?

—আমি বুঝতে পারছি ডাক্তারের সাধ্য আর কিছু নেই। ডাক্তার আনলেও শ্যামলীকে বাঁচান যাবে না। বরং শেষ সময়টা একটু সুস্থ হয়েই যে মরবে—সে সুখটুকু হতেও বঞ্চিত হবে। ডাক্তার এলেই পুলিস-কেশ হবে। তখন আর কেউ রাখতে পার্ব্বে না। মরার পর লাশ নিয়ে চিরে দেখবে—মৃত্যুর কারণ কি? কৈফিয়ৎ খুঁজবে! আমি তা সইতে পারব না......

—কিন্তু অপরাধীর শাস্তি হওয়া দরকার ত।

—দরকার হয় সে শাস্তি আমি নিজেই দেব। কিন্তু ওকথা থাক। আপনি সমর বাবুকে একবার খবর দিয়ে ডাকাতে পারেন? তবে সাবধান—আর কেউ না টের পায়!

সমরকে ডাকতে বাড়ী যাবার তাঁর দরকার হল না কিন্তু। সমর নিজেই খবর নেবার জন্য আসছিলেন।

বললাম—আসুন! শ্যামলীকে ফিরিয়ে এনেছি. এবার তার জাতে তোলাবার বন্দোবস্ত করে দিন!

সমরের চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বার হচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলেন—কার হতে এ দশা হয়েছে জানতে পেরেছেন?—একেবারেই মেরে ফেলেছে যে—

বিদ্রূপ করে বললাম—আমার জাত চাই, দল চাই, দেশ চাই! কিন্তু নিজের প্রাণটাই যে পুড়ে গেল সে দিকে কেউ দেখবে না কোনদিন!

শ্যামলী বোধ হল একবার ঠোঁট দুটো ফাঁক করে কি যেন চাইলে। দু'বার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবারও চেষ্টা করলে। কিন্তু পারলে না।

জলের গেলাস মুখের কাছে এনে ধরলাম। এক ঢোকও গিলতে পারলে না। কষ্ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

আরও আধ ঘণ্টার ভেতর বার দুই ধ্বস্তাধ্বস্তি করল—তারপর একেবারেই নেতিয়ে পড়ল।

বললাম—যাক্ এতক্ষণে শান্তি!

সমর বললেন—রতন দা একটা জিনিস আমি ভুল বুঝেছিলাম। আমাকে মাপ করুন। দল গড়তে হলে নিজেকেই বাঁচিয়ে রাখতে হবে। অপরের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। কিন্তু রতন দা আপনাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না!

—না সমরবাবু! আপনাদের আমার জন্য ভাববার দরকার নেই মোটে। আপনারা আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি কাতর হইনি। কাতর হয়েই বা কি করব। রাতের বেলায় সন্ধান পেলাম—এক বাঁশ ঝাড়ের ধারে শ্যামলী পড়ে গোঙাচ্ছে। দেখতে গেলাম—সে ভীষণ দৃশ্যের কথা ভুলব না জীবনেও। তার ওপর অত্যাচার করছে আমারই দেশের লোক—স্বজাতি এবং স্বধর্মী। সঙ্গে মুসলমান এসেছিল—কিন্তু তারাও ছদ্মবেশী কি না জানি না। পুলিসের হাঙ্গামা বাধাতে চাই না। তাতে অনেক লেঠা। পুলিসের বিচারের ন্যায়শাস্ত্র আমরা গরীব মূর্খ, বুঝতেও পারি না। ওতে কত নির্দোষী সাজা পায়, কত দোষী বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। যদি দিন পাই আমি নিজেই এর শাসন করব। আপনারা কিছু মনে করবেন না সমরবাবু। আমি নিজেই বুঝতে পারছি না কি বলছি। আমার মাথার ভেতর খুন চেপেছে—

ক্রমশঃই উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলাম।

অবশেষে বললাম—চলুন সমরবাবু। পুড়িয়ে আসি!

আপনিই খাটিয়া বেঁধে ফেললাম। শ্যামলীকে অত্যন্ত সন্তর্পণে তার উপর শুইয়ে খাটিয়ার দুপাশের বাঁশের সঙ্গে বাঁধলাম।

সমরকে বললাম—আপনি একদিকে ধরুন, আমি একদিকে ধরি। দুজনেই পারব!

মিলনও আসছিলেন।

বারণ করে বললাম—না মিলনবাবু! আপনি ব্রাহ্মণ, আপনারা আমাদের শব ছুঁতে নেই। আপনাদের অকল্যাণ হবে—!

মিলন বললেন—ও কথা মানি না!

আমি বললাম—আপনি নিজে মানুন আর নাই মানুন, আপনার মা রয়েছেন, দাদা রয়েছেন তাঁরা ক্ষুন্ন হবেন—।

মিলন বললেন—আচ্ছা ছোঁব না আমি কিন্তু আপনাদের সঙ্গে যেতে দিন আমাকে, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মাকে খবর দিয়ে আসছি!

খালের ধারে শ্মশান।

সন্ধ্যার আগেই দেহীর পার্থিব অবশেষ সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

তারা দেখে বাড়ী ফিরলাম।

আমার নিজের বাড়ীতে আর কেউ ছিল না ত। তাই মিলনের মা যখন ডেকে পাঠালেন আমিও আপত্তি না করে তাঁদেরই বাড়ী গিয়ে সে রাতটা কাটালাম।

সময়ে বিধবা মা একমাত্র ছেলের বিয়োগ দুঃখও ভুলে যান।

তাঁদের তুলনায় আমার এ দুঃখ কিছুই নয়, এই বলে মনকে প্রবোধ দিই।

শ্যামলী মরেছে জেনে কেউ সহানুভূতি জানাতে আসে।

কেউ বা বিদ্রূপ করে কাণাঘুষা করতে থাকে—'মরবে না! তখনই বলেছিলাম রতনের অত বাড় যখন বেড়েছে প্রতিফল একটা আছেই।'

দুপক্ষের কথা শুনেই আমি হাসতে থাকি।

মিলন এবং সমর আমার কাছে থেকে সরে দূরে থাকবার জন্য সুযোগ খোঁজেন বুঝতে পারি। ওঁরা ভাবছেন আমি শোক জয় করতে পারি নি, এ সময় তাঁদের কাছে পেলে আমি আরও নুয়ে পড়ব, দাঁড়াবার সাহস পাব না!

একদিন শুনলাম আমাকে লুকিয়েই তাঁরা বিদেশে চলে গিয়েছেন।—ছুটী ফুরিয়ে গিয়েছিল।

মিলন কলিকাতায় ভবানীপুরের এক স্কুলে পড়তেন, সমর পড়তেন মৈমনসিংহের কলেজে।

যে কথাটা দেখা করে সামনাসামনি বলে যেতে পারেন নি তাই তাঁরা চিঠি লিখে আমাকে জনালেন।

মিলন লিখেছিলেন,—"আপনাকে না জানিয়েই চলে এসেছি,—মাপ করবেন আমার এই দুর্ব্বলতাকে,—দেখা করতে পারি নি। আপনার কথা ভাবতে গেলেই কান্না পায়। মানুষের উপর মানুষ এ রকম পশুর মত অত্যাচার ক'রতে পারে ধারণাতেও আনা যায় না।......"

সমর উপদেশ জানিয়েছেন—"......অনেক ভেবে দেখলাম, ওটা আপনার জন্মান্তরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নয়, দেশমাতৃকার পূজায় আপনি প্রাণের প্রিয়তম বস্তু অর্ঘ্য দিয়েছেন। কারও ওপর অভিসম্পাত দেবার আপনার অধিকার নেই। আপনার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করবেন না। আমার এইটুকু মিনতি শুনবেন, দেশ, দল এবং জাতিকে বাদ দেবেন না, বাদ দিয়ে চললে ওদের অন্ধকার আর ঘুচবে না কোন দিন। যত অপরাধই থাক, মা এবং ভাইকে ভুললে চলবে না, ভালবাসতে হবে।......"

এর পরেও আবার সেই কথা! ভালবাসতে হবে! কিন্তু ভালবাসার স্বপ্ন আমার ভেঙে গিয়েছে। জাত আমাদের মরে গিয়েছে। দেশের প্রাণ নেই। তাকে বাঁচাতে যাওয়ার আশা পাগলামি!

ঠিক পাগলামি নয়? আহুতি? মাতৃপূজার আমাদের এই প্রথম আরতি?

তা নয়, নয়! প্রায়শ্চিত্তও নয়, আহুতিও নয়, সর্ব্বগ্রাসী রুদ্রভৈরবের এটা হয়ত' অনুকম্পা!.........

দিন কেটে যায়। প্রতিহিংসা নেওয়া আর হয় না।

সেই জ্যোৎস্নারাতে বাঁশবনের ধারে যে লোকগুলাকে দেখেছিলাম, তাদের খুঁজে বার করতে চেষ্টা করি।

যত লোক দেখি সন্দেহাকুল মনে চেয়ে থাকি!—

পৃথিবীর সব লোককেই শত্রু বলে ভাবি। দেশপ্রীতি, ভালবাসার নাম শুনে হাসি। কিছু ভাল লাগে না।

একদিন খামে করা একখানি চিঠি পেলাম!—

না খুলে ভাবতে চেষ্টা করলুম—সমর এবং মিলন ছাড়া আমাকে চিঠি লেখবার আর কে আছে!

হাতের লেখাটা কিন্তু অপরিচিতও নয়! বাসন্তী লিখেছে কি?

সত্যি তাই!

আমাকে চিঠি লেখবার উদ্দেশ্য?

চিঠি পড়লাম,—

"......তোমাকে চিঠি লেখবার অধিকার আমার নেই। তবু তোমার বিপদ শুনে একটা ইচ্ছা প্রবল হয়ে মনে জাগছে, তুমি যদি ভরসা দাও ত বলি! একদিন তুমি আমার সাহচর্য্য চেয়েছিলে। আমার বাবা তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তুমি দরিদ্র এই অপরাধে। আমারও গত্যন্তর ছিল না। বাপের অবাধ্য হতে পারি না। তোমার মনের গভীর ব্যথার কথা জেনেও প্রতিকার করতে পারি নি।

আমার বড়লোক স্বামী আজও বেঁচে আছেন, এবং আমার প্রতি তিনি সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব যথাযথ দাবী করে চলেছেন। মাটীর খেলানার মতই আমাদের নিজের ক্ষমতা অথবা স্বাধীন সত্বা কিছু নেই।

তুমি যতদিন নিশ্চিন্ত হয়ে আবার সংসার পেতে বসলে নূতন বধূর প্রতি আমার ঈর্ষা যে একেবারে হয় নি তা বলছে

পারি না। কিন্তু এ রকম সর্ব্বনাশ একদিনও কামনা করি নি একথা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে। বরং নববধূর সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হলেও নিরন্তর কামনা করতাম, আমার অভাবের বেদনা, তাকে পেয়ে তুমি ভুলবে। আমার জীবন শ্মশানের আগুনে পুড়ে গিয়েছে, তার চারা নেই, কিন্তু তোমার প্রাণের সুখ আবার যেন মুকুলিত হয়ে ওঠে। তোমার মনের আশা আকাঙ্খা সার্থক হয় যেন।

আজ ভগবান আবার বিরোধী হলেন। তোমার এই দুঃখের সময় ইচ্ছা হচ্ছে আবার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। তোমার চোখের জল মুছিয়ে দিই। তোমার বুকের আগুন নিভিয়ে দিই। আজ আমি যদি নিজের ভাগ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তোমারই পাশটীতে আমার সত্যিকারের স্থান দখল করতে ছুটে যাই, তুমি আমায় স্বীকার করবে ত?

বিধাতার সংসারে আমরা দুজনেই অনেক জ্বলেছি, আমাদের দুজনার হৃদয়ই ব্যর্থতার আগুনে জ্বলে পুড়ে গিয়েছে,—শুধু কি চোখ বুজেই এই অত্যাচার সয়ে পড়ে থাকতে হবে জীবনের দীর্ঘ অবশেষটুকু?.........

চিঠি পড়ে একটা রঙীন নেশার অনুভূতি ক্ষণিকের জন্য প্রাণকে মুগ্ধ করেছিল। বাসন্তীর প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন অভিমান বরাবরই ছিল। আজ তার মনের গোপন কথাটা জানতে পেরে ভারী আনন্দ হল।

বাসন্তীর চিঠির মধ্য দিয়ে আমার শতজনমের প্রিয়ার মিলন আহ্বান শুনতে পাচ্ছি। আমার অন্তরের অন্তরতম আসনটীতে বাসন্তীকে খুঁজে এসেছি আমি চিরদিন। শ্যামলীকে পেয়েও তার মধ্যে আমি বাসন্তীর প্রতিনিধিটিকে আমার প্রাণের অর্ঘ্য দিয়ে এসেছি বরাবর।

ভাবলাম উত্তর দিই,—এস বাসন্তী, আমি তোমারই প্রতীক্ষায় বসে আছি আজ অনন্ত যুগ ধরে—।

কিন্তু......স্বপ্ন ভেঙে গেল!

বাস্তবের ব্যঙ্গ ছবিটা মনের সামনে জাগল।—

বাসন্তী তার স্বামীকে ভালবাসতে পারে নি। কিন্তু তার স্বামীর প্রাণের কথা জানি না ত। আজ যদি বাসন্তীকে আমি কাছে ডেকে আনি স্বার্থপরের মত, বাসন্তীর স্বামীর মনটাতে আমি ভরে দেব অপমানের নিগূঢ় বেদনা—!

তাছাড়া বাসন্তীর জীবনটাও নষ্ট হয়ে যাবে চিরদিনের মত! উল্কার মত ছুটকে আসাটা আত্মতৃপ্তি জাগাতে পারে, কিন্তু গৌরব আনে না!

ফুল ফোটবার আগে ভাবে রোদ চাই আলো চাই,—ফুটে গেলে ঐ রোদের তাতে জীবন পুড়ে যায় যখন, চাঁদের জ্যোছনা স্নিগ্ধতা আনতে পারে কি?

দার্শনিক পণ্ডিতদের মতে জীবনের সুখদুঃখটা নাকি কিছুই নয়। যতটুকু পাওয়া গেছে ভগবানের দান বলেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে!

তথাস্তু!

পণ্ডিতগণের কথাই শোনা যাক্!

বাসন্তীকে উত্তরে জানালাম—

"......ধন্যবাদ তোমাকে, আজও মনে রেখেছ। কিন্তু আমার দুঃখের কথা ভেবে তোমার দুঃখ পাবার দরকার নেই। তোমার নিজের অদৃষ্টটাকেই মেনে চলতে শেখ। তুমি চির-আয়ুষ্মতী হও, এবং তোমার স্বামীরও মঙ্গল কামনা করি। আমার এটা অভিমানের কথা নয়, অন্তরের আশীর্ব্বাদ!......"

নিষ্কর্ম্মার জীবন, আর কিছু ভাল লাগে না।

দুটো পয়সা রোজগারের জন্য দুপুর রোদে দু' ঘণ্টা ধরে লাঙ্গল চষার মধ্যে কোন মোহ নেই।

ঘরটাকে মনে হয় মরুভূমি। সারাদিনের খাটুনির পর তেতে পুড়ে ফিরে এসে মনে করি এক খুঁচি মুড়ি, গুড় এবং এক গেলাস ঠাণ্ডা জল পেলে শরীরটার একটু জুত হয়। খানিক বসে থাকি। শ্যামলী এই সময়টাতে সব জিনিস গুছিয়ে রেখে উদগ্রীব হয়ে বসে থাকত, একটা ভাঙ্গা তালপাখাও ছিল, কাছটীতে দাঁড়িয়ে বাতাস করত, আর হাত দুখানি দিয়ে মুখের ঘাম মুছিয়ে দিত'—দরিদ্র হলেও রাজার ঐশ্বর্য্য ছিল আমার। আজও মনে হয় না, শ্যামলী সত্যিই মরে গেছে। ভাবি হয়ত কাছেই কোথাও গিয়েছে, এখনই আসবে।

কিন্তু আসে না কেউ। নিজেরও ইচ্ছা হয় না উঠে গিয়ে জল গড়িয়ে নিই কিম্বা মুড়ি ভাজতে বসি।

নিজের জন্য দুটী ভাত রেঁধে নিতেও প্রবৃত্তি হয় না। একদিন ইচ্ছা হল দুটীখানি ডালে চালে ফুটিয়ে নিই। পান্তা রেখে দিই,—তিন দিন চলে।

মিলনের মা মাঝেমাঝে ডাকেন। তাঁদের প্রসাদ খেয়ে আসি। রোজ তাও ভাল লাগে না।

বাসন্তীর কথাটা এ সময়ে খুব বেশী করেই মনে হয়। আসবে লিখেছে, এক একবার ভাবি ডেকে আনি। এক একবার স্বপ্নও দেখি বাসন্তী সত্যি এসেছে, এবং তার নিজের উপযুক্ত আসন জোর করে দখল নিয়েছে। আমার বারণ করাটা যে অন্তরের নিষেধাজ্ঞা নয় তা সে বোঝে। তাই অভিমান করে নি। আমার জীবনের পাত্র সুধা দিয়ে কাণায় কাণায় ভরিয়া দিয়েছে। অবসাদ আর মনে জাগে না।

পাব না জানি, তবু ভাবতেও সুখ।

গ্রীষ্মের ছুটী স্কুল কলেজে আরম্ভ হবে—বৈশাখের মাঝামাঝি, তাই জানতাম।

কিন্তু আটাশে চৈত্র আজ, এর মধ্যেই সময় এবং মিলন এলেন। আরও অনেকে এসেছেন বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়েছে তাই আগে থাকতেই ছুটী পেয়েছেন সকলে।

এবারে দুজনেই গ্রামে এসেই সর্ব্ব প্রথমে আমার কাছে এলেন।

মিলন বললেন—ভাল আছেন রতনদা?

সময় জিজ্ঞাসা করলেন—সেবারে দেখা করে যেতে পারিনি বলে রাগ করেছেন নিশ্চয়ই,—কেমন সত্যি নয় কি?

বললাম—রাগ আর করব কার ওপর? আপনাদের ওপর রাগ করবার অধিকারই বা আমার কোথায়? তাছাড়া অপরাধও যে কি করেছেন বুঝি না!

সময় বললেন—সত্যি অপরাধ নেন নি ত! তাহলে বাঁচা গেছে, এবারে প্রাণ খুলে আবার মিশতে পারব। চলুন খানিকটা বেড়িয়ে আসি।

—বেশত! আসুন!

তিনজনে খালের ধারে, বালি পথ দিয়ে চলতে থাকলাম।

পথে যেতে যেতে সময় বললেন—এবার প্রায় দেড় মাস দেশে থাকব কিছু কাজ করে যেতে চাই।

মিলন উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি করবেন ভেবেছেন?

সময় বললেন—রতনদা, সমস্ত আপনার উপরই নির্ভর করছে। আপনাকে আমাদের সঙ্গে খাটতে হবে। না বললে চলবে না। অনেক কিছুই করব, নৈশবিদ্যালয়, কুস্তীর আখ্‌ড়া, লাইব্রেরী,—এম্‌নি সব—

মিলন অত্যন্ত উৎসাহে উৎফুল্ল হয়ে বললেন—বেশ ত! আমরা আপনার সঙ্গে প্রাণ দিয়ে খাট্‌ব। আপনি কি বলেন রতনদা?—দেশের কাজ করবার জন্য ত্যাগ স্বীকার প্রত্যেক মানুষেরই করা কর্ত্তব্য!

আমি বললাম—ভাল কাজ হয় ত সে কথায় মতদ্বৈধ থাকবে না। কিন্তু দেশের লোক উপকার পেয়ে আপনাদের যত অপকার করবার ফন্দী খুঁজে বার করবে, তার হাত থেকে বাঁচবারও চেষ্টা করবেন, সময় থাকতে সাবধান করে রাখি।

মিলন এবং সময়ের প্রাণ খোলা হাসির সামনে আমার মনের অবসাদ কথঞ্চিত প্রশমিত হয়েছিল। আমিও চেষ্টা করলাম ওঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে চলতে।

দিন দুই তিন ধরে মতলব এবং পরামর্শ ঠিক হতে লাগল।

পয়লা বৈশাখ!—আজ নববর্ষের মিছিল বার হবে।

নূতন বৎসরের আরম্ভ! নূতন উৎসাহ আকাঙ্ক্ষা এবং প্রেরণা যাতে জাগে তাহারই উপলক্ষে আমাদের এই উৎসব।

সময়ই আমাদের সকল আনন্দের প্রস্রবণ। মিলনও খুব উদ্যোগী। দুজনের প্রাণপণ পরিশ্রমে আমাদের উৎসবটীর সর্ব্বাঙ্গীন সফলতা লাভ হয়েছিল।

সকাল না হতেই আমাদের সংকীর্ত্তনের দল পথে বার হল। আট দশ বছরের ছেলে থেকে পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ় পর্য্যন্ত সকলেই উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন।

আহার চিন্তা ভুলে সকলে এক পাড়া হতে আর এক পাড়ায় গেয়ে চললাম,

"অবনত ভারত চাহে তোমারেই, এস সুদর্শন-ধারী মুরারি,
নবীন মন্ত্রে নবীন তন্ত্রে দীক্ষিত কর ভারত নরনারী..."

আমাদের মিলিত কণ্ঠের সুর-ধারায় দেশ-মাতৃকার ব্যথা ও বেদনা মূর্ত্ত হয়ে সকলকার অন্তরে করুণ মূর্চ্ছনা জাগাল।

গান গেয়ে চলি। দুয়ারে দুয়ারে আমাদের মা বোনেরা মঙ্গল ঘট পেতে রেখেছেন।

হিতকরী সমিতির নাম করে টাকা পয়সাও আদায় করতে থাকি।

আমাদের প্রস্তাবিত প্রস্তাবগুলির সদুদ্দেশ্য সকলকে জানাই। এবং উৎসাহ প্রার্থনা করি।

বেলা তখন দুটো।

শ্রান্ত হয়ে কয়েকজনে বিশ্বাসদের বাগানে একটা জায়গায় ছায়া দেখে খানিক বিশ্রাম করছিলাম।

পাশের 'কর'-এদের বাড়ী থেকে একটা আট নয় বছরের মেয়ে কাছে এসে বললে—মা আপনাদের ডাকছেন একবার। ডাব পাড়িয়ে রেখেছেন। কিছু ফল আর মিষ্টিও যোগাড় করে রেখেছেন। একটু জল খেয়ে যদি যান! বেলা পড়ে আসছে, আপনাদের ফিরতে অনেকটাই ত সময় লাগবে!

সত্যই ক্ষুধা বোধ হচ্ছিল, কাজেই মেয়েটার আতিথ্যের আহ্বান আমরা উপেক্ষা করলাম না।

শুনলাম মেয়েটার নাম মিনতি।

বেশ ফুটফুটে চেহারা। অমায়িক এবং ধীর। মেয়েটার মুখেও দেখলাম।—বিধবা।

মিনতির মা আমাদের খুব যত্ন করলেন।

মিনতির একটী বড় বোন আছে শুনলাম—তাঁকে দেখিনি। আর একটী ভাইও বর্ত্তমান,—তিনি [illegible] থাকেন।

বাড়ী ফিরে খাওয়ার আয়োজন করতে রাত হয়ে গিয়েছিল।

সেই দিনেই শিল্পাশ্রম, নৈশবিদ্যালয়, এবং কর্ম্মীসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হল।

কিছুই অনুষ্ঠানের ত্রুটী রহিল না।

পনের দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে—আমাদের প্রত্যেক অনুষ্ঠানটী ফলেফুলে সুশোভিত হয়ে উঠেছিল।

সমর আমাদের সঙ্ঘের কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন, নগেন সেন হয়েছিলেন সহকারী।

এমনি সব কাযের মধ্যে থাকার দরুণ আমার স্বজাতিরা ক্রমে ক্রমে আমার প্রতি ঘৃণা ভুলেছিলেন।

একদল লোক কিন্তু ছিল, যারা কোন একটা জাতি বা পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়, অথচ কারও ভাল দেখতে পারে না। খেটে দেশের জন্য এতটুকু কায করছে ওঁদের মতে সেটা শুধু পণ্ডশ্রম তা নয়—বরং বদমাইসী বলাও চলতে পারে। তাঁরা প্রকাশ্যে কিছু বলতেন না—কিন্তু লুকিয়ে কুৎসা রটাতেন। সমর এবং সঙ্গে আমরা সকলেই জাত মানি না, গুরুজনের মান রাখি না—আমরা নাস্তিক সুতরাং আমাদের পরিণাম অত্যন্ত শোচনীয়, এটা ছিল তাঁদের ভবিষ্যৎবাণী।

আমরা কোন কাজে কেহই এই লোক গুলিকে আমল দিতাম না।

সমর এবং মিলন এসে বললেন—চলুন রত্নদা, মিনতিদের বাড়ী বেড়িয়ে আসি। সেদিন ওঁদের আতিথ্য ভারী ভাল লেগেছিল!

তখন অপরাহ্ণ বেলা, সূর্য্যদেব পাটে বসেছেন।

আমাদের হঠাৎ দেখে মিনতির মা—তাঁকে আমরা তিনজনেই মাসীমা বলে ডাকতাম—অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়েছিলেন।

পয়লা বৈশাখের মিছিলের আগে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় ছিল না আমাদের এক জনেরও। তাঁরা থাকতেন

আমাদের বাড়ী থেকে অনেকটা দূরে, তাছাড়া দুটী মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে মাসীমা থাকতেন, কোনো পুরুষ তাঁদের বাড়ীতে ছিল না, আলাপ করবার দরকারও হয় নি।

মিনতির মা বললেন—এস বাবা! বস! ওরে, মিনতি একখানা মাদুর দিয়ে যা ত' মা!

মিনতি মাদুর পেতে দিতে আমরা দাওয়ায় উঠে বসলাম। সমর জিজ্ঞাসা করলেন—মাসী মা, আপনাদের খবর সব ভাল ত'?

মাসীমা বললেন—হাঁ, বাবা, আপাততঃ দিন চলে যাচ্ছে কোন রকমে। তবে মনের অশান্তি, বড় মেয়েটার বিয়ে দিতে পাচ্ছি না! পনের বছর হতে চলল—

সমর বললেন—পনের বছর আবার নাকি বিয়ের বয়স হয়েছে! মাসীমা আপনাদের আমি বলে' বলে' পারলাম না। আপনারা সবাই সমান দেখছি। ছেলেবেলায় মেয়েদের বিয়ে দিয়ে—জাতটাকে পঙ্গু করে তুলছেন—

মাসীমা বললেন—আমাদের ত আর সহরে বাড়ী নয় বাবা,—এখানে এইতেই কত কথা উঠ্‌ছে!

সমর বললেন—বলছে বলেই যে মেয়েটার সর্ব্বনাশ করতে হবে এমন কি মানে আছে! দেশের খবর রাখেন না ত আপনারা, ছেলে বেলায় বিয়ে দেওয়া রীতিমত পাপ, আমাদের এসব কুসংস্কার দূর করতে হবে।

মাসীমা বললেন পাড়াগাঁয়ে বাস করে, কুসংস্কার দূর করব বলে মেয়ের বিয়ে না দিয়ে যদি বড় করে রাখি, সমাজে তিষ্ঠতে পারব না। তাছাড়া মেয়ে বড় হলে—আর ত বিয়েই করতে চাইবে না কেউ।

সমর বললেন—আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন মাসীমা আমি আপনার মেয়ের বর খুঁজে দেব।—আপনি তাড়া করবেন না। আপনার মেয়েদের লেখাপড়া শেখান, গৃহ-কর্ম্ম শেখান, শিল্পকর্ম্ম শেখান, মনের পরিণতি ঘটবার অবসর এবং সময় দিন তারপর আমি কথা দিচ্ছি, আপনার মেয়ের যোগ্য পাত্র যেখান থেকে হ'ক এনে দেবই।

মাসীমা ও কথা নিয়ে আর কথা কইলেন না।

কাপড় কেচে এক বালতী জল হাতে নিয়ে মাসীমার বড় মেয়ে কল্পনা বাড়ী ঢুকতে গিয়ে আমাদের দেখেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন।

মাসীমা বললেন—লজ্জা কি মা, চলে এস। এঁরা তোমার দাদা হন! কল্পনা পাশ কাটিয়ে ঘরের ভিতরে কাপড় ছাড়তে গেলেন।

কল্পনাকে দেখে একটা বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের মতই মনে হয়েছিল। ওরকম রূপ সচরাচর দেখা যায় না। যেন কল্প লোকের এক রাজকন্যা। মাটীতে দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেলেন।

সমরকে একটু উন্মনা দেখলাম!

মাসীমা বললেন—দুটী মেয়ে আর একটী ছেলেকে নিয়ে বিধবা হয়ে ছিলাম। ছেলেটী দেশ দেশ করে পাগল হয়ে গিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের দলে গিয়ে মিশেছে। তার ওপর আর আমাদের কোন ভরসাই নেই। দেশমাতৃকার কথা ভেবে তার চোখে জল ধরে না, নিজের মা কেঁদে শুকিয়ে মরে দেখবার দরকার নেই ভাবে। ভাবি যা ভাল বাসে করুক। ওদের স্বাধীন মতের বিরুদ্ধে মন্তব্য দিয়ে প্রাণে দুঃখ দিতে চাই না। বড় মেয়েটীও ঐ এক রকম। বলে বিয়ে করব না। তর্ক করে ছেলেরা সন্ন্যাসী থেকে দেশের কাজ করতে পারে, মেয়েরাই বা কি অপরাধ করেছে। জিজ্ঞাসা করে মেয়ে মানুষ বলেই যে বিয়ে করতেই হবে এমন কথা কোন শাস্ত্রে লিখেছে। পাগলী মেয়ের কথা শোন একবার। উনিও সন্ন্যাসী হবেন। দেশের পূজা করবেন। আতুর দুঃখীর সেবা করবেন, নিজের দুঃখ কে ঘুচায় ঠিক নেই। ছোট মেয়েটী পর্য্যন্ত দিদির কথায় সায় দিতে শিখছে। পৈতৃক পাগলামিটুকু পুরো মাত্রাতেই সবাই পেয়েছে। কেমন করে যে মেয়ে দুটীর গতি করব ভাবি, ভেবে কূল কিনারা পাই না।

সমর বললেন—পাগল বলছেন এঁদের? আমি ত আপনার কথা বুঝতে পারছি না! এঁরা যদি পাগল হয়, তাহলে এমনি পাগল আমি সকলকে হতে বলি। মাসীমা! আপনি স্থির জানবেন এত উঁচু মন যাদের তাদের অদৃষ্টে কোন দুঃখ থাকতে পারে না। বিশেষতঃ কল্পনা দেবী, এই বয়সেই দেশের কথা, নিজেদের কর্ত্তব্যের কথা এমন

সুন্দর ভাবে ভাবতে শিখেছেন, ভারতের নারী জাগরণের সমস্যাটীর এমন সুন্দর মীমাংসা করেছেন,——আমি ত ভাবি এরকম মেয়ে সারা ভারতে যত বেশী সৃষ্ট হবেন আমাদের দেশের ততই মঙ্গল।

আমি ত চুপ করে দুপক্ষের ঝগড়া শুনছিলাম। হাসতে হাসতে একটা রসিকতা করবার লোভ সংবরণ করতে না পেরে বললাম,—দেখুন মাসীমা, আপনার মেয়েকে ত পাগলী ভাবছেন, আমরাও সমরবাবুকে যত দূর জানি দেশ বলতে অমনিই পাগল,—কল্পনাদেবীর উপযুক্ত যোগ্য পাত্র এই একমাত্র সমরবাবু। আপনারা যদি এই সম্বন্ধ ঠিক করেন, আমরা মিষ্টান্নের লোভে এর মধ্যে থেকেই পেটে ক্ষিদে করতে থাকি, চেঁচিয়ে, গান গেয়ে।

মাসীমা বললেন—ওঁকে পাবার সাধনা কল্পনা যদি করে থাকে সেটা তার সৌভাগ্যই বলতে হবে। কিন্তু এর চেয়ে দুরাশা যে আর কিছু নেই।

সমর বললেন—কল্পনাকে পাওয়া আমারই দুরাশা মাসীমা, তাকে পেতে হলে আমি জীবনের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে পারি শুধু একটী জিনিষ ছাড়া—আমার দেশের পূজা। দেশ-মাতৃকার পূজায় নিজের সুখ দুঃখের কথা ভাবতে গেলে চলে না। আমার জীবনকে আমি উৎসর্গ করে ফেলেছি—ওতে আমার ব্যক্তিগত অধিকার নেই। আমার চিরদিনের সঙ্কল্প, বিয়ে করব না।

মাসীমা বললেন—তাহলে ত আর কথাই নেই।

সমর বললেন—আমার একথাটা আপনি ভুল বুঝবেন না মাসীমা, কল্পনা নিজেই হয়ত বিয়ে করবেন না জীবনে, বিবাহের জন্য তাঁর জন্ম নয়, বিবাহের চেয়ে অনেক বড় কাযই তিনি করবেন,—দেশের কাজে আমি তাঁকে সঙ্গী পেলে ধন্য হব!

অনেক রাত হয়ে যাচ্ছিল। মিলন বলেন—এবার বাড়ী যাই চলুন সমরদা, রতন দা' উঠে পড়ুন।

সেদিনকার মত সেইখানেই সভা ভঙ্গ হল।

তার পরের দিন আবার আমরা মিনতিদের বাড়ী গিয়েছিলাম।

সেদিন আর কল্পনাদেবী আমাদের দেখে উঠে সরে যান নি। বরং কাছে এসেই আমাদের সঙ্গে কথা কইতেও আপত্তি করলেন না।

দুচার কথার পরই পরিচয় না থাকার সঙ্কোচ দূর হল।

সমর এবং কল্পনা দুজনেই দেশের কথা পেলে আর অন্য কোন দিকে লক্ষ্য রাখেন না। আমরা নিরপেক্ষ শ্রোতাই রয়ে গেলাম।

নারী জাগরণ, বাল্যবিবাহের কুফল, চাষী মহলে একটী সমবায় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করা, এমনি সব বিষয় নিয়ে তাঁরা মেতে গিয়েছিলেন।

আমাদের কাছে মনে হচ্ছিল অতটা বাড়াবাড়ি সত্যই পাগলামি।

সেদিনের পর থেকে সমর একলাই মিনতিদের বাড়ী রোজ যেতে আরম্ভ করলেন। নিজের বাড়ীতে তাঁর আর দেখাই পাওয়া যায় না। আমাদের সঙ্গ ও এক প্রকার ছেড়ে দিয়েছিলেন।

আমি একদিন বললাম—বিয়েই করুন না! আপনাদের দুটীতে খুব সুন্দর মিলবে! বিয়ে করলে নিত্যদিন চব্বিশঘণ্টা ধরে কল্পনাদেবীর সঙ্গে পরামর্শ করতে পারবেন, তর্ক করবেন ঝগড়া করবেন,—

সমর শুধু আমাকে মারতে বাকি রেখেছিলেন। বললেন —কল্পনাদেবীর নাম নিয়ে ঠাট্টা করবার অধিকার আপনাদের কারও নেই।

অগত্যা চুপ করেই রইলাম।

সাত দিন পরের কথা। তখন সন্ধ্যা।

সেদিনটা ভারী দুর্য্যোগ। জল ঝড় পৃথিবীময় তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে। এখানে গাছ পড়ে, ওখানে পুকুর ভেসে যায়, সহসা বানই বা আসে এমনি আতঙ্ক হ'ল।

সমর উদ্‌ভ্রান্তের মত আমার ঘরে ছুটে এসে বললেন,—বড় দুঃসংবাদ। কল্পনার বড় ভাই অমিয়র বিসূচিকা হয়েছে, রামকৃষ্ণ মিশন থেকে খবর পাঠিয়েছে, ওঁদের যা এখনই

'গৌরনদী' যেতে চান। কোন মাঝিই রাজী হচ্ছে না এ সময় নৌকা নিয়ে বেরোতে। কি উপায় করা যায় বলুন দেখি।

আজ যাওয়া সত্যই অসম্ভব, বিশেষ মাঝিরা যখন রাজী হচ্ছে না। আমিও ত কোন উপায় দেখছি না।

—সত্যি উপায় নেই? মাসী মা যে রকম অস্থির হয়ে পড়েছেন দেখলে কষ্ট হয়। একটী মাত্র ছেলে! বলেন যথাসর্ব্বস্ব দিতে হয় তাও স্বীকার তবু আজই বেরোন চাই।

—একটা উপায় সম্ভব হতে পারে, আমি নিজেই যাব নৌকা বেয়ে। চলুন ওঁদের ডেকে নিয়ে আসি—

মিলন বলিলেন—রতনদা, আমিও সঙ্গে যাব, আপনাকে কি বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাব বলতে পারি না,—এ গ্রামের মধ্যে একমাত্র আপনাকেই আমি মানুষ বলে শ্রদ্ধা করি!

—আর ফাজলামি করতে হবে না,—চলুন!—

বার ঘণ্টা রুদ্র প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে আমরা 'গৌরনদীর' ধারে রামকৃষ্ণ মিশনের ঘাঠে এসে নামলাম।

মাসী মা বললেন—চলতে সাহস পাচ্ছি না।

কল্পনা দেবী বললেন—মা, তুমি এত' ভয় পাও কেন বল দেখি? ভগবান যা বরাতে লিখেছেন তা যখন হবেই আর, তুমি কাঁদলেও কিছু হবে না হাসলেও কিছু হবে না। মনে সাহস বাঁধ। ভাল হোক মন্দ হোক প্রত্যেক জিনিষকেই বিধাতার আশীর্ব্বাদ বলে ভাব না কেন? তোমার জীবনের কাব যদি ফুরিয়ে গিয়ে থাকে তুমি হাজার দিন কেঁদেও ফেরাতে পারবে না।

আমি নৌকা বেঁধে বসে রইলাম। সমর সকলকে সঙ্গে নিয়ে আশ্রমে গেলেন।

সেদিন সকালে প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা আর ছিল না। চারিদিক একেবারে শান্ত নীরব নিথর। চার পাঁচ ঘণ্টা বসে রয়েছি, সমর একা ফিরে এলেন।

শুনলাম মা ছেলেকে শেষ দেখতে পেয়েছেন এই পর্য্যন্ত। অমিয় আর বেঁচে নেই!

ভগবানের এ লীলার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলাম না। আর বুঝবই বা কি, সবই তাঁর খেয়াল শুধু, আর কিছু নয়। মানুষকে কাঁদিয়ে তিনি তৃপ্তি পান।

নইলে বিধবার একটী মাত্র ছেলে—

জীবনের এই স্বল্প দিনের মধ্যে কারও কোন অনিষ্ট করে নি, পরহিতার্থে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে, দেশের একটা গৌরব—তাকে না হলে শ্রেষ্ঠ বলি আর কোথায় পাবেন?

সব চেয়ে ভাল ফুলগুলিই অকালে ঝরে শুকিয়ে যায়।

আমি জানি, ঐ কল্পনাদেবীটীও পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার জন্য সৃষ্ট হন নি, সমরদা'ও হঠাৎ একদিন জগৎ ছেড়ে নিরুদ্দেশে পালাবেন। যেখানে যে কোনও মানুষ নির্ব্বিবাদে একটুখানি শান্তিতে দুটো দিন কাটিয়ে দিতে চায় সেই খানেই অলক্ষিতে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত পড়ে সুখের সংসার ছারে খারে দেয়।

সমর বললেন,—মাসী মা বলছেন দেশে আর ফিরে যাবেন না। যে ব্রত নিয়ে তাঁর ছেলে বেঁচে ছিল, সেই ব্রত তাঁর নিজেরও মূলমন্ত্র হবে। মাসী মা ওই খানেই থাকবেন। ওখানকার মহিলাশ্রমের তত্ত্বাবধান করবেন। কল্পনার সম্বন্ধে আমি আমার মতি স্থির করেছি। আমি তাকে বিয়ে করব স্বীকার করেছি। তবু মাসীমার যতটুকু চিন্তার লাঘব করতে পারি। আমাকে আশীর্ব্বাদ করেছেন। এবং যাতে আমরা কেহই তাঁদের না ভুলে যাই অনুরোধ করেছেন।—এবারে আমরা বাড়ী ফিরি চলুন।

—আবার আসবেন কবে?

—বাড়ীতে মত অনুমতি নিই গে আগে! তাছাড়া এঁদেরও মতি স্থির হোক্।

অবসন্ন মনে বাড়ী ফিরছি।

আমরা দুজনেই কেহ কারও সঙ্গে কথা কইতে পারছিলাম না। জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা আমার কেবলই বেড়ে যাচ্ছিল।

সমর কল্পনাদেবীকে বিয়ে করবেন—শুনে মনে হর্ষ এবং বিষাদ দুইই হয়েছিল। এই মিলন হলে ভাল হয় জানি,—তবু কেমন যেন দুশ্চিন্তা মনে হয় এর ফলে দুজনেরই অনিষ্ট

হবে। সমর নিজের সঙ্কল্প ভঙ্গ করে যে কাজ করতে চাইছেন—এর ভেতর অনেক খানি ত্যাগ স্বীকারের কথা আছে সত্যি।—কিন্তু পরিণামে তিনি দুর্ব্বল হয়ে পড়বেন না ত’ ?

না জানি কোন্ ক্রুদ্ধ দেবতার অভিশাপ লেগেছিল মাসীমাদের সংসারে দুদিন না যেতেই সংবাদ এল কল্পনা দেবীও মারা গিয়েছেন সর্পাঘাতে।

এবং উপর্য্যুপরি ছেলে ও মেয়ের শোকে মাসীমা পাগলের মতই হয়ে গিয়েছেন। সমরেরও সঙ্কল্প চ্যুতি হল না!

কিন্তু কল্পনা যে তাঁর বুকের কতখানি স্থল কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল তা আমিই বুঝেছিলাম, আর কেহ নাই জানুক।

ভগবানের এ ও আর এক খেয়ালের অত্যাচার।

যে ফুল ফুটবে না এবং যার জীবনের কোন আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হবে না তাকে সৃষ্টি করবারই বা কি দরকার ছিল ?

শ্যামলীর মরে যাবার সময় সমর যে কথাগুলা বলে আমায় সান্ত্বনা দিতে এসেছিলেন, ভাবলাম যেই কথারই পুনরুল্লেখ করে তাঁকে জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে বোঝাতে বসি।

কিন্তু অত দুঃখেও নিজেরই হাসি পেল’। সান্ত্বনা দেব যে কথা বলে নিজেই সে কথায় শান্ত হতে পারি নি।—

সমরের বাড়ী গেলাম।

বাসন্তীর স্বামী বনমালীকে সেখানে দেখে হঠাৎ একটু আশ্চর্য্য হয়েছিলাম।

যে জন্যেই হক, বনমালীর ওপর আমার ধারণা ভাল ছিল না।

আমাদের বিরোধী শত্রু বলে যাদের জানি তাদের সঙ্গেই লোকটা মেলামেশি করে।

অনেকবারই অনেক রকমে আমাদের ভোগাতে চেষ্টা করেছে।

তাছাড়া শ্যামলীর উপর অত্যাচার করেছিল যে কটা লোক আমার মাঝে মাঝে কেন জানি মনে হয় মুসলমানের ছদ্মবেশে এও তাদের মধ্যে ছিল।

সমরের সঙ্গে গল্প করতে করতে হঠাৎ সম্ভবতঃ আমাকে দেখেই বনমালী গাত্রোত্থান করে তখনকার মত বিদায় চেয়ে প্রস্থান করল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম সমরকে—কি বল্‌ছিল বনমালী ?

সমর বললেন—লোকটা আমাদের সঙ্গে দেশের জন্য কাজ করতে চায়। যাই হোক কিছু পয়সা আছে ত!—বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান কল্পে আজই পঞ্চাশটা টাকা দান করে গেল। মন ভাল, পরেও সাহায্য করবে বলেছে।

আমি বললাম—আমার একটা কথা মনে রাখবেন সমর বাবু। জগতের মাঝে সাপ এবং বাঘকেও বিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু এই বনমালীর মত মানুষদের বিশ্বাস করবেন না।

সমর বললেন—সেকি কথা, ভদ্রলোকের নামে নিন্দে করতে নেই!

সেইদিনই দশবার জন পুলিশের লোক এসে সমরকে গ্রেপ্তার করল।

আমরা এর চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার কখনও কল্পনা করতে পারি নি।

সমরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল—মৈমনসিংহে দুমাস আগে একটা স্বদেশী ডাকাতিতে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন—অর্থাৎ তিনিও নিজে একজন ডাকাত। এবং তাঁর বাড়ীতেই খানাতল্লাসী করে বোমার উপকরণ এক শিশি নাইট্রিক এ্যাসিড এবং একটা আস্ত বোমা পাওয়া গেছে।

বনমালী নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খানাতল্লাসীতে পাওয়া জিনিষ সনাক্ত করে গেল।

আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই নিছক মিথ্যা বলেই মনে হল আমার। সমরের মত লোক ডাকাতি করতে পারেন এবং গ্রামে বসেই বোমা তৈরী করছেন এর মত অবিশ্বাস্য ব্যাপার আর কি থাকতে পারে ?

সব চেয়ে রাগ হল বনমালীর ওপর।

বুঝলাম—ওই একটা গোলমাল বাঁধিয়েছে।

কিন্তু প্রমাণ করি কি করে ?

শুধু মুখের কথায় বললেই ত হল না যে বনমালী একটা ভয়ঙ্কর লোক, গোপনে ও-ই বোমা এবং নাইট্রিক এ্যাসিড বাড়ীতে রেখে গেছে !

লোকটাকে খুন করলেও রাগ যায় না।

একদিন দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েই হতভাগাটাকে জন্মের মত কিছু শিক্ষা দেবার জন্ত তাদের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলাম।

রাত তখন দশটা।

কিন্তু বনমালী তখনও বাড়ী ফেরে নি।

বাসন্তীকে দেখলাম—রান্নাঘরের দাওয়ায় মাটীতে আঁচল পেতে শুয়ে রয়েছে। স্বামীর জন্য অপেক্ষা করতে করতেই হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে।

তার দিকে চেয়ে রইলাম লুব্ধ নয়নে। পাঁচ বছরের পর এই প্রথম তাকে দেখ্‌ছি। মাঝখানের এই ক'বছরের দুঃখ বেদনার ইতিহাসটা মন থেকে মুছে ফেলতে চাইলাম। বাসন্তী একদিন নিজে হতেই আমার বাড়ীতে যেতে চেয়েছিল —আমি বারণ করেছিলাম বলে নিজের উপরই অভিমান জাগল। বনমালীর মত পাষণ্ড ঐ অনিন্দ্য কুসুমটীর কি কদরই বা বুঝবে! বানরের গলে মুক্তাহার শোভা পায় না! যৌবনের উন্মাদনা আমার শিরা উপশিরার মধ্যে রোমাঞ্চ খেলাল। সেদিন তার আহ্বান শুনি নি, এখনকার এই প্রস্ফুট কুসুমের রূপটী দেখিনি বলে! কৈশোরের বাসন্তী হতে আজকের এই পূর্ণযৌবনা যুবতী একেবারে আলাদা মানুষ।

কিছুক্ষণের জন্য বনমালীর কথা ভুলে গিয়েছিলাম। বনমালীকে প্রতিশোধ দিতে এসেছি সে কথাটা মনে ছিল না।

তন্ময় হয়ে ডাকলাম—বাসন্তী !

বাসন্তী উঠেই চম্‌কে আমাকে দেখে সবিস্ময়ে বললে— তুমি……এখানে ? আজ তোমাকে ডাকতে এসিছি !—

—এবং ভেবেছ আমার ওপর এখনও তোমার অবিসম্বাদী প্রভুত্ব আছে, তুমি ডাকলেই আমি দ্বিরুক্তি না করে তোমার অনুসরণ করব, কেমন ?

—কেন বাসন্তী! অকারণ রোষ করে কথা বলছ কেন— ? তুমি কি আর আমায় ভাল বাস না ? আজ ডাকলে তুমি আর আসবে না ?

—মেয়ে মানুষের ভালবাসাটা এত সুলভ নয় রতনদা, যে, যখন ইচ্ছা করবে অপমান করবে আবার বরণ করে ফিরেও চাইবে! আজ আমার জীবন পথে—তোমার কোন স্থান আর নেই। তুমি ফিরে যাও! আমার স্বামী আসবেন এখনই, তিনি এসে পড়লে আর তোমায় রক্ষা করতে পারব না!

—আমি তোমার স্বামীকে ভয় করি না। তুমিও তোমার পাষণ্ড স্বামীকে ভুলে যাও।

—রতনদা, এত অধঃপতনে তুমি গিয়েছ ? ভাবতেও পারি না! লজ্জা করে না আজ একথা মুখে বলতে ?—— দেখ, আমি হিন্দুর মেয়ে, হিন্দুর কুলবধূ! আমারই ঘরে আমারই সামনে দাঁড়িয়ে আমারই স্বামীর নিন্দা করতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ তোমার মনে জাগল না ? ধিক্ তোমাকে—

—বাসন্তী, বেশ; আমি চলে যাচ্ছি, তোমার আজকের অপমান আমার চিরদিন মনে থাকবে।

—তা ত' থাকবে! পাষণ্ড! আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে আমার স্ত্রীকে অপমান করতে এসেছ বেল্লিক,— এই বলে অতর্কিতে বনমালী আমাকে আক্রমণ করল। আমার গলায় দুটো হাত দিয়ে সে চেয়েছিল টিপে মারতে।

আমি প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়েই উল্টে পুনর্ব্বার তাকেই মাথায় ঘুষি মারলাম। সে মাটীতে পড়ে গেল। আবার ওঠবার চেষ্টা করছিল, আমি তার বুকের উপর বসে নিজের পকেট হতে ছোরা বার করে উঁচু করে ধরলাম।

বনমালী ভয় পেয়ে কাতর হয়ে বলল—ক্ষমা কর আমাকে! প্রাণে মের না।

বনমালীর দিকে এতক্ষণে ভাল করে চেয়ে দেখবার অবসর পেয়েছিলাম।

মুসলমানের মত লুঙ্গিই পড়েছিল সে।

আজকের এ বেশে দেখে আমার মোটেই সন্দেহ রহিল না শ্যামলীকে হত্যা করেছিল বনমালী নিজেই।

পারি না। কিন্তু এ রকম সর্বনাশ একদিনও কামনা করি নি একথা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে। বরং নববধূর সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হলেও নিরন্তর কামনা করতাম, আমার অভাবের বেদনা, তাকে পেয়ে তুমি ভুলবে। আমার জীবন শ্মশানের আগুনে পুড়ে গিয়েছে, তার চারা নেই, কিন্তু তোমার প্রাণের সুখ আবার যেন মুকুলিত হয়ে ওঠে। তোমার মনের আশা আকাঙ্খা সার্থক হয় যেন।

আজ ভগবান আবার বিরোধী হলেন। তোমার এই দুঃখের সময় ইচ্ছা হচ্ছে আবার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। তোমার চোখের জল মুছিয়ে দিই। তোমার বুকের আগুন নিভিয়ে দিই। আজ আমি যদি নিজের ভাগ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তোমারই পাশটীতে আমার সত্যিকারের স্থান দখল করতে ছুটে যাই, তুমি আমায় স্বীকার করবে ত?

বিধাতার সংসারে আমরা দুজনেই অনেক জ্বলেছি, আমাদের দুজনার হৃদয়ই ব্যর্থতার আগুনে জ্বলে পুড়ে গিয়েছে,—শুধু কি চোখ বুজেই এই অত্যাচার সয়ে পড়ে থাকতে হবে জীবনের দীর্ঘ অবশেষটুকু?.........

চিঠি পড়ে একটা রঙীন নেশার অনুভূতি ক্ষণিকের জন্য প্রাণকে মুগ্ধ করেছিল। বাসন্তীর প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন অভিমান বরাবরই ছিল। আজ তার মনের গোপন কথাটা জানতে পেরে ভারী আনন্দ হল।

বাসন্তীর চিঠির মধ্য দিয়ে আমার শতজনমের প্রিয়ার মিলন আহ্বান শুনতে পাচ্ছি। আমার অন্তরের অন্তরতম আসনটীতে বাসন্তীকে খুঁজে এসেছি আমি চিরদিন। শ্যামলীকে পেয়েও তার মধ্যে আমি বাসন্তীর প্রতিনিধিটিকে আমার প্রাণের অর্ঘ্য দিয়ে এসেছি বরাবর।

ভাবলাম উত্তর দিই,—এস বাসন্তী, আমি তোমারই প্রতীক্ষায় বসে আছি আজ অনন্ত যুগ ধরে—।

কিন্তু......স্বপ্ন ভেঙে গেল!

বাস্তবের ব্যঙ্গ ছবিটা মনের সামনে জাগল।—

বাসন্তী তার স্বামীকে ভালবাসতে পারে নি। কিন্তু তার স্বামীর প্রাণের কথা জানি না ত। আজ যদি বাসন্তীকে আমি কাছে ডেকে আনি স্বার্থপরের মত, বাসন্তীর স্বামীর মনটাতে আমি ভরে দেব অপমানের নিগূঢ় বেদনা—!

তাছাড়া বাসন্তীর জীবনটাও নষ্ট হয়ে যাবে চিরদিনের মত! উল্কার মত ছুটকে আসাটা আত্মতৃপ্তি জাগাতে পারে, কিন্তু গৌরব আনে না!

ফুল ফোটবার আগে ভাবে রোদ চাই আলো চাই,—ফুটে গেলে ঐ রোদের তাতে জীবন পুড়ে যায় যখন, চাঁদের জ্যোছনা স্নিগ্ধতা আনতে পারে কি?

দার্শনিক পণ্ডিতদের মতে জীবনের সুখদুঃখটা নাকি কিছুই নয়। যতটুকু পাওয়া গেছে ভগবানের দান বলেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে!

তথাস্তু!

পণ্ডিতগণের কথাই শোনা যাক্!

বাসন্তীকে উত্তরে জানালাম—

"......ধন্যবাদ তোমাকে, আজও মনে রেখেছ। কিন্তু আমার দুঃখের কথা ভেবে তোমার দুঃখ পাবার দরকার নেই। তোমার নিজের অদৃষ্টটাকেই মেনে চলতে শেখ। তুমি চির-আয়ুষ্মতী হও, এবং তোমার স্বামীরও মঙ্গল কামনা করি। আমার এটা অভিমানের কথা নয়, অন্তরের আশীর্বাদ!......"

নিষ্কর্ম্মার জীবন, আর কিছু ভাল লাগে না।

দুটো পয়সা রোজগারের জন্য দুপুর রোদে দু' ঘণ্টা ধরে লাঙ্গল চষার মধ্যে কোন মোহ নেই।

ঘরটাকে মনে হয় মরুভূমি। সারাদিনের খাটুনির পর তেতে পুড়ে ফিরে এসে মনে করি এক খুঁচি মুড়ি, গুড় এবং এক গেলাস ঠাণ্ডা জল পেলে শরীরটার একটু জুত হয়। খানিক বসে থাকি। শ্যামলী এই সময়টাতে সব জিনিস গুছিয়ে রেখে উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে থাকত, একটা ভাঙ্গা তালপাখাও ছিল, কাছটীতে দাঁড়িয়ে বাতাস করত, নরম হাত দুখানি দিয়ে মুখের ঘাম মুছিয়ে দিত'—দরিদ্র হলেও রাজার ঐশ্বর্য্য ছিল আমার। আজও মনে হয় না, শ্যামলী সত্যিই মরে গেছে। ভাবি হয়ত কাছেই কোথাও গিয়েছে, এখনই আসবে।

কিন্তু আসে না কেউ। নিজেরও ইচ্ছা হয় না উঠে গিয়ে জল গড়িয়ে নিই কিম্বা মুড়ি ভাজতে বসি।

নিজের জন্য দুটী ভাত রেঁধে নিতেও প্রবৃত্তি হয় না। একদিন ইচ্ছা হল দুটীখানি ডালে চালে ফুটিয়ে নিই। পান্তা রেখে দিই,—তিন দিন চলে।

মিলনের মা মাঝেমাঝে ডাকেন। তাঁদের প্রসাদ পেয়ে আসি। রোজ তাও ভাল লাগে না।

বাসন্তীর কথাটা এ সময়ে খুব বেশী করেই মনে হয়। আসবে লিখেছে, এক একবার ভাবি ডেকে আনি। এক একবার স্বপ্নও দেখি বাসন্তী সত্যি এসেছে, এবং তার নিজের উপযুক্ত আসন জোর করে দখল নিয়েছে। আমার বারণ করাটা যে অন্তরের নিষেধাজ্ঞা নয় তা সে বোঝে। তাই অভিমান করে নি। আমার জীবনের পাত্র সুধা দিয়ে কাণায় কাণায় ভরিয়া দিয়েছে। অবসাদ আর মনে জাগে না।

পাব না জানি, তবু ভাবতেও সুখ।

গ্রীষ্মের ছুটী স্কুল কলেজে আরম্ভ হবে—বৈশাখের মাঝামাঝি, তাই জানতাম।

কিন্তু আটাশে চৈত্র আজ, এর মধ্যেই সমর এবং মিলন এলেন। আরও অনেকে এসেছেন বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়েছে তাই আগে থাকতেই ছুটী পেয়েছেন সকলে।

এবারে দুজনেই গ্রামে এসেই সর্ব্ব প্রথমে আমার কাছে এলেন।

মিলন বললেন—ভাল আছেন রতনদা?

সমর জিজ্ঞাসা করলেন—সেবারে দেখা করে যেতে পারিনি বলে রাগ করেছেন নিশ্চয়ই,—কেমন সত্যি নয় কি?

বললাম—রাগ আর করব কার ওপর? আপনাদের ওপর রাগ করবার অধিকারই বা আমার কোথায়? তাছাড়া অপরাধও যে কি করেছেন বুঝি না!

সমর বললেন—সত্যি অপরাধ নেন নি ত! তাহলে বাঁচা গেছে, এবারে প্রাণ খুলে আবার মিশতে পারব! চলুন খানিকটা বেড়িয়ে আসি।

—বেশত! আসুন!

তিনজনে খালের ধারে, বালি পথ দিয়ে চলতে থাকলাম।

পথে যেতে যেতে সমর বললেন—এবার প্রায় দেড় মাস দেশে থাকব কিছু কাজ করে যেতে চাই।

মিলন উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি করবেন ভেবেছেন?

সমর বললেন—রতনদা, সমস্ত আপনার উপরই নির্ভর করছে। আপনাকে আমাদের সঙ্গে খাটতে হবে। না বললে চলবে না। অনেক কিছুই করব, নৈশবিদ্যালয়, কুস্তীর আখ্‌ড়া, লাইব্রেরী,—এম্‌নি সব—

মিলন অত্যন্ত উৎসাহে উৎফুল্ল হয়ে বললেন—বেশ ত! আমরা আপনার সঙ্গে প্রাণ দিয়ে খাট্‌ব। আপনি কি বলেন রতনদা?—দেশের কাজ করবার জন্য ত্যাগ স্বীকার প্রত্যেক মানুষেরই করা কর্ত্তব্য!

আমি বললাম—ভাল কাজ হয় ত সে কথায় মতদ্বৈধ থাকবে না। কিন্তু দেশের লোক উপকার পেয়ে আপনাদের যত অপকার করবার ফন্দী খুঁজে বার করবে, তার হাত থেকে বাঁচবারও চেষ্টা করবেন, সময় থাকতে সাবধান করে রাখি।

মিলন এবং সমরের প্রাণ খোলা হাসির সামনে আমার মনের অবসাদ কথঞ্চিত প্রশমিত হয়েছিল। আমিও চেষ্টা করলাম ওঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে চলতে।

দন দুই তিন ধরে মতলব এবং পরামর্শ ঠিক হতে লাগল।

পয়লা বৈশাখ!—আজ নববর্ষের মিছিল বার হবে।

নূতন বৎসরের আরম্ভ! নূতন উৎসাহ আকাঙ্ক্ষা এবং প্রেরণা যাতে জাগে তাহারই উপলক্ষে আমাদের এই উৎসব।

সমরই আমাদের সকল আনন্দের প্রস্রবণ। মিলনও মস্ত উদ্যোগী। দুজনের প্রাণপণ পরিশ্রমে আমাদের উৎসবটীর সর্ব্বাঙ্গীন সফলতা লাভ হয়েছিল।

সকাল না হতেই আমাদের সংকীর্ত্তনের দল পথে বার হল। আট দশ বছরের ছেলে থেকে পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ় পর্য্যন্ত সকলেই উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন।

আহার চিন্তা ভুলে সকলে এক পাড়া হতে আর এক পাড়ায় গেয়ে চললাম,

"অবনত ভারত চাহে তোমারেই, এস সুদর্শন-ধারী মুরারি,
নবীন যন্ত্রে নবীন তন্ত্রে দীক্ষিত কর ভারত নরনারী…"

আমাদের মিলিত কণ্ঠের সুর-ধারায় দেশ-মাতৃকার ব্যথা ও বেদনা মূর্ত্ত হয়ে সকলকার অন্তরে করুণ মূর্চ্ছনা জাগাল।

গান গেয়ে চলি। দুয়ারে দুয়ারে আমাদের মা বোনেরা মঙ্গল ঘট পেতে রেখেছেন।

হিতকরী সমিতির নাম করে টাকা পয়সাও আদায় করতে থাকি।

আমাদের প্রস্তাবিত প্রস্তাবগুলির সদুদ্দেশ্য সকলকে জানাই। এবং উৎসাহ প্রার্থনা করি।

বেলা তখন দুটো।

শ্রান্ত হয়ে কয়েকজনে বিশ্বাসদের বাগানে একটা জায়গায় ছায়া দেখে খানিক বিশ্রাম করছিলাম।

পাশের 'কর'-এদের বাড়ী থেকে একটা আট নয় বছরের মেয়ে কাছে এসে বললে—মা আপনাদের ডাকছেন একবার। ডাব পাড়িয়ে রেখেছেন। কিছু ফল আর মিষ্টিও যোগাড় করে রেখেছেন। একটু জল খেয়ে যদি যান! বেলা পড়ে আসছে, আপনাদের ফিরতে অনেকটাই ত সময় লাগবে!

সত্যই ক্ষুধা বোধ হচ্ছিল, কাজেই মেয়েটীর আতিথ্যের আহ্বান আমরা উপেক্ষা করলাম না।

শুনলাম মেয়েটীর নাম মিনতি।

বেশ ফুটফুটে চেহারা। অমায়িক এবং ধীর। মেয়েটীর মাকেও দেখলাম।—বিধবা।

মিনতির মা আমাদের খুব যত্ন করলেন।

মিনতির একটী বড় বোন আছে শুনলাম—তাঁকে দেখিনি। আর একটী ভাইও বর্ত্তমান,—তিনি [illegible] থাকেন।

বাড়ী ফিরে খাওয়ার আয়োজন করতে রাত হয়ে গিয়েছিল।

সেই দিনেই শিল্পাশ্রম, নৈশবিদ্যালয়, এবং কর্ম্মীসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হল।

কিছুই অনুষ্ঠানের ত্রুটী রহিল না।

পরের দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে—আমাদের প্রত্যেক অনুষ্ঠানটী ফলেফুলে সুশোভিত হয়ে উঠেছিল।

সমর আমাদের সঙ্ঘের কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন, নগেন সেন হয়েছিলেন সহকারী।

এমনি সব কাযের মধ্যে থাকার দরুণ আমার স্বজাতিরা ক্রমে ক্রমে আমার প্রতি ঘৃণা ভুলেছিলেন।

একদল লোক কিন্তু ছিল, যারা কোন একটা জাতি বা পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়, অথচ কারও ভাল দেখতে পারে না। যেটে দেশের জন্য এতটুকু কায করছে ওঁদের মতে সেটা শুধু পণ্ডশ্রম তা নয়—বরং বদমাইসী বলাও চলতে পারে। তাঁরা প্রকাশ্যে কিছু বলতেন না—কিন্তু লুকিয়ে কুৎসা রটাতেন। সমর এবং সঙ্গে আমরা সকলেই জাত মানি না, গুরুজনের মান রাখি না—আমরা নাস্তিক সুতরাং আমাদের পরিণাম অত্যন্ত শোচনীয়, এটা ছিল তাঁদের ভবিষ্যৎবাণী।

আমরা কোন কাজে কেহই এই লোক গুলিকে আমল দিতাম না।

সমর এবং মিলন এসে বললেন—চলুন রত্নদা, মিনতিদের বাড়ী বেড়িয়ে আসি। সেদিন ওঁদের আতিথ্য ভারী ভাল লেগেছিল!

তখন অপরাহ্ন বেলা, সূর্য্যিদেব পাটে বসেছেন।

আমাদের হঠাৎ দেখে মিনতির মা—তাঁকে আমরা তিনজনেই মাসীমা বলে ডাকতাম—অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়েছিলেন।

পয়লা বৈশাখের মিছিলের আগে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় ছিল না আমাদের এক জনেরও। তাঁরা থাকতেন

আমাদের বাড়ী থেকে অনেকটা দূরে, তাছাড়া দুটী মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে মাসীমা থাকতেন, কোনো পুরুষ তাঁদের বাড়ীতে ছিল না, আলাপ করবার দরকারও হয় নি।

মিনতির মা বললেন—এস বাবা! বস! ওরে, মিনতি একখানা মাদুর দিয়ে যা ত' মা!

মিনতি মাদুর পেতে দিতে আমরা দাওয়ায় উঠে বসলাম। সমর জিজ্ঞাসা করলেন—মাসী মা, আপনাদের খবর সব ভাল ত'?

মাসীমা বললেন—হাঁ, বাবা. আপাততঃ দিন চলে যাচ্ছে কোন রকমে। তবে মনের অশান্তি, বড় মেয়েটার বিয়ে দিতে পাচ্ছি না! পনের বছর হতে চলল—

সমর বললেন—পনের বছর আবার নাকি বিয়ের বয়স হয়েছে! মাসীমা আপনাদের আমি বলে' বলে' পারলাম না। আপনারা সবাই সমান দেখছি। ছেলেবেলায় মেয়েদের বিয়ে দিয়ে—জাতটাকে পঙ্গু করে তুলছেন—

মাসীমা বললেন—আমাদের ত আর সহরে বাড়ী নয় বাবা,—এখানে এইতেই কত কথা উঠছে!

সমর বললেন—বলছে বলেই যে মেয়েটার সর্ব্বনাশ করতে হবে এমন কি মানে আছে! দেশের খবর রাখেন না ত আপনারা, ছেলে বেলায় বিয়ে দেওয়া রীতিমত পাপ. আমাদের এসব কুসংস্কার দূর করতে হবে।

মাসীমা বললেন পাড়াগাঁয়ে বাস করে, কুসংস্কার দূর করব বলে মেয়ের বিয়ে না দিয়ে যদি বড় করে রাখি, সমাজে তিষ্ঠতে পারব না। তাছাড়া মেয়ে বড় হলে—আর ত বিয়েই করতে চাইবে না কেউ।

সমর বললেন—আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন মাসীমা আমি আপনার মেয়ের বর খুঁজে দেব।—আপনি তাড়া করবেন না। আপনার মেয়েদের লেখাপড়া শেখান, গৃহ-কর্ম্ম শেখান, শিল্পকর্ম্ম শেখান, মনের পরিণতি ঘটবার অবসর এবং সময় দিন তারপর আমি কথা দিচ্ছি, আপনার মেয়ের যোগ্য পাত্র যেখান থেকে হ'ক এনে দেবই।

মাসীমা ও কথা নিয়ে আর কথা কইলেন না।

কাপড় কেচে এক বালতী জল হাতে নিয়ে মাসীমার বড় মেয়ে কল্পনা বাড়ী ঢুকতে গিয়ে আমাদের দেখেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন।

মাসীমা বললেন—লজ্জা কি মা, চলে এস। এঁরা তোমার দাদা হন! কল্পনা পাশ কাটিয়ে ঘরের ভিতরে কাপড় ছাড়তে গেলেন।

কল্পনাকে দেখে একটা বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের মতই মনে হয়েছিল। ওরকম রূপ সচরাচর দেখা যায় না। যেন কল্প লোকের এক রাজকন্যা। মাটীতে দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেলেন।

সমরকে একটু উন্মনা দেখলাম!

মাসীমা বললেন—দুটী মেয়ে আর একটী ছেলেকে নিয়ে বিধবা হয়ে ছিলাম। ছেলেটী দেশ দেশ করে পাগল হয়ে গিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের দলে গিয়ে মিশেছে। তার ওপর আর আমাদের কোন ভরসাই নেই। দেশমাতৃকার কথা ভেবে তার চোখে জল ধরে না, নিজের মা কেঁদে শুকিয়ে মরে দেখবার দরকার নেই ভাবে। ভাবি যা ভাল বাসে করুক। ওদের স্বাধীন মতের বিরুদ্ধে মন্তব্য দিয়ে প্রাণে দুঃখ দিতে চাই না। বড় মেয়েটীও ঐ এক রকম। বলে বিয়ে করব না। তর্ক করে ছেলেরা সন্ন্যাসী থেকে দেশের কাজ করতে পারে, মেয়েরাই বা কি অপরাধ করেছে। জিজ্ঞাসা করে মেয়ে মানুষ বলেই যে বিয়ে করতেই হবে এমন কথা কোন শাস্ত্রে লিখেছে। পাগলী মেয়ের কথা শোন একবার। উনিও সন্ন্যাসী হবেন। দেশের পূজা করবেন। আতুর দুঃখীর সেবা করবেন, নিজের দুঃখ কে ঘুচায় ঠিক নেই। ছোট মেয়েটী পর্য্যন্ত দিদির কথায় সায় দিতে শিখছে। পৈতৃক পাগলামিটুকু পুরো মাত্রাতেই সবাই পেয়েছে। কেমন করে যে মেয়ে দুটীর গতি করব ভাবি, ভেবে কুল কিনারা পাই না।

সমর বললেন—পাগল বলছেন এঁদের? আমি ত আপনার কথা বুঝতে পারছি না! এঁরা যদি পাগল হয়, তাহলে এমনি পাগল আমি সকলকে হতে বলি। মাসীমা! আপনি স্থির জানবেন এত উঁচু মন যাদের তাদের অদৃষ্টে কোন দুঃখ থাকতে পারে না। বিশেষতঃ কল্পনা দেবী, এই বয়সেই দেশের কথা, নিজেদের কর্ত্তব্যের কথা এমন

সুন্দর ভাবে ভাবতে শিখেছেন. ভারতের নারী জাগরণের সমস্যাটীর এমন সুন্দর মীমাংসা করেছেন,——আমি ত ভাবি এরকম মেয়ে সারা ভারতে যত বেশী সৃষ্ট হবেন আমাদের দেশের ততই মঙ্গল।

আমি ত চুপ করে দুপক্ষের ঝগড়া শুনছিলাম। হাসতে হাসতে একটা রসিকতা করবার লোভ সংবরণ করতে না পেরে বললাম,—দেখুন মাসীমা, আপনার মেয়েকে ত পাগলী ভাবছেন, আমরাও সমরবাবুকে যত দূর জানি দেশ বলতে অমনিই পাগল,—কল্পনাদেবীর উপযুক্ত যোগ্য পাত্র এই একমাত্র সমরবাবু। আপনারা যদি এই সম্বন্ধ ঠিক করেন, আমরা মিষ্টান্নের লোভে এর মধ্যে থেকেই পেটে ক্ষিদে করতে থাকি, চেঁচিয়ে, গান গেয়ে।

মাসীমা বললেন—ওঁকে পাবার সাধনা কল্পনা যদি করে থাকে সেটা তার সৌভাগ্যই বলতে হবে। কিন্তু এর চেয়ে দুরাশা যে আর কিছু নেই।

সমর বললেন—কল্পনাকে পাওয়া আমারই দুরাশা মাসীমা, তাকে পেতে হলে আমি জীবনের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে পারি শুধু একটী জিনিষ ছাড়া—আমার দেশের পূজা। দেশ-মাতৃকার পূজায় নিজের সুখ দুঃখের কথা ভাবতে গেলে চলে না। আমার জীবনকে আমি উৎসর্গ করে ফেলেছি—ওতে আমার ব্যক্তিগত অধিকার নেই। আমার চিরদিনের সঙ্কল্প, বিয়ে করব না।

মাসীমা বললেন—তাহলে ত আর কথাই নেই।

সমর বললেন—আমার একথাটা আপনি ভুল বুঝবেন না মাসীমা, কল্পনা নিজেই হয়ত বিয়ে করবেন না জীবনে, বিবাহের জন্য তাঁর জন্ম নয়, বিবাহের চেয়ে অনেক বড় কাযই তিনি করবেন,—দেশের কাজে আমি তাঁকে সঙ্গী পেলে ধন্য হব!

অনেক রাত হয়ে যাচ্ছিল। মিলন বলেন—এবার বাড়ী যাই চলুন সমরদা, রতন দা' উঠে পড়ুন।

সেদিনকার মত সেইখানেই সভা ভঙ্গ হল।

তার পরের দিন আবার আমরা মিনতিদের বাড়ী গিয়েছিলাম।

সেদিন আর কল্পনাদেবী আমাদের দেখে উঠে সরে যান নি। বরং কাছে এসেই আমাদের সঙ্গে কথা কইতেও আপত্তি করলেন না।

দুচার কথার পরই পরিচয় না থাকার সঙ্কোচ দূর হল।

সমর এবং কল্পনা দুজনেই দেশের কথা পেলে আর অন্য কোন দিকে লক্ষ্য রাখেন না। আমরা নিরপেক্ষ শ্রোতাই রয়ে গেলাম।

নারী জাগরণ, বাল্যবিবাহের কুফল, চাষী মহলে একটী সমবায় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করা, এমনি সব বিষয় নিয়ে তাঁরা মেতে গিয়েছিলেন।

আমাদের কাছে মনে হচ্ছিল অতটা বাড়াবাড়ি সত্যই পাগলামি।

সেদিনের পর থেকে সমর একলাই মিনতিদের বাড়ী রোজ যেতে আরম্ভ করলেন। নিজের বাড়ীতে তাঁর আর দেখাই পাওয়া যায় না। আমাদের সঙ্গ ও এক প্রকার ছেড়ে দিয়েছিলেন।

আমি একদিন বললাম—বিয়েই করুন না! আপনাদের দুটীতে খুব সুন্দর মিলবে! বিয়ে করলে নিত্যদিন চব্বিশঘণ্টা ধরে কল্পনাদেবীর সঙ্গে পরামর্শ করতে পারবেন, তর্ক করবেন ঝগড়া করবেন,—

সমর শুধু আমাকে মারতে বাকি রেখেছিলেন। বললেন—কল্পনাদেবীর নাম নিয়ে ঠাট্টা করবার অধিকার আপনাদের কারও নেই।

অগত্যা চুপ করেই রইলাম।

সাত দিন পরের কথা। তখন সন্ধ্যা।

সেদিনটা ভারী দুর্য্যোগ। জল ঝড় পৃথিবীময় তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে। এখানে গাছ পড়ে, ওখানে পুকুর ভেসে যায়, সহসা বানই বা আসে এমনি আতঙ্ক হ'ল।

সমর উদ্‌ভ্রান্তের মত আমার ঘরে ছুটে এসে বললেন,—বড় দুঃসংবাদ। কল্পনার বড় ভাই অমিয়র বিসূচিকা হয়েছে, রামকৃষ্ণ মিশন থেকে খবর পাঠিয়েছে, ওঁদের মা এখনই

'গৌরনদী' যেতে চান। কোন মাঝিই রাজী হচ্ছে না এ সময় নৌকা নিয়ে বেরোতে। কি উপায় করা যায় বলুন দেখি।

আজ যাওয়া সত্যই অসম্ভব, বিশেষ মাঝিরা যখন রাজী হচ্ছে না। আমিও ত কোন উপায় দেখছি না।

—সত্যি উপায় নেই? মাসী মা যে রকম অস্থির হয়ে পড়েছেন দেখলে কষ্ট হয়। একটী মাত্র ছেলে! বল্লেন সর্ব্বস্ব দিতে হয় তাও স্বীকার তবু আজই বেরোন চাই।

—একটা উপায় সম্ভব হতে পারে, আমি নিজেই যাব নৌকা বেয়ে। চলুন ওঁদের ডেকে নিয়ে আসি—

মিলন বলিলেন—রতনদা, আমিও সঙ্গে যাব, আপনাকে কি বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাব বলতে পারি না,—এ গ্রামের মধ্যে একমাত্র আপনাকেই আমি মানুষ বলে শ্রদ্ধা করি!

—আর ফাজলামি করতে হবে না,—চলুন!—

বার ঘণ্টা রুদ্র প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে আমরা 'গৌরনদীর' ধারে রামকৃষ্ণ মিশনের ঘাটে এসে নামলাম।

মাসী মা বললেন—চলতে সাহস পাচ্ছি না।

কল্পনা দেবী বললেন—মা, তুমি এত' ভয় পাও কেন বল দেখি? ভগবান যা বরাতে লিখেছেন তা যখন হবেই জান, তুমি কাঁদলেও কিছু হবে না হাসলেও কিছু হবে না। মনে সাহস বাঁধ। ভাল হোক মন্দ হোক প্রত্যেক জিনিষকেই বিধাতার আশীর্ব্বাদ বলে ভাব না কেন? তোমার জীবনের কাব যদি ফুরিয়ে গিয়ে থাকে তুমি হাজার দিন কেঁদেও ফেরাতে পারবে না।

আমি নৌকা বেঁধে বসে রইলাম। সমর সকলকে সঙ্গে নিয়ে আশ্রমে গেলেন।

সেদিন সকালে প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা আর ছিল না। চারিদিক একেবারে শান্ত নীরব নিথর। চার পাঁচ ঘণ্টা বসে রয়েছি, সমর একা ফিরে এলেন।

শুনলাম মা ছেলেকে শেষ দেখতে পেয়েছেন এই পর্য্যন্ত। অমিয় আর বেঁচে নেই!

ভগবানের এ লীলার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলাম না।

আর বুঝবই বা কি, সবই তাঁর খেয়াল শুধু, আর কিছু নয়। মানুষকে কাঁদিয়ে তিনি তৃপ্তি পান।

নইলে বিধবার একটী মাত্র ছেলে—

জীবনের এই স্বল্প দিনের মধ্যে কারও কোন অনিষ্ট করে নি, পরহিতার্থে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে, দেশের একটা গৌরব—তাকে না হলে শ্রেষ্ঠ বলি আর কোথায় পাবেন?

সব চেয়ে ভাল ফুলগুলিই অকালে ঝরে শুকিয়ে যায়।

আমি জানি, ঐ কল্পনাদেবীটীও পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার জন্ম সৃষ্ট হন নি, সমরদা'ও হঠাৎ একদিন জগৎ ছেড়ে নিরুদ্দেশে পালাবেন। যেখানে যে কোনও মানুষ নির্ব্বিবাদে একটুখানি শান্তিতে দুটো দিন কাটিয়ে দিতে চায় সেই খানেই অলক্ষিতে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত পড়ে সুখের সংসার ছারে খারে দেয়।

সমর বললেন,—মাসী মা বলছেন দেশে আর ফিরে যাবেন না। যে ব্রত নিয়ে তাঁর ছেলে বেঁচে ছিল, সেই ব্রত তাঁর নিজেরও মূলমন্ত্র হবে। মাসী মা ওই খানেই থাকবেন। ওখানকার মহিলাশ্রমের তত্বাবধান করবেন। কল্পনার সম্বন্ধে আমি আমার মতি স্থির করেছি। আমি তাকে বিয়ে করব স্বীকার করেছি। তবু মাসীমার যতটুকু চিন্তার লাঘব করতে পারি। আমাকে আশীর্ব্বাদ করেছেন। এবং যাতে আমরা কেহই তাঁদের না ভুলে যাই অনুরোধ করেছেন।—এবারে আমরা বাড়ী ফিরি চলুন।

—আমার আসবেন কবে?

—বাড়ীতে মার অনুমতি নিই পরে আসবে! তাছাড়া এঁদেরও মতি স্থির হোক্।

অবসন্ন মনে বাড়ী ফিরছি।

আমরা দুজনেই কেহ কারও সঙ্গে কথা কইতে পারছিলাম না। জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা আমার কেবলই বেড়ে যাচ্ছিল।

সমর কল্পনাদেবীকে বিয়ে করবেন—শুনে মনে হর্ষ এবং বিষাদ দুইই হয়েছিল। এই মিলন হলে ভাল হয় জানি,—তবু কেমন যেন দুশ্চিন্তা মনে হয় এর ফলে দুজনেরই অনিষ্ট

হবে। সমর নিজের সঙ্কল্প ভঙ্গ করে যে কাজ করতে চাইছেন—এর ভেতর অনেক খানি ত্যাগ স্বীকারের কথা আছে সত্যি।—কিন্তু পরিণামে তিনি দুর্ব্বল হয়ে পড়বেন না ত' ?

না জানি কোন্ ক্রুদ্ধ দেবতার অভিশাপ লেগেছিল মাসীমাদের সংসারে দুদিন না যেতেই সংবাদ এল কল্পনা দেবীও মারা গিয়েছেন সর্পাঘাতে।

এবং উপর্য্যুপরি ছেলে ও মেয়ের শোকে মাসীমা পাগলের মতই হয়ে গিয়েছেন। সমরেরও সঙ্কল্প চ্যুতি হল না!

কিন্তু কল্পনা যে তাঁর বুকের কতখানি বল কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল তা আমিই বুঝেছিলাম, আর কেহ নাই জানুক।

ভগবানের এ ও আর এক খেয়ালের অত্যাচার।

যে ফুল ফুটবে না এবং যার জীবনের কোন আকাঙ্খাই পূর্ণ হবে না তাকে সৃষ্টি করবারই বা কি দরকার ছিল ?

শ্যামলীর মরে যাবার সময় সমর যে কথাগুলা বলে আমায় সান্ত্বনা দিতে এসেছিলেম, ভাবলাম যেই কথারই পুনরুল্লেখ করে তাঁকে জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে বোঝাতে বসি।

কিন্তু অত দুঃখেও নিজেরই হাসি পেল'। সান্ত্বনা দেব যে কথা বলে নিজেই সে কথায় শান্ত হতে পারি নি।—

সমরের বাড়ী গেলাম।

বাসন্তীর স্বামী বনমালীকে সেখানে দেখে হঠাৎ একটু আশ্চর্য্য হয়েছিলাম।

যে জন্যেই হক, বনমালীর ওপর আমার ধারণা ভাল ছিল না।

আমাদের বিরোধী শত্রু বলে যাদের জানি তাদের সঙ্গেই লোকটী মেলামেশি করে।

অনেকবারই অনেক রকমে আমাদের ভোগাতে চেষ্টা করেছে।

তাছাড়া শ্যামলীর উপর অত্যাচার করেছিল যে কটা লোক আমার মাঝে মাঝে কেন জানি মনে হয় মুসলমানের ছদ্মবেশে এও তাদের মধ্যে ছিল।

সমরের সঙ্গে গল্প করতে করতে হঠাৎ সম্ভবতঃ আমাকে দেখেই বনমালী গাত্রোত্থান করে তখনকার মত বিদায় চেয়ে প্রস্থান করল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম সমরকে—কি বলছিল বনমালী ?

সমর বললেন—লোকটী আমাদের সঙ্গে দেশের জন্য কাজ করতে চায়। যাই হোক কিছু পয়সা আছে ত!—নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান করতে আজই পঞ্চাশটা টাকা দান করে গেল। মন ভাল, পরেও সাহায্য করবে বলেছে।

আমি বললাম—আমার একটা কথা মনে রাখবেন সমর বাবু। জগতের মাঝে সাপ এবং বাঘকেও বিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু এই বনমালীর মত মানুষদের বিশ্বাস করবেন না।

সমর বললেন—সেকি কথা, ভদ্রলোকের নামে নিন্দে করতে নেই!

সেইদিনই দশবার জন পুলিশের লোক এসে সমরকে গ্রেপ্তার করল।

আমরা এর চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার কখনও কল্পনা করতে পারি নি।

সমরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল—মৈমনসিংহে ছমাস আগে একটা স্বদেশী ডাকাতিতে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন—অর্থাৎ তিনিও নিজে একজন ডাকাত। এবং তাঁর বাড়ীতেই খানাতল্লাসী করে বোমার উপকরণ একশিশি নাইট্রিক এ্যাসিড এবং একটা আস্ত বোমা পাওয়া গেছে।

বনমালী নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খানাতল্লাসীতে পাওয়া জিনিষ সনাক্ত করে গেল।

আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই নিছক মিথ্যা বলেই মনে হল আমার। সমরের মত লোক ডাকাতি করতে পারেন এবং গ্রামে বসেই বোমা তৈরী করছেন এর মত অবিশ্বাস্য ব্যাপার আর কি থাকতে পারে ?

সব চেয়ে রাগ হল বনমালীর ওপর।

বুঝলাম—ও-ই একটা গোলমাল বাধিয়েছে।

কিন্তু প্রমাণ করি কি করে ?

শুধু মুখের কথায় বললেই ত হল না যে বনমালী একটা ভয়ঙ্কর লোক, গোপনে ও-ই বোমা এবং নাইট্রিক এ্যাসিড বাড়ীতে রেখে গেছে !

লোকটাকে খুন করলেও রাগ যায় না।

একদিন দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েই হতভাগাটাকে জন্মের মত কিছু শিক্ষা দেবার জন্য তাদের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলাম।

রাত তখন দশটা।

কিন্তু বনমালী তখনও বাড়ী ফেরে নি।

বাসন্তীকে দেখলাম—রান্নাঘরের দাওয়ায় মাটীতে আঁচল পেতে শুয়ে রয়েছে। স্বামীর জন্য অপেক্ষা করতে করতেই হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে।

তার দিকে চেয়ে রইলাম লুব্ধ নয়নে। পাঁচ বছরের পর এই প্রথম তাকে দেখ্‌ছি। মাঝখানের এই ক'বছরের দুঃখ বেদনার ইতিহাসটা মন থেকে মুছে ফেলতে চাইলাম। বাসন্তী একদিন নিজে হতেই আমার বাড়ীতে যেতে চেয়েছিল—আমি বারণ করেছিলাম বলে নিজের উপরই অভিমান জাগল। বনমালীর মত পাষণ্ড ঐ অনিন্দ্য কুসুমটীর কি কদরই বা বুঝবে! বানরের গলে মুক্তাহার শোভা পায় না! যৌবনের উন্মাদনা আমার শিরা উপশিরার মধ্যে রোমাঞ্চ খেলাল। সেদিন তার আহ্বান শুনি নি, এখনকার এই প্রস্ফুট কুমুদের রূপটী দেখিনি বলে! কৈশোরের বাসন্তী হতে আজকের এই পূর্ণযৌবনা যুবতী একেবারে আলাদা মানুষ।

কিছুক্ষণের জন্য বনমালীর কথা ভুলে গিয়েছিলাম। বনমালীকে প্রতিশোধ দিতে এসেছি সে কথাটা মনে ছিল না।

তন্ময় হয়ে ডাকলাম—বাসন্তী !

বাসন্তী উঠেই চম্‌কে আমাকে দেখে সবিস্ময়ে বললে—তুমি……এখানে ? আজ তোমাকে ডাকতে এসিছি !—

—এবং ভেবেছ আমার ওপর এখনও তোমার অবিসম্বাদী প্রভুত্ব আছে, তুমি ডাকলেই আমি দ্বিরুক্তি না করে তোমার অনুসরণ করব, কেমন ?

—কেন বাসন্তী! ওরকম শ্লেষ করে কথা বলছ কেন— ? তুমি কি আর আমায় ভাল বাস না ? আজ ডাকলে তুমি আর আসবে না ?

—মেয়ে মানুষের ভালবাসাটা এত সুলভ নয় রতনদা, যে, যখন ইচ্ছা করবে অপমান করবে আবার বরণ করে ফিরেও চাইবে! আজ আমার জীবন পথে—তোমার কোন স্থান আর নেই। তুমি ফিরে যাও! আমার স্বামী আসবেন এখনই, তিনি এসে পড়লে আর তোমায় রক্ষা করতে পারব না!

—আমি তোমার স্বামীকে ভয় করি না। তুমিও তোমার পাষণ্ড স্বামীকে ভুলে যাও।

—রতনদা, এত অধঃপতনে তুমি গিয়েছ ? ভাবতেও পারি না! লজ্জা করে না আজ একথা মুখে বলতে ?——দেখ, আমি হিন্দুর মেয়ে, হিন্দুর কুলবধূ! আমারই ঘরে আমারই সামনে দাঁড়িয়ে আমারই স্বামীর নিন্দা করতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ তোমার মনে জাগল না ? ধিক্ তোমাকে—

—বাসন্তী, বেশ ; আমি চলে যাচ্ছি, তোমার আজকের অপমান আমার চিরদিন মনে থাকবে।

—তা ত' থাকবে! পাষণ্ড! আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে আমার স্ত্রীকে অপমান করতে এসেছ বেল্লিক,—এই বলে অতর্কিতে বনমালী আমাকে আক্রমণ করল। আমার গলায় দুটো হাত দিয়ে সে চেয়েছিল টিপে মারতে।

আমি প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়েই উল্টে পুনর্ব্বার তাকেই মাথায় ঘুষি মারলাম। সে মাটীতে পড়ে গেল। আবার ওঠবার চেষ্টা করছিল, আমি তার বুকের উপর বসে নিজের পকেট হতে ছোরা বার করে উঁচু করে ধরলাম।

বনমালী ভয় পেয়ে কাতর হয়ে বলল—ক্ষমা কর আমাকে! প্রাণে মের না।

বনমালীর দিকে এতক্ষণে ভাল করে চেয়ে দেখবার অবসর পেয়েছিলাম।

মুসলমানের মত লুঙ্গিই পড়েছিল সে।

আজকের এ বেশে দেখে আমার মোটেই সন্দেহ রহিল না শ্যামলীকে হত্যা করেছিল বনমালী নিজেই।

বললাম—তোমাকে মেরে আমার ফাঁসিও হয় তাও স্বীকার। আজ হাতে পেয়েছি ছাড়ব না। শ্যামলীকে মেরেছিলে তুমিই। সমরবাবুর অন্যায় গ্রেপ্তারের মূলেও তুমি আছ। অন্যায় বেশীদিন চাপা থাকে না, প্রকাশ হয়ই। আজও আমার এই অভিযোগ তুমি অস্বীকার করতে পারবে না।

বনমালী বলল—আমায় মাপ করুন, জেলে দিন, দ্বীপান্তরে পাঠান। কিন্তু প্রাণে মারবেন না——

আমি তার কোন্ কথাতেই সঙ্কল্প ভুলব না ঠিক করেছিলাম।—

বাসন্তী প্রথমে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়েছিল, মুহূর্ত্ত পরে নিজে ছুটে এসে আমার হাত ধরে ফেলে বললে—রতনদা, আমার ওপর দয়া কর তুমি! আমার মুখ চেয়ে তুমি ওকে ছেড়ে দাও। আমার সামনে আমার স্বামীকে হত্যা করতে পারবে না তুমি।

বাসন্তীর কাতরোক্তিতে আমার হাত শিথিল হয়ে এল।

বললাম——তোমার অনুরোধ শুনব কেন? তুমি আমার কে?

বাসন্তী বলল—কেউ নই জানি! কিন্তু তোমাকে কলঙ্কী নাম কিনতে দেব না। পাপীর শাস্তি ভগবান দেবেন। নিজের হাতে বিচার দণ্ড নেবার তোমার অধিকার নেই।

বিনা সর্ত্তেই বনমালীকে ছেড়ে দিলাম।

বাসন্তীর হাতের নোয়া অক্ষয় হোক।

বনমালী তারই স্বামী ত'!

এবং আমি তার কেউ নই!

রাত্তে বাড়ী ফিরে দেখি মিলন নীরবে কাঁদছে।

আসতেই রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করল—রতন দা'——সমর দা'কে বাঁচাবার কি করলেন?

—বাঁচাবার? কেন? যে কায করেছেন তার শাস্তি পাওয়া দরকার ত'।

—কিন্তু অভিযোগ যে মিথ্যে। সমরদা কখনো অত নীচ হতে পারেন না। তিনি দেশকে ভালবাসেন এটাই যদি সব চেয়ে বড় অপরাধ হয় তাহলে তিনি দোষী! কিন্তু তা ত নয়! তাছাড়া ডাকাতি করা কিম্বা বোমা তৈরী একেবারে মিথ্যে!

—মিথ্যে, সে কথা আদালতে বলুন গে, আমার কাছে কেন?

—কেন রতন দা, আপনি এ রকম ভাবে বিদ্রূপ করে কথা বলছেন কেন? আপনি কি চান না যে সমর দা ছাড়া পান—

—কিন্তু তিনি ছাড়া পেতে পারেন না। তাই আর চেষ্টারও দরকার বুঝি না। এ ত' তবু এতো বড় কিছু ব্যাপার নয় যে আপীল চলবে না কিম্বা বিচারে সত্যই মুক্তি পাবার সম্ভাবনা নেই। বিনা অপরাধে দেবতাদের আদালতের বিচারে যখন নিরীহ মানুষের শাস্তি হচ্ছে, তখন ত আপীলও চলে না, মুক্তিরও কোন উপায় থাকে না। শ্যামলী যখন মারা গেল একটা প্রতিবাদ করতে পারি নি। অমিয় এবং কল্পনা যখন মারা গেলেন তখনও একটা প্রতিবাদ করতে পারলাম না! তবে?

মিলন আমার রুদ্ধ অভিমানের বেদনা বুঝেছিলেন।

আমরা কেহই কিছু করতে পারলাম না।

বিচারে সমরের দুবছর অন্তরীণের হুকুম হল।

সমর নিজেও কারও বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদও জানালেন না।

জেলে যাবার আগে তাঁর এক ভ্রাতুষ্পুত্র নিরঞ্জনের সঙ্গে মিনতির বিয়ে দিয়ে গেলেন।

মাসী মা'কে কন্যাদায় হতে উদ্ধার করবেন ভরসা দিয়েছিলেন, তাই বোধ হয় প্রতিজ্ঞা পালন করাটা দরকার বুঝেছিলেন।

কিন্তু মিনতির বয়স যে তখন মাত্র দশ বছর, সে কথাটা হয় ত মনে ছিল না।

——:০:——

উদাসিনী প্রিয়া

—শ্রীহেমচন্দ্র বাগ্‌চী

উদাসিনী প্রিয়া চাহে না আমার
কোমল পরশটিরে।
কালো কেশে দিনু নবীন কুসুম ;—
ফেলিল নয়ন-নীরে।
কণ্ঠে দোলাই যে মণি-মালিকা,
তা'রে রাখি' দেয় ভুলে।
বাতায়ন-পাশে বসি' একাকিনী
চম্পক-অঙ্গুলে,
অধীর বীণায় আনে গুঞ্জন ;—
যেন ঘন কালো নীরে
নীরবে ঘনায় অনাদি আঁধার
তা'রি সুরে ধীরে ধীরে ॥

কি আলো তাহারে করে উন্মাদ
আজি এ বিজন পুরে !
ভোরের পবন কি বাণী জানায়
নব টহলের সুরে !
চাহিয়া নয়নে নাহি পাই তা'র
চির পুরাতনী দিশা !
কি তা'র কামনা—কিবা তা'র আশা
কেমন মনের তৃষা !
সে যে চাহে দূর ; আমি খুঁজি সুর
জীবনের পথে ঘুরে ;
বাজি' উঠে মনে চির চঞ্চল ;
ফিরে যাই দূরে দূরে ॥

বাড়ে ব্যবধান ; ভুলে যাই মনে
কি আর রয়েছে বাকী !
উদাসী বাতাস ফিরে চারিপাশ
গুমরিছে থাকি' থাকি'।
ক্ষণে ক্ষণে জাগে নবীন বাসনা
নব মুকুলের মত !—
নূতন করিয়া করিব আপন
হারানো বেদনা যত।
উতল জীবন-দোলা লাগে প্রাণে ;
মুখর মনের পাখী
কলভাষে করে আলোকে সিনান
পিঞ্জর দূরে রাখি' ॥

উদাসিনী প্রিয়া কেশ আকুলিয়া—
কত যুগ-যুগ ধরি'।
নীরবে শসিছে দখিণা বাতাস ;—
হেনা পড়ি' যায় ঝরি' !
আকাশের শশী আছে বসি' যেন
কবে সে জাগিবে বধি' !
করুণ নয়নে চপল হাসির
বিভাটি উঠিবে ঝলি' !
রাঙিবে কপোল ; নব-কল্পনা-
মঞ্জরী উঠে ভরি' ;
উদাসিনী মোর বিরহে রচিছে
মিলনের শর্ব্বরী ॥

তর্কের শেষ

—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

গত রাত্রির উচ্ছৃঙ্খলতার প্রমাণ লুণ্ঠিত কবরী ও ডুরে সাড়ীর আঁচলে কিরূপে পাওয়া গেল, তা গৃহিনী প্রতিভা-রাণীই বলতে পারেন—তবে সেইদিনই তার চাকরিটা গেল।

আমি কিন্তু গোপনে প্রতিবাদ করেছিলুম—অমনটা তো ঠিক নাও হ'তে পারে।

অন্তঃপুর থেকে তার উত্তরটা একটু কড়া রকমেই শোনা গেল—অতই যদি দরদ তো মাসোহারা দিয়ে রাখলেই পার—

আরে ছিঃ—

কোন্ কথায় কি কথা এসে পড়লো, দেখ দেখি।

আমার যুক্তির কিন্তু কতকগুলি কারণ আছে—

রজনী তার নাম, জাতিতে নাপিত কি গোয়ালা, সে নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার ছিল না মোটেই। বয়স কম, খাটতে পারে যথেষ্ট।—মাইনে? সে তো নাম-মাত্তর! সাংসারিক 'ইকনমি'র দিক থেকে এতগুলো সুবিধের কথা আমার কাছে যতখানি মূল্যবান, গৃহিণীর কাছে তা ঠিক ততখানিই অবোধ্য।

অথচ মজা এই—তার কথায়, ব্যবহারে এমন কি চলনে অবধি ভদ্রতার শ্রী মাখা;—বিলাস বিভ্রম বা সামান্য কটাক্ষও তার চোখে কোন দিন দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না।

অথচ কম দিন তো আর নয়, তিন বছর সে চাকরী করছে আমাদের বাড়ীতে।

তথাপি—

কিন্তু কার অন্নজল মাপাবার বিধাতা তো আর আমি নই;—

এই নিয়েই সেদিন ঘরে' বসে তর্ক হচ্ছিল সুনীলের সঙ্গে। সুনীল প্রতিভার বাল্যবন্ধু; আমাদের বিয়ের পরও তাদের বন্ধুত্ব আল্গা হ'তে দিই নি,—দেবার কারণ খুঁজে পাই নি বলে'।

সুনীল বলছিল—মানুষের এমন কতকগুলি প্রবৃত্তি থাকে, যা তুমি হয়ত তার আধা বয়স পর্য্যন্ত দেখতে পাবে না; কিন্তু মনের অন্ধকার নিবিড় গুহায় বাস করতে করতে হঠাৎ একদিন তারা আত্মপ্রকাশ করে—তখনই প্রমাণ ও যুক্তি নিয়ে গোল বাঁধে—মানে, সাব্-কন্‌শাস্ রিজন্ থেকে—

কেরাণীদের এত লম্বা চৌড়া কথা না বুঝলেও চলে, তাই বাধা দিয়ে বল্লুম—ও সব কথাগুলো তুমি না ওঠালেও পারো; কেননা তোমার বন্ধুর কথা যখন নট্-নড়ন্-চড়ন্— অর্থাৎ প্রতিভার কথা আমি বলছি—

সুনীল বল্লে—কিন্তু তাই ব'লে তুমি বোঝবার যুক্তিগুলো উড়িয়ে দিতে চাইছ?

ওগুলো আমার মাথায় ঠিক আসেনা বলেই বোধ হয়। বল্লুম—আজ অবধি তার চরিত্রের বিরুদ্ধে কারো মুখে কোন কথা তুমিও শোন নি, আমিও না,—প্রমাণও কিছু পাওয়া যায় নি। সমস্ত দিনের পর রাত্তিরে সে যে বাড়ীতে শু'তে যেত তা খোলার চালের হ'লেও, সেটা ভদ্রলোকের পাড়া—তাছাড়া তার হাবভাব ব্যবহার——

স্বীকার করি—বলে' সুনীল কিছুক্ষণ ভেবেই আবার বল্লে—কিন্তু তুমি কি বলতে চাও মানুষ নির্ভুল প্রাণী? কখনও কি তার পদস্খলন হ'তে পারে না? যে মানুষ খুন করলো, আগে কি তাকে তুমি খুনী আসামী বলে' চিনতে পারো?

রজনীর পক্ষে ওকালতিতে লাভের মধ্যে দেখলুম বিদ্বেষটাই বেড়ে উঠলো তর্ক করে'। কাজেই বল্লুম, জবাব যখন তাকে দেওয়া হয়েছে, তখন আর সে নিয়ে—

—প্রতিভা ঠিক কাজই করেছে;—বলে' সুনীল মাথা নাড়তে লাগলো।

নটা বাজতে পাঁচ মিনিট!

অফিসে লেট্ করার দরুণ বড়বাবুকে কৈফিয়ৎ দেখাতে গিয়ে যদি এ প্রসঙ্গের উত্থাপন করি তো, সেটা যে তাঁর পক্ষে খুব উপাদেয় বস্তু হ'বে-আমি তা মনে করি না। তাই তাড়াতাড়ি ছুটো নাকে মুখে গোঁজবার জন্তে উঠে পড়লুম।

স্নানযাত্রা উপলক্ষে সেদিন সস্ত্রীক গঙ্গাস্নান করতে যাওয়া—অনেকটা পুণ্যলাভের আশাতেই বটে!

জোয়ারের জল বড় বড় ঢেউ তুলে' ক্রমাগত ছুটে চলেছে—তীরের ওপর অবিরাম জনস্রোতেরই মতো!

সাঁতার না জানা থাকলে জলাশয়ের সর্ব্বত্র কাকস্নানের ব্যবস্থা। তীরে উঠে দেখি প্রতিভা স্নানের চেয়েও অন্ত একটা কাজে নিজেকে ঘনিষ্ঠ ভাবে নিযুক্ত করেছে—সমাগত মহিলাদের কাউকেই সে যেন বন্ধুর দল থেকে বাদ দিতে চায় না—এমনিই তার আলাপের বহর!

কাপড় ছেড়ে' প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি—সামনেই দেখি,—রজনী! আর্দ্র-বসন-রুদ্ধ উদ্ধত যৌবন শাসন মানে না যেন।

আমার কিছু বলবার আগেই সে নীচু হ'য়ে আমার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে।

জিগ্যেস করলুম—কোথায় আছ এখন?

লজ্জানত-আঁখি নীচু করে' সে উত্তর দিলে—আপনাদের আশ্রয়ে ভগবান তো আর ঠাঁই দিলেন না—এই খেনেই এক বাবুদের বাড়ী কাজ করছি।

—ভালো, ভালো, বলে তাড়াতাড়ি পাশ কাটাতে হোলো—প্রিয়ার স্নান তখন সমাপ্ত!

অসম্ভাবিতভাবে আরও একদিন তার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। অফিস থেকে ফিরে বিকেলবেলাটা বৈঠকখানায় চুপচাপ ইজিচেয়ারে চোখ বুজিয়ে শুয়ে আছি—হঠাৎ কে যেন নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে ঘরে ঢুকলো। উঠে বসে' চোখ চাইতেই—দেখলুম—রজনী!

বড় মুস্কিলে পড়লুম। কিন্তু আমার কিছু বলবার আগেই সে উৎকণ্ঠিতস্বরে বলে' উঠলো—বড় বিপদে পড়েই আপনার কাছে ছুটে এসেছি।

—মানে?

যে সম্পর্কীয়া পিসির সঙ্গে সে এক ঘরে থাকে, তার কলেরার মতন হয়েছে সকাল থেকে। আমি এককালে হোমিওপ্যাথি নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করেছি, পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েদের দাতব্য চিকিৎসা করাও আমার এক বদ্ অভ্যাস ছিল—রজনী দেখছি সেটা ঠিক মনে করে' রেখেছে!

কিন্তু বললুম—তুমি অন্ত ডাক্তার ডাকো ঝি, কলেরা সারাবার মতন ডাক্তার তো হইনি কোনদিন।

নাছোড়বান্দা! বলে—আপনার পায়ের ধুলো পড়লেই সে সেরে উঠবে—তার নিজের বিশ্বাস, আরও একবার সেরেছিলো, সেই দু'বছর আগে!

কালকে কি দিয়ে ভাত খেয়েছি তাই মনে পড়ে না—দু'বছরের গত ঘটনা স্মরণ করতে গেলে তো হৃৎকম্প উপস্থিত হ'বে।

কিন্তু আর দেরী করবারও সময় ছিলনা—প্রতিভার চা নিয়ে এখুনি আসবার কথা। এই অবস্থায় আমাদের আবিষ্কার করা কারো পক্ষেই খুব বাঞ্ছনীয় হবে না।

বললুম—আচ্ছা, এখন তুমি যাও।

—কিন্তু দয়া করে সন্ধ্যেবেলা,—

—আচ্ছা সে দেখা যাবে, এখন যাও তো তুমি।

যাবার সময় ছুঁয়ে মাথা ঠেকিয়ে নমস্কার করতে সে ভুললো না।

যে নতুন বাড়ীর নম্বরটা সে দিয়ে গেছে—কলকাতা সহরেও তা খুঁজে বের করা এক মেহনতের ব্যাপার!

ষোল আর কুড়ি নম্বরের মাঝখানে যে খোলার চালের বস্তিটা বেজাতের মতো দাঁড়িয়ে আছে, তাতে যে তিন তিনটে নম্বর এক সঙ্গে থাকতে পারে—সেটুকু বুঝতে অনেকটা বুদ্ধির দরকার।

বাড়ীটার সামনে আসতেই ঘৃণায় সর্ব্বশরীর সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো।

—এই নিয়েই সুনীলের সঙ্গে তর্ক করেছি—

—প্রতিভার কথা অবিশ্বাস করেছি—

কিন্তু তর্ক ও অবিশ্বাসের জোরে, সামনে যারা সিগারেট হাতে হাসাহাসি ঢলাঢলি করছে তাদের অস্তিত্ব তো উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

পিছন ফিরবো ভাবছি—এমন সময় হায় রে! এ কী দেখলুম! সামনে গোখ্‌রো সাপ দেখাও যে ছিল ভালো!

অনেকদূরে একটা গ্যাস পোষ্ট। তার ক্ষীণ আলো সত্বেও জায়গাটা দস্তুর মত অন্ধকার! কিন্তু তাকে চিনতে একটুও বেগ পেতে হোলো না।

একটা দরজা দিয়ে যে বেরিয়ে এল টলতে টলতে—সে সেদিনকারই তর্ক করা সুনীল, আর তাকে দরজা পর্য্যন্ত পৌছে দিতে যে সঙ্গে এল তার সাজসজ্জা পিসির শুশ্রূষারই সাক্ষ্য দিতেছে বটে!

বাড়ী ফিরে একটা প্রবন্ধ লিখবো ঠিক করেছি—কিন্তু কি বিষয় নিয়ে যে লিখবো এবং কোন্ মাসিকে পাঠাবো এবং পাঠালে তারা ছাপবে কিনা—সেই কথাটাই এখন ভাবছি।

মোক্ষসাধন

—শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ

তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে নদীর ওপারে জঙ্গল আর ঘন ঝোপ! দিনের আলো তার ভেতর প্রবেশ পথ পায় না—সন্ধ্যার অন্ধকার সেখেনে আরও নিবিড় হয়ে ফুটে ওঠে। তার ভেতর যে পাখীটা থাকে সে অনেকগুণ শীতবর্ষা দেখে ফেলেছে। প্রকৃতির নিত্য পরিবর্ত্তনের ভেতর সে কি পেলে জানি না,—তবে একদিন কুয়াসাচ্ছন্ন হিমের বাতাসলাগা শীতের প্রভাতে তার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হ'ল—সে ঠিক করলে—ভগবানকে পেতে হবে।

পাখী ভাবলে—গান গেয়ে বেড়ানোই ত জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়, শুধু ওড়ার আনন্দে উড়ে বেড়ালেও ভগবানকে পাওয়া যায় না। জীবনের মধ্যে ভগবানকে পেতে হ'লে—চাই হৃদয়ের বৈরাগ্য, চাই কৃচ্ছ্র সাধন!.........

সেইদিন থেকে পাখী ওড়া ছেড়ে দিলে—গান গাওয়াকে সে পাপ বলে' ভাবতে লাগল। তার সঙ্গিনী তার নির্ম্মমতা ও স্ফূর্ত্তিহীনতা দেখে তাকে ত্যাগ করে চলে গেল—সে যে নিতান্তই বনের পাখী, তার মনের ভেতরটা যে গান গাওয়া আর উড়ে বেড়ানোর আনন্দেই ভরপুর! পাখী একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে—'যাক্ একটা মায়ার বাঁধন কাটলো।'

শীত গেল, ক্রমে বর্ষা এল। সমব্যথী ধরণীর রুক্ষ কোমল বুকখানির উপর প্রকৃতির আকুল করা অশ্রুধারার ঝর ঝর করে' ঝরে' পড়তে লাগলো।.........নদীর পাড়ে জীর্ণ বটগাছটায় যে নবীন মুঞ্জরিত শাখাটা সব নীচে মাথা বাড়িয়ে অবিশ্রান্ত জলধারায় ভিজতে থাকে, তারই উপর বসে' গভীর চিন্তায় আপনাকে ডুবিয়ে দিয়ে পাখী দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটায়—একাকী! অদূরে তার সখা সখীরা স্বাধীন আনন্দে ছুটোছুটি করে' জলে ভেজে, তারপর সাঁঝের আঁধারে চারদিক আচ্ছন্ন হবার আগেই মুখভরা হাসি আর বুকভরা শান্তি নিয়ে নিজ নিজ বাসায় ফেরে। তাদের দিকে তাকিয়ে পাখী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে—মনে মনে ভাবে—'কী মূর্খ!'

পাখীর উড়ে বেড়াবার ইচ্ছা বা ক্ষমতা নেই দেখে

একদিন এক ব্যাধ তাকে ধরে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে খাঁচার ভেতর পুরে রেখে দিলে। পাখী ভাবলে—'এইবার বেশ একটা নিরিবিলি জায়গা পাওয়া গেল, নিশ্চিন্তে ভগবানের ধ্যান করা যাবে।'

কিন্তু দুদিন খাঁচার ভেতর কাটিয়েও যখন ভগবানকে পাওয়ার কোন উপায় ঠিক হল না, তখন পাখীর এই মানুষের তৈরী খাঁচার ভেতর বাস ও মানুষের দেওয়া খাবার খেয়ে জীবন যাপন করা অসহ্য হয়ে উঠলো। এর চেয়ে তার কাছে তার স্বেচ্ছায় উড়ে বেড়ানোটা বেশী বাঞ্ছনীয় বলে বোধ হতে লাগলো।

একদিন খাঁচার দরজাটা একটু খোলা পেয়ে সে উড়ে চলে যাচ্ছিল, এমন সময় ব্যাধের ছেলে তাকে দেখতে পেয়ে ধরে' তার ডানা দুটো কেটে দিলে।

এমনি করে যে উড়ে বেড়ানোটাকে সে পরিহার করতে চেয়েছিল তা আপনিই তাকে ছেড়ে গেল। পাখী কিন্তু ভগবানকে পেলে না।

এখন পাখী ব্যাধের বাড়ীতে দাঁড়ে বসে বসে ব্যাধ-বালকের শিখানো বুলি পড়ে—কিন্তু ভগবানকে পেতে তার যে কত দেরী সে কথা আর তার মনেও হয় না।.........

রূপশিখা

—শ্রীঅরিন্দম বসু

তৃতীয় দৃশ্য

মৃদু-মন্দ-মলয়াকুল সন্ধ্যা। পুষ্পোদ্যানে-কোমল শ্যামল দূর্ব্বাদলের উপরে বসিয়া উৎপলবর্ণা মালা গাঁথিতে ছিলেন। পশ্চাতে উত্তীয় দণ্ডায়মান।

অভিমানে শ্রেষ্ঠীপুত্রী এই কয়দিন উদ্যানে প্রবেশ করেন নাই। আজ কি ভাবিয়া যেন তিনি তাহার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন।

উত্তীয় সম্মুখে আসিয়া ডাকিলেন,—

—উৎপল রাগ করেছো!—মুখ তোল,—

অবনত মুখী উৎপলবর্ণা কোন উত্তর দিলেন না।

—চেয়ে দ্যাখো, আমি এসেছি,—একটী কথা কও উৎপল?

শ্রেষ্ঠীপুত্রী তথাপি নীরব।

নিষ্ফল অনুরোধে উত্তেজিত হইয়া উত্তীয় মনে মনে বলিলেন—বটে, এত তেজ!......ক্রমান্বয়ে তিন দিন ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে ফিরে গিয়েছি। কিন্তু আজ আর নয়,...... ছলে, বলে, যেমন করেই হোক্ একবার তোমাকে ঐ তরণীতে নিতে পার্‌লে, দেখে নেবো তখন—কেমন নারী তুমি...

উত্তীয় অবসন্নের মত উৎপবলর্ণার পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া একমনে তাহার পুষ্প-গ্রন্থন দেখিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল।

—একটী কথাও কি কইবেনা উৎপল—তবে আমি ফিরে যাবো?

সহসা শ্রেষ্ঠিপুত্রীর দুইখানি হাত সজোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন—

—বলো উৎপল—তোমাকে বলতে হবে।......বলো, আমি ফিরে যাবো?

উত্তীয়ের বলিবার ভঙ্গীতে তাহার কথাগুলি শ্রেষ্ঠিপুত্রীর কাণে বড়ই করুণ শোনাইল। তিনি চোখ তুলিয়া গম্ভীর

ভাবে উত্তীয়ের মুখের পানে চাহিয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন—আমার বলা-না বলায় ওপর কি এসে যায় তোমার ?

—খুব এসে যায়।····· তুমি জানোনা উৎপল, গত তিন দিন ব্যর্থ প্রতীক্ষায় সমস্ত সন্ধ্যা এখানে কাটিয়ে দিয়ে শেষে কতখানি ব্যথা নিয়ে ফিরে গেছি। যদি তুমি তা বুঝতে তবে ঐ বাতায়নের পাশে লুকিয়ে থেকে এমন করে আমায় ফিরিয়ে দিতে পারতে না।

—কেন, তুমি আমাকে অমন করে অপমান করলে সেদিন ?

—আমি ক্ষমা চাইছি উৎপল।

—সে ব্যথা বুঝি আমার কাছে কম ?······পিতার নামে মিথ্যা কলঙ্ক—

—ও কথা এখন থাক্ ভাই······অপরাধ তো আমি স্বীকার করছি।······ঐ যে মর্ম্মর বেদী, চলো—

উৎপল বর্ণাকে বাহু-বন্ধনে লইয়া উত্তীয় মর্ম্মর বেদীতে গিয়া উপবেশন করিলেন। তার পর ক্ষণকাল তাহার মুখের পানে অপলক নেত্রে চাহিয়া বলিলেন,—

—আমায় এ তিন দিন কতখানি তুমি ভাবিয়ে তুলোছো, জানো ? সত্যি, তুমি এত সুন্দর কেন হয়েছিলে উৎপল ?

—ছাই সুন্দর।···সুন্দরই যদি হতাম তবে এমন করে তুমি আমায় অপমান—অবহেলা করতে পারতেনা কখনো।

—কিসের অবহেলা উৎপল !

সহাস্য-মুখে উত্তীয় তাহার গ্রীবাখানি তুলিয়া ধরিয়া অধর স্পর্শ করিলেন।

—যাও, আমি বলবোনা।

—আবার রাগ হ'লো বুঝি ?······দেখ্‌ছো কি উৎপল—বাতাস কেমন স্নিগ্ধ—সন্ধ্যা কেমন সুন্দর! এই ছায়া-তলে আজ তরণী বিহার—বড় মধুর, বড় মনোরম।···চ'লে এসো বন্ধু,—ঐ যে সোপান—জলে তরণীখানি আমাদেরই প্রতীক্ষায়——শান্ত, স্থির।

—কিন্তু ভয় হয় উত্তীয়—নদীতে বান এসেছে।

—আমি সঙ্গে থাকতে কিসের ভয়—শুনি ?···আর জল-বিহার এই কি আমাদের প্রথম উৎপল ?······এমনি কত সন্ধ্যায়—

—হাঁ, তা জানি।

—তবে চলে এসো উৎপল—

শ্রেষ্ঠিপুত্রীর হাত ধরিয়া উদ্যান সংলগ্ন সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া উত্তীয় ক্ষুদ্র তরণীতে অবতরণ করিলেন। মুহূর্ত্তে তরণীর বন্ধন মুক্ত হইল।

—দেখ্‌ছো উৎপল,—স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র তরণী কেমন ছুট্‌ছে।

—কিন্তু ওতেই যে আমার ভয় করচে উত্তীয়।

—ভয় কি ?···আরো কাছে এসে ব'সো।······ঐ দেখো শ্রাবস্তীর রাজভবন,······অদূরে মন্দার ঐ উচ্চ চূড়া, ······ঐ শোনো তার জল-নির্ঝরের করুণ কল্লোল—কী সুন্দর, কী মধুর !

শ্রেষ্ঠিপুত্রী অবাক বিস্ময়ে নদীতীরের অদূরবর্ত্তী দৃশ্যরাজি সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তরণীখানি স্রোতাবেগে বহুদূর অগ্রসর হইয়া গেল।

—আর কতদূর যাবে উত্তীয় ?···সন্ধ্যা যে শেষ হয়ে গেছে।

—কাণ পেতে শোনো উৎপল, দূরের ঐ জলোচ্ছ্বাস কী ভীষণ ! দু'দিন পূর্ব্বেও যে নদী শীর্ণকায়া ছিলো,—চেয়ে দেখো আজ তা কত প্রশস্ত।

উৎপল বর্ণা সরিয়া উত্তীয়ের পায়ের কাছে বসিয়া ভীত-স্বরে বলিলেন—

—অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে কেমন—ফিরে চলো উত্তীয় !

—কিন্তু পশ্চিমাকাশে মেঘ জমেছে,—যদি ঝড় ওঠে উৎপল,—

—উত্তীয়, বন্ধু, সে-কি ? ফিরে চলো।······চেয়ে দ্যাখো, কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

—ঝড় উঠ্‌লে কি হ'বে, জানো ?······এই ক্ষুদ্র তরণী চোখের পলকে নদীর অতল জলে তলিয়ে যাবে।—আর—আর আমরা—

—তোমার পায়ে পড়ি উত্তীয়, ফিরে চ'লো···উঃ কি অন্ধকার !

—তা হ'লে বেশ হ'বে। আমরা—হ্যাঁ উৎপল, সেই আমাদের সত্যিকারের মিলন।···পরস্পরের বাহু-বদ্ধ হ'য়ে নিরঞ্জনার অতল জলে ডুবে যাবো···তারপর আমাদের দেহ ভাসতে ভাসতে কোথায়, কতদূরে চলে যাবো, কে জানে।······ওকি, তুমি কাঁপছো?······হ্যাঁ, উৎপল, সেদিনও হয়ত এম্‌নি করেই কেউ কেঁপে উঠবে।······নির্জ্জন নদীতটে আলিঙ্গন-বদ্ধ দুই তরুণ তরুণীকে দেখে সহসা এম্‌নি ভয়েই বিহ্বল হয়ে উঠবে ······কিন্তু মরতে তোমার ভয় কিসের উৎপল?—জীবনের যা কিছু সুখ—

উৎপলবর্ণা শিহরিয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্তে উত্তীয়ের কণ্ঠ-বেষ্টন করিয়া আর্ত্তস্বরে বলিলেন—

—জীবনে কারো কাছে ভিক্ষা চাইনি উত্তীয়,—আজ তোমার কাছে তাও চাইছি।······দয়া করে রাখবে······ঐ দ্যাখো, শ্রাবস্তীর শেষ সীমাও—

—হ্যাঁ, শেষ সীমারেখাও ছাড়িয়ে গেলো,—আরো যাবে।······শোনো উৎপল, ফের্‌বার পথ আজ বন্ধ। ক্ষমা করো—তোমার অনুরোধ রক্ষা করা আজ অসম্ভব।······দিগন্তব্যাপী এই জমাট অন্ধকার······তার বুকে ঝিল্লীর তীব্র ঝঙ্কার······নদীস্রোতের অবিশ্রান্ত কল্লোল,—আজ আমার প্রাণে প্রলয়ের বাঁশী বাজিয়েছে।······আকাশের কোণে ঐ যে একটা উজ্জ্বল তারা—তারই নীচে গভীর অরণ্য······হিংস্র শ্বাপদের ভীষণ হুঙ্কার,······নিশাচর পক্ষীর কর্কশ ধ্বনি,—যেন সমস্ত মিলে একটা মৃত্যু-বিভীষিকার ছায়া।······আর আমরা তারই ভেতর দিয়ে—

—তুমি কি দস্যু? আমায় চুরি করে নিয়ে কোথায় চলেছো নিষ্ঠুর? দুঃখে, ভয়ে, অনুশোচনায় উৎপলবর্ণা মরিয়া হইয়া উঠিয়া দাঁড়াতেই উত্তীয় বজ্রকঠোর হস্তে তাহার কুসুম-পেলব হস্তাকর্ষণ করিয়া বলিলেন,—

—ঠিক বলেছো—আমি দস্যু। কিন্তু কে আমায় এই দস্যুতা শিখিয়েছে—জানো?—সেও একজন দস্যু,······শোনো তার ইতিহাস,—ঐ যে সম্মুখের আম্রকাননখানি অন্ধকারে মিশে গেছে,—একদিন তারই নীচে এই নদীতীরে তিনখানি বৃহৎ বাণিজ্য-তরণী বাঁধা ছিল। তার অধিকারী ছিলেন কোশলের এক ঐশ্বর্য্যশালী শ্রেষ্ঠি। তারপর সেইদিন গভীর নিশীথে—আরোহীরা যখন নিদ্রামগ্ন, তখন অতর্কিতে একদল দস্যু তাদের আক্রমণ করে যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। আরোহীদের ভেতর কেউ দস্যু-সংঘর্ষে প্রাণ ত্যাগ করে······কেউ নদীর জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে পালিয়ে যায়। কোনক্রমে বেঁচে থাকে শুধু শ্রেষ্ঠি এবং তার সপ্তম বর্ষীয় এক পুত্র।······পরদিন হৃতসর্ব্বস্ব বণিক রাজ দরবারে এই লুণ্ঠনের অভিযোগ করেন কিন্তু তার কোন প্রতীকার হয় না।······কে সে দস্যু জানো উৎপল?—ঐ শ্রেষ্ঠিরই অধীনে সে ছিল এক কর্ম্মচারী। পরে প্রবঞ্চনা অপরাধে বিতাড়িত হয়। সেই অপমানের ফলে তারপর হতে সে সর্ব্বদা প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ অন্বেষণ করতে আরম্ভ করে কিন্তু কোন সুযোগই পায় না। তার দু'বৎসর পরে সেই বণিক যখন বাণিজ্য সম্ভারসহ এই নদীপথে বিদেশে যাত্রা করে তখন পথিমধ্যে এই স্থানে তার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ক'রে পরে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়। সে পাপিষ্ঠ পূর্ব্ব হ'তেই নগর রক্ষকের সঙ্গে পরামর্শ করে' রেখেছিল।—তাই সেই ধনলোভী নগর রক্ষক প্রচুর উৎকোচের লোভে তার বশীভূত হ'য়ে থাকে। তারই ফলে গভীর রজনীতে একদল দস্যুর সাহায্যে সে তার প্রতিহিংসা গ্রহণের নিষ্ঠুর সুযোগ পায়।······এই ঘটনার দশ বৎসর পরে সেই নিঃস্ব শ্রেষ্ঠি নিদারুণ দুঃখে কষ্টে ইহ সংসার হতে বিদায় গ্রহণ করেন। যাবার সময়টিতে তার সপ্তদশ বর্ষীয় পুত্রের জিঘাংসা বৃত্তিকে জাগরিত করে যান,—বলেন—পুত্র, অন্যায়ের প্রতিশোধ নিয়ো।······শোনো উৎপল এ তারই প্রতিশোধ।—তাই আজ সেই শ্রেষ্ঠিপুত্র তার পিতার সর্ব্বস্বাপহারী দস্যুর একমাত্র তনয়াকে চুরি করে নিয়ে চলেছে।

—মিথ্যা কথা।······আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলো।

—অসম্ভব। এখনো পিতার সেই দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট রোগ-পাণ্ডুর মুখছবি আমার চোখের সামনে ভাসছে।······চিন্তায় দুর্ভাবনায়, অর্থকষ্টে তিল তিল করে মরণের ধাপে পা বাড়িয়ে শেষে তিনি সকল যন্ত্রণার হাত এড়িয়ে বেঁচেছেন। কিন্তু কেন?···কেন সে দুঃসহ কষ্ট তাকে সইতে হয়েছিলো? তার সেই অকাল-মৃত্যুর জন্য দায়ী কে?······হ্যাঁ, সে ঐ পাপিষ্ঠ নন্দ···তোমার পিতা।

...সাবধান উত্তীয় !

...কাকে সাবধান করছো ?..... তোমার ঐ তুচ্ছ ভ্রূকুটিতে টলবো—সে আমি নই উৎপল।

ইতিমধ্যে সমস্ত আকাশ খানি ধীরে ধীরে মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল—গাঢ়, ঘন—অচঞ্চল। নক্ষত্র-দীপালি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। সহসা পশ্চিম দিক হইতে দমকা বাতাস বহিল—ক্ষুদ্র তরণী আন্দোলিত হইয়া উঠিল। শ্রেষ্ঠিপুত্রী শিহরিয়া বলিলেন—

—ঐ বুঝি ঝড় এলো—তরী কেমন দুলছে,—এখুনি বুঝি তলিয়ে যায়।—হায় ভগবান—

গভীর নৈরাশ্যে উৎপলবর্ণা সম্মুখের জমাট অন্ধকারের দিকে চাহিলেন।

—আমার বুকের স্পন্দনেও আজ এম্‌নি দোলাই চলেছে। কিন্তু ভয় কি তোমার ? আজ আমাদের মৃত্যুর অভিসার,... ...ঐ ঝড় যদি উঠে, তবে এই তরঙ্গ দোলায়—

—তুমি কি মানুষ উত্তীয় ?—হ'লে আজ উন্মত্ত পাষাণ—উঃ—

শ্রেষ্ঠিপুত্র দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

...চমৎকার প্রতিশোধ !......কিন্তু ঝড় বুঝি এলো না, বাতাসের গতি ফিরে গেছে—মেঘগুলো শোঁ শোঁ করে উত্তরে ছুট্‌ছে।......ঐ যে দূরে মেঘের আড়ালে চাঁদের ক্ষীণ রেখা......মুখ খোলো উৎপল, চেয়ে দ্যাখো মরণ আমাদের সরে গেছে—

—কেন তুমি এলে ? কি আমি করেছি তোমার যে তারই প্রতিশোধ নিচ্ছো ?

—বলেছি তো সে কথা কেন এলাম,—অন্যায় তুমি করোনি বটে কিন্তু তোমারই তো সে পিতা !—প্রতিজ্ঞা করেছিলাম প্রতিশোধ নেবো,—তাই এসেছি।—আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, নন্দ শ্রেষ্ঠি তার প্রিয়তমা কন্যা-বিরহে শোক শয্যা গ্রহণ করেছে। পিতার ধনৈশ্বর্য্য সে সেদিন লুণ্ঠন করেছিলো—আর আমি আজ তার বুকের রক্ত শুষে নিয়ে চলেছি—শান্ত আমার বেশী উৎপল্।

—তা হোক্ কিন্তু চেয়ে দ্যাখো ঝড়ের নৃত্য থেমেছে —চারদিক পূর্ব্বের মতই শান্ত। এখনো সময় আছে, কেউ জানবে না।......আমি জানি তুমি সময়ে সময়ে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ো। নইলে এমন ঝড়ের রাতে আমায় নিয়ে এমন লক্ষ্যহীন হয়ে ছুট্‌বে কেন ?......সন্ধ্যা বেলার কথা মনে করো একবার! উত্তীয়—প্রিয়তম—ফিরে চলো।

সহসা উত্তীয়ের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া উৎপলবর্ণা তাহার ওষ্ঠাধরে স্বীয় অধর স্পর্শ করিলেন।

—হঠাৎ এ অভিনয় কেন উৎপল ?

—অভিনয় নয়,—ফিরে চলো বন্ধু। এমন সুন্দর জ্যোৎস্না—এই নিশুতি রাত—

—বৃথা অনুনয়, বৃথা অভিনয় উৎপল। আমার সঙ্কল্প আজ অটুট। আকাশের মেঘ কেটে গেছে—ঐ আব্‌ছায়া জ্যোৎস্নায় চারদিক ফুটে উঠেছে।......এই তো সুযোগ—রজনী শেষ হবার পূর্ব্বেই আমাকে আমার গন্তব্য স্থানে পৌছিতে হবে।......সম্মুখে ঐ যে সেই গভীর অরণ্যানী ......তার ধার দিয়েই বেসালির পথ।

—বেসালি!—আমায় কি তুমি তবে বেসালি নিয়ে চলেছো ?—তা পূর্ব্বে কেন বলনি আমায়!

—প্রয়োজন হয়নি।

—হুঁ, এতক্ষণে বুঝ্‌লাম—সন্ধ্যা বেলায় কেন সেই প্রেমের অভিনয়।......ছল করে আমায় তরণীতে উঠিয়ে নিয়ে তারপর......প্রতারক, কাপুরুষ।

—বৃথা তিরস্কার, আমার হৃদয় আজ কঠোর!

—কিন্তু একি নিদারুণ কলঙ্ক আমার—শ্রাবস্তীতে আর মুখ দেখাবো কি করে ?......কাল সূর্য্য ওঠ্‌বার সঙ্গে সঙ্গে যখন এই সংবাদটাই নগরের চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে যাবে যে এক অজ্ঞাত কুলশীল দরিদ্র যুবকের সঙ্গে শ্রেষ্ঠিকুমারী উৎপলবর্ণা নগর ত্যাগ করে গেছে—তখন, নাগরিক প্রধান নন্দ শ্রেষ্ঠির অভ্রভেদী সম্মান,—চিরোন্নত শির যে লজ্জায়, ঘৃণায়, দুঃখে মাটীর সঙ্গে মিশে পড়তে চাইবে। শতধিক্ সে দুহিতায়, যার জন্য পিতার—উঃ, সে কী মনস্তাপ।......উত্তীয়, উত্তীয় এ তুমি আমার কি করলে!

—বেসালিতে গিয়ে আমি তোমায় যথাবিধি বিবাহ করবো।

—ঠিক বলেছো।......তোমার পর্ণকুটীরে নিয়ে তার

অধীশ্বরী করে রাখ্‌বে। তা' না হ'লে এমন স্তব্ধ নিশীথে আমায় প্রতারণা করে আনবে কেন!

—তবে কি তুমি আমায় বিবাহ করতে অনিচ্ছুক?

শ্রেষ্ঠিপুত্রী নিরুত্তর রহিলেন।

—বলো উৎপল,—আমি শুনতে চাই।

—আগে ফিরে চলো, এখনো সময় আছে। নইলে আমি কিছুই ব'ল্‌বোনা।

—তবে তুমি স্বেচ্ছায় বেসালিতে যাবে না?

—না।

—বেশ।·· ···তবে শোনো উৎপল্‌, আমি তোমায় স্পষ্ট কথা বল্‌ছি—আমার পিতার সেই অপমানের প্রতিশোধ স্বরূপ আমি তোমায় চুরি করে নিয়ে চলেছি। এ ছাড়া অন্য সম্বন্ধ তোমার সঙ্গে আর নাই।

—অর্থাৎ আজ হতে আমি তোমার বন্দী হ'লাম।

—হ্যাঁ, অনেকটা তাই বটে।

—কিন্তু তা' বলে মনেও ভেবোনা উত্তীয়—আমি তোমার লালসার ইন্ধন যুগিয়ে, সামান্য একটা পর্ণকুটীরে এই অপমানের ব্যথা স'য়ে থাকবো।

—কি কর্ব্বে?

—তা তখনই দেখতে পাবে।

মানসিক উত্তেজনায় শ্রেষ্ঠিপুত্রী উত্তীয়ের বজ্র-কঠিন হস্ত হইতে নিজের হাতখানি মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া অবশেষে রোষে, ক্ষোভে তাহার পায়ের নিকটে অবসন্নের মত লুটাইয়া পড়িলেন।

(ক্রমশঃ)

——:০:——

নীলকণ্ঠ

—পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর—

"এত ভাবছ কেন বাবা? তোমায় কি এর মধ্যে ছেড়ে দেব ভেবেছ? তা দিচ্ছি না। ভগবান না করুন—যদিই তুমি চলে যাও—যতদিন জীবন থাকবে এই মাটীতে—সন্ধ্যা জাগাতে বসে থাকব। কেউ আমায় আমার মৃত্যুর আগে এ বাড়ী থেকে স্থানচ্যুত করতে পারবে না। তারপর আমিও যখন মারা যাব—এমনি একটা ব্যবস্থা করে রেখে যেও তুমি—যাতে গরীব দুঃখী এই ভিটার আশ্রয়ে বেঁচে থেকে আপনারাই গৃহদেবতার নিত্যকার পূজার যোগাড় করে দেবে!—এ বিষয়ের বিন্দুমাত্র ত্রুটী না হয় দেখবে।"

"ঠিক বলেছিস্‌ মা! গোপালের হাত থেকে বাঁচাবার এই একমাত্র উপায়। তাকে আমি এক পয়সাও দিয়ে যাব না। সমস্ত আমি তোর নামে লিখে দিয়ে যাব।—দরিদ্রনারায়ণের সেবা তোর হাতে ব্যাঘাত পাবে না বরং আমার চেয়েও তুই ভাল করে করবি। তোর হৃদয় আমি জানি। তুই বেঁচে থেকে দেবতার পূজা যথা নিয়মে পালন করে যাবি।"

"পূজার কোনই বিঘ্ন হবে না বাবা! তবে বিষয় তোমার নামে লিখনা। তাতে এর চেয়ে অনেক সর্ব্বনাশ হবে। ঠাকুরের নামে সমস্ত লিখে দাও। আমি তোমার প্রতিনিধি থেকে সেবা করে যাব। তাছাড়া—কিন্তু বাবা —এ সব বিষয়ে ভাববার এখানো অনেক সময়ে আছে। তোমার এরই মধ্যে পালালে চলবে না।······আজকের আসল কথাটা এখনো ঠিক হল না। আমার যাওয়া সম্বন্ধে—"

"না মা! যাওয়া হতে পারে না। তোকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। আর শোন গোপালকে একখানা

চিঠি লিখেছে—এই শেষ চিঠি আমার—আমি বিষয়ের বিলি-বন্দোবস্ত করছি। সে যদি এখনো ফিরে আসে—তাকে কিছু ভাগ দেব—নইলে এক পয়সাও সে পাবে না। আরও লিখে দে—এবারে চিঠির জবাব না দিলে, আমি তাকে চিরজন্মের মত ভুলে যাব।......বলতে পারিস্ মা বাপেদের মন বিধাতা কোন উপাদন দিয়ে গড়েছে? মুখে বলছি ভুলে যাবো...অথচ...ঠোঁট কেঁপে উঠছে...বুকের ভিতরটা দুলে উঠছে। অকৃতজ্ঞ সন্তান! সে বাপের হৃদয় অবহেলা ও ঘৃণা দিয়ে ভরে দিলেও তাকে অভিশাপ দিতে পারি না। একবার মনে হয়...ক্রোধের বিষে তাকে জর্জ্জরিত করে...কিন্তু দীর্ঘ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ফেলতে পারি না...ভয়ে যদি এরই সঙ্গে জলন্ত আগুন ছিটকে বেড়িয়ে তাকে পুড়িয়ে মারে।......কাঁদছিস মা? না আর বলব না। তোর কান্না দেখলে আমার নিজের কান্না শতগুণ বেড়ে ওঠে। চুপ কর! চুপ কর তুমি।"

"আশীর্ব্বাদ কর বাবা, তুমি আশীর্ব্বাদ করে যাও। অবোধ! কিন্তু একদিন যাতে বুঝতে পারেন...তুমি সেই আশীর্ব্বাদ করে যাও।"

"মালতী! মা! আশীর্ব্বাদ করছি সে ভাল হবে। আমি মারা গেলে নিজের ঘাড়ে সমস্ত ভার পড়বে, তখন সে আপনিই বুঝতে পারবে। কিন্তু......তার সে পরিবর্ত্তন আমি দেখে যেতে পারলে কত সুখী হতুম।"

—ষোল—

সুরথের শেষ চিঠি পাবার পর ছমাস অতীত হইয়াছে।

নীরজা পল্লীসমাজ বইখানা পড়িতেছিল। গোপাল আসাতে তাড়াতাড়ি বই রাখিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল "এই যে ঠাকুরপো! এস! আজ এত সকালেই যে...কি মনে করে?"

গোপাল উদাস কণ্ঠে বলিল "কিছু ভাল লাগ্‌ছে না বৌদি। আষাঢ়ের মেঘলা বাদল লেগেই আছে। মনটাও কি জানি কেন ভিজে মুচির মত স্যাঁৎ স্যাঁৎ করছে। আজ সকালটায় একটু ধরণ করেছে। ভাবলুম, তোমাদের সঙ্গে একটু গল্প গুজব করে তাজা হয়ে আসি। সুভাষ কোথায়?"

"তাকে একবার বাজারে পাঠিয়েছি। ঝিএর অসুখ করেছে—তাই! তা এসেছ ভালই হয়েছে। আজকাল কদিন থেকে ত দেখছি তুমি কেবল পালিয়ে পালিয়েই বেড়াচ্ছ। কি হয়েছে তোমার বল ত? দেখ এ রকমটা আর ভাল দেখায় না। একটা বিয়ে থা কর, ঘর সংসার পাতাও। আমরা দেখে সুখী হই।...বাপের খবর পেয়েছ?"

"না...হ্যাঁ,...পেয়েছি এক রকম! ভালই আছেন। আমার যেমন দুর্ভাগ্য দেশের লোকদের জ্বালায় এসময় বাবার কাছে থেকে সেবা করতে পারলুম না। গেলেই একঘরে করবে—বাবাকে পর্য্যন্ত! ডাক্তার কবিরাজ ধোপা নাপিত কেউ আর বাড়ী মাড়াবে না। প্রজারা খাজনা বন্ধ করে দেবে। বাবাকে লিখলুম কলিকাতায় এসে চিকিৎসা করাও তাও তিনি শুনলেন না......তারপর তোমাদের খবর কি? সুরথ আজও কোন চিঠি লিখলে না? ছমাস হয়ে গেল!"

"বরাত আমার! যেমন কপাল করেছি কেউত আর খণ্ডাতে পারবে না।"

"তা সত্যি! তবে খবর যখন নেই মনে হয়, হয়ত সে মারা গেছে। এরকম খুবই হতে পারে। তা না হলে—তাদের সঙ্গে অন্য যারা যুদ্ধে গিয়েছিল—প্রায় একে একে সবাই ফিরে আসছে। ভগবান না করুন—যদি মারাই যায়—!"

"না ঠাকুরপো—অমন আকাঙ্খা করনা—! খবর নেই, তবু বেঁচে আছে অমনি আশা করে থাকাও ভাল!"

"যাক্ সে কথা—দুটো পান দাও দেখি!"

"আমি এখনই সেজে আনছি। ততক্ষণ তুমি না হয়——"

"হাঁ—এই খবরের কাগজটা রয়েছে! আজকের ত?—দেখ, বেশী দেরী করনা। তোমার সঙ্গে দুএকটা বিশেষ কথা আছে—।"

গোপাল কাগজ পড়িতে লাগিল।

সুরথের কথা মত গোপাল নীরজাকে সাহায্য করিত। বরাবর সুভাষের স্কুলে পড়িবার খরচও দিয়েছে। সুভাষ এইবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

কোনও কলেজে এখনও ভর্ত্তি হয় নাই। অনেকদিনের পুরাণো এক ঝি ছিল সে নীরজার কাছে সকল সময় থাকিত। বুড়া হইয়া পড়িয়াছে। কাজ বিশেষ করিতে পারে না। সকাল ও বিকালে একবার করিয়া বাজার গিয়া জিনিষপত্র কিনিয়া আনিয়া দেয়। নীরজা সংসারের কাজ একাই করে। কাজের অবকাশে সময় কাটাইবার জন্ত গোপাল বাংলা ইংরাজী অনেক নাটক উপন্যাস কিনিয়া একটা আলমারী ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছে। সে নিজেও মাঝে মাঝে আসিয়া গল্প করে। গল্পের সময় কোন কোনদিন আধুনিক সমাজ, স্ত্রীশিক্ষা, নারীজাগরণ, বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহ এমনই সব সামাজিক প্রসঙ্গের আলোচনা উত্থাপন করিত। এই সব তর্কের মধ্য দিয়া গোপাল তাহাকে বুঝিতে চেষ্টা করে। তর্কের সময় নীরজা কিন্তু গোপালকে এত উঁচু করিয়া ভাবিত যে, সে যা বলিত কিছুতেই তার বিপরীত মত দিত না। নীরজার নিজের যেন স্বতন্ত্র ইচ্ছা বলিয়া কিছু ছিলনা। গোপাল তাহাকে যা বুঝাইত বিশ্বাস করিত—যা শেখাত শিখিত। নীরজার সেই পরনির্ভর মনের ভাবটীর সহিত গোপাল বরাবর এতদিন পরিচিত হইয়া আসিয়াছে। তার আসল স্বাধীন মনের ছবি সে একদিনও দেখে নাই।

কয়েক দিন হইতে গোপালের মনে আপনার অজ্ঞাতসারে নীরজাকে পাবার নেশা ধীরে ধীরে জাগিতেছিল। পিতার অথবা মালতীর কথা সে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের কারও কোন চিঠি আসিলে গোপাল তা খুলিয়া পড়িবার জন্ত আগ্রহও আর বোধ করিত না। ঝুরির মধ্যেই সব পড়িয়া থাকিত। মালতীর কথা নীরজাকে সে কখনো বলে নাই। গোপাল যে বিবাহিত এ কথা নীরজা জানিতে পারে নাই। দেশে যায় না কেন একথা কেহ গোপালকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে—সমাজের ভয়ে। নিজের মনের কাছেও হয়ত এমনই একটা মিথ্যা কৈফিয়ত সে দিয়ে এসেছে।

নীরজা চায়ের বাটী আনিয়া তাহার সামনে ধরিয়া বলিল "কাগজ উল্টো করে ধরে পড়ছ ত খুব দেখছি।.........কি এত ভাবছ বলত?"

গোপাল ছদ্ম হাসি হাসিয়া, মনের দুশ্চিন্তা ঢাকিতে চেষ্টা করিয়া বলিল "সুরথটার কথাই ভাবছিলুম। ভাল কি মন্দ—যা হক একটা খবরও যদি পাওয়া যেত?—

"এই এক কথাই কি কেবল তুমি ভাবছ? বোধ হয় গলগ্রহের ভার আর সইতে পারছ না?"

"না—না—সে কথা বলছি না। আমি কি একদিনও তোমায় গলগ্রহ বলে ভেবেছি? মনের আভাষেও কি কখনো তা জানিয়েছি?"

"তবে?"

"কিছু মনে কর না!—জিজ্ঞাসা করছি তুমি কি আজও তার প্রতীক্ষা করছ?"

"কেন? তাতে দোষ আছে? তুমি চাও কি নিত্যদিন আমি ঈশ্বরের কাছে তার মৃত্যু প্রার্থনা জানাব?"

"আমার দুর্ভাগ্য—তুমি আমায় আজও চিনলে না। বুঝেছি তুমি আমায় বিন্দুমাত্র ভালবাস না।"

গোপালের কথায় নীরজা শিহরিয়া উঠিল।

গোপাল বলিতে লাগিল "সুরথ আমার বন্ধু! আমার ভাই বলেই তাকে জানতুম। তাকে ফিরে পেতে হলে আমি আমার সর্ব্বস্ব এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি। কিন্তু যাকে ভালবাসি—তার স্থান আরও অনেক উঁচু। তোমার জন্য শুধু আমার প্রাণ দিতে পারি তা নয়! আমার এক জন্ম নয়—জন্ম জন্মান্তরের ধর্ম্ম কর্ম্ম পাপ পুণ্য—আমার ইহকাল পরকাল—সব লুটিয়ে দিতে পারি তোমার পায়ের তলায়…শুধু এক বিন্দু অনুকম্পা পাবার আশাতে…! তোমার জন্য আত্মীয় স্বজন ভুলেছি কত অভিশাপ মাথা পেতে নিয়েছি…"

"সেকি! এ সব তুমি কি বলছো ঠাকুরপো? আমি তোমায় ভালবাসি সত্যি… কিন্তু সে ভালবাসার মাঝে তোমার এ রকম কামনা জাগাবার মত সুযোগ দিই নি ত! আমি নিজেও একটা মুহূর্ত্তের জন্ত লোলুপ দৃষ্টিতে তোমার দিকে চাই নি। তুমিই ত এতদিন বলেছ… ভালবাসা স্বর্গের জিনিষ! তাতে পাপ নেই…কামনা নেই…মোহ নেই…। আকাঙ্ক্ষা না রেখে কামের বশীভূত না হয়ে ভালবাসতে হয়! আজ সব ভুলে এ সব কি তুমি বলছ? তোমার ভালবাসার

আদর্শ শুনে আমি যে তোমায় দেবতার মতো ভেবেছিলাম। ভালবাসা হৃদয়ের মিলন। স্বর্গের পারিজাতের মতই শুভ্র। কিন্তু কলঙ্ক মাখা বাসনার একটী মাত্র রেখা পাতে তার সমস্ত পবিত্রতা মলিন হয়ে যায়। আমি তোমারি আদর্শে তোমায় দেবতা বলে পূজা করে এসেছি। আজ তোমার এ রকম নীচ কামুক দৃষ্টি দেখে ঘৃণায় লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে। আমি যে তোমায় এর চেয়ে অনেক উঁচু ভাবতুম। তাইতে তোমার সাহায্য নিয়ে দিনের অন্ন মুখে তুলতে আমার একটুও বাধে নি! তাইতে তোমার আহ্বানে সাড়া দিতে...তোমার কাছে এসে বসে কথা কইতে...আমার একটি দিনের জন্ত লজ্জা বা সঙ্কোচ হয় নি। ছিঃ ছিঃ চলে যাও তুমি। তোমার নিশ্বাসে আজ আমার গা শিউরে উঠছে। না খেতে পেয়ে বরং মরব সেও ভাল। চলে যাও তুমি...যাও।”

গোপাল নীরজার কথা শুনিতে শুনিতে...প্রথমে বিস্মিত হইয়াছিল। তার এই অদ্ভুত তেজোময়ী মূর্ত্তি আগে কখনো চোখে পড়ে নি। গোপাল মুগ্ধ হইয়া এই অদ্ভুত অপূর্ব্ব শক্তির সামনে মাথা নত করিল। তার অন্তঃকরণ নীরজার পদতলে পূজার অর্ঘ্যের মত লুটাইয়া পড়িল।

গোপাল রুদ্ধস্বরে বলিল “বৌদি! মুখ তোল। কেঁদ না আমি তোমায় বুঝতে পারি নি। আর কখনো আমার ভুল হবে না। তুমি আমায় ক্ষমা কর। আজকের দিনটী তুমি আমায় ক্ষমা কর।”

“ক্ষমা করব। কিন্তু ভুলতে পারব না। তোমার আদর্শের তুমিই অবমাননা করেছ। এর পর আর কখনো আমার কাছে আসতে চেষ্টা ক’র না। তোমার দেওয়া অন্ন আর আমার মুখে রুচবে না। তুমি আমায় ভুলতে চেষ্টা কর। আমার হৃদয় থেকেও তোমার চিন্তা মুছে ফেলব। আমি ভিক্ষা করে খাবো...তবু...”

“বৌদি। মনে ক্ষোভ রেখে এরকম ক্ষমা আমি চাই না। তুমি আমায় ভুলতে চেও ভুলে যেও। আমিও তোমার কথা শুনে তোমার কাছে আর আসব না। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তোমার স্মৃতি আমার বুকে জেগে থাকবে। পাপ হোক পুণ্য হোক আমি তার বিচার করব না। তোমায় ভালবাসি এই মধুর আনন্দ যেমন চিরকাল আমার বুকে জেগে থাকবে তোমায় দাগা দিয়েছি এই ব্যথা-টুকুও জেগে থাকবে। আমি তোমায় মিনতি করছি—যদি ক্ষমা করতে পার মনে আক্ষেপ রেখনা।..... একটা কথা, আমার সাহায্য তুমি নেবে না—কিন্তু দিন কাটাবে কি করে? স্বভাবের পড়া—তারপর—”

“এই চলার একটা উপায় কিছু করে দিতে পার না তোমরা? মেয়েমানুষের স্বাধীন ও পবিত্র থেকে নিজের পরিশ্রমে জীবিকা অর্জ্জন করবার কোন পথই কি নেই? কিন্তু—ধ্রুব জানি,—ভগবানে বিশ্বাস রেখে চললে কিছুই আটকাবে না। আমার বিপদের সময় ভগবানের স্নেহ তোমার মধ্য দিয়ে দয়ার রূপ ধরে আমাকে রক্ষা করেছে। তিনি যদি মনে রাখেন—যেমন করে হোক দিনের উপায় জুটে যাবে। বুঝতে পারছি, তোমার সাহায্য আর নেব না, তাই মনে করে দুঃখিত হচ্ছ। কিন্তু একটা কাজ করতে পার? এইটুকু করলেও তোমার দুঃখিত হবার আর কোন কারণ থাকবে না। একটা হাসপাতালে শিক্ষিত ধাত্রী হিসেবে আমায় ভর্ত্তি করে দিতে পার যদি... তা হয় না কি?”

“হবে না কেন? তবে এর জন্যে কিছুদিন শিখতে হয় পড়তেও হয়। সেই সময়টুকু আমার সাহায্য নিতে কুণ্ঠিত হয়ো’ না। আমি সমস্ত ব্যবস্থা করে দেব’ খন। কাজটা খুবই ভাল—কিন্তু প্রলোভনও অনেক! আমার বিশ্বাস আছে—তোমার প্রকৃতি আমি যেমন জেনেছি—তাইতে বলছি—শত প্রলোভনও তোমায় টলাতে পারবে না। বেশ! আজই আমি খোঁজ নেব।”

“দুঃখ কর’না তুমি!”—নীরজার কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল। সে অশ্রুরুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিল “আমি তোমায় মন্দ বলেছি!—তোমার হৃদয়ে আঘাত দিয়েছি! কিন্তু আজকের পথ আমি কত দুঃখে কত মর্ম্ম বেদনায় বেছে-নিলুম—একদিন তুমি বুঝতে পারবে। তোমায়—ভালবাসি, এ আমার গৌরব! সেই গৌরবটুকু আমার—অক্ষুন্ন থাকুক——”

"বুঝেছি বৌদি! অকুণ্ঠিত চিত্তে তোমার সংকল্পের সমর্থন করলুম। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমার এমনি মনের জোর অটুট থাকুক!—চিরদিন তুমি নিষ্কলঙ্ক থাক?"

ক্রমশঃ

শ্রী......

ঘরে বাইরে

বড়দিনের ছুটী আসিয়া পড়িল। এইবার দেশের সুপুত্রগণের অনেকে কলিকাতা ছাড়িয়া আর একবার বিদেশ পাড়ি দিয়া আসিবার চেষ্টা করিবেন। রেল কোম্পানীর আয় বিভাগে লাভাংশ কিছু বাড়িবে। প্রতি বৎসরই ছুটির সময় রেলকোম্পানী বেশ একটা দাঁও মারেন। তাঁদের লাভের প্রায় সমস্ত টাকাটাই আসে 'থার্ড ও ইণ্টার ক্লাস' যাত্রীদের নিকট হইতে। ফার্ষ্ট সেকেণ্ড ক্লাসে কয়টা লোক আর যাতায়াত করে? অথচ এই 'থার্ড ও ইণ্টার' যাত্রীদের সুখ সুবিধার দিকে রেলকোম্পানী একেবারেই অন্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। ইহা লইয়া অনেক আবেদন নিবেদন হইয়া গিয়াছে কিন্তু কোম্পানীর অভিরুচি যথা পূর্ব্বং তথা পরং। গাড়ীর সংখ্যার সেই ন্যূনতা, ষ্টেশনে অত্যধিক জনতানিবন্ধন অসুবিধার অপ্রতিকার, '৩০ জন বসিবেক' চিহ্নিত কামরায় ৭০ জনের আমদানীতে আরোহীদের চলন্ত অন্ধকূপের দ্বিতীয় অভিনয়-প্রচেষ্টা কোন কিছুরই ব্যবস্থা ও প্রতীকার আজ অবধি হইল না। কোম্পানীর পরিচালকগণ ভুলিয়া যান, যাহাদের কল্যাণে তাঁহাদের ব্যবসা আজও চলিতেছে তাহাদের সুখ সুবিধার জন্য সচেষ্ট থাকা তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য। আমরা আর একবার এ বিষয়ে কোম্পানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

* * *

গত ১৮ই অগ্রহায়ণ বেলা ৪৷৷০ ঘটিকার সময় আমাদের পুরাতন কার্য্যালয় ৭৯।২৩ লোয়ার সার্কুলার রোডে ধূপছায়ার পক্ষ হইতে একটী প্রীতি-সম্মিলনীর অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। সম্মিলনীতে 'ধূপছায়া'র লেখক ও অনুগ্রাহক বর্গের ভিতর পরস্পর পরিচয় ও আদান প্রদানের যথেষ্ট সুযোগ মিলিয়াছিল। সঙ্গীত ও বাদ্যাদির দ্বারা সম্মিলনীকে আরও রমণীয় করিবার চেষ্টা করা হয়। সামান্য জলযোগের পর রাত আট ঘটিকায় সম্মিলনীর কার্য্য শেষ হয়।

সম্মিলনীকে সার্থক ও সুশোভন করিয়া তুলিতে সেদিন যাঁহারা কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের দ্বারা সমবেত সুধীবৃন্দকে আনন্দ দান করিয়াছিলেন, 'ধূপছায়া-সম্মিলনী'র পক্ষ হইতে আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

* * * *

আমরা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলাম—রায় বাহাদুর ৺গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সত্তর বৎসর বয়সে হিন্দুর পুণ্যপূতধাম বরাণসীর পবিত্র গঙ্গাসলিলে সজ্ঞানে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার নিষ্কলঙ্ক মনটী একদিকে যেমন নিরহঙ্কার ও পরদুঃখকাতর ছিল, অন্যদিকে তেমনি হিন্দুধর্ম্মের উজ্জ্বল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর হইল তিনি ক্ষেত্রসন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক কাশীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার দান যেমন উন্মুক্ত ও অজস্র ছিল তেমনি উপযুক্ত পাত্রেতেও তাহা ন্যস্ত হইত। প্রতি বৎসর শীতকালে তিনি দুঃখী দরিদ্রদিগকে দুইশত কম্বল দান করিতেন ইহা ছাড়া তিনি নিয়মিত কাঙ্গালী ভোজনও করাইতেন। অনেক দুঃস্থ ব্রাহ্মণ সন্তানকেও তিনি নিয়মিত মাসিক বৃত্তি দিয়া আসিতেছিলেন।

'ধূপছায়া'র অন্যতম পরিচালক শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কৃতী পুত্রদিগের ভিতর একজন। আমারা নৃপেনবাবু ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গের প্রতি আমদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

সওদা

"শনিবারের চিঠি"র সত্যবাদিতার একটী চমৎকার উদাহরণ পাওয়া গেছে। চিঠিওয়ালারা লিখ্‌ছেন—"গত মাসের শনিবারের চিঠিতে আমরা বনের পাঁঠাটির ছবি দিতে পারি নাই কারণ সেটি ছবি তুলিবার পূর্ব্বেই পলাইয়াছিল। 'বিচিত্রা'র কর্ত্তৃপক্ষেরা বহু পরিশ্রমে সেটির একটি চিত্র সংগ্রহ করিয়াছেন দেখিতেছি। তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ।"

তবে আমাদের কিন্তু অজ-"প্রবরে"র মগজ উষ্ণ বলে' বোধ হ'ল না। বরং তার হাসি-হাসি ফোলা-ফোলা মুখখানি ভালই লাগ্‌ল।

রবীন্দ্রনাথ কুন্তলকৌমুদী তেলের প্রশংসা করেছেন,—এবার করেছেন মোহিতলালের।

মহিষ্‌ছাল মাগ্‌নদার,
"কন্ধে-ঢাল্‌-সাজ্‌-আবার"।

সজনী-কণ্ঠে আজকাল খুব "সীৎকার" শোনা যাচ্ছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কি বলেন? কবিরাজী বিজ্ঞাপনে "বীর্য্যবর্দ্ধক" কথা থাক্‌লে তা ছাপ্‌তে তাঁর নীতিজ্ঞানে আঘাত লাগে, কিন্তু তাঁরই প্রেস থেকে তাঁরই কর্ম্মচারী এ সব কী ছেপে বা'র কর্‌ছে?

তাঁর উত্তর হয়ত এই— বিষস্য বিষমৌষধম্‌। ঐ কাগজে তাঁরও একটি লেখা থাক্‌লে মন্দ হয় না।

রবীন্দ্রনাথ প্রান্‌সিউস্‌ জাহাজে বসে' অনেক কিছুরই খবর রেখেছেন দেখ্‌ছি—মোহিতলালের পৌরুষ, তাঁর কথায় তাল-ঠোকা পাঁয়তাড়া-মারা পালোয়ানির অভাব, ইকনমিক্‌সের অধ্যাপক, দরিদ্রনারায়ণ, সাহিত্যে নবব, যাঁরা ভালো রকম উপার্জ্জনও করেন, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকেন তাঁদের দেশের দারিদ্র্যকে সাহিত্যের নূতনত্বের ঝাঁজ বাড়াবার জন্য ঝাল্‌মস্‌লার মতো ব্যবহার করবার চেষ্টা, তরুণ লেখকদের নৈতিক চিত্তবিকার, পাঁক, ডিগ্‌বাজি-খাওয়া বাঁকাচোরা ভাষা,—সবই। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে অজ্ঞ—এ ধারণা করবার আর এতটুকু হেতু নেই।—

তবে তুচ্ছ ও মহতের, ভালো ও মন্দের, কাঁকর ও পদ্মের ভেদ নিয়ে একটা প্রশ্ন "পরম্পরায় তাঁর কানে উঠ্‌ল।" জাহাজে এমন একটা কথা কি করে' তাঁর কানে উঠ্‌ল সেটা সুনীতি বাবু গবেষণা করে' দেখ্‌লে পারেন। তবে অমন একটা ভেদের প্রশ্ন উঠেছে বটে, কিন্তু তা ২৩শে আগষ্টের বহু পরে।

ঐ তারিখটা বোধ হয় প্রবাসীর ছাপ্‌বার ভুল।

কবিকুলগুরু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বাইরের নিত্য মুখরকে দূর থেকে নমস্কার করে' নিরাপদে চলে' গেছেন। ক্ষণকাল-বিহারী আধুনিক সাহিত্যের উপস্থিত গরজের দাবী অত্যন্ত উগ্র ব'লেই তার হট্টগোল সব চেয়ে বেশি শোনা যাচ্ছে!

এই কথাই ভাবি, "কলমের আব্রু" কি আজই হঠাৎ ঘুচে গেল? চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলম কি বরাবর আব্রু বাঁচিয়ে চলেছে? দরিদ্রনারায়ণের তিলক না থাক্‌লেও তাঁর ললাটে ত' পঙ্কতিলক কাটা ছিল। তিনি রবীন্দ্রনাথের থেকে গল্পের প্লট্‌ও যেমন দু'হাত পেতে নিয়েছেন তেম্‌নি মাথা পেতে আশীর্ব্বাদও কুড়িয়েছেন। তাঁর চিত্ত-বিকার সম্বন্ধে তাই কোন কিছু রবীন্দ্রনাথের কানে ওঠেনি। তিনি উৎরে গেছেন।

গল্পই সব,...গল্পের নামটা কিছু নয়। লাউটাই সব লাউয়ের বোঁটা দিয়ে কি হবে? তবে লাউয়ের বোঁটা নিতান্ত হাল্‌কা হ'লে লাউটা মাটিতে ছিঁড়ে পড়ে' ভেতো হয়ে যেতে পারে।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একজন ভাষাতত্ত্ববিৎ… কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ রকম একটা জনশ্রুতি আছে। তাঁর নীতিজ্ঞানও শুনেছি টনটনে। তাঁর মাতৃভাষাজ্ঞানের কিছু নমুনা দিলে মন্দ কি ?…

অনামী সেপাইরা চলেছে—চীনেম্যানের মত চেহারা, বেঁটে-গড়ন, দেখ্‌তে ছেলে-মানুষ ছেলে-মানুষ—হঠাৎ খাকী উর্দ্দীতে পাতলা দুবলা গোছের গুর্খা বলে' ভ্রম হয়, কিন্তু গুর্খার শরীরের দার্ঢ্য, তার ধীর পদক্ষেপ আর লা-পরওয়া চাল কিছুই নেই।……দু-একজন হুদেদারের মাথায় আমাদের কল্‌কাতার ট্রামগাড়ী টিকিট পরিদর্শকদের টুপীর মতন টুপী……বড়ো বড়ো নোংরা নখওয়ালা হাত নেড়ে নেড়ে……জবরদস্ত আরবের দেশে এরা কি সেপাইয়ত্ব কলিয়েছিল……স্বদেশের কতকটা তাসের মতন কি এক অজ্ঞাত খেলা সেটা খেল্‌ছে……এদের সঙ্গে ফরাসীতে আলাপ করি……আলাপ করে……ভাষা লেখে……আনামী আর ফরাসী লোকেরা চাঁচ-পুছ করে' শেষ করে' দেয়……ছুটো করে' ঠোঁটে কলা,……খিদের পেট যখন চুঁই চুঁই করে……চটান সিঁড়ি……ছোক্‌রা রোগা লিকলিকে……মার্টর্ম্মন্য……দুঃখু জানালে……ভ্যাঁ-ট্যাঁ হচ্ছে কেমন,……তারিয়ে তারিয়ে খাই……খোব-পোষাকী বাজিয়ে… দার নাকের নাকছাবিটি পর্য্যন্ত…এঁর মাকে কি সৌষ্ঠবশালিনী আত্ম-মর্য্যাদায় পূর্ণ দেখাচ্ছিল……একটি ছোক্‌রা ফরাসী সেপাই কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, বোধহয় জাহাজের গতিবেগেই হবে মেয়েটা চল্‌তে চল্‌তে তার গায়ের ওপর ধাক্কা দিয়ে পড়ল,—কিন্তু, "হাসিল রমণী মধুর টচ্চ হাসি"…মুখে মদের গন্ধ যত সব ফরাসী সেপাই,—আর মেয়েটি যখন চলে' যাচ্ছিল দু একজন অস্ফুটস্বরে ফরাসীতে বলে' উঠলো—',এটা মন্দ নয় হে।"…একটা বড়ো কথা বলে রাখি—নারী দেহের তৌলপাতের স্বাভাবিক অসামঞ্জস্য……স্থুলোর্দ্ধ স্থুলমধ্য আর সূক্ষ্মনিম্ন……সাড়ী বা ঘাঘরার অবধেষ্ট জঙ্ঘা ও চরণযুগলকে ঢেকে তাদের আবশ্যক পূর্ত্তি দিয়ে… এমন মনোহর ভঙ্গীতে স্ত্রী-শরীরের মধ্যে অবিদ্যমান উর্দ্ধাধঃ-সুষমাটিকে আনে……উপরভারী দোষ এসে গিয়েছে……সারাদিন ধরে' জাহাজে বসে' বসে' ফরাসী মেয়েদের এই খাটো হাঁটু-ঝুল ঘাঘরা পরে' খটখট করে' বেড়ানো দেখতে হচ্ছে (চশমার powerও বেড়ে গেছে নিশ্চয়)—এই পোষাক যতই দেখি ততই মনে হয় যে নারী দেহের কুশ্রীতম প্রকাশ যেন এর দ্বারা হচ্ছে……ভোরে যখনি কোনও স্থূলকায় মহিলা এই ছোটো ঘাঘরা পরে' হাঁটু পর্য্যন্ত নগ্ন পদদ্বয়কে প্রদর্শন করে' সাম্‌নে দিয়ে যাওয়া-আসা করেন, অথন পিছন থেকে পদদ্বয়ের মেদবাহুল্য কখন বা পেশী বাহুল্য গুর্খা সেপাইয়ের স্ফীত দৃঢ়পেশী পা-কে স্মরণ করিয়ে দেয়।…..এটা কি নোতুন একটা সুরুচির যুগের সন্ধিক্ষণ ? রহস্যালাপ করতে করতে যাওয়া চল্‌ছে……তাঁকে আর তাঁর কন্যাকে ধীরেনবাবুকে ডেকে এনে তাঁর এস্‌রাজ শুনিয়ে দিলুম…

আধুনিক কথা-সাহিত্যিকদের রচনারীতির অবিকল নকল বল্‌তে হবে। তেমনি ড্যাস্‌এ ভর্ত্তি, অতীতকে বর্ত্তমান কাল দিয়ে বোঝান, তেমনি প্রাদেশিকতা, ও অদ্ভুত বানান। তিনিও নতুনের মোহে পড়েছেন দেখ্‌ছি।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিত্রবহা' নামে একখানি উপন্যাস বেরুচ্ছে। তাতে রসালো কামকেলিবর্ণনা আছে। তা কি শনিবারের চিঠির দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি ? না তাঁর সঙ্গে পিওনদের বাধ্যবাধকতা আছে,…তাই।

শ্রীউপেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এতকাল উপন্যাস লিখে কিছুই করতে পারলেন না দেখে এবারে কবিতা নিয়ে পড়েছেন। খেয়ালিস্নাই বটে।

রবীন্দ্রনাথের পরেই প্রবন্ধ রচনায় কেউ যদি "সংযম" দেখিয়ে থাকেন ত' একমাত্র শ্রীকালিদাস রায়!

যেমন গল্প রচনায় সংযম দেখিয়েছেন শ্রীফণীন্দ্র পাল।

Printed & published by Sj. Nripendra nath Banerjee from the Bela Printing Works,
14, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta.

কার এণ্ড মহলানবিশ

সর্ব্বপ্রকার খেলার সরঞ্জাম ও

গ্রামোফোন বিক্রেতা

ফুটবল, হকি, টেনিস ও সর্ব্বপ্রকার গ্রামোফোনের

সচিত্র তালিকার জন্য পত্র লিখুন

(চৌরঙ্গী, কলিকাতা)

ART WITHIN THE REACH OF ALL !!!

LITTLE BOOKS ON ASIATIC ART

A CHEAP SERIES OF POPULAR BOOKS ON ALL PHASES OF ORIENTAL ART UNDER THE EDITORSHIP OF

Mr. O. C. GANGOLY. Editor "Rupam"

Each volume to contain a General Introduction, Description of Plates, & Bibliography, with 20 to 25 reproductions of representative. Examples carefully selected and artistically executed, specially suitable for students and the general public. Size 7″ × 5″

TITLES OF FIRST FEW VOLUMES:

SOUTHERN INDIAN BRONZES	THE ART OF JAVA	INDIAN ARCHITECTURE
23 Illustrations	Double Volume	
	About 60 Illustrations	About 50 Illustrations
Price Rs. 2/4	Price Rs. 4/8	Price Rs. 3/

Ready in November.

TITLES OF VOLUMES IN PREPARATION:—
Mussalman Calligraphy, Islamic Pottery, Japanese Colour Prints, Chinese Sculpture

ORDERS REGISTERED BY

MANAGER : "RUPAM"

6, Old Post Office Street, Calcutta.

কি ছিলাম!—
কী হয়েছি!
ভাঙ্গা শরীর শোধরাতে
সুরবল্লীর মত কেউ না।
সুরবল্লী কষায়
বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।
সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ,
২৯. কলুটোলা
কলিকাতা।
AD.IN

ধূপছায়া

সম্পাদক— শ্রীবেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়— শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

প্রতি সংখ্যা ।০ আনা। বার্ষিক ৩।৵০ আনা।

বড় দিনের বাজারে কিস্তিবন্দী বন্দোবস্তে

"রীগ্যাল অর্গ্যান"

ফোল্ডিং মডেল একমিনিটে মুড়িয়া ভ্রমণোপযোগী বাক্সে বন্ধ করা যায়। গঠন পারিপাট্যে যেমন বৈচিত্রময় তেমনি স্বরুচিপ্রকাশক। স্বরমাধুর্য্যে ও স্থায়িত্বে অতুলনীয়।

ক্রয় কালীন—৫০৲ } মূল্য
বাকি ৫মাসে ২০৲ হিঃ ১০০৲ } ১৫০৲ মাত্র।

সচিত্র ক্যাটালগের জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন :—
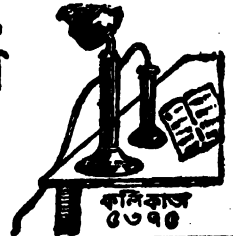
এন্. বি. সেন এণ্ড ব্রাদার্স

গ্রামোফোন ও বাদ্যযন্ত্রের সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত দোকান

১-সি বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

কলিকাতা হোটেল লিঃ

মির্জ্জাপুর স্কোয়ার নর্থ, কলিকাতা।
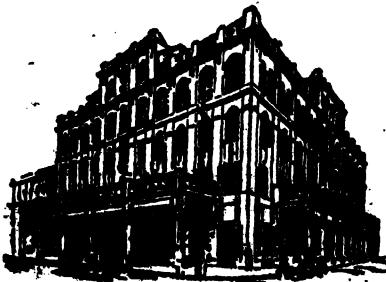
মফস্বল হইতে আগত রাজা, মহারাজা, নবাব, জমিদার এবং সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণের বসবাসের আদর্শ নিকেতন।

প্রাসাদ তুল্য নূতন পঞ্চতল অট্টালিকা, দক্ষিণে উন্মুক্ত ময়দান, বৈদ্যুতিক আলো ও পাখা এবং মূল্যবান আসবাবে সুসজ্জিত গৃহ, উৎকৃষ্ট আহারের ব্যবস্থা সকলকেই তুষ্টি দান করিবে।

চব্বিশ ঘণ্টা জল সরবরাহের জন্য মোটর-পাম্প এবং সকলের সুবিধার জন্য টেলিফোন সংযুক্ত আছে।

[illegible] দৈনিক চার্জ্জ [illegible] ৩৲, ৬৲, ৮৲ ও [illegible]

[illegible]

এ, সি, কর্ম্মকার

৬৯, মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখানে যাবতীয় প্রকারের ঘড়ি ও চশমা বিক্রয় করি এবং চক্ষু পরীক্ষার দ্বারা চশমা দিয়া থাকি ও সকল ঘড়ি সুন্দর ভাবে মেরামত করিয়া থাকি।

জারমেন টাইম পিস—	...	২।০
সুইস রিষ্টওয়াচ—	...	৫৲

(গ্যারান্টি ২ বৎসর)

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ডি, সলিন্ এণ্ড কোং।

৬৯ মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(কলেজ স্কোয়ারের নিকট।)

আমরা সকল রকম সাইকেল, ষ্টোভ, সেলাইয়ের কল, ডে-লাইট, ইলেক্‌ট্রীক প্রভৃতি জিনিষের সরঞ্জাম বিক্রয় করি ও সুলভ মূল্যে সুচারুরূপে মেরামত করি এবং ক্ষুর, কাঁচি ও ডাক্তারি [illegible] মেসিনে সান, পালিস ও নিকেল প্লেটিং করিয়া থাকি।

বিষয় সূচী

বিষয় সূচী

বিষয় সূচী

ধূপছায়ার নিয়মাবলী

মূল্য—

ধূপছায়ার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩।৵০ ও যান্মাষিক ১৸০, প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। নমুনার মূল্যও ।০ আনা। বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ধূপছায়ার বৎসর গণনা করা হয়। মূল্যাদি কার্য্যাধক্ষের নামে পাঠাইতে হয়। ভিঃ পিঃতে কাগজ পাঠাইতে অনেক অসুবিধা সুতরাং আগে মণিঅর্ডারে টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হইলে, আমাদের ও গ্রাহকদের সকলেরই সুবিধা।

অপ্রাপ্ত সংখ্যা—

ধূপছায়া প্রতি বাংলামাসের ১লা প্রকাশিত হয়। সুতরাং কোন মাসের কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া ডাক বিভাগের উত্তরসহ সেই মাসের ১০ই তারিখের মধ্যে আমাদের নিকট অপ্রাপ্তি সংবাদ পৌছান আবশ্যক।

পত্রোত্তর—

রিপ্লাই কার্ড বা ডাকটিকিট না পাঠাইলে কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব নয়।

রচনা—

সকল রচনা সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। টিকিট দেওয়া থাকিলে অমনোনীত রচনা গল্প কবিতা ফেরৎ দেওয়া হয়। রচনা কেন অমনোনীত হইল তৎসম্বন্ধে সম্পাদক কোনও উত্তর দিতে অসমর্থ। ফেরৎ রচনাদি লেখকদিগের নিকট পৌছান সম্বন্ধে আমরা দায়ী নহি। কাগজের এক পৃষ্ঠায় মার্জ্জিন দিয়া ফাঁক ফাঁক করিয়া পরিষ্কার অক্ষরে রচনা না পাঠাইলে প্রকাশিত না হইবারই বেশী সম্ভাবনা।

বিজ্ঞাপন—

কোনও মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বের মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হয়। বিজ্ঞাপন বন্ধ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ব্লক ফেরৎ লইবেন। ব্লক কোন প্রকারে ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই, যদিও ব্লক যাহাতে না ভাঙ্গে সে সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন লওয়া হইয়া থাকে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিজ্ঞাপনে হার নিম্নে দিলাম।

নিবেদক—কার্য্যাধ্যক্ষ—**ধূপছায়া**।
কার্য্যালয়—১৪নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

আশ্বিন মাস হইতে "ধূপছায়া"র কলেবর বৃদ্ধি হওয়াতে বিজ্ঞাপনের হারের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিল।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রথম কভারের অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	...	...	৩০৲ টাকা
দ্বিতীয় ,, পূর্ণ ,,	...	...	৩০৲ টাকা
,, ,, অর্দ্ধ ,,	...	...	১৬৲ টাকা
তৃতীয় ,, পূর্ণ ,,	...	...	৩০৲ টাকা
,, ,, অর্দ্ধ ,,	...	...	১৬৲ টাকা
চতুর্থ ,, পূর্ণ ,,	...	...	৫০৲ টাকা
সাধারণ ,, পূর্ণ ,,	...	...	১৫৲ টাকা
সাধারণ ,, অর্দ্ধ ,,	...	...	৮৲ টাকা
,, ,, সিকি ,,	...	...	৫৲ টাকা
সূচীর নীচে অর্দ্ধ ,,	...	...	১০৲ টাকা
,, ,, সিকি ,,	...	...	৬৲ টাকা
টাইটেল পৃষ্ঠার সম্মুখের পৃষ্ঠা	...	...	১৬৲ টাকা
আরম্ভের সম্মুখের পৃষ্ঠা	...	...	১৬৲ টাকা

নিবেদক—
কার্য্যাধ্যক্ষ—ধূপছায়া।

(মাসিক সাহিত্য পত্রিকা)

প্রথম বর্ষ, ২য় খণ্ড ৫ম সংখ্যা

মাঘ, ১৩৩৪ সাল

সম্পাদক

শ্রীরেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

পরিচালক

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীপ্রণবদেব মুখোপাধ্যায়।

ধূপছায়া কার্য্যালয়

১৪নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"দস্যুকবলে যাদব-রমণীগণ"

হিজ, হাইনেস টেহরী-গাড়ওয়াল মহারাজার সৌজন্যে।

Bela P. W.

[মাঘ ১৩৩৪]

ওরা শুধু করে উপহাস

—শ্রীবুদ্ধদেব বসু

ওরা শুধু করে উপহাস,
কুঞ্চিত করিয়া ভুরু হাসে অবিশ্বাসে।
বলে, 'এক পহরের নেশা এযে পহলি বয়সে,
তা'র চেয়ে বেশি কিছু নয়।
মদের নেশার মত ক্ষণিকের গোলাপী আমেজ,
আগাগোড়া মিথ্যা দিয়ে গড়া,
মাটির বুকের তলে গাড়ে নি শিকড়!'

ওরা সবে এই কথা বলে—
বলে, আর হাসে অবিশ্বাসে
বাঁকায়ে ঠোঁটের কোণ, কুঞ্চিত করিয়া দুই ভুরু।

আরো বলে, 'এর শোভা রঙ্‌চঙে রামধনু যেন,
ভরা বয়সের গুণে মনের আকাশে ওঠে ফুটে,'
কি আর বিচিত্র ইথে!
পলক ফেলিতে, হায়, মিলায় সে ছবি,
কিছু তা'র থাকে নাকো বাকী!

হাল্‌কা, ঠুন্‌কো যেন চক্‌চকে কাচের বাসন,
মূর্খ লোকে কেনে বটে ঢের দাম দিয়ে,
দু'দিনেই ভেঙে যায় তবু।
এ শুধু রূপের মোহ, দেহের কামনা,
সূর্য্যাস্তের আভা-সম মায়ার স্বপন—
একে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি!
একে নিয়ে এত হাসি, এত কান্না এত, হৈ-চৈ—
এরি নাম—ছি-ছি,—বলি শিহরিয়া ওঠে,
লজ্জায় ঘৃণায় যেন।
বলে পুন, 'কিছু নাই এর চেয়ে বাজে বুজরুকি,
অসহ্য এ ভান ও ভণ্ডামি,
ন্যাকামির প্রচণ্ড এ-ঠাট্‌'।
এত বলি শোয় পাশ ফিরে,'
চুপি-চুপি বলে "কাছে এসো নাগো সরে"—
তারপর—
তারপর চলে সত্য-সাধনের পালা—
সে-কাহিনী নাই-বা বলিনু।

(তাহারি পাশের ঘরে ভূ-শয্যায় এলায়িতা তনু,
বিনিদ্রা, বিধবা মেয়ে ফেলে দীর্ঘশ্বাস।
আরো কিছু দূরে—
দু'হাতে ঢাকিয়া মুখ প্রাণপণে
কান্না রোধে আরো একজন।)

যা বলে বলুক ওরা, আমি তা'তে দিই নাকো কাণ;
এ যে কত বড় সত্য, আমি তাহা জানি,
আর জানে মোর ভগবান।
তিনি যে জানেন তাহা ভালো করে' জানিয়াছি আমি।
তাই তো নানান্ ছলে আশীর্ব্বাদ করে' যান্ তিনি,
'আরো যেন দুঃখ পাও, আমিও যে বড় দুঃখী ভাই'—
আবার নিজেই তিনি পাঠান্ সান্ত্বনা
রজনীর তারার নয়নে,
শরতের শেফালির মধুর অধরে,
শিশিরের শীতল পরশে।
ক্ষান্ত হন্ নাই তিনি শুধু বক্ষে অগ্নি জ্বেলে মোর,
দুই চক্ষে দিয়াছেন জল,
হৃদয়ে দেছেন আর্দ্র, পেলব নম্রতা,
কণ্ঠে দিয়াছেন গান।
তাই মিতা মনে হয় সর্ব্ব-মানবেরে,
মধু মনে হয় এই মাটি।
এ যে কত বড় সত্য, আমি তাহা জানি,
এই যে অপার দুঃখ, অসীম বাসনা,
অকারণে সব-কিছু ভালো-লাগা—
আপনারে নিঃস্ব করি' নিঃশেষে এই যে বিতরণ
সহস্রের মাঝে—
এই যে আনন্দ, যাহা আপনাতে আপনি সার্থক,
এরি নাম বুঝি ভালোবাসা—
বুঝি এরি লাগি এত হাসিকান্না যুগ-যুগান্তর!

ওরা তো অনেক-কিছু বলে,
তা'তে কার কিবা আসে যায়?
ওরে মন, তাহাদেরো ক্ষমা করো আজ,
অভাগ্য উহারা কভু পায় নিকো প্রেমের আস্বাদ,
তাই শুধু বিসম্বাদ করে—
মিথ্যা বলি' করে বৃথা কলঙ্ক আরোপ।
এ যে কত বড় সত্য, জানো তুমি, জানে তব প্রাণ,
আর জানে তব ভগবান॥

—:o:—

ফল্গু

—————শ্রীপ্রণব রায়

গলির শেষ-প্রান্তে খাপ্‌রার ঘর দু'খানা ভাড়া লইয়াছে ছিদাম।......মিশ্‌কালো কদাকার চেহারা। অন্ধকারে হঠাৎ দেখিলে ভয় হয়!

ছিদাম মাণিকতলা বাজারে মাছ বেচে।

অতি প্রত্যুষে বাহির হইয়া যায়—বেলা দুপহরে ঘরে ফেরে।

সংসারে শুধু বৌ সুন্দরী।

সুন্দরীই বটে!

ছোটলোকের ঘরে অমন সুন্দর মুখ দুর্ল্লভ।

বয়সটা উনিশ কুড়ির মধ্যেই।

গোলগাল গড়ন।

দেহখানি যৌবন-বিকশিত।

বর্ণ টা উজ্জ্বল শ্যাম—বেশ একটা স্নিগ্ধ শ্রী মাখানো।

কিন্তু রূপসী সোমত্ত বৌকে নিয়া ছিদামের প্রাণে একদণ্ডও সোয়াস্তি নাই—

বলে, মেয়েমানুষের রূপ-যৌবনকে বিশ্বেস নেই......ও সব করতে পারে·· ···

বৌকে খুব কড়া-শাসনে রাখে।

আদর-সোহাগ দিলে বৌ নাকি বিগড়াইয়া যাইবে!

সুন্দরী তাই অন্তরে উপবাসী।

যৌবনোৎসবের প্রতি স্বামীর নির্ম্মম উদাসীনতাটুকু এই নব-যৌবনাটীর বুকে কাঁটার মত বেঁধে।

সখ করিয়া কোনদিন হয় তো সে রঙ-করা শাড়ী পরে ......খোঁপায় ফুল গোঁজে......

ছিদাম মুখ বেঁকাইয়া বলে, বিবিয়ানার ঢং শেকা হচ্চে···

ম্লান মুখে সুন্দরী সব খুলিয়া ফ্যালে।

সোহাগের দুটো মিষ্টি কথা—

মন যে শুধু ইহারই পিয়াসী!

......তাও তার পোড়া কপালে জোটে না।

ওই তো পট্‌লি, টগর·· ···স্বামীর কত আদর পায় ওরা!

কত সাধ আহ্লাদ!

আর সে......

অন্তরের অতৃপ্তিটুকু গোপনই রহিয়া যায়!

সহদেব ও-পাড়ায় নবাগত।

ছিদামের পাশের ঘরখানা এতদিন অব্যবহৃত পড়িয়া ছিল। পচা-ঘায়ের মাংসের মত জীর্ণ দেয়াল হইতে মাটি খসিয়া পড়ে।......ছিটে-বেড়ার গায়ে নতুন করিয়া মাটি লেপিয়া সহদেব একদিন আসিয়া সেখানে আস্তানা পাতিল।

সহদেব পূর্ব্বে ঠিকা-চাকরের কাজ করিত।

অবসর সময়ে ঘুগ্‌নি-দানাও বেচিত।

তখন সে থাকিত ডালিম তলার বস্তিতে।—কিন্তু বস্তি ভাঙ্গিয়া এখন সেখানে পাকা ইমারৎ তৈরী হইতেছে।

সেইজন্যই খালপারে আসা।......

পরের চাকরী করাও আর পোষায় না!

এখন সে মাণিকতলা বাজারের পসারী—

পটলের সময় পটল বেচে, বেগুণের সময় বেগুণ।

বেশ জোয়ান ছোক্‌রা।......

ভারি ফুর্ত্তিবাজ, সৌখিন।

পরণে ফুলপাড় ধুতি, গায়ে ডোরা ছিটের ফতুয়া।

ঘাড়ের চারিপাশে বেমালুম ক্ষুর বুলানো। কিন্তু কপালের ওপর লতায়িত কেশগুচ্ছ সর্ব্বদাই পরিপাটী।

হরদম্‌ বিড়ি ফোঁকে।

কিন্তু খাল পারের বস্তিবাসী তার আরো একটী সৌখীনতার পরিচয় পাইল।

সেদিন সন্ধ্যার পর চাঁদ উঠিয়াছিল।......

সহদেবের ঘর হইতে হঠাৎ ভাঙ্গা হারমোনিয়ামের বেসুরো আওয়াজ শোনা গ্যালো—

সঙ্গে সঙ্গে সাধা গলার বিরহ গীতি!

……এমন চাঁদ্‌নী রাতে সই—

আমার মনের মানুষ কই… ..

সহদেব গায় বেশ। ডালিম-তলায় আগে কি বছর শ্রীশ্রীশীতলা পূজার রাত্রে যাত্রা হইত। 'মদন ও রতি'র গানে সে মদন সাজিত!

সুন্দরী তখন ভাত চড়াইতেছিল।

সহদেবের গান তাকে আন্‌মনা করিয়া দিল। দাওয়ায় আসিয়া সে অকারণে চুপ করিয়া বসিল—

……বাইরে তখন জ্যোৎস্নার ম্লান আভা……

বাজারের পথে দেখা—হঠাৎ।

অন্ধকারের কুঁড়ি ফাটিয়া সবে আলোর ফুল ফুটিয়াছে। ময়লা-ফেলা এক্কাগুলো ঝন্ ঝন্ শব্দে চলিয়াছে। সদ্য-নিদ্রোত্থিত শহরের ঘুমের জড়িমা তখনও কাটে নাই।

মাছের বাজ্‌রা মাথায় সুন্দরী যাইতেছিল বাজারে—

ছিদামের আজ জ্বর।……রূপের-ডালি সোমত্ত বৌটাকে বাজারে পাঠাইতে তার আদৌ ইচ্ছা ছিল না।

কিন্তু নিরুপায়! পেটের ভাতের যোগাড় করিতে হইবে তো!

পেছনে আসিতেছিল সহদেব।

গলির মধ্যে আব্‌ছা-আলোয় ভালো ঠাওর হয় না। বড় রাস্তায় আসিতেই সহদেব দেখিল—ফুলন্ত-লতার মত ফুটন্ত-যৌবনা একটী মেয়ে। তারই প্রতিবেশিনী।

কি ভাবিয়া সে একটু মেকী কাশিল।

সুন্দরী ফিরিয়া চাহিল—

তারপর মুখ ঘুরাইয়া, আঁচল দোলাইয়া চলিয়া গ্যালো।

তা'র যৌবনের লাবণ্য……

চলনের ভঙ্গিমা……

সহদেবের মুগ্ধ চোখে ভারি সুষমাময় ঠেকিল। আপন মনেই তারিফ্‌ করিয়া উঠিল, বাঃ, বেড়ে তো!

পরিচয়ও তেম্‌নি হঠাৎ—

বস্তির সরকারী-কলতলায় ঝগড়াঝাঁটি লাগিয়াই আছে!

সহদেব সেদিন আগে বাল্‌তি পাতিয়াছে।

এমন সময় বাল্‌তি হাতে সুন্দরী আসিয়া হাজির। কল 'জোড়া' দেখিয়া তার গা' জ্বলিয়া গ্যালো।

ঝঙ্কার দিয়া বলিল, যখুনি আসব, তখুনি কল 'জোড়া'… …আমার যেন ঘরের কাজ কিছু নেই……জল নিতে এসে সারাদিন দাঁড়িয়েই থাকি আর কি!……

তাড়াতাড়ি আসিয়া সহদেব বাল্‌তি সরাইল।

মৌন চাউনি তার বারম্বার ক্ষমা চাহিল।

বাল্‌তি যে সহদেবের সুন্দরী তা' জানিত না—

কেমন একটু অপ্রতিভ হইল।

উদাসীন ভাবে বলিল, থাক্, থাক্, আর সরাতে হবে না ……ভরুক্ না……

সহদেব মৃদু হাসিল।

বিদ্যুৎবর্ষী কটাক্ষ হানিয়া সুন্দরী মুখ ঘুরাইয়া লইল।

এম্‌নি করিয়াই আলাপ সুরু……

পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয়।

সহদেবের ভারি গায়পড়া স্বভাব।

ছিদাম না থাকিলে আসিয়া বলে, সুন্দরী, একটু দোক্তা দেনা মাইরি……

সুন্দরী মুখ-ঝামটা দিয়া বলে, দোক্তা ভারি সস্তা, না?

কিন্তু আঁচলের খুঁট খুলিয়া দেয় একটু।

সহদেব তার মুখ ঝাম্‌টাকে ভয় করে না।

মুচকি হাসিয়া, কটাক্ষ হানিয়া চলিয়া যায়।

ওর চাউনিটা যেন কেমনতর।……

সুন্দরী ভাবে, আর দেব না—

কিন্তু চাইলে, মুখ-ফুটিয়া 'না' বলা যায় না।

দোক্তার বদলে সহদেব ছাঁচিপান দেয় মাঝে মাঝে।

ফিরাইয়া দেওয়াও যায় না

এমন সকরুণ মিনতি—

একদিন জানলায় এক ছড়া বেল ফুলের মালা পাওয়া গ্যালো।

গন্ধের মৌতাতে ঘরের বাতাস মশগুল্।

সুন্দরী অস্ফুটকণ্ঠে কহিল, পোড়ার মুখো ড্যাকরা……

কিন্তু সেই নিভৃত নিবেদনকে সে উপেক্ষা করিতে পারিল না।—

এক অজানা মধুর রসে তার রিক্ত-অন্তর ভরিয়া উঠিল।……

ছিদাম তাকে কোনদিন আদর করিয়া কিছু উপহার দেয় নাই।

বস্তির শেষে একটা পচা-ডোবা।

নীলচে জল, তার—পানায় প্রায় ঢাকা।

কয়েকটা পাতিহাঁস পাঁক খুঁড়িয়া বেড়ায়।

ওপারের পোড়া জমিটায় আগাছার জঙ্গল—

রঙ বেরঙের জংলীফুলে আগাছার বন মুঞ্জরিত হইয়া ওঠে।

পথ-ভোলা ফাল্গুণ এখানেও আসে।

ফুরফুরে দখিণা বয়।

আকাশ স্বচ্ছ-নীল।

সহদেব গোঁপের দু'পাশে দু'ফোঁটা সস্তা-দামের আতর মাখে। আর বসন্তের চাঁদ্নী রাতে গুন্ গুন্ সুরে রসের গান গাহিয়া বেড়ায়—

—ভোম্‌রা আমি ফুল বাগানে,

নিতুই নিতুই করি খেলা'—

সুন্দরীর মন অকারণে চঞ্চলিয়া ওঠে।……

বসন্তের অলস-বেলায় সে রহিয়া রহিয়া উন্মনা হইয়া যায়।……ঘরের কাজ পড়িয়া থাকে।

লট্‌কান-রঙা শাড়ীখানি পরে সে।

ভ্রূ-যুগের মাঝে কাঁচ পোকার টিপ লাগায়।

তারপর দুটী চোখে অতৃপ্ত আকাঙ্খা নিয়া, স্বামীর কাছে আসিয়া দাঁড়ায়—

ছিদাম হয়তো তখন অরসিকের মত বলে, কাঁথাটা সেলাই কোরে দে'না সুন্দর……

—পার্‌বো না,—ঝঙ্কার দিয়া সুন্দরী চলিয়া যায়।—

বুকে উদ্বেল অভিমান—

……সহদেবের সঙ্গে সুন্দরীর মাখামাখিটা নাকি বড়ই বাড়িয়া উঠিয়াছে। সহদেব সুন্দরীকে পান খাওয়ায়, কল্কা-পাড় শাড়ীও নাকি কিনিয়া দিয়াছে……গোপনে দু'জনের রঙ্গ-রসিকতাও চলে……

একেই তো রূপসী 'সোমত্ত' বৌয়ের প্রতি ছিদামের সন্দেহের অন্ত ছিল না।

তার ওপর এই সব—

ছিদাম ক্ষেপিয়া গ্যালো।

অত্যন্ত কট গালাগালি দিয়া একদিন সে সুন্দরীকে বলিল, তাই দেকি ওই টেরি-কাটা গোরাপানা ছোঁড়াটা রাতদিন আনাচে কানাচে ঘুর ঘুর করে……গান গায়…… ভারি পীরিত! লাথিয়ে দূর কোরে দেব হারামজাদী……

আজিকার তিরস্কার সুন্দরী কিন্তু নীরবে সহিল না—

নব-বসন্তের ইঙ্গিত তাকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল।

……দাওনা দূর কোরে, বাঁচি তা হোলে……বে' কোরেছিলে ক্যানো তবে?

বলিয়া এঁটো বাসনের গোছাটা তুলিয়া লইয়া ঝুম্‌ঝুম্ করিয়া বাহির হইয়া গ্যালো।

ঘাটে বসিয়া সুন্দরী বাসন মাজিতেছিল।

আজ ভাবিতেছিল তা'র পোড়া জীবনের কথা—

জীবন, না খাঁচার বন্ধন!

প্রতিদিন শুধু দাসত্বের অত্যাচার।

নিত্যকার এই ঘরের কাজ……প্রাণহীণ!

গোপন অতৃপ্তিটুকু তার বুকের ভিতর গুমরিয়া মরে—বন্দিনী বিহগীর মত।

নিজকে সে আর বঞ্চনা করিতে পারে না।

উপবাসী যৌবন তার তৃষায় ব্যাকুল!

কোথা হইতে সহদেব আসিয়া হাজির।

এদিক ওদিক চাহিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল, সুন্দর—

সুন্দরীর বুকের বসন একটু শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল।

ত্রস্ত সলজ্জ ভঙ্গীতে সে বুকের আঁচল টানিয়া দিল।

সহদেব লোলুপ নেত্রে চাহিয়া অভিমান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল, কি বেইমান তুই সুন্দর।......যে তোর এত হেনস্তা করে, তার কাচেই তুই প'ড়ে আচিস্......অথচ আমি তোর তরে হেদিয়ে মরি, তুই একবার ফিরেও চাস্ নে......

সুন্দরী নতমুখে বলিল, এক্ষন যা'......কেউ এসে পড়বে· ....

মিনতি পূর্ণ স্বরে সহদেব বলিল, কদ্দিন আর আশা ক'রে রাক্‌বি সুন্দর? আমার যে আর তর সইচে না!... তোর তরে রূপোর কাঁকণ গড়াতে দিয়েছি মাইরি, কি রূপেই মজিয়েচিস্ আমায়.........

সুন্দরীর চোখে মোহ ঘনায়—
সারা দুনিয়াটাই তখন রঙিন!

আবেশ-মদির কটাক্ষ হানিয়া সুন্দরী বলিল, রকম দ্যাকো থাল-ভরা'র!......

বলি, আমারও কি অসাধ?

—ঠিক তো! অসাধ নেই?

হাসিয়া সহদেব সুন্দরীর গাল দুটী টিপিয়া দিয়া চলিয়া গ্যালো।

সেদিন সকালে এক কাণ্ড—

ভোরে জাগিয়া ছিদাম দেখে, সুন্দরী পাশে নাই!

ভাবিল, কাছাকাছি কোথাও গিয়াছে হয় তো।

কিন্তু বেলা হইয়া যায়, সুন্দরী তবু ফেরে না—

ছিদাম ডাকিল, সুন্দর......

সাড়া-নাই।

আবার হাঁকিল কোথা গেলি সুন্দর......

ঘর-দোর তেমনি নিস্তব্ধ।

হঠাৎ একটা দারুণ সন্দেহ ছিদামের মনে ফুঁসিয়া উঠিল।

সহদেবের ঘরে গিয়া দেখিল, সে-ও ফেরার!

নিস্ফল ক্ষোভে ছিদাম সেই পলাতকার উদ্দেশ্যে ইতর গালি পাড়িতে গাগিল।......

এমন মুখরোচক খবরটা পাড়ায় রটিতে বিলম্ব হইল না।

প্রতিবেশীদের মুখে সবজান্তা-হাসি ফুটিল।

বলাবলি করিল, পটল-অলা ছোঁড়ার সঙ্গে অত ঢলাঢলি দেকে তখুনি ঠাউরেছিলুম......ও-ই তো ওর নাগর.........

ক্ষীরো পাড়ার সরকারী পিসি।

তার বিগত-যৌবনের স্মৃতি-কোঠায় অনেক রহস্য গোপন আছে। অবশ্য এখন ক্ষীরো-পিসির মত সতী-সাধ্বী পাড়ায় পাড়ায় আর নাই।

অবাক বিস্ময়ে বলিল, হাজার হোক বিয়ে করা ভাতার তো বটে.........তাকে ফেলে একটা ফচ্‌কে ছোঁড়ার সাতে বেরিয়ে যেতে একটু হায়া হোল না আবাগীর!...... বয়েসকালে আমরা কিন্তু অমন বেহায়া ছিলুম না বাপু......

ছিদাম নিঃশব্দে ঘরে চলিয়া গ্যালো।

অকস্মাৎ তা'র দু'চোখে বাহিয়া দরদর ধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল—

গঙ্গার তীরে মস্ত চট্‌কল।

যেন অতিকায় রক্ত লোলুপ দানব একটা।.........

ভোরের ধূম-ধূসর আকাশ বিদীর্ণ করিয়া কলের ভোঁ বাজে—যন্ত্র দানবের পূজার আয়োজন!

দলে দলে শ্রমজীবিরা রক্ত আহুতি দিতে চলে। বেলা শেষে আবার ফেরে——

শুষ্ক বিবর্ণ মুখে, ইতর জন্তুর মত ধুঁকিতে ধুঁকিতে বস্তির ভাঁটিখানায় ভিড় জমায়।

কুৎসিৎ গালাগালি চলে!

নির্লজ্জ প্রমোদ-বিলাস সুরু হয়।.........

বিদেশী-ধনীর অর্থ-লুব্ধতা দরিদ্রের মনুষ্যত্বও কিনিয়া লয়!

কুলি-বস্তিতে দু'খানা ঘর ভাড়া করিয়া সহদেব সুন্দরীকে লইয়া ঘর-কন্না পাতিল।……

দিন যায়, বছর ঘোরে।

সংসারে একটী কচি অতিথি আসিল।

সুন্দরীর খোকা!

সহদেবের প্রেমের জোয়ারে কিন্তু আবার ভাঁটা পড়িল।

কলে সখি বলিয়া একটী মেয়ে কাজ করে।

কাঁচা বয়স।

সারা অঙ্গে অঙ্গে উছলিত যৌবন।

চাহনি চটুল, অধর পানে-রাঙা।

খুঁটিয়া দেখিলে, অবশ্য রূপসী বলা যায় না—

তবু কেমন একটা আকর্ষণ জাগায়।

নব-যৌবনের মোহ!

সখি কলের পুরুষদের সঙ্গে অবাধে হাসি-রঙ্গ করে।…

তার মিঠে হাসির গোলাপী-নেশায় সহদেব মাতাল হইয়া উঠিল।

তারপর—

বস্তির ভাঁটিখানায় সহদেবের নিয়মিত হাজিরা পড়িতে লাগিল।

নিজের ঘরের চেয়ে সখির ঘরই অধিকতর লোভনীয় বোধ হইল।

সুন্দরীর সুখের নীড় ভাঙ্গিল।

তার অভিমান—মিনতি……সব ব্যর্থ!

সহদেব শোনে না।

বলে, বেশ কোরব……তুই বল্‌বার কে? না জানি যদি মাগ হতিস্……

সুন্দরী চুপ করিয়া থাকে।

অন্তরে বেদনায় বহ্নি-শিখা জ্বলে—

ব্যাকুল বাহু মেলিয়া কচি ছেলেটাকে বুকে জড়াইয়া ধরে।

শূন্যঘর খাঁ খাঁ করে—

ছিদামের বুকটাও তেমনি খাঁ খাঁ করে।

নিয়মের ব্যতিক্রম!

কোনো দিন বাজারে যায়, কোনো দিন যায় না।

অধিকাংশ দিন রাঁধে না, মুড়ি-ফুলুরি চিবায়।

বলে কে আবার রান্নার হ্যাঙ্গাম করে……

প্রতিবেশীরা বলে, থাকুক্ সে আবাগী তার নাগর নিয়ে ……তুই আর কাউকে রাক্ না ছিদাম………

ছিদাম বলে, এক্‌লা মানুষ……বেশ আচি……

নিঃসঙ্গ নির্জ্জনতা মনকে কিন্তু উদাস করিয়া দ্যায়।

বেণী মিস্ত্রি ছিদামের পড়্‌শি।

সহদেবেরই কলে কাজ করে।

সেদিন আসিয়া বলিল, সুন্দরীর ভারি কষ্ট ছিদাম…… সহদেব তো আর একটা ছুঁড়িকে নিয়ে মেতেচে……যা' রোজগার করে, সব তাড়ির দোকেনেই উড়িয়ে দ্যায়…… এ'দিকে সুন্দরীর দু'মুঠো জোটে না……

ছিদামের সে কী রাগ!

বলিল, খবরদার, আমার কাচে ও-হারামজাদীর নাম করবি নে……

ভাতের থালা কিন্তু সেদিন অভুক্ত পড়িয়া রহিল।

দু'পহর—

নিঝুম বস্তিটা তন্দ্রা বেশে যেন ঝিমাইতেছে।

যে যার কাজে বাহির হইয়াছে।

সুন্দরী খোকাকে ঘুম পাড়াইতেছে।

পরণে ময়লা চিরকুট কাপড়—সাত-তালি-দেওয়া।

পূর্ব্বের সে স্নিগ্ধ-কান্তি অযত্ন-ম্লান।

হঠাৎ—

দুয়ার পানে চাহিতেই, মুখ তার পাংশু বরণ হইয়া গ্যালো।

যেন ভূত দেখিয়াছে!

অদূরে দাঁড়াইয়া ছিদাম।

নিস্পলক চোখে তারি পানে চাহিয়া আছে……

এক হাঁটু ধূলো……

সুন্দরী কাঠ হইয়া রহিল।

ছিদাম আগাইয়া আসিয়া শুধু বলিল, চ'—

অভিভূতের মত সুন্দরী শুধাইল, কোতা ?

গম্ভীর কণ্ঠে ছিদাম জবাব দিল, চুলোয়······ঘর্ ক্‌ যাবি চ'······

নতমুখী সুন্দরী বেদনা-করুণ স্বরে বলিল, আর তা' হয় না······আমি এখেনেই মর্‌ব······

ছিদাম রাগিয়াই খুন।

বলিল, হয় কি, না হয়, সে আমি বুঝ্‌ব······মরতে সাধ হয় পরে মরিস্‌······

এই কচিটার মুখ চেয়ে একন বাঁচ্‌তে হবে তো······

তারপর হেঁট হইয়া, ঘুমন্ত শিশুকে বুকে তুলিয়া লইয় ডাকিল, আয়—

সুন্দরীর চোখদুটী তখন অশ্রু-অন্ধ !

—:০:—

তরুণ-প্রশস্তি

—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

এস অরুণের রথে,
শত শকুন্ত-সঙ্গীতে,
আলোক-কনক-অঞ্জলি—
এস বিজন এ পথে,
ছায়া-ঝিলিমিলি ইঙ্গিতে,
বক্ষ-শোণিত চঞ্চলি।

আনো রূপের আসব,
মদির ব্যাকুল যন্ত্রণা—
কামনা-সিন্ধু-ইন্দিরা,
আনো মনের মানব
অবাধ প্রাণের মন্ত্রণা,
মুক্ত হউক বন্দীরা।

আনো পুরাণো সে দিন,
হারাণো সে রাগ কল্যাণ,
কল্প-লোকের কল্পনা,
আনো কুণ্ঠাবিহীন
সুর-সুরভির সন্ধান,
সত্য প্রাণের আল্পনা।

এস রক্ত-পতাকা,
ছিঁড়িয়া জীর্ণ দুর্ব্বল
আচারের চীর-শৃঙ্খল—
এস মানস-বলাকা,
ফাল্গুনি ফাগ-উজ্জ্বল,
যৌবন-রস-বিহ্বল।

—

মনের কাঁটা

—শ্রীবেলা দাসগুপ্তা

শৈশব হইতেই সৌরীন ঐ বাড়ীটাতে প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছে। গৃহস্বামী ভবেন্দ্র নাথ তাহার পিতার একজন বিশিষ্ট বন্ধু। পশ্চিমের একটা ছোট সহরে পিতা-মাতা উভয়ে স্বর্গীয় হইবার মাস কয়েক পর হইতেই সে এই সংসারের একজন। এইটুকু ছাড়া অন্য কোন সম্পর্ক তাহার নাই।

কিন্তু জ্ঞানবুদ্ধি হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই সংসারকেই সে ভালবাসিয়াছে—নিজের বলিয়া জানিয়াছে।

এই জানিবার কারণও ছিল—তাহা—ভবেন্দ্রনাথ এবং স্ত্রী কুমুদিনীর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি। সৌরীনের বুকে যাহাতে পিতৃমাতৃ-স্নেহের বিন্দু মাত্র অভাবের ছায়াও কোন দিন না ফুটিয়া উঠে,—সেই আশঙ্কায় সংসারের যাহা কিছু সুখ স্বাধীনতা, সমস্তই নির্ব্বিকারে তাহার সম্মুখে ধরিয়া ছিলেন। এমনকি নিজের পুত্রকন্যার চেয়ে তাহার দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া চলিতেন বেশী।

এ হেন একটা সংসারের মধ্যে আশ্রয় পাইয়া নিজের সমস্ত স্মৃতির ব্যথাকে সৌরীন মুছিয়াই ফেলিয়াছিল, যেটুকু জাগিয়াছিল তাহা হৃদয়ের একান্ত অন্তরালে অতি ক্ষীণ আগুনের রেখার মতই অস্পষ্ট। এমন করিয়া দিনের পর দিন কুমুদিনীর স্নেহ-সিক্ত বুকের উপর মাতৃত্বের সমস্ত মাধুর্য্যটুকু সে আবিষ্কার করিয়া লইয়াছিল এবং অনীতা ও অরবিন্দকে নিজের একান্ত আপনার বলিয়া জানিয়াছিল।

কিন্তু এই জানাটুকু তার বেশী দিন টিকে নাই। এই সংসারে সে যখন প্রথম আসিয়াছিল তখন বয়স বোধ হয় তাহার ছয় কি সাত বৎসর। তারপর সুদীর্ঘ তেরোটী বৎসর সুখ-সাচ্ছন্দের ভিতরে কাটাইয়া দিয়া যখন একদিন এক রূপ-রস-গন্ধ ভরা জীবনের প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল তখন সহসা এই সুখ শান্তিময় সংসারে এক অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার ঘটিল। এবং তাহার পরই সংসারটী এমন করিয়াই ওলট্ পালট্ হইয়া গেল যে তার প্রভাবটা প্রকাশ পাইল সৌরীনের উপরই বেশী করিয়া।

সামান্য কয়েক দিনের জ্বরে ভুগিয়া চিরহাস্যময়ী গৃহিনীটী সকলকে কাঁদাইয়া চলিয়া গেলেন।

কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে মাস কয়েক পরে যিনি আসিয়া গৃহিণীপনার শূন্য আসনটী অধীকার করিয়া বসিলেন তিনি ভবেন্দ্রনাথেরই এক নিকট সম্পর্কিতা পল্লীবাসিনী, বিধবা ভগ্নি। বয়স তাহার অনুমান করা কঠিন—মাথার বিরল-কেশ যাহা শুভ্রতা লাভ করিয়াছে তাহাও বেশী নয়।

তবে তিনি বালবিধবা।

মোটের উপর সে যাই হোক—আসিয়া অবধি এই নব গৃহিনীটে সৌরীনকে সুখ-দৃষ্টিতে দেখিতে পারিলেন না। বরং সে যে উড়িয়া আসিয়া ভাইয়ের সংসারে জুড়িয়া বসিয়াছে তাহাই প্রমাণের জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন।

শেষ অবধি সৌরীন বুঝিল সমস্তই—কিন্তু বহুদিন পরে নিজের জন্য স্মৃতিকে মনে করিয়া বিশেষ কিছু উপায়ই ভাবিয়া পাইল না। নিয়মিত কলেজ করিয়া আসিয়া অবসর সময়ে অনীতা ও অরবিন্দকে লইয়া আগের মতই সে বেড়াইত যাইত বটে কিন্তু মনের ভিতরে তেমনি অনাবিল আনন্দ আর খুঁজিয়া পাইত না।

অনীতা যে সৌরীনের এই মনোভাবটা লক্ষ্য না করিত নয়, কিন্তু মুখ ফুটিয়া এই নবাগতা পিসীমাকে কিছু বলিবার মত প্রবৃত্তি তাহার হইত না।

আর ভবেন্দ্রনাথ?—তাহার নিজের ত কোন কথাই নাই।—স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি এমনই হইয়া গিয়াছেন যে সংসারের সর্ব্ব প্রধান হইয়া ও সর্ব্ব বিষয়ে নির্লিপ্ত,—উদাসীন।

এমনই নানারূপে পিসীমার সুপরিচালনের ভিতর দিয়া সংসারের গতি যখন ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিতেছিল,

তখন তাহারই অখণ্ড প্রতাপ একদিন সৌরীনের পরিবর্ত্তন শীল মনের মধ্যে বিষ ঢালিয়া দিল।

ব্যাপারটী ঘটিল এইরূপ—

চিরদিনের অভ্যাসমত সেদিন বিকালে সৌরীন অনীতা ও অরবিন্দকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া সন্ধ্যার পর ছাতের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া নিজের জীবনের কথাটাই ভাবিতেছিল। এমন করিয়াই যে তাহার এত-দিনকার অধীকারটুকু ক্ষুন্ন হইয়া উঠিবে তাহা যে মুহূর্ত্তের জন্য ও সে কল্পনা করে নাই।

যে নাকি একদিন পরম স্নেহে তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া ছিলেন আজ তাহারই অবর্ত্তমানে নারী হইয়া আর একজন কি করিয়া তাহাকেই উপেক্ষার চোখে দেখিতে পারেন? এই কথাটাই সে কোন মতে ভাবিয়া পাইতেছিল না।

আপনার জন না হইলেও এই সংসারের উপর তাহার কি কোন দাবীই নাই? সুদীর্ঘ কুড়ি বৎসরের এই জীবনটা কি একবারেই মিথ্যা—সমস্তই অর্থহীন?—না হয় তাই হইল।

কিন্তু তাহা ছাড়াও তো অনেক কিছুই আছে—ঐ কাকাবাবু, অনীতা, অরবিন্দ—ইহাদের উপর যে অধিকার—সেটুকু ছাড়িয়া দিবার মত ক্ষমতা তাহার কোথায়?—আর যাই হোক্; সে যে তাহাদের কেহই নয় একথা যে প্রাণ গেলেও সে স্বীকার করিতে পারে না।

সৌরীন যখন নিজের ঐ জীবনটাকে নানাদিক দিয়া খতাইয়া দেখিতেছিল তখন সহসা পিসীমা পশ্চাতে আসিয়া ডাকিলেন—সৌরীন—

সৌরীন চম্‌কিয়া উঠিল।

পিসীমা কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া কহিলেন—তোমাকে অনেক দিন থেকেই একটা কথা বল্‌বো বল্‌বো ভাব্‌ছিলুম কিন্তু সময় অভাবে আর হয়ে ওঠেনি। ত্যাকো, তোমরা লেখা পড়া শিখেচো,—না হয় তোমাদের রকম সকমই আলাদা। কিন্তু সবাই তো আর তা মান্‌তে চাইবে না—তারা অনেক কথাই বলবে।—তাই বল্‌ছিলুম কি—তুমি যতই আপনার জন হওনা বাছা,—হাজার হলেও রক্তের সম্পর্ক তো আর নেই। কাজেই লোকের কওয়া-বলাটা আর এমন কি অহেতুক,—ছোটো তো আর নও—বুজে-সুজেই চোলো।—এই যে এত রাত করে রোজই ঘুরে আসো—না হয় অরু ও সঙ্গে থাকে কিন্তু সবাই কে আর তা দেখতে যায়?..... আচ্ছা, তুমিই না হয় বলো এই অত বড় মেয়ের সঙ্গে——

'ছিঃ পিসীমা'—

মুহূর্ত্তে সৌরীন প্রতিবাদ করিয়া কি একটা কথা বলিতে চাহিল কিন্তু ইহার বেশী একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া আর বাহির হইল না। এক রকম ছুটিয়াই নীচে নামিয়া গেল।

কিন্তু পলাইয়া গিয়াও সে নিস্তার পাইল না। নিজের ঘরে টেবিলের পাশে বসিয়া বিলাতী ছবির মাসিক খানা হাতে তুলিয়া লইল বটে কিন্তু মনসংযোগ করা দূরের কথা,—তাহার চোখে সমস্তটাই যেন ঝাপ্‌সা হইয়া গেল। মনের অস্বাভাবিক উত্তেজনায় বইখানা টেবিলের একান্তে ছুড়িয়া দিয়া সম্মুখের খোলা জানালাটার পানে চাহিল। মনে হইল—এই পৃথিবীটা যেন আজ নূতন—সেখানে পূর্ব্বের সে শ্যামলতা,—সে স্নিগ্ধতা নাই—পাষাণের মতই আজ ধূসর—প্রাণহীন—

পিসীমার ইঙ্গিতটা যে সে ভাল করিয়াই না বুঝিয়াছে নয়।

—ছিঃ, কি বিশ্রী!—নিজের বোনের মতই যে সে তাহাকে এতদিন দেখিয়াছে—তেমন করিয়াই যে ভাল বাসিয়াছে। নাই বা থাকিল রক্তের সম্পর্ক—কি এমন তাহাতে আসিয়া যায়?—প্রাণের দানটা কি কিছুই নয়?—তাহা কি এমনই তুচ্ছ?

দারুণ ঘৃণায়, দুরন্ত অভিমানে, সৌরীনের চোখ দুইটি হইতে অবিরল ধারায় অশ্রু গড়াইতে আরম্ভ করিল।

বাহির হইতে বঙ্কু ডাকিয়া কহিল—'দাদাবাবু—আপনাকে দিদিমণি ডাকৃচেন খেতে—

মুহূর্ত্তে যেন সৌরীন উন্মনা হইয়া উঠিল—এই যে বাড়ীর চাকরটী পর্য্যন্ত তাহাকে এই সংসারেরই একান্ত আপনার জন বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে—রক্তের হিসাবে এ অধিকার

টুকু পাইবার দাবীও কি সত্যি করিয়াই তাহার নাই? সে দাদাবাবু,—আর অনু দিদিমণি এই কথাই সে শৈশব হইতে শুনিয়া আসিয়াছে—তাহার ভিতরে এমনই যে একটা মিথ্যা লুকাইয়াছিল তাহা কে জানিত?

বন্ধু পুনরায় ডাকিতে সে কোনমতে বলিল—'বলগে, তাহার অসুখ করেছে—খাবে না।

বন্ধু চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরেই যে আসিয়া রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিল সে অনীতা—কহিল—দোর খোলো সৌরীন দা,—কি অসুখ তোমার করেচে শুনি?—এতক্ষণ তো দিব্যি বেড়িয়ে এলে,—ও সব পরে হবে'খন,—এখন উঠে এসো শিগ্‌গির করে।

সৌরীন কোন কথাই বলিল না বরং কিছুকাল পূর্ব্বের পিসীমার কথাগুলিই আবার নূতন করিয়া তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। যে অভিমানটা তাহার নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছিল, অনীতার এই স্নেহ-কোমল আহ্বানে তাহাই আবার তীব্র হইয়া জাগিল। রুদ্ধ-কণ্ঠে শুধু কহিল—বড্ড মাথা ধরেচে আমার—উঠতে পার্ব্বো না।

ইহার পরও বার কয়েক নিষ্ফল অনুনয় করিয়া অনীতা চলিয়া গেল।

রাত্রি অনেক হইয়া গেলেও সৌরীনের চোখে ঘুম আসিল না। তাহার ভিতরে বাহিরে যে গোপন দ্বন্দ্ব লাগিয়াছিল, না পারিল সে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে না পারিল তাহার একটা সহজ মীমাংসা করিয়া উঠিতে। অবশেষে নিজের হতভাগ্য জীবনের উপর একটা ধীক্কার জন্মাইয়া সে একটা নূতন কল্পনা স্থির করিল,—ভাবিল এতদিনকার এই সহজ গতিটাকে সে অন্যদিকে ফিরাইয়া দিবে,—নিজের সুখ-সুবিধার দাবী আর করিবেনা।........

পরদিন প্রত্যুষে ঘুম ভাঙ্গিতেই রাত্রের ঘটনাটি একটা দুঃস্বপ্নের মতই তাহার কাছে মনে হইল! তাড়াতাড়ী উঠিয়া হাত-মুখ প্রভৃতি ধুইয়া সে তখনই রাস্তার দিকে বাহির হইয়া পড়িল। আশা—হয়তো মনের এই চাঞ্চল্য টুকু প্রভাত সমীর স্পর্শে শান্ত হইয়া উঠিবে। তারপর সারাটী সকাল বেলা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া—কর্ম্ম ক্লান্ত জনস্রোতের মধ্যে নিজেকে উদ্দেশ্যহীন ভাবে মিশাইয়া দিয়া যখন বাড়ী ফিরিল তখন বেলা বারোটা বাজিয়া গিয়াছে।

কিন্তু মনের যে বিপ্লবটাকে দমিত করিবার জন্য তাহার এত চেষ্টা—তাহা সার্থক হওয়া দূরের কথা আরও যেন তীব্র হইয়াই জাগিয়াছে।

ঘরে ঢুকতে যাইতেই সর্ব্ব প্রথমে দেখা হইল বন্ধুর সঙ্গে।

সে বলিল—'আপনি কোথা গেছ্‌লেন দাদাবাবু?—রাত্তিরে না আপনার অসুক করেছিলো—শিগ্‌গির যান—চান করে আসুন।

সৌরীন উত্তরে হঁা কি না কিছুই বলিল না।

সম্মুখে সাপ দেখিলে মানুষ যেমন চঞ্চল হইয়া উঠে,—ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া আজ সৌরীনও ঠিক তেমনি করিয়া উঠিল। দেখিল—অদূরে তাহারই টেবিলের পাশে বসিয়া অনীতা গত রাত্রের সেই মাসিকখানার পাতা উল্টাইতেছে। সৌরীন ফিরিবারই উপক্রম করিল কেননা আজ ঐ মেয়েটীর সম্মুখে উপস্থিত হইবার সাহসটুকু পর্য্যন্ত একরাত্রির মধ্যেই যেন অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

—ও কি সৌরীনদা—

কি একটা কথা বলিতে যাইতেই অনীতা সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল।

মুখ তুলিয়া দেখিল—এ কি, একটী রাত্রের ভিতরে এত পরিবর্ত্তন। বিবর্ণ, পাংশু মুখ,—রক্তাভ চক্ষু—উচ্ছৃঙ্খলতার নিদারুণ চিহ্ন সমস্তটা শরীর যে ছাইয়া ফেলিয়াছে!

ভয়ে, বিস্ময়ে অনীতা ক্ষণকাল নির্ব্বাক হইয়া রহিল। পর মুহূর্ত্তে ছুটিয়া গিয়া সৌরীনের একখানা হাত শক্ত করিয়া ধরিয়া কহিল—তোমার পায়ে পড়ি সৌরীনদা,—কি হয়েছে শুনি?

উন্মুখ-আগ্রহে অনীতা তাহার দিকে চাহিল।

অস্ফুট কণ্ঠে কি একটা কথা বলিতে যাইতেই নিমেষে পিসীমার কথাটাই সৌরীনের কাণে প্রতিধ্বনিত হইল। জোর করিয়া নিজের হাতখানা মুক্ত করিয়া খানিকটা সরিয়া গিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল—

—তোমার স্কুল নেই অনীতা?

আজ অনু বলিতেও যেন তাহার সঙ্কোচ।

ওষ্ঠ দুইটী চাপিয়া ধরিয়া বিবর্ণ মুখে অনীতা দাঁড়াইয়া ছিল অভিমানে তাহার ভিতরেও তুমুল আলোড়ন আসিয়াছিল—তীব্রকণ্ঠে শুধু কহিল—না।

সেদিন যে শনিবার,—স্কুল ছুটি—তাহা সে গোপন করিয়া গেল।

সৌরীনের মনে তখন প্রলয়ের বাঁশীই বাজিতেছিল। সহসা সে একটা অভাবনীয় কাণ্ড করিয়া বসিল।—মুহূর্ত্তে সরিয়া গিয়া অনীতাকে দুই হাতে জোর করিয়া বুকের উপর টানিয়া লইয়া কহিল—এ কথা যে কখনো আমি ভাবতেই পারিনে অনু—রক্তের সম্পর্ক নেই বলেই কি সত্যিকারের স্নেহ কলুষিত হয়ে ওঠে!—ছিঃ তুই যে আমার বোন্—আমি যে তাই জানি—সে কথা কিছুতেই মান্‌বো না—কিছুতেই না।

অসংলগ্নভাবে এই কথা কয়টা অনীতাকে সৌরীন বলিয়া বসিল বটে কিন্তু তাহার ভিতরের দুষ্ট ভগবানটী কিছুতেই তাহাকে সায় দিতে পারিল না।

যে তোলপাড়টী তাহার ভিতরে হইতেছিল তাহারই মাঝখানে এই কথাটাই বেশী করিয়া জাগিল—হ্যাগো, যত কিছুই তুমি বল না কেন, সেখানে সবই হইতে পারে—যত বড় অসম্ভব—যাহা কিছু অকল্পনীয়—সবই মনের এ হেন বিরুদ্ধ যুক্তির প্রভাব সৌরীনকে যেন অস্থির করিয়া তুলিল। মুহূর্ত্তে অনীতাকে জোর করিয়া সরাইয়া দিয়া বলিল—সরে যাও অনীতা, তোমরা সবাই আমায় পাগল পেয়েছো না কি!

তাহার ইচ্ছা হইতেছিল ছুটিয়া গিয়া পিসীমাকে বলিয়া আসে—মনের একান্ত নিভৃত কোণে যে অজ্ঞাত বাসনাটী সঙ্গোপনে মিশিয়া ছিল তাহাকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া এ তুমি কি করিয়াছ— তাহা যে আমার সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে।

সম্মুখের টেবিলটা শক্ত করিয়া ধরিয়া অনীতা কোন মতে দাঁড়াইয়াছিল। আজ যেন সৌরীন তাহার কাছে নূতন—তাহার ব্যবহারে—অর্থ হীন কথাবার্ত্তায় পূর্ব্বের কোন সামঞ্জস্যই যেন নাই। সহসা এমন কি করিয়া হইল?

উৎকণ্ঠায় অনীতার দুইটী চক্ষুই জলে ভরিয়া গেল।

কিন্তু ঐ অশ্রু-উচ্ছল চক্ষু দুইটী দেখিয়াই সৌরীনের জ্ঞান যেন সেই মুহূর্ত্তে ফিরিয়া আসিল। লজ্জায়, অনুতাপে মরিয়া গিয়া কহিল—আমার বুঝি ক্ষিদে পায় না অনু?

অনীতা প্রায় কাঁদিয়াই ফেলিল—কহিল—আমি তার কি করেছি—সেই জন্যই তো বসে আছি এখনো—যাওনা,—স্নান করে এসো।

সৌরীন মুগ্ধ হইয়া গেল—স্নেহের এতখানি নিবিড়তা যেন আজ তাহার চোখে নূতন।

মুহূর্ত্তপূর্ব্বে যে ব্যবহারটা সে অনীতার উপর করিয়া বসিয়াছিল তাহাই স্মরণ করিতে গিয়া নিজের উপর তাহার ধিক্কার জন্মিল। ভাবিল—সামান্য একজন সংস্কারাচ্ছন্ন মেয়ে মানুষের তুচ্ছ কথায় কেন সে নিজেকে এমন করিয়া আন্দোলিত করিতে গিয়াছিল!

ধীরে ধীরে সে স্নানের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু শেষ অবধি কিছুতেই কিছু হইল না।

একে একে সৌরীন ঐ সংসারের সমস্ত সুখ-সুবিধার দাবী ছাড়িয়া দিল বটে কিন্তু মনে শান্তি ফিরিয়া পাইল না।

কি যে বিষের কাঁটাই মনের কোণে গভীর হইয়া বিঁধিল, তাহা যেন আর কিছুতেই খুলিতে চায় না। দিনের পর দিন মনের এই বিরুদ্ধ যুক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিয়া অবশেষে সে আহত হইয়া পড়িল।

অনীতাকে দেখিলে মুখ তুলিয়া চাহিতে পর্য্যন্ত পারে না—পাছে চোখোচোখী হয়। সেই ভয়েই বেশীর ভাগ সময় বাহিরে বাহিরেই কাটাইয়া দেয়।

কিন্তু তাহাই বা চলে কতদিন?

সেদিন শ্রাবণের ধারা যেন অশেষ হইয়া নামিয়াছে। মাঝখানে ক্ষণিকের অবসানে সৌরীন কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিল। নিজের ঘরটিতে ঢুকিতেই দেখিল—টেবিলের ধারে বসিয়া অনীতা। আপনা হইতেই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—সে কি অনু—তুমি?

স্কুল ছুটি বলিয়া সেদিন নিরিবিলি ঐ ঘরটাতে অনীতা পড়িতে আসিয়াছিল—আর কিছু নয়।

কিন্তু সৌরীনের মুখে অমন ধারা বিস্ময় দেখিয়া সেও যেন সহসা অপ্রতিভ হইয়া গেল—যেন কত বড় একটা

অন্যায়। শুধু তাই নয়,—জীবনে সেই সর্ব্বপ্রথম আর একটা জিনিষ তাহার প্রকাশ পাইয়া গেল—তাহা লজ্জা—সমস্তটা মুখের ঐ রক্তরাঙা আভাটুকু।

সৌরীন মুগ্ধ হইয়া গেল,—আজ তাহার দৃষ্টি নূতন—এই কি সেই অনীতা?—এত বড় সে?—এত সুন্দর? সমস্ত দেহে আজ ও কিসের ছাপ? ধীরে ধীরে সে অনীতার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। তারপর আদর করিয়া দুইহাতে মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া কি একটা কথা বলিতে গেল—অনু, অনু—কিন্তু ইহার বেশী কিছুই মুখ হইতে বাহির হইল না।

উপরন্তু তাহার সমস্ত চেতনা গ্রাস করিয়া সহসা সে কল্পনাটী মনের উপর প্রভাব ছড়াইয়াছিল—তাহাই অপসারিত হইয়া তাহাকে যেন বাঁচাইয়া দিল। সে চমকিয়া উঠিল—একি কোন পথে সে চলিয়াছে! দুইটী চক্ষুই যেন তাহার অনুশোচনায় বুজিয়া আসিতে চাহিল।

মুহূর্ত্তে সে ছুটিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

আরও কিছুদিন কাটিল।

কিন্তু অবশেষে একান্ত নিরুপায় হইয়া একদিন ভবেন্দ্র নাথের সঙ্গে নিরিবিলি দেখা করিয়া কহিল—কাকাবাবু, আপনি বল্‌ছিলেন আমি ব্যারিষ্টারী পড়তে বিলেত যাই,—আমার তো ইচ্ছে আসচে মাসেই—

কথাবার্ত্তা অনেক কিছুই হইল। ভবেন্দ্রনাথ সৌরীনের এই ইচ্ছায় বাধা দিতে চাহিলেন না। শেষ অবধি সম্মতি দিয়া কহিলেন—বেশ।

অতঃপর সৌরীন গোপনে সমস্ত বন্দোবস্ত স্থির করিতে লাগিল। আজকাল তাহার মন যেন অনেকটা শান্ত।—অনীতার সঙ্গে দেখা হয়—তেমনি মুখোমুখি—কিন্তু পাশ কাটাইয়া চলিবার আগ্রহ জাগে না।

কিছুদিন কাটিয়া গেল।

অরবিন্দকে লইয়া সৌরীন সিনেমায় গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া নিজের ঘরটাতে ঢুকিয়া আবার সেদিন সে আশ্চর্য্য হইল—দেখিল সম্মুখে অনীতা।

কিন্তু আজ ঐ মেয়েটীর চেহারা তেজোদীপ্ত। স্পষ্ট অথচ শান্ত কণ্ঠে তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল—তুমি বিলেত যাচ্ছো,—সে কথা আমার কাছে বলতেও কি তোমার বাধা সৌরীনদা? কি আমি করেছি তোমার? কথার শেষটায় তাহার গলা যেন ভারি হইয়া আসিল।

সৌরীন উত্তর দিতে চাহিল—বাধা নয়—তবে—

অনীতা তেমনি বলিল—তা' যাই থাক্, কিন্তু এমন করে নিজের মনকে ছলনা করে চলবার কি দরকার শুনি?—সত্যিটাকে কি চিরকালই চাপা দিয়ে রাখতে পার্ব্বে?

সৌরীন চঞ্চল হইয়া উঠিল—একি,—অনীতা আজ কি বলিতে চায়?—কিসের সত্যি?

দিন ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিতেছিল।

সৌরীণের চোখে আশ্চর্য্য ঠেকিল—আজকাল অনীতাই তাহাকে এড়াইয়া চলিয়াছে। কাছে আসিবার কিছু মাত্র আগ্রহও যেন তাহার নাই—কিন্তু কেন?

এমনি করিয়াই যাইবার দিনটি একদিন সত্য সত্যই দেখা দিল। বৃদ্ধ ভবেন্দ্রনাথ সজল চোখে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—অরবিন্দ কাঁদিয়া আকুল হইল। এমন কি পিসীমাও চোখে আঁচল দিলেন। শুধু অবিচলিত দাঁড়াইয়া রহিল ঐ মেয়েটী। তাহার মনে যেন আজ কোন আক্ষেপই নাই।

সৌরীনের চোখেও জল।—আজ অনীতার কাছে গিয়ে কত কথাই কহিবে বলিয়া রাখিয়াছিল—শেষ পর্য্যন্ত কিছুই তাহার মনে আসিল না। শুধু কহিল—অনু লক্ষী বোনটী, মনে কিছু করোনা ভাই।

অনু কিছুই বলিল না। শুধু তাহার ঠোঁট দুইটিতে একটা করুণ মৃদু হাসির আভাষ ফুটিয়া উঠিল।

যেন বলিতে চায়—সব মিথ্যা, ও শুধু তোমার মুখের কথা।

—:০:—

অভয়

—শ্রীগিরিজাকুমার বসু

সব কথা বলেছিনু, শুধু এক বাণী
আজো মোর অকথিত ছিল ওগো রাণী,
জীবনের শেষক্ষণে ললিত চিবুকে
নিবিড় চুম্বন আঁকি শেষবার সুখে,
তোমারে তা শুনাইব এই ছিল আশা ;
কিন্তু আজ হৃতগর্ব্ব, চ্যুত ভালোবাসা
বঞ্চিত এ অভাগ্যেরে হেলাভরে দলি
তুমি আজ দ্বিধাহীন, দূরে গেছো চলি ;
অ-বলা সে কথাটুকু, অ-দেখা প্রিয়ায়
বিশুষ্ক অধর মোর বোলে যেতে চায়
তাই আজি মনোরমে, এ জীবনে আর
দেখা যদি নাহি হয় তোমার আমার ;
সে গোপন বাণী বঁধু আর কিছু নয়—
এ পারের ভয় যেন, ও পারে না রয়।

—:•:—

কেয়ার কাঁটার ডগায়

—শ্রীজ্যোৎস্নানাথ চন্দ

—ফাগুন এয়েচে, নয়রে মিনু ?

—কী বললি ?......আসেনি ?

—পাঁজির লেখায় কী এসে যায় ! ওই চেয়ে দ্যাক্ গাছে গাছে সবুজ-পাতার কেমন নাচন্ চলেছে......ওরাই তো মৃদু হাওয়ায় দোল্ খেয়ে জানিয়ে দিচ্ছে ফাগুন এয়েচে আর তুই বলিস্ কি না তোর পাঁজির ফাগুন আজও এসে পৌঁছয়নি !......ফেলে দে, ফেলে দে ছুঁড়ে 'ডাষ্ট্‌বিনে' তোর ওই পাঁজি।

—চুপ্ করতে বলিস্?......আর কেনরে মিনু......কটা দিনই বা তোদের এই ফাগুন-আসা দেখ্‌ব! এই ফাগুনই তো শেষ!......

—হাসালি মিনু......আজ না নিয়ে কাল যাবে যে তাকে আর কেন আমার বাণী শোনাচ্ছিস্? বল্‌তে দে বলে যাই দুটো কথা......আ—আ—

—ফের্ কথা বলতে বারণ করছিস্? জানিস্ তো মিনু ডাক্তার কি বলে গেছে?......না থাক্, ওই চেয়ে দ্যাখ্ আকাশটা কেমন নীল দেখাচ্ছে......ঝাউয়ের ডাল-পালাগুলো ওদের ঝাঁক্‌ড়া ঝাঁক্‌ড়া বাব্‌রী চুল নেড়ে কেমন খেল্‌চে!......ওই...ওই ঘাসের শিস্‌গুলি কেমন সুন্দর! দেখ্‌চিস্‌নে মিনু ওর ওপর শিশিরকণাগুলো সদ্য-আসা ভোরের আলোয় কেমন ঝল্‌মল্ কর্‌চে?......

—দেখ্‌চিস্!......হাঃ! হাঃ! তোরা এই পৃথিবীতে আরো অনেকদিন আছিস্ কি না তাই তোদের চোখে এসব খুসী এনে দেয় না!......আজ যাত্রা পথে দাঁড়িয়ে নিখিল ধরণীটাকে যেন একটা শান্তিনিকেতন বলে মনে হচ্ছে—সে আমার দুর্ব্বলতা!......কিছু নয়......ভুঁয়ো.. একটা মহা-মিথ্যার আস্তরণ পাতা রয়েচে সারা বিশ্বের বুকটা ছড়িয়ে। আজ বিদায়-বেলায় ও আবার আমায় ভুলোতে এসেচে। ভু...ভুল—

—আমি বাজে বক্‌চি......এ কথা তুইও বলিস্ মিনু?

—হ্যাঁ, বল্‌কি বৈকী!......ওটা তোদের ধরণ।

—আঃ!......বালিস্‌টা গেল সরে! বালিস্‌টা ঠিক্ করে মাথাটা আমার ওর ওপর তুলে দে না ভাই মিনু......

—দিয়েচিস্? হ্যাঁ, আর একটু ডান দিক্‌টায় সরিয়ে দে দিকিন্......এই হয়েচে......ব্যস্!......

—ও কী? তুই উঠে যাচ্ছিস্ যে মিনু?......

—ওঃ! লোটী এসেচে......তা ওর সঙ্গে ও ঘরে বসে আলাপ কর্‌গে যা!......মরণ-পথের পথিকের বাজে বকুনী আর কত সইবি তুই!......যা ওঘরে যা—ও দাঁড়িয়ে রয়েচে!......তা দরকার হলে ডাক্‌ব'খন্!

*　*　*　*　*

সত্যি, লোটী এক অদ্ভুত মেয়ে! রোজই একবার করে আমায় এসে দেখে যায়......মুখে কথাটী নেই। ওই কবাটের গায়ে গা ঠেকিয়ে খানিক্ চেয়ে থেকে সে চলে যায়।......ওর গভীর অতল কালো চোখ দুটো......উঃ! কত কথাই যেন বলে তারা!......শুয়ে শুয়ে তো চিন্তে করা ছাড়া আর কিছু কাজ নেই......

......ভাবি কেমন মেয়ে লোটী। ফরাসী লেখক পিঁয়ের লোটীরই মতন হেঁয়ালিতে ভরা! নিখুঁত্ কমনীয় মুখখানি আর enigmatic দুটো চোখ...কুবেরের ঐশ্বর্য্য তাদের কাছে দেউলে হয়ে যায়! ওর চোখ দুটো যেন সব সময়ই কী বল্‌ছে যাকে ভাষার পুচ্ছে বন্দী করা যায় না......এমনি একটা কি!......বুঝে উঠ্‌তে পারলুম্ না কোন্ বাণী লুকিয়ে রয়েচে ওর অন্তরের আব্‌ডালে!......না গো না, আর পারিনে!......হাঁপিয়ে উঠেচি আমার এই এক টানা জীবনের জের টান্‌তে টান্‌তে!

*　*　*　মেনকা আমার জন্যে প্রাণপণ খাট্‌চে কিন্তু বৃথাই সে সব! বন্যার হানা এলে পথঘাট, ঘর-বাড়ী ডুবিয়ে দিয়ে সে তার পথে অপ্রতিহত গতিতে চলে যায়।...মরণ-দূতের রথে কাল যার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়ে আছে তাকে বাঁচার ওষুধ গেলালে কী হবে!......তবু, তবু মানুষের মন তো! মিনু চাইছে আমায় বাঁচাতে...সে কী হয়!......

মায়াময়ী ধরিত্রীর ছ'ছটী ঋতুর বর্ণ সম্ভার......বৈশাখের পিঙ্গল-জটা-জালের না-বলা বাণী......শ্রাবণের জলদ্-মন্দ্র-সুর......বাদল-বেলার ভেজা-মাটীর নীরব গাথা......শরৎ প্রান্তের সোনায়-মোড়া নীলাকাশ!......উঃ! আজ এই বিশ্বের প্রতি ধূলিকণা আমার নাড়ী ধরে টান্‌ছে ...তবু... তবু ছিঁড়তে হবে আমায় সে বাঁধন।.........

মুক্তি আজ আমার দুয়ারে এসে ডাক দিয়েচে......কই আমি তো তাকে প্রাণ দিয়ে বরণ করে নিতে পার্‌ছিনে? ......কেন? এ কেন'র জবাব নেই! বুঝি এই চিরন্তনী! ওই একা চিল উড়ে যাচ্ছে......কী সুন্দর আকাশের গা বেয়ে চলেছে।......এম্‌নি মন থেকেই বোধ হয় শেলির কলম দিয়ে 'স্কাইলার্ক' বেরিয়েছিল। রোমের কবি টেরেন্সের কথায় আজ আমার বল্‌তে ইচ্ছে ইচ্ছে—**Homo sum, humani nihila me alienum puto!**

......আমি মানুষ, মানুষের যা কিছু তার সঙ্গে আমার অচ্ছেদ্য যোগাযোগ রয়ে গেচে যে!......কৈশোর আর যৌবনের মাঝামাঝি যে স্বপ্ন-সেতু রয়েচে তারই ওপর দাঁড়িয়ে প্রথম একদিন এই পৃথিবীটাকে সুন্দর দেখেছিলুম্—আজ আবার বিদায়-বেলায় এই জগৎটাকে যেন বড় সুন্দর লাগ্‌চে!......এর চুনো গাছ-পালা, এর নদ নদী·· ··· এর সব নর-নারী.........সব সুন্দর, সব ভালো!......

* * * * *

বৌদি এসে বল্‌লেন—লোটীর নাকি পশু´ বিয়ে!

মাথায় যেন বাজ পড়্‌ল একটা......লোটীর বিয়ে?··· তা হোক আমার তাতে কী!

আমি হলুম্ মৃত্যু-পথ-যাত্রী থাইসিসের রোগী আর ও হল সদ্য-ফোটা গোলাপ-কুঁড়ির মতনই শুভ্র কমনীয় তরুণী!

আমায় আমি সাম্‌লে নিলুম্।

নিজেই নিজেকে ধিক্কার দিলুম্...ছিঃ!

একটু ঢোক্ গিলে বৌদিকে জিজ্ঞেস্ কর্‌লুম্—তা বৌদি, কার সঙ্গে বিয়ে হবে? খুব বড় লোকের ছেলে আর বরটীও দেখ্‌তে খুবই সুন্দর, কেমন?·· ···

বৌদি বল্‌লেন ও দুটোই নাকি মিলেছে......কেন মিল্‌বে না! বড় লোকের ছেলে আর দেখ্‌তেও খুবই সুন্দর......তা হবে বৈকী। কিন্তু···

থাক্, আর কেন এ সব ছেলেমানুষী;......অজানিতে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়্‌ল!

বৌদি মাথার কাছেই বসে ছিলেন। তিনি বোধ হয় ভাব্‌লেন······হয়তো ঠিকই ভাব্‌লেন······চোখদুটো তার ছল্ ছল্ কর্‌ছিল......বুঝ্‌লুম্ বৌদির তরুণ-বুকে দাগা লেগেচে!......

* * কথার স্রোত একটু হাল্কা করে নেবার উদ্দেশ্যে সহজ সুরেই বল্‌লুম—দেখুন বৌদি লোটীর তো বিয়ে হতে চল্‌ল......ওকে তো আমরা লোটী বলেই ডাকি......ওর ভালো নামটা কি বলুন্ তো!......

বৌদি আঁচলের খুট দিয়ে চোখের পাতা দুটো মুছে একটু জোর-করে-হাসা হেসে বল্‌লেন—অবাক্ করলে ভাই! তাও আজ্‌কে নাগাদ জাননা বুঝি......ওর ভাল নাম লতিকা।

—বাঃ! বেশ মিষ্টি নামটী তো। দু'বন্ধুর নামেরও বেশ মিল রয়েচে—মেনকা আর লতিকা। বৌদি ডাল চড়িয়ে দিয়ে এসেছিলেন। কদ্দূর হল দেখ্‌তে চলে গেলেন।

* * *

মিনু রাত জাগ্‌তে হবে বলে দুপুর টুকুন্ জিরিয়ে নিয়ে প্রায় গোটা পাঁচেকের সময় আমার কাছে এসে বস্‌ত!......

পথের আলোগুলো বাতিওয়ালা একটা একটা করে জ্বালিয়ে দিয়ে চলেছে। আমি একমনে চেয়ে চেয়ে ওই দেখ্‌ছিলুম এমন সময় মিনু এসে ঘরে ঢুকল......চোখে তার জলের দাগ তখনো মোছেনি।......

আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে পায়ের কাছে গিয়ে সে বস্‌ল।

জিজ্ঞেস্ করলুম—তোর চোখে জল কেন রে মিনু?···

মিনু যা বল্‌লে শুনে অবাক্ হয়ে গেলুম্।

তবে...তবে...উঃ! আর যে পারিনে গো!......

লোটীর কাল বিয়ে। সে সারাটা দুপুর মিনুর কাছে কেঁদে কাটিয়ে গেছে—এ বিয়েতে কেন?......

উঃ!

* * *

আজ আমার পথের বাঁশি বেজে উঠেচে আর ঠিক সেই সময়েই চোখের সুমুখে খুলে গেল বাসন্তী রঙের লালিমা-লাগা বসন্তের রাজ্য-দুয়ার!......কে জান্‌তো আজ এই মরণের পিচ্ছিল ঘাটে দাঁড়িয়ে আমার চোখের সুমুখে ভেসে উঠ্‌বে এক স্বপ্ন সেতু যার ওপারে জ্বল্‌চে কল্পনাতীত কামনার কল্প-প্রদীপ কিন্তু···কিন্তু আজ যে আমায় যেতেই হবে।

ওগো কল্পনাময়ী নারী......আজ তুমি আমার আঁখির আগে কেন ওই মধু-পর্কের পাত্র নিয়ে এম্‌নি করে দাঁড়ালে?...···

মরণের মণি কোঠায় পৌঁছে কোন আফ্‌শোষই থাক্‌তো না যদি না তুমি আজ এক মৃত্যু-পথ-যাত্রী তরুণের সম্মুখে এম্‌নি করে অমৃতের সুধা-পাত্র ভাঙ্‌তে!......

এই মাটীর খেলায় আর কতকাল খুসি লাগে?......

তবু···মানুষের মন তো!......

এক মিনিটে কেউ কী এই মিট্‌মিটে সল্‌তেটাকে নিবিয়ে দিতে পারে না ?......

না গো না, শেষ চাইনে ! যার ভাণ্ডারে যা আছে সব দাও......মাথা পেতে নিচ্ছি ।......

আমার খুসির খেসারৎ তো দেউলে......চাওয়া-চাওয়ির বালাই গেছে চুকে !......তবু ওইখানেই তো যত গোল !

* * *

এক, দুই, তিন করে তিরিশটা দিন কল্‌জেটাকে মাটীর মায়ায় বেঁধে রেখেছি ।

আর কটা দিন......কে জানে ?

* * *

দোরটা খুলে দে তো মিনু......কে যেনো ডাকছে !

লোটী...সেই লোটী...তা ও অলুক্ষণে সাদা কাপড়ে কেনো ? পাড়টা উঠে গেছে বুঝি !......দোপাটীর পাঁপ্‌ড়ির দপ্‌দপে রঙ্‌ যেন মিইয়ে গেছে ।

লোটী একটু হাসে ।...অদ্ভুত !

হাসি তো নয় যেন আগুনের ফুল্‌কি !......

চোখ জলে ভরে ওঠে । মুখ ফুটে বেরোয় ভগবানের প্রতি একটা নিস্ফল আক্রোশ !

* * *

মাথার কাছের জানালাটা বোধ হয় মিনু ইচ্ছে করেই খুলে রেখেছিল ।

বাইরে সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে । ভুবনের চারিভিতে কাঁচা সোণার রং ধরিয়ে দিয়েছে ! আর......আবার সেই কথা ।......

লোটী সেই লোটী মাস না ফির্‌তেই বিধবা হয়ে ফিরে এল !

আচম্‌কা ঝরে পড়্‌ল এই তরুণী শিউলির শুভ্র পাঁপ্‌ড়ি-গুলো......বিধাতার বেয়াদপি !—আকাশে তারার মেলা বসেছে......তারই মাঝে বুঝি ওই জীবন-শিল্পীর সিংহাসন পাতা রয়েছে । হে শিল্পী, অপরূপ রঙের তুলিতে নীলাকাশ তোমার বিচিত্র করে তুলেছো.........তোমার এই লীলা-নৈপুণ্যের পায়ে আমার লক্ষ নম্র নতি !

* * * *

পায়ের দিকে দেয়ালে তিন-চারটে Pre-Raphaelite ছবি ঝুল্‌ছে !

চারিদিকে দেখি অতীতের ইসারা !......বেশী তো আর বাকী নেই ।

শয্যায় শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় ধুঁকচি ।

বাইরের পৃথিবীটাও দেখ্‌চি তেম্‌নি রাত্রি শেষের প্রতীক্ষায় একান্তে ধুঁকচে !

চোখে জল.........ঘাসের ওপর দুফোঁটা শিশির টল্‌মল্‌ করে !

আজ শুধু মনে হয়

—শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

রজনীর শেষ প্রদীপ শিখায় জ্বলে' যেই ব্যথা ওঠে,
আজি সে নিরাশ চরম নিশাস বুকে মোর মাথা কোটে।
আজ শুধু মনে হয়
অন্তর তলে আছাড়িছে মোর ভোরের তারার ভয়।
ঊষালোক-ভীতা শেফালি বনের মনের বেদনাগুলি,
মুদে পড়া ম্লান আঁখির কোণায় কেবলি উঠিছে দুলি'।
খর শরাহত ক্রৌঞ্চ কণ্ঠে করুণ কাহিণা যেই,
বেসুর বীণার কড়ি ও কোমলে আমারো কাঁদন সেই।
বাজে শুধু খাদ্ সুর
বিস্বাদ লাগে সরার সরাব মদের পাত্র চুর।
আখার ভিতর জ্বলে যেই আগ্ জানিয়াছি প্রিয়সখী!
মরমের কোণে সারা রাতি যেন কেঁদে মরে চখাচখি!
লোহার বাসর ঘরে
বেহুলার ব্যথা বুকে জাগে মোর লখিন্দরের তরে।
পাণ্ডুর শশি পশ্চিমে ঢলে নিভে আসে আশা বাতি,
ভোরের পাপিয়া কেঁদে কয় পিয়া পোহাইয়া গেছে রাতি।
আজ শুধু মনে হয়
বক্ষের প্রতি কক্ষ আমার হোয়েছে আঁধারময়।

—সচল—

—শ্রীঅরিন্দম বসু

মধুর মোহে দেহের দুয়ারে দহিয়া কখন যে দু'জোড়া চোখের মণি অবসাদের ভারে ঘুমের দেশে দৃষ্টি হারায়, অনুভূতির কাছে অজিত ও সুজিতার কোন দিনই তাহা ধরা পড়ে না। খুব সকালে যখন সোণার আলোর উজল রেখা রুদ্ধ জানালার ছোট্ট একটু ফাঁক দিয়া জাগর-দেশের স্পর্শ আনে, সেই মুহূর্ত্তে সুজিতা তার ডাগর কাজল চোখ দুটি মেলিয়া উঠিয়া বসে,—লুণ্ঠিত নীলাম্বরীর আঁচল টানিয়া ত্রস্তে বুকের উপর তুলিয়া দেয়।.........

এম্‌নি করিয়া নিভৃত নিলয়ের সুপ্তি-স্তিমিত সুন্দর মুখখানির উপর তরুণ উষার অরুণ আলো আসিয়া রোজই মায়াঞ্জন বুলাইয়া যায়,—আর সুজিতার ঘুম ভাঙ্গে।

অদূরে মাঠের শেষে দীঘির বুকে শিশির-সজল পদ্মকলিও দল খুলিয়া ফুটন্ত হয়,—বাতাসে মিশিয়া মুক্ত সুরভি ভাসিয়া চলে।

ভোরের দিক্‌কার স্বপ্নভরা গাঢ় ঘুমটি অজিতের নির্ব্বিকার মুখের উপর মিষ্টি হাসির যে আভাষটুকু রাখিয়া যায়, তারই পানে লুব্ধ চোখে চাহিয়া সুজিতার আবেশ-আকুল অলক-এলো মাথাটি ধীরে সন্তর্পণে নুইয়া পড়ে,—দুটি ঠোঁট উন্মুখ আগ্রহে সঙ্কুচিত হইয়া স্পর্শ লালসায় কাঁপিয়া উঠে।

একটি অতি-মধুর সোহাগ ছোঁয়াইয়া অজিতের ঘুমটি ভাঙ্গাইয়া দেয়।

......বহুদূরে ধনীর প্রসাদ-তোরণে প্রভাতের বিভাসটি হয়তো তখন আকাশ ছাইয়া কাঁপিয়া মরে।

নিমেষহীন নয়নে মুহূর্ত্তের পরে মুহূর্ত্ত নীরবে কাটিয়া যায়,—মনের কথা চোখের নিবিড়তায় ফুটিয়া উঠিয়া শুধু গোপন রহস্যের উৎস রচনা করে। তারপরই নদীর বুকে জোয়ার-জলের আবেগ-ধ্বনির মত সহসা হাসিয়া আকুল হয়—স্বামীর তর্‌তরে নাকটি কোমল দুটি আঙুলের মৃদু পীড়নে টিপিয়া দিয়া সুজিতা তার ঘুম-ভাঙ্গা চোখে, নয়নের বিজুলি হানিয়া খুব আস্তে বলে—ওগো, তবে যাই......

অজিতের দেহের শিরায় রক্ত তখন নাচিয়া ছুটে,—বিবশ-বাহু বেষ্টনী রচনা করিয়া মাতাল হয়।

ধরা না দিবার ছল করিয়া সুজিতা শুধু মুখ টিপিয়া হাসে,—কৃত্রিম রোষ-কটাক্ষে চোখের তারা ভরিয়া তুলিয়া কয়—ধ্যেৎ......

কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই ঐ আকুল আলিঙ্গনের মধ্যে সহসা নিজেকে শেষবারের মত নিস্পেষিত করিয়া ধীরে ধীরে দোর খুলিয়া বাহির হইয়া যায়।

এম্‌নি করিয়া উতলা রজনীর অবসাদে যে ঘুমটি আসে,—তারই অবসানে প্রভাতের অরুণিমায় আবার তাহা ভাঙ্গিয়া যায়—সুন্দর, মধুর, মনোরম।

......সুদূর পল্লীর নিরালা নীড়ে, অজিত ও সুজিতার প্রস্ফুট যৌবনের প্রথম মিলন প্রভাতে একদিন এম্‌নিই ছিল তাদের উন্মুখ প্রণয়ের লীলা ভঙ্গিমা। তারপর......জীবনের সে অপরূপ স্মৃতি লইয়া একটা বছর পেছনে সরিয়া গেছে... কোন স্বপ্ন লোকের বিস্মৃতি-আলয়ে।

বহুদূরে দুর্গম প্রবাসে সেদিন অতি মধুর একটি প্রভাত...

সুজিতা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—পাতার আড়াল থেকে এক ঝলক মিষ্টি রোদ আসিয়া তার চোখে, মুখে, চুলে ঝলিয়া গেল। দু'টি চোখ আঁচলে মুছিয়া দেখিল, সম্মুখের বারান্দায় একখানা ডেক চেয়ারের উপর নিশ্চিন্ত নীরবে বসিয়া সিদ্ধার্থ........

সদ্যপরিত্যক্ত এক রাশ সিগারেটের ধোঁয়া তার আশে পাশে কুণ্ডুলি পাকাইয়া উর্দ্ধমুখী হইয়াছে, ভেসে-চলা অম্বর অলক-মেঘের মত সুন্দর, সুস্পষ্ট। বিস্মৃতি নষ্ট করিয়া সিদ্ধার্থ সহসা যেন ব্যগ্র হইয়াই সুজিতার মুখের পানে চাহিল। সেই অতর্কিত অনিমেষ চাহনির অর্থ সুজিতা

কি বুঝিল কে জানে,—কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে গতরজনীর নিপীড়িত যৌবনের চমক-স্মৃতিটুকু তার সারা দেহ মনে লজ্জার প্রবাহ বহাইয়া গেল।

সিদ্ধার্থ যখন মুখ টিপিয়া হাসিয়া সুপ্রভাত জানাইল, সে তার মুখের উপর চোখ তুলিয়া আর চাহিতে পারিল না।

প্রভাতের স্বর্ণালোকে এই গতি ত্রস্তা সরমা মেয়েটিকে দেখিয়া সিদ্ধার্থের মনে হইল গত নিশীথে অজিতের শয্যা-সঙ্গিনী কাম-কলা-পটিয়সী সেই তন্বীটি যেন এ নয়।

—রাত্তিরে আপনার ভালো ঘুম হয় নি বুঝি?

—হ্যাঁ, ইচ্ছে করেই জেগেছিলুম······

—হয় তো নতুন জায়গা, তাই···

—কিন্তু তার ওপরও জীবনের মস্ত একটা লোভ······ কি সে রহস্য আর কি সে আকুলতা!······তোমাদেরই ঘরের ঐ বাতায়নের পাশে······মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত।······জীবনের শত অনুযোগ······শত অনুশোচনা······ও কি তুমি চম্‌কে উঠ্‌লে সুজিতা?······মুখখানি যে তোমার রক্তিম...লজ্জা? কিন্তু কেন?······একদিন আমার জীবনেও তো তোমার অম্নিই পুলক-স্পর্শ পেতুম ·····অম্নি মাদকতা··প্রেমের অম্নি অভিমান······অমনিই মঞ্জুল গুঞ্জরণ······তারপর নিশান্তের সুখ-সুপ্তি ভাঙ্গিয়া প্রভাতের অভ্যস্ত জাগরণ······রোজই···

—চুপ করুণ, ও কি কইচেন আপনি?

—কিন্তু স্বীকার করো মিথ্যা এ নয়····· হয় তো সেদিন মুহূর্ত্তের ভুল করেছিলুম, নইলে আজ আমারই দেহের প্রাঙ্গণে তোমার ঐ উন্মুখ যৌবনের বসন্তোৎসব হোত...... শোন, শুনে যাও সুজিতা······

গোধূলি-লগ্নে পশ্চিম-দিগন্তে সন্ধ্যা সিঁদুর লেপিয়া গেছে।

শিলাতটে অজিত ও প্রিয় বন্ধু সিদ্ধার্থ বসিয়াছিল। অদূরে ছোট্ট পাহাড়টির অন্তরালে অদৃশ্য অরণ্যের উদাস মর্ম্মর ধ্বনি বাতাসে মিশিয়া দিগ্বিদিক্ ছড়াইতেছে।

বন্ধুর অনুরোধে সিদ্ধার্থ গাহিল—

'শোনো শোনো ওগো বকুল বনের পাখী
আর বার তারে ফিরিয়া ডাকিবে নাকি'—

দেহ-তন্ত্রীর পর্দ্দায় পর্দ্দায় অপরূপ সুরের মূর্চ্ছনা কাঁপিয়া মূর্চ্ছিয়া গেল······মনের কোনে সুখের আবেশ মায়া ছড়াইল।

একপাশে একটী শিশু শিমুলের নীচে দাঁড়াইয়া কোন্ অমরাবতীর বাতায়নে নক্ষত্র-মালিকার পানে নির্নিমেষ-নয়নে চাহিয়া সুজিতা যৌবন-স্বপ্ন রচিতে ছিল,—সিদ্ধার্থের গানে চকিত হইয়া উঠিল।

যৌবনের প্রথম ফাল্গুনের ভুলে-যাওয়া কত স্মৃতি আর কত কথা!······

সুজিতা ভাবিল তিনটি বছর আগে তার এই দেহকুঞ্জকে লতাইয়া যৌবনের মাধবী-মঞ্জরীটি যখন প্রথম বসন্তের বারতা বহিয়া দেখা দিয়াছিল,—রামধনুর বর্ণচ্ছটা যখন তার ছুটি চোখের সম্মুখে প্রথম আলো ছড়াইয়াছিল, তখন তার সেই দেহকুঞ্জটি এই সিদ্ধার্থেরই মোহন স্পর্শে, পুষ্পে-পর্ণে-গন্ধে-বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়া ছিল।

কিন্তু সেথায় প্রবেশ তখন সে করে নাই,—প্রলুব্ধ যৌবনের আকর্ষণে দূরের দুরাশায় নিজেকে দূরে সরাইয়া লইয়াছে।

আজ ফিরিয়াছে অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস লইয়া।

সুজিতার মনে পড়িল—একদিন সন্ধ্যার বকুলে মালা গাঁথিয়া নিজের হাতেই সে তার কণ্ঠ জড়াইয়া দিয়াছিল।

সিদ্ধার্থের কণ্ঠ তখনও নিঝুম হয় নাই,—ফিরিয়া ফিরিয়া শুধু সে গাহিতে ছিল—

'শোন শোন ওগো বকুল বনের পাখী
দূরে চলে এনু, বাজে তার বেদনা কি?'

সন্ধ্যা-রবির অস্তরাগের পানে চাহিয়া সুজিতার আঁখি সেদিন উদাস হইয়া রহিল।

অজিত কবিতা লেখে, সুজিতা মুগ্ধ হইয়া শোনে,— কখনো আঁখির তারা প্রশংসার বাণীতে ভরিয়া তোলে।

কিন্তু শ্রাবণের বাঁধন-হারা বাদল-ধারায় শুধু যখন কবিতাই লিখিয়াছে, সুজিতার তখন অনুযোগের সীমা থাকে

নাই, রুদ্ধ অভিমান বাধা মানে নাই। রাগিয়া বলিয়াছে—কি যে ছাই লেখা,—আর বুঝি কিছু নেই?......কবিতা আর কবিতা—যা—ও......

অজিত সম্পাদকের তাড়ার কথা বলিয়াছে,—তারপর মিষ্টিসুরে মিনতি করিয়া জানাইয়াছে—এই তো হোল জিতা......

কিন্তু সত্য সত্যই সে রাতটি বিফল গিয়াছে।

সুজিতার মনে সন্দেহ জাগিয়াছে অজিত তার উপর বিতৃষ্ণ,—কিন্তু ভাবিয়া পায় নাই—কেন?

প্রবাসের এক শিশির-গুণ্ঠা শুক্লা রাতে অজিত যখন কবিতা লিখিয়া আগ্রহ-কণ্ঠে শোনাইল—

'সে ছাড়া আর কাহার আঁখি অমন মায়া বোনে?'

সুজিতা তখন কোন কথাই কহিল না,—উন্মনা হইল।

শরতের পাগল হাওয়ায় উতল হইয়া সিদ্ধার্থের সরস গলার সুরগুলি সুজিতার মনের আগল ধীরে ধীরে খুলিয়া ফেলিতেছিল। অজিতের সেদিকে দৃষ্টি ছিল না—কবিতার মোহে সে তখন পরিপূর্ণ মাতাল।

যশের দীপ্তি তার মনের দেউলে দেয়ালি দিয়াছিল।

প্রহরের পর প্রহর জাগিয়া কবিতা লিখিত,—তারপর প্রভাতে কবি-বন্ধুকে তাহা পড়িয়া শোনাইত, সমালোচনা করিত।

সুজিতা এই কাব্য-মুখরতায় যোগ দিতে পারিত না, ইচ্ছা করিয়া আন-কাজে ঘুরিয়া বেড়াইত।

এমনি করিয়া কিছুকাল কাটিল—রাতের পর দিন দিনের পর রাত—

কিন্তু ব্যর্থ তার অভিমান—ব্যর্থ তার মাধবী স্বপন।

নিশীথ্-রাতে চাঁদের আলো বাতায়ন-পথ দিয়া জ্যোছনা ছড়াইত, অজিত হয়তো তখন কোন্ কল্পনা-কাননে বিভোর হইয়া থাকিত, অনুভূতির ভিতরে আর কোন ছাপও পড়িত না।

পাশের ঘরে স্বপন ঘোরে সুজিতার বন্ধন-হারা বাহু ছটি তখন আশ্রয়-আশায় ব্যর্থ বইয়া লুটাইয়া পড়িত...... অন্ধকারের অবগুণ্ঠন-অন্তরালে বিরহের দীর্ঘশ্বাস উদাস হইয়া বাতাসে মিশিত......প্রিয়ার মিলন সুখের আশায় অজিতের যে যৌবন-মনটি একদিন শয্যার বন্ধন-মোহে আকুল হইয়া থাকিত, আজ সে নির্ব্বিকার, অচঞ্চল।

সুজিতার মনে সন্দেহ ভারি হইয়া উঠিল—অজিতের প্রিয়া-বিমুখ গৃহ-নিস্পৃহ হৃদয়টি স্থানান্তরে বাঁধা পড়িয়াছেই।

আজকাল অজিত আরও নিয়ম করিয়া গৃহের বাহির হয়।

প্রবাসের দিনগুলি ক্রমশঃ কমিয়া, ফিরিবার সময়টি যতই সম্মুখে আসিয়া পড়িতেছিল, কবি-যশ-লিপ্সু তার তরুণ মনটিও নিসর্গের সৌন্দর্য্য-সম্ভোগে ততই উন্মুখ হইয়া উঠিতেছিল।

কাঁকর-ভরা রাঙা-মাটির উঁচু-নীচ পথ দিয়া সন্ধ্যায় প্রভাতে বেড়াইতে বাহির হইয়া অদূরে তুষার শৈল-শিখরের পানে ছটি চোখই তার বাঁধা পড়িত। উদয়-দিগন্তে উষার সিঁদুর-রেখা,—গোধূলিতে অস্ত-রাগের আবির আল্পনা, ঐ শৈল শুভ্রতায় রংয়ের ফুলঝুরি ছড়াইয়া যাইত।

শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া অজিত অবাক-বিস্ময়ে অনিমেষ-আঁখিতে চাহিয়া থাকিত।

হয় তো কোথাও ভ্রমণ-বিরতা তরুণীরা দলবিচ্ছিন্ন হইয়া পাহাড়ের উপত্যকায় স্বচ্ছ উপলখণ্ডের সন্ধান করিত,—প্রসাধন-গন্ধে বাতাস আমোদিত হইয়া ফিরিত। তাদের যৌবন-চঞ্চল চকিত চোখের চটুল চাউনি,···ঠোঁটের কোণে মুচ্‌কি হাসির চুমার মোহ সুরত-সুখের আকুলতার আভাষ জাগাইত।

দিনান্তের ক্ষীণ আলোর রেখাটুকু বিলীন হইবার আগে অজিতের স্বপ্ন-বিহ্বল মনটি গৃহের টানে আর সাড়া দিত না। পাহাড়ের বুকে ঝর্ণাধারার ঝর্ ঝরাণি, গানের সুরে ধ্বনিত হইয়া অন্ধকারের ঝিল্লি-মুখরতায় যখন অস্পষ্ট হইয়া ভাসিত, অজিতের মোহ তখন টুটিয়া যাইত,—ধীরে ধীরে সে উঠিয়া দাঁড়াইত।

সিদ্ধার্থের আকাঙ্ক্ষা দীপ্ত অতৃপ্ত চোখের পানে চাহিয়া সুজিতা সমস্তই বুঝিল এবং কোন কিছুর প্রতিবাদ না করিয়া নীরবেই শুনিয়া গেল।

সবার শেষে শুধু বলিল···সে কথা থাক্····এমন সুন্দর সন্ধ্যেবেলাটি জীবনের বিফলতার আক্ষেপে নষ্ট করে হয় তো তার উপভোগটাই বেশী মধুর হবে আজ······অন্ততঃ একটা গানও যদি······না হয় আপনিই বলুন, কি লাভ আছে ওতে?······

সিদ্ধার্থ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল···সুজিতার একখানি হাত নিজের হাতের ভিতরে টানিয়া লইয়া বলিল—কিন্তু সেই আক্ষেপটাই যে আমি দূর করতে চাই সুজিতা······

নিজের কোমল কর-পল্লবের উপর পৌরব-প্রবল চাপটুকু অনুভব করিয়া সুজিতা নীরবেই বসিয়া রহিল।

সাবধানে বাঁচাইয়া চলিবার মত যাহা তার ছিল তাকে খুইয়াছে সে তো অনেক দিনই······এখন আর গৌরবের কি আছে?

মনের দিকটা ভাবিতে গিয়া অচলার হাসি পাইল—হেথায় হোথায় কোথাও তার ছাপ নাই।

সুজিতা উত্তরে শুধু বলিল—বছর তিনেক আগেকার স্মৃতি গুলি আজো আমার ভালোই মনে পড়ে—সে আমি ভুলিনি—তাই তো আপনি চান?······কিন্তু আমি অবাক হই বন্ধুর প্রতি এত বড় অবিচার কি সত্যি করেই আপনি করবেন?······কৃতজ্ঞতা বলেও কি কিছু······

সিদ্ধার্থ শুধু বাধা দিয়া অপ্রতিভ হইয়া রহিল।

কিন্তু নিজেও সে সত্যি করিয়া কিছু ভোলে নাই—মনে পড়িল, একদিন তারই স্পর্শ-পুলকে কাঁপিয়া-ওঠা সুজিতার কনক-চাঁপা আঙুল গুলি যে বারতা জানাইয়াছিল মনে মনে তাকে বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছুই সে করে নাই। হয় তো তারই লাগিয়া অচলার আজ এই অভিমান।

অবশেষে কি ভাবিয়া কিসের আবেগে সিদ্ধার্থ গাহিল—

'এই পথ পাশে বাঁধিয়াছি বাসা দিন কাটে গান
গেয়ে—'

সুর সপ্তমেই চড়িয়াছিল।

দূরে—বহুদূরে সন্ধ্যা তারাটি তখন আকাশের কোণে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

আরও একটা দিন।······

ঈষৎ ঢলিয়া-পড়া সূর্য্যকে আড়াল করিয়া পাইন-বৃক্ষের সারগুলি, নীচের তৃণ-কোমল শ্যামলিমার বুকে ধূসর ছায়া ছড়াইয়াছে।

সকাল বেলায় সিদ্ধার্থ কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিল—সত্যিকারের কবি হইতে গেলে প্রকৃতিকে নিবিড় করিয়া উপলব্ধি করা চাই।

কথাটায় অত্যুক্তি ছিল না বলিয়াই অজিত সেদিন সকাল সকালই বাহির হইয়াছিল।

বাংলোর সম্মুখে পাইন-তরুর ছায়ায় বসিয়া সিদ্ধার্থ সুজিতাকে বলিল—পিণ্ডারি-গ্লেসিয়ারের পথে বেড়াতে যাবে সুজিতা? গ্লেসিয়ার দেখা যখন সম্ভব নয়ই, তখন ঐ দিক-পানেই যতটা পারা যায় বেড়িয়ে আসা মন্দ কি!·········অজিত তো ভীমতালের দিকেই গেচে—সাম্‌নে জ্যোছ্‌না রাত·········হ্রদ-বিহার না করে নিশ্চয়ই সে শিগ্‌গির ফিরচে না।······

ঐ বিরাট তুষার-আবৃত দুগ্ধ-ধবল গ্লেসিয়ারের কথা সুজিতা আলমোড়ায় আসিবার আগেও অনেকের মুখে শুনিয়াছিল—কৈলাসপর্ব্বতে উঠিবার দুর্গম পথটি নাকি ওরই পাশ দিয়া।

সুজিতা সংক্ষেপে সম্মতি জানাইয়া কহিল—বেশ তো···

সিদ্ধার্থ ক্ষুব্ধ হইয়াছিল—সুজিতা সমস্ত কথা নীরবে মানিয়াও তবু ধরা দিতে চায় না।

সেদিন সে ঠিক করিল আজ যেমন করিয়াই হোক্ একটা সমাধান করিয়া লইবেই—রহস্যকে সে আর গোপন রাখিয়া চলিতে পারিবে না।

বেলাও তখন বেশ ছিল। বসন পরিবর্ত্তন এবং প্রসাধন সমাপ্ত করিয়া সুজিতা আসিয়া চা'য়ের টেবিলে বসিল,—সিদ্ধার্থকেও আহ্বান করিল।

পোরটীকোর বাহিরে সোফার গাড়ী লইয়া আসিয়াছিল

অনেকক্ষণ। সিদ্ধার্থকে সে রাস্তার ইতিহাস জানাইতেছিল—দুইধারে কোথায় গভীর পাইন-বন—মাঝে মাঝে দূরের অপরিসর সমতল-ভূমিতে দেওদারের সার—তারই ভিতর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া উঁচু নীচু রাস্তায় চলিতে হয়। বিশেষতঃ বেলা পড়িয়া আসিলে আর কথাই নাই—সুমুখের পানে দৃষ্টি একেবারেই চলে না। মনে হয় নিস্তরঙ্গ হিম-সাগর জমাট বাঁধিয়া আকাশের সঙ্গে পৃথিবীকে এক করিয়া বাঁধিয়াছে। তখন ফিরিয়া আসা ছাড়া আর নাকি কোন উপায় থাকে না। তবে বেলা বেশী এবং আকাশ নির্মেঘ থাকিলে ধবল-গিরি দর্শন মিলিলেও মিলিতে পারে। এই-টুকুই একমাত্র আশার কথা।

সিদ্ধার্থ শুনিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

সুজিতার দেহ-সজ্জাটি মহার্ঘ না হইলেও দেখাইতেছিল বেশ। সুনীল-শাড়ীর উপর সাদা কাশ্মিরী শালখানি অপরিপাটী-রূপে পড়িয়াছিল।

সিদ্ধার্থ লুব্ধ চোখে পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল—দুটি কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল—বহুদিন তোমায় এমন দেখিনি সুজিতা!

সুজিতা নীরবেই শুনিল—কোন শ্লেষের কথা যে তার মুখ দিয়া বাহির হইবে না সে তাহা ভালোই জানিত। সিদ্ধার্থ যাই বলুক—তার সম্বন্ধে সমস্ত প্রশংসার উক্তিই যে তার মুখে অতি সুলভ সে কথা বিন্দুও মিথ্যা নয়। সেদিনও অজিত বাহির হইয়া গেলে সে যখন তাকে উদ্দেশ করিয়াই কবিতা রচিয়াছিল—

'শোনো গো সোণার মেয়ে—
নয়ন উপাড়ি' দিয়ে দিতে পারি, তুমি যদি নাও চেয়ে।'

সুজিতা তখনও উন্মনা হয় নাই বরং মনের কোণে একটা গোপন হাসিরই সৃষ্টি করিয়াছিল।

সিদ্ধার্থ আজও কিছু শুনিবার আশা করিল কিন্তু সোণার মেয়ে বলিয়াই হয় তো সুজিতা মুখ তুলিল না।

কয়েক মুহূর্ত্ত সিদ্ধার্থ অচল হইয়াই সুজিতার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিল।

ভৃত্যটী বাটীতে চা' ঢালিয়া তখন অন্যকাজে অন্যদিকে অন্তরাল হইয়াছিল।

সুজিতার কাঁধ ছাড়িয়া সিদ্ধার্থের দুটি হাতই যে কখন কিসের আশায় ধীরে ধীরে উর্দ্ধমুখী হইতেছিল সুজিতা তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেও প্রতিবাদের প্রবৃত্তি তার জাগিল না। একদিন তারই যৌবনের যে দুর্লভ সম্পদটুকু সিদ্ধার্থেরই বাসনার বিষে জর্জ্জর হইয়া শুধু জীবনের দুঃসহ দুর্ব্বলতাকেই প্রকাশ করিয়া দিয়াছে আজ তাকেই জাগ্রত করিবার আগ্রহ এবং মনের অটলতাখানি অন্ততঃ সিদ্ধার্থের কাছে তার কিছুতেই ফুটিতে পারিল না। ভাবিল—হয়তো ঐ টুকুই সে নগ্ন-বিদ্রূপের চোখে দেখিবে—তার সত্যিকারের মর্য্যাদাকে তীব্র উপহাসের হাসি দিয়া নির্ম্মম অপমান করিবে·········

মনের আগুণ মনেই সুজিতা চাপিয়া রাখিল।

সেদিন চা'র বাটীতে চুমুক দিবার আগে সুজিতার চিবুক তুলিয়া সিদ্ধার্থ অনেকদিন পরেই আবার তাকে জোর করিয়া চুম্বন করিল।

বাংলোর সুমুখ হইতে হুড-ফেলা মোটরখানি দুটি প্রফুল্ল তরুণ-তরুণীকে লইয়া সেই যে বিকাল বেলায় বাহির হইয়া গেল, সেরাত্রে আর সেখানে আসিয়া দেখা দিল না।

অনেক রাতে নৈশ-বিহার সমাপ্ত করিয়া অজিত যখন গৃহে ফিরিল—গৃহ তখন শূন্য। এই প্রথম সে উন্মনা হইল—ভৃত্যকে ডাকিয়া উষ্ণ-কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করিল—তারা কোথায় গেছে—জানো?

ভৃত্য সংক্ষেপেই উত্তর দিল—না।

উপরন্তু জানাইল—এম্‌নি রোজই—আজ দেরী কেন হইতেছে, সে তাহা জানিবে কি করিয়া?

ফিরিবার সারাটী পথে সুন্দর একটী সরস কবিতা লিখিবার প্রেরণা অজিতের কবি-চিত্তকে কল্পনায় বিভোর করিয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু বাংলোয় ফিরিয়া তাহা যখন ঝাঁঝালো মনের শিখা লাগিয়া সুদূর হইল, তখন শূন্য কণ্টক-শয্যা গ্রহণ ছাড়া আর কোন উপায়ই রহিল না।

সেদিন সারাটী রজনী অজিতের বিনিদ্র কাটিল।

সময়টী সকাল হইলেও ঘড়ীতে তখন প্রায় নয়টা।—কুয়াশার শ্বেত-গুণ্ঠায় প্রভাতের রোদটুকু দরিদ্র হইয়াই ছিল।

অজিত চা'য়ের টেবিলে বসিতে গিয়া শুনিল—বাইরে মোটরের শব্দ—হয়তো সেই মুহূর্ত্তেই থামিয়াছে।

চোখাচোখী হইতে দিবে না বলিয়াই সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রাখিল।

প্রথমেই দেখা দিল সিদ্ধার্থ—মুখখানিকে সহাস্য করিবার চেষ্টা যদিও সে প্রাণপণেই সাধিয়াছিল কিন্তু দুটি চোখ তাহাতে সাড়া একটুও দেয় নাই। তবুও আনত চোখেই কহিল—বড় বিপদেই পড়েছিলাম অজিত—মোটরটা কেন যে আমাদের ফেলে চলে এসেছিল—সে কথা ভেবেই পাইনে। অথচ ওই সোফারের জন্যই এত বিপত্তি।.........গাড়ীর জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে করে' শেষটায় হেঁটেই রওনা দিলুম—আর কি করা, যদি বা নিকটেই কোথাও একটা রাতের জন্য আশ্রয় পাওয়া যায়। কিন্তু সাধ্য কি যে—সেই জমাট কুয়াশা আর কনকণে ঠাণ্ডা হাওয়ার ভেতর দিয়ে চলতে পারি—খানিকটা চলেইতো সুজিতার হাত-পা একবারে অসাড় হয়ে এলো।—এদিকে অন্ধকারও যেমনি, তেম্‌নি উত্তরে হাওয়াও প্রবল।......আশে পাশে পাহাড়ের ওপরে টুক্‌রো টুক্‌রো বরফ পড়বার শব্দ,—দেখে শুনে মনে হ'ল—বুঝি এই নির্জ্জন বন্ধুর পথেরই কোন খাদে পড়ে ঠাণ্ডায় জমে একবারে জন্মের মত নিঃসাড় হতে হ'বে। তবুও অতি ক্ষীণ একটা আশার ওপর নির্ভর করে মাইলখানেক এগিয়ে গেলুম—এম্‌নি সময় দূরে মোটর দেখা গেলো........

এই টুকু বলিয়া সিদ্ধার্থ কোন মতে অজিতের পানে চাহিল—কিন্তু তাহার নির্ব্বিকার গম্ভীর মুখের ওপর কোন কিছুর ছাপই সুস্পষ্ট দেখিতে না পাইয়া একটু আশার সুরেই আবার সুরু করিল—কিন্তু সোফার যা বল্লে—তাতে আর সেই রাতেই বাংলোয় ফিরে আসার সম্ভাবনা খুঁজে পেলুম না—বল্লে, বাবু, এম্‌নি অবস্থায় যাওয়া কিছুতেই চলতে পারে না—হয়তো এখুনিই বরফ পড়া সুরু হবে।—শুধু আপনাদের বিপদের কথা মনে করেই আমি আসচি নইলে এই দুর্য্যোগে,—আকাশের এমনি অবস্থা দেখে—সাধ্য কি যে মোটর চালিয়ে আসি—হাজার টাকার লোভেও হয়তো নয়। এই দেখুন, আমি তো একবারে জমে গেচি—আর সামনেও রাস্তা কম নয় দেড় ঘণ্টার পথ—মাইল পনেরোর কিছু বেশী তো খুবই।.........তার চেয়ে চলুন—ঐ যে দূরে একটা আলো দেখা যাচ্ছে—ওটা একজন বাঙ্গালীরই বাংলো—আমার সাথে আলাপ ও আছে—আজ এই রাতটা ওখানেই কাটিয়ে দিয়ে তারপর কাল সকালে যা হয় করা যাবে।'

সিদ্ধার্থ ক্ষণকাল চুপ করিল,—সুজিতা ইতিমধ্যে টেবিলেরই একপাশে বসিয়া চা' পান করিতেছিল—যেন অজিতের ঔদাসিন্য সম্বন্ধে কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নাই।—সিদ্ধার্থের চোখে একটু বিস্ময়ই ঠেকিল।

অবশিষ্ট কয়টী কথাও সে আর নিঃশেষ না করিয়া পারিল না—বলিল, কে জানতো প্রেসিয়ারের পথে বেড়াতে গিয়ে এম্‌নি হ'বে—সোফার বলছিলো—এম্‌নি আধাগরমের সময়ে এমন ধারা দুর্য্যোগ—এমন আকস্মিক পাহাড়িয়া-ঝড় বৃষ্টি সচরাচর হয়ই না।—তারপর অগত্যা রাতটা সেই বাংলোতেই কাটানো গেল—ভদ্রলোকটী বেশ অমায়িক—নামটী মন্দ নয়—ভালোই আদর যত্ন করলেন—হ্যাঁ, আজ বিকেলে তিনি সকলের সঙ্গে দেখা করিতে আসবেন বলেছেন—

অজিত তবুও কথা বলিল না। মনে মনে ভাবিল কিন্তু কাল রাত্রে তো বেশ জ্যোছনাই ছিল।—হয়তো সব কথাই সে অবিশ্বাস করিল। সুজিতা চায়ের বাটিটী নিঃশেষ করিয়া এতক্ষণে কথা কহিল—বলিল, কিন্তু আসল কথাটাই যে বাকী রইলো সিদ্ধার্থবাবু—এ অভিযানে আপনার লাভের কথাটুকু আপনার প্রিয় বন্ধুর কাছে খোলা খুলিই আমি বলে নিতে চাই—তারপর যা হয়......

সিদ্ধার্থ যেন উন্মনা হইয়া উঠিল—মুহূর্ত্তে কি একটা জড়তা-মাখা কথা অতি অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করিয়া পাশের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। কিন্তু তারপরই যে কোন পথে কি করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল—অজিত ও সুজিতার কেহই তাহা জানিতে পারিল না।

সুজিতা সব কথাই প্রকাশ করিল—অজিতকে স্পষ্ট কথায় বলিল—সোফারের দোষ কিছুই নয়—তোমার প্রিয় বন্ধুটি ইচ্ছে করেই কাল কিছুক্ষণের জন্য মোটর বিদায় করে দিয়েছিলেন—হয় তো জীবনের একটা দুর্লভ সুযোগের আশায়। তিনি মনে মনে আদায় করতে চেয়েছিলেন অনেক কিছুই—কিন্তু যেমন করেই হোক, যা পেয়েছিলেন—কি যে তার দাম, তা' আমিই জানি,—কিন্তু এই বিম্ব-ঠোঁটের একটি ছাপ তার অধরে না এঁকে দিয়ে আমি পারনি…… হয়তো আমার দুর্ব্বলতা. কিন্তু তা'ছাড়া আর কিছু সাধ্য তখন হয় নি। এককালে তার যে দাবী ছিল তারই জুলুমটুকু তিনি প্রকাশ করেছিলেন—সেজন্য দোষ হয়তো সবখানিই তার নয়।

সুজিতা তার প্রথম যৌবনের অতীত ইতিহাসটুকু একে একে অজিতের কাছে বলিয়া গেল।

তার নিজের বিবাহিত জীবনে তিন বৎসরের ক্ষুব্ধ বেদনার সঙ্গে গত সন্ধ্যার কাহিনীটা সরল ভাবে বিবৃত করিয়া সর্ব্বশেষে সহসা অধীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—তুমিও কি এতে দায়ী একটুও নও?……তা' যাক্……কিন্তু এর পর? একটিবার কি বলবে সে কথা?

কিন্তু সুজিতার সমস্ত আশাই ব্যর্থ হইল।—নির্ব্বাক অজিত যখন উঠিয়া গেল—মনে হইল—অত্যধিক সুরা-বিষে তার দেহখানি যেন অবশ হইয়া গেছে—এমনিই তার চলার ভঙ্গিমা।

একটু পরেই ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিয়া গেল—এইমাত্র সিদ্ধার্থবাবু ষ্টেসনে চলিয়া গেলেন—দশটার ট্রেণেই তিনি দেশে ফিরিবেন।

অজিত এই অত্যাশ্চর্য্য সংবাদটি শুনতে পাইল না—কিন্তু সুজিতা শুনিয়া ক্ষীণ হাসি হাসিল।

যক্ষ্মাক্রান্তা পত্নীকে আলমোড়ায় আনিয়া পরিমল অনেক কিছুই আশা করিয়াছিল কিন্তু শেষ অবধি তাহা পূর্ণ হয় নাই—ঐ ভীমতালেরই পাশে প্রিয়তমার চির-বিদায় স্মৃতি রচিতে হইয়াছে।

অতঃপর বাংলো পরিবর্ত্তন করিয়া আজ ছয়টি মাস সে এখানেই রহিয়া গেছে—দেশে আর ফেরে নাই।

গত রজনীতে সুজিতাকে আকস্মিক দেখিয়া এবং তার সাথে আলাপ করিয়া পরিমলের ভালোই লাগিয়াছিল,—অতিথি হিসাবে এমন একটা সম্পদ দুর্লভ বলিয়া সে সম্বর্দ্ধনাও যেমন করিয়াছিল,—তৃপ্তিও পাইয়াছিল ঠিক তেমনি। এই মেয়েটির দুটি চোখের অবশ চাহনির অন্তরালে অনেকখানি ব্যথাই যে অস্পষ্ট হইয়া আছে,—অর্থ তার সে নাই বুঝুক, সহানুভূতি জাগিয়াছিল খুবই।

সেদিন সকালে সুজিতারা চলিয়া গেলে—এমনই অকারণে তার শোক-আর্দ্র মনটি সহসা ব্যথিত হইয়া উঠিল—সুদূর আকাশের পানে আন-মনে চাহিয়া ভাবিল—ওরই সাথে যেন এই তরুণী মেয়েটির অনেকটা মিল আসে।

পরিমলের ক্ষুব্ধ বুকটিকে দোলা দিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহিরে আসিয়া মিলাইয়া গেল।

বেলা তখনও পড়িয়া আসে নাই।

বাংলোর পশ্চিম দিককার ক্ষুদ্র একটী কক্ষের মেঝের উপরে সুজিতা চিন্তা-নিবিষ্ট-মনে বসিয়াছিল। সুমুখে স্তুপীকৃত বিচিত্র জিনিষ পত্র—শাড়ী, ব্লাউজ, রুমাল, চিঠির তাড়া প্রসাধন-সুগন্ধি…… এমনই আরও অনেক কিছু। পাশে পড়িয়া শূন্যগর্ভ সুন্দর একটী সুট কেস।

সুজিতা নিশ্চল হইয়া অজিতের কথা ভাবিতেছিল—তাকে একটা কথা বলিবার মত প্রবৃত্তি তার সত্যি করিয়াই এখনো আছে কিনা, সে কথাটাই সে স্পষ্ট করিয়া জানিতে চায়।

সেই মুহূর্ত্তে ভৃত্য আসিয়া একখানি চিঠি দিয়া গেল—বলিল, বাবু দিয়ে গেছেন।

সুজিতা চকিত হইল—গেছেন—সেকি?

ভৃত্য কহিল—হ্যাঁ, এই মিনিট দশেক হবে—আমায় কিছু বলে তো যান্ নি, কি করে জানবো?

সে চলিয়া গেলে—সুজিতা চিঠিখানা খুলিল।

অজিত লিখিয়াছে—যা' ভালো বুঝলুম তাই করা ছাড়া আর উপায় কি? আমি চল্লুম—কোথায়—সে কথা শুনে

দরকার যখন কিছুই হবে না—তাই বলাটা নিরর্থকই মনে করুচি। সিদ্ধার্থকে বলবার মত প্রবৃত্তি আমার নেই, খবরটা তুমিই তাকে দিও। জীবনে তোমায় যতখানি ভালোবেসেছি তার দাম আজও যে খুব বেশী দাঁড়ায়নি, এটা ঠিক।—অন্ততঃ হিসেব খতিয়ে আজ তাই স্পষ্ট বুঝতে পাচ্ছি।—দুটো অতি তুচ্ছ মন্ত্রের বন্ধনই দুটো জীবনকে এক করে দেয় না,—কাজেই তাকে বড় করে দেখার সুবুদ্ধি দেখি না—ইতি—অজিত—

এতটা সত্যি করিয়াই সুজিতা ভাবে নাই,—সুমুখের টেবিলের একপাশে কাগজের একটা টুকরা পড়িয়াছিল,—অন্যমনস্ক হইয়া সে তাহাই তুলিয়া লইল। কিন্তু দেখিল—তাকে উদ্দেশ করিয়া লেখা সিদ্ধার্থের কবিতার খানিকটা অংশ—অস্পষ্ট দৃষ্টিভরা চোখে সুজিতা পড়িল—

সোণার মেয়ে গো শোনো—
লাজের জড়িমা রেপোমা জড়ায়ে ভয় রাখিয়োনা কোনো।
আমার এ ঘরে তাজা মধু আছে, রসে ভরা জামরুল,
আঙিনার পাশে অঝোরে ঝরিছে ব্যাকুল বকুল ফুল,
মাটির মেঝেতে বিছায়ে রেখেছি চিকণ শীতল পাটি,
আলপনা আঁকা একখানি পাখা রাখিয়াছি পরিপাটি।

সুজিতা আর পড়িতে পারিল না! কাগজের দুটি টুকরাই নিজের কোমল আঙুলের নির্ম্মম বন্ধনে পিষিয়া ধরিল। শুধু একটা ক্ষীণ হাসির রেখা তার পাণ্ডুর ঠোঁট দু'টির উপর উদাস হইয়া খেলিয়া গেল।—কিন্তু তারপরই সহসা আর্ত্ত-আকুলতা………

সুজিতা মেঝের উপরে লুটাইয়া পড়িল—মা-গো……

•

সেদিন আর জ্ঞান হইল না—সারারাত শিয়রে বিনিদ্র বসিয়া রহিল পরিমল—আর রহিল অধীর উদ্বেগ বুকে লইয়া সেই ভৃত্যটি।

সকাল বেলায় জ্ঞান যখন হইল—পূবের আকাশ তখন হাসিয়া উঠিয়াছে। সুজিতা অবাক হইয়া ক্ষণ-কাল চাহিয়া রহিল—তারপর লজ্জা-জড়িমা-কণ্ঠে কহিল……আপনি……পরিমলবাবু…সেকি ?

পরিমল সংক্ষেপেই বলিল…কাল সন্ধ্যায় আপনাদের সাথে দেখা করতে এসেছিলুম,…তারপরই দেখি এই ব্যাপার ……যা' ভয়টাই আপনি দিয়েছিলেন…তা' থাক সে কথা এখন…আপনাদের চাকরের কাছেই কিছু কিছু আমি শুনেছি,…বাকীটা না হয় পরেই আপনার মুখে শুনবো…এখন চলুন আমার সাথে…আপনাকে ফেলে আমি যাবো না…নিন্ তৈরী হয়ে পড়ুন্।

সুজিতা ক্ষণকাল কি যেন ভাবিল…তারপর মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল পরিমলের মুখের পানে প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল…বেশ চলুন,…আমি তৈরী,…সাথে আমার কিছুই যাবে না। শুধু এক মুহূর্ত্ত আপনি দাঁড়ান…চাকরকে আমি দুটো কথা বলে আসি শুধু।……

বাহিরে সেদিনকার মতই হুড-ফেলা একখানি গাড়ী প্রতীক্ষা করিতেছিল।

সাঁঝে—

—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

(গান)

আজি আকাশপথে চলছে শুধু হোলিখেলা
হাল্‌কা হাওয়ায় মন-মাতান সন্ধ্যাবেলা।

অনেক দূরে যায় রে উড়ে পাখীগুলি—
হাওয়ায় ভেসে একসারে সব পক্ষ তুলি'
মায়ের কোলে ভুললো শিশু দিনের খেলা!

মাঠের পথে কৃষক যত ফিরলো ঘরে—
তরুশিরে ঝিল্লি ডাকে শ্রান্তস্বরে,
আসছে ভেসে কুসুম-সুবাস হেলা ফেলা।

জীবন সাঁঝে রাঙ্গা আলোর মধুরিমা,
এমনি করে' চিত্তভরে পাব কি মা?
উজল আলোয় ভরবে কি পথ মরণ বেলা?

——:•:——

প্রতিশোধ

—শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ

১

ওরে—আগুন লেগেছে রে—আগুন—আগুন।

চারিদিকে আকুল আর্ত্তনাদ, তুমুল কোলাহলে অকস্মাৎ সুরুচির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

একে সদ্য পুত্রহারা জননী, তায় সারাদিনের খাটুনী, অনেক রাতে তন্দ্রাবেশে চোখদুটো বুজিয়া আসিয়াছে মাত্র। মানু তখনো তার বক্ষে থাকিয়া, তার শোকতপ্ত বক্ষ জুড়াইতে প্রয়াস পাইতেছিল।

পাশের জলন্ত গৃহ হইতে অগ্নি-শিখার বিকট হাসি সুরুচির অন্ধকার কারাকক্ষকেও অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করিয়া আসন্ন আগমনের সম্ভাবনা জানাইল। ভয়ে শিহরিয়া সুরুচি দ্বার খুলিল। উঃ! কি ভীষণ বহ্নি। রক্ত-লোলুপ রাক্ষসের মত লেলিহ রসনা বিস্তার করিয়া সর্ব্বস্ব গ্রাস করিতে উদ্যত।

গাঢ় অন্ধকারে ছাওয়া অমানিশা দিনের আলোর মত দীপ্ত হইয়া গেছে। "ওরে সর্ব্বনাশ হোল রে··· ······ধার

করে ঘরটা তুলেছি এখনো শেষ হয়নি, চোখের সামনে পুড়ে যাচ্ছেরে—হতভাগারা আগে কেন সাবধান হোস্‌নি ?" "বাক্স পেটারাগুলি নিয়ে আয়না নিতু ? যতটা পারি রক্ষা করি" "আরো জল—আরো জল"—"এস এদিকের বেড়াটা খুলে ফেলি" "হায় হায়রে ছেলেটা গেল—ছেলেটা গেল ওকে বাঁচাতে পারলুম না, উপায় কি হবে আমার ?"......

আকুল আর্ত্তনাদের মাঝে উমার বক্ষে শতশেল বিদ্ধ হইল "ছেলেটা গেল—ছেলেটা গেল ওকে বাঁচাতে পারলুম না।"

সুরুচি ভাবিল, কে সে হতভাগিনী, যে বুকের ধন হারাইতে বসিয়াছে ? হারাইবার তীব্র অনুভূতি আজও তার বক্ষ জুড়িয়া। যে বেদনায় সে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে—সেই নিষ্ঠুর বেদনার অনুভূতি আবার কার বুকে জ্বালাময় পরশ দিয়াছে ? না সে তা হইতে দিবে না...... এই এত বড় একটা বিপদ—অবাঞ্ছনীয় অপমৃত্যু সে ঘটিতে দিবে না ! হয়ত অসম সাহসিক বলে মৃত্যুমুখী ছেলেটাকে যমের কবল হইতে টানিয়া আনা সহজ। অথচ বিপদে ধৈর্য্যহারা হইয়া অনেক সময় মানুষ অসময় কালের কোলে ঢলিয়া পড়ে—লোকে বলে অদৃষ্ট।

সমবেত জনতার কণ্ঠে এই অদৃষ্টের ধিক্কার, এই হতাশ করুণ হাহাকার শুনিয়াও সুরুচির মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল, যে একটু চেষ্টা পাইলে বোধকরি রক্ষা পায়, অন্ততঃ প্রাণ বিনিময়েও।

আবার সেই করুণ কণ্ঠের ব্যথিত আর্ত্তনাদ "বাঁচাও—বাঁচাও—আমার সব যাক তবু" ;—মর্ম্ম বিদারী কণ্ঠের আকুল আহ্বানে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, সন্তানশোকাতুরা সুরুচি উন্মাদের মত, দিগবিদিক্ জ্ঞানশূন্যা হইয়া ছুটিল—জনতার কোলাহল অভিমুখে প্রদীপ্ত বহ্নি মুখে।

সেই মুহূর্ত্তে মানুর ঘুম ভাঙ্গিল শূণ্য গৃহে ভীত আকুল আঁখি তুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল "কাকীমা—কাকীমা"

বালকের করুণ ক্রন্দন কাকীমার কর্ণে প্রবেশ করিল না। সেখানে হাজার কণ্ঠের মাঝে শুধু সেই করুণ কণ্ঠেরই কাতর মিনতি শোনা যাইতেছিল "বাঁচাও, বাঁচাও ছেলেটাকে বাঁচাও।"

"তুমি কি বল্‌ছ ?—ছেলেটার মাও তো আসেনি এঁ্যা—কি হবে, তবে এক সঙ্গে দুজনে জীবন্ত দগ্ধ হবে ?—ভগবান, ভগবান রক্ষা কর।"

দিশেহারা হইয়া এক প্রৌঢ় জ্বলন্ত গৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া আকুল অশ্রুজলে ধরা অভিষিক্ত করিয়া তুলিলেন, এক বৃদ্ধ তার হাত ধরিয়া সজোরে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, "আর কেন ?—তারা ত গেছেই, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও আত্মহত্যা করে মরবে নাকি !"

গৃহস্বামী কাঁদিয়া উঠিলেন "না—না এখনো তারা বেঁচে আছে ঘরটা একেবারে জ্বলে ওঠেনি।"

অকস্মাৎ দীপ্ত মহিমময়ী তেজস্বিনী এক নারীর আবির্ভাবে সকলে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িল। কেহই তাকে বাধা দিতে পারিল না। যেন কোনমন্ত্র বলে সকলের শক্তি পরাভূত হইয়া গিয়াছিল। সুরুচি মুহূর্ত্তে জ্বলন্ত গৃহে প্রবেশ করিল। সদ্য জ্ঞানহারা একটী নারী তার বক্ষের নিধি বক্ষে জড়াইয়া মেঝেতে পড়ে লুণ্ঠিতা ! চারিদিকে প্রজ্জ্বলিত আগুনের আভায় তার মুখে আঁকা মাতৃস্নেহের স্নিগ্ধ রেখা সুরুচির চোখে মুগ্ধ দীপ্তি ফুটাইয়া তুলিল। ঐ রেখাটুকুই যেন তাকে কর্ত্তব্যের পথে টানিয়া লই প্রয়াস পাইল, সবলে শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া নারীকে প্রাঙ্গণে আনিয়া ফেলিল। ততক্ষণে স্কাউটের ছেলেরা আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

সুরুচির পশ্চাতের অঞ্চলে আগুন ধরিয়া উঠিয়াছিল। একটা মোটা কম্বলে অকস্মাৎ তাকে জড়াইয়া ধরিয়া স্কাউট বালক আগুন নিভাইয়া দিল।

২

"বেরো—হারামজাদী—কলঙ্কিনী। আমার বাড়ী থেকে বেরো—"

একি নিষ্ঠুর বাণী ?—ভাসুরের একি নির্ম্মম আদেশ ?

একে পুত্রহারা, বিয়োগ ব্যথায় অহর্নিশি অন্তর জ্বলিয়া খাক্ হইতেছে তার উপর অগ্নিদগ্ধ দেহে অসহ্য যন্ত্রণা ! কিন্তু নারীর নারীত্বে আঘাত দিয়া এ কি তীব্র তিরস্কার ? উঃ ! সুরুচি দ্বারে মাথা ঠেকাইয়া বেদনাদগ্ধ দেহে তীব্র তিরস্কার নীরবে সহ্য করিতে লাগিল।

ভাসুরের সঙ্গে জাও তার সুরের প্রতিধ্বনি তুলিয়া কহিলেন "মানুকে একলা ফেলে কোন চুলোয় যাওয়া হয়েছিল শুনি? আহা কচি ছেলেটা,—ভয়ে ভয়ে কোন রোগ না হয়ে পড়ে।"

"বাড়ীর ছেলে মরুক বাঁচুক তাতে আমার কি?—পরের ছেলেকে বাঁচাতে যাই—আহা কি আমার বাহাদুরী?—তুমি বৌ নয়? না কি ব্যাটাছেলে? পর-পুরুষের গা ঘেঁসতে গিয়েছো—লজ্জা সরম নেই—আক্কেল নেই—দেখাও দেখি আমাকে পাড়ার কোন্ মেয়ে গেছে ছুটে—নিশুতি রাতে পুরুষের গা ঘেঁসতে।"

নারীত্বের এমনি কদর্য্য অপমান শুনিয়াই হয় তো সাধ্বী সীতা বসুন্ধরাকে দ্বিধা হইতে মিনতি জানাইয়াছিলেন! শিহরিয়া সুরুচি কাণে হাত চাপা দিল—

কিন্তু এত করিয়াও তাদের মনের ঝাল মিটিল না—ভাসুর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ! এ বউকে গৃহ ছাড়া করিয়া তবে তিনি স্নানাহার করিবেন।

সুরুচির মনে তখন যে ঝড় উঠিয়াছিল তা অবর্ণনীয়। হঠাৎ আশ্রয়হীনা হইয়া এ অপরিচিত বিপুল বিশ্বে সে কোথায় দাঁড়াইবে? থাকার মধ্যে এক স্বামী অরুণ আর বৃদ্ধ পিতা। তাও স্বামীর কোন নির্দ্দিষ্ট বাড়ী নাই—সুদূর সহরের অজ্ঞাত কোন মেসে থাকিয়া পড়ায় নিযুক্ত। তার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে আর কয়টা দিনের সবুর। সুরুচি, বড় বৌয়ের পাদুটী জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুজলে সিক্ত করিয়া দিয়া ভিক্ষা চাহিল "দিদি, এখন কোথায় যাব আমি, তোমরা ঠাঁই না দিলে বল?" সদর্পে পা দুটী সরাইয়া লইয়া ঝাঁঝালকণ্ঠে বড় বৌ বলিলেন—"ওমা আমি কি জানি—" "তুমি বল দিদি ভাসুর ঠাকুরকে বুঝিয়ে"—"কথার ধরণ দেখ আমি বলতে যাই আর ঝাঁটার বাড়ি দিক্, আমার কথায়ই যেন উনি ওঠেন বসেন।" সুরুচি কাতরে কহিল "দিদি—আমায় ক্ষমা কর দিদি—অবুঝ বোনটী—" "কি জানি—এখন আর ঐ ঘ্যানঘ্যানানী ভাল লাগেনা, দোষ করবার বেলায় মনে থাকে না? আগুর জন্য ছেলেটা রক্ষা পেয়েছে--যেখানে প্রাণ নিয়ে খেলা সেইখানের অপরাধ আমি মার্জ্জনা করতে পারিনে যাও—"

তাহাকে যাইতেই হইবে একটী দিনের সবুর নয়, কত কাকুতি মিনতি, শুধু দুইটী দিনের জন্য আশ্রয় ভিক্ষা তাও ব্যর্থ হইল, কি পাষাণ গো! অর্গল বদ্ধ দ্বারের বাহিরে আশ্রয়হারা ভিখারিণী সুরুচি কাঁদিতে কাঁদিতে আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিল—কি অপরাধ তার? নারী হইয়া জন্মিয়াছে বলিয়াই না এত লাঞ্ছনা তার? নারী কি এতই ঘৃণ্য? দুটী অমূল্য জীবন রক্ষার্থে পুরুষের মাঝে ছুটিয়াছে বলিয়া কি তার এমন অমার্জ্জনীয় অপরাধ? সে অপরাধের কঠিন শাস্তি সারাজীবন তাকে মৌন মুখে সহিতে হইবে... নিষ্ঠুর সমাজের অবজ্ঞার ঘৃণাই শুধু তার প্রাপ্য!.........

"মা মা, আমার লক্ষ্মী মা! তোমায় এত অনাদর? যা মানুষ কখনো করতে পারে না তাই ভদ্রলোক হয়ে করেছে—ছিঃ এরা মানুষ নাকি! এস মা, আমার ঘরে এস।

সুরুচি মাথা তুলিয়া দেখিল সেদিনকার সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক সকৃতজ্ঞ নয়নে তারই অভ্যর্থনায় নিযুক্ত। অতি গভীর দুঃখে, আন্তরিক সহানুভূতির স্নিগ্ধ পরশ পাইলে চোখের জল আর বাধা মানে না—সুরুচি ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। "কুণ্ঠা কেন মা......এস, তুমি আমার মেয়ের বয়সী আমি তোমার বড় ছেলে—এসো। সমাজের কাছে আজ তুমি যে জন্য ঘৃণ্য তার চেয়ে বড় কাজ আজ জগতে নেই! যদি তারা মানুষ নামের যোগ্য হয়, হৃদয় বলে একটা কিছু থাকে তবে প্রাণ বেশী কি সমাজ বেশী এ দুয়ের মীমাংসা তাদের চলবে—"

সুরুচি মাথার কাপড় আর একটু টানিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটী কথা বলিতে বলিতে হাঁটিতে লাগিলেন।

"তোমার নামে এই এত বড় একটা মিথ্যা অভিযোগ, তা মন থেকে মুছে ফেলো। যারা তোমার নামে মিথ্যা রচনা করে মুখুয্যে মশায়ের মন বদলে দিয়েছে তাদের নিজেদের জীবনেই যে কত গ্লানি লুকানো তা বাহিরের লোকের চোখে ধরা পড়ে না.........ভেতরের সত্যিকারের অনুভূতি কি সকলেরই থাকে? তাই বলি মা, দুঃখ কোরো

না, মানুষ যারা তারা তোমায় সাধ্বী বলেই সুখ্যাতি করবে, আর মাথার ওপরের ভগবান তিনিত সবই দেখেন।

কেঁদোনা মা কেঁদোনা! আমি অরুণকে লিখে দিচ্ছি ওর একটা সুবিধা না হওয়া পর্য্যন্ত তোমার বাবার কাছে গিয়ে থাকবে, ভগবান একদিন তোমার সুখের পথ উন্মুক্ত করে রাখবেনই।"

•

মুখুয্যে বাড়ীর বড় বৌ যেমনই কুঁদুলে বসিয়া বিখ্যাত—অন্য দিকে তেমনি সুরুচি শান্ত নম্র আচরণে—সবাইর কাছে প্রিয়। এই জন্য বড় বৌয়ের কাছে সে দুই চক্ষের বিষপাত্র। সে হিংসার জ্বালায় জ্বলিয়া তীব্র তিরস্কার ও বিদ্রূপের বাণ বর্ষণ করে।

কিন্তু সুরুচি নীরবে শুনিয়া যায়, জায়ের কথার প্রতিউত্তর করে না—

বড় বৌ বিনাদোষে সুরুচির অহিত খুঁজিতে চেষ্টা পায়। সুযোগ আর মেলে না, সহসা শুভ মুহূর্ত্ত আসিল। একেতো মানুকে একা ফেলিয়া পুরুষের হট্টগোলের মাঝে ছুটিয়া যাওয়া, তায় পাড়া-পড়শী দু এক জনের টিট্‌কারী—সুবর্ণ সুযোগ—

যারা মুখের ওপরে তাকে কুঁদুলী বলিতে ছাড়ে না, আজ তারাই—তাকে সুপথে টানিয়া সুরুচির অপরাধ দর্শাইয়া তার গুরু শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া দিল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে অরুণ বাড়ী পৌছিল—ব্যাপার কি?—

সমাজের নিষ্কর্ম্মা নেতারা বাঁকিয়া বসিলেন "এই বউকে নিয়ে ঘর করিলে তাকেও এ বাড়ী ছাড়িতে হইবে।" সমস্ত শুনিয়া অরুণ স্তম্ভিত হইল। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া হঠাৎ যেন অকূলে কূল পাইয়া মুখখানি তার হর্ষ-প্রফুল্ল হইয়া হইয়া উঠিল,সমাজপতিরা ভাবিলেন তাঁহাদের আশা সফলতায় পরিপূর্ণ—কিন্তু সে আশা নিরাশায় পূর্ণ করিয়া দিয়া অরুণ উত্তর দিল,—"আমার তো শুনে আনন্দ হচ্চে দু-দুটী জীবন রক্ষা—সে তো প্রশংসার কাজ......"

"আমরা তোমার বিজ্ঞ চাল শুনতে চাইনে অরুণ—যা চাই তারই উত্তর দাও, এ বউ নিয়ে ঘর করবে কি না?"

আর একদিক হইতে আর একজন টিট্‌কারি দিল "আজকালকার ছেলেরা কি আর সমাজ মানবে? তাদের বৌই সর্ব্বস্ব।"

অরুণ অকস্মাৎ উত্যক্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "আপনাদের যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন, এ বউ নিয়েই আমি ঘর করব।"

"তবে বেশ, এই কথা রইল, ভবিষ্যতে আমাদের দুষতে পার্ব্বে না, শরণাপন্নও হ'তে পারবে না।"

"আজ হিন্দু নারী ঘরের বাহিরে পা দিয়েছে বলে তার সম্মান ক্ষুণ্ণ করতে আপনারা দলবদ্ধ অথচ কিসের জন্য কোন বলে সে এ অসম সাহসিক কার্য্যে জীবন দিতে ছুটে ছিল তা একবার ভেবে দেখেছেন কি? চাক্ষুষ দেখেও তা প্রত্যয় হয় নি। হবেও না কোনদিন, পরের নিন্দে করা আর ছল খুঁজে যারা বেড়ায় তাদের কেউ বোঝাতে পার্ব্বে না।—"

"কিসের বড়াই অরুণ? প্রাণ রক্ষা!—সে তো তোমার বউ না হলেও হোত!—স্কাউটের ছেলেরা......"

"মিথ্যে কথা—আমি সব শুনেছি—আপনাদের সমাজ মানব না—বিদায় নেবার বেলা এই টুকু বলে যাচ্ছি—যাকে অপরাধ মনে করে গুরু শাস্তি দিচ্ছেন সেটা অপরাধ নয়, ভগবানের তৃপ্তি"—কাহারও কথার প্রতীক্ষা না করিয়া অরুণ দ্রুত চলিয়া গেল—

"ছেলেটার কি তেজ দেখলে? এ তেজ আমরা ভাঙ্গবই। শেষে আমাদেরই পায়ে লুটিয়ে পড়তে চাইবে, তখন দেখা যাবে।"

বাড়ীর দ্বারও তার জন্য অর্গল বদ্ধ,—সে সুরুচির স্বামী, সুরুচি তার স্ত্রী এই তার অপরাধ?

"অরুণ এখনো তোমার খাওয়া হয় নি?—এসনা আমাদের বাড়ীতে"?

পথশ্রান্ত অরুণ ফিরিয়া চাহিল।

সুরুচির আশ্রয় দাতা স্নেহ সিক্ত-কণ্ঠে চুপি চুপি কহিলেন 'যাকে আমি দুদিনও রাখতে পারি নি—সমাজে অবাঞ্ছনীয় হলেও, আমিত তা ছাড়তে পারি নে, এই দেশের ভিটেই আমার জীবন যাবে, আমার ছেলে মেয়ের মঙ্গল উৎসবে এই

সমাজেরই মুখ চাইতে হবে, তাই তার বাবাকে টেলীগ্রাফ করে আনিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি, নইলে ইচ্ছে ছিল তুমি একটা বিহিত করবে।" অরুণ সানন্দে তার পদধূলি লইয়া কহিল "আপনার জন্যই আজ আমার সম্মান অক্ষুন্ন—আজ আমি আপনারই অতিথি।"

৪

অরুণ সাবরেজিষ্টীরের পদে নিযুক্ত হইয়া সুরুচিকে কর্ম্মস্থানে লইয়া আসিয়াছে। আবার পুত্র পাইয়া সুরুচি তার পূর্ব্ব শোক ভুলিয়াছে তবে ক্ষণে ক্ষণে মান্নুর স্মৃতি উদিত হইয়া মনটা অস্থির দুর্ব্বল হইয়া পড়িত। সেই শেষ দিনেও বাড়ী ত্যাগ করিবার পূর্ব্বক্ষণে জড়াইয়া ধরিয়া কত কান্নাই না কাঁদিয়াছিল, একটু কোলে লইয়া শোকাতুর বক্ষ জুড়াইবার ও তখন তার অধিকার ছিল না। জোর করিয়া টানিয়া লইয়া মা তাকে কত মারই না মারিয়াছিল। সেই প্রহারের কথা আরও মনে করিয়া সুরুচির চোখে জল আসিল,—হায় অবোধ শিশু তার অপরাধে সেও অপরাধী? পুত্র কোলে লইয়া আজ সুরুচির মনে স্বতই উদিত হইল যম ব্যতীত কেউ তার এ বুকের নিধিকে কাড়িয়া নিতে সমর্থ হয় না কেন? আপন ছেলে বলিয়াই না? অপরের ছেলে তাই তাকে চোখের দেখা দেখিবার অধিকারটুকুও নাই,—এমন কি তার খবরটুকু জানিবার আগ্রহে মন উদগ্রীব হইলেও চিঠির উত্তরটী মেলে না—অপরাধ তার এতই দূষনীয়?—তাহারা ভুলতে পারে তাই বলিয়া সে তো ভুলিতে পারে না। এত দূরে থাকিয়া, তবুও ত সে তাহাদের একখানি চিঠির প্রত্যাশায় তৃষিত নয়ন উন্মুক্ত রাখিয়াছে। সমাজে সে অপরাধী হইতে পারে কিন্তু চিঠি একখানা লিখিতে কি দোষ? বাহিরের লোকের নিকট অজ্ঞাত রাখিয়া ও তো মানুষ খবরটা একবার দিতে পারে?

সুরুচির অস্থির মন কিছুতেই শান্ত হইতে চায় না; কাহাকেও বলিয়া যে বুকের বোঝা কমাইবে সে পথও বন্ধ। বলিলে অরুণ রাগিয়া ওঠে তোমার অত মাথা ব্যথা কেন? চিঠিত আমিও কম লিখিনি উত্তর না দিলে আর কি করতে বল? যাওয়া ও যে বন্ধ!

এমনি উদভ্রান্ত মনের মাঝে অপ্রত্যাশিত রূপে হঠাৎ একখানি চিঠি আসিয়া পৌছিল "বোন সুরুচি! একদিন তোমাকে ভিখারিণীও অধম করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলাম তার প্রতিফল পদে পদে পাইতেছি, কোন মুখে তোমার কাছে অগ্রসর হইব তবুও লিখ্‌ছি বোন উপায় নাই, তোমার ভাসুর রুগ্নশয্যায়, মান্নু মৃত্যুশয্যায়—সুরুচির কম্পিত হাত হইতে চিঠিখানি পড়িয়া গেল—হায় ভগবান একি করিলে? আমিত এ আশা করিনি—মায়ের কোল আলো করিয়া বাঁচিয়া থাকুক। নাই বা পেল এ দুখিনী তাকে দেখিতে তবু সে বাঁচিয়া উঠুক............

অস্থির উদ্ভ্রান্ত চিত্তে আবার চিঠিটা তুলিয়া লইয়া সুরুচি পাঠ করিল "তোমার জন্য দিন দিন তিল তিল করে তার কোমল প্রাণ কেঁদে গুমরিয়ে ফুঁপিয়ে উঠ্‌ছিল, তার সে দুঃখ-ব্যথা জানবার পথটী পর্য্যন্ত বন্ধ করে রেখে ছিলুম—হতভাগিনী—নিষ্ঠুর মা আমি। বোন্ কি বলব তোমায়, তুমিই প্রকৃত সন্তানের জননী, তাই পরের ছেলেকেও, আপন সন্তান জ্ঞানে অন্তরের অমৃতময়ী স্নেহসুধা ঢেলে দিতে চেয়েছিলে। ঐ টুকুর জোরেই বিশ্বের সব ভুলে তুমি তোমার ঐ অমূল্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে ছুটেছিলে আগুণের মুখে পরের ছেলের প্রাণ বাঁচাতে!

"তখন বুঝিনি, হিংসার বিষে দেহ জর্জ্জরিত ছিল তাই পেটের ছেলের দুঃখও বুঝিনি, আজ তাকে হারাতে বসেছি। তার মা বলেও আজ আমি নিজকে ভাব্‌তে পারিনে। কেবল প্রসব কল্লেই মা হয় না—মায়ের কর্ত্তব্য যে বড় কঠিন, বড় দুরূহ।

"মান্নুর শিয়রে বসে তার রুগ্ন-কাতর মুখখানি চোখের ওপরে দেখছি,—প্রলাপের ঘোরে শুধু তার মুখের বুলি কাকীমা কাকীমা,—তাই আশা আছে হয়ত সে আবার বাঁচ্‌বে—কিন্তু তুমি আসিবে কি? না প্রতিশোধের পথ পরিষ্কার করে, আমার আশা ব্যর্থতায়ই ভরে দেবে? সুরুচি বোন, আমি কাতরে তোমার হাতে ধরে ভিক্ষা চাইছি এস এস ফিরে এস, আমার মাণিককে, আমার বাছাকে বাঁচিতে দাও,—এখনো আশা আমার, সে বাঁচ্‌বে।

আমি সমাজ চাই না কিছুই চাই না,—তোমায় চাই পুত্র চাই—

রোগ শয্যায় তোমার ভাসুর পড়ে আছেন,—তুমি এলে আমি এ ভাঙ্গা বুকে বল পাব—তোমারও তো ছেলে আছে মায়ের ব্যথা তুমিই বুঝ্‌বে। যাদের পরামর্শে তোমায় লাঞ্ছিতা অপমানিতা করে দূরে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম তাদের কাছেও আজ আমরা লাঞ্ছিত। আজ বিশ্ব সংসারে আমি একা,—বন্ধু কেউ নেই, যারা ছিল তাদেরও তাড়িয়ে দিয়েছি ভগবান ত আছেন, সে শাস্তি আজ পাচ্ছি। আসিবে কি? তোমার হত ভাগিনী দিদি!"

৫

সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে একখানি পাল্কী আসিয়া ঘরের দ্বারে থামিল। বড়বৌ উৎসুক কৌতুহলী নয়ন তুলিয়া দেখিলেন সুরুচি—

ঘরের মধ্যে বিছানার উপর মানুর রোগশীর্ণ দেহখানি ঝরা কুসুমের মত এলাইয়া পড়িয়াছে। সুরুচি স্নেহার্ত্ত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল—মানু—মানু এই যে আমি এসেছি বাবা আমার, চেয়ে দেখ কাকী মা—

কাকীমা—কাকীমা আমি যাব। মা মেরেছে,—কই মা কাকীমা।

বালক এমনি কত কি প্রলাপ বকিতেছিল, তখন তার শূন্য দৃষ্টি কাকীমার সন্ধানে ফিরিতেছিল। "কাকীমা এসেছে। আমি আর ওখানে থাক্‌বনা তুমি এতদিন আমায় চিঠি দাওনি কেন?

সুরুচি অশ্রুসিক্ত নয়নে কহিল "বাবা এইত আমি, বেঁচে ওঠ লক্ষীধন আমার মাণিক"—

"মানু এই যে তোমার কাকীমা আর এই দেব একটী ভাই হয়েছে কী সুন্দর।"

ব্যর্থ ডাক—ব্যর্থ আশা! বালকের প্রাণপাখী দেহ পিঞ্জর হইতে মুক্তি পাইয়া অনন্ত নীলাকাশে উধাও হইয়া যাইবার চেষ্টায় ছট ফট করিতেছে! একবার প্রলাপের ঘোরে—কাকীমা—বলিয়া তার অধরপ্রান্তে ক্ষীণ হাসির দীপ্তি ফুট্‌তে না ফুট্‌তেই সব স্থির হইয়া গেল। বাড়ীতে তুমুল ক্রন্দনের রোল উঠিল।

বড়বৌ কাঁদিতে কাঁদিতে সুরুচিকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল তোর হাত দিয়ে প্রতিশোধ তুলবার উপায় নেই বলেই ভগবান তার শোধ দিলেন—তুই সতী রাণী। তোকে যে অপমান করেছিলুম তারই প্রতিফলে আজ আমার এই শাস্তি।.........

চিরন্তনী

—শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

……বিবর্ত্তনের পর থেকে মানুষের অনেক ক্রম পরিবর্ত্তন হয়েচে! আদিমযুগে মানুষ পশু ছিল, কারণ দেহটার পেছনে মন বলে যে একটা বস্তু আছে, তার খবর তারা পায়নি! তারপর ক্রমে ক্রমে মানুষ আপনাকে উপলব্ধি ক'রতে শিখলে। নবসৃষ্ট পৃথিবীর প্রকৃতি নব নব রূপে তার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হোয়ে উঠ্‌চে,—বলচে—'দেখো, জানো আমাদের।' তারপর থেকেই সে প্রশ্ন ক'রতে আরম্ভ ক'রলে—এটা কি? কেন? তারপর?—এই জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসার ভেতর দিয়েই সে সত্যকে খুঁজে চলেছে। এ একটার সমাধান হোল ত' আরো প্রশ্ন বেড়ে উঠলো। আবার তার সত্যের পিপাসা—জ্ঞানের পিপাসা বেড়ে উঠলো।

এই জ্ঞানপিপাসা চিরন্তন এবং সত্য-শিব-সুন্দরের স্বরূপ জান্‌বার চেষ্টাই মানুষের মানসিক ধর্ম্ম।

……সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে মানুষ তার বাইরের আবরণের দিকেই বিস্মিত হোয়ে চেয়ে রইলো, তারপর নানারকমভাবে তার তৃপ্তিসাধন কোরে তারা জীবনের পথে অগ্রসর হোল……কিন্তু দেহের প্রদীপে সেই যে অগ্নিসংযোগ তা'রা ক'রলে, সেটা যুগে যুগে মানুষের মনে প্রদীপ্ত শিখার মতোই বহ্নিময় হোয়ে রইলো।

কিন্তু তারপর থেকে এতদিন ধরে এই বর্ষিয়সী পৃথিবী তার আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্রাম বেগে ছুটে চলেছে—এ কিসের প্রেরণায়—কার অভিযানে?

মানুষের দেহের পেছনে যে একটা রসগ্রাহী মন জেগে উঠেচে—সেই অন্তর প্রতিধ্বনি কোরে বলে—নবজীবনের পথে—নবীন সৃষ্টির আহ্বানে!

মানুষের মনের যে প্রসারতা বেড়েছে আজ, সে ত' আর তার দেহটাকে নানারকমভাবে আহার জুগিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না, কারণ সে যে জানে—দেহটা নশ্বর, মানুষের শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারাই বেঁচে থাকে—অনাগত যুগের মানুষের মধ্যে। তাই তার সত্যোলাগ্রত জ্ঞান পিপাসার মধ্য দিয়ে সৃষ্টির নবরূপ আবিষ্কার ক'রতে গিয়ে, বাধা পেলে—যারা তাকে বুঝলে না, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কোরে উঠে বল্লে—এ কি নতুনপথে এ আমাদের নিয়ে যাচ্ছে—বেশ ত' ছিলুম আমরা,—আমাদের এতদিনের সংস্কারে যা সত্য বলে মেনে এসেচি আজ এক অর্ব্বাচীনের কথায় তা ছাড়তে হবে? ও মিথ্যাচারী, দাও ওকে কলমের খোঁচায় শেষ কোরে।

—শাস্ত্রের অনুশাসন, সমাজের দোষ সে দেখিয়ে দেয়, ভয়ে তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে, বলে—"রাজ্য যে যায় এই অসভ্য প্রচারকের অত্যাচারে।"

কিন্তু এই যে আঘাত সে লাভ করে, এ তার সম্পদ—হাসিমুখে সে এসব উপেক্ষা কোরে চলে, কারণ এই বেদনা তার সুন্দর হোয়ে ওঠে,—তার সৃষ্টির অধিকতর চরম উৎকর্ষে।

কিন্তু জ্ঞানের যে শাশ্বতী জিজ্ঞাসা, তার ত' সমাপ্তি নেই, তাই সে তার অতৃপ্তির বেদনা বহন কোরে চলে গেলো,—মনে তার আশা জেগে রইলো,—'একজন অন্ততঃ মানুষ জন্মগ্রহণ ক'রবে, যেদিন আমাকে সে বুঝবে, আর তার নিজের অন্তর-রসে একে পরিপূর্ণ রূপ দান ক'রবে।' এ আশা মনে জাগরুক না থাকলে মানুষের সৃষ্টির উৎসাহ-উৎস বহুদিন রুদ্ধ হোয়ে যেত।

—এতদিনের এই পৃথিবী, কত রকম অবস্থা বিপর্য্যয়ের ভেতর দিয়ে কল্পান্তকাল ধরে অতিক্রম কোরে এসেচে!……মানবমনের নিত্য-উৎসারিত সাহিত্য-রসপিপাসাই ত' এর প্রতীক!

মানুষের অন্তরতম কোণের আশা, আকাঙ্ক্ষা, বেদনা রূপায়িত হোয়ে ওঠে—সাহিত্যে! কিন্তু মানবের একান্ত

অন্তরের বস্তু সাহিত্যে, বিভিন্ন মতবাদ এবং একপক্ষ, অন্যপক্ষের লেখার কদর্থ কোরে মিথ্যাগ্লানির সৃষ্টি ক'রেচে. তাতে বিস্ময়ের কারণ না থাকলেও, তার অপমানও বড় কম নয়।

* * * *

পুরাযুগের সাহিত্য আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে আকারে, ভাষায়, ভঙ্গীতে মেলে না, তাই বলে কি বুঝতে হবে, এ সাহিত্য একেবারে অবনতির দিকেই চলেছে!

...পিতামহদের জীবন যে ভাবে কেটেচে, আজ বহুদিন পরে নবাগত যুগে যাঁরা জন্মেছেন, তাঁদের জীবন যদি সেই ভাবে না চলে, ত' সেটা কি তাঁদের অপরাধ?

পৃথিবীতে যাঁরা নতুন এসে জন্মালেন, তাঁরা শিখলেন কি? স্মরণাতীত যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা যা দেখেছেন, ভেবেছেন এবং রসবেত্তা অন্তর দিয়ে তাকে অভিসিঞ্চিত ক'রেছেন সাহিত্যদেবীর পাদপীঠে সেই পুষ্পসম্ভার দিয়ে অর্ঘ্য সাজিয়েছেন!—যা' কালের কষ্টি পাথরে প্রমাণিত হোয়ে—সাহিত্যের ভাণ্ডারে চিরস্থায়ী হোয়ে বর্ত্তমান ও অনাগতযুগের মানুষকে উন্নততর সোপানে ওঠবার পথ প্রশস্ত কোরে দিচ্চে।

...একবার ভেবে দেখলেই ত' হয় আমরা কি আজ রবীন্দ্রনাথকে এইরূপে পেতুম, যদি Shelley, Keats বৈষ্ণব কবিরা এবং বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের চিন্তাধারায় অতদূর অগ্রসর হ'তে না পারতেন!

অতীতযুগ থেকে এ যুগের সাহিত্য যে একবারে বিভিন্ন, এ কথা ত' সত্যি নয়, কারণ মানবমনের চিরন্তনী প্রবৃত্তি ভোগতৃষা এবং প্রেম সাহিত্যে এরাই ত' চিরদিন স্থান অধিকার কোরে আছে। কারণ মনের সঙ্গে মনের এই প্রবৃত্তিগুলো ত' ওতঃপ্রোতভাবে মিলে আছে। এদের ঘাত প্রতিঘাতের ভেতর দিয়েই ত' মানুষের জীবন!

প্রকৃত সাহিত্য যা', তা, ত' সর্ব্বদা সংযমের মাধুর্য্যে প্রোজ্জ্বল হোয়ে থাকবেই।

কেউ কেউ অভিযোগ করচেন—আজকালকার সাহিত্যে মানুষের ভোগলিপ্সা আর লালসা-পঙ্কিল-দেহের কর্দ্দিম ধর্ম একেবারে নগ্ন হোয়ে দেখা দিয়েচে!—অন্তরের স্থূলদিকটাই একান্ত হ'য়ে উঠেছে!

এর উত্তরে বলা যায়, সমান ও পারিপার্শ্বিক জীবনের গ্লানি দেখিয়ে দেওয়া কি সাহিত্যের কর্ত্তব্য নয়? সাহিত্যের মধ্যে কি আমরা নিজেদের খুঁজিনা, মানুষকে দেখিনা?... দুঃখের মধ্যে যে মানুষের ধৈর্য্য এবং মহত্ত্ব বিচার হয় তেমনি পাপের আবর্ত্তনে যার সংযম ডুবে যায় না, সেই ত মানুষের প্রণম্য! তাই যখন দেখি সন্দীপের উদ্দাম লালসার ওপর নিখিলের সংযম অপরূপ সৌন্দর্য্যে স্নিগ্ধ হোয়ে উঠেছে, পাপের পঙ্কিলতা কি তখন মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে?

কিন্তু কথা হচ্চে আধুনিকযুগের তরুণদের সাহিত্য নিয়ে। সত্যই কি আজকালকার সাহিত্যে একমাত্র দৈহিক ভোগই মূর্ত্ত হোয়ে উঠেছে...? তাতে মানবমনের চিরন্তন হাহাকার, দৈন্য, বেদনা, ত্যাগ ভক্তি, প্রেম ক্ষমা প্রভৃতির সংযোগে জীবন্ত মানুষ জেগে ওঠে নি?

—আধুনিক সাহিত্য-বিরোধীরা আরো বলেন—'সাহিত্যের ব্যভিচারের আবহাওয়ায় মানুষের জীবন পর্য্যন্ত কলুষিত হ'তে আরম্ভ কোরেছে'।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—যা' সত্য-সাহিত্যের সঙ্গে একাসনে বসবার দাবী রাখে, তা' কি কখনো দু' চারটে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা দ্বারা পঙ্কিল হ'তে পারে? স্থায়ী সাহিত্যের বিচারে কখনোই ত' এ টি কবে না।

কেউ কেউ আবার বর্ত্তমানযুগের সাহিত্যের সঙ্গে সমানতালে চলতে না পেরে বলচেন—'ওর কোনো মানে নেই—মিথ্যে গোটা কতক কথা সাজিয়ে লেখা হয়েচে, অতএব——' ইত্যাদি

এমন কথা বলতে শুনেচি,—যে সুরেন ভটচায প্রভৃতির মতন লেখক বাংলাদেশে বেশী নেই,—'আবার সেই সঙ্গে আরো বলতে শুনেচি—রবীন্দ্রনাথ যা লেখেন তা নাকি ন্যাকামী এবং শরৎচন্দ্র যা লেখেন তা' অশ্লীল।

এদের সামনে এদের মতে মত দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় কিছু আছে কি?...

—শ্লীলতা আর অশ্লীলতার মাপকাঠি সকলের কাছে সমান নয় জানি, কিন্তু সাহিত্যে তার মাপকাঠি একটা আছেই

তাই আশ্চর্য্য হোয়ে যখন দেখি 'চরিত্রহীন' পড়তে পড়তে একটা সহানুভূতি ও বেদনার গৌরব ও পুলকে মন ভ'রে ওঠে আবার ব্যথিতবিস্ময়ে অনুভব করি 'রসবস্তুর ধোঁয়ায়' কেউ না মন না মতি কিছুই স্থির ক'রতে পারচেন না, কেউ বা সেই ধোঁয়ার অন্ধকারে কাঁটাগাছের ভেতর পদ্ম খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

* * *

শুনেই আসচি বহুদিন থেকে, হিংসা বা ঈর্ষা জিনিষটা সাহিত্যের মধ্যে থাকলে সুন্দরের পূজা হয় না, সুন্দরের যে পূজারী তার মনে ঈর্ষা কীট সে কখনোই সাহিত্য-দেবীর পূজা-বাসরে স্থান পায় না।

একদল লোক আছেন, যাঁরা নিজে কিছু সৃষ্টি ক'রতে পারলেন না আর দেখচেন যে নবীন সাহিত্যিকরা উত্তরোত্তর উন্নতিই কোরে যাচ্চেন অমনিই রবীন্দ্রনাথের কাছে চিঠী লিখে এক প্রবন্ধ লিখিয়ে নিলেন আর সেই নিয়ে কাগজে কাগজে তরুণদের লেখাগুলো বিকৃত কোরে বারবার আক্রমণ ক'রতে লাগলেন—আর এই পণ্ডিতম্মন্য দলটি শ্রেষ্ঠ কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র, মনীষি পণ্ডিত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির বিচারবুদ্ধির পরীক্ষা ক'রতে বসলেন। আর সেই দলেরই অন্যতম পাণ্ডা ছদ্মনামে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা আরম্ভ ক'রলেন। আর একজন কবি-সাহিত্যিক ত' কাজী নজরুল ইসলামের নাম শুনলেই ক্ষেপে ওঠেন।

রসিক আর অরসিক শব্দ দুটি আধুনিক সাহিত্যের সমালোচনার আসরে বড় গোল বাধিয়েছে।

আমরা বলি রসিকজনের ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকা সম্ভব কিন্তু অরসিকের ঐ এক নাম!

তিনি আবার কবিতাও লেখেন, কেউ কেউ তাঁকে কোনো বিশেষ জায়গার কবি ব'লে বিদ্রূপও ক'রেছেন।

এ হেন রসিক তাঁর অপূর্ব্ব রসের ভাণ্ডার থেকে কটূক্তিরস বর্ষণ করলে শৈলজানন্দ প্রমুখ কয়েকজন প্রতিষ্ঠাবান্ তরুণ সাহিত্যিকের ওপোর।

...আর একজন বৃদ্ধ সমালোচকের কথা ব'লে এই প্রবন্ধ শেষ ক'রবো, তিনি রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর নন, তাঁর দুর্ব্বলমুহূর্ত্তে তিনি যে 'আমিনাবিবির আত্মকথা' লিখেচেন তার জন্যে অনেকেই তাঁর মর্ম্মব্যথা জাগিয়ে দিয়েচেন, ইনি হচ্চেন নাট্যজগতের পিতামহ ব'লে যিনি গর্ব্ব করেন, স্বর্গীয় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদকে অদ্বিতীয় নাট্য-কবি ব'লে যিনি ক্ষুব্ধ হন, যিনি তাঁর নাটকে অনেক সরস রস পরিবেষণ ক'রেচেন, তিনি নাকি আধুনিক সাহিত্যের কুরুচি দর্শনে মর্ম্মাহত হয়েচেন!

আর একজন শ্রদ্ধেয়া আদর্শবহুল-উপন্যাস লেখিকা এই সব তরুণ সাহিত্যিকদের মাতৃত্বের দাবী কোরে নুন খাইয়ে মারতে চেয়েছেন।

জানি, স্বীকার করি বর্ত্তমান সাহিত্যে, সাহিত্যের নাম কোরে এমন অনেক কদর্য্য জিনিষ চলে গেছে, যা মোটেই সাহিত্য পদবাচ্য নয়।

কোন একটা নতুন যুগের স্রোতোধারায় অনেক আবর্জ্জন ও ত' বয়ে আসে, কিন্তু সেই আবর্জ্জনার সঙ্গে যে অফুরান ভাবগঙ্গা বয়ে আসচে, তার দিকে কি আমরা দেখবো না? ভালোমন্দ নিয়েই ত' পৃথিবী, জগতের কোনো জিনিষই ত' সুসম্পূর্ণরূপে সমৃদ্ধ হোয়ে ওঠেনা।

আবর্জ্জনা ত' জীবনকে আচ্ছন্ন করে রাখে না—সাহিত্যের মণি-কৌটায় যে মণি মঞ্জুষা আজ সঞ্চিত হবে, তার দাম আজ হয়ত কম মনে হ'তে পারে, কিন্তু সাহিত্যের দরবারে তার স্থান সে আপনিই করে নেবে।...একথা যিনি অস্বীকার করবেন আধুনিক সাহিত্য দরদের সঙ্গে তিনি পড়েন না।

দুঃখ দৈন্য পরাভব জর্জ্জরিত দেশে আজ এই যে লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত মানবাত্মা হাহাকার কোরে মরচে, তার দুর্দ্দম বেদনাকে রূপে রসে সঞ্জীবিত করবার এই যে এক বিপুল অভিযান হচ্চে...... তার জন্যে যে সব দরদী তরুণ সাহিত্য-সেবী গ্লানিকর জীবনের চরম অভিজ্ঞতা নিয়ে এই বিরাট প্রচেষ্টায় অগ্রসর হচ্চেন তা' লক্ষ্য কোরে পরম বিস্ময় ও একান্ত সম্ভ্রমে হৃদয় পরিপূর্ণ হোয়ে ওঠে!

যন্ত্র জগতের 'ধূলিধূমধূম্রজটার' বহ্নি শিখায় যাদের অন্তর নিষ্পেষিত হচ্চে, তাদের সুখদুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষার কথা সাহিত্যে স্থান পেলে সাহিত্য যদি আভিজাত্যের স্তর থেক

নেমে এসে অপকৃষ্ট সাহিত্য হোয়ে ওঠে, তা'হলে দেশের দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি হ'তে পারে?

* * *

শ্রমিক হ'লেও, দরিদ্র হ'লেও সেও ত' মানুষ, তারও ত' মন ব'লে একটা জিনিষ আছে। বেদনায় সে কষ্ট পায়, আনন্দে সুখী হয়।

এই সম্মিলিত মহাশক্তির মানবতা কি চিরদিন অবহেলিত হ'য়ে আসবে?

...কবে আসবে সেদিন, যেদিন জগতের ধনী দরিদ্রের প্রভেদ থাকবে না। থাকবে শুধু মানুষ—এই বিশ্বকে যাঁরা নিয়ন্ত্রিত ক'রবে। সাহিত্যের ভাণ্ডারে সেদিন এরা যা দান ক'রবে, বিশ্ব-সাহিত্য এবং বিশ্বমানব তার পুণ্য স্নানে পবিত্র হোয়ে উঠবে।

গ্লানির ভিতর থেকে যে জীবনের আলো ফুটে ওঠে সে আলোই ত' মানুষকে মহান্ করে।

তাই যখন দেখি মনীষি কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র—মহেশ ও অভাগীর স্বর্গ, নরেশচন্দ্র, নটবর, শৈলজানন্দ ধ্বংসপথের যাত্রী এরা—ও কয়লাকুঠি, প্রেমেন্দ্র বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে, বন্দী মোর ভগবান্ কাঁদে প্রভৃতি গল্প সৃষ্টির অপরূপ মাধুর্যে বিকশিত কোরে তুলেছেন আর তা' কলালক্ষ্মীর পাদপদ্মস্পর্শে সুপবিত্র হোয়ে উঠেচে তখন কি মনে হয় আধুনিক সাহিত্যের প্রতি এই যে অবিচার, কলঙ্কলেপন এর কোনো ভিত্তি আছে?

বাধা দেবার, আঘাত করবার প্রতিরোধ করবার জন্ত অনেক রক্ষণশীল ঈর্ষা-পরায়ণ, খড়্গ তুলে দাঁড়াবেন কিন্তু যাঁরা সত্য শিব সুন্দরের একনিষ্ঠ পূজারী তাঁরা কখনোই এদের রক্তচক্ষু দেখে বিচলিত হবেন না। কারণ এমনিই ত' হয়, সৃষ্টির শেষ পর্য্যন্ত এও হ'তে থাকবে। Newton ও Socratesএর কথা লোকে এখনো ভোলে নি।

* * *

সমস্ত পৃথিবীময় এই যে একটা মহাযুদ্ধ বেধে গেছে—একটা বিপ্লব এসেছে, তাতে 'নবীনে'র সর্ব্বস্ব একেবারে পুড়ে যাচ্চে—কিন্তু মন তার প্রদীপ্ত হোমশিখার মতোই জ্বলে উঠ্চে—তার আশা আকাঙ্ক্ষা ত' নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়নি, নবীন আশায় বুক বেঁধে সে বল্‌চে—"পুড়ুক, আর একটা নূতন গ্লোব আনিয়া দিব।"

* * *

মহাসাগরের ওপার থেকে প্রশ্ন হয়—"ব্যাপার কি তোমাদের? কোন্ পথে চলেছে তোমাদের সাহিত্য?"

ভারতের হোমধূমমুখরিত পুণ্য প্রাঙ্গণে, ভারতীয় পূজা-বেদীতলে একটা সুর কি ধ্বনিত হচ্ছে না—'মহামানবতার পথে—নবজীবনের পথে।'

দান

—শ্রীমতী নির্ম্মলা দেবী

পাড়াগাঁয়ের মেয়ে হইলেও আড়িপাতা রোগটা আমার কখনো ছিল না।

সতেরো বছর বয়সেই মা বাপকে হারিয়েছি, স্বামীর বংশের কেহ কোথাও আছেন কি না জানি না, মাতুল গোষ্ঠীর কাহাকেও জন্মাবধি চোখে দেখি নাই!—একমাত্র ছোট বোনটীকে লইয়া বাস করি।

সুকুর বিবাহ দিলাম। পাত্রটীকে নিজে ভাল করিয়া দেখি নাই। আমার কাকাবাবু সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সবার কাছে শুনিয়াছি, ছেলেটী নাকি দেখিতে শুনিতে ভালোই।

বিবাহের দিন গোলমালে কাটিয়া গেল। সকালবেলা বর কনে বিদায়ের সময় চোখের জলে ভাসিয়া কিছুই দেখিতে পাই নাই। ভাগ্য বিড়ম্বিতা বলিয়া বরণ বা স্ত্রী-আচার অথবা অন্য কোনও অনুষ্ঠানে নিজে যোগ দিই নাই।

সপ্তাহ পরে বর কনে জোড়ে এ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

আমার সুকুকে মনোমত করিয়া সাজাইয়া তাহার স্বামীর শয়নঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া, এতদিনের পর যেন নিজেকে অবসন্ন মনে করিলাম।

নিজের কক্ষের জানালাটী খুলিয়া দিতেই এক ঝলক চাঁদের আলো আমার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। এলাইয়া, বিছানায় শুইয়া, চোখ বুজিয়া ভাবিতে লাগিলাম,—সুকু এখন হইতে আর আমার নয়। কয়েকদিন পরেই তো তাহাকে লইয়া যাইবে! আসন্ন বিচ্ছেদের ব্যথায় প্রাণ হাহাকারে কাঁদিয়া ওঠে!

তবু সারা অন্তরের সহিত প্রার্থনা করি সুকু আমার জন্ম জন্ম স্বামীর ঘর করুক। সে-ই তাহার স্বর্গ। যাঁর হাতে তাহাকে সঁপিয়া দিয়াছি, সে-ই তাহার একমাত্র আপন।

সুকু আজও যেনো ছেলেমানুষ। কৌতূহল জাগে দুজনাতে বেশ ভাব হইয়াছে তো? ওদের ঘরটীতে এখনো আলো জ্বলিতেছে। পাগলীটা নরেশের সঙ্গে না জানি কি বলিয়া আলাপ করিতেছে! উহারা কি কথা কয়, শুনিতে ইচ্ছা করে! নরেশকে দেখিয়া বহুদিনের বিস্মৃত একটী কিশোর তরুণ মুখের ছবি মনে জাগে। নরেশ নামটীও আমি দিয়াছি। তাঁহার আসল নাম তো আমি মুখে আনিতে পারি না! সে নাম যে আমার স্বামীর নাম। আর যে যাই বলিয়া ডাকুক, আমি তাঁহাকে নরেশ নামেই ডাকিব।

মনের মধ্যে প্রবল বাসনা জাগিল লুকাইয়া ওদের কথাবার্ত্তা চুরি করিয়া শুনিব। নিজের মনের সঙ্গে দ্বন্দ্বে পরাজিত হইলাম। এ অভ্যাস আমার কখনো ছিল না। মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠিয়া সুকুর ঘরের জানালার নিচে দাঁড়াইয়া ঈষৎ মুক্ত খড়খড়ির মধ্য দিয়া তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলাম।

অতৃপ্তনয়নে চাহিয়াছিলাম। হঠাৎ নরেশের একটী কথায় চমক ভাঙ্গিয়া উৎকর্ণ হইলাম।—তখন বলিতেছিলেন, ..."আমাদের আজ থেকে এই যে নূতন পথে যাত্রা সুরু হোল, তোমাকে আমাকে এক সাথেই চলতে হবে। দুজনার গতির ছন্দ এক সুরেই বাঁধতে হবে। আমাদের তৃতীয় আত্মীয় আর কেহ নেই,—সুখে দুঃখে চিরদিন তুমি আমার সাথী, আমি তোমার বন্ধু। তোমার আমার মাঝে গোপন লুকোচুরি কিছু থাকবে না। তোমার মনটীর সবখানটাই আমার চোখের সামনে ধরে রাখবে,—আমার মনের সকল কথাই তুমি জানতে পাবে। এই জন্যেই আজ ছেলেবেলাকার কাহিনী তোমার কাছে বলতে আরম্ভ করেছি। আমার জীবনের সকল কথা তুমি জানবে৷

তোমার মনের ইতিহাসও আমি জানব। তারপর আর কিছুই বাধা থাকবে না পথ চলার সময়।.........

তারপর, হাঁ, সন্ন্যাসী হওয়ার কথা বলছিলাম।

তিনটী বছর ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে এই ছন্নছাড়া জীবনটাও আর ভাল লাগল না।

ভগবানের নাম যত ভাবতে চাই তত দূরে গিয়ে পড়েন। মোক্ষের সন্ধান সুদূর পরাহত বলেই মনে হোল। অধিকন্তু খবর পেলাম, বাবা এবং মা আমার সন্ধান না পেয়ে শোকে দুঃখে পাগল হোয়ে স্বর্গে গেছেন।

ছোটবেলা থেকেই আমার সাধু সন্ন্যাসীর ওপর ঝোঁক, লেখা পড়া ভাল লাগত না, কোথায় কোন তীর্থে কে সাধু মোহন্ত আছেন খুঁজে খুঁজে বেড়াতাম। মাছ মাংস খেতাম না কখনো। মা ভেবেছিলেন বিয়ে দিয়ে আমাকে গৃহবাসী করবেন। প্রথমে তাঁদের কথার অবাধ্য হতে পারি নি। অগ্নি দেবতা সাক্ষী করে এক অভাগিনীকে সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করেছিলাম সে কথাও সত্যি। কিন্তু ক্রমশঃই মন বিদ্রোহ করল। ভাবলাম বাপ মা আমার দেহের জনক এই অধিকারে আমার মনের স্বভাব গতির ছন্দটুকুও বেঁধে ফেলবেন সে কেমন করে সইতে পারি?

তিন বছর পরে কাশীতে মাতা পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনলাম,—সেদিন কিন্তু নিজের মনে আত্মগ্লানি জেগেছিল। আমার জন্তই ভেবে ভেবে তাঁরা মারা গিয়েছেন একথা মনে হলে আর জ্ঞান থাকে না।

দেশে ফিরে এলাম।

বিবাহ করে আর একটী যে অভাগিনীর জীবন বিষময় করে দিয়েছি, তাকে অনুসন্ধান করে, যদি এখনও সম্ভব হয় ভালবাসতে চেষ্টা করব, ভাবলাম। সন্ন্যাস পিপাসা একেবারেই মিটে গিয়েছিলো।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তারও আর সন্ধান পেলাম না।

আমার শ্বশুরের প্রকৃত দেশ কোথায় ছিল জানি না।—তবে আমার শ্বশুরের নাম গিরিশবাবু,—এবং স্ত্রীর নাম ছিল রাণী, এইটুকু জানতাম। শুধু এই পরিচয়ের উপর নির্ভর করে তাঁদের খুঁজে বার করা একেবারেই অসম্ভব মনে হোল।

আজ তোমাকে বিয়ে করতে রাজী হলাম, তার কারণটাও তোমায় জানালাম, তুমি রাগ কোর না।

রাণীর চেহারা সম্বন্ধে আমার কল্পনায় যে ছবি জাগ্রত ছিল, তোমার চেহারার সঙ্গে তার এতো মিল, আশ্চর্য্য! এমন কি প্রথম দেখে মনে হয়েছিল তুমিই রাণী—আমাকে ছলনা করছ—”

যাহা শুনিলাম যথেষ্ট,—আর যে সহ্য হয় না!

শুধু নামে মিল ছিল বলিয়া নরেশ বলিয়া ডাকিব ভাবিয়া ছিলাম,—কিন্তু এর পর—?

হায় রে অদৃষ্ট—উনি যে—আমারই—স্বামী—! না—না—আমার নয়—সুকুর! আমার কেহ নন—!

জানালার নীচেই বসিয়া পড়িলাম!—সুকু কি পিতার এবং দিদির নামে সামঞ্জস্য মনে করিয়া কিছু সন্দেহ করিয়াছে?

কিন্তু এ রকম নামের মিল তো কত জনেরই থাকিতে পারে!

তাছাড়া আমরা যখন ৺কাশী হইতে ফিরিয়া আসি সুকু তো বালিকা ছিল। আমার স্বামী সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছিলেন—এ সব ইতিহাস সে জানে না।

চোখে যেন সব অন্ধকার দেখিতেছি। সব গোলমাল হইয়া যাইতেছে। উদাস নেত্রে একদিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতে লাগিলাম,—এই তো শুক্লা চতুর্দ্দশীর চন্দ্র মাথার উপরে হাসিতেছিল, উঠানের এক পার্শ্ব হইতে হাস্নাহেনার ঝাড়টী গন্ধ বিকীরণ করিতেছিল, কিছুক্ষণ আগেও জোৎস্না-স্নাত মুঞ্জরিত পুষ্প শাখাটীর দিকে মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া তাহার মদির গন্ধ অনুভবে পুলকিত মনে বোনটীর সুখমিলন দর্শনের জন্য উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলাম,—এখন কিন্তু অন্ধকার! আলো নাই, পথ নাই,—শুধু বিভীষিকা জেগে ওঠে—

এগার বছর বয়সে আমার বিবাহ হয়।

স্বামীর বয়স তখন ছিল সতেরো।

বিবাহের পর তিনটী মাসের মধ্যেই তিনি গৃহত্যাগ করেন। সেদিনের পর আজ চোদ্দটী বর্ষ অতীত হইয়াছে।

এতদিনের পর সহসা তাঁহাকে পুনর্ব্বার দেখিয়া মন যদিও চঞ্চল হইয়াছিল, তবু প্রথমে চিনিতে পারি নাই! সে আমার দুরদৃষ্ট!

এই চোদ্দ বছরের মধ্যে পৃথিবীতে কত ওলট পালট হইয়াছে!

আমার শ্বশুর শাশুরী, বাবা মা সকলেই এক এক করিয়া জীবনের ঋণ শোধ করিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। আমাদের এই ভদ্রাসনটুকু ও সামান্য কয়েক বিঘা জমির আয় আছে বলিয়া অনাহারে মরিতে হয় নাই। সুকু এবং আমার মাঝখানে আরও তিন চারিটী ভাই বোন ছিল, আজ তাহারা সকলেই মরিয়াছে। সুকু আমার চেয়ে দশ এগারো বছরের ছোট বলিয়াই আমার কোলেপিঠেই মানুষ হইয়াছে। সন্তানের জননী হই নাই, সুকুকে আমার মেয়ের মতই ভালোবাসিয়া আসিয়াছি।

ছেলেবেলা হইতে স্বামীর নামটী জপমালার মত বুকের মধ্যে ছিল। স্বামীর প্রতিমূর্ত্তি হৃদয় আসনে দেবতার ন্যায় প্রতিষ্ঠা করিয়া কল্পনায় এ ক্ষুদ্র পরাণের ভক্তি নিবেদন জানাইয়া পূজা করিতে শিক্ষা করিয়াছি। আজ আমার ধ্যানের কল্পনার দেবতা সশরীরে সম্মুখে!

বর কন্যার বিদায়ের দিনও কি আমি অন্ধ হইয়াছিলাম? তাহা না হইলে, তাঁহারা যুগলে আমাকেই নত মস্তকে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ চাহিলেন যখন........

তখনো স্পষ্ট চিনিতে পারি নাই!

স্বামী বার বছর নিরুদ্দিষ্ট হইলে বিধবার বেশ পড়িয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়,—আমাকেও সকলে বিধবা বলিয়াই জানিত।

ওগো, দেখা যদি দিলেই দেবতা, তবে এতদিন পরে এয়োতীর সজ্জায় এতদিন অপেক্ষা করিয়া তোমায় তো পাই নাই, এখন এই সর্ব্বস্বহারা বিধবার বেশ, বিধবার বেশে আমার সর্ব্বস্বকে আমার চোখের সামনে দেখিতেছি! আজ যদি পরিচয় দিই—আর কেহ বিশ্বাস না করুক,—তুমি করিবে তা জানি,—তবু—পারিব না! জীবন থাকিতে পরিব না! সুকু যে আমাকে আজন্ম দিদি বলিয়াই চিনিয়াছে, আজ নূতন সম্পর্ক সতীন বলিয়া—না—না—তাহার কচি কোমল বুক ভাঙ্গিয়া যাইবে। সে যে পরম বিশ্বস্ত হৃদয়ে নিজেকে স্বামীপ্রেমের একমাত্র রাণী ভাবিয়া সুখের হিল্লোলে ভাসিতেছে, সে যখন শুনিবে স্বামীর সেই কোন কালের হারিয়ে যাওয়া অজানা প্রথম পত্নী এই তাহার অভাগিনী দিদিই—হয়তো ভাবিবে তাহার বুকভরা প্রণয়ের, প্রেমের, সুখের পথে কণ্টক। তখন? তখন হয়ত তাহার দিদিকেই ঘৃণা করিবে! এমন নূতন করিয়া পরিচয় জানাইলে স্বামীও কখনই সুখী হইবেন না! তবে কি জন্য আমার পরিচয় জানান? আমার এ জন্ম পূজা করিয়াই কাটিবে—এবং তাহা সকলের অজ্ঞাতসারেই!....

পরদিন বৈকালে সুকু বলিল, স্বামী তাহাকে তাঁহার কর্ম্মস্থল বহরমপুরে লইয়া যাইবেন।

কাকাবাবু আমার চোখে জল দেখিয়া বলিলেন,—জানোই তো মা, সংসারের নিয়ম এই। অন্তরের স্নেহ দিয়া যাহাকে তিল তিল করে গড়েছ সে তোমার নিজের নয়! সুকুকে ছেড়ে তোমার থাকতে হবে, কিন্তু চঞ্চল হয়ো না মা। তুমি তো সবই বোঝ—

আজ আমার জীবনের একটী মহাপরীক্ষার দিন!

কেমন করিয়া বলি, শুধু সুকুর বিচ্ছেদ নয়, তাহার সহিত আমার প্রাণের প্রাণকেও দূরে সরাইয়া দিতেছি,—আমার জন্মজন্মান্তরের সাধনা এবং কামনাকেও হারাইতে বসিয়াছি!

স্বামী বলিলেন—নূতন করিয়া সংসার পাতিলাম। সুকু এবং আমার দুজনকারই সমান অভিজ্ঞতা! কত কষ্টই পেতে হবে! তার চেয়ে চলুন দিদি, আমাদের সঙ্গে—

এ কি অপূর্ব্ব আনন্দ শিহরণ! আমার শিরায় শিরায় উন্মাদনা আগুন জ্বালাইতেছে! আমি নারী তো! মনের বল পাই না! কেমন করিয়া নিজের রুদ্ধ আবেগ সংযত করি? ভগবান! এ আমায় কি বিপদে ফেলিলে প্রভু, একি পরীক্ষা দয়াময়! আমি সুকুকে ছাড়িয়াই বা কি করিয়া থাকিব?

কিন্তু—যেতে পারি না কিছুতেই!

যৌবনে যে হোমানল অন্তর মধ্যে জ্বালাইয়া ইষ্টদেবতার পূজা সঙ্গে করিয়া যোগিনী সাজিয়াছিলাম তাহা কি নিষ্ফল? আজ শুধু কি ভস্মই অবশিষ্ট আছে? এতটুকু উত্তাপও নাই?

সুকু আসিয়া দুটী পা জড়াইয়া ধরিল, বড় কান্নাই কাঁদিল! দুর্ব্বল মন! আশ্চর্য্য! যাবো? সুকু বলিতেছে, —স্বামী মিনতির সহিত অনুরোধ করিতেছেন,—

কিন্তু—তবু—না, যেতে পারব না!

যতদিন পাই নাই, ক্ষীণ আশা ছিল! কামনা জয় করিতে পারি নাই! শুধু একবার—একটীবার—অই দুর্লভ পদযুগল বক্ষে ধারণ করিতে এখনও কামনা জাগে!

চোখে এক ফোঁটা জল ছিল না। শুষ্কনেত্রে বিহ্বল ভাবে সুকুর দিকে চাহিয়া রহিলাম। জানে না—কেহ জানে না—আমার বক্ষ মধ্যে নীলাম্বুর অগাধ নীর সঞ্চিত ছিল,—তবু—তবু এক ফোঁটাও বাহির হইল না।

অস্বীকার করিলাম। হস্তপদ শীতল, মস্তিষ্ক উষ্ণ বোধ হইতেছে, যথা সম্ভব প্রাণপণে মনের গোপন ভাব লুকাইয়া বেড়াইতেছি। ঐ পদ্মকোরক তুল্য চরণ দুখানির উপর একটীবার যদি মাথা রাখিতে পারিতাম,—আহা, সার্থক আমার সুকুর জন্ম! সার্থক তাহার শিব পূজা! আমার কি নয়? ওগো, আমিও তো পাইয়াছিলাম! কে এমন পাইয়াছে?—পাইয়া বঞ্চিত হইয়াছি—তবু আমারও তো স্বামী!—স্বামী—এ জনমে অন্তরের ধন অন্তর মধ্যেই পূজা গ্রহণ করিও।

গাড়ী আসিল। সুকু কাঁদিতে কাঁদিতে প্রণাম করিতে আসিল।—তিনিও আসিতেছিলেন,—আমি অন্যত্র সরিয়া গেলাম। অন্তর হইতে সুকুকে আশীর্ব্বাদ করিলাম, যাও সুকু, জন্ম জন্ম ঐ ঘর করো!—আমার সুকু, সুখী হোয়ে তুমি!—

বিদায়ের ক্ষণটীতে দেখা করিতে পারিলাম না!

বিধবা আমি নই। অন্তরে চির এয়োতীই আছি!—তবু সুকুর কল্যাণে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছি যে! আমার মনের পরিচয়টাও সঙ্গোপনে লুকাইয়া রাখিলাম।

নীলকণ্ঠ

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

—সতের—

গোপাল নীরজার কাছ হইতে বাড়ী আসিয়া নিতান্ত অবসন্নের মত একটা কেদারায় হেলান দিয়া বসিয়া পড়িল। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সর্ব্বস্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে এমনি তার মনের অবস্থা।

গোপাল ইতিমধ্যেই মাঝে মাঝে মদ্য পান করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। নীরজা বা বন্ধু বান্ধবদের কেহ এ কথা জানিতে পারে নাই।

আজ আবার তার ইচ্ছা হইল, 'কলিং বেল' বাজাইয়া বেয়ারাকে ডাক দেয় অথবা নিজেই উঠিয়া আলমারী খুলিয়া হুইস্কির বোতল বার করে একটী গ্লাস আকণ্ঠ পান করে। কিন্তু উঠিয়া দাঁড়াইতে গিয়া সে আবার বসিয়া পড়িল। পা ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছিল। মাথার ভিতর ঝিম ঝিম করিতেছিল। বেহারাকেও ডাকিতে না পারিয়া যেমন ছিল তেমনি বসিয়া রহিল।

অনেকদিন পরে গোপালের মনে অতীত জীবনের ছবি

স্মৃতি জাগিয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। সে আজ প্রথম ভাবিতে লাগিল যে পথে সে এতদিন চলিয়াছে হয়ত তাহার উচিত হয় নাই। কেমন করিয়া মালতীর একটী মাত্র অবজ্ঞার ভ্রূকুটীতে সে তাহাকে বিবাহ করিয়া অবহেলার ব্যথায় সারাজীবন কষ্ট দিয়া প্রতিশোধ লইবে ভাবিয়াছিল,—মালতীর প্রতি বিদ্বেষ ছিল বলিয়া পিতার সঙ্গে পর্য্যন্ত দেখা করে নাই, তাঁহাকেও নিরন্তর দুঃখ দিয়াছে,—কেমন করিয়া নিছক পাগলামীর খেয়ালে তাহার বিলাত যাবার ইচ্ছা হইয়াছিল—এবং ভারতের বাহিরে এক বৎসর বিদেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইবার সময় নীরজার প্রতি ভালবাসার তীব্রতা বিশেষ কয়িয়া অনুভব করিয়াছিল,—নীরজাকে পাবার নেশা তাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল,—তারপর হঠাৎ সুরথ সম্ভবতঃ তাহাদের সন্দেহ করিয়া ব্যথিত হইয়া একরূপ নিজের মৃত্যু যাচিয়া লইল—অবশেষে নীরজার তত্ত্বাবধানের ভার তাহার উপর অর্পিত হওয়ায় ফলে এতদিনকার প্রচ্ছন্ন ভালবাসা সহসা প্রকাশ করিয়া কামুক মোহে নীরজাকে পাইবার জন্য ব্যগ্রতা দেখাইলে সে তাহাকে তিরস্কার করিয়া প্রত্যাখ্যান করিল,—আগাগোড়া সমস্তই স্বপ্নের মত গোপালের মাথার ভিতর তোলপাড় করিতে লাগিল। আজ যেন মনে হইল সে আগাগোড়াই ভুল করিয়াছে। কিন্তু যা করিয়াছে আর প্রতীকার হয় না। সমস্ত ক্রোধ মালতীর উপর পড়িল। সেই তাহার স্বচ্ছন্দতা হরণ করিয়া তাহাকে গৃহ হইতে দূর করিয়া ছন্নছাড়া ও ভবঘুরের অবস্থা গ্রহণ করাইয়াছে। তাহাকে বিবাহ করাটাই সব চেয়ে ভুল হইয়াছে। মালতী তাহার জীবনকে বিষাক্ত না করিলে হয়ত সে অসুখী হইত না। নীরজাকে পাবার লালসা তাহাকে এতখানি পাগল করিয়া তুলিবার অবসর পাইত না! বন্ধু সুরথ অকালে স্বেচ্ছা মৃত্যু বরণ করিত না!

পিওন একখানা চিঠি দিয়া গেল।

চিঠিখানা কার, কে দিলে পড়িয়া দেখিবার শক্তিটুকুও যেন তার ছিল না। টেবিলের উপর যেমন ছিল, না খোলা অবস্থায় পড়িয়া রহিল। আধঘণ্টা একঘণ্টা কাটিয়া গেলে মনটা যখন একটু সুস্থ হইল—গোপাল তার নিজের জীবন সম্বন্ধে অতীত কথা সব ভাবিতে ভাবিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। সে পিতার অসুখের কথা শুনিয়াছিল। দু' একখানা চিঠিতে মালতী একথা জানাইয়াছিল, মনে পড়িল। তাকে বাড়ী ফিরিবার জন্য পিতার সমস্তই বানানো মিথ্যা ছল ভাবিয়া এতদিন সেকথায় আস্থা স্থাপন করে নাই। আজ একটু ভয় হইল—অসুখের কথাটা সত্যিই যদি হয়!

আজকের চিঠিখানার দিকে দৃষ্টি পড়িতে—তার এই ভয়টা আরও বেশী হইয়া উঠিল। সেখানা হাতে করিয়া খুলিতে তার ভয় হইতেছিল—যদি একেবারে শেষ খবরই তাতে লেখা থাকে! পিতার উদ্দেশে কপালে হাতদুটা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া নিজের সকল অপরাধের মার্জ্জনা চাহিল। ভাবিল না জানি কত অভিমানই তিনি করেছেন। গোপালের ইচ্ছা হইতেছিল এখনই ছুটিয়া যায়। তিনি বেঁচে আছেন ত? কম্পিত হস্তে মালতীর চিঠিখানা খুলিয়া পড়িতে লাগিল।

সে লিখিয়াছে—

"পূজনীয়েষু—

আমার চিঠি আপনাকে বিরক্ত করে জানি। আপনি হয়ত একবারও খুলিয়া দেখেন না। তবু বাবার অনুরোধ না লিখে পারলাম না। তাঁর প্রতিও ত আপনার কর্ত্তব্য আছে! দয়া করিয়া তাঁর এই শেষ সময়ে আর কষ্ট দিবেন না।

বাবার রোগ হঠাৎ অত্যন্ত বাড়িয়াছে। আর দু'চার দিনও বাঁচেন কিনা সন্দেহ। তিনি বিষয় সমস্ত ঠাকুরের নামে লিখিয়া দিয়াছেন। ও আমাকে সমস্ত দেখিবার জন্য প্রতিনিধির সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব দিয়াছেন। কাগজের লেখায় আমার নাম থাকায় আমি অনেক আপত্তি করেছিলুম। তাঁকে বলেছিলুম—এমন কথা লিখে দিন যাতে আপনার যদি কখনো বাড়ী ফিরতে ইচ্ছা হয় এসে সব বুঝে নিজেই দেখা শুনা করিবেন। যদি আমার জন্য কখনও দেশে না আসেন—তাহলেও যাতে সকল বিষয়ে আপনারই ক্ষমতা থাকে তার জন্য ব্যবস্থা লিখে রাখতে বলেছিলুম। বাবা সে কথা শুনলেন না। আপনি যদি এখনও তাড়াতাড়ি একটী

বার বাড়ী এসে উইলখানা বদলে কর্ত্তৃত্বের ভারটা নিজের নামে লিখিয়ে নেন তাহলে ভাল হয়।

অধিক কি আর লিখব।

আমার প্রণাম জানিবেন। ইতি

সেবিকা
"মালতী"

বিষয় হাত ছাড়া হইলে গোপাল খাবে কি? মালতীর চিঠিখানা পড়িয়া সে যারপর নাই বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। পিতার অবিবেচনা ও মালতীর স্পর্দ্ধার কথা যতই তার মনে হইতে লাগিল—তার সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া গেল। উত্তেজনায় তার মাথা গরম হইয়া উঠিল। কলিং বেল বাজাইতে বেয়ারা রামচন্দ্র সামনে হাজির হইলে গোপাল বলিল "আলমারী থেকে হুইস্কি বার কর। গলাটা একদম শুকিয়ে গেছে।"

রামচন্দ্র মদের যোগাড় করিয়া দিলে গোপাল বলিল "আর দেখ,—একখানা গাড়ী ভাড়া করে আন—ষ্টেশনে যাব। আমার জামা কাপড় তৈরী করে রাখ। আর—শোন—আমি দুতিনদিন আসবনা জিনিষপত্র কিছুমাত্র তছরূপ না হয়। আর—আর—নীরজা বৌদি—বুঝেছিস্‌ত' —তাঁকে খবর দিবি! আচ্ছা আমি চিঠি লিখে সব খবর বলে পাঠাচ্ছি—!"

মদ পেটে পড়িতে গলা ভেজা দূরের কথা—আগুনের তাপে নূতন করে যেন সব পুড়িয়া যাইতেছে এমনি মনে হইল। ক্রমশঃই উত্তেজনা বাড়িতেছিল। গোপাল ছটফট করিয়া বেড়াতে লাগিল। আপন মনে চীৎকার করিয়া সে বলিতেছিল "এ সমস্তই হারামজাদীর কারসাজি। সেই জোর করে লিখিয়ে নিয়েছে। আবার দোষ ঢাকবার জন্ম —এই চাল চেলেছে। আমি গিয়ে একবার তাকে দেখে নেব।"

ট্যাক্সি চালক গাড়ী আনিয়া হর্ণ বাজাইয়া জানাইল সে প্রস্তুত। সে আওয়াজ গোপালের কাণে গেল না। আপন মনেই সে তখন ছুটিয়া বেড়াইতেছিল—আর বলিতেছিল "হারামজাদীকে কেটে ফেলব। খুন করব! খুন করব আমি! দেখব কে তাকে রক্ষা করে।"

উন্মাদনার মাঝে হঠাৎ কেমন মাথা ঘুরিয়া গেল। সামনে কিছু দেখিতে পাইল না। টলিতে টলিতে দেওয়ালে আঘাত পাইয়া তৎক্ষণাৎ পড়িয়া গেল। ধারে একটা তেপায়া টেবিলের উপর ফুলদানীতে গোলাপের তোড়া সাজান ছিল। সবশুদ্ধ উবুড় হইয়া সেটা গোপালের মুখের উপর পড়িয়া গেল ও তার বাম গালের উপর ভীষণ ক্ষত করিয়া দিল। গোপাল তখন উত্থান শক্তি রহিত। অজ্ঞান অবস্থায় গোঁ গোঁ করিতেছিল। রামচন্দ্র ও অন্যান্য চাকরেরা শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া আসিল ও 'জল আন' 'ডাক্তার ডাক' 'পাখার বাতাস কর' এমনি সব গোলমাল আরম্ভ করিয়া দিল।

প্রকৃতিস্থ হইলে গোপালের মনে পড়িল বাড়ী যাইতে হইবে। সেদিন কিন্তু অবসাদে আর উঠিতে পারিতেছিল না। সে একটা টাকা ছুঁড়িয়া মোটর চালককে দিয়া গাড়ী ফিরাইয়া লইয়া যাইতে বলিল। ও তারপর টলিতে টলিতে কোনও ক্রমে বাড়ীর ভিতর গিয়া বিছানার উপর শুইয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

—আঠার—

সকালবেলা বিছানা থেকে উঠিয়া গোপাল মনে করিল—নীরজার জন্ম হাসপাতালের খবরটা আগে লইতে হইবে। তাহার সম্বন্ধে সকল বন্দোবস্ত করিয়া তবে বাড়ী যাওয়া উচিত ভাবিয়া সে তখনই সব খোঁজ লইতে বাহির হইল। নীরজা প্রবেশিকা পাশ করিয়াছিল এইজন্য তাহাকে ভর্ত্তি করিতে বিশেষ কষ্ট হইল না। দুইদিন পরে নীরজাকে এই খবর দিবার জন্ম তাহার বাড়ী যাইল। নীরজার সহিত দেখা করিতে তাহার কুণ্ঠা বোধ হইতেছিল সে ভাবিতেছিল সেদিনকার অত বড় অপরাধের পর নীরজা হয়ত তাহার সহিত আর কথা কহিবে না। যাই হক নীরজার কথা মত ধাত্রী বিদ্যালয়ে তাহার প্রবেশ পত্র ডাকে না পাঠাইয়া নিজে গিয়া দিয়া আসিবার ইচ্ছা সংবরণ করিতে পারিল না। নীরজা হাসি মুখে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া ঘরে ডাকিল। তাহার অকপট ব্যবহারে গোপালের সঙ্কোচ দূর হইল।

সুভাষ আসিয়া অনুযোগ করিতে লাগিল "ছোটদা।

তুমি দিদিকে বারণ কর। আমি ত বড় হয়েছি। আমাকেই বরং কলেজে ভর্ত্তী না করে একটা কোনও কাজ-কর্ম্ম দেখে দাও। তিরিশটা টাকা মাহিনা পেলেও আর বাড়ী ভাড়া যা মাসে পাই দুয়ে মিলে আমাদের খুবই চলে যাবে। দিদি শুনবেন না কিছুতেই। বললেন তুমি সাহায্য করবে না বলেচ, তাই—আর তাছাড়া কত দিনই বা অপরের উপর নির্ভর করে থাকবেন সেইজন্য তাঁকে কাজ শিখতে হবে। আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি আর টাকা দিয়ে সাহায্য করবে না বলেচ—সে কথাও আমার বিশ্বাস হয় না! তোমাকে জানি ত! তবে চিরকাল তোমার সাহায্য গ্রহণ করার কথা ওঠে যদি—আমি যা বলছি এই করলে ত সমস্ত গোল মিটে যায়। আমার আর পড়ার কি দরকার ?"

নীরজা বলিল "সুভাষ আমি আশীর্ব্বাদ করছি তোকে! আমার ভার নিবি বলছিস্,—কিন্তু, কেন আমি তা স্বীকার করব বল। নিজের ক্ষমতা যদি থাকে অপরের কাছে চাওয়া পাপ। তোর ছোটদাকে ত তোর মতই আমার ভাই বলেই জানি। তাঁর সাহায্য নিতে কুণ্ঠিত হচ্ছি যখন, তখন তোর মাহিনার টাকাই বা আমি নেব কেমন করে? এটা আত্মীয় পরের তফাৎ ভেবে বলছিনা তা জানিস্। আর একটা কথা, তোর এরই মধ্যে পড়া ছাড়লে চলবেনা। আই এ, বিএ, না পড়তে চাস্—একটা কোন কাজ শেখবার জন্য তোকে কোথাও ভর্ত্তী হতে হবে। আমার ইচ্ছা,—কোনও কলকারখানায় দুতিনবছর শিক্ষানবিশী করে মানুষ হ' ত' আগে। তারপর রোজগারের ভাবনা ভাবিস্!"

সুভাষ বলিল "তা হলেও দিদি—আমি যখন রয়েছি—" নীরজা বাধা দিয়া বলিল "না সুভাষ! আমি যা ঠিক করেছি আমাকে বাধা দিস্ নি। আমি চাই আমার উদরান্নের জন্য আমি কারও দায়স্থ হব না। আমি চাই স্বাধীন হয়ে আমার জীবিকা আমিই রোজগার করে নেব। বাড়ীতে নিষ্কর্ম্মার মত বসে দিন কাটান আর মোটেই ভাল লাগছে না। আমি কাজ চাই। তবে যদি কোন দিন এমন দুর্ভাগ্য ঘটে যে কাজ করবার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলি তখন তোদের আশ্রয়ে আবার ফিরে আসব।"

গোপাল নীরজার জন্য বন্দোবস্ত সব করিয়াছে শুনিয়া নীরজা উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "তুমি দুঃখ কর' না ঠাকুরপো। আমার চেয়েও সাহায্য করবার মত গরীব দুঃখী অনেক আছে—তাদের দিকে যদি নজর দেও আমি বড় আনন্দ পাব। আমি অনেক ভেবে আজকের পথ বেছে নিলুম। ভগবান করুন তাঁর আশীর্ব্বাদে আমি সফল হই।"

সেদিন নীরজার বাড়ী হইতে ফিরিয়া গোপাল ভাবিল সত্যিই হয় ত তার বাপের শেষ সময় আসে নাই। প্রতিবারেই মালতী যেমন লেখে এও তেমনি একটা ছল। দিন চার পাঁচ দেরীতে গেলেও চলিবে। কলিকাতার বাসা যখন তুলিয়া দিবে ঠিক করিয়াছে তখন একেবারে সমস্ত কাজ শেষ করিয়া যাওয়া ভাল। নীরজা ও সুভাষের আপাততঃ দরকার যাহা কিছু, তাহার জন্য তাহাদের কোম্পানীর কাগজ ভাঙাইয়া সমস্ত টাকা পোষ্ট অফিসে জমা রাখিল। সুভাষকে মেকানিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং পড়িবার উপযুক্ত জায়গায় ভর্ত্তী করিয়া দিল। নিজের বাড়ীর আসবাব পত্র সব বেচিয়া ফেলিল। ভৃত্যদের একমাসের মাহিনা বেশী দিয়া ছাড়াইয়া দিল। তারপর সে বাড়ী যাইবার আয়োজন করিতেছিল এমন সময় মালতীর আবার চিঠি আসিল। কম্পিত হস্তে খাম খুলিয়া সে পড়িল,—

"পূজনীয়েষু

সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। আর আসবার দরকার নাই। আপনার পথ চেয়ে বসে বসে আপনার নাম করতে করতে বাবা বুকভরা হাহাকার ও হতাশার ব্যথা নিয়ে জগৎ ছেড়ে চলে গেলেন। ভগবান করুন অমর ধামে গিয়ে পুত্রের নির্ম্মম ও নিষ্ঠুর অবজ্ঞার ব্যথা স্মরণ করিয়া আর না তিনি কষ্ট পান। ইতি—

ভাগ্যহীনা "মালতী"

পাষাণ হইলেও পিতা মারা গিয়াছেন এই নিদারুণ-সংবাদে গোপালের অন্তর বিচলিত হইল। এবার আর কাল বিলম্ব না করিয়া ছুটিতে ছুটিতে অবশেষে একখানা ভাড়াটে হাওয়া গাড়ী যাইতেছিল দেখিয়া তাহাতে উঠিয়া সে ষ্টেশনাভিমুখে চলিল।

—উনিশ—

বাড়ীর উঠানের চণ্ডীমণ্ডপে পাড়ার মাতব্বরদের অনেকেই জুটিয়া ছিলেন। অন্তঃপুরেও মালতীর দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিবার লোকের অভাব হয় নাই।

চারিদিকটাই গমগম করিতেছিল সকলকার মিশ্র কোলাহলে।

গোপাল আসিতে তাহার দিকেই সকলকার নজর পড়িল। তাঁহাদের সকল রকম অদ্ভুত কুশল প্রশ্নে সে অস্থির হইয়া পড়িল। চৌধুরী মহাশয় গোপনে জানাইলেন "দেখ বাবাজী। আমি ছিলুম না তাই কাণ্ডটা হয়ে গেছে। নইলে তোমার বিষয়ে অছি থাকবে তোমার স্ত্রী আর তুমি কিনা নিষ্কর্ম্মার মত ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে বসে থাকবে? তা ভাবনা নেই। এসে পড়েছি যখন, আমি আছি, কৃত্তিবাস খুড়ো আছেন, কৈলাস দা আছেন—দুদিন যাক্—দেখিয়ে দেব এ উইল আদালতে ট্যাঁকে কেমন করে!"

কৃত্তিবাস খুড়ো মৃদুস্বরে সেই কথায় সায় দিয়া বলিলেন —এক ছেলে—উপযুক্ত ছেলে—ত্যাজ্য পুত্র হয় না। করব বললেই হবে?—তোমায় কিছু ভাবতে হবে না—আমরা সব ঠিক করে দেব।"

রাম সদয় বলিলেন "বৌমা মেয়ে মানুষ—বিষয় রক্ষার জানেই বা কি আর করবেই বা কি! তাকে ঠকিয়ে কত লোকে শেষে তোমাদের দুজনকেই পথে বসাবে। তুমি বিদ্বান! বুদ্ধিমান। তোমার বিলাত যাওয়ার পাপ আমরা সবাই মিলে খণ্ডন করে দিয়েছি। এখন তুমি যদি তোমার যোগ্য আসন গ্রহণ করে দেশে থাক কোন বেটা বেটীর টুঁ শব্দটী পর্য্যন্ত করতে হবে না। তাছাড়া তোমারও যে বিশেষ ঝক্কি সইতে হবে তা নয়। আমরা আছি তোমার কিছু মাত্র ভাবনা কিম্বা ভয় নেই!"

সকলকার প্রশ্ন ও সমবেদনার যথাযথ উত্তর দিয়া গোপাল বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল। ঘন্টাখানেক ধরিয়া সমবেত প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধাদের গগনভেদী ক্রন্দনে দশদিক প্রতিধ্বনিত হইল! গোপালের নিজের প্রাণও ব্যথার হাহাকারে গুমরে উঠিতেছিল! তবে আর সকলকার দুঃখের মত হয়ত বা তার নিজের দুঃখ গভীর ছিল না—! তাইতেই হয়ত তাঁদের সঙ্গে সুর মিলাইয়া কাঁদিতে সে পারিল না। দিনের মধ্যে মালতীর সঙ্গে দেখা হয় নাই। রাত্রি হইলে গোপাল নিজে তাহার কাছে উপস্থিত হইল। গোপালকে দেখিয়া মালতী চোখের জল সামলাইতে পারিতেছিল না। কিছুক্ষণ পরে একটু শান্ত হইয়া সে রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "আর কি দেখতে এসেছ তুমি। ফিরে যাও—! যেখানে ছিলে তুমি ফিরে যাও! যেখানে এত সুখে ছিলে যে বাপের শেষ আহ্বান তোমাকে বিচলিত করিতে পারিল না—সেখানে ফিরে যাও। ......মরবার সময়টাতেও তোমাকে ভুলতে পারেন নাই। বলে গেলেন—এর পরেও যদি তুমি আস' আমরা যেন তোমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করি। তুমি তাঁকে অবজ্ঞা করেছ বলে আমরা না তিরস্কার করি। আর আমরা যেন তোমায় বলি—কি রকম ব্যাকুল হয়েই তোমায় একটীবার দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় পথ চেয়ে ছিলেন।......জানতুম আমার প্রতিই তোমার ঘৃণা বিদ্বেষ যা কিছু! কিন্তু তোমার বাবা তোমার কাছে এমন কি দোষ করেছিলেন যে তুমি তাঁকে শেষ জীবনে এমনি দাগা দিলে? আমার জন্য যদি আসতে না পেরে থাক—আমায় ত তাড়িয়ে দিলেই পারতে?............"

গোপাল অস্থির হইয়া বলিল "যথেষ্ট হয়েছে মালতী। তোমার বক্তৃতা শোনবার মত ধৈর্য্য আমার নেই। আমার কোন কাজের জন্য কৈফিয়ত তোমাকে দেব না। তোমার সাহস ও স্পর্দ্ধা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছি।"

মালতী নির্ব্বাক ও স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর সেখান থেকে চলিয়া যাইতে চাহিল। গোপাল বাধা দিয়া বলিল "দাঁড়াও তুমি। তোমার সঙ্গে কাজের কথা আছে। বাড়ী ঘর দোর নিজের নামে সবই ত লিখিয়ে নিয়েছ দেখছি, আমার এখানে দুপাঁচদিন এই বাবার কাজটা মিটে যাওয়া পর্য্যন্ত থাকবার অনুমতি হবে কিনা জানতে চাই। নইলে—আমার আর কারও বাড়ী আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে।"............

মালতী নত হইয়া মাটীতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। বলিল "তুমি কি আমাকে এতই নীচ মনে করলে? ফিরে যাও বলেছি বলেই কি এই কথাটা জিজ্ঞাসা করছ?

আমার দুর্ভাগ্য! বিষয় লিখে নেওয়ারও অভিযোগ দিলে! বিশ্বাস না করতে পার আমি যথেষ্ট বারণ করে ছিলুম। আমি বলেছিলুম তাঁকে ;—আমার চাইতে তোমাকেই অছি হিসাবে নিযুক্ত করে' যেতে। তা তিনি শুনলেন না। কি করব বল! বিষয় আমার নামে থাকলেও সমস্তই তোমার। তুমি দুদশদিন কেন বরাবর যদি এখানে থাক সে ত আমার সৌভাগ্য! হয়ত তোমার স্বর্গগত পিতারও সৌভাগ্য। তা কি তুমি পারবে! বিষয় থেকে পাই পয়সাটী পর্য্যন্ত তুমি যেমন ভাবে খরচ করতে চাও করবে আমি বাধা দেব না। বিষয় রাখতে হয় রাখবে না রাখতে হয় উড়িয়ে দেবে। আমার বলবার এতে কিছুই নেই। আমার জন্ম দুবেলা দুমুঠো ভাত আর পরবার কাপড়—তাও দিতে তুমি যদি কুণ্ঠিত হও—চাই না। তবে—বাবা বলে গেছেন যাতে তাঁর ভিটায় প্রতিদিন সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলে, ঠাকুরের আরতি ও ভোগের ক্রটী না হয় এই সব ভার আমায় নিতে।……একটা মাত্র ছোট ঘর আমায় ছেড়ে দিও।"

"বেশ তাহলে তোমার আপত্তি নেই ত? আচ্ছা, —তুমি এখন যেতে পার। কিন্তু দাঁড়াও একবার উইলখানা নিয়ে এস'—দেখে নি ভাল করে।"—

মালতী উইল আনিয়া দিল।

তাহা দেখিয়া গোপাল বলিল "তোমার বুদ্ধির তারিফ করছি। সব দিকেই বেঁধে রেখেছ। বাঃ।—আমার জন্ম দয়া করে একশটী টাকা মাসে—আর কলিকাতার বাড়ীটা! একশ টাকা মাত্র—আমার দুদিনের খরচ। তারপর বাকী আটাশটে দিন আমি দোরে দোরে ভিক্ষা মেগে বেড়াই। ……দান বা বিক্রয়ের ক্ষমতা তোমার নেই। তোফা— যদিই আমি জোর করে লিখিয়ে নিই ভয়ে!……ছলনা কেমন, ঠাকুরের বিষয় ভোগ করবে অছি থেকে!—বাঃ! তারপর মরে গেলে ছেলে—অছির পদে বাহাল হবে! তবু আমি নই! আবার ছেলে যদি না থাকে বিষয় কোম্পানী বাজেয়াপ্ত করবে ও ঠাকুরের পূজার ব্যবস্থা ও দরিদ্র নারায়ণের সেবার জন্য যা দরকার রেখে বাকী দানছত্র করে বিলিয়ে দেবে।……কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ! খাসা উইল হয়েছে। তুমি মরলে যদি আমার পাবার কথা থাকত হয়ত আমি তোমায় খুন করে কেড়ে নেব ভেবে এই মতলব ঠাউরেছ।……নাঃ—বুদ্ধি আছে! হয়ত খুন করে—কেন —তাহলে ত নিশ্চয় খুন করতুম।—যাক্ এখন আর হয় না! বুদ্ধি আছে স্বীকার করতেই হবে! ভাবিয়ে তুললে আমায়! ছেলে না থাকলে কোম্পানী সব বিলিয়ে দেবে! হুঁ! আচ্ছা তুমি যেতে পার। উইলটা থাক।— না হয়—কাছেই রেখে দাও! তোমায় এ বিষয়ে হুঁসিয়ার হতে বলাই বাহুল্য! তবু দরকার—যদিই আদালত পর্য্যন্ত লড়তে হয়!"…………

মালতী ভীত হইয়া বলিল, "আদালত কেন? নামে আমার থাকলেও—সমস্তই ত' তোমার। তুমিই দেখবে শুনবে। আমি ত' সব ভার ছেড়ে দিচ্ছি। যা করতে বলবে করব সব স্বীকার করছি। তবু আদালতে যেতে হবে কেন? একটা ঘর আমার শুধু মাথা রাখবার জন্ত আমি চাচ্ছি—তাও দিতে পারবে না? তাই বলছ? স্পষ্ট করে বল—! আমি ওটাও চাইব না!"

"আমায় বোকা বোঝাচ্ছ তুমি? আজ না হয় অধিকার দিলে, কাল যদি মন জুগিয়ে চলতে না পারি—বলে বসবে বেরোও! অথবা মারাই যদি তুমি যাও—তখন যে আমার সকল দিক ফর্সা! কিন্তু এতেও আমায় কাবু করতে পারবে না তা বলে রাখছি। উইল আমি রদ করবই যেমন করে হক পারি! তা না হয়—আচ্ছা—যাও—ভেবে দেখি!"

—কুড়ি—

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এবং আদালত ও উকিলের বাড়ী আনাগোণা করিয়া গোপাল বুঝিল মোকর্দ্দমা করিয়া কিছু হইবে না। রেজিষ্টার বাড়ী আসিয়া উইল দাখিল লইয়াছেন।—তা আর বদলান চলে না! তাছাড়া—এক ছেলে বলিয়া ত্যাজ্য পুত্র হয় না আইনে থাকলেও তাহার বিষয়ে সে কথা খাটে না। পিতা যদি তাকে কলিকাতার বাড়ীটা না দিতেন তবে হয়ত ব্যাপার অন্ত রকম সাজান যাইত। আপাততঃ কিছুদিন তাহাকে দেশেই থাকিতে হইবে। তারপর অবস্থা বুঝিয়া কাজ করিবে। মালতীর

উপরে জোর করিয়া সমস্ত অধিকার কাড়িয়া লইবে। কিন্তু তাহাকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দেওয়া উচিত নহে। তাতে অনিষ্ট বই কিছু ইষ্ট সাধিত হইবে না।

মালতী তাহার প্রতিশ্রুতি মত আদায় ও ব্যয় এবং অন্যবিধ দরকারী কাগজপত্রে তার সই দিবার সময় কিছুমাত্র কুণ্ঠা দেখায় না। টাকাকড়ি সম্বন্ধে নিজের ইচ্ছামত বন্দোবস্ত করিবার সম্পূর্ণ অধিকার সে গোপালকে দিয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও মালতীর কাছে তাহার লিখিত অনুমতি লইতে হয় এইজন্য সে যারপর নাই বিরক্ত হইত। মালতীর যে দান বিক্রয়ের অধিকার নাই—নইলে আর ভাবনা কি ছিল! মালতীর প্রতি সে যৎপরনাস্তি বিরূপ হইয়াছিল। মরণ বাঁচনের কথা বলা যায় না! হঠাৎ যদিই সে মারা যায়? তাহলে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত! এই চিন্তাটা গোপালকে বিশেষ অভিভূত করিয়াছিল। মালতীকে মরিতে দেওয়া হইবে না। দেহ কারাগার হইতে তার জীবন পাখী যাহাতে মুক্তি লইয়া আকাশে উড়িয়া চলিয়া না যায় তারজন্য গোপাল যতটা দরকার সতর্ক হইয়াছিল। সামান্য অসুখ—অথবা সর্দ্দি হইলে যাহাতে সেটা বাড়িয়া উঠিয়া নিউমোনিয়া বা অন্য কোনও শক্ত অসুখের সৃষ্টি না করে তার জন্য বাড়ীতে একজন ডাক্তার নিযুক্ত করিল। আফিং খাইয়া কিম্বা গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াও যাতে সে প্রতারণা করিতে না পারে সেজন্য অনবরত পাহারা রাখিতেও ক্রটী করে নাই!

বাড়ীতে যে ডাক্তারটী ছিলেন—নাম তাঁর পঞ্চানন। লোকটী আসল সয়তান। অল্পদিনের মধ্যেই গোপালকে বশ করিয়াছিল। গোপালের কলিকাতা ছাড়িয়া আসার দুঃখ বেশী দিন সইতে হয় নাই। তার জন্য পঞ্চানন বাড়ীতেই দস্তুর মত আড্ডা বসাইল। সারাদিন গান বাজনা নাচ তামাসা চলিতে লাগিল।

মালতী একদিন ভয় দেখাইয়া বলিল "তোমার ও ডাক্তারের ওষুধ আমি খাই না। আমার কোন অসুখেই তাকে আমার কাছে পাঠাবে না। তাকে এখনই বিদায় করে দাও। আমার সম্পত্তি থেকে ওকে মাইনে দেওয়া চলিবে না। না যদি তাড়াও—"

গোপাল উত্তরে বলিল "তোমার সম্পত্তি থেকে না চলে আমার আলাদা করে প্রাপ্য যে একশ-টাকা তাই থেকে ওকে রাখব। কিন্তু তাড়াতে পারব না, তুমি যাই বল! ও লোকটার মত বন্ধু আমার নেই!"

মালতী আর একদিন এই কথা তুলিয়াছিল। বলিল "ডাক্তারকে যদি না তাড়াও এবং তামাসা গান সব না বন্ধ করে দাও আমি আত্মহত্যা করব। তখন আপনিই সব বন্ধ ছেড়ে যাবে! আর সমস্ত উপদ্রবই তোমার এক নিমেষে বন্ধ হয়ে যাবে!—"

গোপাল হাসিয়া বলিল "তোমার এ ভয়ে আমি আগে হয়ত চঞ্চল হতুম। কিন্তু এতদিনে আমি তোমায় চিনেছি। তুমি তা পারবে না। নিজে মরে শ্বশুরের ভিটায় চামচিকি বসাবার ব্যবস্থা করে দেবে। সমস্ত কোম্পানীর দৌলতে পাঠিয়ে দিয়ে তাদের হাতে সব ছারেখারে দেবার পথ করবে গৃহদেবতার পূজা হবে না বাড়ী শ্মশান হবে—এ সব সইতে তুমি কিছুতেই পারবে না।"

মালতী কোন রকমেই তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিল না।

গোপাল যখন বলিল আমি তোমায় চিনেছি শ্বশুরের ভিটে পরের হাতে ছেড়ে দিয়ে নষ্ট করবার পাত্রী তুমি নও—তার এই কথাটা শুনিয়া অবধি এত দুঃখেও মালতীর মনটাতে একটু খানি অপূর্ব্ব আনন্দের শিহরণ খেলিয়া গেল। স্বামী তাহাকে চিনিয়াছেন বলিলেন—! সে যে নীচ ও কুটীল বুদ্ধিতে এরকম উইল লিখাইয়া নেয় নাই—এ কথাটাও তিনি বুঝিয়াছেন! স্বামীর অধঃপতন দেখিয়া আর তাঁর মুখের তিরস্কার ও কটূক্তি শুনিয়া মালতীর মনে নিয়ত ব্যথা জাগিত। তাহা সত্তেও স্বামী তাহাকে চিনিয়াছেন—এই চিন্তার মধুর গৌরব তাকে আজ সমস্ত দুঃখ ভুলাইয়া দিয়াছিল। আজিকার যুদ্ধে—এ তার এক বিজয় গর্ব্ব!

দিন কেটে যায়।

মালতীর হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া অবধি গোপাল তাহার প্রতি কোন দুর্ব্ব্যবহার করে না। তবে—উইলের সর্ত্ত মনে করিয়া সে এখনও দুঃখ বোধ করে।

এক একবার গোপাল যখন স্থির হইয়া ভাবে তখন এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দেয়—ভবিষ্যৎ সম্পত্তি কে পাবে—সে পরের কথা। মালতী আজই ত আর মরিতেছে না।

ভগবান করুন সে সুস্থ থাকিয়া শতবর্ষ বাঁচিয়া থাক। যতদিন উভয়ে জীবিত থাকিবে বিষয়াদি ভোগ করিবে। ছেলে হইল না—সে ভগবানের ইচ্ছা তার জন্য দুঃখ করিয়া ত ফল নাই। *

আবার এক সময় ডিকান্টারে মদ ঢালিতে ঢালিতে সে চমকিয়া ওঠে। ভবিষ্যতের দারুণ কষ্টের ছবি চোখের সামনে জাগে। মালতীর মৃত্যুদৃশ্য কল্পনা করিয়া ও পয়সার অভাবে আপনার কাঙাল গরীবদের মত অনাথ অবস্থার কথা ভাবিয়া সে কাতর হইয়া পড়ে। মালতীর ছেলে হওয়ার জন্য সে নাস্তিক ও বিলাত ফেরত হইয়াও এখন অনেক রকম সংস্কার মানিয়া চলে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা যেমন বোঝান যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে সে ত্রুটী করে না। অনেক শান্তি স্বস্ত্যয়ন তুলসী দেওয়া প্রভৃতি অনুষ্ঠানের পরও যখন ছেলে হইল না গোপাল বিশেষ চিন্তিত হইল।

গোপালের কোন ইচ্ছাতে মালতী বাধা দেয় না এই জন্য তার প্রতি বিদ্বেষ কিম্বা ঘৃণার ভাব সর্ব্বদা মনে হইত না। তিনবছরের মধ্যে তাহার আমোদ প্রমোদের কিছু মাত্র হ্রাস হয় নাই। এই ব্যাপারটাতেই শুধু সে মালতীকে উপেক্ষা করিয়া চলিত। পঞ্চানন ডাক্তারের কল্যাণে তাহাদের আড্ডা বেশ পুরা দস্তুর চলিতেছিল। মালতী চোখের সামনে শ্বশুরের ভিটায় সেই সব অকীর্ত্তি দেখিয়া কুণ্ঠিত হইত বলিয়া গোপাল গ্রামের অনতিদূরে একটী বাগানবাড়ী তৈয়ারী করাইয়াছে। দিনরাত সে এখন সেই খানেই পড়িয়া থাকে বাড়ীতে যখন আসে মালতীর সঙ্গে ভাল ভাবেই কথাবার্ত্তা কয়। ব্যবহার ও কথায় ভালবাসা ও স্নেহ জানায়। ক্রমে সকল বিষয়েই তাহার স্বভাব বদলাইল। একমাত্র শুধু মদের বোতল ও কুসঙ্গীর সঙ্গ ছাড়িল না।

মালতীরও একটী ছেলে পাবার জন্য আকাঙ্ক্ষা খুব হইত। সমস্তদিন—স্বামী বাহিরে বাহিরে কাটান। নিজের সংসারের কাজকর্ম্মও বিশেষ কিছু করিতে হয় না। প্রাণটা কেবলি খালি পড়িয়া থাকে। বাড়ীর সকল ঘটনা জানাইয়া মালতী তাহার পিতাকে একখানি চিঠি লিখিয়াছিল তিনি যদি মালতীকে কিছুদিনের জন্য কাশীতে তাঁহার কাছে লইয়া যান ত ভাল হয়। ইদানীং অনেক দিন হইতে পিতা তাহাকে চিঠি দেওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন। মালতীও চিঠির পর চিঠি লিখিয়া উত্তর না পাইয়া ভাবিত হইয়াছিল। শ্বশুরের অসুখের সময়ও একবার পিতাকে আসিতে লিখিয়াছিল। সে চিঠিরও উত্তর সে পায় নাই। পিতার সম্বন্ধে অনেক রকম ভাবনা ভাবিয়া সে ব্যাকুল হইত। তাঁহাদের শারীরিক কুশল সংবাদটুকুও যদি জানাতেন! তার বড় বোন বিধবা হইয়া পিতার কাছে থাকিত। তাহার কাছ হইতেও মালতী কোন চিঠি পায় নাই। সুলতা ও সুলতার পিতা কাশী হইতে নিরুদ্দিষ্ট হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, একখানা চিঠিতে সে খবরটুকু পাইয়াছিল। তাঁহাদের বর্ত্তমান খবর মালতী জানে না। এই সব নানা কারণে মালতী অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছিল। একবার কাশীতে গিয়া সঠিক খবর জানিবার ইচ্ছা তাহার খুব হইত। কিন্তু সে স্বামীকে এই কথা জানাইয়া কোনদিন অনুমতি জিজ্ঞাসা করে নাই। এবং কেবলমাত্র পিতা যদি আসিয়া নিয়া যান এইটুকু অনুরোধ তাঁহাকে লিখিয়া জানান ভিন্ন নিজে যাইবার কোন আয়োজনও করিল না। অবসর সময়ে মাঝে মাঝে তাহার মন পিতা ও সুলতাদের খবরের জন্য যখন ব্যাকুল হইত মালতী নিজেকে বিবিধ কাজের ভিতর ব্যাপৃত রাখিয়া মনের কষ্ট ভুলিবার চেষ্টা করিত। তবে কাজ করিবার মত বিশেষ কিছুই তাহার ছিল না। মালতী মাঝে মাঝে প্রতিবেশী বৌ ও গৃহিণীদের দুপুরবেলা বাড়ীতে গল্প করিবার জন্য ডাকিত। যতদিন শ্বশুর বাঁচিয়াছিলেন তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়া নিষ্কর্ম্মা মনের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য কাজ অথবা গল্প কিছুই সে চাহে নাই। এখন তাহার কেবলি মনে হয়—সময় যেন কাটে না। সে চায়, প্রতিদিন সূর্য্য উঠিবার পর হইতে এত দীর্ঘকাল মাথার উপর দাঁড়াইয়া না থাকিয়া আরও দ্রুত পশ্চিমে অস্ত যাক্। আর রাত্রির বেলাটাও একটা গাঢ় ঘুমের মাঝেই ফুরাইয়া নিঃশেষ হক। পাড়ার বৌঝি দুচারজন দুপুরে বেড়াইতে আসিলে মালতী তাহাদের সহিত যত রাজ্যের প্রসঙ্গ উথাপন করিয়া সময়কে ফাঁকি দিয়া পলাইবার অবসর দেয়। তাহাদের সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে পাইয়া মালতী কত আদর করে। নিজে ঘরে প্রস্তুত করিয়া কত রকমের

খাবার তাহাদিগকে দেয়। রঙীন জামা ও জুতা নিজের পয়সায় কিনিয়া দিয়া তাহাদিগকে মুগ্ধ করিতে চায়। তাহাদের কোলে করিতে গিয়া মালতীর বুকের ভিতরটা কতটা দুলিয়া উঠে। ভগবান যদি তাহাকেও একটী দিতেন! ওই রকম কিশলয় কোনও শিশু যদি আধআধ বুলিতে তাহাকে মা বলিয়া ডাকিত! এমনি ছোট্ট একখানি মুখে সে যদি সারাদিন চুমায় চুমায় ভরিয়া দিতে পারিত!—তা' হলে কত আনন্দই না হত!

—একুশ—

অত্যন্ত অধ্যবসায় ও উৎসাহের সহিত শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া নীরজা শম্ভুনাথ হাসপাতালে নার্সের চাকরী পাইয়াছিল। সুভাষও তাহার কর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া এক ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানার তত্ত্বাবধায়ক হইয়াছিল। অর্থের অভাব আর তাহাদিগকে সহিত হয় না।

নীরজাদের বুড়ী ঝি আজও বেঁচে আছে। সে নিতান্ত অথর্ব হইয়া পড়ায় নীরজা আর একজন ঝি নিযুক্ত করিয়াছিল। নীরজা সুভাষের বিবাহ দিবে ইচ্ছা করিয়া তাহার মত জিজ্ঞাসা করে। সুভাষ তাহার উত্তরে নীরজাকে পরিহাস করিয়া বলে "দিদি! আপনার জন হয়েও তুমি যখন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য চাকরী স্বীকার করলে তবু আমার উপার্জ্জনের অংশ নিলে না, যাকে বিয়ে করব সে পরের মেয়ে হয়ে না জানি আরও কত স্বাধীন হতে চাইবে। দুনিয়ায় এমনি করে সবাই যদি স্বাধীন হতে চায় ঘর সংসার পর্য্যন্ত...আমাদের কারখানার মেসিন গুণার মত হরদম পাক খেয়ে ঘুরবে। শুধু কাজ আর কাজ। অবসর কখন পাব যে দুদণ্ড জিরিয়ে বসে আমোদ করতে চাইব? আগে সকাল বিকাল রাত্রে তোমাদের কাছে বসে গল্প করে তোমাদের স্নেহ পেয়ে কতনা আমোদ পেতুম। এখন মাসের মধ্যে একদিনও একটী ঘণ্টার জন্য তোমার আদর পাই না! তুমিই আমাকে শেখাচ্ছ শুধু কাজ করে চলতে হবে। অলস আমোদে একটা মুহূর্ত্তও যেন না কাটাই! তাহলে ভেবে দেখ দেখি বিয়ে করার ফুরসুতই বা পাই কখন আর তা পেলেও জীবনটা যখন শুধু খেটেই মরতে হবে জিরুবার অবসর দেবে না বিয়ে করে লাভই বা কি?"

নীরজা বলিল "সুভাষ! তোর আমার ওপর রাগ করবার কারণ আছে স্বীকার করি। তোর সঙ্গে দুদণ্ড বসে কথা কইতে সময় পাই না বলে দুঃখ করছিস কিন্তু একদিন যদি আমার সঙ্গে হাসপাতালে রোগীদের কাছে তাদের ব্যথার কাতরতা শুনতে যাস তখন বুঝবি কেন আমি নার্সের জীবনটাকে এত ভালবেসে পছন্দ করে নিয়েছি। আগে অবশ্য নিজের খাওয়া পরার জন্য খেটে পয়সা রোজগার করব ভেবে এসেছিলুম। এখন স্বীকার করছি ঠিক সেই ধারণাটা আজও থাকলেও তার চেয়ে আরও একটা বেশী গুরুতর কারণ আছে যার জন্য আমি একাজ কিছুতেই ছাড়তে চাই না। যদি দেখতিস্ সেখানে তাদের অসহ্য যাতনায় অস্থির হয়ে ছটফট করে হাঁফিয়ে মরতে। কেউ চীৎকার করে কাঁদছে কেউ পাগল হয়ে মনের ভুলে কত কি বকে যাচ্ছে কেউ বলছে তেষ্টায় প্রাণ গেল একটু জল, কেউবা বলছে মাথা গেল হাত বুলিয়ে দাও সে সব দৃশ্য দেখে পাষাণেরও চোখে জল আসে! মাইনে নিয়ে রুটিন মত ওষুধ বা পথ্য দেওয়া জ্বর দেখা এমনি সব সেবা করে চলে আসতে মন সরে না। যতটুকু পারি প্রাণ দিয়ে তাদের জন্য খাটি। তাদের ব্যথায় সমবেদনা প্রকাশ করে যন্ত্রণা লাঘব করে দিই। তাদের আপন বোনের মত তেমনি আদর দেখিয়ে শুশ্রূষা করি। সে সময় নিজের কথা কিছু মনে থাকে না। আমি যে একজন বাঙ্গালীর মেয়ে একটা ছোট ঘরে আমি ও আমার আত্মীয় পরিজনদের মাঝখানেই আমার নির্দ্দিষ্ট সীমা, সে কথা ভাবতেও পারি না! মনে করি যারা রোগী আতুর ব্যথিত তাদের সবার আমি বড় আপনার। তাদের নিয়েই আমার সংসার। তারা আমারই ছেলে মেয়ে ভাই বোন!"

সুভাষ বলিল "সেকথা সত্যি দিদি। আমার কথায় কিছু মনে কর না। আমি তোমার ওপর অভিমান বা রাগ করি নি। তুমি যে কোন একটা কাজ অবলম্বন করে নিজের দুঃখ বেদনার কথা ভুলতে পেরেছ এর জন্য আমিও খুব আনন্দ পেয়েছি। মানুষের সব আশা ও সুখ ভেঙে

গিয়ে যখন শুধু বিরাট হাহাকারে বুক ভেঙে যায় তখন এমনি কাজই একমাত্র তাকে ভুলিয়ে রাখতে পারে। অবলম্বন না থাকলে মানুষ একদিনও বাঁচত না। আমি ছোট ভাই কি আর বলব তোমায়'। ভগবানের কাছে নিরন্তর প্রার্থনা কর্চ্ছি তুমি সুখী হও। যে কাজে ব্রতী হয়েছো তার মাঝেতেই সান্ত্বনা পাও! প্রণাম করছি দিদি তুমি আমাকেও আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমারই মত আমিও জীবনে মানুষ মাত্রকেই এমনি করে আপনার ভেবে ভাল বাসতে পারি! মানুষের কাজে নিজের স্বার্থ বলি দিয়ে প্রাণ উৎসর্গ করে খাটতে পারি! শক্তি আমার যত অল্পই হোক তাই দিয়ে যদি কখনো একটা লোকেরও হিত সাধন করতে পারি নিজেকে ধন্য মানব।"

দিদির শিক্ষায় সুভাষ ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল। সে কবির মতই সরল অন্তঃকরণ পাইয়াছিল। যদিও মেসিন লইয়া তাহার কারবার—কারখানার যন্ত্র ঘাঁটিয়া তাহার দিন কাটে তবু সে সেই সব নীরস একঘেয়ে হাফর ব্যাটারী ও চাকা ঘোরার শব্দ তরঙ্গের মাঝখানে তাহাদেরই তালে তালে পা ফেলিয়া আনন্দে মনের একতারা বাজাইয়া চলে। শ্রমের কষ্ট তাহাকে কাবু করে না। কাজের মাঝখানে যেটুকু অবসর সে পায় বাহিরের দিকে চোখ তুলে জগৎটাকে একবার দেখে নেয়! যতটুকু সময় পায় পথে পথে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া দেশের জনসাধারণের সুখ দুঃখের ভাগ নিতে চায়। নিজের যাহা উদ্‌বৃত্ত থাকে যাহাদের কিছু নাই তাহাদের বিলাইয়া দেয়। অর্থে না পারিলে সামর্থ্য দিয়া তাহাদিগের উপকার করে। তাহার নিঃস্বার্থ ও অক্লান্ত চেষ্টা দেখিয়া অনেক ধনী সমর্থ যুবক মুগ্ধ হইয়া তাহার অনুকরণে দেশের সেবা করিতে শিখিয়াছিল। সুভাষকে আশীর্ব্বাদ করিয়া নীরজা বলিল "মানুষ হতে শেখ ভাই! আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা জানাচ্ছি!"

গোপাল সেই চলিয়া যাইবার পর আর কোনও দিন নীরজার খবর লইতে আসে নাই। চিঠি পত্রও লেখে নাই। নীরজা তাহার জন্য সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন ছিল। সে মুখে যাহাই বলুক না কেন, রোগীর শুশ্রূষায় বা অন্য কাজের ভিতর যতই নিজেকে হারাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করুক, গোপালের চিন্তা সে ভোলে নাই। গোপালকে সে যথার্থই ভাল বাসিয়াছিল। ভালবাসা তাহার স্বভাব। মানুষ মাত্রকেই সে ভাল বাসিত। তবে, গোপালের প্রতি তাহার ভালবাসা গোপনে কেমন করিয়া এত প্রগাঢ় হইয়াছিল তার ইতিহাস সে জানিত না। যেদিন সুরথ সৈনিকের কাজ লইয়া চলিয়া গেল সেইদিন তাহার প্রচ্ছন্ন সন্দিগ্ধ ইঙ্গিতে নীরজা চমকিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছিল তাহার স্বামী কেন এত অসুখী ছিলেন। নীরজা বুঝিয়াছিল গোপালকে সে ভালবাসে ইহা তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছিল। স্বামীর কথায় সে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে ফিরাইবার জন্য যারপর নাই কাতরতা দেখাইয়াছিল। তিনি ফিরিলেন না। নীরজা তাঁকে নিরন্তর প্রতীক্ষা করিত। তাহার মন কেবলি বলিত একদিন তিনি বুঝিবেন নীরজা অবিশ্বাসিনী নহে। নীরজা স্বামীকে একদিনের জন্যও প্রতারণা করে নাই। স্বামীকে সে একদিনের জন্যও কম ভাল বাসে নাই। তা সত্ত্বেও সে গোপালের জন্য কাতর হইত। সে গোপালের অদর্শনে উদ্বেগ অনুভব করিত। মনের মন্দিরে দেবতার আসনে বসাইয়া তাহাকে পূজা করিত। সে জানিত ভালবাসা স্বর্গের জিনিষ। ভালবাসায় কখনো পাপ থাকে না। কামনা ও লালসা যদি আসিয়া মিশে তাহাদের দূষিত হাওয়ায় স্বর্গ নরকে পরিণত হয়। রাধিকা কৃষ্ণকে যেমন কামনা বর্জ্জন করিয়া ভালবাসার মাঝে তন্ময় হইত, মা শিশুকে যেমন জগৎ ভুলিয়া ভালবাসে তেমনি নিষ্কাম হইয়া সে গোপালকে ভাল বাসিত। যেদিন গোপালের কথায় নীরজা বুঝিতে পারিল গোপাল তাহার প্রতি কামুক দৃষ্টিতে দেখিয়াছে সে শিহরিয়া আত্মরক্ষার্থ সচেষ্ট হইল। নীরজা প্রথম বুঝিল জগৎ স্বর্গ নয়। নীরজা কল্পনায় যে স্বপ্নে আত্মহারা হইয়াছিল এক নিমিষে সব আকাশে মিশাইল। যাহাকে দেবতা ভাবিয়াছিল তাহাকে আজ পিশাচেরও অধম বলিয়া চিনিয়া নীরজা পিছাইয়া আসিল। সেইদিন হইতে গোপালের স্মৃতি সে মন হইতে মুছিয়া ফেলিবে ভাবিল।

কিন্তু পারিল না। ক্ষণে অক্ষণে কাজে অকাজে সকল

সময় সব চিন্তা ফেলিয়া তার কথাই মনে জাগে। নীরজা বিদ্রোহী মনকে কিছুতেই বাগে আনিতে পারে না। সে অস্থির হইয়া পড়িল। মন বলে মাটীর প্রতিমা জলে গলিয়া গিয়াছে তাহাতে ক্ষতি কি? দেবতা যে আজ জলে স্থলে অণুপরমাণুর মাঝে বিলীন হইয়াছে। তাহাকে খুঁজিতে হইলে প্রতিমার কথা ভাবিও না। চাহিয়া দেখ চারিদিকে, তোমার দেবতা আজ জগতের বুকে ধরা দিয়াছে। তোমার ভালবাসায় প্রাণ পাইয়া সে আজ জগৎকে প্রাণময় করিয়াছে। গোপালের মাঝে দেবতাকে খুঁজিও না—আজ জগতের মাঝে গোপালকে দেখিতে শেখ।

—বাইশ—

একদিন সকালবেলা নীরজা হাসপাতালে যাইবে বলিয়া, পথে বাহির হইতেছে এমন সময় এক বিকৃতদেহ খঞ্জ দুয়ারের সামনে বসিয়া হাঁফাইতেছে দেখিতে পাইল।

নীরজা লোকটার দিকে চাহিয়াই চমকিয়া উঠিল। সে নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। নীরজা দেখিল—সুরথ!

কাছে আসিয়া নীরজা তাহার হাত ধরিয়া অশ্রু-সজল চোখে বলিল "ভগবান, এ কি দেখালেন আজ?……মা গো! যদিই দয়া করে ফিরিয়ে দিলে কেন এই নিষ্ঠুরতা সাধলে তুমি?……চাওয়া যায় না! কি অপরাধ করেছি পাষাণী?……এস ঘরের ভিতর, সেখানেই তোমার সব কথা শুনব!……"

সুরথ বলিল "কাঁদছ নীরজা! ছিঃ চুপ কর। জান তো তুমি ভগবানের মার আমাদের মুখ বুজেই সইতে হবে! আমিত বরং তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমার কাছে ফিরে আসা পর্য্যন্ত প্রাণটা বজায় রেখেছেন। আমি আর বেশী-দিন বাঁচব না। যে কটা দিন আছি শেষ কালে পথে মরে না পড়ে থেকে তবু আপনার লোকের কাছে ফিরতে পেরেছি এ আমার ভাগ্য।"

নীরজা সুরথকে ঘরে আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কখন এসেছ? কোথায় ছিলে এতদিন?

সুরথ বলিল "কাল রাত দুপুরে এসে ক্লান্ত হয়ে দোর গোড়াতেই বসে পড়ে ছিলুম। ক্ষীণকণ্ঠে দুএকবার তোমাদের ডেকে ছিলুম বোধ হয় শুনতে পাওনি। শেষে ঘুমে চোখ ঢুলে এসেছিল।……"

"এতদিন আসনি কেন? কোথায় ছিলে তুমি?"

"সব বলছি।……কিন্তু তার আগে তুমি আমার কৌতূহল মেটাও। যে কথা জানবার জন্য এমনি অবস্থায় পড়েও সুদূর ইউরোপ থেকে আজ চার বছর ধরে ছুটে এসেছি সেই কথা তুমি আগে বল। তুমি বল আমার মনকে যে কথা বলে প্রবোধ দিয়ে এসেছি, সে কথা সত্যি! বল তুমি……!"

"কি জানতে চাও তুমি?"

"সেদিনের কথা মনে পড়ে! যেদিন তোমাকে চিঠি লিখেছিলুম বন্দুক ও গোলা বারুদের গর্জ্জন আর আহত মানুষের করুণ চীৎকার কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গিয়ে তোমার—তোমার স্মৃতি মনে জেগেছিল—আসন্ন মৃত্যুর বিরাট অন্ধকারের মাঝখানে একটুখানি আলো দেখতে পেয়ে তোমার দর্শনের জন্য লালায়িত হয়েছিলুম—সব ভয় সব ভাবনা দূর করে সাবিত্রীর মত অপরূপ জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলো ভয় নেই আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব—! বল নীরজা সে কথা সত্যি! তোমারই মুখে মৃত্যুর আগে এই কথা শুনে যাব বলেই আমি আজ ব্যগ্র ও ব্যাকুল হয়ে তোমাকে মিনতি করছি—বল—"

নীরজা কাঁদিয়া বলিল "আমায় সন্দেহ করেছিলে তা যদি জানতে পারতুম আগে—যদি কোন দিন আমায় মুখ ফুটে একবার জানতে চাইতে আমি বলতুম—আমি ছলনা জানি না—চিরদিন তোমাকে ভালবেসে এসেছি'—বিশ্বাস না করলে তোমার সামনে বুক চিরে দেখাতুম—"

"আর কিছু বলতে হবে না—আমি বুঝিছি। আমার আজ বড় শান্তি নীরজা! আমি আমার জীবনের দুঃখ যন্ত্রণা সব ভুলেছি। নীরজা! তুমি আমায় ক্ষমা কর। আমি তোমাকে বড় অবিচার করেছি।"

নীরজা জলছলছল চোখে অনিমেষ নয়নে স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল। সুরথ ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমন্ত মুখখানির উপর এক সুনিবিড় শান্তির ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

—শ্রী……

রূপশিখা

—শ্রীঅরিন্দম বসু

—চতুর্থ দৃশ্য—

বহুদূরে—সুপ্ত বনান্ত-রেখার উপরে উদয়ের প্রথম আভাষটুকু পূর্ব্বাকাশে মায়াঞ্জন বুলাইয়া গিয়াছে। তখনও বিহঙ্গের কাকলী-কণ্ঠ মুখর হয় নাই—সবই যেন নিদ্রালস,—ঘুমন্ত।

অদূরে বেসালির প্রান্তসীমা ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীটিকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে।—দীর্ঘায়িত চন্দনবৃক্ষের অন্তরালে লিছ্‌বি রাজার শুভ্র সৌধশ্রেণী—তাহারই তোরণ হইতে সাহানায় প্রভাতীর বিভাস ভাসিয়া আসিতেছে।

স্রোতোবেগে তরণী আপনা হইতেই ছুটিয়া চলিতেছিল,—একপার্শ্বে উৎপলবর্ণা সুপ্তিমগ্না আর পশ্চাতে শ্রান্তদেহমনে নির্ব্বাক হইয়া উত্তীয় বসিয়া—কর্ণধার।

দেখিতে দেখিতে রাজপ্রাসাদ পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। উত্তীয় সম্মুখের আম্রকাননের দিকে চাহিয়া ভাবিলেন,—আর সামান্য পথ অতিক্রম করিলেই……

শ্রেষ্ঠিপুত্রী গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা,—উদ্বেল দুশ্চিন্তায় সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর শেষ রাত্রিতে তাহার সুপ্তি আসিয়াছিল,—তাহার পর প্রভাতসমীরস্পর্শে তাহা আরও গভীর হইয়াছে।

উত্তীয় থাকিয়া থাকিয়া মুগ্ধ নয়নে উৎপলবর্ণার দিকে চাহিতেছিলেন।—তাহার সেই বিস্রস্ত বসন,—যৌবন-জাগ্রত বক্ষ………স্তিমিত নয়ন-মুখ-সরোজ………স্বর্ণোজ্জ্বলা ক্ষীণা দেহলতা তাহাকে যেন স্বপ্নাবিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। চকিতে আর একজনের কথা মনে পড়িল—তিনি আগ্রহে সম্মুখের আম্রকাননের দিকে চাহিলেন—দেখিলেন—অদূরে মর্ম্মর সোপানের নীচে বৃহৎ ময়ূরপঙ্খী তরণী।—এই দৃশ্য প্রাসাদ-ভবনে চন্দার আবির্ভাবের কথা জানাইয়া দিল।

ধীরে ধীরে তরণী সোপান সংলগ্ন হইল। তখনও অরুণোদয় হয় নাই। উত্তীয় মুগ্ধ হইয়া দেখিলেন—অসংখ্য রাজহংস সোপানজলে ছুটাছুটি করিতেছে!—আর অদূরে মর্ম্মর ভবনের সু-উচ্চ তোরণদ্বার বিচিত্র লতা-পুষ্পের সম্ভার লইয়া তাহাদিগকে নীরব অভিনন্দন পাঠাইতেছে।

উত্তীয় নিঃশব্দে উঠিলেন,—উঠিয়া উৎপলবর্ণার অতি নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন।

চতুর্দ্দিক-নীরব, নির্জ্জন। বিহঙ্গ-কাকলি সুরু হইয়াছে মাত্র।

উত্তীয় একবার প্রাসাদভবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন,—পরে নতজানু হইয়া গাঢ় নিদ্রাভিভূতা শ্রেষ্ঠি-কুমারীকে অতিযত্নে, অতি সন্তর্পনে নিজের বাহু-মূলে তুলিয়া লইয়া তরণী হইতে অবতরণ করিলেন।

উৎপলবর্ণার মুখ হইতে সহসা একটা অস্ফুটধ্বনি বাহির হইল কিন্তু সুপ্তি নষ্ট হইল না।

মন্থর গতিতে উত্তীয় প্রাসাদ সম্মুখীন হইলেন। সম্মুখেই প্রশান্ত সোপান-শ্রেণী,—তাহা অতিক্রম করিয়া দ্বিতল ভবনে আরোহণ করিলেন। অদূরে একটী সুবৃহৎ কক্ষ,—সেই কক্ষ অতিক্রম করিয়া পরবর্ত্তী ক্ষুদ্র কক্ষমধ্যস্থ পালঙ্কের উপরে উৎপলবর্ণার দেহ স্থাপন করিলেন।

বহুক্ষণ পরে উত্তীয় স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কিছুক্ষণ অপলক-দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠিকুমারীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া পরে ধীরে ধীরে কক্ষ নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

বিলাস ভবনের দক্ষিণপার্শ্বে অন্য একটী কক্ষ। উত্তীয় অন্য মনস্ক ভাবে সেই কক্ষের রুদ্ধ দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া করাঘাত করিলেন। কিন্তু অভ্যন্তর হইতে কোনরূপ শব্দ আসিল না। পুনরায় আঘাত করাতে, কিছুক্ষণ পরে দ্বার উন্মুক্ত হইল।

—কে? উত্তীয়?

—হ্যাঁ, আমিই চন্দা।

উত্তীয় মুগ্ধনয়নে চন্দার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার অসম্বৃত বসন, বিশৃঙ্খল কেশদাম,—নিদ্রালস আঁখিযুগল তাহার হৃদয়ে এক অপরূপ মাদকতা সৃষ্টি করিয়া দিল।

দৃষ্টি-বিব্রতা চন্দা লজ্জায় মাথা আনত করিলেন,—পরে কোনরূপে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—

—আজ আমার বড় সৌভাগ্য যে তোমাদের শুভ পদস্পর্শে এই পতিতার কুটীর ধন্য হ'ল।

—কিন্তু কুটীর তোমার নয় চন্দা—

—তা বটে।—হ্যাঁ, তোমরা কখন এলে?

—এইমাত্র।

—শ্রেষ্ঠিপুত্রী কি—

—না, তিনি ঐ ক্ষুদ্র কক্ষে নিদ্রিতা।

—কিন্তু এত বিলম্ব দেখে আমি ভেবেছিলুম—বুঝি আর এলে না।.........কাল সমস্তদিন তোমাদের প্রতীক্ষায় ঐ মর্ম্মর সোপানে বসেছিলুম।.........যাক্, তুমি এখন বিশ্রাম করো উত্তীয়।

সদ্য নিদ্রোত্থিতা চন্দা প্রস্থান করিলেন।

উত্তীয় কক্ষে প্রবেশ করিয়া পালঙ্কে লুটাইয়া পড়িলেন। তাহার জাগরণ-ক্লিষ্ট অবসন্ন দেহ—বিশৃঙ্খল বেশ-ভূষণ তাহাকে এক নূতন মানুষ করিয়া তুলিয়াছিল! কিন্তু নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিবার মত মনের একাগ্রতা তাহার ছিল না। কাজেই চন্দন গন্ধামোদিত শুভ্র-সুকোমল বিলাস-শয্যার উপর শরীর এলাইয়া দিয়াও তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল না—গত রজনীর কথাই কেবল মনে পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল।

সহসা বাতায়ন পথে দৃষ্টি পড়িতেই উত্তীয় দেখিলেন প্রভাতসূর্য্য-কিরণে চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। নদী-তীরে পুষ্পোদ্যানে চন্দার মালঞ্চ-মালাকর পুষ্পচয়ন করিতেছে।

উত্তীয় পালঙ্ক হইতে অবতরণ করিলেন। পরে ক্লান্ত-পদে অলিন্দ পথে অগ্রসর হইয়া উৎপলবর্ণার কক্ষদেশে উপস্থিত হইলেন,—দেখিলেন শ্রেষ্ঠিপুত্রী তখনও সুপ্তিমগ্না। সন্তর্পণে তিনি তাহার দেহপার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলেন। দক্ষিণহস্তে তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া উত্তাপ পরীক্ষা করিলেন। পরে একদৃষ্টে ক্ষণকাল মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া সহসা তরুণীর দেহলতার উপরে ঝুকিয়া পড়িলেন—অধরে অধর স্পর্শ হইল।—সেই স্পর্শে শ্রেষ্ঠিকুমারী শিহরিয়া উঠিলেন—তাহার কমলাক্ষি উন্মীলিত হইল।

উত্তীয় আবেগভরা কণ্ঠে ডাকিলেন—

—উৎপল, অনেক কষ্ট দিয়েছি—না?

উৎপলবর্ণার কর্ণে তাহার বিন্দুমাত্র কথাও প্রবেশ করিল না। তিনি নির্ব্বাক হইয়া কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাহার মনে হইল—একি স্বপ্ন—না সত্য?

—উৎপল, কথা কও—

—কিন্তু আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

শ্রেষ্ঠিপুত্রী আঁখি-পল্লব করতল দ্বারা স্পর্শ করিয়া পরে উত্তীয়ের মুখের পানে দৃষ্টিপাত করিলেন।

—কি দেখছো?—কিছুই স্বপ্ন নয় উৎপল?

—তোমায় এমন দেখাচ্ছে কেন?—যেন——

—মনে নেই উৎপল গত বিনিদ্র রজনীর কথা।—তবু……

—ও, ঠিক মনে পড়েছে—তবে এ বেসালি নয়—আমায় তুমি ফিরিয়ে নিয়ে এসেছো উত্তীয় ?

উৎপলবর্ণা উঠিয়া বসিলেন। উত্তীয়ের বক্ষ হইতে একটী চাপা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

—না, উৎপল,—এ বেসালিই।

বেসালি ?

—উৎপলবর্ণা কক্ষের চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া পরে বিস্মিতকণ্ঠে বলিলেন—

—তাইতো! কিন্তু শুনেছি সে তোমার পর্ণকুটীর—আমায় কি তুমি পরিহাস করছো উত্তীয় ?…এই কারু-কার্য্য-খচিত, শুভ্র-সুন্দর মর্ম্মর কক্ষ……

—হাঁা, এ আমারই প্রাসাদ।……পরিহাস নয়—সত্যি কথাই বলেছি—এ বেসালি।

শ্রেষ্ঠিকুমারী ঘৃণায় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিলেন—

—কি মর্ম্মান্তিক!—আমার অদৃষ্টে শেষকালে এই ছিল!……কুক্ষণে এক লম্পটের কথায় ভুলে……

—ভেবে ছাখো উৎপল—বৃথা অনুযোগ করে……

—বৃথা অনুযোগ!……পিতার এমন অত্যুচ্চ সম্মান, এমন বংশগরিমা,—সব কলুষিত করেছি।……তুমি সেই দস্যু,—আমায় চুরি করে নিয়ে এসে এখন অবিচলিত কণ্ঠে বলছো—বৃথা অনুযোগ।……তুমি সরে যাও কাপুরুষ।

—এতদূর।……ভালো। ভেবেছিলাম পিতৃ-অপমানের প্রতিশোধ তোমার পিতার উপরেই শুধু নেব,……কিন্তু আজ হতে তুমিও তার অংশীদার হ'লে। তোমায় ভাল বেসেছিলুম—আজ হতে তা ভুলে যেতে চেষ্টা কর্ব্বো। মনে রেখো উৎপল—উত্তীয় কাপুরুষ নয়—সে অতি নির্ম্মম……অতি ভীষণ।

শ্রেষ্ঠিপুত্রী বাতায়ন-পথে দৃষ্টিপাত করিয়া উত্তীয়ের কথা শ্রবণ করিলেন…কিন্তু প্রত্যুত্তর দিলেন না।

—হাঁা, শোনো নন্দ-দুহিতা—আজ হ'তে এই প্রাসাদে তুমি বন্দী।……তবে এই বিশাল ভবনের সর্ব্বত্রই তোমার স্বাধীনতা রইলো,—জেনো এটুকু আমার অনুগ্রহ।……যাক্ আমি চল্লাম।

উত্তীয় কক্ষ-নিষ্ক্রান্ত হইতেই শ্রেষ্ঠিপুত্রী চঞ্চল হইয়া উঠিলেন,—ভাবিলেন—তবে কি সত্যি করেই এ নির্ব্বাসন! পরে বাতায়ন-পথ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া শান্ত অথচ করুণ স্বরে বলিলেন—আমি কি তবে একাকী……

—না, একাকী নয়, আমিও এই প্রাসাদেরই কোথাও অবস্থান কর্ব্বো।

উত্তীয় কক্ষান্তরে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

দিনের আলো ম্লান হইয়া গিয়াছে। সূর্য্য অস্তোন্মুখ—তাহারই রক্তিমাভা বিরাট শ্বেত-সৌধকে রঙীণ করিয়া তুলিয়াছে।

দ্বিতলের উন্মুক্ত অলিন্দে উৎপলবর্ণা দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাহার বিমর্ষ মুখ, কুঞ্চিত ললাট মনের দুর্ব্বিসহ ব্যথারই প্রতীক হইয়া ফুটিয়াছে। অনুশোচনায় নিজের উপর ধিক্কার জন্মিতেছিল,—কেন তিনি সৌন্দর্য্যের মোহে এক অজ্ঞাত কুশশীল স্বেচ্ছাচারী যুবকের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন—?

শুষ্ক-ক্ষুব্ধ শ্রেষ্ঠিকুমারী আপনার অদৃষ্টের এই শোচনীয় পরিণতির কথাই শুধু ভাবিতেছিলেন।—সন্ধ্যা-প্রকৃতির সেই অভিনব সৌন্দর্য্য তাহার মনে কোন পরিবর্ত্তনই আনিতে পারিল না।

প্রাসাদের নিম্নতলে সাধারণভাবে সজ্জিত একটী কক্ষ,—সেই কক্ষের পশ্চিম বাতায়ন পথে রূপসী চন্দা মুগ্ধনয়নে তখন সূর্য্যাস্ত-শোভা সন্দর্শন করিতেছিলেন।

আর অদূরে নদীতটব্যাপ্ত পুষ্পোদ্যানের একটা বৃহৎ প্রস্তরের উপরে বসিয়া উত্তীয় নতমস্তকে চিন্তা করিতেছিলেন।—তাহার হৃদয় উৎকণ্ঠিত, মুখমণ্ডল আরক্ত। যে নিদারুণ সমস্যা তাহার রূপ-মুগ্ধচিত্তকে নৈরাশ্যে উদ্বেল করিয়াছিল তাহারই উপযুক্ত সমাধান একাগ্রমনে তিনি ভাবিতেছিলেন।

বহুক্ষণ কাটিয়া যাইবার পর উত্তীয় উঠিলেন—উঠিয়া ধীরে ধীরে প্রাসাদ-অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

এই তিনটী নর-নারীর মধ্যে যে বিচিত্র যবনিকা একটা ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছিল—সন্ধ্যার ছায়া তাহাতে যেন অধিকতর গাঢ় করিয়া ঘনাইয়া আসিয়াছে এখন।

চন্দা তখনও বাতায়ন পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন। উত্তীয় সেই কক্ষের দ্বারদেশে গিয়া ডাকিলেন—

—চন্দা।

—কে? উত্তীয়?—কেন বন্ধু?

—কাল সকালে শ্রাবস্তীতে একজন অনুচর পাঠিয়ে নন্দশ্রেষ্ঠির সংবাদ এনে দিতে হবে আমায়।

—শ্রেষ্ঠিপুত্রীর অনুরোধে বুঝি!......তা' আর এমন কি কঠিন কথা......কালই সকালে আমি পাঠিয়ে দেবো।

—তা' বটে।......একথা আজ তেমন কিছু কঠিন নয়। ......আচ্ছা চন্দা, তুমি আমাকে এতদূর ভালবাসো?...... অথচ আমি তার—না থাক্।......আমার জন্য তুমি এত ত্যাগ স্বীকার করছো,—নইলে নিজের প্রাসাদে এমন করে বন্দী হয়ে থাক্‌তে কার অভিলাষ হয় চন্দা?......আমার সামান্য মুখের কথায়—

—ছিঃ, উত্তীয়—তোমার সামান্য মুখের কথাই যে আমার পরম আদেশ।......এটুকু পালন করতে পারলেও আমি তা' নিজের পরম সৌভাগ্য বলে মনে কর্ব্বো। তা যাক্ সে কথা।......কিন্তু আমি যে কোন কারণই ভেবে পাইনে উত্তীয়,—তোমাদের এই নির্জ্জন মিলন অভিসারে আমায় কেন আহ্বান করে আন্‌লে?—যার জন্য তোমাকে আজ অনর্থক সঙ্কোচ করে চল্‌তে হচ্ছে!

—প্রয়োজন আছে চন্দা।......আচ্ছা, আমি তবে আসি এখন,......চেয়ে ছাখো সন্ধ্যা হয়ে গেছে।—

পরে চন্দার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া মিনতিপূর্ণ স্বরে বলিলেন,—

—আর তিন দিন মাত্র। এ ক'টা দিন তোমাকে কষ্ট করতেই হবে।—তারপর......

—কেন ব্যস্ত হচ্ছো উত্তীয়?......আমি তো বলেছি তোমায়—আমার উপস্থিতি শ্রেষ্ঠিপুত্রীকে জানতে দেবো না। ......যতদিন না তুমি বলবে, ততদিন এম্‌নি করেই নিজেকে গোপন করে চলবো। তোমার সুখের জন্য আমি সমস্ত কষ্টই হাসিমুখে সইতে পার্ব্বো,......এতে আমার কোন দুঃখই নেই বন্ধু।

—এতো গভীর তোমার ভালবাসা!

উত্তীয় মনে মনে ভাবিলেন—কিন্তু আমি তো তোমায় ভালবাসতে পারিনি।......তোমার ঐ অপরূপ সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ,—ঐ পরিস্ফুট যৌবনের আকুলতা, আমাকে তো তেমন বিচলিত করে তোলেনি।......কিন্তু তবুও আমাকে তার প্রতিদান দিতেই হবে। হোক্ না সে আমার প্রেমের তুচ্ছ অভিনয়,—তবুও তা আমার কর্ত্তব্য।

উত্তীয় দুই হস্তে তাহার বঙ্কিম গ্রীবাখানি তুলিয়া ধরিতেই চন্দার আঁখি দুইটী স্পর্শসুখলালসায় স্তিমিত হইয়া গেল। পরক্ষণে তাহার উন্মুখ অধরোষ্ঠে একটী গভীর চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিয়া উত্তীয় ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

—:•:—

সওদা

সুখে থাকতে ভূতে সবাইকে কিলোয় না এবং ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার দুষ্প্রবৃত্তিও সকলের হয় না। কিন্তু যাদের হয়, লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি পেয়েও লক্ষ্মীছাড়াদের কথা যারা ভুলতে পারে নি তাদের দারিদ্র্যের জন্য এত দরদ যে মানসিক বিকারের লক্ষণ ও গুরুতর অপরাধ এ কথাটা এতদিন পর্যন্ত কেউ সন্দেহ করে উঠ্‌তে পারে নি। জীবনে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে' পরম সুখে থাকবার যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্বেও অনেক নীচাশয় ব্যক্তি দীন দরিদ্রের জন্য ব্যথা অনুভব করে', বই লিখে, বক্তৃতা দিয়ে, খেয়ে সময় নষ্ট করে' অবাধে এতদিন পার পেয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদের ধৃষ্টতা ও অপরাধ এতদিনে ধরা পড়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত তাঁর ডায়েরীতে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন।

স্বাচ্ছন্দ্যে থাক্‌বার মতো অর্থ উপার্জ্জন করে' নিশ্চিন্ত ভাবে নির্ব্বিকারচিত্তে নিজের সুখের ধান্দায় ব্যস্ত থাকাই

যাঁদের উচিত ছিল, দরিদ্র নারায়ণের জন্যে তাঁদের এ মাথা ব্যথার স্পর্দ্ধা যে সত্যিই অসহ্য! অর্থও তাঁরা উপার্জ্জন করেন। সুখে থাকবার কোন উপকরণের তাঁদের অভাব নেই। তবু তাঁরা দীন দুঃখীর অবস্থার প্রতিকার কর্‌বার চেষ্টা করেন কোন্ অধিকারে?

এই সোজা কথাটা তাঁরা বোঝেন না কেন যে, রোগের সেবা করতে গেলে নিজের স্বাস্থ্যের মাথাটি খেয়ে রোগী হতে হয়, অন্ধের দুঃখে দুঃখী হয়ে যদি কেউ তার দুঃখ দূর করবার সঙ্কল্প করেন, নিজের চোখ দুটি তাঁর গেলে ফেলা দরকার, অশিক্ষিতকে শিক্ষা দিবার অধিকার ও শক্তি তাঁরই আছে যিনি সব বিদ্যাগুলি গুলে খেয়ে আকাট মূর্খ হতে পেরেছেন!

বিখ্যাত 'বিদেশী' পত্রিকা এই বিজ্ঞাপনটী ছাপ্‌তে আমাদের অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন। তাঁদের ছাপাখানা বাড়ী ঘর ইত্যাদি এখন দেনার দায়ে নীলামে চড়েছে। নীলাম থেকে উদ্ধার পেয়েই তাঁরা এলাহাবাদে চিড়িয়াখানা খুলে তার আয়েতে বিজ্ঞাপনের দাম চুকিয়ে দেবেন ভরসা দিয়েছেন। আমরা বিনামূল্যে বিজ্ঞাপনটী ছাপ্‌লাম।

"বিখ্যাত 'বিদেশী' পত্রিকার চিড়িয়াখানায় দন্তবিকাশ ও লম্ফঝম্ফ করিবার জন্য কয়েকটী ওরাংওটাং আবশ্যক। বিখ্যাত ওরাংওটাং সখী খোজার সহিত মুখের আকৃতি ও বর্ণ না মিলিলে চাকরি মিলিবে না। বেতন নাই। তবে আড়ালে আবডালে বিদেশিনীদের চুড়ির শিঞ্জিনি ও দৃষ্টি প্রসাদ পাওয়া যাইবে।"

আমরা বিখ্যাত ওরাংওটাং সখী খোজাকে দেখেছি। আফ্রিকার জঙ্গলে ছাড়া তার জোড়া কোথাও পাওয়া যাবে না বলেই আমাদের ধারণা।

বাংলা ভাষার কী দুর্গতিই হয়েছে এই সব আনাড়ি হাতুড়ে ডক্টরদের হাতে পড়ে'। যারা আপন মাতৃভাষায় গৌরব অর্জ্জন করবার পক্ষে অযোগ্য প্রতিপন্ন হ'ল দেশবাসীর কাছ থেকে—তারা অনন্যোপায় হয়ে টম্‌সনের দেশে গিয়ে হত্যা দিয়ে পড়্‌লো পরে মুখ্‌ গোমরারা হোম্‌রা চোমরা হয়ে দেশে ফিরে এল,—ফতো বাবুর দল। হায়, আমরা ত' জানি বেচারা টম্‌সনের দেশের সাহিত্য সমালোচনার মূল্য!

আধুনিক সাহিত্যিকদের কোনো হিতৈষী বন্ধু (সজনী হয় ত নয়) রবীন্দ্রনাথ থেকে তাঁদের চিত্তবিকার সম্বন্ধে অভিযোগ এনেছেন। না, না, রবীন্দ্রনাথ তা বিশ্বাস করেন না,—যদিও সেই অভিযোগের কথা তিনি সবিনয়ে উল্লেখ করেছেন। "অনেককে বল্‌তে শুনেছি গতবারের শনিবারের চিঠিতে যোগানন্দ দাস এর ছবি বেরিয়েছে, আমি নিজে তা বিশ্বাস করি না।"—অনেকটা এ ধরণের যুক্তি!

যাঁরা এই অভিযোগ করেছেন, তাঁদের নৈতিক চিত্ত নিষ্কলঙ্ক, রবীন্দ্রনাথ কি সে কথা বিশ্বাস করেন না?

আধুনিক সাহিত্যিকদের লেখা পড়েই কি রবীন্দ্রনাথের এ ধারণা?

তাই যদি হয়, তবে বড় বড় অনেক কবি ও সাহিত্যিকেরই আর রক্ষা নেই। অকৃত্রিম পুরুষ মোহিতলাল মজুমদারই সব চেয়ে বিপদাপন্ন হবেন।

লেখা ছাড়াও, অনেক দেশী ও বিদেশী বরেণ্য ও বিখ্যাত মৃত কবির যৌবনে নৈতিক চিত্তবিকার সম্বন্ধে বহু অপবাদ আজো পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে,—বাংলাদেশেই।

সে সব কথা আমরাও বিশ্বাস করি না।

—:o:—

ঘরে বাইরে

সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও কবি টমাস হার্ডি মারা গিয়াছেন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হইয়াছিল সাতাশি বৎসর। তাঁহার লিখিত "Far from the Madding Crowd" এবং "The Three Wayfarers" দুখানি পুস্তকেরই তুলনা নাই।

মহাসমর সংক্রান্ত তাঁহার অনেকগুলি সুন্দর কবিতাও আছে।

আমরা 'নব-মিলন' নামে একটী মাসিকের আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যা পাইয়াছি। পত্রিকাখানি ক্ষুদ্রকলেবর হইলেও রচনাসম্পদে নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। কার্ত্তিক সংখ্যার শ্রীসৌরীন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস ও শ্রীনিশিকান্ত সরকারের গল্প বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে কতকগুলি গল্প ও কবিতা নিতান্ত চতুর্থ শ্রেণীর। সম্পাদকত্রয় রচনা সম্পাদনে অতঃপর একটু তীক্ষ্ণদৃষ্টি দান করিলে ভালো করিবেন। আর একটী কথা এই সম্পাদকীয় স্তম্ভে যে লেখাটুকু বাহির হইতেছে তাহা যেন সম্পূর্ণই চর্ব্বিত চর্ব্বন। লেখার ধাঁচ তাঁহাদের সুন্দর সন্দেহ নাই কিন্তু আধুনিক সাহিত্যের অন্য কোন বিভাগ ও বিষয় লইয়া তাঁহারা আলোচনা করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

পত্রিকাখানির উত্তরোত্তর উন্নতি আমরা কামনা করি।

হাফেজ

—শ্রীক্ষেত্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

দীপ্তিমান্ সুরা-স্রোতে দাও ভরি' দাও
হৃদি-পান-পাত্র-খানি মোর;
গাও, প্রাণ খুলে গাও,—সসাগরা ধরা
অতুলন, ফল্গু, মনোহর।
বিম্বিত গো দয়িতের প্রেমমুখচ্ছবি
আজি বক্ষ' পরে পিয়ালার!—
তুমি কি বুঝিবে বল, তিক্ত অরসিক!
কি আনন্দ সুরা-সাধনার!
সংসার সতত হায়, কুহকে ভুলায়,
ভুলে যাই জীবন-জীবন!—
রাজরাজ-মহিমায় এস এস নাথ!
ভেঙ্গে যাক্ চির-দুঃস্বপন!
আকণ্ঠ ও প্রেম যে-ই পান করিয়াছে
সে-ই হইয়াছে মৃত্যুঞ্জয়।
ভঙ্গুর জগতে তার কভু কোন দিন
মরমের নাহি—কোন ভয়।
জীবনে পাই না বটে কুহকে ছলায়
সে পরম তত্বের আভাষ,
মহাবিচারের দিনে কিন্তু জানি—জানি
সত্য যা তা' হবে সুপ্রকাশ।
হে বায়ু, বহিবে যবে তুমি' ফুলে ফুলে,
জীবনাধিকের উপবনে,
মোদের বারতা দিও; ব'লো কেঁদে কেঁদে,
'ভুলিও না পদানত জনে'।
সার বুঝিয়াছ, বন্ধু, নেশা মনোলোভা;
সুরা-স্রোতে ডুবাও ডুবাও;
অন্তরের অন্তঃস্থলে রূপে গন্ধে গানে
তব বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ফুটাও।
শুষ্ক ম্লান অবসাদে হৃদয়-কুসুম
দীর্ঘ তিক্ত ব্যর্থ অপেক্ষায়;—
হে হৃদি-রঞ্জন সখা জীবন-বল্লভ,
ওগো তুমি কোথায়—কোথায়?
কাঁদিও না মুছে ফেল তপ্ত আঁখি-লোর
ওরে মোর শান্তি-হারা মন!
চুম্বকের মত প্রেম টানিয়া আনিবে
আছে তোর বাঞ্ছিত যে জন॥

Printed & published b Sj. Nripendra nath Banerjee from the Bela Printing Work
14, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta.

আর কোন কাজে মন লাগে না
কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন
এণ্ড কোং লিঃ ১৮/১-১৯ লোয়ার চিৎপুর রোড
কলিকাতা

পরিচালক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীপ্রণবদেব মুখোপাধ্যায়।

ধূপছায়া

সম্পাদক—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীরেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রতি সংখ্যা।০ আনা। বার্ষিক ৩৸০ আনা।

বিজ্ঞান জগতে নূতন আবিষ্কার

১৫০০ ফুট আমেরিকান এভার রেডি ফোকাসিং সার্চ্চ লাইট, মূল্য ১৫৲।

আপনি কি আমেরিকান "এভার রেডি" সার্চ্চ লাইট দেখিয়াছেন? ইহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যদি অন্ধকারে চোর, ডাকাত ও হিংস্র জন্তুর হাত হইতে বাঁচিতে চান, এভার রেডি লাইট আপনার বন্ধুর কাজ করিবে। সুইচ্ টিপিলে উজ্জ্বল আলো চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হইয়া বহুদূর দেখা যাইবে, যখন ইচ্ছা জ্বালাইতে পারিবেন। মূল্য ৮০০ ফুট ১০৲; ৪০০ ফুট ৮৲; ৩০০ ফুট ৬৲; ষ্টাণ্ডার্ড টাইপ মূল্য ৪৲ টাকা হইতে ৯৲। পত্র লিখিলে ক্যাটলগ পাঠান হয়। অর্ডারের সহিত ২৲ টাকা অগ্রিম পাঠাইলে ভিঃ পিতে মাল পাঠাই।

মহামায়া এজেন্সি,

৮৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ক্যামেরা এবং ফটো' সংক্রান্ত সর্ব্ববিধ জিনিষই আমরা সরবরাহ করে থাকি।

ফটো এন্‌লার্জ করাতে অথবা প্লেট ও ফিল্‌ম্ ডেভেলপ করাতে হলেও আমাদের কাছে আসবেন।

দেশী ও বিলাতী সকল প্রকার অকৃত্রিম ঔষধ, পেটেণ্ট ঔষধ, সুগন্ধি এসেন্স, ও অন্যান্য ফ্যান্সি জিনিষ আমাদের কাছে পাবেন।

মফস্বলের অর্ডার আমরা অত্যন্ত যত্ন সহকারে সরবরাহ করে থাকি।

অর্শ রোগের একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য মহৌষধ HADENSA প্রাপ্তিস্থান—

O. N. Mookerjee & Sons.

19, Lindsay St. (below Clock Tower)
and 157, Dhurrumtolla Street

দ্বিতীয় বর্ষ **উত্তরা** আশ্বিনে বর্ষ আরম্ভ

সম্পাদক—শ্রীঅতুল প্রসাদ সেন, শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী (সহ)

আকার—প্রবাসী, ভারতবর্ষের অনুরূপ, পৃষ্ঠা ৮০ হইতে ১০০। একখানি করিয়া রঙিন ছবি। একবর্ণের অনেকগুলি।

প্রতি সংখ্যায়—বিখ্যাত লেখকদের ৩।৪টি করিয়া বড় গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, রসসাহিত্য, সমালোচনা, স্বরলিপি ইত্যাদি থাকে। **প্রবাসী-বাঙালী, আহরণী, সপ্তধারা, সঙ্কলন** বিভাগ গুলি এই পত্রিকার বিশেষত্ব।

পত্র সহ ৵১০ পয়সার ডাকটিকিট পাঠাইলে একখানা উত্তরা পাঠান হয়। আজই গ্রাহক হউন, বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲

উত্তরা কার্য্যালয়—লক্ষ্ণৌ

বিষয় সূচী

বিষয় সূচী

বিষয় সূচী

(মাসিক সাহিত্য পত্রিকা)

প্রথম বর্ষ, ২য় খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা

ফাল্গুন, ১৩৩৪ সাল

সম্পাদক

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

শ্রীরেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়।

পরিচালক

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীপ্রণবদেব মুখোপাধ্যায়।

ধূপছায়া কার্য্যালয়

১৪নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কৃষ্ণ ও গোপীগণ"

লণ্ডন সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়মের সংগ্রহ হইতে

Bela P. W.

ফাল্গুন।

কবি মঙ্গল

—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

(১)

—বাল্মিকী—

ভারতের আদিকবি ওগো রত্নাকর,
সংযমে নিষ্ঠায় তেজে প্রদীপ্ত অন্তর!
রামায়ণ গানে ছিল পূর্ণ এই দেশ—
এখনো হয়নি শেষ সে সুরের রেশ!
কেঁদেছিলে অভাগিনী জানকীর তরে,
কাঁদায়েছ সকলেরে প্রতি ঘরে ঘরে!
আদর্শ দেবর আর একনিষ্ঠ প্রেম
জগতে দেখায়ে তুমি এনেছিলে ক্ষেম!
ভারতের আজি এই দুঃখময় রাতে
তুমিই পারিতে কবি, আনিতে প্রভাতে!

(২)

—কালিদাস—

ওগো নব-রসরসিকপ্রবর
উজ্জয়িনীর কবি!
ওগো প্রকৃতির আঁচলের নিধি
সমাপ্ত তব ছবি?
তোমার কাব্যে ছত্রে ছত্রে
স্পন্দিত তব প্রাণ!
যক্ষের ব্যথা, দেবের দুঃখ
হয়েছে কি অবসান?

(৩)

—সেক্সপীর—

নরচরিত্র বুঝেছিলে যেন
দর্পণে তস্‌বীর,
প্রণাম করিহে চরণে তোমার
বিদেশী সেক্সপীর!
সবার হৃদয় মাপা হ'য়ে গেল হায়—
তব অন্তরে মাপকাঠি ডুবে যায়!

(৪)

—হাফেজ—

পারস্য-মণি ইরাণের কবি কবিত্বে মস্‌গুল,
তুমি গুলাবের আধফোটা কলি সৌরভে বৈয়াকুল!
তোমারে শোনায় কামনা তাহার লাজুক যুথিকাকুল,
হাফেজ বিনা কে বুঝিবে কি বলে বিরহী ও বুলবুল?

(৫)

—ওমার খায়াম—

জগতের দ্রাক্ষাকুঞ্জে সৌন্দর্য্যের সুরাপাত্রমুখে
কবিত্বের শান্তি মনে, যে গান গাহিলে কবি সুখে,
দুঃখশোক পাপতাপ পরিপূর্ণ ধরার যে সুর
ওঠে ধ্বনি' ক্ষণেকের তরে, করে অন্নচিন্তাদূর!
ভঙ্গুর এ ধরণীর তুচ্ছ এই মৃত্তিকা-আবাসে
সৌন্দর্য্যের স্বপ্নময় স্বর্গপুর যেন নিয়ে আসে!

(৬)

—হুগো—

ওগো বিশ্বের দরদিয়া কবি,
কাঁদিলে নরের তরে
সে কাঁদন আজি উঠিয়া আকাশে
বিধিরে বিকল করে!
ওগো মানবতা-উদ্ধার-যাগে
হোতা, দয়া অবতার
সার্থক আজি তপস্যা তব
লহগো নমস্কার!

(৭)

—বায়রণ—

স্বাধীন জাতির স্বাধীনপুরুষ
ওগো স্বাধীনতা পূজারী
কলঙ্কী তুমি, সমাজের বুকে
ঠাঁই নাই শুধু তোমারি?
তুমি হীন আজি—কত পাপ তব,
কতইনা অপরাধ!
অপরের তরে পরাণ ত্যজিলে
হীনতার একি সাধ!

(৮)

—রবীন্দ্রনাথ—

ওগো বাংলার মুখর কোকিল,
ওগো সম্রাট কবি।
প্রাচী গগনের মধ্য-মাণিক
ওগো ভাস্বর রবি।
বিশ্ব আজিকে তব মুখপানে চায়,
বিস্মিত চোখে আকুল আকাঙ্খায়,
পশ্চিম দেয় অর্ঘ্য তোমার পায়
বাংলার কবি, ভারতের কবি
তুমি জগতের কবি!

বনের পাখী

—শ্রীসুরেন ভট্টাচার্য্য।

গোলপাতার ছাউনি কুঁড়ে।—মোটমাট ১৩ খানা।

তিনখানা পাহারওলা সাহেবদের জন্য, একখানা দারোগা-বাবুর, একখানা বাড়তি কর্ম্মচারী অথবা সরকারের পক্ষ থেকে কেহ আস্‌লে তাঁদের, আর বাকী আটখানা আমাদের নিজস্ব।

আমরা ছিলুম আপাততঃ পঁচিশজন! কোনো ঘরে তিনখানা কোনো ঘরে চারখানা এমনি বিছানা ছিল। আমার কক্ষটীতে আমি থাকতুম একেবারে একলা।

সবে নূতন এসেছি, কি রকম মেজাজ-এর আসামী সব পরিচয় এখনো এঁরা জানতে পারেন নি, তাই যথাসম্ভব তফাতে থাকতে হুকুম দিয়েছেন। অন্য বন্দীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে পারি হয়তো এ ভয়টাও ছিল।

এখানকার এই কর্ত্তা-মশাইদের দেখে বুঝেছি নেহাৎ গোবেচারা। সরকারের চাকর সুতরাং সরকারী মেজাজ এঁদের ছিল বলা বাহুল্য। আমাদের কুকুর বেড়ালের মতোই মনে করে কেবলি তাড়া এবং খোঁচা দিতে আসতেন, কিন্তু আমরা উল্টে যদি একবারটী চোখ রাঙিয়ে উঠি লেজ গুটিয়ে ফিরে দাঁড়াতেন। মুখে সামনাসামনি আস্ফালন করতে না পেরে ওঁরা চাইতেন আমাদের ভাতে মারতে।

নিয়মিত আহার কোনদিন পেতাম কোনদিন বা বরাতে জুটত না। নালিশ করবই বা কার কাছে? শীতকালের রাত্রে মজা দেখবার জন্য লুকিয়ে কম্বলগুলা জলে ভিজিয়ে রেখে যেতেন! কাপড় কেচে শুকোতে দিয়েছি খানিক পরে এসে দেখি কে কাদা ও গোবর মাখিয়ে রেখেছেন!

এম্‌নি অনুগ্রহ নিত্যদিন ভুগতে হলে হয়ত' শেষকালে সত্যই বিদ্রোহ জাগাতে হবে আত্মরক্ষার খাতিরে এই কথাটা একদিন দারোগাবাবুকে জানিয়ে দিলাম।

দারোগাবাবু সেদিন কোনো উত্তর দেন নি। দিন দুই পরেই একদিন ঘুমিয়ে উঠে দেখলাম, হাতে হাতকড়ি পড়ে গেছে। এবং বাহির থেকে দরজাটায় শিকল দেওয়া।

সকালে বিকালে এবং খাবার সময়টা দুএক ঘণ্টা বাইরে যেতে দিত, তা নইলে সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত রুদ্ধ ঘরে আবদ্ধ থাকতাম।

আমাদের তেরখানা কুঁড়েঘরকে ঘিরে একটা দশ হাত উঁচু ইঁটের পাঁচীল। বাহিরে যাবার একটী মাত্র দোর,—সেখানে তিনজন পাহারাওয়ালা সঙ্গীন হাতে দাঁড়িয়ে। আটখানা ঘরের সামনে চৌকি দেবার জন্য ষোলজন, আর পিওন এবং বেহারার কাজ করে আটজন—অর্থাৎ সবশুদ্ধ দারোগাকে নিয়ে আটাশজন। মোট বার'খানা বন্দুক, তেত্রিশটা লাঠি আর উনিশখানা বল্লম।

এদের হাত থেকে পালানো হয়ত' সহজ নয় তবু চেষ্টা করলে যে একেবারে অসম্ভব তাও নয়। কিন্তু পালাবার মতলব আমাদের ছিল না।

আমরা চাইতুম আমাদের স্বাধীনতা দিক্। আমরা নিজের ইচ্ছামত খেতে পাব, নিজের অভিলষিত বই এবং সংবাদপত্র পড়তে পাব, আত্মীয়স্বজনের কাছে চিঠি লিখে খবরাখবর জানব,—কোন বিষয়েই আমাদের কেহ বাধা দেবে না।

এই গ্রাম ছেড়ে আমারা পালাব না প্রতিজ্ঞা করতে রাজী আছি কিন্তু আমাদের মুখের কথার বাঁধন ছাড়া আর কোন বাঁধন মানতে প্রস্তুত নই। ওই পাঁচীলের সীমা ছেড়ে একটুখানি হাওয়া আর আলো আমরা চাই।

কিন্তু—অধিকার নেই!

আমরা রাজার শত্রু এবং ভয়ঙ্কর লোক! আমাদের অস্ত্র এক শিশি নাইট্রিক্ এ্যাসিড্ এবং একটী বোমা—হয়ত' তাই যথেষ্ট!

ওরই জোরে আমরা সমগ্র ব্রিটিশ রাজত্বের ভিত্তি কাঁপিয়ে তুলেছি !

মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা আমি ক্রমশঃই হারিয়ে ফেলছি। রাজার দেওয়া অধিকার আছে বলেই একজন মানুষ আর একজনের মনুষ্যত্বের এতদূর অবমাননা করতে পারে জানতাম না। আমাদের শরীরের প্রতি ওরা যে অত্যাচার করে, আমি তাতে কষ্ট অনুভব করি না মোটেই, কিন্তু ওদের নীচতার কথা ভেবে দুঃখ হয়।

ছেলে বেলা থেকে এতটা জীবন, বাপ মা ভাই কারও কাছে একটা চড় চাপড় কোন দিন খাইনি। একদিন কি একটা কারণে বাবা রেগে গিয়ে কাণ মলে দিয়েছিলেন, সে বেদনা আজও মনে রয়েছে। তিন মাস অভিমান করে বাবার সঙ্গে কথা কইনি, বাড়ীর আর কারো সঙ্গেও মিশতে চাই নি!—সামান্য একটুখানি প্রহার অত করে বুকে বাজত। আজ আমি এই মহা-প্রভুদের লাঠির গুঁতো এবং অন্যবিধ অত্যাচার অম্লান বদনে সয়ে চলেছি, একবারটী প্রতিবাদও জানাই না। শিকলের ব্যথা ভুলে শিকলের বাঁধন ভুলতে চাই।

কিন্তু মনের বন্ধনটা সত্যই বেদনা জাগায়। আমার মনের স্বাধীনতাকে ওরা যখন বন্দী করতে চায় আমি মুখ বুজে সইতে পারি না।

আলো এবং হাওয়া চাই।

আমি এখানকার গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিশতে চাই। ওদের সুখ দুঃখের কথা জানতে চাই, ওদের কাছটীতে ডেকে কাজের এবং অকাজের গল্প করে আমোদ পেতে চাই।

এই দুটী বছর আমাকে কাটাতে হবে এই অন্ধকার কুঁড়ে ঘরটীতে চুপ করে একলা বসে থেকে—ভাবতে পারি না! নিষ্কর্ম্মার জীবন কেমন করে সহা যায়?

একটা ঘণ্টা কাটে মনে ভাবি আরও তেইশ ঘণ্টা কাটলে একটা দিন যাবে। এমনি করে দুটো বছর কাটবে সে কত দিনে?

মার খেতে খেতে শক্ত হই। মনে করি কারাগার আমাদের শিক্ষা মন্দির। দেশেমাতৃকার পূজায় মনের সংযম এবং সাধনা যতখানি দরকার হবে তারই জন্য আমাদের এই দুর্ভোগ, ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিই।

সংবাদপত্রে স্বদেশী দেশপ্রেমিকদের নির্য্যাতন ও কারাদণ্ডের ইতিহাস অনেকবার পড়েছি। তাঁদের মহানুভবতা ও ত্যাগ স্বীকারের দৃষ্টান্ত পড়ে, তাঁদিগকে অন্তরের পূজার অর্ঘ্য দিয়ে এসেছি বরাবর। তাঁদের দেখে আমার ঈর্ষা হত। কবে আমিও ওঁদেরই মত দেশকে ভালবাসতে পারব, দেশমাতৃকার শ্রীচরণে নিজের স্বার্থ নিঃশেষ করে বলি দেব, মায়ের পূজায় নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠিত হব না,—এমনি চিন্তা মনে নিরন্তর জাগত। অনেক সময়ই অনুভব করেছি বুকের মধ্যে এক ঘুমন্ত দানব শিশু জেগে উঠে বাইরের আলোকে ছুটে আসবার জন্য পথ খুঁজে বেরিয়েছে। পথের সন্ধান আমি কোন দিন পাই নি। মনে প্রাণে দেশমাকে ভালবাসার ব্রত নিয়েছি, কিন্তু কেমন করে সাধনা করব উপায় কিছু জানি না।

তাহলেও ডাকাতি এবং বোমা তৈরী যে দেশ ভক্তির চরম নিদর্শন একথাটা আমি কোনও দিন স্বীকার করি নি। আমারই মত একই অপরাধের অভিযোগে অনেকে কারাবরণ করেছেন জানি, আমি তাঁদের দেশপ্রীতির প্রশংসা করলেও অবলম্বিত উপায়টীর যোগ্যতা সম্বন্ধে বরাবরই সন্দেহ করে এসেছি।

আমি নিজে যে ডাকাতি এবং বোমা তৈরীর অভিযোগে ধরা পড়েছি এ রকম পরিহাসের কথা কল্পনাতেও ভাবি নি কোন দিন।

তবে এটাও সন্দেহ করা হয়ত অন্যায় নয় যে, আমারই মত আরও অনেকে যাঁরা ঐ এক শিশি নাইট্রিক এ্যাসিড আর একটী বোমা তৈরী করে দেশোদ্ধার করতে নেমেছেন বলে ধরা পড়েছেন, তার মধ্যেও এমনি কোনও অদৃশ্য বন্ধুর গোপন পরিহাস জড়ানো আছে।

একজন মানুষ কেমন করে দুটী ঘণ্টা ধরে আলাপ করতে এসে অবশেষে চলে যাবার সময় লুকিয়ে গোপনে বাড়ীর মধ্যে বোমার উপকরণ রেখে গিয়ে পুলিশ ডেকে এনে মানুষের সর্ব্বনাশ করতে পারে। অভিজ্ঞতা না থাকলে বিশ্বাস করতে পারতাম না।

বনমালীর মত লোক আমাদের সমাজের কলঙ্ক।

তার সঙ্গে আমার কোন দিন শত্রুতা ছিল না। কোন দিন বন্ধুত্বও ছিল না। বিনা কারণে আমার পেছনে লেগে আমাকে ধরিয়ে দিয়ে তার কি স্বার্থ লাভ হয়েছে জানি না।

যে কদিন বিচারের অপেক্ষায় জামিনে খালাস পেয়ে ছিলাম সেই সময়ে একবার বনমালীর স্ত্রী বাসন্তী আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। আমি তাঁর আসবার কারণ বুঝতে না পেরে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করছিলাম—"আপনি এখানে—একটা খুনে এবং ডাকাতের বাড়ীতে—এই নরকে কেন এনেছেন ?"

বাসন্তী বলেছিলেন—"আপনি রয়েছেন এখানে, সুতরাং এটা নরক নয়,—স্বর্গ! আমরাই নরকে পচে মরচি। আমি কে, হয়ত চিনতে পেরেছেন, আমার পরিচয়ের লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়! কিন্তু কি করব বলুন! আপনার কাছে একটা অনুরোধ করতে এসেছি—"

জিজ্ঞাসা করলাম—"কি বলতে চান, বলুন!"

বাসন্তী বললেন—"আমি সাক্ষী দেব, প্রমাণও দিতে পারব, আপনি দারোগার কাছে যে স্বীকোরোক্তি করেছেন সেটা অস্বীকার করুন, এবং যার প্রতারণায় আপনি এই নিগ্রহ ভোগ করছেন তাঁকে ধরিয়ে দিয়ে জেলে দিন। আপনি মিথ্যা স্বীকারোক্তি জানিয়ে আমার স্বামীকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আপনার ক্ষমার উপযুক্ত লোক তিনি নন। আপনার মহত্বের তুলনা নেই। কিন্তু পরের দেওয়া মিথ্যা কলঙ্ক আপনি কেন যে মাথায় তুলে নিচ্ছেন—"

আমি বাধা দিয়ে বললাম—"কোন্‌টা মিথ্যা আর কোন্‌টা সত্যি আপনি কি করে জানবেন? আমার ঘরে বোমা পাওয়া গেছে।—পুলিশে যখন জিজ্ঞাসা করলে—এর কৈফিয়ৎ দিতে পার? আমি উত্তরে বললাম—কৈফিয়ৎ দেব কাকে? পুলিশ পুনশ্চ প্রশ্ন করলে—এ জিনিষ গুলা বাইরের কেউ রেখে যেতে পারে সে রকম কোন অভিযোগ কারও বিরুদ্ধে জানাতে চাও? আমি বললাম—না, কারও সঙ্গে আমার শত্রুতা নেই।—"

বাসন্তী বললেন—"স্পষ্ট না বললেও প্রকারান্তরে আপনি মিথ্যা বলেছেন। এবং যদি এখনো সাবধান না হন বিপদে পড়তে হবে।—"

আমি একটু বিরক্তিভাবে বললাম—"আমার বিপদ সম্পদের কথা আমি বুঝি। আপনি কেন আপনার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাচ্ছেন আমার কাছে? আপনার স্বামী আমার কোন অনিষ্টই করেন নি।—"

বাসন্তী অশ্রুরুদ্ধস্বরে বললেন—"আমার স্বামী আমারই শুধু আপনার। আমার স্বামীর ইষ্ট অনিষ্টে আমার এবং তাঁর ছাড়া আর কারও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। কিন্তু আপনি যে আমাদের দেশের প্রাণ। আমাদের সবার আপনার জন। আপনার অমঙ্গলে সমস্ত গ্রামটারই ক্ষতি এই কথা ভেবে ছুটে এসেছি—। তাছাড়া সমরদা'—"

বাসন্তীর মুখে চিরআত্মীয়ের মত ঐ ডাকটা শুনে বড় আনন্দ হল। বাংলার ঘরের একটী মেয়ের কাছে আমার জীবনের মহামন্ত্রের কথা পৌছেছে জেনে গর্ব্ব হবারই ত কথা!

বাসন্তী বললেন "সমরদা। আমার অদৃষ্টের দুঃখ আপনি হয়ত সব জানেন না! এক একটা দিন যে আমার কেমন করে কাটে তার ইতিহাস শোনাতে গেলে আপনার ধৈর্য্য থাকবে না। নিজের জীবনের কোন মমতা আমার নেই। মরণ এলে বেঁচে যাই। মানুষ আশা করে বেঁচে থাকে, ভবিষ্যৎ তার কাছে এনে দেবে মনের অনাবিল শান্তি এবং সুখ। আমাদের আশা করে সামনে চাইবার পথ বন্ধ হয়ে গেছে চিরদিনের জন্যে। শুধু আমার বলে নয়, আমার মত বাংলার ঘরে ঘরে কত মেয়ের সামনে চলবার পথ এমনি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। একটা কুঁড়ে ঘর এবং একটু খানি চারদিকে পাচীল দেওয়া উঠানের মাঝখানে আওতায় আলো এবং হাওয়ার সঙ্গে চিরশত্রুতা বাধিয়ে মাটী কামড়িয়ে পড়ে থাকতে হয় আমাদের। স্বামী এসে দুমুঠো খেতে দেবেন—খেতে পাব। প্রহার করেন—তাও সইব। স্বামী আমাদের চরম মোক্ষ—একমাত্র অগতির গতি! আমারই চোখের সামনে দাঁড়িয়ে স্বামী আমারই মত আর এক অভাগিনী মেয়ের প্রতি নৃশংস অত্যাচার করছেন দেখেও চুপকরে থাকতে হবে! আমারই বাপ ভাই এবং গ্রামের

লোকদের ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছেন দেখে আমি লুকিয়ে যদি তাঁদের সাবধান করতে আসি স্বামী দেবতার অবাধ্যতা করেছি এই অপরাধে আমায় নরকে ছুটতে হবে………”

বাসন্তীর কথিত বাংলার মেয়েদের নিজের ঘরে চির-জীবন ধরে বন্ধন ও নির্য্যাতনের বেদনার কথা মনে করে আমার বর্ত্তমান বন্দীত্বের ব্যথা মোটেই গুরুতর মনে হ'ল না।

দুবছর পরে মুক্তি পাব—এই যে আশাটুকু রয়েছে—তার আনন্দ অনেকখানি বেদনা লাঘব করে দেয়।

কিন্তু বাসন্তীর মত অভাগিনীদের সারা জীবনটাই ব্যর্থ!

বাসন্তীর জীবনের কাহিনী শুনে অশ্রুবর্ষণ করা ভিন্ন আর তো ক্ষমতা আমার কিছু নেই! প্রতীকার করবার কোন উপায়ই জানি না।

তবু বাসন্তীর হৃদয়ের গুরুভার লাঘব করবার খাতিরে বনমালীকে তার পাপের শাস্তি দেওয়ার যুক্তির সমীচীনতা বুঝতে পারলাম না।

আমি তাঁকে জানালাম,—অপরে আমার অনিষ্ট করে যদি কিছু সুখ পায়, আমি প্রতিশোধ নিতে তার অনিষ্ট করতে চাই না!………

আজ সন্ধ্যা বেলায় বাসন্তীর চোখের জলের কথা মনে পড়ছে।

আরও কত কথা মনে পড়ছে! রতনদার কথা—মিলনের কথা—কল্পনার কথা—!

দূরে বনের আড়ালে সূর্য্যদেব চলে যেতে যেতে বারেক পথ ফিরে চেয়ে দেখছেন।

তাঁরও বিদায় বেলার অশ্রু ছলছল আঁখিদুটী—

অনিমেষ চেয়ে থাকি। আধো আলো আধো আঁধার—এই সময়টা আমার ভারী ভাল লাগে।

রাখাল গরুগুলিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অবোধ পশু যেতে চায় না, থমকে দাঁড়ায়। মুক্ত মাঠের হাওয়া ছেড়ে অন্ধকার ঘরের কোণটীতে ফিরে যেতে ভালোবাসে না হয় তো।

সাঁঝতারারও পথের যাত্রা সুরু হয় আঁধার ঘেরা আকাশের মাঝ দিয়ে!

ইচ্ছা হয় ওরই পেছনে পেছনে চলি। বাঁশী বাজিয়ে অভিসারিকার পথ ভুলিয়ে দিই। ওরে আমার সারা প্রাণ দিয়ে মুগ্ধ করতে চাই।

হয়তো আমারই মানসীপ্রিয়া—

ও-ই 'কল্পনা'!

জন্মজন্মান্তর হতে আমি ওকেই অনুসন্ধান করে এসেছি। আড়াল দিয়ে আমাকেই সে লুকিয়ে যেতে চায়!—অভিমান করে ধরা দেবে না ভাবে!

একবারটী কাছে এসে পড়েছিল আমার জীবনে। আজ কিন্তু স্বপ্ন বলেই মনে হয়।

আশ্চর্য্য হই, নিজের কাছেই কৈফেয়ৎ দিতে পারি না।—মাসীমা যেদিন কল্পনাকে আমার হাতে সমর্পণ করতে চেয়েছিলেন, আমি তাকে স্বীকার করি নি কেন?

দেশের কাজে বিঘ্ন হবে ওজর দিয়েছিলাম।

আজও ঐ সন্ধ্যাতারাটীর সঙ্গ সুখের জন্য মন লালায়িত হয়ে উঠ্‌লেও অন্তরের কাছটীতে পেলে হয় তো অমনি করেই দূরে সরিয়ে দেব!

আমার দেশপ্রাণ, ও সাধনার মুকুলটীকে সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত করেই যেন কল্পনার জীবনের কাজ পরিসমাপ্ত হয়েছে!………

—কি ভাবছো গো?

চম্‌কে উঠ্‌লাম। জানালার ধারটীতে দাঁড়িয়ে একটী মেয়ে—

চিনতে পারলাম না! কোনও দিন দেখেছি বলেও মনে পড়ে না!

অথচ কোন' সঙ্কোচ কিম্বা ভূমিকার অপেক্ষা না রেখে একেবারে অনাড়ম্বর এই আলাপ—

এবং কি মিষ্টি তার সমবেদনাভরা আঁখির চাহনি!

কাছে সরে গিয়ে বললাম—কে তুমি খুকী?

—আমি খুকী নই, মলিনা! তোমার নাম কি?

—তোমার বাড়ী কোথায়? এখানেই থাক'?—কই, একদিনও তো তোমায় দেখিনি?

—আমি বুঝি এখানে ছিলাম? সবে ত' আজ দশদিন এসেছি—ঠিক একটা বছর পরে। এখানকার দারোগা বাবুকে চেন না? আমি তাঁরই মেয়ে—

—কোথায় ছিলে এতদিন?

—সব কথা তোমায় বলতে গেলুম আর কি?—নিজের কথা কিছু বললেন না এখনো! আমি তোমার সঙ্গে কথা কইব না—যাই—

—যেওনা মলিনা, লক্ষ্মীটী, কি জানতে চাও আমি সব বলছি। আমার নাম শুনবে? নাম আমার অনেকগুলি কোন্‌টা শুনতে চাও? এখানে আমায় সকলে তের নম্বর বলেই ডাকে!

—ও নাম বিশ্রী! আর কি নাম আছে? তোমার হাতে হাতকড়া কেন? এখানে আর কারও তো নেই! তুমি বুঝি সবার চেয়ে দুষ্টু?

—তোমার কি মনে হয় বল তো? আমি একটা ডাকাত—নয়?

—নাঃ, ডাকাত কেন হবে?—কিন্তু তোমার নাম এখনো বললে না—

—বাড়ীতে আমায় সমর বলে ডাকতো?

—সমর? সমর মানে তো যুদ্ধ! তুমি খুব যুদ্ধ করতে পার বুঝি! তোমার দেশ কোথায়?

—আমার দেশ ভারতবর্ষ—

—তাতো জানি,—কিন্তু ঠিকানা আছে তো? গ্রাম, সহর, পোষ্ট-আফিস,—

—আমার ঠিকানা জেনে কি করবে?

—তুমি তো চিরকাল এখানে থাকবে না, যখন চলে যাবে চিঠি লিখব।

—আমি চলে গেলেও তুমি মনে করে রাখবে?

—না রাখবে না! তোমার সঙ্গে আলাপ হোল, বন্ধুত্ব হোল, তুমি চলে গেলেই আমিও ভুলে যাব একেবারে? আমি নেমক-হারাম নই—

—ফরিদপুর জেলার নাম শুনেছো?

—শুনেছি বই কি! আমিতো ফরিদপুরেই ছিলাম এতদিন—এই একটা বছর—

—কোটালিপাড়া পরগণা।

—বাঃ, আমার সঙ্গেও যে মিলে যাচ্ছে!—আর গ্রাম? পিঞ্জরী নয় তো—

—হাঁ, ঐ গ্রামই আমাদের! তুমিও পিঞ্জরীতে থাকতে? আশ্চর্য্য ত!

—দাঁড়াও, সমর নাম বললে না? আমি শুনেছি তোমাকে বোমা তৈরী করেছ বলে ধরেছে, আচ্ছা, বোমা কি বলতো? বাজীওলারা বোমা তৈরী করে, সেই জিনিষ? কিন্তু তাদের তো ধরে না! কেমন করে তৈরী করে আমায় বলবে না?

—আমি জানি না তৈরী করতে, তোমায় সত্যি বলছি? অথচ ঐ বলেই আমাকে ধরেছে। বোমা দিয়ে মানুষ মারে। তোমার কি বিশ্বাস হয় আমি মানুষকে মারতে পারি?

—মানুষকে মেরে ফেলে? তাহলে ভয়ঙ্কর জিনিষ তো! তুমি জান না সত্যি বলছো, তাহলে তোমায় ধরলে কেন? বাসন্তীদিও বলছিলেন তোমাকে মিছিমিছি ধরে নিয়ে এসেছে। বাবাকে একদিন জিজ্ঞাসা করছিলাম,—মানুষকে মিছিমিছি ধরে এনে জেলে দাও কেন। ওদের কত দুঃখ হয়, বাপ মা ভাই বোন কাহাকেও দেখতে পায় না। ভাল খেতে পায় না। বাইরে বেড়াতে পারে না। বাবা বললেন,—যারা দুষ্টু বদমাস তাদেরই শুধু ধরি। ভাল লোককে কি আর কেউ কিছু বলতে পারে? তোমাকে কিন্তু দুষ্টু বলে মোটেই মনে হয় না।

—বাসন্তীকে তুমি চেনো? তিনি আমার কথা তোমাদের কাছে গল্প করছিলেন? কি কি বলেছেন বল তো? খুব নিন্দে করেছেন—নয়?

—বাসন্তীদিকে চিনি বইকি! আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই আসতেন। ওঁদের ঠিক পাশাপাশি আমাদের বাড়ী জানতো? বাসন্তীদির বর যখন বেরিয়ে যান বাইরে, তিনি আমাদের কাছে এসে গল্প করতেন, আমাদের সংসারের কাজে কত সাহায্য করতেন! আমার বড় দুটী ভাজ, ভারী

খিট্‌খিটে, আমি ছেলেমানুষ, কিছুই জানি না, তার জন্য কত যে বকতেন তার ঠিক নেই। একদিন একখানা পাথরের রেকাব হাতফস্‌কে ভেঙে গিয়েছিল, আমাকে দুজনে এমন মারটা মেরেছিল, কখনো ভুলব না। বাসন্তীদি এসে আমার সাহায্য করতেন, কাজ করে দিতেন, তাইতে আর রোজ বকুনি খেতে হত না। এবার কিন্তু আমি একেবারেই বেঁচে গিয়েছি। আর সে বাড়ীতে মরলেও যাচ্ছি না। কারণ জান তো? শোন নি বুঝি! এই দেখ না, আমার কপালের সিঁদুর মুছে দিয়েছে, হাতের শাঁখা ভেঙে দিয়েছে,—আমি বিধবা হয়েছি সবাই বলে। 'বর' মরে গেলে বিধবা হয়? বিধবাদের বুঝি শাঁখা পরতে নেই? আমার শাশুড়ী হাতের চুড়ি কগাছাও খুলে নিয়েছে। বাড়ীতে আসতে মা কিন্তু আবার গড়িয়ে দিয়েছে। এই দেখ না, বরফি কাটা, আমার খুব পছন্দ! তোমার কি মনে হয়, বেশ সুন্দর, নয় কি?

মাত্র বার বছরের বালিকা—

পুতুল খেলার বয়স আজও পার হয় নি—

বিয়ে হয়েছে বলেই এতক্ষণ মনে করতে পারি নি!

স্বামীর ঘর করা, সধবা জীবনের সুখ সম্ভোগ যত কিছু উপভোগ করা—সব শেষ হয়ে গিয়েছে।

যার মনে এখনো যৌবন জাগে নি,—সে আজ বিধবা।

সারা জীবনটাই পড়ে রয়েছে সামনে!

তৃষ্ণা অসহ হলে দমন করে থেকে ব্রহ্মচর্য্য শিখতে হবে। পথের সামনে সুন্দর কিছু দেখলে চোখ ফিরিয়ে নিতে হবে। আনন্দ যেখানে আছে সে দিক দিয়েও চলার অধিকার নেই।

কিন্তু বাঁধাবাঁধি এবং পাহারা দিয়ে একটা সাগরের জলোচ্ছ্বাস থামিয়ে রাখা যায় না। ফাঁক পেলেই সে ছুটে আসবে আর কুলের সকল বাঁধন ভেঙে ফেলবে।

দিনের আলোয়, পিতার সতর্ক দৃষ্টি এবং অন্যান্য পুলিশের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে যদি নাই বার হতে পারে, রাতের অন্ধকারে তাকে বাধা দেবে কে?

মলিনা একটী ব্যর্থ এবং নিষিদ্ধ ফুল।—দেবতার পূজার উপচারে তার কোন সম্মান নেই!..........

মলিনা দুঃখ কি বোঝে না, তাকে সান্ত্বনা দেব কি বলে? প্রাণের ভেতর কিন্তু তার কথা ভেবে হাহাকার জাগ্‌ছিল!—পৃথিবীতে সবাই কি শুধু কাঁদতেই এসেছে?

কি উত্তর দেব, না ভেবে পেয়ে চুপ করে ছিলাম।

মলিনা আবার জিজ্ঞাসা করল—তুমিও তো বিয়ে কর' নি? তুমি যাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে সে মেয়েটী মরে গিয়েছে,—নয়? বাসন্তীদি একদিন বলছিলেন, তোমার সঙ্গে আর সেই মেয়েটীর অন্তরে অন্তরে বিয়ে হয়েছিলো,—মন্ত্র পড়া নাই বা হোল,—সত্যি কথা বলতে কি তোমারও বিয়ে হয়েছিলো বৌ মারা গিয়েছেন! আমার সঙ্গে তোমার অনেক মিলে যায়! এখানে তোমার মত যত লোক আছে, সবার সঙ্গে আমি লুকিয়ে ভাব করে ফেলেছি। কিন্তু তোমার সঙ্গে কথা কইতে আমার সব চেয়ে ভাল লাগে। আমি রোজ সন্ধ্যার সময় আসব। জানালার আরও কাছে এস, একটা কাণে কাণে কথা বলি। তুমি আমার সঙ্গে সই পাতাবে? কিন্তু কি বলে ডাকবো বল তো?

আমি বললাম—বেশতো, তুমি আমায় "খাঁচার পাখী" বলে ডাকবে আর আমি তোমায় "বনের পাখী" বলে ডাকবো.........কেমন রাজী ত? একটা গান আছে—

"খাঁচার পাখী ছিল সোণার খাঁচাটিতে
বনের পাখী ছিল বনে,
একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে
কি ছিল বিধাতার মনে......"

সম্মতি জানাল একগাল হেসে।

আমার অন্ধকার নিঃসঙ্গ জীবনের মাঝে একটুখানি আলো!—

যতটুকু দেখতে পাই তাই আমার পরম লাভ।

দারোগা সাহেবের বাড়ী থেকে কে যেন ডাকাডাকি করছে মলিনার নাম ধরে।

মলিনা সন্ত্রস্ত হয়ে বলল—আজ আসি ভাই খাঁচার পাখী! বাবা দেখতে পেলে অনর্থ করবেন!—

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে ছুটে পালাল।

ভগবানের এই অদ্ভুত খেয়ালের কথা যত ভাবি, আশ্চর্য্য হয়ে যাই।

কাকে কখন রাজা করেন, কাকে পুড়িয়ে মারেন, কাকে হাসান কাকে কাঁদান খেয়ালের মানেই বুঝতে পারি না।

আর এই কারাকক্ষটাকে দুঃসহ মনে হয় না।

জীবনের প্রতি মমতা আবার জাগছে।

একটী সন্ধ্যার পর আর একটী সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করে থাকি।

বিশ্বজগতের প্রত্যেক মানুষটীর মাঝে আমি কল্পনার সোণার কাঠির ছোঁয়াচ লেগেছে দেখতে পাই। আজ সবাইকেই আমার ভাল লাগে। বনমালীর কথা মনে হলেও আর রাগ হয় না। মলিনার অকাল বৈধব্যের কথা ভাবতেও দুঃখ হয় না। মনে হয় যেন সব ভালো সব সুন্দর এবং সবই সুখের। জল সমুদ্রে দাগ কাটলে চিহ্ন থাকে না। মলিনার মনটাতেও তেমনি একটুখানি আঁচড় লাগে নি। কল্পনাও এই কথাটা একদিন আমায় বোঝাতে চেয়েছিলো। এর অর্থটুকু আজ আমি ভালো করেই অনুভব করছি প্রাণ দিয়ে।

একদিন মলিনা এসে বললে—বাসন্তীদিকে চিঠি লিখে-ছিলাম। জবাব শুনবে?

অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বললাম—পড়, শুনব।

—আমি পড়তে পারব না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই তিন পাতা লম্বা চিঠি। তুমি সময় মত পড়ে রেখো।

—সেই ভালো। দাও।—

—আমি কিন্তু আজ আর দাঁড়াবনা মোটেই। বাবা কাছারীতে বসেন নি, আজ বাড়ীতেই রয়েছেন। বেশীক্ষণ আমায় না দেখতে পেলেই সন্দেহ করবেন।

মলিনা চলে গেলে—বাসন্তীর চিঠি পড়লাম।

এক জায়গাতে লিখেছে...........মলিনা, তোমার চিঠি পড়ে জানলাম সমরদা তোমাদের ওখানেই রয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে। তোমার কাছ থেকে নিয়মিত ভাবে সমরদার কথা জানতে পারব ভেবে বড় আনন্দ হচ্ছে। তাঁর বোধ হয় নিজে চিঠি লেখবার সুযোগ হবে না। যাই হোক, তাঁর নিজের কাছ থেকেই হোক অথবা তোমার চিঠিতেই হোক তাঁর খবরাখবর জানতে পাই যেন। তাঁর মা, ভাই, এবং বাড়ীর আর সকলে বড় উদ্‌গ্রীব রয়েছেন। আমি অবশ্য তোমার নাম করি নি, কিন্তু জানিয়ে এসেছি কোনও সূত্রে সমরদার খবর জানতে পাই। প্রত্যেক দিনই তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন আর কিছু চিঠি এসেছে? আমি নিজেও তাঁর জন্যে উৎসুক রয়েছি। সমরদাকে এখানকার একটা কথা জানাতে পারবে কি? সমরদা এখানে থাকতে যতটা না হয়েছিলো, তাঁর অন্তরীণের খবর পেয়ে অবধি তাঁর আরব্ধ কাজ পরিপূর্ণ করবার ব্রত নিয়ে অনেকেই প্রাণপণ খাটছেন। এই দুতিনটে মাসের মধ্যে দেশের আবহাওয়া একেবারে বদলে গেছে। যারা সমরদার বিরোধী ছিল এক এক করে অনেকেই মিলন এবং রতনদার সঙ্গে দেশের কাজে যোগ দিয়েছেন। গ্রামের মধ্যেই একটা বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, নৈশবিদ্যালয়ের কাজ ভাল রকমেই চলেছে, একটা সমবায় ব্যাঙ্ক খোলা হয়েছে—চাষী বাসীরা বিনা সুদে টাকা ধার নিতে পারবে মহাজনদের অত্যাচার আর সইতে হবে না,—ব্যাঙ্কের মূলধন গড়ে তুলছে চাষীরা নিজেই প্রত্যেকে তাদের জিনিষ বিক্রয় করে যা লাভ হয় তার একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ দিয়ে। ....আজকের মত আর কিছু জানাবার আমার নেই। কিন্তু ভাই, মনে থাকে যেন, সামান্য দুটো কথা লিখেও উত্তর জানাস, ভুলিস নি!”

মলিনা বলে, সমরদা তুমিও একটু কিছু নিজের হাতে লিখে দাও না।

প্রথমে আমি রাজী হইনি। বললাম,—তুমি লিখছ যখন আমার আর আলাদা করে লেখবার দরকার নেই।

বাসন্তীর চিঠি নিয়মিত ভাবেই পড়তে পাই।

একটা জিনিষ লক্ষ করে আসি বরাবর বাসন্তী তার নিজের সুখ দুঃখের কথা কিছু লেখে না কোন দিন। যেন তার জীবনের কাহিনী শোনবার জন্য আগ্রহ কারও নেই।

মলিনাকে বললাম—তুমি অভিমান করতে পার না?

একখানা চিঠি মলিনার হয়ে আমিই লিখে দিলাম। সে শুধু নকল করে পাঠিয়েছিল।

বাসন্তী জবাব জানাল—প্রাণের সই আমার দিনের ইতিহাস তোমায় কিছু জানাই না বলে দুঃখ করেছ, কিন্তু তুমি জানইতো আমার নিজের কথা জানাবার কিছু নেই। একটা দিন সকাল হতে রাত্রি পর্য্যন্ত যেমন ভাবে কাটে পরের দিনটাও ঠিক তেমনি ভাবেই কেটে যায়। বৈশিষ্ট্য কিছু নেই বৈচিত্র্যও নাই। বাইরের পৃথিবীতে ওলট পালট হয়ে যায়, লাঠালাঠি মারামারি কত কথাই শুনি, আমাদের ঘরোয়া জীবন কিন্তু নিশব্দ নিঃসাড়। শরীর কেমন আছে জানতে চাও? বেশ ভালোই আছি। স্বচ্ছন্দেই দিন কেটে যায়।............

ও চিঠিরও জবাব আমি লিখে দিলাম।

নিজের নামে কিছু লিখতে চাইনি তার অন্য কারণ আছে অনেক। কিন্তু এবার থেকে মলিনার প্রত্যেক চিঠি খানির বেশীর ভাগটাই আমি লিখে দিতাম। মলিনা মোটেই রাগ করত না। বরং উৎসাহ দিত। এবং বলত, তার কথা আমি যেমন করে প্রকাশ করি, সে নিজেই পারে না।

বাসন্তী যেন আমার প্রাণের দরদী সখি।

মলিনার নাম নিয়ে তাকে চিঠি লিখতে বসে আমার সেই কথাটাই মনে হয়।

নিজেকেও মনে করি মলিনার মতই আমার জীবনের সর্ব্বস্ব পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। আমার অন্তরের মধ্যেকার বিধবা মেয়েটা কিন্তু নির্ব্বিকার।

মলিনার কপালের সিঁদুর মুছে গেলেও মনের সিঁদুর মোছেনি।

আমিও তেমনি করেই জগতের সব সুন্দরকেই ভাল বাসতে চাই। বাসন্তীকে চিঠি লিখতে গিয়ে কাঙাল মনের ব্যাকুল আবেগ তেমনি রূপ নিয়েই প্রকাশ পেয়ে ওঠে।

মলিনার কোনও হাত এর ভেতর ছিল কি না জানি না। একদিন দারোগা বাবু নিজে এসে আমার হাতের কড়া খুলে দিয়েছিলেন। ঘরে অষ্ট প্রহর বন্দী থাকার বন্ধন হ'তেও মুক্তি পেলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এ আবার আপনাদের কি খেয়াল?

দারোগা উত্তরে বললেন, তুমি আমাদের বন্দী, আমরা কোন কাজের জন্য কারও কাছে কৈফেয়ৎ দিতে রাজী নই।

কিন্তু রাজারাজড়ার অত্যধিক স্নেহ দয়াটাও ভাল নয়।

মলিনাকে অবসর মত জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কি বল ত?

মলিনা বলিল,—জানিনা।

তার মুখ চোখ কিন্তু সে কথার সাক্ষ্য দিল না। একটা কোন রহস্য আছে যা মলিনা আমার কাছ থেকে গোপন রাখতে চায়।

কিছুক্ষণ চুপ করে ছিলাম। মলিনা আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একটু ব্যথিত স্বরে বলল,—আমি মিথ্যা কথা বলেছি, সমরদা, রাগ কোর না। জানি আমি,......কিন্তু বল রাগ করবে না!

—না, কি হয়েছে?

—বাসন্তী দি বাবার কাছে নিজের গহনা বেচে পাঁচশ' টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে এবং অনুরোধ করেছে তোমাকে কষ্ট না দিয়ে সুখে রাখতে। বাবার নীচতায় আমি যারপর নাই লজ্জিত হয়েছি। কিন্তু আমি কি করব বলো! আমার নিজের যদি থাকত লুকিয়ে এই পাঁচশ টাকা বাসন্তীদি'কে ফেরত পাঠিয়ে দিতাম। তোমার মুক্তির আনন্দ শুধু তাঁর নয়তো, আমারও।

আমার সামান্য কষ্ট লাঘবের জন্য বাসন্তীর এই টাকা পাঠানো ব্যাপারটা আমার ভাল লাগলো না। হাতকড়া বাঁধা থাকতে এবং ঘরের মধ্যে অবরুদ্ধ থাকতে আমার তো কষ্টই মনে হোত না! এইটুকুর জন্য অতগুলা টাকা নষ্ট করা!

মলিনা আবার বাসন্তীকে চিঠি লেখাতে এল।

আমি এবারে আর কিছু লিখলাম না। বললাম,—যা বোঝ, তুমিই লেখ। আমার জীবনকে ঘুষ দিয়ে যে কিনতে চায় আমি তার সঙ্গে কোন সংস্রব রাখতে চাই না।

মলিনাও একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিল।

তারপরে দশ দিন যায়, পনের দিন যায়, মলিনা বাসন্তীর লেখা আর কোনো চিঠি দেখাতে আসে না। ভাবলাম সে ইচ্ছা করেই বলে না। অথচ মনে প্রাণে বাসন্তীর খবর জানবার জন্য আমি ব্যতিব্যস্ত হয়েছিলাম।

একদিন নিজেই জিজ্ঞাসা করলাম—বাসন্তীর আর কোনও চিঠি পাও নি?

মলিনা বললে—না, আমরাই লিখিনি যখন কেন সে জবাব দেবে?

—তুমি লেখনি? কেন? তোমায় তো বলেছিলাম লিখতে—

মলিনা ওকথার জবাব দিল না। তার চোখ দুটো ছল ছল করে উঠেছিল।

আমি আবার বললাম—আমাদের রাগ করা উচিত হয় না মলিনা। হাজার হোক সে আমার ভালোর জন্যই ও কাজ করেছিলো তো! তুমি কাগজ কলম নিয়ে এসো, আমি আবার একখানা লিখে দিই।

চিটি লিখলাম, কিন্তু আরও এক পক্ষ কেটে গেল কিছু জবাব এল না।

মনে ভয় হোল, বাসন্তী ভাল আছে তো? তার অমঙ্গল কিছু হয় নি!

কার কাছেই বা খবর পাই।

শেষ চিঠি পাবার পর একটা মাস কেটে গেছে।

একদিন দুপুরবেলা মলিনা হাঁপাতে হাঁপাতে একখানি খাম আমার জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে বললে—তোমার নিজের নামের চিঠি আমার খামের মধ্যে ছিলো। আমি এটা খুলিনি বারণ রয়েছে বলে। আমার চিটিটাও এই নাও! সন্ধ্যের সময় এসে জিজ্ঞাসা করব কি লিখেছে তোমায়।—চিঠি দেখতে বারণ থাকলেও তোমার কাছে শুনতে বারণ নেই নিশ্চয়! কি বলো!

—এই বোলেই সে বাড়ী ফিরে গেল। উত্তর শোনাবার অপেক্ষাও করল না।

মলিনাকে লেখা চিঠিতে বাসন্তী জানিয়েছে অনেক দুঃখের ব্যাপারে চিঠি লিখতে পারে নি, এবং হয়ত এই তার শেষ চিঠি।

ব্যাপার কি?

আমার চিঠি খুলে পড়লাম—

"............সমরদা, তুমি আমার ওপর রাগ করেছ হয়তো,—বুঝতে পারছি। আমি একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছি এবং এর জন্যে তোমার মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে জানি। কিন্তু আমার এখনকার মনের অবস্থা তোমায় খুলে জানালে হয় তো তুমি রাগ নাও করতে পার।

সেই ভেবেই লিখছি।

মলিনা যে চিঠি লিখত তার ভেতর তোমার অন্তরের কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পেতাম। তুমি যে আমাকে স্নেহ কর তা জানি সেই ভরসাতে এই কথাগুলা লিখতে পারছি।

তোমার প্রতি স্বামী অত্যাচার করেছেন, রতনদার স্ত্রী শুভনলীর মৃত্যুর কারণও তিনি। এত বড় অপরাধের শাস্তি তাঁকে পেতে হবে জানতাম। তাই সেদিন যখন রাত্রে তিনজন মুখোসপরা গুণ্ডা এসে তাঁর পায় লাঠি মেরে বললে তোমার নাম করে, তোমাদের মতো আর কোনও নিরীহ লোকের যাতে অনিষ্ট পুনর্ব্বার কখনও করতে না পারে তারই জন্য জন্মের মতই খোঁড়া করে দিয়ে গেল—আমি একটুও আশ্চর্য্য হই নি। স্বামী শয্যাশায়ী হলেন, তবু আমার প্রতি তাঁর রোষ কমল না। নিজের রোজগারের পথ বন্ধ হয়েছে, মদের খরচ যোগাবার জন্য আমার গহনা নিয়ে টানাটানি। টাকা না দিয়ে নিস্তার নেই দিলেও বিপদ। মদ পেটে পড়লেই সয়তান মাথায় চেপে বসে। আমি সইতে না পেরে বাকী গহনাগুলা বেচে ফেললাম। টাকা বাড়ীতে রাখতেও সাহস করি না। তুমি বলবে দেশের কাজে ব্যয় করলাম না কেন। তোমাদের কাছে নিজের জীবনের সুখ দুঃখের চেয়ে দেশের কাজটা বড় হতে পারে। আমরা মেয়ে মানুষ, ততটা বুঝি না। দেশের চেয়েও আমার আপন যাঁদের বুঝেছি তাঁদের একটুখানি মুখের হাসির জন্য সব সইতে পারি। তুমি যে আমাদের দেশের প্রাণ। তোমার একটুখানি সুখের জন্য আমার এইটুকু ক্ষতি স্বীকার কিছু বেশী নয় নিশ্চয়ই।

এবারে আমরা খাব কি ?

স্বামীকে বললাম,—সর্ব্বস্ব চুরি গেছে। কিন্তু তোমার আর আমার দু' মুঠো চালের জন্য ভাবতে হবে না। আমি কার্পেট বুনে এবং জামা সেলাই করে একটা টাকা রোজগার করতে পারব। তবে—বাড়তি তোমার নেশার খরচ যোগাতে পারব না।

স্বামী বললেন,—তুই রাক্ষসী, তোর চালাকী আমি সব বুঝেছি। কিন্তু কিছু শুনতে চাই না। রোজ একটা বোতলের দাম দু' টাকা তের আনা আমাকে দিতেই হবে, ভাত খাওয়া হোক আর নাই হোক।

আমি বললাম—কোথা থেকে পাব? আমায় কেটে ফেললেও পারব না দিতে!

স্বামী দুজন অনুচরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এমন এক মতলব ঠিক করলেন যার কথা শুনলে তোমরা মর্ম্মাহত হবে! কিন্তু পৃথিবী রসাতলে যায় নি! কলির দেবতারা বোধ হয় ঘুমিয়ে আছেন তাই!

একজন মাড়ওয়ারী স্বামীর হাতে এক তাড়া নোট গুণে দিয়ে আমায় বললে—চল!

বাইরে পাল্কী কাঁধে করে চার জন মুসলমান দাঁড়িয়ে।

আমি সমস্ত অত্যাচারের জন্যই প্রস্তুত হয়েছিলাম। এক খানা ছোরা আমার কাপড়ের ভেতর সর্ব্বক্ষণই লুকান থাকত। আমি তাই বার করে বললাম—সাবধান! এগোলেই মার খাবে।

মাড়ওয়ারীটা ভয়ে দু'পা পেছিয়ে গেল। আমার কাছ থেকে প্রতিরোধের সম্ভাবনা ওরা হয় তো ভাবে নি তাই ছোরা দেখেই ভয় পেয়েছিল।

আমি সেইদিন জন্মের মত স্বামী-দেবতার পায় গড় করে পালিয়ে এলাম।

রতনদার কাছে গিয়ে সব জানিয়ে বললাম—তুমি আমায় রক্ষা করতে পারবে কি?

রতনদা আমার সমস্ত ভারই নিয়েছেন।

আমার ইহকালের স্বর্গের মোহ ত্যাগ করে জলাঞ্জলি দিয়ে এসেছি। চারিদিকে ছি ছি পড়ে গিয়েছে। তোমরাও হয়তো নিন্দা অথবা ঘৃণা করবে। কিন্তু এ ছাড়া আমার উপায় কি ছিলো?

গ্রামে বাস করা আমাদের দুরূহ হয়ে পড়েছে। রতনদাকে বললাম—পালিয়ে যাই চল!

রতনদা বললেন—সময় ফিরে না আসা পর্য্যন্ত যাই কি করে?

তোমার অপেক্ষাতে আমরা সব উপদ্রব সহেও এখানে পড়ে থাকতে পারতাম। কিন্তু স্কুলের ব্যাঙ্কের কাজ এবং অন্য যা কিছু কাজ রতনদা জীবনের মূলমন্ত্র করে নিয়ে ছিলেন তাই যখন করতে পার্ব্বেন না, দেশের ভাল লোকেরাও যখন আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষার দাবী সইতে পারে না, তখন না পালিয়েই বা গত্যন্তর কি?

খাঁচার পাখী! খাঁচা ছেড়ে বেরোবে নাকি?

চমকে চেয়ে দেখলাম—মলিনা।

বললে—কি লিখেছে বলত? সেই দুপুর থেকে চিঠি খানা হাতে করে বসে রয়েছ! কটা বেজেছে জান?

আকাশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। সূর্য্যও ডুবতে যায়।

বললাম—বাসন্তীর চিঠি সম্বন্ধে আমায় কিছু জিজ্ঞাসা কর' না। নিজে পড়ে দেখতে চাও এই নাও চিঠিখানা।—

—তোমার কথা শুনে মনে ভয় হচ্ছে। দিদি ভাল আছেন তো?

আমি চুপ করে রইলাম। বাসন্তী যা করেছে সেটা তার পরাজয় নয় জানি। রতনদা এবং বাসন্তীকে তাদের নূতন জীবনে আমিই বরণ করে নেব সবার আগে।

কিন্তু সংস্কারের সংকোচ একটু জাগেই। অস্বীকার করা যায় না।

মলিনা চিঠিখানি পড়ল।

বললে—তুমি জবাব দেবে না?

—না!

—কেন?

—আমার মনের জবাব তারা পেয়েছে চিঠি লিখে জানাবার অপেক্ষা রাখে নি।

তাঁরা চলে যাবেন দেশ ছেড়ে তুমি বাধা দেবে না?

কেমন করে দেব বল!

—চিঠি লিখে বারণ কর!

—আমার নিষেধ জানিয়ে তাদের অবাধ গতি রুদ্ধ করতে চাই না। তাছাড়া গ্রামে থাকতে হলে মরে যাবে সে কথা আমিও বুঝি। কিন্তু—তুমি কি বাসন্তীর এই কাজটা সমর্থন করতে পার?

—সমর্থন করা না করার কারণ কিছু জাগে না। চলার পথে মানুষ চলবে তার নিজের খেয়ালে, সেই তার ধর্ম্ম। মনকে বাঁধা রেখে বিপথে যাওয়াটাই অধর্ম্ম।

—আমিও তাই জানি। তোমার মুখে এ কথা শুনে আমার বড় আনন্দ হচ্ছে। কিন্তু একটা মহৎ দুঃখ আমার বুকে রয়ে গেল—জন্মভূমি আমার, রতনদার মহানুভবতার দাম দিলে না, বাসন্তীর পথ চলার দাবী অগ্রাহ্য করলে! ওদের দীর্ঘ নিঃশ্বাসের অভিশাপ তাকে দগ্ধ করবে সুনিশ্চিত।

দুজনারই মন ভারী হয়ে ছিল। আর কিছু কথা কইতে পারি না, চুপ করে ছিলাম কতক্ষণ তার হিসাব রাখিনি।

কল্পনার পরে বাসন্তীকেও যেন বসি দিলাম দেশমাতৃকার পূজায় এমনি মনে হল।

হয়তো জীবনে আর কোন দিনও দেখতে পাব না। কিন্তু তার জয়ের গৌরবস্মৃতি আমার বুকে চিরকাল জেগে থাকবে।· ....

মাস ছয় পরে একদিন মলিনা এসে বলল—সাত নম্বর ঘরে আজ একটী নূতন বন্দী এয়েছে তাকে দেখলে দুঃখ হয়!

—কে সে? নাম কি তার, জান?

—নাম এখনো শুনি নি। কেবল মনে হচ্ছে যেন কোথায় দেখেছি। ঠিক ভাল বুঝতে পারছি না। একজনকে সন্দেহ হয়—কিন্তু—তুমি একবার দেখবে কি? আমি এখানে অপেক্ষা করছি—তোমার সঙ্গে যাব না--

দেখতে গেলাম—

কিন্তু—

ও যে বনমালী নিজে!

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হচ্ছিল না!

দুটা পা'ই অকর্ম্মণ্য হয়ে গেছে। চেহারা যেন জরাজীর্ণ। পাঁজরা বেরিয়ে পড়েছে। মাথার চুলে জট ধরেছে। হাতে পায়ে বিশ্রী ঘা—কুঠ বলেই মনে হল!

আমাকে দেখে সেও কম আশ্চর্য্য হয় নি।

হায় হায় করে কেঁদে আমার পা জড়িয়ে ধরতে আসল। আমি বিরক্ত হয়ে সরে দাঁড়ালাম।

বনমালী বল্লে—সমর ভাই, তোমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি, তার শাস্তিত যথেষ্ট পেয়েছি! আমার জীবন শেষ হয়ে আসছে, এসময় আমার প্রতি রাগ কোর না। তোমরা যদি ক্ষমা কর সুখে মরতে পারব! দেখচ আমার সর্ব্বাঙ্গে পচ ধরেছে। নিজের হাতে তুলে ভাত খেতে গেলে ঘেন্না করে। আগে এতো সৌখীন ছিলাম একখানা ময়লা কাপড় পরিনি কোন দিন। আজ শতজীর্ণ হয়ে গেছে দেহের এই খোলসটা,--যতক্ষণ না বদলাতে পারি; নিস্তার নেই।

—তোমাকে এখানে ধরে আনলে কেন? কি করেছ?

—তোমাকে বলতে আজ আর আমার বাধা নেই। স্বদেশীর দলে পড়ে ডাকাতি করে এসেছি আমি অনেক দিন থেকে। নিজের হাতে বোমাও তৈরী করেছি। খুন খারাপী কিছুই বাদ যায় নি। তোমার মত কত নির্দ্দোষীর সর্ব্বনাশ করেছি। অষ্ট প্রহর নিশিদিন দুঃস্বপ্ন দেখে শিউরে উঠ্‌ছি আজ। ছমাস আগে আমারই অত্যাচারে বৌটা পালিয়ে গেল। নিজে নড়ে বেড়াতে পারি না। সঙ্গী সাথী বন্ধু সবাই দুঃসময়ে সরে দাঁড়াল। না খেতে পেয়েই মরতাম। মরার ওপর খাঁড়ার ঘার মত', তখন হঠাৎ একদিন পুলিশে খবর পেয়ে ধরলে। কোথায় কবে কোন ডাকাতিতে ছিলাম, কাকে খুন করেছি, কাকে জখম করেছি, সব লিষ্ট মাফিক বলে যেতে লাগল। আমি জোর গলায় অস্বীকার করলাম। ছমাস হাজতে থেকে মোকদ্দমা চলল। শেষে বিচারে সব দোষই প্রমাণ হয়ে গেল। প্রকৃত কোন খুনের চার্জ্জ পায় নি বলে প্রাণটা রেখেছে, কিন্তু আমি বলি কি, একেবারে ফাঁসী দিলেই বাঁচতাম। দগ্ধে মরছি শেষ সময়ে তোমার পায়ে ধরছি ভাই! তোমাদের কল্যাণে একটু যদি যন্ত্রণার লাঘব হয়।

দেখে দুঃখ হয়!

রাগ করলাম না। ভুল পথে চলেছিল সত্যি, কিন্তু অনুতাপ যখন এসেছে ওর সব অপরাধই ক্ষমা করতে পারি। বললাম—ভগবানের কাছে তুমি দোয়া, একাগ্র হয়ে শ্রীকৃষ্ণের নাম ভাবতে থাক, তাঁরই কাছে সকল অপরাধের ক্ষমা চেয়ে নাও, যন্ত্রণার অবসান হবে।

মলিনার কাছে ফিরে এসে বললাম—তোমার অনুমান সত্যি। কিন্তু বাসন্তীর কথা ভেবে বেচারীর ওপর অভিমান রেখনা—আজ চরম শাস্তি পেয়েছে আপন কর্ম্মফলে। মানুষের সহানুভূতি এবং আশীর্ব্বাদে যদি কিছু কষ্টের লাঘব হয় তাই বরং ভাব!

মলিনা বলিল—ওর গায়ে ঘা বেরিয়েছে দেখেছ?

—হাঁ, দেখেছি। এরকম অসুখ থাকলে জেলে অপর আসামীদের মাঝে রাখার নিয়ম নেই কিন্তু। মিছিজাম কি আর কোথাও কুষ্ঠাশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার।

—বাবার মতামত জিজ্ঞাসা করব। এখানে তো কোন চাকর ওর ছোঁওয়া ভাতের থালা মাজতে চায় না। তাছাড়া উঠে বসতে পারে না, কে ওর সেবা করবে? পুলিসের আইন এবং তার বিচার কিছু বুঝতে পারি না।

মলিনা সেই দিনই দারোগাবাবুকে বনমালীর কথা জানিয়েছিল।

বনমালী আসার সময় দারোগাবাবু বাড়ী ছিলেন না। মলিনার কাছে সমস্ত খবর শুনে এবং বনমালীকে দেখে তিনি যারপর নাই ক্রোধে অস্থির হয়ে পড়লেন। পরের দিনই লম্বা রিপোর্ট লিখে ওপর ওলাদের কাছে দরখাস্ত করলেন।

জবাব এল দশদিন পরে।—বনমালীকে কুষ্ঠাশ্রমে পাঠান হবে। এতদিন হাজতে থাকার সময় তার রোগের কথা সরকারের কাছে রিপোর্ট না করার জন্য যারা দায়ী তাদের প্রতিও জবাবদিহি চেয়ে পাঠান হয়েছে।

এই দশদিন বাধ্য হয়ে আমাকেই বনমালীর জন্য কিছু খাটতে হয়েছিল। আর কেহ লোকটার কাছে এগোত না, কাজেই আমি না গেলে চোখের সামনে বসে না খেতে পেয়েই সে মরে যেত।

মলিনা কেবল অনুযোগ করত এই ছোঁয়াছুঁয়ির ফলে আমি নিজে না রোগ করে বসি।

আমি বলতাম—কি করি বল, চুপ করে নিঃসাড়ে একটা মানুষের মরণ-চীৎকার শুনতে পারি না।

এর পরে মলিনা নিজেও সাহায্য করতে আসত। দারোগাবাবু কিন্তু জানতে পেরে তাকে এমন তিরস্কার করেছেন সে আমার কাছেও আর আসতে অবসর পায় নি পুরো একটী মাস।

তারপরে আর বাপকে ফাঁকি দিয়ে আসবার সময় করে নিতে তাকে বেগ পেতে হয় নি কোন দিন।

আমার দুবছরের মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছিলো।

মনের ভেতর কত রকম সংশয় জাগছে, দেশে গিয়ে কত পরিবর্ত্তনই না দেখব। বাসন্তী এবং রতনদার খবর পাই নি অনেকদিন। মিলনের খবরও জানি না। মা, বাড়ীর আর সকলে,—সবাই কেমন আছে কে জানে! হয়তো কাকেও জন্মের মত হারিয়েছি। রতনদা যখন নেই দেশের যেটুকু কাৰ সূচনা হয়েছিল আবার নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

মলিনাকে ছেড়ে যেতেও দুঃখ হয়।

এই দুইটী বছরের মধ্যে কারাগারে কষ্ট আমায় কিছুমাত্র সইতে হয় নি—শুধু মলিনার কল্যাণে।

আমার দৈনন্দিন জীবনের আর্দ্ধেকটা সে অধিকার করে বসেছিল।

মলিনা এসে ডাকল—খাঁচার পাখী, এবার তুমি ছাড়া পেয়েছ?

—ছাড়া পেলাম কই? আমাদের মুক্তি এবং বন্ধন একই কথা। 'উড়বার শকতি' নেই,—খাঁচা খুলে দিলেও সেই খাঁচাতে ফিরে বসতে সাধ হয়। খাঁচা ছেড়ে এ যেন মুক্তিরই আর এক কঠিন নিগড়ে বাঁধা পড়তে চলেছি। এখানে তবু নিরালা ঘরের কোনটীতে বসে জানালার বাহিরে তোমার কণ্ঠ সঙ্গীত শুনে বিভোর হয়ে থাকতাম। আজ হতে আবার আমার মরু যাত্রা আরম্ভ হবে—

আজ তারও চোখে জল দেখা দিল।

বললে—ছাড়া পাওয়াটাই সুখের নয় আমার জীবনেও তা বুঝেছি। মুক্তি আজ ভাল লাগে না। সমস্ত প্রাণ দিয়ে ধরা দিতে চাই নিজেকে।

হায় অভাগিনী—

বাঁধনের মোহ কি বোঝবার আগেই তুমি ছাড়া পেয়েছিলে। আজ যৌবন যখন জেগে তোমার মন সমুদ্রকে বিক্ষুব্ধ করতে চায়, কেমন করে তাকে রোধ করবে? প্রাণ যতদিন থাকবে বাঁধন খুঁজে ঘুরে মরবেই!

বনের পাখী 'ঘননীল আকাশ' ও 'মেঘ' ভুলে আপন মনেই কাঁদে।

সান্ত্বনার ভাষা জানি না!—

মরুভূমির তৃষ্ণা বুকে করেই আমি ফিরে চললাম।

—:০:—

হাফেজ

—শ্রীক্ষেত্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

২

পান-পাত্র পূর্ণ কর, হে বন্ধু আমার,
 বিলম্ব সহে না আজি আর!
সংসার দুর্ব্বার অতি;—ডুবাইতে হবে
 সুরা-স্রোতে যত দ্বন্দ্ব তার।

দাও পূর্ণ পেয়ালাটী তুলে মোর করে,
 শেষ হোক সকল বিলাপ।
চুম্বনে চুম্বনে হেন ঘুচাইয়া দেই
 জন্ম-জন্মগত অভিশাপ।

মধু মদিরার রসে মাতোয়ারা ব'লে
 নিন্দা করে সমস্ত সংসার;—
নিন্দা বল, যশ বল, জানে নাকো তারা
 কোন ধার ধারে না কাহার।

ঢাল, বন্ধু, সুরা ঢাল;—বল কত কাল—
 কত জন্ম—জন্মান্তর আর!
সহি মর্ম্মন্তুদ এই গরল-যন্ত্রনা
 নিদারুণ গর্ব্ব-বাসনার!

অনুক্ষণ নিশিদিন দুলিতেছে বুকে
 বিরহের যে অনল-ভার
নিঃশেষে জুড়ায়ে দিতে কামনার স্তুপ
 লেগে যাক্ শিখাটী তাহার!

মুর্ম্মুর-দহন সম যে প্রেম-বেদন
 সহিতেছি দিবা বিভাবরী
হায়, মোর কেহ নাই বলিব যাহারে
 দুটী হাতে গলাটীকে ধরি!

একদিন কিন্তু নাথ! হে আত্মা-রমণ!
 অধমেরে বুকে ধ'রেছিলে,
সুখী হ'য়েছিলে তাহে, স্নেহে অনুরাগে
 অন্তজনে সুখী ক'রেছিলে!

অনন্য-ভজন যেই আত্মহারা প্রেমে,
 বুঝিনা—বুঝিনা কেন, হায়,
ও করে সোহাগ পেয়ে ওই করাঘাতে
 উপেক্ষায় জনম গোঁয়ায়!

মাথা পাতি লহ, মন, শত বজ্রাঘাত
স্থখে দুখে হ'য়োনা কাতর ;—
অনুতাপ-অশ্রুনীরে ভিতিয়া নিষ্ঠুর
একদিন করিবে আদর।

৩

ওগো রাজরাজেশ্বর, দৌবারিক তব
ভিখারীরে দেয় যে তাড়ায়ে !
চির-বিরহীরে, নাথ, ওই বক্ষ' পরে
টেনে লও দুহাত বাড়ায়ে !
জানি না চাহ না কেন এ মুখের পানে
গলি' স্নেহে প্রেমে করুণায় !—
জগতের যত ভ্রম কেটে যায় যে গো
শ্রীমুখের বিদ্যুৎ-বিভায় !
শত-চন্দ্র-বিনিন্দিত বদন তোমার,
অতুলন শরীর-গঠন।—
দীর্ঘ-তীব্র তীক্ষ্ণ তব রূপ-পিপাসায়
হে দয়িত, ভরি' দাও মন !
জীবন গোঁয়াই বসি' পল গণি' গণি'
স্থখে দুখে আশা-আশঙ্কায় ;—
বল্লভ-আহ্বান-বার্ত্তা মরণের দূত
আনি দিবে একদা সন্ধ্যায়।
হে প্রিয়, ও নয়নের কটাক্ষ-কুহকে
নাচে মাথে নাচে রক্ত-ধারা ;
আকাঙ্খায় আকাঙ্খায় শিহরি' শিহরি'
ওগো মোর চিত্ত দিশেহারা !
দাও পান-পাত্রখানি তুলি' হে সুহৃৎ !
পূর্ণ করি' প্রেমের আস'বে,
বল', আজ শুভ-লগ্নে চির-জনমের
অভিলাষ পূর্ণ হবে—হবে।
ভাবি তাই, মন মোর জন্ম-জন্ম ধরি'
মৃতকল্প যার পিপাসায়,
কি করে সে, যদি আজ সেই প্রিয়তম
আঁখি-আগে আসিয়া দাঁড়ায় !

৪

অদম্য বাসনা কোথা সাধুতার তরে,
কোথা আমি, কোথায়—কোথায় ?—
হেরি এ পার্থক্য-সৃষ্টি আতঙ্কে বিস্ময়ে
মন-প্রাণ সদা শিহরায় !
কিন্তু, নাথ, সর্ব্ব-ত্যক্ত, রিক্ত যেই জন,—
কেহ নাই, কিছু নাই যার,
জগতের এই ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান সাথে
কি সম্বন্ধ—কি সম্বন্ধ তার ?—
ধার-করা কথা নিয়া বাঁধা প্রণালীতে
চীৎকারিয়া চাই, শুধু, চাই !
ভাসিয়া চোখের জলে নিভৃতে নীরবে
ব্যথা নিবেদিতে শিখি নাই !
শুষ্ক অনুষ্ঠান বহি ধর্ম্ম-দেউলেতে
ওগো মোর অসহ্য জীবন ;—
এড়ায়ে সকল সঙ্গ নিভৃতে একাকী
প্রেমরসে মগ্ন হও, মন !
যিনি প্রেম-দৃষ্টি-পাতে ঘুচান যন্ত্রনা
দিনরাত দাঁড়ায়ে শিয়রে,
ছুটিলে বিপথে ত্রস্তে ভ্রুকুটি হানিয়া
ফিরান গো আপনার ঘরে ;
হায়, হায়, অনুষ্ঠানে এমনি বিভোর,
শুষ্ক তিক্ত তাহাদের চাই
দয়িত-দুর্ল্লভ যিনি স্নেহে-প্রেমময়
পলে পলে তাঁহারে হারাই !
ওরে মন, মূঢ় মন, মায়াভ্রান্ত মন,
স্ব-প্রকাশ সূর্য্য ফেলি পাছে
ভজ যে প্রদীপ-শিখা কি দেখাবে তাহা ?
কতটুকু জ্যোতিঃ তার আছে ?

নীলকণ্ঠ

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

এক ঘণ্টা পরে সুরথ চোখ চাহিয়া দেখিল নীরজা তখনো তাহার মুখের পানে চাহিয়া নীরবে কাঁদিতেছে সুরথ উঠিয়া বসিয়া হাত দিয়া পরম যত্নে তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিল।

নীরজা বলিল "এই চার বৎসরের ইতিহাস আমায় বল।"

সুরথ বলিল "সেদিনকার যুদ্ধে আহত হয়েই মাঠের উপর পড়ে ছিলুম। পিছনের যারা সামনে এগিয়ে যাবার সময় আমাকে মৃত ভেবে আমারই বুকের উপর দিয়ে চলেছিল। আমি যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে চীৎকার করেছিলুম। সে ক্রন্দন কারও কানে পৌছেছিল কি না জানি না। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইলুম। কিন্তু এত সত্তেও প্রাণ বাহির হল না এইটাই আশ্চর্য্য। সময়ে চেতনা ফিরে পেয়ে, দেখলুম আমি মৃত মানুষের স্তূপের মাঝে পড়ে রয়েছি। জীবিত সেখানে কেউ কোথাও নেই। যুদ্ধ থেমে গিয়েছে। দুই একটা করে শকুনিরা উড়ে এসে বসেছে। বাতাস পর্য্যন্ত থমকে ছিল। স্তব্ধ হয়ে জগৎটাই বোধ হয় চলার গতি থামিয়ে আমাদের দিকে চেয়েছিল। যে দলই সেদিন জিতুক না কেন—বিজয় গৌরব আমাদেরই। যুদ্ধে যারা মরে তারাই সত্যি জিতে কাজ শেষ করে ছুটী নেয়। চেতনা ফিরে আসতে আমি তখন এই কথাই ভাবছিলুম। একবার মনে হল এ বোধ হয় আমার মৃত্যুর পরের অবস্থা। বোধ হল মৃত্যু হয় তো একটা অনন্তকাল ব্যাপী বিরামহীন ঘুম। আমি যেন এমনি ঘুমিয়েই স্বপ্ন দেখছি। ভাল করে চারিদিকটা চেয়ে দেখলুম শেষে একবার নিজের দিকে চাইলুম। বাঁ পাটা হাঁটু থেকে ভেঙে গিয়ে কোন রকমে দেহের সঙ্গে লেগে রয়েছে। বুকের পাঁজরাও বোধ হয় কিছু ভেঙেছে। অসহ্য ব্যথা বোধ হচ্ছিল। তার পরেও যে বাঁচব সে আশা ছিল না। বোধ হল আমার কাতরোক্তি শুনে কারা যেন এগিয়ে এসেছিল। বুঝতে পারিনি আমাকেই তারা নিয়ে যেতে এসেছে কি না। আমি যে মরিনি একথা তাদের জানাবার জন্য আর একবার চেঁচিয়ে উঠলুম। তারপর আমি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। আমাকে মাঠ থেকে নিয়ে আসবার কথা কিছু মনে পড়ে না। কতদিন এমনি করে কেটে গেল জানি না। যেদিন একটু সুস্থ হয়ে নিজের কথা আবার ভাবতে পেরেছিলুম—দেখলুম আমি এক হাসপাতালে পড়ে আছি। আমারই পাশে আমারই মত আরও কত দুর্ভাগা শুয়ে ছিল। আমার বাঁ পা কেটে দিয়েছিল। আর বুকের সমস্তটাই ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। হাসপাতালে দুতিন মাস থাকবার পর পর তারা আমায় বিদায় দিলে। একটা পা হারিয়ে আর তার পরিবর্ত্তে কাঠের এই লাঠিটা বদলি পেয়ে যুদ্ধের দেবতাকে সেলাম জানিয়ে বাঙালীর ছেলে ঘরে ফিরে আসবার উদ্যোগ করলুম।

বুকের পাঁজরা সম্পূর্ণ জোড়া লাগে নি। একটা হাড় এখনও মাঝে মাঝে খোঁচার মত ফুসফুসে গিয়ে লাগে আর আমি সে সময়টা আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ি। যাহোক সে কথা বলে হাসপাতালে ফিরে যেতে আমার ইচ্ছা ছিল না। আমার তখন কেবলি তোমার কথা মনে হচ্ছিল। কেমন করে এই দেহটাকে দেড় হাজার দুহাজার ক্রোশ পথ বহে তোমার কাছটীতে এনে ফেলব—সেই ভাবনা কেবল ভাবছিলুম। প্রায় তিনটে বছর আমার কেটে গিয়েছিল নিঃসম্বল অবস্থায় চাষীদের পাড়ায় পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করে। কখনো জ্বর হোত অজ্ঞান হয়ে পড়তুম। আবার যখনি ভাল থাকতুম—তাহাদের প্রতিদানে যতটুকু ক্ষমতা কাজ করে দিতুম।

হাতে পয়সা নেই কেমন করে দেশে ফিরব? নিজে কিছুই ঠিক করতে না পেরে একদিন সমুদ্রের দিকে হাঁটতে লাগলুম। একজন আমায় বলেছিল যদি কোনও পোর্টে গিয়ে পৌছতে পারি যুদ্ধে আহত সৈনিক বলে পাথেয়ের

কথা হয়ত ভাবতে হবে না। এ কথা আমিও জানতুম। কিন্তু এইটুকুই বা কেমন করে যাই? পঞ্চাশ মাইল পথ হেঁটে একদিন একটা রেলের ষ্টেশনে গেলুম। তারা বললে কথাটা সত্যি। সরকারে দরখাস্ত করে হুকুম নিয়ে এস। হুকুম আনতে আরও অনেক দিন গেল। সে কটাদিন একরকম অনাহারে অথবা যাত্রীদের দয়ায় যদি কিছু পেতুম মাত্র তাই খেয়ে কেটেছিল। সরকার কিছু টাকাও পাঠালেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য সেইখানেই শেষ হয় নি। বুকের ব্যথাটা আবার কিছুদিন খুব কষ্ট দিল। আর একটা হাসপাতাল খুঁজে নিতে হয়েছিল। সেখান থেকে সেরে উঠে ইটালির এক পোর্টে এলুম। বোম্বে পর্য্যন্ত আসতে আর বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। টাকাকড়ি যা সঙ্গে ছিল ইতি মধ্যেই কিছু খরচ হয়ে গিছল—আবার কিছু চোরের পেটে পড়ল। রিক্ত সম্বল হয়ে বোম্বে এসে আবার সরকারকে দরখাস্ত করলুম। এমনি করে আরও কিছুদিন দেরী হল। সরকার এবারে টাকা দিলেন না। লিখলেন 'তোমার আর কিছু প্রাপ্য আছে কিনা সে বিষয়ে খোঁজ নিচ্ছি। প্যাসেজের জন্য ফ্রিপাশ ছাড়া আর টাকা তুমি পাবে না। বোম্বে থেকে কলিকাতায় যাবার যে পাশ চুরি গেছে তার নকল আর একখানা পাঠালুম।' যাহোক তিনদিন পরে কোনও গতিকে কলিকাতায় এলুম। এখানে এসেও কালকের দিনটা তোমার কাছে পৌছতে পারি নি। তার কারণ তিন দিন না খাবার ফলে আমার আর কিছু শক্তি ছিল না। হাওড়ার ষ্টেশনেই অজ্ঞানের মত হয়ে পড়েছিলুম। কয়েকজন ভদ্রলোক আমাকে দয়া করে কিছু খেতে দিয়েছিলেন। তারপর খানিক ঘুমিয়ে রাত্রেই হাঁটতে আরম্ভ করি!"

সুরথের কথা শেষ হইলে নীরজা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "ভগবান্ তোমাকে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন এইটুকুই সান্ত্বনা।............"

তারপর কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করিয়া রহিল।

"গোপাল কোথায়?"

"তিনি দেশে ফিরে গিয়েছেন।"

"ওঃ—আর সুভাষ?"

"সে এক কারখানার কাজে ঢুকেছে।"

"এতদিন তোমাদের কিসে চলছে?"

"যতদিন সে কিম্বা আমি কাজ পায় নি—কোম্পানির কাগজ ভাঙিয়ে ছিলুম। গোপাল ঠাকুরপো কিছু কিছু সাহায্য করেছিলেন। শেষে আমরা আর তা নেওয়া দরকার মনে করি নি।"

"তুমি কাজ পেয়েছ? কি কাজ? তাই বুঝি সকালে যাচ্ছিলে—?"

"হাঁ,—আমি হাসপাতালে ধাইএর কাজ করছি—।"

"নার্স?......শেষকালে চাকরী করতে হল তোমাকে? ওঃ ভগবান! কেন আমার দুর্ম্মতি হয়েছিল! আমিই তোমার এ দুরবস্থার জন্য দায়ী।......নার্সের কাজ নিয়েছ? ......তা না নিয়েই বা খাবে কি?......না, নীরজা আর তুমি যেও না সেখানে। আমি অনেকদিনই হাসপাতালে কাটিয়েছি। এ বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা পেয়েছি। ও কাজ খুবই ভাল স্বীকার করি কিন্তু সেখানে চারিদিকে আগুন নিয়ে খেলা। তার মাঝে নিজেকে বাঁচিয়ে চলা কঠিন। নীরজা! সুভাষ যা পায় তাতেই এক রকম করে চালিয়ে দাও। না হয় এক বেলা খাব সকলে। তাই বলি তুমি সেখানে যেও না আর—।"

"বারণ কর যদি—যাব না!"

"কিন্তু—না গেলেই বা চলবে কি করে? তোমরা দুটীতে ছিলে তার ওপর এই অথর্ব্বের মত হয়ে ফিরে এলুম। ......চলবে কি করে?—"সুরথ ভাবিয়া কুল কিনারা পাইল না।

ফুসফুসের ব্যথা সুরথকে আবার কাবু করিয়াছিল। নীরজা বলিল "মনে হয় অস্ত্র করিয়ে দেখলে হয়ত ভাল হোতে পারে। আমাদের ডাক্তার সাহেবকে বলাতে তিনিও এ কথায় সায় দিলেন।"

সুরথ বলিল "না নীরজা। তার দরকার নেই। পাঁচ, ছবার এমনি ব্যথা আমার জেগেছে, এবারও আপনি সেরে যাবে। একটা মালিশ টালিশ দেয় যদি বল'।"

ডাক্তার, দেখিয়া নীরজাকে গোপনে বলিল "আমার সুবিধা মনে হচ্ছে না। একটু একটু করে ফুসফুসে লেগে

এখন সেখানে এক গর্ত্ত করে ফেলেছে। অস্ত্র করালে বোধ হয় আর বেশী দিন বাঁচানো যাবে না। তুমি মনকে দৃঢ় কর। সব ভগবানের হাত। কি করবে বল।"

নীরজা ব্যাকুল হইয়া বলিল "কিছুতেই বাঁচানো যায় না? ডাক্তার সাহেব। আমি আপনার মেয়ের মত। আপনাকে অনুরোধ কর্ছি।"

ডাক্তার বলিলেন "অস্থির হয়ো না মা। আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করব। ভগবানকে ডাকো। সারাবার মালিক তিনি।"

নীরজা আপনার নাওয়া ও খাওয়া ভুলিয়া স্বামীর সেবা করিতে লাগিল।

সুরথ এখন মাঝে মাঝে রক্ত বমন করিত। দু একদিন এমন হইত, ইন্‌জেকসন করিয়াও রক্ত থামে না। আবার দু' একদিন হয়তো ভাল থাকিত। নীরজা ভগবানকে ডাকে। ভাবে তিনি বুঝি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। তৃতীয় দিনের দিন আবার হয়ত রোগ বৃদ্ধি পাইল। এমনি করিয়া দু' মাস ভুগিবার পর সুরথ এবার আর ভাল হইল না।

নীরজা প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল। স্বামীর শেষজীবনে কয়েক দিনের জন্য সেবা করিবার অধিকার পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। সুরথ মারা যাবার আগে একদিন নীরজাকে বলিল "ভগবানে বিশ্বাস রেখো। তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ কর'। জীবন থাক বা না থাক ভাববার দরকার নেই। আর দেখো......আমি বারণ করে যাচ্ছি তুমি নার্সের কাজ ছেড়ে দিও। বরং মেয়ে স্কুলে মাষ্টারী দেখে নিও যদি নিতান্তই দরকার হয়। সুভাষ মানুষ হয়েছে—তাই বলছি —আর নিজের জন্য ভেব না।"

সুরথের মৃত্যুর পর নীরজা নার্সের কাজ একেবারে ছাড়িয়া দিল। গোপালের সাহায্য নেয় নাই। তার উপর অভিমান করিয়া সুভাষের দেওয়া অর্থও সে গ্রহণ করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়া ধাইএর কাজে ভর্ত্তী হইয়াছিল। স্বামীর বারণের জন্যও বটে, তাছাড়া তাঁর মৃত্যুতে নীরজার সকল উৎসাহ উদ্যম চলিয়া গিয়াছিল বলিয়া, সে কাজ ছাড়িয়া দিয়া সুভাষের সাহায্য লইতে বাধ্য হইল। কিন্তু মনে সে সন্তুষ্ট ছিল না। গোপালের দেওয়া অপমান সে আজও ভোলে নাই। স্বামীর মৃত্যুতেও সে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিল। ইহার পর কেমন যেন উদাস নৈরাশ্য আসিয়া তাহার মনকে অধিকার করিল। সে যে দিকেই চায় আজ যেন সর্ব্বত্রই দেখে শুধু দুঃখ যাতনা হাহাকার। নীরজা ভাবে ইহাদের মধ্যে থাকিলে পাগল হইয়া যাইবে। তার চেয়ে মুক্তি লইয়া পলায়ন করা ভাল। কেমন করিয়া যাইবে? কোথায় যাইবে? কোথায় গেলে শান্তি পাইবে? সে মুক্তি চায়! সে আর সহিতে পারে না। যেখানে গেলে, মান-অপমানের কথা ভুলিবে, দুঃখ যাতনার কথা ভুলিবে সেইখানে সে যেতে চায়। যেখানে গেলে গোপালের স্মৃতি আর তাহাকে ব্যথা দিবে না—স্বামীর মৃত্যু আর তাহাকে কষ্ট দিবে না—দরিদ্র দুঃখী ও রোগীর কথা ভাবিয়া ব্যাকুল হইবে না—সেইখানে যেতে চায় সে। কোথায় সে স্থান? নীরজা রাত্রিদিন কেবলি ভাবিতে লাগিল। সুভাষ তাহা দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই দিদিকে প্রবোধ দিতে পারিল না।

—তেইশ—

একদিন রাত্রে বাগান বাড়ীতে মজলিশ ভাঙিবার পর অভ্যাগতেরা প্রস্থান করিলে পঞ্চানন ডাক্তার গোপালকে বলিল "আজ আর বাড়ী যায় না। বিশেষ কথা আছে। অনেকদিন থেকে বলব বলে ভেবেছিলুম—"

"কি কথা?"

"আমি তোমার বাড়ীর ডাক্তার হিসেবে এই কবছর আছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমার পরামর্শ কখনো দরকার ভাব নি। কারও অসুখ করলে হাঁসপাতালের ডাক্তারদের ডাক দাও। আমি তোমার মাইনে যা পাই লোকে ভাবে সেটা ঠকিয়ে নিচ্ছি। কেন না—কাজ তো আর আমাকে করতে হয় না কিছু—!"

গোপাল তার কথার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তাতে কি হয়েছে? তুমি আমার বন্ধু! চাকর নও!"

"তুমি আমায় বন্ধু বলে স্বীকার কর সে আমার সৌভাগ্য। যদি বন্ধুর অধিকার দাও তবেই যা বলতে চাই বলতে পারি—!"

"বল !"

"দেখো, হিন্দুশাস্ত্রমতে ছেলে না হলে সপ্তপুরুষ নরকস্থ হয়। তুমি যদিও বিলাত গিয়েছ তবু এসব সংস্কার ভাল হোক মন্দ হোক স্বীকার কর একথা অনেক কাজে প্রমাণ পেয়েছি। তোমরা ভগবানের দোহাই দেবে। বলবে যত বিষয়েই মানুষ ভগবানের ব্যবস্থার উপর হাত দিতে পেরেছে এইখানটীতে তাকে হার স্বীকার করতে হয়েছে। যাদের চাল নেই, চুলো নেই, গরীব ভিখারী খেতে পায় না তাদের ঘরে ছেলে ধরে না। আর যারা টাকার বিছানায় শুয়ে রয়েছে—ভোগ করবার লোক খুঁজে পায় না চিরজীবন প্রতীক্ষা করেও একটী মাত্রও ছেলে পাওয়ার সৌভাগ্য তাদের হয় না। এ ব্যাপারে কি কিছুই করা যায় না? হাল ছাড়া উচিত নয়। আমি বলছি কি বুঝতে পারছ?...... হয় তোমার স্ত্রী বন্ধ্যা না হয় তুমি নিজে শক্তিহীন। অনেক সময় মেয়ের দোষেই সন্তান হয় না এই কথা লোকে বলে থাকে। এ কথা সবক্ষেত্রেই সত্য নয়। অনেক সময় স্ত্রী বন্ধ্যা না হলেও—পুরুষের শক্তিহীনতার জন্য—রাগ ক'র না মোটেই—বলছি যে—শাস্ত্রঅনুসারে—"

"চুপ কর পাঁচু! রেখে দাও তোমার শাস্ত্র! তুমি আমার সামনে যে কথা উচ্চারণ করলে—আমার ইচ্ছে তোমায় তপ্ত তেলের কড়ায় পুড়িয়ে মারি। এ কথার পুনর্ব্বার কখনো উল্লেখ করলে, আমার হাতে তুমি নিশ্চয় মরবে! সেদিন আর ক্ষমা করব না!—আমি মাতাল—স্বার্থপর—পাষণ্ড হলেও—এতটা নীচ হইনি—।"

সেদিন ব্যাপারটা এক মুহূর্ত্তে গোপালকে পঞ্চাননের প্রতি যার পর নাই বিরক্ত করিয়া তুলিল। তার মুখ পর্য্যন্ত দেখিতে গোপালের ঘৃণা বোধ হইতেছিল। গোপাল তাহাকে শ' দুই টাকা দিয়া বলিল "আমাদের এ গ্রাম ছেড়ে তুমি চলে যাও। আমার স্ত্রীর অবমাননা করেছ'। আমার নিজের আঁতে ঘা দিয়েছ—ভবিষ্যতে চোখের সামনে ফের পড়লে পৈতৃক প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না। যাও তুমি আমার সুমুখ থেকে—এই মুহূর্ত্তে—সকাল হলে আর না দেখতে পাই।"

পঞ্চানন টাকা পাইয়া গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে মোটেই অসন্তুষ্ট হয় নাই।

—চব্বিশ—

এক নবীন সন্ন্যাসী আসিয়া একদিন গোপালকে বলিলেন তিনি এমন ওষুধ দিতে পারেন যাহা ধারণ করিলে মালতীর ছেলে হবে।

গোপাল তাঁকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিল। স্বর বোধ হয় যেন পরিচিত। চেহারা দেখিয়াও তাহার সন্দেহ দৃঢ়তর হইতেছিল। কিন্তু মনে করিতে পারিল না কোথায় তাহাকে দেখিয়াছে। সন্ন্যাসীর গায়ের রঙ গৌরবর্ণ। লাবণ্য ও মাধুর্য্য যেন প্রত্যেক অঙ্গ সৌষ্টবে প্রকটিত হইয়াছিল। এক একবার মনে হইতেছিল—সে নারী, ছদ্মবেশে আসিয়াছে! কিন্তু কে সে? সন্ন্যাসীর মুণ্ডিত মস্তক, চন্দন চর্চ্চিত কপাল, গৈরিক বসন প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য করিয়া গোপাল মুগ্ধ হইয়াছিল। ভাবিল সত্যি হোক মিথ্যা হোক, ওষুধ যখন খেতে হবে না শুধু ধারণ করিলেই চলবে তখন আর এতে অনিষ্ট হবার আশঙ্কা কি থাকতে পারে?

সন্ন্যাসী আসিলে মালতী তাঁহাকে ভক্তি ভরে প্রণাম করিল। পা ধোবার জল ইত্যাদি যাহা দরকার নিজে হাতে করিয়া আনিয়া দিল। সন্ন্যাসী সন্তুষ্ট হইয়া তাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

রাত তখন সাতটা কি আটটা হবে।

মালতীদের বাড়ী, তাহারা স্বামী স্ত্রী ছাড়া আর কেহ গৃহস্থ লোক ছিল না। চাকর বাকরেরা যাহাতে কৌতুহল বশতঃ হউক অথবা অন্য কোনও দরকারে সন্ন্যাসী মন্ত্র পড়িবার সময় কাছে না আসে সেজন্য তিনি গোপালকে সাবধান হইতে বলিলেন। সন্ন্যাসী আসার সংবাদ তাহারা পাইয়াছিল কিন্তু মনিব বারণ করিবার পর আর সেদিকে মাড়ায় নাই। আপন আপন, কাজ সারা হইলে ছুটী পাইয়া তারা তাস খেলিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী অনেক রকমের মন্ত্র আওড়াইলেন, ধ্যান করিলেন, স্তব করিলেন। শেষে বলিলেন "মালতীকে একবার মায়াবিষ্ট করতে হবে।"

গোপালকে আপত্তি করিবার অবসর না দিয়া সন্ন্যাসী

বলিতে লাগিলেন "দেখ বাপু এই সম্মোহন বিদ্যা আমাদেরই তান্ত্রিকদের গুপ্ত ছিল। দু চারটে স্তোত্র বা প্রক্রিয়া পাশ্চাত্য জগৎ জানতে পেরে কতোনা রাজার সম্পত্তি পেয়েছে ভেবে আহ্লাদে আটখানা হয়েছে। অগাধ সমুদ্রের দুগণ্ডুষ মাত্র জল পান করে ভাবছে কি অমৃতই না পেয়েছে। আমরা যা জানি তার সিকির সিকিও যদি ওরা জানত তাহলেও বুঝতুম। তুমি কিছু মনে কর না। একটু সরে গিয়ে বসতে হবে। এই ঘরেই থেকো—তাতে আপত্তি নেই। তবে—সেই দোরটার কাছে গিয়ে বস! মালক্ষ্মীকে আমি প্রদক্ষিণ করে মন্ত্র পড়ব।"—

গোপাল সরিয়া বসিল। সন্ন্যাসী তখন যা বলিতে-ছিলেন যা যা করিতেছিলেন তার কিছুতেই গোপাল প্রতিবাদ করিতে পারিতেছিল না।

মালতীর কিন্তু সন্ন্যাসীর কথাটা ভাল লাগিল না। তার প্রাণে কেমন যেন একটু ভয় হইল। সন্ন্যাসীকে সে একটীবারের জন্য বিশেষ করিয়া দেখিল;—সন্দেহের বিশেষ কিছু কারণ পাইল না। সন্ন্যাসী বার চারেক মালতীর শয্যার চারিদিক পরিবেষ্টন করিয়া ঠিক সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর বলিলেন "মালতী! ঠিক আমার দুটি চোখের প্রতি চেয়ে থাকবে—একাগ্র হয়ে—তন্ময় হয়ে।"—

সন্ন্যাসীর এইরূপ আদেশে মালতী বিস্মিত হইল! তাঁর সকল কাজে ও ব্যবহারে এবার ক্রমেই সন্দেহ জাগিতেছিল। মালতী বিশ্বাস স্থির রাখিতে পারিল না। সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া এক মুহূর্তের জন্য চোখ উঁচু করিয়া নামাইয়া ফেলিল। সন্ন্যাসীর দৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়জিৎ পুরুষের তেজ কিছুই ছিল না। তিনি মৃদু হাসিতেছিলেন। এক মুহূর্ত দেখিয়াই মালতীর মন ঘৃণায় ভরিয়া গেল। সে চাহনিতে ছিল—উদ্দাম লালসা। মালতীর মনে হইল তিনি আসিয়াছেন শুধু অপমান করিতে। সহসা সন্ন্যাসীও অগ্রসর হইয়া তার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া তার আরক্তিম গণ্ডে তপ্ত চুমা আঁকিয়া দিলেন।

মালতী উন্মত্তের মত উঠিয়া দাঁড়াইয়া অগ্রপশ্চাৎ কিছুই না ভাবিয়া অন্য অস্ত্রের অভাবে হাতের এক গাছা বালা খুলিয়া সন্ন্যাসীর কপাল লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া মারিল। তাঁর কপালে আঘাত লাগিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। তিনি বসিয়া পড়িলেন।

গোপাল ছুটিয়া আসিল। বলিল "ভণ্ড! আজ শুধু এইটুকু রক্তপাতেই আমরা ক্ষান্ত হব না।" অতঃপর নিজেও তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া বলিলেন "গোপাল ঠাকুরপো! ক্ষান্ত হও! আমি কে—ভাল করে চেয়ে দেখো চিনতে পার কি না!"

সন্ন্যাসী মালতীর কাছে উঠিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন "তুমি আশ্চর্য্য হয়েছ বোন! আমায় তুমি চিনবে না! আমি ছদ্মবেশে এসেছি। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য খারাপ কিছু নেই—অন্ততঃ যতটা তুমি মনে করেছ!"

গোপাল বিস্মিত হইয়া সন্ন্যাসীর দিকে চাহিল।—নীরজা! গলার স্বর ত এতক্ষণ তাহাকেই মনে করাইয়া দিতেছিল। তবু সে চিনিতে পারে নাই। নীরজা সিন্দুর শোভিত দীর্ঘ কেশরাশি কাটিয়া ফেলার জন্যই বোধ হয় এতক্ষণ তাহার গোল দাঁড়াইয়াছিল। এতদিনের অদর্শনের পর নীরজাকে এই রকম বেশে দেখিয়া গোপাল আশ্চর্য্য হইয়াছিল। তার এই অদ্ভুত আবির্ভাবের হেতু সে বুঝিতে পারিতেছিল না। নীরজাকে গোপাল একটী দিনের জন্য ভোলে নাই। তার খবর পাবার জন্য গোপালের মন কেবলই ছটফট করিত। তবু সে আর কলিকাতায় যায় নাই অথবা তার খোঁজ লইবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করে নাই। তাহার আদেশ গোপাল বরাবরই মানিয়া আসিয়াছে।

নীরজা মালতীর দিকে চাহিয়া আর একবার হাসিয়া বলিল "আমি তোমার দিদি হই মালতী। গোপাল আমার ভাই!"

মালতীর কাছে সমস্তই রহস্য বলিয়া মনে হইতেছিল। কে এ নারী? এ রকম ছদ্মবেশে কেনই বা সে এসেছে? তাহার স্বামীকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিতেছে সে তো কই তাহার কথা কখনো শোনে নাই! তথাপি মালতী অম্লান চিত্তে তাহাকে আদর করিয়া কাছে ডাকিল ও না চিনিয়া আঘাত করিয়াছে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিল। নীরজা

বলিল 'না বোন! এ আমার উপযুক্ত হয়েছে। তোমার হাতের এই চিহ্নটী হয়ত চিরকাল আমার কপালে আঁকা থাকবে তার জন্য আমি মোটেই দুঃখিত নই। আমি সমস্ত মায়া কাটিয়ে দেশ ছেড়ে পালাবার সময়ও আমার ভাইটীর স্নেহ ভুলতে পারি নি। আমার সেই অন্যায়েরই এই শাস্তি!"

মালতী নীরজার কপালের রক্ত ধুইয়া ও মুছিয়া দিল।

গোপাল ভাবিতেছিল মালতী যদি জানিতে চায় তার কাছে নীরজার সম্বন্ধে কি পরিচয় দেবে? কেমন করিয়াই বা তাকে বিশ্বাস করিতে বলিবে যে নীরজা পর-স্ত্রী হইয়াও তাহাকে ভালবাসে আর শুধু তাই নয় এই ভালবাসাকে পবিত্র ও স্বর্গীয় ভাবিয়া গর্ব্ব অনুভব করে। মালতীর স্বভাব যে রকম তাতে সে স্বামী ছাড়া মেয়ে মানুষ যে আর কাকেও ভালবাসিতে পারে এ কথা বিশ্বাস করিবে না। নীরজার সম্বন্ধে সমস্ত শুনিয়া তার ঘৃণা হইবে। গোপাল নীরজাকে দেবীর মত ভক্তি করে তার এই ভক্তির সে কদর্থ করিবে। নীরজা তাহাদের মাঝে অকস্মাৎ এ রকম করিয়া উপস্থিত হইল? কেমন করিয়া তাকে অমর্য্যাদা ও কলঙ্কের হাত হইতে সে রক্ষা করিবে।

গোপাল নীরজাকে বলিল "আমি এটা কিছুতেই বুঝতে পারছি না বৌদি। তুমি আমায় ভুলতে চেয়েছিলে—তাই যাতে তোমার চিন্তার পথে ভুলেও না এসে পড়ি সেইজন্য। তোমার জন্য মন অস্থির হলেও একটীবারও খবর নিতে যাইনি। প্রার্থনা করতুম যেখানে থাক ভাল থেক'। আজ যদি কোনও বাধা না থাকে তোমার সব কথা খুলে বল। শুনতে আমার বড় কৌতুহল হচ্ছে!"

নীরজা বলিল 'সব বলব—যদিও তোমাদের কাছে ধরা পড়বার আগে পর্য্যন্ত আমার বলবার আদৌ ইচ্ছে ছিল না। আমাদের বুড়ো ঝি মারা গেছে। সুভাষ মানুষ হয়েছে। তার বিয়ে দিয়ে এসেছি। তার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েই আমি পালাব ভেবেছিলুম।.........স্বামী ফিরে এসেছিলেন। তাঁর শেষ জীবনে দু'দিনের জন্যও সেবা করতে পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি। কত চেষ্টা করলুম—কিন্তু তাঁকে বাঁচাতে পারলুম না।.........আমায় ধাত্রীর চাকরী করতে দেখে তিনি কুণ্ঠিত হয়ে বলেছিলেন ও কাজ যেন আমি ছেড়ে দিই। তাঁর আদেশ আমি অমান্য করি নি। তোমার সাহায্য নিই নি। সুভাষের রোজগারের অর্থ নিতে গেলে মনে পড়ত তুমি তারই মত আমার ভাই হয়েও আমাকে সাহায্য না করতে পেয়ে অভিমান করেছ। তার দেওয়া ভাত আমি মুখে দেব কোন্ লজ্জায়? নিজে চাকরী ছেড়ে দিয়েছি। ভাবনা এল পেট চলবে কি করে? স্বামীর কথা মনে পড়ল জীব দিয়েছেন যিনি আহারও তিনিই দিবেন। আমরা ভেবে কি করতে পারি? দু'দিন পাঁচ দিন নিয়ত ভেবে ঠিক করলুম পাহাড়ে কিম্বা জঙ্গলে গিয়ে বাস করব। সেখানে বনের ফল আর ঝরণার জল খেয়ে দিন কাটাব। তাছাড়া জগতের প্রতি কেমন একটা বিতৃষ্ণা এসেছে। সবার কাছ থেকে পালাবার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছি। সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়লুম। তোমাকে আমি ভোলাবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলুম। তোমার দেওয়া অপমানে আমি ঘৃণায় তোমাকে মন থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছিলুম। আবার আমি তোমায় লাঞ্ছনা দিয়েছি সে ব্যথাটুকুও নিরন্তর কষ্ট দিত। কিন্তু আজ যাবার দিনে সব ক্ষমা করে যাব। আমি মান অপমান ঘৃণা লজ্জা দুঃখ লাঞ্ছনা সমস্ত ভোলাবার জন্য যে দেশে চলেছি সেখানে যেন শান্তি পাই। মনে হল বেদনা বুকে করে নিয়ে গেলে শান্তি পাওয়া ত সম্ভব নয়। তাই সমস্ত ভুলে তোমাকে লুকিয়ে ক্ষমা করে তোমার মুখে হাসি দেখে চলে যাব বলে এসেছিলুম। তুমি ভাল আছ দেখে লুকিয়ে চলে যাব অথচ পরিচয় জানতে দেব না! আজ এসেই পথে লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করে তোমার জীবনের অনেক ঘটনা ও তোমার মনের দুর্ব্বলতার কথা জানতে পেরে একটু রঙ্গ দেখবার ইচ্ছা হয়েছিল। মালতী কেমন পরশ পাথর কেমন করে সে তোমার বিদ্রোহী মনকে ধীরে ধীরে বশ করে এনেছে সেটাও দেখতে চেয়েছিলুম। ভাল করে দেখবার পর বিদায় নেব ভেবেছিলুম। কিন্তু মন সরছিল না। মালতীর কমনীয় মুখখানি দেখে কে যে ভাল বাসতে না পারে জানি না। মেয়ে মানুষ হলেও তার দিকে চাইতেই আমার চোখ দুটী আপনি বশীভূত হয়ে গেল। তখন একটী মুহূর্ত্তে আমার আসবার উদ্দেশ্য ভুলে গেলুম।

ভুলে গেলুম আমি পুরুষের ছদ্মবেশে এসেছি। ভুলে গেলুম আমি সম্মোহন বিদ্যার মায়ায় তোমাদের বশ করতে চেষ্টা করছি। শুধু মনে হোল আমারি সামনে এমনি এক দেবী শুয়েছিলেন যাঁর সামনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভালবেসে চরণে লুটিয়ে পড়ে। আমিও তাঁকে ভালবাসলুম। বিদায়ের সময় তাকে আলিঙ্গন করে তাঁর রাঙা অধরে চুম্বন করব ভাবলুম। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁরই হাতে আহত হয়ে চমক ভাঙল।......"

মালতী নীরজাকে বলিল "তুমি সংসার থেকে পালাতে চাইছ দিদি কিন্তু আমি যেতে দেব না। তুমি আমার কাছে থাকবে।" পরে গোপালের দিকে চাহিয়া সে বলিল "তুমি আমার হয়ে অনুরোধ কর থাকবার জন্য। কি বল করবেনা ?"

গোপাল নির্ব্বাক হইয়া নীরজার কাহিনী এতক্ষণ শুনিতেছিল। সে জানিত তাকে নীরজা ভাল বাসে। অথচ স্বামীর প্রতি তার ভাল বাসাও কম নয়! কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইতে পারে! নীরজা যে তাকে মিথ্যা স্তোক দিয়াছিল তা বিশ্বাস হয় না। তবে! এ কি অদ্ভুত নারী সে! মালতীর হৃদয়ও সে একটা চাহনিতে জয় করিয়াছে। তার ভালবাসা অমর অক্ষয় অনন্ত ও স্বর্গীয়। ভালবাসাই তার স্বভাব। তার এই ভালবাসা স্থান কাল কিছু মানে না। সারা জগৎকে ভালবাসা দিয়া বুকের মধ্যে আলিঙ্গনে বাঁধিতে চায়। তাই যদি হয়—সে জগৎকে ভুলিবার জন্য সব ছাড়িয়া যাইতেছে ইহারই বা অর্থ কি ?

মালতীর কথার উত্তরে গোপাল নীরজার দিকে অনুনয় পূর্ণ নয়নে চাহিয়া রহিল মুখের ভাষায় কিছু বলিল না। কারণ সে জানিত নীরজা যা ভাবে তার অন্যথা করে না।

নীরজা বলিল থাকবার হলে থাকতুম দিদি! তোমার মত বোনের ভালবাসা পেয়ে এখানে বাস করতে আমার আপত্তি থাকতে পারে না। তবে যাচ্ছি এই জন্যে—ভগবানকে কখনো ভাবি নি। কি তাঁর স্বরূপ জানি না। প্রতি কথায় আমরা যে বলি তাঁর ওপর নির্ভর করে থাকলে কোন বিপদ আসতে পারে না রক্ষা করবার এই শক্তিটুকু তাঁর আছে কিনা একবার যাচাই করে দেখব।......তাছাড়া মানুষকে ভালবেসে আর তার ভালবাসা কুড়িয়ে দিন কাটানতে তত আমোদ পাই না। মানুষ মানুষকে চেনে না। কেউ কারও মনের হিসেব রাখে না। শুধু বাইরেটা দেখেই বিচার করতে চায়। ভালবাসার কদর তারা বোঝে না। তারা যুদ্ধ কোরে শত্রু বাড়ায় শুধু। ভালবেসে বিশ্বকে আপনার করতে জানে না। যাঁর সৃষ্টি এই অদ্ভুত মানুষ জাতটা—তাঁকে একবার খুঁজে দেখতে চাই। মানুষের ভালবাসা তাঁকে দিয়ে দেখব তিনি কি চান। তিনিও কি মানুষের মতই শুধু বাহিরের হিসাব-টাকেই বড় করে দেখেন কিম্বা মনের ছবি তাঁর অগোচর থাকে না.........আর গোপাল! তোমাকে আজ আমার ভাই ভেবে যথার্থই আপনার করে নিতে পেরেছি বলে শুধু নাম ধরেই তোমায় সম্বোধন করছি। তোমাকেও বলছি—আমার ইচ্ছায় বাধা দিও না। আমার স্বামীর আদেশ আমি পেয়েছি। তাঁর প্রদর্শিত পথের সন্ধান পেয়ে আর ঘরে বসে থাকতে পারছিনা। তোমাদের লুকিয়ে দেখে যাব এই দুর্ব্বলতাটুকু ছিল বলেই ধরা পড়ে গিয়েছি। তোমাদের এবং শুভাষের বাঁধন ছিঁড়তে মনে কষ্ট খুবই হচ্ছে। কিন্তু না ছেড়ে উপায় নেই। জানি না কবে কোন মুহূর্ত্তে জগৎ ছেড়ে যাবার ডাক আসবে।—আজ যদি তোমাদের স্নেহের বাঁধন ছিঁড়তে না পারি—সে দিনের গতি কি হবে ?"

মালতী অনেক কাঁদাকাটি করিল। শেষে যখন বুঝিল নীরজার যাবার জন্য একান্তই ইচ্ছা আর বাধা দিল না।

গোপাল নীরজাকে প্রণাম করিল। নীরজা তাড়াতাড়ি সরিয়া গিয়া তাহাকে বাধাদিয়া বলিল "এ কি করলে তুমি ?"

গোপাল বলিল "আমার মনের গ্লানিমা সব দূর হয়ে গেছে দিদি! আমার সমস্ত ভুল মিটে গেছে। তুমি দেবতার চেয়ে মহৎ। তোমার অনন্ত উদার মনের স্বরূপ না বুঝে জয় করতে চেয়েছিলুম—এমনি স্পর্দ্ধা হয়েছিল। তুমি আমায় ক্ষমা কর। আমার সমস্ত অপরাধ ভুলে যেও।"

নীরজা বলিল "পাগল হয়েছ ভাই? তোমাদের দুজন-কার কাছেই আমি যে সম্পূর্ণ বাঁধা পড়েছি। তাইতেই তোমাদের কাছ থেকে পালাবার জন্য এত ব্যগ্র হয়েছি।...

আর তোমাকে, একটা অনুরোধ করব। সুভাষের খবর মাঝে মাঝে নিও আমি চলে যেতে সে হয়ত কাতর হয়ে পড়বে! .....”

গোপাল বলিল “নেব বৈকি দিদি!”

মালতী বলিল “তুমি অন্ততঃ দুটো দিন আমাদের কাছে থাকো দিদি!”

নীরজা বলিল “না ভাই! সে অনুরোধ কোর না। তোমাকে যত বেশী দেখছি—যেতে আর মন সরছে না। আমাকে আজ রাত্রের মধ্যে—এই অন্ধকারেই পথ খুঁজে বেরিয়ে পড়তে হবে। কেঁদনা তুমি লক্ষ্মীটী। আমি আজ তোমাদের কাছে এক মিথ্যার অভিনয় করেছি। ভগবান করুন আমার এই ছল করা আশীর্ব্বাদ সত্য হোক। তোমাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হোক। তুমি সুন্দর ও সচ্চরিত্র পুত্রের মা হও। আমি যদি বেঁচে থাকি—কথা দিচ্ছি—খোকা হলে এসে দেখে যাব।”

নীরজা যেমন সহসা আসিয়াছিল—তেমনি সেই অন্ধকারের মাঝে লুকাইয়া পড়িল। গোপাল স্তব্ধ হইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। মালতী নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

—পঁচিশ—

নীরজা চলিয়া যাইবার পর থেকে গোপালের স্বভাব সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল। ডাক্তার পঞ্চানন ত আগেই বিদায় নিয়াছিল; এখন একে একে অপর বন্ধুরাও সেই একই পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইল। গোপাল মদ ছাড়িল। বাগান বাড়ীতে যাওয়া বন্ধ করিল। মালতী এতদিন তিরস্কার ও অভিমানে যা করতে পারে নাই। নীরজার একটা দিনের আসা ও চলে যাওয়াতে সেই পরিবর্ত্তন ঘটিল।

একদিন মালতীকে সে নিজে হতেই বলিল “তোমার বাবার খবর অনেকদিন পাওনিতো। চলোনা দিন কতক বেড়িয়ে আসি।”

মালতী একথায় অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া সম্মতি জানাইল। বাবা ও সুলতাদের কিছুমাত্রও খবর সে না পাইয়া যার পর নাই ব্যাকুল ছিল। স্বামী নিজে প্রস্তাব করিতেই সে সানন্দে জিনিষপত্র গুছাইয়া বাঁধিতে লাগিল। ও মনে মনে ঠিক করিয়া লইল তাহার পিতাকে যদি সুস্থ দেখিতে পায় ত অভিমান করিয়া তাঁহাকে সাধ্যমত কাঁদাইবে। আর সুলতার সহিত দেখা হইলে বলিবে,—ছেলেবেলাকার বন্ধুত্ব ও ভালবাসা অস্বীকার করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া যে থাকিতে পারে তাহার মত পাষাণী আর কেহ নাই।

সম্পত্তির উত্তরাধিকারের জন্য গোপাল যে এতদিন পুত্র কামনা করিত সে ভাব আর নাই। মালতীর মতই পুত্রের প্রকৃত অভাব সে এখন প্রাণ দিয়া অনুভব করে। গোপালের পিতা গোপালের জন্য কি কষ্টই না সহিয়াছেন মনে করিয়া অনুতাপে—তার হৃদয় দগ্ধ হয়। একদিন ভাবিল সুন্দর দেখিয়া অপর কারও ছেলে কাছে আনিয়া পালন করিবে। আবার মনে করে, পিতার মনে ব্যথা দিয়াছিল এ হয়তো সেই পাপরই শাস্তি। পাপ যখন করিয়াছে শাস্তি মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। মালতীর ব্যথিত মুখের পানে চায়—তখন কিন্তু আবার মন ব্যাকুল হইয়া ওঠে! ভাল ঘরের পরের ছেলে পাবেই বা কোথা থেকে? সেও এক ভাবনা। আর ছোট ঘরের ছেলে পুলে মালতী হয়ত রাজী হইবে না। তখন আর এক মতলব মনে জাগিল। পরের ছেলে আনিয়া নিজের বলে কাছে রাখিবে! পাড়াপ্রতিবেশী দেশ ও সমাজকে ভ্রূক্ষেপ করিয়া বলিবে সে তাহারই ছেলে! মালতীকে পর্য্যন্ত স্বীকার করাইবে প্রকাশ করতে দিবে না!—সে বিন্দুমাত্র আপত্তি করিতে পারিবে না! নিজের ছেলে নয় জানিয়াও সে মুখে অস্বীকার করিবে না! তার উপর ব্যাপারটাকে যদিই গোপন রাখিতে পারে—সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধেও কোন গোল দাঁড়াবেনা! মালতীকে মতলবের কিছু জানাইল না। প্রতিবেশীদের কাছে প্রকাশ করাইয়া দিল সত্যই একজন মহাপুরুষ আসিয়াছিলেন, তিনি মন্ত্র পড়িয়া ঔষধ দিয়া বলিয়াছেন রাজচক্রবর্ত্তী ছেলে হবে। পাড়ার মেয়ে মহলে সংবাদটা রঙচঙ লইয়া চারিদিকে প্রচার হইয়া গেল।

মালতী যাহাতে এই আলোচনার কিছু না জানিতে পারে সেই জন্যই সতর্ক হইবার জন্য গোপাল ভাবিয়াছিল, বৎসর খানেকের জন্য এদেশ সেদেশ ঘুরিয়া বেড়াইবে তাহার পর মতলব মত কাজ করিবে।

কাশীতে আসিয়া মালতী তাহার দিদি ও পিতার সম্বন্ধে যাহা দেখিল বা শুনিল তাহাতে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

মালতীর পিতার নাম শ্রীনাথ। বিধবা মেয়ে রতিকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার দিন কাটিতেছিল।

রতি কাশীর মত জায়গায় অত প্রলোভনের মাঝখানে নিজেকে সামলাইতে পারে নাই। তাহার হাব ভাব দেখিয়া পিতার যথেষ্ট সন্দেহ হইত। কিন্তু তিনি কিছু বলিতেন না। প্রথম কারণ তাঁহার নিজের তো কিছু রোজগার ছিল না। অন্নসত্রে মেয়েকে দিয়া রাঁধাইয়া খোরাক যোগাইতেন। রাজীব বলিয়া একটী ছেলে যখন আপনি দয়া পরবশ হইয়া শ্রীনাথকে বলিল তাঁর কোন ভাবনা নেই, সে তাঁহাদের অন্নের সংস্থান করিয়া দিবে; এবং রতির কোথাও দাসী বৃত্তি করিতে হইবে না তখন তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে অনুমতি দিলেন। আর দ্বিতীয় কারণ শ্রীনাথের নিজের ইহাতে স্বার্থ ছিল। রাজীবের সহিত দশাশ্বমেধ ঘাটের ধারে বেড়াইবার সময় একদিন একটী কিশোরী মেয়েকে তার মায়ের হাত ধরিয়া স্নান করিয়া ফিরিতে দেখিয়া শ্রীনাথ চঞ্চল হইয়াছিলেন। রাজীব কৌশল করিয়া মেয়েটীর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জানিল তার নাম প্রতিভা। বর্দ্ধমান অঞ্চলে তাহাদের বাড়ী। একটী বৃদ্ধ—তিনি প্রতিভার সম্পর্কে ঠাকুরদাদা হন—এবং বিধবা মায়ের সঙ্গে সে কাশী দেখিতে আসিয়াছিল। কাশীতেই রাজীব শ্রীনাথের জন্য ঘটকালীতে লাগিয়া গেল। প্রতিভার মা অত্যন্ত গরীব। শ্রীনাথ যদিও দোজবরে—তাঁহার বয়স চল্লিশ পার হয় নাই—তাছাড়া ছেলে নাই! দুটী মেয়ে—একটী শ্বশুর ঘরে আছে এবং আর একটী বিধবা। কুল ও শীল খুব ভাল। দেশে জমিদারী আছে। ইত্যাদি নানান কথা বলিয়া রাজীব প্রতিভার মায়ের মত করাইয়াছিল। তাঁহার টাকাকড়ি দিবার মত অবস্থা ছিল না! যেখানে হোক মেয়ে সুখে থাকিলেই হইল। তাঁহারা বর্দ্ধমানে ফিরিয়া গেলে একদিন শুভক্ষণ দেখিয়া শ্রীনাথ দু চারজন বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে লইয়া বর বেশে বিবাহ করিতে চলিলেন। রাজীবের হঠাৎ জ্বর হওয়ায় সে যাইতে পারিল না বলিয়া অনেক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল।

বিবাহ করিতে গিয়া সেখানে সেইদিন দুপুরবেলা কিন্তু এক ফ্যাসাদ বাঁধিল। শ্রীনাথ জানিতেন না—প্রতিভার এক ভাই আছে, সে নাকি বিধবা বিবাহ করিয়াছে! শুনিয়াই তো তাঁর বিষম ক্রোধ হইল। তিনি তখনই ফিরিবার মতলব করিলেন। প্রতিভা মনে মনে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, কিন্তু তার মা সারদা নিশ্চিন্ত হইলেন না। সেই রাত্রে যেখানে হোক মেয়েটীর বিবাহ দিতে না পারিলে জাত যাবার সম্ভাবনা। পাড়াতে স্বঘর কোনও ছেলে রাজী হইল না। সারদা প্রমাদ গণিলেন।

প্রতিভার ভাই নলিনকে কোন খবর পাঠান হয় নাই। কিন্তু সে দিন বিকালে পাড়ার এক শুভানুধ্যায়ী বৃদ্ধের নিকট হইতে এক 'তার'-যোগে প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিয়াছিল। মায়ের নিষেধ থাকিলেও সে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। আপনার অবিবাহিত বন্ধুদের মধ্যে প্রথমেই সুভাষের কথা মনে হইল। সুভাষের ভগিনীপতি সুরথের সহিত নলিনের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল। সেই সূত্রে সুভাষকে চিনিত। তাহা ছাড়া সুভাষের সরল ও সহৃদয় মনের পরিচয় সে অন্যত্রও পাইয়াছে। সুরথ তখন সবে মারা গিয়াছিল। এই জন্য সুভাষের মনের অবস্থা ভাল ছিল না। তথাপি কর্ত্তব্য ও বিবেকের কথা সে অবহেলা করিল না। দিদির অনুমতি লইয়া সুভাষ সম্মতি জানাইল। মেলে করিয়া একঘণ্টার মধ্যে তাহারা বর্দ্ধমানে পৌঁছাইল। নলিন নিজে ষ্টেশনে 'বসিবার ঘরে' থাকিয়া সেখান হইতেই সমস্ত যোগাড় করিতে লাগিল। সুভাষকে জামাতারূপে পাইয়া সারদা যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

শ্রীনাথ তখনি কাশী ফিরিবেন মতলব করিয়াও আসিতে পারেন নাই। ব্যাপার কতদূর দাঁড়ায় জানিবার জন্য নিকটেই রাত্রি পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যখন দেখিলেন তাঁর অভিশাপের উপযুক্ত ফল কিছুই ফলিল না, হতাশ হইয়া কাশী ফিরিলেন।

শ্রীনাথ বাড়ী আসিয়া দেখেন রতি বাড়ীতে নাই। রাজীবেরও অসুখের কথা মিথ্যা। তাহারা দুইজনে নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীনাথ মাথায় হাত দিয়া বসিলেন।

সেই থেকে সত্রে খাইয়া ও ভিক্ষা করিয়া তাঁহার দিন

চলে। নিজের ফের বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল বলিয়া যথেষ্ট অনুতপ্ত হইয়াছেন। রাজীবের দয়া করিবার প্রবৃত্তির অন্তরালে তার স্বার্থের হিসাব আগে চোখে পড়ে নাই বলিয়া আপনাকে যথেষ্ঠ তিরস্কার করিলেন। রতির এই পরিণামের পর মালতীকে আর কোনও চিঠি লেখেন নাই তার কারণ লজ্জা ও অনুতাপে তিনি কাহাকেও কিছু জানাতে চান নাই।

মালতী পিতার কাছে সমস্ত শুনিল। তাঁহাকে অনুতপ্ত দেখিয়া আর রাগ করিতে পারিল না। এবার থেকে তাঁহাকে মাসে মাসে টাকা পাঠাইবে স্বীকার করিল। শ্রীনাথ মেয়ে জামাইএর কাছে ক্ষমা ও মাসিক সাহায্য পাইয়া আনন্দিত হইলেন।

মালতী সুলতার কোন খবর পাইল না।

মাস দুই তিন কাশীতে থাকিবার পর একদিন মালতী দেখিল, এক অনাথা ভিখারিণী শতচ্ছিন্ন কাপড় পরিয়া তাহার দেহের রোগজীর্ণ কঙ্কালবৎ দেহ কোন রকমে আবৃত করিয়া তাহাদের ঘরের ভিতরে আসিল। মালতী বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিল—রতি! কলঙ্কিনী এই ক'মাসের মধ্যেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মালতীর পিতা উন্মদের মত ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে গলা ধরিয়া বিতাড়িত করিতেছিলেন।—রতি কাতর কণ্ঠে বলিল "বাবা! আমি মরে যাচ্ছি তোমার বুকে কি এতটুকু স্নেহ অবশিষ্ট নেই যে আমার শেষের দিন কটাতে পাপপুণ্যের কথা ভুলে মেয়েকে কোলে টেনে নাও! পাপের শাস্তি ভগবান দিতেছেন! তুমিও কি তাঁরই মত নিষ্ঠুর?"

শ্রীনাথ বলিলেন "দুর হ রাক্ষসী! আমি তোকে খুন করব! বেরিয়ে যা এখনি!..... ...."

মালতীর দিকে কুণ্ঠিত হইয়া রতি বলিল "তুমিও কি আমায় এতটুকু আশ্রয় দেবে না মালতী? আমি ভুল করেছি—তার শাস্তি—ভগবানের দয়া ও আশ্রয় হারিয়েছি! কিন্তু তাঁর রাজ্যে কোথাও এতটুকু স্থান কি আমার নেই? তোমরা যদি মানুষ হয়ে মানুষের দয়া মায়া স্নেহ অনুকম্পার অধিকারী হয়েও নিষ্ঠুর দেবতার মত বিচার করতে এস—আমি যাব কোথায়? বিশ্বনাথ তাঁর বুকে সকল পাপীরই স্থান ঠিক করে রেখেছেন—! অনুতপ্ত হলে সবাই শান্তি পায়—! আমি কেন পাব না? তোমরা কি বলতে চাও গঙ্গার জলে ডুবে মরে যাব সেই আমার একমাত্র পথ?"

মালতী শ্রীনাথের দিকে চাহিল। বলিল "বাবা! পিতা যদি সন্তানকে তার সকল অপরাধ ক্ষমা করে কাছে টেনে না নিতে পারে—তাহলে আর কেউ পারবে না! জগতের পিতার সামনে গিয়ে আমরা যখন দাঁড়াব আমাদের জীবনের সব অন্যায় ও দোষের কথা তিনি জেনে মুখ ফিরিয়ে নেবেন—তাঁর দয়াও আমরা পাব না। এ কথা সত্যি বলে ভাবতে পারি না! ছেলেরা দোষ করবেই! আর কেউ না পারুক মা বাপকে তা সইতে হবে। না হলে সৃষ্টি রসাতলে যাবে। ক্ষমা দয়া ও অনুকম্পার কথা পৃথিবী থেকে লোপ পাবে! জগৎ-পিতার দয়া না পেয়ে আমরা সবাই হাহাকার করে বেড়াব! স্বর্গ মর্ত্ত্য ও নরক—কোথাও কিছু থাকবে না—শুধু তীব্র হাহাকার কেঁদে মরবে। তা' হয় না বাবা! দিদি ফিরে এসেছে—তুমি তাকে স্নেহ দিয়ে কাছে ডাক!"

মালতীর উদার সহৃদয়তায় শ্রীনাথের মন ভিজিল।

রতি তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া বিশ্বনাথের সেবা করিয়া আবার সুখী হইল।

মালতী ও গোপাল আরও কিছুদিন সেখানে থাকিয়া অন্যান্য তীর্থে বেড়াইতে গেল।

—ছাব্বিশ—

সুলতা হয়তো ভাবিয়াছিল এতদিনে সে অদৃষ্টকে ফাঁকি দিয়া সুখী হইয়াছে। তাহার ভাগ্য-বিধাতা অদৃশ্য থাকিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন "না—সুলতা—না! যা ভাবিতেছে—তা চিরকাল থাকিবে না। তুমি আপনাকে আনন্দময়ীর সন্তান ভাবিয়া আমার প্রতি ভ্রুকুটী করিয়াছিলে আমি তোমাকে কাঁদাইব। তোমার চোখের জলে নদী বহে যাবে। তোমার কাতর ক্রন্দনে পাথর গলিবে তবু তোমাকে বিচলিত করিবে না। আমি দেখিতে চাই আনন্দময়ী মা কেমন করিয়া তোমাকে রক্ষা করেন। আমি দেখিব এত দুঃখে পড়িয়াও কেমন করিয়া তুমি আনন্দ কর!"

অদৃষ্ট নূতন করিয়া ফাঁদ পাতিলেন।

নলিন ও সুলতা তাহাদের ভাবী সন্তানের আগমন সম্ভাবনায় আপনাদের ক্ষুদ্র গৃহটীকে যতদূর সাধ্য সাজাইয়াছিল। নলিন তাহার ডাক্তারী অভিজ্ঞতায় প্রসূতির জন্য পাঁচ ছ' মাস আগে হইতে যতদূর যত্ন লওয়া দরকার ত্রুটী করিল না। সুলতাকে কোনরূপ পরিশ্রমের কাজ করিতে দিত না। বাড়ীতে অপরিষ্কার কিছু যাহাতে না থাকে লক্ষ্য রাখিত। নিজে যতটুকু অবসর পাইত ভাল ভাল বই আনিয়া সুলতার কাছে বসিয়া পড়িত অথবা গল্প করিত। এইরূপে আপনার অফুরন্ত ভালবাসা দিয়া সুলতার মন যাহাতে ভাল থাকে সেইজন্য সচেষ্ট হইত।

সুভাষ ও প্রতিভা মাঝে মাঝে প্রায়ই বেড়াইতে আসিত। এইরূপে পরম শান্তিতে দিন কাটিতেছিল।

একদিন সুলতা শুনিতে পাইল, তাহার স্বামী উগ্র হইয়া পাশের ঘরে কাহাকে যেন বলিতেছেন "বেরিয়ে যাও! আমার সামনে থেকে বেরিয়ে যাও! আমার বাড়ীতে ঢুকে আমাকে অপমান করবার তোমার কোন অধিকার নেই।"

অপর একজন প্রতিবাদ করিয়া বলিল 'দেখ নলিন! আমি তোর ভালর জন্যই বলছি। বেটা ছেলে—একটা না হয় দোষ করে ফেলেছিস। তা আমরা পাড়ার লোক সকলকে বুঝিয়ে একটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে শুধরে দেব। মাকে ভুলে আমাদের ভুলে দেশ ছেড়ে এ রকম করে তোর থাকা ভাল দেখায় না! তোর বাপ আমাকে মান্য করে চলতো। হরিনাথ দা বলতে তিনি অজ্ঞান ছিলেন। আজ একবার কালীঘাটে যাচ্ছিলুম—ভাবলুম চোখের সামনে তুই বয়ে যাবি—এটা কেমন করে সই বল? একটা প্রায়শ্চিত্ত কর্! সব দোষ কেটে যাবে। শুনেছি ত ব্রাহ্ম কিম্বা খৃষ্টান হস নি। সত্যি বিয়েও করিস নি। ভাল করেছিস। ও সব হলে জাতে ফিরে আসা শক্ত হত। একটু ভেবে দেখ। তুই ঘরে নিলেও সত্যি ছুঁড়িটা বেশ্যা বইতো আর কিছু নয়। তার ছেলে হলে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্ম—কোন সমাজেই তার স্থান নেই। ছিঃ ছিঃ ঘেন্নার কথা। আইনেও সে তোর ছেলে বলে ধার্য্য হবে না। তোর বিষয় আশয় কিছু থাকলে সে তার অধিকারী হবে না। তাই বলছি—"

সুলতা শব্দ শুনিয়া বুঝিল তাহার স্বামী অধীর হইয়া লোকটাকে গলাধঃকরণ দিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

সুলতা ভাবিতে লাগিল—কোন সমাজের প্রচলিত অনুষ্ঠান অনুসারে তাহাদের বিবাহ হয় নাই, সুতরাং লোকের চক্ষে সে পতিতা ভিন্ন আর কিছু নয়। তাহার সন্তান আইনের চোখেও হেয় হইবে। কোন ন্যায্য অধিকার তার থাকিবে না। সে আপনার মনকে এতদিন বুঝাইয়াছে, হিন্দুসমাজ তাহাদের না চায় আরও বড় একটা সমাজ আছে সে তাহাদের অস্বীকার করিবে না। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে সে কিম্বা তাহার সন্তান অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিবে—তাহারা এই বিরাট মানব সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত। তাহারা মানুষ! হিন্দুধর্ম্ম তাহাদের ত্যাগ করিলেও তাহারা বলিবে তাহাদের ধর্ম্ম সনাতন সত্য। আজ কিন্তু নলিনের এই "হিতাকাঙ্ক্ষী" প্রতিবেশীর কথা হইতে সে বুঝিল—জগৎ সত্য চায় না। জগৎ আপনার সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র মাপ কাঠি দিয়া যাহাকে পরিমাণ করিতে পারে না—তাহাকেই বাতিল বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিবে।

নলিন আসিলে সুলতা লক্ষ্য করিল তাহারও মুখে প্রফুল্লতা নাই। সে যেন কিছু চিন্তাকুল ও অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে।

সেদিনের পর হইতে নলিন বা সুলতা আর যেন পরস্পরের কাছে মন খুলিয়া কথা কহিতে পারে না। নলিন ঘরেই বসিয়া থাকে। কেহ ডাকলে অধিকাংশ সময়ই বলে মন ভাল নেই, যেতে পারব না। সুলতার কাছে আসিয়াও বসিতে পারে না। সত্য ধর্ম্ম এবং বিরাট উদার মানব জাতি এই দুটো কথাই নিরন্তর উভয়ের মনকে তোলপাড় করে। সব যেন মিথ্যা-ভুয়ো-বলে মনে হয়। মন প্রবোধ মানে না! প্রশ্নের মীমাংসা হয় না! সন্দেহ মেটে না!

নলিন উৎক্ষিপ্ত হইয়া সুলতাকে বলিল "যে কথা তুমি ও আমি এতদিন বুঝে এসেছি আর কেন তা সত্য বলে নিশ্চিন্ত হতে পারছি না? সেদিন তোমার কথায় আমার সকল প্রশ্নের সমাধান হয়েছিল! আজ কেন আবার সন্দেহ জাগছে? সত্য কিছু নয়—ধর্ম্ম কিছু নয়—মানুষের

আচারটাই হল সব চেয়ে আসল কথা? সে কথা আমরা মানব না—কিন্তু লোকের কাছে এই সত্যটাই কেন জোর করে বলতে পারি না? কেন তাদের ঘৃণা ও অপমানের প্রতিবাদ করতে গেলে নিজের মাথা হেঁট হয়ে যায়! কেন তুচ্ছ সঙ্কোচটুকুকে জয় করতে পারছি না?"

সুলতা কি বলিয়া উত্তর দিবে? আজ তাহার সকল যুক্তি সকল প্রমাণ সমবেত জগতের লোকের ভ্রূকুটীর সামনে ম্লান হইয়া গিয়াছে!

নলিন বলিল "এস সুলতা! এখনও সময় আছে। আমরা এখনই ক্রীশ্চান হয়ে জগৎকে প্রমাণ দেবার জন্য নূতন করে বিবাহ করে ষ্টাম্প লিখিয়ে আনি। তাহলে হয় তো—"

সুলতা বলিল "মন দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে! নিজের বিশ্বাষ নিজেই মানতে পারছি না। এ সময় তুমিও যদি এরকম অস্থির হও—আমি সইতে পারব না! তুমি কাতর হয়োনা! তুমি আমাকে সাহস দাও! না পার এস দুজনেই গঙ্গায় ডুবে মরে গিয়ে সকল ভাবনা ভুলে যাই।—সকল প্রশ্নের মীমাংসা কবি!—"

নলিন বলিল "মৃত্যু!........ না—না—তাহলেই কি এই ভাবনার শেষ হবে?.........যদি পরজন্ম থাকে—? ....যদি মৃত্যুর পরও আত্মা থাকে? অনন্তকাল ধরে যদি এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে হয়—? ....সে যে অসহ্য! তার চেয়ে এইখনেই আমাদের সব শেষ করে যেতে হবে!"

নলিন কেবলি ভাবে—না মরা হবে না! মৃত্যুতো পরাজয়ের চেয়েও খারাপ। জগতের যুদ্ধে আজ হারিলে কাল হয় ত আবার জিতিবার আশা থাকে। আজ তাহাদের কেহ স্বীকার না করিলেও কাল হয় তো বিশ্বশুদ্ধ লোক তাহাদের নিজেদের যুক্তির অসারতা বুঝিয়া সত্যধর্ম্ম স্বীকার করিবে! কিন্তু—মরিলে তো সব ফুরাইয়া গেল?

সুলতার ভাবিতে ভাবিতে জ্বর হইল। নলিন আরও ব্যাকুল হইয়া পড়িল। নিজে ডাক্তার হইয়াও কচি শিশুর মতই সে অবুঝ হইয়া পড়িয়াছিল। সুভাষ ও প্রতিভা নলিনের বাড়ীতেই কয়েকদিন হইতে থাকিয়া সুলতার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। জ্বর ক্রমে বিকারে দাঁড়াইল। মাঝে মাঝে সুলতা অজ্ঞানের মত অভিভূত হইয়া থাকিত;—মাঝে মাঝে ভুল বকিত, চীৎকার করিত, কখনও বা আপনার মনে কাঁদিয়া আকুল হইত! নলিন সুভাষকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিত "কি বুঝছ ভাই, বাঁচবে ত?" সুভাষ বলিত "পাগল হচ্ছ কেন দাদা? অসুখ কি কারও হয় না? তবে একটু বেড়েছে—সময় নেবে! সারবেন না কেন? এই দেখ না ক'দিন ধরে কেবলি ছটফট করছেন—আজ কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুচ্ছেন। এইবার সেরে যাবে।" নলিন মনে করিত সুভাষ তাহাকে শুধুই প্রবোধ দিতেছে। নলিন ভাবিত মৃত্যুর মাঝে সুলতা তাহার শান্তি খুঁজিয়া লইতেছে! সে নিজে কেমন করিয়া সুলতাকে ভুলিয়া ই তপ্ত মরুজগতে পড়িয়া থাকিবে?

ভাবিয়া নলিন কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। একদিন সুলতার অবস্থা দেখিয়া সুভাষ ও ডাক্তার চুপি চুপি কি বলাবলি করিতেছিলেন—নলিন মনে করিল—আর বুঝি দেরী নাই! সুলতা বাঁচিবে না! কোন আশা তার নাই! নলিন সঙ্কল্প করিল তা হবে না। সুলতা যে তাহাকে ফাঁকি দিয়া আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইবে—তা হবে না। তাহারা একত্রে একই পথ বাছিয়া লইয়াছে। সত্য হোক, মিথ্যা হোক, একই পথ ধরিয়া এতদিন পাশাপাশি চলিয়াছি—মৃত্যুর পরও স্বর্গ থাকুক কিম্বা নরক থাকুক একই পথ দিয়া তাহারা অনন্তকাল ধরিয়া চলিবে! সেও পড়িয়া থাকিবে না। সুলতার হাত ধরিয়া পরপারের দুর্গম পথে অগ্রসর হইবে!

নলিন পাগল হইয়া ক্ষুরের দ্বারা নিজের গলা কাটিয়া আত্মহত্যা করিল।

একদিকে সুলতাকে লইয়া জীবন মৃত্যুর টানাটানি চলিতেছিল। অপরদিকে—নলিন নিজে মরিল। সুভাষ ও প্রতিভা কেমন করিয়া কোন্‌দিক সামলাইবে ভাবিয়া পাইল না। সুভাষ প্রতিভাকে অস্থির হইতে বারণ করিল। অন্ততঃ সুলতাকেও যদি বাঁচান যায়—সে চেষ্টা করা দরকার। এইজন্য সুভাষ প্রতিভাকে বলিল "দেখো, বৌদি দাদার কথা

কিছু জানতে না পারেন। তাঁর সামনে তুমি একটুও চোখের জল ফেলো না।"

দুইজনে আপনাদের সকল ক্রন্দন গোপন করিয়া সুলতার সেবা করিতে লাগিল। সুলতা যদি কখনো নলিনের কথা জিজ্ঞাসা করিত, বলিত 'এই এতক্ষণ তো তিনি ছিলেন! তুমি বুঝি দেখতে পাওনি! আমরা বললুম—কিছুক্ষণের জন্য একবার বাইরে বেড়িয়ে আসতে—! শেষে কি তাঁরও আবার অসুখ হয়ে পড়বে?'

সুভাষ নলিনের মাকে—'তার' করিয়া খবর দিয়াছিল। সারদা কাঁদিতে কাঁদিতে তখনই কলিকাতায় আসিলেন। সারদা আসিলে সুভাষ তাঁহাকে চুপ করিয়া কাতরতা না দেখাইয়া 'ভগবানের মার' সহিতে অনুরোধ করিল। তিনি সমস্ত বুঝিলেন। সুলতা যদি বাঁচে, তাহার জন্যও তিনি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নলিন সুলতাকে কত ভালবাসিত তাহা তিনি জানিতেন। সুলতার জন্যই সে প্রাণ দিল। নলিনকে সুখী করিবার জন্য তাহাদের বিবাহে তিনি অমত করেন নাই। কিন্তু তবু তাহাদের নিজের ঘরে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। নলিনের বুকে এই ব্যথা কত বাজিয়াছিল তিনি জানিতেন। সব ভুলিয়াও যে মনের জোরে—তিনি পুত্রের অদর্শন সহিয়াছিলেন আজ পুত্রের মৃত্যুতে সেটুকু বাঁধও ভাঙ্গিয়া গেল! নলিন সুলতাকে ভালবাসিত—তাই সুলতাকে ফিরিয়া পাইলে তাহাকে আদর করিয়া কাছে রাখিয়া পুত্রের শোক ভুলিবেন মনে করিয়াছিলেন। আহা! প্রথম হইতেই কেনো তিনি নলিনদের সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে পারেন নাই? তাহলে হয়তো ছেলে অসুখী হইত না! হয়তো সে পাগল হইত না! মায়ের কাছে থাকিলে সুলতার অসুখে সে আপনি এতো অভিভূত হইত না! এইসব ভাবিয়া সারদা বড়ই ব্যথিত হইলেন।

সারদাকে দেখিয়া সুলতা বলিল "মা, তুমি এসেছ? তুমি অভিমান ভুলে ফিরে এসেছ? তোমাকে দেখে আমার সব ভাবনা দূর হয়ে গেছে! সব প্রশ্নের মীমাংসা হয়েছে! আর আমার কষ্ট নেই! তুমি যদি আমাদের অভয় দাও—কারও লাঞ্ছনা আমরা সইব না! এবার আমি ভাল হয়ে উঠব!"

সকলে আশ্চর্য্য হইল, যে জ্বর ডাক্তারে এতদিন কিছু উপশম করিতে পারে নাই—সারদা যেন শুধু গায়ে হাত বুলাইয়া তাহা সারাইয়া দিলেন। সারদাকে দেখিয়া সুলতার ভুল বকা কমিল। একটু একটু করিয়া জ্বরও কমিল। একটু একটু করিয়া সে আরোগ্যের পথে চলিল।

ক্রমশঃ

শ্রী......

তাজমহল

—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দে

অনিন্দ্যসুন্দরী তাজ! বিশ্বমাঝে চিরন্তন তুমি
প্রেমের অমরাবতী, তাই আজি তব পদ চুমি
ভাষাহীন প্রেমবার্ত্তা প্রকাশিছে বিশ্ব সভাতলে
উদ্দাম যমুনানীর, শ্রীচরণ প্রক্ষালন ছলে
ঊর্ম্মিমালা উচ্ছ্বসিয়া প্রকাশিছে আকাশে বাতাসে
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, প্রতি প্রাতে ঊষা এসে
সুগম্ভীর শান্ত মৌন অভ্রভেদী নির্ম্মল ললাটে
আঁকিয়া চুম্বন রেখা, বিশ্বের অনন্ত চিত্রপটে
এঁকে রাখে ক্ষিপ্রহস্তে শতবর্ণে তুলিকার মুখে
অপূর্ব্ব প্রেমের ছবি। অসীমের অনবদ্য সুখে
সুবিশাল স্বর্ণাঞ্চল দ্বিধা ভাবে সুরঞ্জিত করে
সন্ধ্যা আসি চুম্বে তোমা আলিঙ্গনে সর্ব্ব অঙ্গ ঘিরে,
ছুটায় তড়িৎস্রোত। ধরণীর সিগ্ধ গন্ধোচ্ছ্বাসে
উচ্ছ্বসিয়া উদ্বেলিয়া লুটে পড়ে তব পক্ষ পাশে
উদ্দাম অনিল এসে। সৌধশৃঙ্গ স্তব্ধ কণ্ঠহারা
শূন্যে চাহি বরষিছে প্রণয়ের নির্ঝরিণী ধারা।
হে সুন্দরী হে প্রেয়সি! প্রণয়ের হে পূণ্য প্রতিমা
অনন্তের অন্তর শায়িনী। লাবণ্যের নাহি সীমা
তোমার যৌবন দৃপ্ত উচ্ছ্বসিত স্তব্ধ সুগম্ভীর
সমুচ্ছ্বল দেহমাঝে। কবে কোথা বিরহে অধীর
দিল্লীশ্বর শাহজাঁহা মমতাজ-স্মৃতি লয়ে বুকে
দুঃখে শোকে আত্মহারা অশ্রুজলে স্নেহগর্ব্বসুখে
আদ্র করি বন্দীশালা তোমার বিপুল বক্ষোমাঝে
হেরিত প্রিয়ার ছবি। সুগম্ভীর শান্ত মৌন সাঁঝে
ও প্রশান্ত বক্ষ হতে মুহূর্ত্তে অখণ্ড মূর্ত্তি ধরি
স্মিতনেত্রে বাহিরিয়া মমতাজ,—অপূর্ব্ব সুন্দরী,
পুত্রহস্তে বন্দীকৃত দিল্লীশ্বর বৃদ্ধ সাজাহানে
দানিত অপূর্ব্ব শান্তি। প্রতিদিন নিশা অবসানে
প্রাণভরা ভাষাহারা দিশাহারা ভগ্ন আশা নিয়ে
তোমার প্রাণের মাঝে সমর্পিয়ে ক্লান্ত ক্লিষ্ট হিয়ে
বেঁচেছিল কোনমতে সাজাহান দিল্লীর ঈশ্বর।
তারি স্মৃতি "তাজ" তোমা বিশ্বমাঝে করেছে অমর।

রূপশিখা

—শ্রীঅরিন্দম বসু

পঞ্চম দৃশ্য

শ্রাবণ—সায়াহ্ন।

আকাশের দক্ষিণ প্রান্তে খণ্ড খণ্ড মেঘ আসিয়া ক্রমশঃ জমাট বাঁধিতেছিল।

কক্ষের দক্ষিণ-বাতায়ন পার্শ্বে বসিয়া উৎপলবর্ণা চিন্তা করিতেছেন।—তাহার শিথিল বিলাস-বসন,—অযত্ন-রক্ষিত কেশ গুচ্ছ,—অঙ্গরাগ হীন মুখ-কমল হৃদয়ের গভীর বেদনাকে অধিকতর পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে।

অসহায়া শ্রেষ্ঠিপুত্রী নির্ব্বাক—তাহার ঐ উদাস দৃষ্টিখানি যেন দিগন্তের কৃষ্ণ রেখার মধ্যে আশ্রয় খুঁজিয়া ফিরিতেছে।

........সহসা সোপান শ্রেণীতে পদধ্বনি শোনা গেল।

কিন্তু শ্রেষ্ঠিপুত্রী কোনরূপ বিচলিত হইলেন না। পরক্ষণেই অলিন্দে উত্তীয় প্রবেশ করিলেন।

শ্রেষ্ঠিপুত্রীর আঁখি যুগল তখনও তেমনি অসীমের দিকে

নিবদ্ধ তাহা লক্ষ্য করিয়া উত্তীয় তাহার খুব সম্মুখে গিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন—

—আকাশের পানে তাকিয়ে কি দেখ্‌ছো উৎপল ?

উৎপলবর্ণা ইহার উত্তর দিলেন না—তেম্‌নি অবিচলিত হইয়া রহিলেন।

উত্তীয় প্রবল আবেগে তাহার একখানি হাত নিজের বুকের উপর টানিয়া লইয়া বলিলেন—

—কথা কও উৎপল...... আমি জানতে এসেছি তোমার কাছে, আজ শেষদিন......প্রতীক্ষার ব্যথা আর সইতে পাচ্ছিনে আমি......বলো তুমি সম্মতি দেবে ?

শ্রেষ্ঠিপুত্রী তাহার হাতখানি উত্তীয়ের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া লইবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু পারিলেন না। না পারিয়া অবশেষে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

—অমন করে রইলে কেন ?—তোমাকে আজ বল্‌তে হবে।

উত্তীয়ের কণ্ঠস্বর উত্তেজনায় কাঁপিয়া গেল।

—সে কথাতো সেদিনই বলেছি।

—আজ ভেবে বলো উৎপল !

—খুব ভেবেছি আমি।

—তবে আমার আশা পূর্ণ হবে না ?

শ্রেষ্ঠিকুমারী নিরুত্তর রহিলেন।

—অভিমান কি তোমার যাবেনা উৎপল ?......এমন করে নিজের সর্ব্বনাশ ডেকে এনো না।......আমি তোমায় চাই,......আমার এতদিনকার আশা, আজীবনের কল্পনা, ...তুমি হেলায় ভেঙ্গে দেবে—এতটা নিষ্ঠুর হ'য়ো না আজ।

—সে আশা, সে কল্পনা আমি ভাঙ্গিনি, ভেঙ্গেছো তুমি।......নইলে কি আমাদের অভাব ছিল সেখানে ?

—কিন্তু আমি যে তোমায় পরিপূর্ণ করে পেতাম না। আমার জীবনের দুঃসহ স্মৃতি যে সেখানে অবিরত কশাঘাত করে চল্‌তো।

—তাই তুমি সে যন্ত্রণার হাত এড়াবার জন্য নিজেকে সরিয়ে এনেছো।—কিন্তু আমি ?......সে কশাঘাত যে এখানে আমায় জর্জ্জরিত করে তুলছে।

—থাক্‌, আর আমি শুনতে চাইনে।......আমি জানতে এসেছি শুধু তুমি আমার কথায় সম্মত কি না......তোমাকে আমি বিবাহ করতে চাই......নন্দ শ্রেষ্ঠির পুষ্পোদ্যানে তোমাকে যেমন করে পেয়েছিলাম, তার চেয়েও নিবিড় করে এখানে আজ পেতে চাই......বলো সম্মতি দিচ্ছো ?

উৎপলবর্ণার বিবর্ণ মুখে একটা চাপা হাসির উচ্ছ্বাস বহিয়া গেল। অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন—

—না !......

—না !......সেদিনও তুমি এই উত্তরই দিয়েছিলে কিন্তু আমি তখন তোমায় তিনদিন সময় দিয়ে বলেছিলাম—ভেবে দেখো ! আজ তাই আবার জিজ্ঞাসা করতে এসেছি,—সে কথা কিন্তু ভুলে যেয়োনা উৎপল।

—আমি কিছুই ভুলিনি। সেদিনও তোমার কথায় সম্মত হইনি, আজও নয়।......যতদিন না তুমি......

—থাক্‌, শুন্‌তে চাইনে আমি।......তবে এই তোমার স্থির ?

—হাঁ।

—বেশ উৎপল, তাই হোক্‌। শোনো আমার কথা—ভেবেছিলাম অতীতের স্মৃতি ভুলে গিয়ে......জিঘাংসা প্রবৃত্তিকে জন্মের মত বিসর্জ্জন দিয়ে এক নূতন জীবন তৈরী কর্ব্বো।......ভেবেছিলাম—শ্রেষ্ঠি উত্তম ও শ্রেষ্ঠি নন্দের জীবন-ইতিহাসের সম্মুখে যবনিকা টেনে দিয়ে আমরা দু'জনে এক নূতন ইতিহাস সৃষ্টি কর্ব্বো।...... তাই ছল করে তোমাকে বেসালির এই নির্জ্জন আম্রকাননে নিয়ে এসেছি......তোমার জন্যই তাই এক পতিতার প্রেমের বিনিময়ে এই মর্ম্মর-প্রসাদ গ্রহণ করেছি। ......কিন্তু তা' আজ ব্যর্থ হ'লো।.........কিন্তু এর পরিণাম কি জানো উৎপল ?......আমার ব্যর্থ প্রেমের রোষ-বহ্নিতে তোমাকেও তিল তিল করে জ্বলতে হবে।... ভেবোনা শ্রেষ্ঠিপুত্র—এ আমার প্রত্যাখ্যাত প্রেমের বিকল প্রলাপ।......আমি তোমাকে তবে সব খুলে বল্‌ছি—এই মর্ম্মর ভবন একদিন রূপসী-শ্রেষ্ঠা চন্দার বেসালির বিলাস-বিহার রূপে ছিল..... আমার প্রতি তার একনিষ্ঠ প্রেমের অর্ঘ্যস্বরূপ আজ এ আমার অধিকার-গত হয়েছে।

……শুধু তাই নয়……তার ঐ নিবিড় প্রেমের আকর্ষণে মুগ্ধ হয়ে তাকেও আমি এই প্রাসাদে আহ্বান করে এনেছি।……

শ্রেষ্ঠিপুত্রী এতক্ষণ উন্মুখ হইয়া শুনিতেছিলেন—সহসা উত্তীয়ের শেষ কথায় চম্‌কিয়া উঠিয়া বলিলেন—

—এই প্রাসাদে!

—হ্যাঁ, এই প্রাসাদে……নীচে দক্ষিণ দিকের ঐ কক্ষে।……মনে করোনা আমার এই উদ্দাম যৌবনকে এম্‌নি আমি বিফল হতে দেবো। ধরণীর যত রূপ, রস, গন্ধ আছে……সবই তোমার ঐ তৃষিত চোখের সম্মুখে উপভোগ কর্ব্বো……আর তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই……

—উত্তীয়, উত্তীয়, লজ্জা করেনা তোমার…… কাপুরুষ……

—হ্যাঁ। ঠিক বলেছো, কাপুরুষ।……লজ্জা আজ আমায় ভয় পেয়ে পালিয়েছে।……কিন্তু তুমি যাকে আজ জোর করে প্রত্যাখ্যান করছো……জেনো, তারই সামান্য প্রেম-প্রত্যাশায় বিশ্ববাঞ্ছিতা চন্দার মত রূপ-গর্ব্বিতা নারী আজ লালায়িতা!……আমি তার সে প্রেমের প্রতিদান সাদরে……ওকি, যেয়ো না উৎপল……দাঁড়াও……শুনে যাও……

উৎপলবর্ণা এতক্ষণ রোষে, ক্ষোভে, অধর দংশন করিয়া কোনরূপে দাঁড়াইয়া ছিলেন কিন্তু আর পারিলেন না। উত্তীয়ের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সহসা সম্মুখের কক্ষে প্রবেশ করিয়া সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন।

—বুঝে দেখো নারী—নিজের সর্ব্বনাশ তুমি নিজেই করতে চলেছো।

উত্তীয় ক্ষণকাল কি যেন চিন্তা করিলেন—পরে সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া উদ্‌ভ্রান্তের মত প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যা অতিক্রান্তা।

আকাশ মেঘ-মেদুর—নক্ষত্রদীপালি মিলাইয়া গিয়াছে। ঝাকে ঝাকে বৃষ্টির ফোটা পৃথিবীর বুকে আসিয়া লুটাইতেছে।

প্রাসাদের নিম্ন তলে দীপালোকিত কক্ষে উত্তীয় ও চন্দা বিলাস-শয্যায় বসিয়াছিলেন।

উত্তীয়ের নিশ্বাস দ্রুত বহিতেছিল। তাহার চক্ষু দুইটী আরক্ত,—উজ্জল। তিনি একাগ্রমনে ভাবিতেছিলেন। সহসা কখন ঝুকিয়া পড়িয়া বলিলেন—

—তাই তো,……কিসের সঙ্কোচ?……ও কি! তুমি অত দূরে কেন চন্দা?……সরে এসো—আরো কাছে।…শ্রাবস্তীতে সেদিন তোমার প্রার্থনা পূর্ণ কর্ব্বো বলে স্বীকার করেছিলাম,—আজ সেইদিন।……সে কি চন্দা?……অমন করে তাকিয়ে কি দেখছো?

—তোমার চোখে-মুখে এ কিসের পরিবর্ত্তন উত্তীয়?… …তোমার দেহ-মনে যেন আগুণ জ্বলছে,—তোমার সৌন্দর্য্যের এমন তীব্রতা যে কোন দিনই দেখি নি।……

—হ্যাঁ, তীব্রতা।……সত্যি আজ আমার দেহ-মনে আগুণ জ্বলছে……এ আগুণ তাকে গ্রাস করবে……পুড়ে ছাই করে দেবে।……সে অতি সুন্দর চন্দা……আমি যেন চোখের সাম্‌নে সেই দৃশ্য দেখ্‌ছি।

—তুমি কি বলছো উত্তীয়?—আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে।

—তাই কি?……হ্যাঁ, ঠিক বলেছো চন্দা।……একটা অদ্ভুত কল্পনা……অদ্ভুত খেয়াল,……মনটাকে যেন ঘুলিয়ে দিয়েছে।……সত্যি, কী সে উত্তেজনা!……সব স্বপ্ন, প্রলাপ…… তুমি মনে কিছু করোনা চন্দা।

চন্দা বিস্মিত হইয়া উত্তীয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন……কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল।

উত্তীয় গবাক্ষ পথে বাহিরের গভীর অন্ধকারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন—মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—

—নীরব কেন চন্দা? কি ভাব্‌ছো…সব ভুল.. …

—তা' নয়। হ্যাঁ, তারপর তোমার নির্দ্দেশ মত আজ শ্রাবস্তীতে লোক পাঠিয়েছি……

—বেশ,—না, কিইবা তার প্রয়োজন? সে তো স্পষ্ট উত্তরই আজ দিয়েছে।……তবে কেন……

—তুমি যে বলেছিলে তখন।

—হ্যাঁ, বলেছিলাম বটে!

উত্তীয় অন্যমনস্ক হইলেন।

—তুমি অপরাধ নিয়োনা......একটী কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা কর্ব্বো উত্তীয়......

—কি ?

—শুনেছি শ্রেষ্টিপুত্রী তোমার অনুরক্তা......আর শ্রেষ্টি নন্দ,......তিনিও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি।......তবে তোমরা কেন এমন চুপে চুপে গভীর নিশীথে চলে এলে বন্ধু ?......এমন উচ্ছল খরস্রোতা নদী......বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন এমন আকাশ......তারই ভেতরে সামান্য একটা ক্ষুদ্র তরী সহায় করে......

—বুঝেছি চন্দা......কিন্তু তোমার এ সন্দেহ অমূলক। এ আমাদের সর্ব্বগ্রাসী যৌবনের একটা অদ্ভুত খেয়াল...... উঃ, বাহিরে কি তুমুল বৃষ্টি......পৃথিবীর বুকে কি নিবিড় অন্ধকার !......আজ ঐ মেঘ গর্জ্জনের সঙ্গে আমার প্রাণেও যেন প্রলয়ের বাঁশী বাজ্‌ছে।......আমায় তুমি মাতাল করে রাখো বন্ধু।

—কিন্তু শ্রেষ্টিপুত্রী যে তোমার প্রতীক্ষার ব্যথা সইছেন।

—না, চন্দা,......আজ আমি তোমার অভিসারে এসেছি। একদিন যে উন্মুখ যৌবনকে অনাদরে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম আজ আমি তাকেই আবার ফিরে পেতে চাই।

—কিন্তু......

না, কোন কিন্তুই নেই......সরে এসো,—আরো কাছে ......মুহূর্ত্তে উত্তীয় দুই হস্তে চন্দাকে আকর্ষণ করিলেন। পরে একদৃষ্টে ক্ষণকাল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আবেগভরে বলিলেন,—

—তুমি এত সুন্দর !......তবে কেন আমি তোমায় প্রত্যাখ্যান করেছিলাম,......কেন আজ আমায় অনুশোচনার তীব্র জ্বালা সইতে হচ্ছে ?......কি তোমার অভাব ?...... ঐ ক্ষীণা যৌবন-ভারাবনতা দেহলতা......মণি ভাস্বর ঐ আয়ত আঁখি......ঐ ভ্রমর-কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ......পৃথুল-সুন্দর উন্নত বক্ষ......কম্বু-কণ্ঠ......সৌন্দর্য্যের এমন ঐশ্বর্য্য কার—কার আছে চন্দা ?......আমি ভ্রান্ত......তাই তোমায় সেদিন হেলায় পরিত্যাগ করে, স্বপ্নের কুহক-জালে নিজেকে আবদ্ধ করে তুলেছিলাম।......কিন্তু আজ আমি সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বো।

প্রবল উত্তেজনায় উত্তীয় চন্দাকে বক্ষ-সংলগ্ন করিলেন।

—তোমার বুকের স্পন্দন কী গভীর উত্তীয় !

—ভুল, ভুল,......ও স্পন্দন নয় চন্দা—হৃদয়ের জয়োল্লাস......নবীন উন্মাদনা। প্রেমের আজ অপরূপ নৃত্য চল্‌ছে সেথায়।

—বাইরে কি বিরাট অন্ধকার......

—কিন্তু খুব সুন্দর......এই মিলন-অভিসার......এই প্রেম-সঙ্গম ঐ অন্ধকারের ভেতরে চিরকাল মিশে রইবে।...

আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন। গহন-কৃষ্ণ রজনীর বক্ষ মথিত করিয়া অবিশ্রান্ত বর্ষণ পৃথিবীকে স্নাত করিয়া দিয়াছিল। বর্ষা-প্রকৃতির সেই তাণ্ডব লীলার মধ্যে বেসালির এক মর্ম্মর-প্রাসাদের প্রমোদ-কক্ষে দুইটী তরুণ-তরুণী পরস্পরের সৌন্দর্য্য-সম্ভোগে উন্মত্ত, অধীর। আর তাহারই দ্বিতলে নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে শিশির দলিত শতদল সদৃশ একটী দুঃখ-ম্রিয়মানা কিশোরী কঠিন পাষাণ-শয্যায় তন্দ্রাভিভূতা।

ক্রমশঃ

দেবী বাক্।

—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন

অতীতের কুহেলিকাতমোবৃত সুদূর উষায়,
ভারতের তপোবনে, প্রকৃতির অনন্ত লীলায়
আত্মহারা মন্ত্রদৃক্ ঋষিদের ঋক্‌সামগানে,
স্বর্গ হতে নেমে এলে ধীরে দেবি ! মরতের পানে।

নিভৃত তমসাতীরে বিগলিত ক্রৌঞ্চীর ক্রন্দনে
তাপস হৃদয়ে পুন আবির্ভাব তব সঙ্গোপনে,
পরিণত নবছন্দে বাহিরায় গূঢ় ব্যথা শোক,
আদি-কবি ভাবাবেশে উচ্চারিলা অভিনব শ্লোক।

বিরহের মন্দাক্রান্তা ভাষা ক্রমে অমন্দ ব্যাকুল
বিলাপে কাঁদায় বিশ্ব, মর্ত্ত্য হতে প্রেমতরুমূল
উঠি গিয়া ঠেকে স্বর্গে, সুধারস মধুর নির্ঝর,
কবি বৃষ বরপুত্রে বরদানে করিলে অমর।

তারপর কত কবি সেবি' তব চরণ যুগল
ধন্য হইয়াছে, তোমা' সাজায়েছে অর্ঘ্যপুষ্পদল
স্রন্দাম চন্দন ঢালি; করিয়াছে তব নীরাজনা
ধূপদীপে শঙ্খরবে, স্তুতিগীতি মঙ্গল বন্দনা।

তব অনুগ্রহলব্ধ—নব—নব—উন্মেষ শালিনী—
প্রতিভাস্ফুরণে মুগ্ধ জগৎ আনন্দ মন্দাকিনী —
অমৃত শীকরাসারে সিক্ত করি' শান্ত নিরমল
সঞ্জীবিত কর নিত্য, ব্যর্থ হয় পাপের গরল।

শব্দ নিত্য, নাদবিন্দু হতে সৃষ্ট এ বিশ্ব সংসার
শব্দ ব্রহ্ম, তুমি তাঁর অজর অমৃত কলাসার;
প্রণবের মহাগীতি মহাশূন্যে উঠে তরঙ্গিয়া,
কি অমৃতধারা নিত্য পড়িতেছে তাহ'তে ঝরিয়া।

ভারতী দেবতা বাক্ অনক্ষরা তুমি সরস্বতি,
বেদের সে পরা বিদ্যা নিস্তরঙ্গা মূর্ত্তি জ্যোতিষ্মতী,
কুন্দেন্দু তুষারশুভ্রা পুরাণের সিতাব্জবাসিনী,
হংস বীণা প্রিয়া বাণী নমি তোমা, জাড্য বিনাশিনী।

'অনাদি ক্ষুধার অনল দহে মোর উপবাসী দেবতারে'—

—শ্রীসত্যেন্দ্র দাস

পৌষের সকাল.........

হী হী ক'রে শীতের হাওয়া আসে......

আমলকী গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়ে......ঝাউ গাছটায় সোঁ সোঁ সাড়া পড়ে যায়......

সুরটা যেন ঝরার গানের......

ছেঁড়া কাঁথাটা গায়ে জড়িয়ে ছিদাম দাওয়ায় এসে বসে ......একটু কাঁপেও......

বাড়ীর সামনের নদীর জলে তার কুঁড়েখানার ছায়া পড়ে......ঢেউয়ের সঙ্গে সে-ছায়া নাচে—

অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে থাকে সে, আর—

বাড়ীর পাশ দিয়ে নদীর ঘাটে যে-পথটি গিয়ে পড়েছে, তারি বুকের পরে তার আকুলদৃষ্টি লুটিয়ে এক একবার……

হয়তো তার মনে হয়……কে যেন আসে—আসে—আসে!……

একটু পরে রোদ ওঠে……দাওয়ার একপাশে তার একটি ঝলক্ এসে পড়ে—

না-কর্‌লে নয়, তাই—

কদিন থেকে নদীতে যাওয়া বন্ধ……জালটা ছিঁড়ে গেছে।……তালি দিতে হয়……

ধীরে ধীরে উঠে ছেঁড়া জালটা হাতে করে রদ্দুরের দিকে যায়……তারপর দাওয়ার একটা পুরানো খুটির সঙ্গে জালটা বেশ করে বেঁধে তালি দিতে সুরু করে……

উঠানের উপরকার পায়রাগুলো হঠাৎ এক সময় পাখ্-ঝাপটা মেরে উড়ে যায়……

সে শব্দে পেছন ফিরে তাকাতেই তার চোখদুটো উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে……

হাসিমুখে বলে, শিউলি যে, এত সকালে আজ জল আন্‌তে যাচ্ছিস্?……

বলেই সে অবাক্ হ'য়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে ……ঠিক একথাটুকুর জবাব পেতেই যেন সে তাকে প্রশ্ন করে নি……

তবু শিউলি বলে. হ্যাঁ, সকাল তোমার মতো বসে থাকে এখনো!……তা যাচ্ছিলুম পাশ দিয়ে, একটু উকি দিয়েই না-হয় গেলুম—তুমি কি কচ্ছো……

কত লোক সকাল থেকে নদীর ঘাটে আসে যায়, আর কেউ তো উঁকি দিয়ে দেখ্‌তে আসে না তাকে……

খুসী হয়ে ভাবে সে, কিছু বলে না……

শিউলি কিন্তু এবার একটু জোরেই বলে, কাল তো সারদিন খাওয়া হয়নি……আজো বোধ হয় তেমন কোনো ইচ্ছে নেই—কেমন? আমি ভেবে পাইনে ছিদামদা, কি ক'রে মানুষ এরকম শুকিয়ে মর্‌তে পারে……

আবেগে তার গলার স্বর ধরে আসে……আরো কিছু কঠিন কথা তার বলা হয়ে ওঠে না—

শিউলির কথা কিন্তু ছিদামের কানে যায় না……

সে হাতের কাজে এবার খুব মনোযোগ দেয়……

শিউলির রাগ হয়—

দুটি চোখ ছল্ ছল্ করে ওঠে অভিমানে……

বা রে, কথাটি পর্য্যন্ত নেই। থাক্‌না, কার গরজ পড়েছে খুটিয়ে জিজ্ঞেস কর্‌বার জন্যে……

বলেই সে কলসী কাখে করে ঘাটের দিকে চলে যায়…

ছিদাম পিছন-ফিরে তার চলার পানে তাকিয়ে থাকে…

শিউলি জেলের মেয়ে।……কিশোরী……

গায়ের রঙ কুচ্‌কুচে কালো……চুলগুলো রুক্ষ এলো-থেলো……জাতিতে তারা হীন—

তবু সে কিশোরী।………

বুকে তার আধো জাগরণের গতি-ছন্দে নিখিল-সৃষ্টির আনন্দ রহস্য……

অনন্ত রাত্রির অপরূপ কালো তার চোখে……

ছিদামের সমস্ত অন্তর সেই চোখের মাঝে হারিয়ে যেতে চায়……সমস্ত দেহ বুকের তটে লুটিয়ে পড়্‌তে চায়… …

সেও তার ভেতর যৌবনের সাড়া পেয়েছে যে—

যৌবনের ধর্ম্মই এই—

একটু পড়ে শিউলি জল নিয়ে ফিরে আসে—

দেখে, ছিদাম সেই তেম্‌নি ভাবে বসে জালে তালি দেয়……

পেতলের কলসীটাকে দুম্ করে মাটির উপর রাখে…… ছুটে যায় ছিদামের কাছে…তার হাত থেকে জালটা ফেলে দেয়—টান মেরে……

ছিদাম একটু একটু হাসে……কিছুই কয় না—

শিউলি ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে, ঘরে বসে খুটিনাটি করলেই খাওয়া মিলবে নাকি—জিজ্ঞেস করি? আমি তো এসব

দেখ্‌তে পারি নে বাপু।······আর এমন পোড়া সংসারও মানুষের থাকে,—কোথায় বা হাঁড়ি, কোথায় বা চালপাত······

বল্‌তে বল্‌তে সে কুঁড়ের ভেতর ঢুকে পড়ে······

ছিদামের সমস্ত মুখখানা খুসীতে ভরে ওঠে······

শিউলি রেঁধে ছিদামের পাতে ভাত দিয়েই চলে যায়··· একটুও দেরী করে না······বাড়ীতে যদি জান্‌তে পারে তাহ'লে পিঠের চাম্‌ড়ায়—

ছিদাম বসে বসে খায় আর ভাবে······

একটি গ্রাস তুলে' আরেকটি তুল্‌তে হবে—ভুলে যায়!···

খাওয়া তো নয়—যেন সমস্ত অন্তর দিয়ে একটা কাজ করা!······ এযে তার প্রিয়ার হাতে অমৃত পরিবেশন!······

দোরের কাছ দিয়ে নব্‌নে জেলের বিধবা ডব্‌কা মেয়েটা প্যাট্‌প্যাট ক'রে তাকিয়ে যায়······

একটুখানি মুচ্‌কি হাসেও······

চোখ দিয়ে যেন কি কথা বল্‌তে বল্‌তে চলে যায়······

ছিদাম বোঝে না······সে তখন তাড়াতাড়ি খেতে মনোযোগ দেয়······

সন্ধ্যা নেমে আসে···সেই একই রকম···প্রথম দিনের প্রথম সন্ধ্যার মত······

প্রথমে গাছের তলায় আঁধার জমে···ধীরে ধীরে তা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে···নদীর জলের উপর কুয়াসা দেখা দেয়······

একটু পরে ছিদামের কুঁড়েখানা আর দেখা যায় না···

পায়ে-চলার পথ নিরালা হয়······গাঁয়ের ভেতরকার দু একটা মিটমিটে প্রদীপের আলো গাছের ফাঁকে উঁকি মারে······

ছিদামের ঘরে আজ আর আলো জ্বলে না······

অন্ধকারে ময়লা ছেঁড়া বিছানাটার উপর বসে বসে সে হুঁকোতে টান মারে······গড় গড় ক'রে শব্দ হয়······ মুখ থেকে ধুঁয়ো বেরোয়······সাদা কুয়াসার মত, অন্ধকারেও তা দেখা যায়!······

ভাবে—আর ভাবে।······কত কি—তা কে জানে?

হয়তো শিউলির কথা······

সে সঙ্গে তার নিজের কথাও মনে হয়······

তার কি আছে?—

নিজে যে একমুঠো খেতে পায় না, তার আবার অত—

আর ভাব্‌তে পারে না······

কথা তার গুলিয়ে যায়।

শিউলিকে তখন যেন আর হাত বাড়িয়ে নাগাল পাওয়া যায় না······

ঘুরে-ফিরে সেই ভাবনা—

শত হোক্‌—শিউলিদের অবস্থা ভালো তো······

বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান······শিবরাত্তিরের সল্‌তে ঐ এক শিউলি তো······

তাকে কি তারা ছিদামের মতো ছন্নছাড়ার হাতে······

শুক্‌নো পাতা মর্‌ মর্‌ ক'রে ওঠে······

কার যেন পায়ে-চলার শব্দ······

ছিদাম ভাবে, বাতাসে শুক্‌নো পাতা উড়ে যায়······ তারি শব্দ······

আবার একা-একাই হাসে,—চোর?······হা হা······ চোরের বুদ্ধি আছে বটে······

ছিদাম আবার তার ছেঁড়া-সুতা জোড়া দিতে চেষ্টা করে······

শিউলি কি তার হবে না?······

ঘরের দাওয়ায় পরিষ্কার পায়ের শব্দ হয়······

দুয়ারে মানুষের ছায়া পড়ে······

ছিদাম ছায়ার কায়ার দিকে তাকায়······

ঠাওর হয় না……সারা গায়ে কাপড় জড়ানো একটা মানুষের মতো দেখা যায়……

মানুষ তো ?……

ছিদামের সমস্ত শরীর কণ্টকিত হয়ে ওঠে……বুড়ো বটতলায় সেই—

গলাটা একবার ঝেড়ে জোর করে বলে—কে ?

মূর্ত্তি কথা কয়……মানুষের গলায় পরিষ্কার করে বলে, আমি ছেদাম,—আমি ক্ষেন্তি……

ধীরে ধীরে সে ঘরের ভেতর ঢোকে……মেঝের উপর বসে পড়ে……

ছিদাম ধড়্ফড় করে দাঁড়িয়ে বলে, এত রেতে কেন রে ক্ষেন্তি……নব্নে খুড়ো ডেকেছে কি ?……কোনো বিপদ—

ময়লা গাম্‌ছাটা চৌকাটের উপর থেকে হাত্‌ড়ে নিয়ে সে মাজায় বাঁধে……

ক্ষেন্তি তাড়াতাড়ি বলে, তোকে যেতে হবে না কোথাও ……বাবা বাড়ী নেই……তাইতে তোর কাছে আস্‌তে পেলাম……

হয়তো মেয়েটা একটু হাসে……অন্ধকারে তা দেখা যায় না……

ছিদাম বসে পড়ে।……

বলে, কেন ?

মেয়েটা জবাব দেয় না……

মেয়েটা এবার উঠে অন্ধকারে হঠাৎ ছিদামকে জড়িয়ে ধরে……

অনাবৃত ভরন্ত দেহটার পরশ ছিদামের শিরায় শিরায় আগুণ ধরিয়ে দেয়…ক্ষেন্তির কথা-না-বলার উত্তর পাওয়া যায়…ছিদামের কাছে সবই যেন তখন সহজ হয়ে আসে— সে বুঝ্‌তে পারে সবই……

ধীরে ধীরে নিজের গলা থেকে ক্ষেন্তির অলঙ্কারহীন স্নিগ্ধ হাতের বাঁধনটা খোলে……

একটু দূরে স'রে বসে বলে, ঘাড়ী যা ক্ষেন্তি……

স্বরটা গম্ভীর…একটু ভেজাও যেন।

হয়তো মেয়েটার জন্য ছিদামের একটু দুঃখ হয়…আহা ছোট বেলা সোয়ামী মারা গেছে…আজ এই ভরা-বয়স……

মেয়েটা যায় না…বসেই থাকে……

ছিদাম আবার বলে……

এবার মেয়েটার চোখ দুটো হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলে ওঠে…অন্ধকারেও…ঝাঁকানো কণ্ঠে বলে, আচ্ছা যাচ্ছি, কিন্তু মনে থাকে যেন আমার নাম ক্ষেন্তি……

দুম্ দুম্ করে মেয়েটা চলে যায়……

ছিদামের মনে হয়, অন্ধকারটা যেন হাতে ঠেকে…এত ভারি—এত জমাট—

—ছিদামদা, কবে থেকেই বল্‌ছি, এবার একটা বিয়ে কর। এ রকম না-খেয়ে না-দেয়ে আর ক'দিন কষ্ট পাবে ?—

শিউলি ছিদামের সন্মুখে ভাত দিয়ে এই কথা কয়টি ধীরে ধীরে বলে—

ছিদাম একটুখানি হাসে—বলে, বিয়ে কর্‌তে বল্‌ছিস্ তো আমায় শিউলি ? হ্যাঁ, করবো—না কর্‌লে দেখচি আর চলে না—

চলে-না চলে-না তো কর্‌চো চিরকাল, না-চলেও তো থাক্‌ছে না দেখি—

এই তো দেখ্‌ছি বুঝেছিস্ লক্ষীমেয়ের মতো, আরে চল্‌চে বলেই তো ওটা দরকার হয়নি—ছিদাম হেসে বলে।—

শিউলি কৃত্রিম কোপ দেখিয়ে বলে, ফাজলামি করতে হবে না বাপু—খেতে বসেছ, খেয়ে ওঠো—

তারপরে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আমি যাই…দেরী হলে মা সন্দেহ করবে তোমার এখানে এসেছি বলে…ক্ষেন্তিটা আবার আমার পেছনে লেগেছে ক'দিন থেকে……

শিউলি চলে যায়।

ছিদামের আর খাওয়া ভালো লাগে না……

সন্দেহ কর্‌বে ?…কেন ?…আমি কী……

ধীরে ধীরে ছিদাম সবই বুঝ্‌তে পারে যেন…মুখখানা তার লাল হ'য়ে ওঠে অকারণে ?……

দাওয়ায় বসে ছিদাম হুকোয় টান দেয়……

একটু পড়েই শিউলির বাপ্ ধনাই সর্দ্দারকে আস্‌তে দেখে…হন্‌হন্ করে আসে……

ভয়ে ছিদামের মুখ চুণ হ'য়ে যায়…হাতের হুকো হাতেই থেকে……

ধনাই এসেই ছিদামকে যা'চ্ছে তাই করে গালি দেয়…

আর কোনোদিন যদি সে শিউলিকে দেখে তার কাজ করে দিতে—তাহ'লে তার মাথার খুলি আস্ত থাক্‌বে না……

তারপর সুরটা একটু নাবিয়ে শানায়…শিউলির বিয়ের বয়স…বদ্‌নাম হলে বিয়ে হবে না…এই তো ক্ষেন্তি দেখে গিয়ে পাড়া রটিয়ে দিচ্ছে……

ছিদাম কিছু বলে না…মাথা নীচু ক'রে থাকে—অপরাধীর মতো……

ধনাই গট্ গট্ ক'রে চলে যায়……

রাত্তিরে শুয়ে-শুয়ে ছিদাম কত কি ভাবে……

দু'চোখ জলে ভ'রে আসে……

পৃথিবীতে নিঃস্ব হ'য়ে যারা আসে, তাদের চোখেই জল অম্‌নি করেই ঝরে' পড়ে—সবার চোখের আড়ালে…নীরবে …অন্ধকারের অন্তরালে……

* * * *

শিউলি আর আসে না……

একটানা জীবন কাটে……

সকাল বেলা বেরিয়ে দুপুর বেলা জালটা হাতে ক'রে ফিরে আসে……

মাছের ঝুড়িটা আরেক হাতে……

রদ্দুরে চেহারা রং তামাটে হয়ে যায়…কপাল দিয়ে স্রোতের মতো ঘাম ছুট্‌তে থাকে……

এরপরে আবার নিজের হাতে পাক কর্‌তেও হয়…কে তাকে পাক করে দেবে ?—

খাওয়া দাওয়া কর্‌তেই বেলা পড়ে আসে……

আবার জালটা কাঁধে নিয়ে নদীর ধারে বেরিয়ে পড়ে…

এম্‌নি করেই দিন কাটে—

হঠাৎ একদিন শুন্‌তে পায়—শিউলির বিয়ে…ওপারের মেনোর সাথে……

ধনাই এসে নেমন্তন্ন করে যায়……

আরো বলে, একটু দেখে শুনে কাজটা উদ্ধার করে দিস্ ছেদাম…আমি একা মানুষ—

ছিদাম মাথা নেড়ে স্বীকার করে……

খুশী হয়ে ধনাই চলে যায়……

খাঁচার পাখীর মতো একটা রুদ্ধ হাহাকার—একটা অশ্রান্ত আক্ষেপ ছিদামের বুক ফেটে বেরোতে চায়……দুহাত দিয়ে নিজের গলাটা টিপে ধরে……

পৃথিবীর বুকে সে যেন একটা অভিশাপ……

জগতের কাছে এর চেয়ে বেশী সে কী আশা কর্‌তে পারে ?……

পাতা-ঝরার পালা শেষ হয়ে—শীত চলে যায়……

ধীরে ধীরে বসন্ত আসে…ফুলের পসরা নিয়ে দক্ষিণের পথে……

ছিদামের সহজ জীবন আবার চল্‌তে থাকে……

ব্যথাকে সে বুকের মণি-কোঠায় যত্ন করে তুলে রাখে…

মাঝে মাঝে চোখের জলে পূজা করে—ব্যথার পূজো !

ক্ষেন্তি আবার তার সমুখ দিয়ে আসে যায়—

ব্যথা-হত প্রাণ নিয়ে ছিদাম যখন নিরালা বসে কত কি চিন্তার জাল বোনে, সে তখন একটুখানি মুচ্‌কি হেসে আড়চোখে চেয়ে যায়……

তার চোখে মুখে খুশী যেন উপ্‌চে পড়ে……

ভাবটা যেন—ছিদাম এবার খুব জব্দ হয়েছে !……

একদিন ফাগুনের বেলা শেষে অকাল-বাদ্‌লা নেবে আসে !

সারা আকাশটা ঘোলাটে…বেবাক্ গায়ে যেন ধুলো মাখা……

দিনটা মন-মরা......

কে যেন গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদছে—

ছিদাম আজ আর বেরোয়নি।

বেরিয়ে কি হবে? টাকা? টাকা তার কী দরকারে আস্‌বে?

শিউলির বিয়ের পর থেকে সে ক্ষ্যাপার মতো কেবল খেটেছে!

টাকাও মেলাই পেয়েছে—কিন্তু—

মনের দারিদ্র্যতা কি টাকায় মিটে?

হঠাৎ তার চিন্তার জাল ছিঁড়ে যায়......

ছিদাম চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারে না......

ক্ষেন্তি আবার বলে, পারবে কিনা বলো...অন্তত তিনটে টাকা—

ছিদামের বিস্ময়ের ঘোর তবু কাটে না···ক্ষেন্তির দিকে সে চেয়ে থাকে অপলকদৃষ্টিতে......

জলে সারা গা ভেজা—ছপ্‌ছপে......

মাথার চুলগুলো খোলা......

কাপড়ের আঁচল বেয়ে—চুলের আগা বেয়ে ফোটা ফোটা করে জল চুইয়ে পড়্‌ছে......

ভেজা কাপড়ের ভেতর দিয়ে সমস্ত শরীর ফুটে উঠ্‌ছে...

সবার উপরে বুকে তার কী সে উদ্দাম যৌবন-শ্রী!··· যেন দু'টি ফুটন্ত ফুল...পূজার জন্যে উন্মুখ আকুল···একটুখানি সহজ আবরণ ঢাকা......

ছিদামের চোখ দিয়ে আগুন ছোটে···বুকের নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসে......

মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে ঘরের কোণ থেকে টাকার পুটুলিটা এনে—যার ভেতর তার সমস্ত উপার্জ্জন জমা করা—ক্ষেন্তির হাতে গুঁজে দেয় কোনো মতে···তারপর—

তারপর উন্মাদের মতো ক্ষেন্তিকে দু'হাতে বুকের মাঝে চেপে ধরে—চুমোয় চুমোয় তার সমস্ত মুখটা ভ'রে দেয়......

ছাড়া পেয়ে ক্ষেন্তি খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে ওঠে......

ঠোঁটে হাত ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে বলে, হেরে গেলি ছেদাম ......

আরো বলে, কিন্তু আমার প্রতিহিংসার শেষ এখনো হয়নি···এবার তোর চোখের জলে বাণ ডাক্‌বে......

বলেই আর সেখানে থাকে না···জলের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ে......

* * * *

সবাই যেমন শোনে, ছিদামও শুন্‌তে পায়—

কী শুন্‌তে পায়?......

—মেনো কাল রাত্তিরেই ক্ষেন্তিকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে···

একটা প্রচণ্ড বজ্রের আঘাতে যেন তার বুকটা ভেঙে পড়ে......

শিউলির ব্যথার সবখানিই যে তার।—

কিন্তু দিন বসে থাকে না......

বসন্তের সমারোহ একদিন রৌদ্র-দগ্ধ পৃথিবীর তাপসী মূর্ত্তি দেখে অদৃশ্য হ'য়ে—যে আসে সেই পথেই।......

বেবাক্ প্রকৃতির মধ্যেই একটা পরিবর্ত্তন জাগে......

ছিদামও আর সে ছিদাম নেই......

এক মুহূর্ত্তে ক্ষেন্তি তাকে বদ্‌লে দিয়ে গেছে......

তার ভেতরকার ক্ষুদ্র ভগবানটি আজ অভাবের তাড়নায় আর্ত্তনাদ করে—সে আজ ভুখা......

ছিদাম অন্তর দিয়ে অনুভব করে......

কিন্তু কী সে ক্ষুধা?...কিসের সে অভাব?......

ছিদাম ভালো ক'রে বুঝ্‌তে পারে না......

শুধু তার মনে হয়,—ক্ষেন্তি যদি আর একবার সেই বাদল রাতের অভিসারিকা হ'য়ে তার কাছে আসে, তাহ'লে আজ সে সব কিছুই তাকে দিতে পারে

শুধু সে এইটুকু বুঝতে পারে—পথ দিয়ে যখন কাঁচা বয়সের মেয়েরা জল নিয়ে যায়···তার ইচ্ছে করে তাদের কলসীগুলো এক ঢিলে ভেঙে দিয়ে তাদের নিয়ে আসে তার কুঁড়ের ভেতর···তার জীর্ণ শয্যার পায়ে......

শুধু এইটুকুই—আর কিছু সে বুঝ্‌তে পারে না......

ক্ষেন্তি তাকে আর কিছু বুঝ্‌তে শেখায়নি......

রাতের আঁধারে তার বেদনা বিরাট হ'য়ে ওঠে......

কেবলি মনে হয়—বড় একা⋯বড় একা⋯⋯

বুকের খুব কাছে...আরো যেন কাকে—

⋯⋯কালো কুশ্রী সারা দুনিয়ার অবজ্ঞাত নারী—যার বুকে যৌবন আছে,—তাকে দিয়েই সে তার ক্ষুধিত আত্মার বাসনার দুয়ারে ধূপ-ধুনা দেবে⋯⋯

দিনের বেলা জালটা কাঁধে নিয়ে নদীর পার দিয়ে ঘুরে' বেড়ায়⋯⋯

যে ঘাটে মেয়েরা নাইতে আসে দলে দলে, তারি একটু দূরে জাল ফেলে বসে⋯⋯

তাদের নাওয়া দেখে......

আরো কত কী⋯⋯

বিকৃত ক্ষুধায় অন্তরের বন্দী ভগবানটে আরো আর্ত্তনাদ করে ওঠে⋯⋯

সেই শিউলির আজ কী চেহারা হয়েছে⋯⋯

যেন শরত-প্রভাতের ফুলে-ভরা শিউলী-গাছের একটা কচি শাখা !⋯⋯

যেন দেহের দুকূল ছাপিয়ে বান এসেছে⋯⋯

যেন——

তেমন সহজ ভাবে আর সে শিউলীকে পায় না⋯⋯

একটা অশান্তি আক্ষেপ জেগে ওঠে বুকের মাঝ-খানটায়⋯

শিউলি যখন ফাঁক পেয়ে দু'একটি কথা জিজ্ঞেস ক'র্‌তে আসে, তখন ছিদাম এমন ভাবে তার দৈহিক সৌন্দর্য্যের দিকে তাকিয়ে থাকে যে, শিউলি মুখ-চোখ লাল ক'রে বুকের কাপড়টাকে আটোসাঁটো কর্‌তে কর্‌তে ছুটে পালায়, —ছিদামের উত্তর না নিয়েই⋯⋯

ছিদামের লোলুপ-দৃষ্টি যেন শিউলির সারা দেহে একটা আলিঙ্গণের মতো লুটিয়ে পড়ে......

* * * *

একদিন কালবোশেখী আসে...ঝড়ের ধ্বজা উড়িয়ে⋯⋯

পৃথিবী যেন আকাশের এতদিনকার চাপা বেদনাটা তার নিজের মাঝে অনুভব কর্‌তে চায়⋯⋯

তাই প্রথম অনুভূতির এই বিরাট আর্ত্তনাদ !⋯⋯

ছিদাম তার কুঁড়ের দুয়ারে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে⋯⋯

একটা ক্ষ্যাপাটে রকমের ভাব তার সমস্ত অন্তর জুড়ে সাড়া দিয়ে ওঠে⋯⋯

কতক্ষণ কাটে⋯⋯হিসেব নেই⋯⋯

দারুণ হাসির মতো একটা সুতীব্র আলো আকাশটাকে দু'ভাগ ক'রে চিরে দেয়......

তারি সাথে পিঠের উপর কার যেন হাতের পরশ পায়...

—তুমি এখনো এখানে বসে আছো ছিদাম দা ? কী রকম লোক তুমি ?⋯দেখ্‌ছো না—কী ভয়ঙ্কর ঝড় আস্‌ছে ...নদীর পারের ঘর—এ কিছুতেই টিক্‌বে না⋯শীগ্‌গীর আমাদের বাড়ী চলো⋯ওঠো......

স্বপ্নের ঘোর কেটে যায়⋯⋯

বিস্ময়ে চোখ দু'টো মদির হ'য়ে ওঠে⋯⋯

শিউলি ?⋯এখানে ?...এমন সময় ?⋯⋯

আবার সেই দৃষ্টি !⋯বিশ্ব-গ্রাসী ক্ষুধার দৃষ্টি !⋯⋯

বিব্রত শিউলি নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বাইরের দিকে তাকায়⋯⋯

তবু মনে হয়—পেছনেও যেন দৃষ্টির স্পর্শ লাগে⋯⋯

শিউলি বাইরের দিকে দেখে—ব্যথিত বিরহীর চাপা-কান্নার মতো হু-হু ক'রে ঝড়-বৃষ্টি যেন আকাশ-ভেঙে ঝাঁপিয়ে পড়্‌বার জন্যে উন্মত্ত...তুগ্রা লক্ষ ঢেউয়ের হাত-তালি দিয়ে চঞ্চলা বালিকার মতো রঙ্গে মেতে উঠেছে⋯⋯

ছিদামকে আবার তাড়া দেয়......

—ওঠো না ছিদাম দা, ঝড় যে বেড়ে উঠ্‌লো⋯শেষে আর এখান থেকে বেরোনো যাবে না যে⋯⋯

শিউলির মুখে চোখে একটা ভয়মিশ্রিত ব্যাকুলতার আভাস দেখা যায়⋯⋯

ছিদাম একবার কথা বলে⋯⋯

বলে, মনে আছে শিউলি, একদিন তুই আমায় বিয়ে করতে বলেছিলি⋯আমি বিয়ে কর্‌বো⋯. .

এ যেন ছিদামের কথা ন... ...যেন আর একজন কথা কয়... ...

শিউলি ব্যস্ত হ'য়ে বলে, সে কোরো এখন। সে তো ভাল কথাই হোল, কিন্তু আর যে দেরী করা চলে না—

কেন চলে না—ছিদাম তা ভাবে না......

বলে, সেদিন শুন্‌তে চেয়েছিলি—কাকে বিয়ে কর্‌বো। আজ সে কথা শুন্‌বি শিউলি?......

ওগো না—এখন শুন্‌তে চাইনে। বাঁচতে চাও তো চলো আমার সাথে...দেখ্‌চো না, তুগ্রায় বাণ ডেকেছে—চলো শীগ্‌গীর......

ছিদাম অর্থহীন উদাস দৃষ্টিতে একবার বাইরের দিকে তাকায়......

দেখ্‌তে পায়, তুগ্রার বুকটা হঠাৎ যেন কিসের উদ্দাম উল্লাসে ফুলে উঠেছে...তার ঢেউগুলো চারিদিকে কলরোল তুলে পাহাড়ের মতো উঁচু হ'য়ে গাঁয়ের দিকে ছুটে আসছে......

—আমি চল্লুম। কে মরবে বাপু তোমার সাথে? বাঁচতে চাও তো আমার সঙ্গে এসো—

বলেই শিউলি বাইরের দিকে পা বাড়ায়......

হঠাৎ একটা দুরন্ত ঝড়ের ঝাপ্‌টার মতো ছিদাম ছুটে গিয়ে তাকে বুকের ভেতর সজোরে চেপে ধরে......

—যেতে আমি দোব না শিউলি,...কিছুতেই না... আমি বিয়ে কর্‌বো যে শিউলি......

শিউলি প্রথমতঃ একটা বিরাট বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে রইলো...তারপর একটা ঝড়ো-হাওয়ার মতো ছিদামের বাহু পাশ থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে বেরিয়ে গেলো...

এতটুখানি পরে......

মেঘ বৃষ্টি-ধারার আঁচল উড়িয়ে ঘুরপাক্ খেলা সুরু করে......

বাতাস তার সঙ্গে যোগ দিয়ে একটা প্রলয়-উৎসবের সৃষ্টি করে......

পৃথিবীর নাড়িতে নাড়িতে কী ব্যথার টান পড়ে—এই আকাশ জোড়া হাহাকারে, গাছপালার করুণ মর্ম্মরে তারি বেদনার আভাস ওঠে......

তুগ্রার বেবাক্ জল উপ্‌চে উঠে দু'কুল ভাসিয়ে নিয়ে যায়......

যেন ঝড়ের মঙ্গল-দুন্দুভির ভেতর দিয়ে কোন্ দেব-কন্যার অভিসার-যাত্রা সুরু হয়......

*　　*　　*　　*

পরদিন উষার আলো ধরণীর বুকে নেমে না আস্‌তেই চারিদিকে জাগরণের সাড়া পড়ে যায়......

যেন কত যুগের পরে এই জাগরণ... যেন সবাই এক নতুন পৃথিবীতে এসেছে......

নদী-তীরের দিকে তাকালে চেনা যায় না......

চারিদিকে গত-রাত্রির ধ্বংস-লীলার ভগ্নস্তূপের সারি...

মাঝে মাঝে পশু-পাখীর মৃত দেহ......

পথ-ঘাট গাছ-পালা পড়ে আট্‌কে গেছে......

তবু তারি ভেতর দিয়েই মানুষ চলেছে—সুন্দরী বসুন্ধরার এই বিধবা-মূর্ত্তিকে দেখ্‌তে......

মড়ার মুখের মতো চেহারা......

সাদা...ফ্যাকাসে......

অনেক কষ্টে গাছ পালা সরিয়ে ছিদামের কুঁড়ের সামনে এসে দাঁড়ায়......

চিন্‌বার যো নেই যে, ওই শিউলি!......

কুঁড়ের চিহ্নটি পর্য্যন্ত নদীতীর হ'তে মুছে গেছে......

অসংখ্য গাছপালা প্রাঙ্গনটুকু জুড়ে আছে......

তারি ফাঁক দিয়ে ব্যাকুল দৃষ্টিতে শিউলি চারিদিকে তাকায়......কি যেন খোঁজে...ঠোঁট কাঁপে......মুখে কথা বেরোতে চায় না......তবু সাহস করে ডাকে—

ছিদামদা,—ওগো ছিদামদা!

প্রভাতের এক ঝাপ্‌টা ফুরফুরে হাওয়া লুটিয়ে-পড়া গাছ গুলোর পাতায় পাতায় মৃত্যু-মর্ম্মর তুলে চলে যায়......

রাণী আমার রাণী

শ্রীপ্রভাত কিরণ বসু

আমায় যদি ত্যাগ ক'রে যাও আপন অভিলাষে
থাকতে যদি না চাও আমার পাশে,
তবু তোমায় বাস্‌ব ভালো সারা জনম ধ'রে,
এমনি ওগো এমনি নিবিড় ক'রে !
জানিয়ে দিতে নাই বা পারি মুখের কথা ব'লে,
মনের ভাষা থাকুক মনের কোলে;
ভালো তোমায় বাস্‌ব আমি' বাস্‌ব ভালো জানি,
রাণী ওগো রাণী আমার রাণী !

কালো চোখের বাহার খানি থাক্‌বে হিয়ায় গাঁথা;
থাক্‌বে পায়ে লুটিয়ে দেওয়া মাথা;
থাক্‌বে তোমার সেবায় ভরা রাঙা হাতের স্মৃতি;
থাক্‌বে তোমার নিবেদনের প্রীতি;
মালা গেঁথে পরিয়ে দেওয়া স্নিগ্ধ হাসির সনে,
থাক্‌বে প্রিয়া থাক্‌বে আমার মনে;
থাক্‌বে তোমার জ্যোস্নারাতে পাগল করা বাণী !
রাণী ওগো রাণী আমার রাণী !

তোমার সখি আমার সখা জান্‌বে সবাই তারা
ভালবাসা সত্যি কেমন ধারা !
বাঁধন তারি ছিন্ন করা নয়ত' সহজ মোটে।
দিনে দিনেই জটিল হয়ে ওঠে !
চোখের আড়াল হলে পরেই যায় না ভুলে যাওয়া।
চায় যে গো মন কেবল ফিরে পাওয়া !
দুঃখে সুখে সকল সময় মুখচ্ছবি খানি
সাম্‌নে জাগে রাণী আমার রাণী !

রোদের রেখা মিলিয়ে আসে গাছের শিরে শিরে,
মিলিয়ে আসে নির্ঝরিনীর তীরে !
বাজ্‌ল দূরে রাখাল ছেলের মেঠোসুরের বাঁশী;
পথের পরে পান্থজনের হাসি ;
শূন্য হল হাটের শেষে অশথ গাছের তলা;
থাম্‌ল লোকের হাজার রকম গলা ;
নাম্‌ল এবার সন্ধ্যা; তোমায় ভাবতে বসি আমি,
রাণী ওগো রাণী আমার রাণী !

ঝি

—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

রূপ ত ছিলই না—যৌবনও যায়-যায়।

উদরে অন্ন নাই······শরীরের উপরেও অত্যাচার! এমন করিলে মানুষের স্বাস্থ্য কয়দিন টিঁকে ?—অথচ এ ব্যবসায়ে ঐ টুকুই হইল যে সব চেয়ে বড় পুঁজী !

কিন্তু উপায় নাই !

এ ভাঙন অনিবার্য্য।

ভাঙুক·····

কিন্তু অর্থ কই ?

শুধু রাতের উপার্জ্জনে কুলায় না।

পেটের ভাত, পরণের কাপড়, তাহা ছাড়া মানুষের জীবনে দু'একটা সাধ-আহ্লাদ আছে ত!

······কুলায় না।

কাজেই দিনের বেলা পরের বাড়ীতে ঝি খাটিতে হয়।

ছোট্ট সংসারটি।—মা, ছেলে, বৌ আর ননির পুতুল খোকাটি।

এই বাড়ীতেই কাজ।

মা'র বয়স হইয়াছে, ঠাকুর ঘরেই তাঁহার দিন কাটিয়া যায়। ছেলেটী কোন্ সওদাগরী অপিসে চাকরী করে, ন'টা না বাজিতেই খাইয়া বাহির হইয়া যায়। বৌটি যেন মূর্ত্তিমতী মমতা আর খোকাটি যেন আকাশ থেকে ঠিক্‌রে পাড়া এক টুক্‌রা চাঁদের আলো!

ভোর বেলাতেই কাজে আসিতে হয়।—

বেলা আটটার মধ্যেই ভাত চাই।—সময় থাকিতে বাসন মাজিয়া, রোয়াক ধুইয়া, রান্নাঘর পরিস্কার করিয়া না দিলে কচি বৌ পারিবে কেন?

সাধারণ গৃহস্থের অনাড়ম্বর সংসার। রাঁধুনী নাই...... বৌ নিজেই রাঁধে, পরিবেশন করে।

ছেলেটির খাওয়ার সময় মা কাছে বসিয়া হাওয়া করেন। কখন কখন হাসিয়া বলেন,—কি বদ্ অভ্যেস বাপু! আচ্ছা, আমি কাছে না বস্‌লে কি তোর খাওয়া হতে নেই কোন দিন?

ছেলেটি হাসিয়া বলে,—এ বদ্ অভ্যেস ত তুমিই করিয়েচ মা—সেই ছেলেবেলা থেকেই। এখন আর আমাকে বক্‌লে কেন চল্‌বে বাপু?

মা হাসিয়া বলেন,—তা' বলে বুড়ো বয়সেও?

ছেলেটি হাসি-চাপা গম্ভীর মুখে বাঁ-হাতে আপনার লম্বা কোঁক্‌ড়া চুলগুলি টানিয়া ধরিয়া বলে,—কই মা, চুলগুলো ত পাকে নি এখনও?

মা প্রসন্ন হাসি-মুখে ছেলেটির দুষ্টুমী ভরা মুখের দিকে সস্নেহে চাহিয়া থাকেন।

ছেলেটি খাইতে খাইতে চট্ করিয়া একবার মুখ তুলিয়া রান্না ঘরের দিকে চাহিয়া লয়। বলে,—আঃ আজকের তরকারী গুলো যা হয়েচে—একেবারে যাচ্ছে তাই!

মা বলেন,—কি করবে বাবা, একলাটি ছেলে মানুষ! —কিন্তু কই তোর পাতে ত কিছু পড়ে রইল না রে?

ছেলেটি হাসি-মাখা মুখে বলে,—কি করি মা, যে পেটের জ্বালা!

বলিয়াই লুকাইয়া সে একবার আড়-চোখে রান্না ঘরের দিকে ফিরয়া চায়।

রান্নাঘরের কপাটের ফাঁকে তখন হয়ত দু'টি কৌতুক-ভরা কালো চোখে কৃত্রিম কোপের উজ্জ্বল মাধুরীটুকু ঝিক্ মিক্ করে।

ঝি সবই দেখে—বুঝেও সে সবই।

হাজার হউক মানুষ ত সেও!......তাই, বুকে যেন তাহার কেমন একটা হাহাকার জাগে যখনই সে তাহার নিজের দিকে ফিরিয়া চায়!

এই শান্তিপূর্ণ আনন্দময় সংসার—এই স্নিগ্ধ পবিত্র স্নেহ-নীড়—ইহারই মাঝে ইহাদের মত একজন করিয়া তাহাকে সৃষ্টি করা কি এতই অসম্ভব ছিল ভগবান!

পতিতার মেয়ে—পতিতা হওয়া ছাড়া কি তাহার আর কোন গত্যন্তরই ছিল না পৃথিবীতে!

সমাজ-বিচ্ছিন্ন এই জঘন্য ঘৃণিত জীবন......

জন্ম যেন একটা অভিসম্পাৎ!

দুঃখে দরদ নাই, রোগে সেবা নাই, চৈত্র-খরায় শুষ্ক নদীর মত জীবনে যেন কোথাও একটু সরসতা নাই—কেবল ধুধু করিতেছে শুধু রুক্ষ রিক্ত তপ্ত বালুচর......

কেন?

ছেলেটি তাড়াতাড়ি করে......

আপিসে যাইবার নাকি তাহার বেলা হইয়া গেছে!

বৌটি তাড়াতাড়ি পান সাজিয়া লইয়া ঘরে ঢুকে।

ছেলেটি ততক্ষণে কাপড় ছাড়িয়া জামা গায় দেয়—বৌটি পান কয়টি ডিবায় রাখিয়া ছেলেটির পায়ে ফিতা বাঁধিতে বসে।

জামা গায়ে দেওয়াও শেষ হয়—জুতার ফিতা বাঁধাও শেষ হয়।

যাইবার সময় ছেলেটি আদর করিয়া বৌটির গাল দুটি একটু টিপিয়া দেয়। চকিতের নিমিত্ত দুই জনে চোখো-

চোখী চাহিয়া ফিক্ করিয়া একটুখানি হাসে। পরক্ষণেই ছেলেটি বাহির হইয়া যায় তাহার নিজের কাজে, বৌটি নামিয়া আসে নীচে শাশুড়ীর কাছে।

কিন্তু পাশের বারান্দা দিয়া চলিতে চলিতে আর একজনের চোখে পড়িয়া যায় ঐ সোহাগটুকু!

সে ভাবে,—কী মধুর ঐ দু'টি আঙুলের একটুখানি মিষ্টি ছোঁওয়া!

মনে পড়ে তাহার রাত-চরা প্রেমিক-অতিথিগুলির ব্যবহারের কথা।—প্রবৃত্তির তাড়নাই বুঝি তাহাদের কাছে সব খানি!—কই এমন আদর, এমন সোহাগ ত কেহ কোনদিন করে নাই তাহাকে!

ঐ ছোঁওয়াটুকু যেন পরশ মণি।—ঐটুকু পাইলে লোহাও বুঝি সোনা হইতে পারে!

আজ সহসা যেন তাহার মনে হয় এ নারী জন্মটা তাহার বৃথাই গেছে!

সমস্ত বিকালবেলটা মা'র জপ-আহ্নিক ও পূজার গোছ করিতে ঠাকুর ঘরেই কাটিয়া যায়।

বৌ একলাটি চুল বাঁধে, বিছানা করে, পান সাজে, গা ধোয়। সন্ধ্যাবেলায় তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালে, গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করে।

ঝি ততক্ষণে বাসন মাজে, উনান ধরায়, ঘর ঝাঁট দেয়। আজ দিন তিনেক হইল কি জানি কেন রোজ বিকালে তাহার একটু করিয়া জ্বর হয়—হাত-পা জ্বালা করে, চোখ-মুখ দিয়া যেন আগুনের ঝাঁঝ্ বাহির হয়! শ্রান্ত শরীর আর পারে না, একটুখানি বিশ্রাম চায়।

হইলই বা ঝি, তবু বৌটি তাহার ঐ কষ্টটুকু বুঝে। তাই,—থাক্ ভাই, আজ আর তোমাকে বেশী খাটতে হবে না। তুমি শুধু উনুনটা ধরিয়ে দিও, আমি নিজেই বাসন মেজে ঘর ঝাঁট দিয়ে নেব'খন।

ছেলেটি অপিস হইতে ঘরে ফিরে। বৌটি নিজে আসিয়া তাহার জামার বোতাম খুলিয়া দেয়, হাত-পাখা লইয়া বাতাস করে।

বিনিময়ে ছেলেটি হয়ত কোন কোনদিন তাহার নরম রাঙা ঠোঁট দু'খানিতে ছোট্ট একটি চুমু দেয়।

বৌটি হাসিয়া বলে,—আঃ জ্বালাতন! তোমার কি সময় অসময় নেই?

খোকা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠে। বলে,—বাবা আমালেও।

রান্নাঘর হইতে খোলা জানালা দিয়া ছেলেটির ঘরের ভিতরটা বেশ দেখা যায়। উনান ধরাইবার অছিলায় আসিয়া ঝি সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চুরি করিয়া শুধু উহাই দেখে।

এক একদিন তাহার মনে হয়,—ঐ বৌটি যদি সে নিজে হইত!

বড় ইচ্ছা হয় অমনি স্বামীপুত্র লইয়া একটি সংসার পাতিতে।

কিন্তু.... ....

মানুষের সমাজে সে উদারতা কই?

জ্বরটা বোধহয় সেদিন একটু বেশী জোরেই আসিল।

সন্ধ্যা তখনও হয় নাই।

বৌটি বলে,—আজ আর তোমাকে বেশীক্ষণ থাকতে হবে না ভাই, তুমি বাড়ী যাও। নইলে এরপর হয়ত আর তুমি যেতেই পারবে না। আমি কিছু পয়সা দিচ্ছি যাবার সময় ফল কিনে নিয়ে যেও। ভাত-টাত আজ আর কিছু খেওনা যেন।—বুঝলে?

আঁচলের খুঁট হইতে একটি আধুলি খুলিয়া বৌটি তাহার হাতে গুঁজিয়া দেয়।

আধুলি.........!

এযে প্রায় তাহার দু'টি দিনের উপার্জ্জন!

মুখ দিয়া তাহার আর কথা ফুটে না,—শুধু জল-ভরা দু'টি চক্ষু মেলিয়া মেয়েটির মুখের দিকে সে চাহিয়া থাকে।

সে চাহনির একটা অর্থ আছে কিন্তু ভাষায় তাহার প্রকাশ নাই!

রাত্রি তখন প্রায় বারোটা।

জ্বরটা তখন সবেমাত্র ছাড়িয়াছে।

এঁদোপড়া অন্ধকার গলি। দূরে মোড়ের মাথায় একটা লাইট্‌পোষ্ট।—কিন্তু তাহার সহিত এ গলিটার যেন কোন সম্বন্ধই নাই! দুইধারে ময়লা-পচা দুর্গন্ধ নর্দ্দমা। তাহারই গায়ে সারি-সারি খোলার ঘর। ইহারই একটা ঘরে সে থাকে।

অতরাত্রেও গলিটা নির্জ্জন নহে। তখনও পর্য্যন্ত দুই চারিটি হতভাগিনী তাহাদের দুর্ভাগ্যের তাড়নায় অজানা প্রিয়তমের পথ চাহিয়া বসিয়াছিল।

সহসা মনে হইল কে যেন তাহার দুয়ার ঠেলিতেছে!

—কে?

—আমি ছন্নু। ঘরে কেউ আচে নাকি রে?

—না।

—তবে দোর খোল্।

—আজ বড্ড জ্বর হয়েচে মাইরি। মোটে উঠতে পার্‌চি না।

হো হো করিয়া একটা হাসির শব্দ!

বলে,—ন্যাকামী ত খুব শিখেচিস্ মাইরি! কোন্ শালা বুঝি বায়না করে গেছে?

—না মাইরি না।

—তবে ওঠ্। দোর খোল্। চিনিস ত ছন্নু মিঞাকে!

চিনে বৈকি! সেদিন চুম্‌কির ঘরে যে রক্তারক্তিটা হইয়া গেল তাহার স্মৃতি কি সহজে ভোলা যায়!

কাজেই উঠিতে হয় এবং দুয়ারটাও খুলিতে হয়।

মাথাটা বোধ হয় তখনও টলে!

দুয়ার খুলিয়া সে উপরের চৌকাঠখানি দুই হাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া দাঁড়ায়।

ছন্নু অগ্রসর হইয়া তাহার চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলে,—তবে নাকি প্রাণ উঠ্‌তে পার না!

কী বিভৎস চেহারা ঐ লোকটার!

দিনের বেলা ঘোড়ার গাড়ী হাঁকায় আর রাতের বেলা গুণ্ডামী করে।

মদের নেশায় তখন একেবারে চুর্!

বলে—চল্। তোর ঘরে আজ বস্‌বো আমি।

—তোর দু'টী পায়ে পড়ি ভাই, আজকে আমাকে মাপ কর।—

—খুব—খুব পারবি। তুই চল্ ত দেখি।

ছন্নু যেন একপ্রকার জোর করিয়াই ঘরে ঢোকে।

কোটর প্রবিষ্ট চক্ষু দুইটি হইতে শুধু দু'ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়ে।

এক ভগবান ছাড়া বুঝি আর কেহ তাহা দেখিতে পায় না।

ঝনাৎ।

দুয়ারটা বোধ হয় ছন্নু নিজেই বন্ধ করিয়া দেয়।

—:•:—

দেবদাসী

—শ্রীহীরালাল গুপ্ত

বহু আয়াসে মাদ্রাজী ভাষা অর্থাৎ তেলেগু যতটা শিখেছিলুম তাতে বেশ কথা বল্‌তে পাত্তুম। দয়াটা সম্পূর্ণ আমার সহকর্ম্মী মিষ্টার রমণের। আটটী ঘণ্টা একত্রে থাক্‌তুম কাজ কর্ম্ম খুব কমই কর্ত্তে হ'ত তাই সহজে কাজটা সমাধা হ'য়ে গেল। কোন আবশ্যক না থাক্‌লেও কেন যে এই "ড" এর শ্রাদ্ধক্রিয়ার উপর এতটা ঝুঁকে পড়েছিলুম তাইই বল্‌বার জন্যে এই প্রসঙ্গের অবতারণা।

আমাদের আশে পাশে বহু মাদ্রাজী সপরিবারে বাস করতো। তাদের সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে হ'লে এক ইংরেজী ছাড়া গতি ছিলনা। পরন্তু জান্‌তে পাল্লুম—আমাদেরই বাসার কাছে মিষ্টার রমণের একটী প্রণয়িনী আছে।

মিষ্টার রমণকে জিজ্ঞেসা কল্লে—সে বল্‌ত—"আত্মীয়ের বাসায় তোমরা কি যাও না মিঃ সে?"

কিন্তু কি আত্মীয়তা ওদের সঙ্গে আছে জিজ্ঞেস্ কল্লে—শুধু হেসেই সে কথার উত্তর দিত।

আমার কিন্তু গোড়াথেকেই সন্দেহ একটু হ'য়েছিল—যে, আত্মীয়তার কথা রমণের চালাকী—প্রকৃতপক্ষে—ওই কৃষ্ণবর্ণা যুবতীটীরই ওপর তার আসক্তি। এই রহস্য ভেদ করার তীব্র-আকাঙ্ক্ষাই আমাকে তেলেগু শিক্ষায় উন্মাদ ক'রেছিল।

মাদ্রাজী মেয়েটী যখন সামনের মাঠের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত কর্ত্ত। একদিন তাকে উদ্দেশ ক'রে বল্লুম—"বাঙ্গালী বাবুদের দিকে চাইলেও কি পাপগ্রস্ত হতে হয় নাকি?"

সে বোধ হয় বুঝ্‌লে—কথাটা তাকে উদ্দেশ ক'রেই বলা হ'য়েছে, কারণ, সে একবার ফিরে চাইলে আমার দিকে। বোধ হয় সে একটু আশ্চর্য্য হ'য়েছিল—বাঙ্গালীর মুখে তেলেগু শুনে'—তাও এমন পরিষ্কার উচ্চারণের সঙ্গে।

মাথাটী তার আবার নুয়ে পড়্‌ল—আমিও সড়ে পড়লাম।

আর একদিন জিজ্ঞেস্ কল্লুম—"দয়া ক'রে আমার একটা কথা শুন্‌বে কি?"

সে ফিরে বল্লে—"আমাকে বল্‌ছ?"

আমি—উত্তর দিলুম—"হাঁ"

"কি?" ব'লে সে দাঁড়াল।

"রমণ কে তুমি জান?"

"হ্যাঁ।"

তার সঙ্গে তোমাদের কোন আত্মীয়তা আছে?"

"না," ব'লে সে চল্‌তে আরম্ভ কল্লে।

মনটায় আনন্দ হ'ল। রমণকে বেশ করে পাকড়ালুম। শেষটা সে সব স্বীকার কল্লে। বুঝতে পাল্লুম তাদের প্রণয় খুব গাঢ়ই হ'য়েছে। এ পথে চলা বড় শক্ত। তাই তাদের এ সুখ অধিক দিন স্থায়ী হ'ল না।

মাদ্রাজে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এই রকম একটা নিয়ম আছে যে তারা কোন কোন কুমারীকে দেবদাসী করে অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে বিবাহ দেয়। তখন তাদের দেহ শুদ্ধ হ'য়ে যায়। অতঃপর তাদের পেশা হয় গণিকা বৃত্তি। এতে সমাজেও তাদের কোন দুর্ণাম হয় না। পরন্তু আয়ের পন্থা বেশ সুগম হয়।

মেয়েটীর নাম ছিল সুমিত্রা। সুমিত্রার পিতৃহীন এক ভাই, সে ২০৲ টাকা বেতনে কাজ কর্ত্ত। তাই ছিল তাদের সংসারের সম্বল।

এক কথায় তারা ছিল বড় গরীব। কিন্তু গরীব হ'লেও ভ্রাতৃবরের ব্যসনের ত্রুটী বিন্দুমাত্র হ'তে পাত্ত না। মদও একটু আধটু খেত', সঙ্গে সঙ্গে তার সাথীটিও চল্‌ত। সুমিত্রা কত কেঁদেছে। তার পায়ে মাথা খুঁড়ে সৎপথে আস্‌তে অনুরোধ ক'রেছে তার পরিবর্ত্তে সে পেয়েছে শুধু গালাগাল। মা বৃদ্ধা, সুতরাং সে তার এই উপযুক্ত পুত্রকে ভয় কর্ত্ত! আর একটী ছোট বোন—নেহাৎ ছোট। সুমিত্রার বয়স ১৪।১৫। সে যখন বুঝ্‌তে পাল্লে যে দাদাকে ব'লে কিছু লাভ নেই—তখন সে চুপ ক'রে থাকত। চা'ল না থাক্‌লে উপোষ দিত কিন্তু মাঝে মাঝে ছোট বোনটীকে নিয়ে বড় বিব্রত হ'য়ে পড়্‌ত। নিজে না হয় উপোষ দিতে পারে কিন্তু ছোট বোন্—লিলি, তাকে ত আর রাখা যায় না ক্ষুধা পেলে?

সে দিন সবে আমি অফিস্ থেকে এসে কাপড় জামা গুলো ছাড়্‌ছিলুম হঠাৎ "বাবু" শব্দে চম্‌কে চেয়ে দেখি—ম্লানমুখী সুমিত্রা।

আমি ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞেস্ কল্লুম—"কি চাও?" সে ধরা-গলায় বল্‌তে লাগ্‌ল—আজ দু'দিন তার দাদা বাড়ী আসে নি। ঘরে খাওয়ার কিছু নেই—একটী পয়সা নেই। তারা দুই মায়ে ঝিয়ে উপোষ আছে। কিন্তু লিলিকে ত আর রাখা যায় না।

ঘর থেকে দু'সের চা'ল আর একটী টাকা দিয়ে বল্লাম—"তুমি আজ থেকে আমারও বোন্। যখন কিছু দরকার হবে—আমার কাছে আসবে।—আস্‌বে ত?"

সে ধীরে মাথা নাড়লে—চোখ দুটী তখন তার জলভারে টল্ টল্ কচ্ছে।

রমণকে এ কথা বল্লুম না।

তারপর কিছুদিন চুপচাপ। হঠাৎ একদিন তাদের ঘরে তার ভা'য়ের চীৎকার শুন্‌লুম।—বুঝলুম সে

সুমিত্রাকেই গালাগাল দিচ্ছে। চুপ করে তাদের ঘরের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালুম। একে একে যা' শুনলুম তাতে আমার পা' থেকে মাথা পর্য্যন্ত একটা শিহরণ ব'য়ে গেল।

সুমিত্রা বলছে—"দাদা, তোমার পায়ে ধরি দেবদাসী আমি হতে চাই নে। সে আমি সহ্য কর্ত্তে পারব না—"।

"তবে তোকে খেতে দেবে কে?"

"আমাকে দুটো খেতে দিতে না পার ত তাড়িয়ে দাও, আমি ভিক্ষা ক'রে খাব।"

সে গর্জ্জন করে উঠল—"হ্যাঁঃ ভিক্ষে ক'রে ত খাবেন, —তা' এদ্দিন যে আমার অন্ন ধ্বংসালি—তার খরচটা কে দেবে?"

এর উত্তর সে অভাগী কি দিবে—এক চোখের জল ছাড়া?

আবার সে গর্জ্জে উঠল—"ও ন্যাকামো রাখ—কাজটা হ'য়ে যাক্—তারপর দেখ্‌বি আমাদের আর কোনো অভাব থাক্‌বে না। কত পয়সাওয়ালা—

সুমিত্রা শুধু আর্ত্ত-চীৎকারে বল্লে—"না দাদা, তোমার পায়ে পড়ি।

"তবু ন্যাকামো?—হারামজাদী!"—

তারপর সুমিত্রার চীৎকার!

দু'হাতে বুকটা চেপে ধরে ফিরলাম।

পরদিন রমণকে চেপে ধরলাম—দেবদাসী জিনিষটা কি শুনবার জন্যে।

সে ব'লে গেল সব ব্যাপারটা। তাকে আমি বল্লুম সুমিত্রার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে। সে রাজী হ'ল।

কালকের ব্যাপার তার কাছে কিছু বল্লুম না।

"তুমি তা হ'লে সব শুনেছ মিঃ সেন!"

"নিশ্চয়ই!"

"আমার পক্ষে কিন্তু অসম্ভব।"

"কি?"

"তাকে বিয়ে করা!"

আমি একটু শঙ্কিত হয়ে বল্লুম—"কেন?"

"আমি ব্রাহ্মণ আর সে শূদ্রাণী!"

সুমিত্রাও যে জানতো না তা নয়, তবু আজ যখন স্পষ্ট বললাম সে যেনো আকাশ থেকে পড়লো। বেটীর কি ঢঙ্! বলে বামুন শূদ্দুর মানি না, তুমি ভালবাস আমাকে আমার মনের এই সত্যিকার গৌরব ভেঙে দিয়ো না!"

"তবে তার সঙ্গে কোর্টসিপ কর্ত্তে গিছলে কি জন্যে?"

"সে কোর্টসিপ নয়। আমি তাকে ভালবাসি এ তার ভাগ্যি!"

মাথাটা উত্তপ্ত হ'য়ে উঠল।—"তুমি খুসীমত তার ধর্ম্ম নষ্ট কল্লেও সেটা হবে তার ভাগ্যি।"

"ঠিক তাই মিঃ সেন! তাদের কর্ত্তব্যই ত ব্রাহ্মণের সেবা।"

চীৎকার করে বল্লুম—"চুপ কর্ ড্যাম্ রাস্কেল! তোমরা কি মানুষ? না আজ থেকে তোমার সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ। তোমরা পশু। তোমাদের সঙ্গে কথা বলাও মহা পাপ।"

ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছিল। উঠে চ'লে যাচ্ছিলুম।

সে একটু হেসে' আমার হাতখানা ধ'রে বল্লে—"এ দিনের বন্ধুত্ব এক নিমেষে ভুল্‌লে চল্‌বে কেন বন্ধু? আমি ভুল বুঝ্‌লে আমায় সম্‌ঝে দাও।"

আমার মনটা একটু ঠাণ্ডা হ'ল। বল্লুম—"শোন রমণ! ঘুমন্তকে জাগান যায় কিন্তু যে জেগে ঘুমোয় তাকে জাগানো যায় না। তুমি লেখা পড়া শিখেছ সব বোঝ কিন্তু বুঝ্‌তে চাওনা স্বার্থের খাতিরে। কিন্তু এমন দিন আস্‌বে আমি ব'লে দিচ্চি রমণ—যখন শুধু অনুতাপ কর্ব্বে। প্রতীকারের আর কোন পথ খুঁজে পাবে না। আচ্ছা যখন তুমি তাকে বিয়ে কর্ত্তে পার্ব্বে না জান, তখন তাকে মজালে কেন?"

"তার দাদা ব'লেছিল যে সে তাকে দেব দাসী কর্ব্বে!"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকলুম। তারপর বল্লুম—"তোমার প্রাণে কি একটু লাগলো না—তার সর্ব্বনাশ কর্ত্তে? তুমি না শিক্ষিত? তুমি না গর্ব্ব কর্ত্তে তিলকের, আয়েঙ্গারের। আচ্ছা তোমার কি মত এই নিয়ম সম্বন্ধে?"

সে বল্লে—"আমার মতামতে কি যায় আসে মিঃ সেন? তার রূপটা চোখে লেগেছিল—দু'দিন মজা মেরে' নিলুম অর্থের বিনিময়ে। কারণ আমি জানতুম যে এর পরে সে

দশ হাত চলাফেরা কর্বে! ভাল তাকে আমি একটুও বাসিনি মিঃ সেন।”

সমস্ত মাথাটা ঘুরে' গেল। সাম্‌লে' নিয়ে বল্লুম—“বড় ভুল ক'রেছি, রমণ, তোমাদের ভাষা শিখে'।—এখন আমার কাঁদতে ইচ্ছে হচ্চে। আর তোমার সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলাপ কর্ত্তে চাইনে—খবরদার! সাবধান ক'রে দিচ্চি তোমায় —পুনর্ব্বার আমার সঙ্গে এ প্রসঙ্গ নিয়ে কথা উত্থাপন কল্লে —এই অফিসের মধ্যে ঘুষোঘুষি হয়ে যাবে। মাদ্রাজ যে এখনো এত নীচে তা এদ্দিনে জান্‌লুম।”

বেড়িয়ে গেলুম সেখেন থেকে। ভাব্‌লুম—ভিন্নদেশে বাড়ী—এ সব নিয়ে মাথা ঘামাবার, মন খারাপ কর্ব্বার দরকার আমার নেই। আর সে সম্বন্ধে জানবার চেষ্টাও কিছু কল্লুম না। মাঝে মাঝে সুমিত্রার চীৎকারে মনটা বড় চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ত। জোর ক'রে মনের টুঁটি টিপে তাকে শান্ত কর্ত্তুম।

সমুদ্রের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা বিশ্বজগৎ পেলেও তৃপ্ত হয় না।

সৃষ্টিছাড়া একবিন্দু গোষ্পদ বিধাতার বিধান না মেনে তাঁকে ফাঁকি দেবে ভেবেছিলো, সবার আড়ালে লুকিয়ে থেকে।

কিন্তু শেষ রক্ষা হোল না।

সুমিত্রাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হোল নিজের প্রাণ দিয়ে। এটা তার বিদ্রোহের শাস্তি।

রাতের বেলায় ভাবছিলাম—সুমিত্রাকে না হয় আমার বাড়ীতেই এনে আশ্রয় দেবো। ও থাকবে আমার সত্যি-কার বোন হয়ে—আমাদের সংসারের একটী ধারে।

ভোর হতেই দেখলাম—সব শেষ হোয়ে গেছে।—বাড়ীটা পুলিশে ঘিরে ফেলেছে। আজ কিন্তু জীবন্তকে পারে নি, মৃত সুমিত্রার দেহটী ঘিরে তার ভাই এবং বন্ধুরা, তার প্রেতযোনী উদ্ধারের মন্ত্র পড়ছে।—দেবতার অনুকম্পা না হোলে তো আত্মঘাতী মর্ত্ত ছেড়ে স্বর্গে যেতে পারবে না!

দেবতার সামনে সুমিত্রা নিজের ধর্ম্ম এবং সম্মান বলি দেয় নি। তার চেয়েও বেশী দিয়েছিল—নিজের অকলঙ্ক প্রাণ।

সুমিত্রার অত্যাচারী দাদা এবং রমণ আজ শান্ত। চোখ তাদের লাল—জবাফুলের মতো। ইচ্ছে হচ্ছিল একবার বলে দিই সবাইকে—“আফিং খাওয়াটা সুমিত্রার অপরাধ নয়। এই লোক দুটোর ফাঁসী হওয়া দরকার। এরাই খুনে। এদেরই অত্যাচারে সুমিত্রা আত্মহত্যা করেছে।”

কিন্তু কেই বা শুনবে আমার কথা!

অফিসে সাহেবের কাছে দরখাস্ত দিয়ে বদ্‌লি চাইলুম। যখন যাই বদ্‌লি হ'য়ে—রমণ ডাক্‌লে—“মিঃ সেন!”

উত্তর দিলুম না তার কথায়। মনে হ'ল—সে একটী পাপের পূর্ণ প্রতিকৃতি।

.........এখনো স্বপ্নের মাঝে আঁতকে উঠি—সুমিত্রার সেই বিষাদ মলিন মুখখানি মনে ক'রে; আর কাণে বাজে সেই আর্ত্তধ্বনি—“দাদা—তোমার পায়ে পড়ি দেবদাসী আমি হ'ব না।”

রবিবারের রামায়ণ

—শ্রীগ্রহাচার্য্য

ষষ্ঠীবাবু গুণগুণ করে গান গেয়ে তান ধরেন,—আমরা চার রকমের চার বিরহিনী—

হরিপদ বাধা দিয়ে বলে—চার নয়তো, পাঁচ!

ষষ্ঠী রেগে যায়। বোঝাতে চেষ্টা করে, গান হচ্ছে গান, সঙ্গীত, কাব্য, খাস সুরলোক থেকে আমদানী,—ওর ভুল ধরতে নেই। গান ইতিহাসও নয় খবরের কাগজও নয় আর মাসকাবারি শনিবারের হিসেবের খাতাও নয় যে পাই ক্রান্তি বজায় রেখে চলতে হবে,—

শশী অবাক হয়ে ষষ্ঠীর দিকে তাকিয়ে থাকে পুরো দেড় মিনিট, তার পর জিজ্ঞাসা করে, এত বক্তৃতা তুই শিখ্‌লি কোথা থেকে?

আহ্লাদে ষষ্ঠীর বুকটা আটখানা হয়ে যায়, ভাবে অন্ততঃ একজন তাকে চিনতে পেরেছে এবং তার প্রতিভার তারিফ করেছে—

হরিপদ শশীর প্রশ্নের জবাব দেয়—মা সরস্বতীর বরপুত্র—

ষষ্ঠী মনে করে ওটা হল গিয়ে—শ্লেষ। রেগে ওদের জব্দ করবে বলে মুখ বন্ধ করে থাকে। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পনের মিনিট কাটে। কারও মুখে কথাটী নেই। নিঃসাড়ে যে যার কাজ করে চলেছে। কিন্তু কাজেও মন বসে না। গল্প করতে করতে মনের ভুলে হাত যে রকম চলতে থাকে, মন সজাগ থেকে তার গতি বন্ধ করে দেয়।

পরেশ এতক্ষণ একটা গ্যেলি ডিস্‌ট্রিবিউট্‌ করছিল।

সেটা শেষ হয়ে যেতে হাঁপ ছেড়ে দাঁড়িয়ে বাকী কজনের মুখের দিকে তাকিয়ে সমস্ত ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করে আশ্চর্য্য হোয়ে বললে—এটা যে শীতকাল, কিন্তু মনে হচ্ছে বর্ষা, কি গুমোট বাব্বা! যা হয় একটা কিছু করো, হয় বৃষ্টি না হয় বাদলা—

শশী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে—ও দুটোর তফাৎ কি ভাই?

হরিপদ বললে—গান যেমন গান কথা তেমনি কথা! শব্দ ব্রহ্ম শোননি? কথার ভুল ধরলে ব্রহ্মের অপমান হয়—

ষষ্ঠী বুঝলে এবারেও হরিপদ তার কথারই ব্যঙ্গোক্তি করলো। সে আরও গম্ভীর হয়ে গেল।

আসছে মাস থেকে বাবুদের রবিবারের রামায়ণ নামে একখানা মাসিক কাগজ বার হবে—তারই কিছু বিজ্ঞাপনের টাইপ সাজাতে সাজাতে পরেশ বললে—ষষ্ঠীবাবুকে তোমরা জানোনা। সেদিন বঙ্গেবর্গী থিয়েটার হোল' ষষ্ঠীবাবু মাধুরীর পার্ট প্লে করেছিল। এমন জমেছিল,—

হরিপদ 'ফিল অফ্‌ দি গ্যাপস্‌'-এর অনুকরণে বলে উঠল—ঠিক যেন বরফ!

পরেশ বললে—নাহে হরিপদ ঠাট্টা নয়! মৈমনসিংহের রাজা নিজে বলে গেছেন আসছে মাসে একটা সোণার মেডেল পাঠিয়ে দেবেন ষষ্ঠীকে—

হরিপদ বললে—সে আসছে মাস আর আসবে না—

যতীন লোকটা নতুন। সে এখনো ধোপদুরস্ত হয় নি। বাকী সকলের কথার মাঝখানে কথা কয়ে রসভঙ্গ করতে চায় না। অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করে মাঝে মাঝে মুচকে হাসে, এই পর্য্যন্ত। আজ তারও গাম্ভীর্য্য নষ্ট হয়েছিল একটু মাত্রা বাড়িয়ে, অর্থাৎ হাসির ডিগ্রিটা ১০৫ পেরিয়ে গিয়েছিল, ষ্টীম বেরুবার সূচনা নিঃসন্দেহ।

শশী বললে—ব্যাপার কি হে যতীন—

যতীন বললে—ওঁদের দুজনের কথা শুনে আমার একটা গল্পের কথা মনে পড়ল—

পরেশ বললে—তাহলে বলে ফেলো—

যতীন নিজের দরটা একটু বাড়াবার জন্য উপক্রমণিকা

ভাঁজতে লাগল—দেখুন দাদারা! আমাদের বড় বাবু রবিবারের রামায়ণ বার করবেন এবং তার জন্যে কত গল্প উপন্যাস কবিতা সমুদ্র তোলাপাড় করে বেড়াচ্ছেন। ওঁরা মস্ত মস্ত কথা বলেন—পত্রিকার ভেতরে প্রেরণার অনুভূতি জাগাতে হবে। সাহিত্যক্ষেত্রে মনগড়া দুটো দল খাড়া করে তুলেছেন—একটার যুদ্ধনিশান তৈরী হয়েছে মুর্গীর ঝুঁটি বুনে আর একটার হবে সবুজ তালপাতা! সবুজ পত্র নয় কিন্তু! সেটা ছিল নকল, তালের জাত হোলেও বিদেশী পাম। এবারে খাঁটি স্বদেশী। খাস বাংলার প্রাণের রক্ত দিয়ে আঁকা। ওঁরা সব বড় বড় রথী। শনিবারের মটো গরদের পাঞ্জাবী গায়ে ঝুলিয়ে, রাবীন্দ্রিক প্যাটার্ণে চুল আঁচড়ে, মোটর হাঁকিয়ে চলতে চলতে, যে ভিখিরী বুড়োটা চাপা পড়ে থেঁতলে মরলো তারই দিকে একটীবার চোখ ঘুরিয়ে আহা করে পরক্ষণেই বর্ম্মাচুরুটের ধোয়া ছেড়ে ভাবতে হবে—ওমার খৈয়ামের অমর বাণী—জগতের সবই নশ্বর—যে কটা দিন হাতে আছে এই সত্যি—আমোদ কর—উপভোগ কর—যারা মরতে চায় ধুলো ঘেঁটে মরুক—প্রিয়ার মুখের চুম্বন—টাকার বাদ্যির মাধুর্য্য এই দুটো জিনিষই শুধু জগতে অমর—অতএব ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। শনিবারের রাতের উচ্ছৃঙ্খল নেশা কেটে গেলে যখন অবসাদ আসে—রবিবার এগিয়ে আসেন ঐ বুড়ো ভিখিরীটাকে কাঁধে তুলে ঘাটে নিয়ে যান,—তার অনাথ পরিবারদের দুঃখে সহানুভূতি জানান,—শুধু আহা বলে মুখের কথায় নয়, পয়সা দিয়ে, সামর্থ্য দিয়ে, সাহায্য করেন,—রাতের শেষে, যে ফুলটী সৌরভ হারিয়ে ঝরে পড়ল তাকেই বুকে তুলে ঠাঁই দেন,—দুঃখীর জগৎ যেখানে সেইখানেই তাঁর বিহার, মুটেমজুরের দুঃখদিনের কবি তিনি!—শনিবার মুখ ফিরিয়ে বলে—নোংরা—বস্তীর পোকা। রবিবার হেসে জবাব দেয়—উপভোগ করে রসটুকু নিঃশেষ করে—অবশেষে জঞ্জাল বলে যাকে ফেলে দিলে তোমরা আমরা তাকেই আদর করে ফিরিয়ে আনি জগতের দেবতার মন্দিরে এই আমাদের গর্ব্ব। তোমরা বোধ হয় অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছ আমার এত বড় ভূমিকার দরকার কি! দরকার আর কিছু নয়—আমি এইটুকু বলতে চাই জগতের কথার ব্যবসা করেই লোকে দিন কাটায়। গান এবং গল্প যা নিয়ে আজ তর্কটা উঠ্‌ল—ও জিনিষ গুলা কারও নিজস্ব নয়। একদিক দিয়ে ওদের দাম অমূল্য। আবার উল্টোদিক দিয়ে ভাবলে ওরা একেবারেই নিরর্থক। হরিপদবাবু শশীবাবুর ঝগড়াও যেমনি শনিবার আর রবিবারের ঝগড়াও ঠিক তাই। কেউ ভাবে আকাশ পাতাল তফাৎ—এরা মিলতে পারে না!—আবার কিছুক্ষণ শান্ত হতে দাও ওরা আপনারাই তলিয়ে বুঝবে—ও ঝগড়ার মানেই হয় না। কে ভাষার মধ্যে শুক্‌নো চিরা কিম্বা থুথুরো পচা ঘর লিখেছে ওমনি অপর পক্ষ পেয়ে বসল—অকথ্য এবং অভদ্র কথায় গালাগালি আরম্ভ করল—যেন ঐ দুটো কথা বলে মহাভারত অশুদ্ধ করে দিয়েছে। ওদের দল ভাবলে গালাগাল শুনে এরা হয়তো বাসায় গিয়ে মরে থাকবে। ঠিক যেমন হরিবাবুর বিদ্রূপ শুনে ষষ্ঠীবাবু মনমরা হয়ে পড়েছেন। আমরা কিন্তু মধ্যবিত্ত—অর্থাৎ মাঝখানের লোক। আমরা বলি ষষ্ঠীবাবুর রাগ করবার কি আছে, ওরা বলে বলে মুখ ব্যথা করুক, তারপর আপনিই থামবে। তুমি তোমার নিজের কাজ এবং আনন্দ ভুলে নিজেকে কষ্ট দাও কেন?

যতীনের বক্তৃতা শুনে সবাই আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েছিল।

সে থামলে হরিপদ এগিয়ে এসে ষষ্ঠীর হাত ধরে বললে—রাগ কোরো না তুমি। এর পরে অন্ততঃ আজকের দিনের জন্যে—পৃথিবী অর্থাৎ আমাদের এই ছাপাখানা শান্ত হোক্।

ষষ্ঠীবাবুর মুখের চাবি খুলে গেল।

যতীনের দিকে একটু সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চেয়ে এবং হরিপদর দিক থেকে অভিমানের জাল গুটিয়ে নিয়ে সে সবাইকে উদ্দেশ করে বললে—ছাপাখানার সংস্রবে এসে অনেক বই, বিয়ের কাগজ, এবং বক্তৃতা কম্পোজ করেছি। যখন যে কোন একটা ভাল কাজ হাতে এয়েছে পড়ে দেখেছি। যতীনের মত এরকম মীমাংসা এর আগে কখনো পড়িওনি শুনিওনি। ও আমাদের মধ্যে নতুন এসেছে ওকে আমরা ভাল করে চেনবার অবসর পাই নি এতদিন। গল্প বলতে আরম্ভ করে শুধু উপক্রমণিকার পরই যবনিকা টানতে

এর আগে আর কেউ পারে নি। আমরা কিন্তু ঐটুকুতেই ক্ষান্ত হব না। গল্পটাও শুনতে চাই—

হরিপদ আশ্চর্য্য হয়ে বললে—গল্পটাই বাদ গিছল? কিন্তু এমন সুন্দর মীমাংসা হোয়েছিল—গল্পর অভাবটা আমার তো নজরেই পড়ে নি। বেশ, বেশ, গল্প চলুক্।— তোমার হাতের কাজ আজ আমিই কোরে দেব ওভার-টাইম খেটে—

যতীন বললে—গল্পতো জানা কিছু নেই, তবে বড় বাবুদের মত বানিয়ে বলতে পারি—

শশী বললে—সে তো আরও ভাল হবে—

যতীন বললে—একটু আপত্তি আছে, আমরা তো আর দিগ্‌গজ পণ্ডিত নই কথায় কথায় একটু আধটু গরমিল থাকতে পারে তোমরা যদি সেটা মাপ কর'—

পরেশ বললে—নিশ্চই নিশ্চই, মাপ তো করবই একটা ফুট রুল নিয়ে বসে আছি সেই জন্যে—

যতীন গল্প বলতে লাগল—

"আমি এখানে আসবার আগে শনিবারের আফিসে ছদশদিন অ্যাপ্রেণ্টিস্ খেটে এসেছি। তখনকারই একটা অভিজ্ঞতার কথা বলব। শ্রীপঞ্চমীর দিন। স্কুলের বই-গুলার একখানাও আর বাড়ীতে নেই, পেটের দায়ে ছেঁড়া-কাগজের সঙ্গে চিনিবাস 'স্যাক্‌রার' দোকানে বেচে এসেছি—আজ অন্য কিছুর অভাবে বটতলার সাড়ে তিন-পয়সা দামের একখানা নভেল নগদ কিনে, আর আমার মান্ধাতার আমলের একটা কড়ির দোত আর খাগড়ার কলম দেবী সরস্বতীর শ্রীচরণ কমলে রেখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে বর চাইলাম,—এ জন্মেতো মা যা হবার তা শেষ হয়ে গেছে আস্‌ছে জন্মে একটুখানি বিদ্যে আর বুদ্ধি দিও অন্ততঃ ম্যাট্রিকুলেশনের বেড়াটা ডিঙিয়ে কোনও গতিকে রেল কোম্পানী কিংবা ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জির পাঁচতালা সিঁড়ি টপ্‌কে কোথাও একটা কেরণীগিরি যোগাড় করে নিই!— তারপর চোখকাণ বুজিয়ে পড়ে থাক্‌লে পঁচিশ বছরে সাতাশ টাকা থেকে আরম্ভ করে সাতাশি পর্য্যন্ত মারে কে? ট্রামের কারখানায় কম্পাউণ্ডারী করতে গেলেও ম্যাট্রি-কুলেশন পাশ চাই.........হাসছ কেন তোমরা? কথাটা কি মিথ্যে বলেছি......কম্পাউণ্ডার বলে ফেলেছি.........তা হোক্‌গে অই না হয় কণ্ডক্‌টারই হোল! ওটা ভুল হতে পারে, পাসের সার্টিফিকেট্‌টাতো আর মিথ্যে নয়! পাস করতে পারি নি তাই একপাশে পড়ে আছি সবার অস্পৃশ্য! জাতে বৈশ্য হোয়েও চাঁড়ালের পায়ে তেল দিতে হয় এর চেয়ে আর দুর্ভাগ্যের কথা কি ছিল বল?

সেদিন প্রেসের দিকে আর যাব না ভেবেছিলাম।

পথের মাঝখানে মিয়াজান জমাদারের সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞাসা করলে—আজ আফিস যাওনি বাবু?

উত্তরে বললাম—আপিসে বেরোব মানে? কালতো রমেন বাবু বলে দিলেন—ছুটী সকলের—

—হাঁ, ছুটীতো কিন্তু ওভার টাইম দেবে—ডবল খোরাকী—

—তা দিক্‌গে আজকের সম্বৎসরের দিনটা না হয় বাদই গেল—

—বলো কি হে, ডবল খোরাকীর মোহ কাটিয়ে সন্ন্যাসী হোয়ে পড়লে যে এই বয়সেই?

—পাঁজীতে বারণ আছে আজ লেখাপড়া বন্ধ!

—ঐ পদীপিসীর বিধান তো! রেখে দাও ও কথা— পাঁজীতে অনেক কিছুই বলে থাকে। আমার আজ কর্ম্ম কোন রেডি নেই তাই ছুটী, বেরুতে পারবনা জেনে আপ্‌-শোষ হচ্ছে এমন কি তোমাদের হিংসে করছি বরাতের,— তুমি দেখছি একেবারেই দলছাড়া—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেল।—তাছাড়া লেখা পড়া করতে নেই! তোমাদের কম্পোজ করা তো লেখাও নয় পড়াও নয়—শুধু সাজিয়ে দেবে এই পর্য্যন্ত!

—যাই বল' আজ বেরুব না ঠিক করেছি যখন,—

—বেশ তা হলে চল আমার সঙ্গেই একটু ফুর্ত্তী করে আসা যাক্—

—কোথায়?

—ঐ ভবানীপুরের দিকেই চল—পোড়াবাজারে এক-জিবিসন্ দেখতে—

আপত্তি করলাম না।

পথ চলতে চলতে মিয়াজান জিজ্ঞাসা করলে—আজ তোমাদের কিসের পরব হে ?

বললাম—শ্রীপঞ্চমী—

---অর্থাৎ লক্ষ্মী পুজো ?

—না, সরস্বতী,

—কেন শ্রী মানে তো লক্ষ্মী! তাছাড়া সেদিন বলেছিলে—

সত্যিই তো! তাছাড়া লক্ষ্মী সরস্বতীর চিরন্তন বিবাদ শুনে আসছি। লক্ষ্মীর নাম নিয়ে সরস্বতী জাহির হোতে চান ?

জানি না বলে জমাদারের কাছে হার স্বীকার করতেও পারি না। মানে না মিললেই বাবুরা বলে থাকেন ছাপার ভুল। এক্ষেত্রেও হয়তো তাই।

মিয়াজান ব্যাখ্যা শুনে খুসী হোল না।

কার্ণিভালে গেলাম, সাড়ে পাঁচটা ছটার সময়! সকাল নয়—বিকেল!

শনিবারের আফিসে চাকরী করি। ওঁরা মণিমুক্তা কুড়োন আমাদের ভাগে দুয়ানির ওপরে চার আনিও জোটে না। জয়-হুইলে নিজে না চড়তে পেলেও অপরে চড়ে দেখি! মনে হয় নিজে চড়ার চেয়েও চড়া দেখাতেই আমোদ বেশী।

মহা মহা সাহিত্যিকদের সঙ্গগুণে আমার মনটাতেও একটু সাহিত্যের আমেজ লেগেছিল, চোখটা সবুজ হয় নি লালও হয় নি ঐ মাঝামাঝি একটা রঙের। বাবুরাতো প্লট পেলেই ঘর গাঁথেন, আমরা আদার ব্যাপারী মনে মনে গল্প লিখি। পয়সা নেই ছাপাই না। নইলে ছাপালে মস্ত মস্ত বই লিখতে পারতুম—টাওয়ার অফ পিসার চেয়েও বড়।

একটী তরুণী—ষোড়শী—দুধে আলতার রঙ স্বর্গের অপ্সরী বললেও চলে! আমার গল্পের নায়িকা! পতিতা নয়—শনিবারের বাবুদের হুকুমে পতিতার কাহিনী নিয়ে গল্প লেখাটা অশ্লীলতায় চূড়ান্ত। অতএব ভদ্র ঘরের মেয়ে—সতী সাধ্বী এবং সাবিত্রী। মনের সাগরে জোয়ার খেলে না—আড়নয়নে প্রাণান্তেও কারও পানে চান না—কেবল একটী জিনিষ ছাড়া স্বামী দেবতার ক্যাম্বিসের জুতোর আবরণে অর্দ্ধেক অপ্রকাশিত রোদে ফাটা ত্রিভঙ্গ চরণ। এই তার তীর্থ এবং স্বর্গ। স্বামী পাশে পাশে চলেছেন। নব্যতন্ত্রের লোক নন। পঁয়ত্রিশের বেশী বয়স এবং তিয়াত্তরের কম। দাড়ী রেখেছেন। চোখে চশমা নেই। ধর্ম্মভীরু। পথের সামনে সুন্দরী রমণী চোখে পড়লেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। চোখ বুজে থাকেন। রমণী পাশ কাটিয়ে সরে গেলে তবে আবার চলতে আরম্ভ করেন। হয়তো বড় লোক, মান বজায় রাখতে অর্দ্ধাঙ্গিনীকে সঙ্গে নিয়ে একজিবিসান দেখ্‌তে এসেছেন। এমন তো কত লোকই আসে, নিন্দের কিছু নেই।

স্ত্রীটী আধুনিকা নন, সেকেলে, তবে আলোকপ্রাপ্তা, ঘোমটার বালাই নেই। শতদলের মত ফুটন্ত মুখখানি দেখে অনেক পথিকেরই মাথা ঘুরে পড়ে। কত লোকে কত ইঙ্গিত করে, কেউ ভাল ভেবে, কেউ মন্দ ভেবে। সুন্দরী কারও কথায় কাণ দেয় না—চেয়েও দেখে না!—শাস্ত্রে বারণ আছে!

কারও দিকে নজর না দিয়ে স্বামী ও স্ত্রী পথ চলেছেন। —হয়ত জীবনের এতগুলো বছর এমনি ভাবেই কেটে এসেছে এবং বাকী বছরগুলাও এমনি কোরেই কেটে যাবে। জল আর তেলে মিশ খায় না জানতুম, কিন্তু আলো আর অন্ধকার এমন ভাবে হাত ধরাধরি করে চলে কি কোরে কল্পনায়ও ভাবতে পারি নি।

নিজের চোখকে প্রথমে অবিশ্বাস করেছিলাম! কিন্তু মিয়াজানকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম সেও দেখতে পাচ্ছে। দুজনার চোখেই ধাঁধাঁ লেগেছে এমনটা তো হতেই পারে না—

আমরা পাশ কাটিয়ে আবার সেই জয় হুইলের ধারে এসেই দাঁড়ালাম। অনেকক্ষণই দাঁড়িয়েছিলাম। পাকা এবং ডাঁশা শনিবারের বাবুদের কড়া পাহারাও আমার মনের তরুণত্ব ভোলাতে পারে নি—তাই ফাঁক পেলেই চোখ মুদে অহঃরহ নাম জপ না করে বিশ্বজগৎটার দিকেও তাকিয়ে দেখি। সুন্দরের মোহ আমাকে পথ ভুলিয়ে দেয়। সেটা স্বভাবের নয়—যৌবনেরই দোষ।......

যতীন চুপ করল।

হরিপদ বললে—শেষ কর! শেষ কর! তারপর বলে যাও! বেশ জমে উঠেছে!

যতীন বললে—পরে আর বেশী কিছু নেই। এক প্রহর রাত পর্য্যন্ত সেখানে ছিলাম। মিয়াজান বেশী ক্ষণ থাকে নি। আমার সঙ্গে নিষ্কর্ম্মার মত দাঁড়িয়ে থাকতে সে প্রস্তুত ছিল না তাই অন্যত্র স্ফূর্ত্তির সন্ধানে সরে পড়েছিলো। আমি দেখ্‌ছিলাম—কত লোক আস্‌ছে, উঠছে, দোল খাচ্ছে, হাসছে, লাফাচ্ছে। তারপর ফিরে চলে যাচ্ছে। নদীর স্রোতের মতই প্রাণের খেলা বহে চলেছে। চিরদিনের কাজের মাঝে একদিনের এই উচ্ছৃঙ্খল বিশ্রাম—বড় ভালো লাগে। হঠাৎ—

ভূমিকম্প নয়, বিনা মেঘে বজ্রাঘাতও নয়।—কিন্তু তাদের চেয়েও ভয়ঙ্কর এবং অনাকাঙ্ক্ষিত—

পূর্ব্বোক্ত সুন্দরীটীর স্বামী অথবা সাথী প্রৌঢ় অথবা বৃদ্ধটী ওদিককার হুইপে চড়ে ঘুর পাক খেতে খেতে হেসে গড়িয়ে পড়ছেন ভয়ঙ্কর কালো কুৎসিত মোটা কিম্ভূত কিমাকার চেহারার একটী সগুম্ফ শিখণ্ডীর সঙ্গে!—

এবং সামনের জয় হুইলে দোল খাচ্ছেন সেই সুন্দরীর পাশে বসে আমাদেরই চাটুয্যে মশাই!—

শনিবারও আড়ালে রামায়ণ গান করেন তাহলে।

ও দৃশ্য আর দেখে সইতে না পেরে ফিরে এলাম, এবং ওঁদের আফিসের কাজ ছেড়ে দেব বলে তার পরদিনই দরখাস্ত নিয়ে গিয়েছিলাম।

সেটার কিন্তু দরকার হয় নি। ভেতরে ঢুকেই সর্ব্ব প্রথমেই নজর পড়েছিল আমারই নামে বড় বড় নোটিস—"You are no longer required in our office" আমাকে আর তাঁদের দরকার নেই!"

* * * *

পাঁচটা বেজে গিয়েছিল। ছাপাখানার ছুটী। তবু সেইদিন সবাই মিলে আরও দুঘণ্টা খেটে কাজ করেছিল এবং তার জন্যে কেউই ওভারটাইম দাবী করে নি।

—o—

আক্কেল সেলামী

—শ্রীজিষ্ণুচন্দ্র মণ্ডল

কেতো ওরফে শ্রীমান্ কার্ত্তিক চন্দ্র ছিলো একজন প্রসিদ্ধ চোর। পাড়া গাঁয়ে তার বাড়ি—কাহারও ক্ষেতের কলাটা কাহারও ক্ষেতের শশাটা কাহারও বা ঝাড়ের খান দুই বাঁশ রাতারাতি সরান এই ছিল তার অভ্যাস—এতেই সে পেতো আনন্দ......! গাঁয়ের সকলেই তাকে চেনে—সকলেই জানে......সে যে ভারি ডাঙ্‌পিটে এ কথা জানা সত্ত্বেও ছেলে বুড়ো সকলেই আবার তাকে বাসে ভালো—কেননা মনটা ছিল তার সাদা......এমন কি পাড়ার মেয়ে মহলে আধিপত্যটা তার খুব বেশী রকমের। গ্রাম হতে গ্রামান্তর থেকে পিতৃকুলের সুখবর আনিয়ে নেওয়াটাই ছিলো মেয়েদের বেশি প্রয়োজনের......বেশি আগ্রহের...। কেতো সে জন্য পেতো তাদের দু'চারটে মিষ্টি কথা......। চরিত্রে সে ছিলো ভীষ্ম। আজ নীলু খুড়োর পিতৃশ্রাদ্ধ, কেতো একাই মন পাঁচেক কাঠ বন থেকে কেটে এনে হাজির। হরে তাঁতির আজ তিন দিন হোলো চাল অভাবে খাওয়া হয় নি—কেতো অমনি রাত্রে চাড়ুয্যে মশাইয়ের গোলাবাড়ি থেকে পালি পাঁচেক ধান সরিয়ে ফেল্লে......। চুরি সে করতো বটে—কিন্তু নিজের জন্যে নয়—এই ছিল তার গুণ। সংসারে তার কেউ নেই। এখন পাড়ার ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা তার খেলুড়ে......তা'রা ডাকে......কাতুকা'।

সে বছরে চাষ মোটেই হোল না—ঈশ্বরের অভিপ্রেত কি না তা আমরা বুঝতে পারি না। গ্রামের সকলেরই মন বিষণ্ণ—কি করে চল্‌বে পুরো এক বছর এই ভাবনায়।

চাড়ুয্যে মশাইয়ের জোর বরাত। 'কুমীর মারীর' আবাদের ধানটা নাকি খুব হয়েছিলো ভাল। তাই দাদাঠাকুরের গোলা বাড়িতে ধান ঝাড়ায় খুব ধুম। আবার ধান আছড়াবার প্রধান পাণ্ডা হচ্ছেন আমাদের কাতুকা। সে ধান আছড়ায় আর মনে মনে ভাবে—"এই বাঁকতুলসী ধান গুলো একবার শেষ হলে গোলায় উঠ্‌লে হয়! বোঝা পড়া আছে আমার সঙ্গে একদিন কেমন কোরে দা'ঠাকুর সরু চালের ভাতগুলো এই দুর্দ্দিনে একলা একলাই গলাধঃকরণ করেন। কিন্তু যখন সেই ধানগুলো গোলায় ওঠবার পরিবর্ত্তে চাল হয়ে—একেবারে চাড়ুয্যে মশাইএর শোবার ঘরে আশ্রয় পেলে……কাতুকা একটু চিন্তিত হয়ে উঠেছিলো মাত্র। মোটের উপর—এই সরু চালটা মণ পাঁচেক হয়েছিলো বলেই দাঠাকুর নিজের শোবার ঘরেতেই বড় বড় গোটা চারেক হাঁড়া বোঝাই করে রাখবার সুবিধে পেয়েছিলেন।

সুযোগ বুঝে এক অমাবস্থার রাতে কাতুকা দাদা ঠাকুরের সেই শয়ন কক্ষে সিঁধ দিতে আরম্ভ করেছিলো। এইখানে এইটুকু জানালেই হবে যে সেই ঘরে চাড়ুয্যে মশাই ছাড়া আর কাহারও থাকবার অধিকার ছিলো না। সিঁধ খোঁড়া শেষ হলে যখন কাতুকা ঘরের ভিতর ঢুকলো রাত্রি তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে……দাদা ঠাকুরের ঘুমটা প্রায় ছাড়ো ছাড়ো। কাতুকা যখন অন্ধকারে ঠিক দাদা ঠাকুরের মাথার কাছেই এসে দাঁড়িয়েছে তখন কিন্তু তাঁর ঘুম একেবারেই ছেড়ে গিয়েছে। দাদা ঠাকুর তখন চুপ্‌ করে মাদুরের ওপর শুয়ে শুয়েই দেখ্‌তে লাগ্‌লেন (কতকটা ভয়েও)……চোর্‌টা কী করে। কাতুকা আস্তে আস্তে তার গা থেকে সেই গ্যাল মঙ্গলবার দিন বাঁড়ুয্যের হাট থেকে যে নতুন দোলাইটা নগদ সাত সিকে দিয়ে কিনে ছিলো—সেইটে খুলে ঘরের মেঝেতে ঠিক দাদা ঠাকুরের মাথার অদূরেই বিছিয়ে ফেল্লে। পরে অন্ধকারে আন্দাজ কোরে সেই চালের হাঁড়ার দিকে অগ্রসর হোলো। আন্দাজটা তার অব্যর্থ—কেননা সেই তার দিন দুই আগে নিজের হাতে কোরে ঐ ঘরেই তুলেছে……। ইচ্ছেটা তার উপস্থিত এক হাঁড়া চা'ল ঐ দোলাইএ বেঁধে পিট্টান দেবে। ইত্যবসরে দাদাঠাকুর সেই মাটির উপর বিছানো দোলাইটা হাত দিয়ে টেনে নিয়ে একটা ছোট্ট পুঁটলির মতন কোরে মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লেন। কার্ত্তিকচন্দ্র কিন্তু অন্ধকারে সেই এক মুনী হাঁড়াটা খুব সন্তর্পণে তুলে তার নির্দ্দিষ্ট স্থানে এনে উল্টে ধরল, চাল দোলাইএর ওপর না পড়ে—পড়্‌ল ছড়িয়ে—দাদা ঠাকুরের ঘরের মেঝের ওপর। তারপর হাঁড়া যথাস্থানে রেখে এসে অন্ধকারে দোলাইয়ের খুট্‌ খুঁজতে গিয়ে দ্যাখে তার দোলাই সেখানে নেই। কেতো তখন দাঠাকুরের কারসাজি বুঝতে পেরে অন্ধকারে চুপ্‌ করে দাঁড়িয়ে রইলো খানিকক্ষণ। অপরপক্ষে দাদাঠাকুরও বুঝতে পেরেছিলেন যে এ চোর তাঁহাদের পরিচিত কার্ত্তিক চন্দ্র ছাড়া আর কেহই নয়। চোরও হাঁসে চৌকিদারও হাঁসে—মনে মনে—নীরবে……

কিছুক্ষণ যায়—কার্ত্তিকচন্দ্র অতি দুঃখিত স্বরে বলে… …দাঠাকুর! ও দাদাঠাকুর।……

দাদাঠাকুর এদিকে জেগে ঘুমুচ্ছেন……নীরব। কার্ত্তিক আবার ডাকে—একটু জোর গলায়—ও দাদা ঠাকুর গো!

দাদা ঠাকুর যেন এই মাত্র জাগ্রত হলেন এমনি ভাবে বলেন—খুব দ্রুত স্বরে—কেরে ঘরের ভেতর?

কার্ত্তিক।—এঁজ্ঞে আমি দাঠাকুর।

দাঠাকুর।—কেরে ব্যাটা কেতো?—তা ঘরের মধ্যে ক্যান্‌রা?

কার্ত্তিক।—এঁজ্ঞে—আমার দোলাইটা ফিরিয়ে দিলেই আমি চলে যেতুম্‌!

দাদাঠাকুর।—ও! ব্যাটা এসেছো চাল চুরি করতে? নে এই দেশলাই ধর্‌। জাল্‌ ঐ খানে একটা লাম্পো আছে। (কার্ত্তিকের তথাকরণ)……আর হাঁ দরজাটা খোল দিকিন্‌……(পিছন দিকে চেয়ে) উঃ ব্যাটা মস্ত সিঁধ কেটেছিস্‌ যে!……যাক্‌……এক কাজ কর্‌ রান্না ঘরের দাওয়ায় হুঁকোটা আছে—এক ছিলিম তামাক সেজে আন্‌ দিকিন্‌। (কার্ত্তিকের তথাকরণ) (তামাক খাওয়ার পর)—দ্যাখ্‌ এখন যা—কাল সকালেই আস্‌বি—এবং আমার সিঁধটা বুজিয়ে দিবি বেমালুম—তবে দোলাই ফেরৎ পাবি। আর বাপ ধন এ রকম কোরে ঘর গুলো মাটি করিস্‌ নি (স্নেহপূর্ণ বাক্যে) জান্‌লি?

কেতো সেই রাত্রে সেই যে এঁজ্ঞে বলে গ্যালো আর ফিরলো না।

কবি মোহিতলালের কাব্যে "অক্বিত্রিম পৌরুষ"

—শ্রীদুঃশীল কুমার দে।

বাংলা কাব্যে ও সাহিত্যে মেয়েলি ও কাঁদুনে ঢঙ্-এর প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশি,—এম্‌নি একটা অপবাদ বহু দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই অভি-যোগ হইতে অব্যাহতি পান নাই। কয়েকদিন আগে বাংলা কাব্যে পুরুষত্ব ও বিদ্রোহের বিপুল আস্ফালন সুরু হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই সবকে 'পায়তাড়া মারা পালোয়ানি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অধুনা অতি আধুনিক কথাসাহিত্য বলিয়া বাংলা দেশে একটা প্রকাণ্ড আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে 'ল্যাঙট্-পরা গুলি-পাকানো' সাহিত্য বলিয়াছেন। যখনই পুরুষত্ব প্রকাশের চেষ্টা হইয়াছে, হয় তাহা হইয়াছে গুণ্ডামি নয় নোংরামি। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ মোহিতলালের কাব্যে 'অকৃত্রিম পৌরুষের' সন্ধান পাইয়াছেন। এই পৌরুষে গুণ্ডামি ত' নাইই, ষণ্ডামিও নাই। ইহা একেবারে খাঁটি বিশুদ্ধ আদি ও অকৃত্রিম পৌরুষ। মোহিত লালের পদ্যে কি কি দৃষ্টান্ত দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথ এই প্রশংসাব্যঞ্জক সার্টিফিকেট দিলেন' নীচে তাহা উল্লেখ করিতেছি। কবিরাজগণ তাঁহাদের পুরুষত্ববর্দ্ধক ঔষধের বিজ্ঞাপন হিসাবে এই সব দৃষ্টান্তের সাহায্য নিলে হয়ত' উপকৃত হইবেন। এই সব দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা ত' দূরের কথা, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও যে মোহিত লালের পৌরুষের গুণগান ও জয়ঘোষনা করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

(১) "বুকের বর্ত্তুল।"

(২) "আমারও খেলেনা আছে প্রেয়সীর সুচারু চুচুক।"

(৩) "কামের পূজারী আমি, দেহযন্ত্রে করিয়াছি নারীচক্রভেদ।"

(৪) "উদূখলে দলি তার দুই-দেহ-রূপ।"

(৫) "নিশি নিশি গণিকাভবনে দুয়ার ঠেলিত এক পুরুষপ্রবর।"

(৬) "বুকের সে মোমে-গড়া শুভ্র ছাঁচ দু'টি
কি যেন পরখছলে দেখিত সে খুঁটি'।"

(৭) "নারী যত ভুঞ্জে রতি, তত সে পুরুষ
কত না ভ্রূকুটী করে, ভঙ্গী তার ততই পরুষ।
উঠে যায় সম্ভোগের শেষে
রক্তহীন পাংশুমুখে, বুকে তবু জেগে রয় ক্ষুধা সর্ব্বনেশে।"

(৮) "যে কথা পুরুষমুখে নারী কভু করেনি শ্রবণ।"

(৯) "পাপ যে বিরাজে মণি হয়ে ওই মনোহর বুক' পরে,
নাচে লালসায় পরশি' হরষে মন্মথ মঞ্জরী।"

(১০) "বহিব কি শুধু বুকের উপরে কঠিন কনক-গিরি?"

(১১) "ধরণীর স্তনযুগ করি' দিব ক্ষত।
ক্ষুধাতুর দশন-আঘাতে করিব জর্জ্জর।"

(১২) "আমার বুকের ফুলদানিতে
তোমার দু'টি পদ্মকলি।"

(১৩) "হেরিয়াছি সাথ, তোর নগ্ন তনু......"

(১৪) "কটিতলে জন্ম-রাজধানী।

(১৫) "হেরি উরসের যুগ্ম যৌবন-মঞ্জরী।"

(১৬) "বিলোল কবরী আর নীবিবন্ধ মাঝে
পেলব বঙ্কিম ঠাঁই যেথা যত রাজে—"

(১৭) "ওগো কাম বধূ,
বল, বল, অনুচ্ছিষ্ট আছে আর এতটুকু মধু?"

(১৮) "দেখি ওই অনাবৃত দেহের শ্মশানে
প্রতি ঠাঁই আছে কোন কামনার সদ্য বলিদান।"

(১৯) "পুরুষের পুরুষার্থ হরি' লও......স্বচ্ছন্দ-স্বৈরিণী।"

(২০) তুমি বন্ধ্যা বারাঙ্গনা, নগ্ন অঙ্গ অনঙ্গ গৌরব।"

(২১) "জায়া-স্বসৃ-মাতা রূপে কর যার মরণ-বারণ,
মদন সদনে তারে বাহু পাশে বাঁধি' আয়ু করিছ হরণ।"

(২২) "আদি-রস-উৎস-ধারা মুক্ত-প্রবাহিণী।"

(২৩) "সন্তান মরিছে বুকে, তখনিই যে নব-গর্ভাধান।"

(২৪) "শ্রেণীভরে অলস-গমনা,
বসনের তলে দু'টি স্তনচূড়া এখনো শিহরে।"

(২৫) "তৃপ্ততনু স্নিগ্ধ এবে, গেছে ক্লান্তি গত যামিনীর।"

(২৬) "আত্মহারা কামসুখে জাগে।"

(২৭) "শিরে পিয়ায় সুধা, রতিবিষে পুরুষ অজ্ঞান।"

অলমিতি বিস্তারেণ।

—:•:—

সওদা

বহুদিন কবি মোহিতলাল মজুমদার আমাদের একটী বিজ্ঞাপন বিলি করেছিলেন। তাতে লেখা ছিল

> "আশায় থাকুন! প্রতীক্ষা করুন!
> অদ্বিতীয় ও অকৃত্রিম বাংলার একমাত্র মার্জ্জিন-
> এক্সপার্ট শীঘ্রই বঙ্গ সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবেন।
> ইউরোপ আমেরিকার সমস্ত দেশের পুস্তকের মার্জ্জিন
> যাঁর নখদর্পণে তিনি শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করিবেন।
> উপযুক্ত মার্জ্জিনের অভাবে বাংলা সাহিত্য রসাতলে
> যাচ্ছে—
> বাঙ্গালী বই পড়ে', মার্জ্জিন দেখেনা
> এ দুর্দ্দশা তিনি ঘুচোবেন।"

তখন জানতাম না এই অপরূপ জীবটীর শ্রীমোহিতলাল মজুমদারই ম্যানেজার প্রোপ্রাইটার। এই কিম্ভূত কিমাকারকে দেখবার জন্য আমরা উৎসুক হয়েছিলাম। এতদিনে তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যে দন্ত বিকাশ করেছেন। আশার অতিরিক্ত আমোদ পেয়ে আমরাও পরম পুলকিত হয়েছি। ইনি শুধু মার্জ্জিন এক্সপার্ট নয়। রুশ ভাষায় একদিন ঢুঁ মারতে গিয়ে......"টুসারমুটভো মানাখো" পর্য্যন্ত শিখেছিলেন তাও অযাচিত ভাবে জানাতে ভোলেন নি। ইনি আরও একটী পরম উপাদেয় সংবাদ নিজের সম্বন্ধে দিয়েছেন। প্রকৃতি দত্ত যে সমস্ত ক্ষমতা পুরুষ মাত্রেরই গৌরব সে সব ক্ষমতা হতে ইনি বঞ্চিত। ইনি শুধু লাইব্রেরীতে বসে বইএর সাদা মার্জ্জিনে তার স্বপ্ন দেখেন।

এ সংবাদটুকু না দিলেও চল্‌ত। তাঁকে দেখেই আমরা এটুকু অনুমান করে ছিলাম।

* * * *

এই বৃদ্ধ বয়সেও বারবার তাঁর অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের বিস্মিত করেছেন। কিন্তু সম্প্রতি তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তাতে তাঁর পূর্ব্বেকার সব কীর্ত্তি ম্লান হয়ে গেছে। তিনি এবার টেনে হিঁচড়ে আগে 'শনিবারের চিঠি'কে'ও আর্টের কোঠায় তুলে ফেলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তার কাণে কাণে একটু উপদেশও দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বিচক্ষণ ব্যক্তি, তাঁর উপদেশ মত চল্‌লে শনিবারের চিঠির শনির দশা অবশ্যই ঘুচবে। শনি রবির মিলন উৎসবে আমরাও আনন্দে যোগ দেব। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন গালাগালের ভেতর দুএকটা মিষ্টি কথার ফোড়ন দিলে গালাগালের দর বাড়ে, লোকের মনেও ধোঁকা দিয়ে বিশ্বাস উৎপাদন করা যায়। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ বলছেন সোজা না মেরে মিছরির ছুরি পেছন থেকে মারো তাহলে ফল হবে।

* * * *

রবীন্দ্রনাথের মতে তরুণরা নাকি স্থানে অস্থানে 'আমরা তরুণ আমরা তরুণ' বলে চেঁচিয়ে তরুণ-জ্বরের মত নিজেদের কম্পান্বিত করে হাস্যাস্পদ করে তুলছে। এবং বুড়োদের 'অধ্যাপক পাড়া' থেকে তারুণ্যের প্রমাণপত্র সংগ্রহের চেষ্টায় ফিরছে। তরুণরা কোথায় কবে যে 'আমরা তরুণ' বলে জাহির করবার চেষ্টা করেছে তার একটা উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ দিলে আমরা বাধিত হব। আর প্রমাণপত্র ও সার্টিফিকেটের প্রয়োজন থাকলে তরুণরা সর্ব্ব প্রথম যে বাংলার প্রধান সার্টিফিকেট দাতা শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছেই যেত এইটুকু রবীন্দ্রনাথ ভুলে যাচ্ছেন।

তরুণরা কোনদিন নিজেদের তরুণ বলে হেঁকে বেড়িয়েছে এমন কথা ত আমরা শুনিনি। বরঞ্চ আমরা জানি ৬৪ বৎসর বয়সে শিঙ্‌ভেঙে বাছুরের দলে ঢোকবার আগ্রহে কেউ কেউ সভায় সমিতিতে কাগজে পত্রে নিজের ধার করা তারুণ্যকে বার্দ্ধক্যের বাতের ব্যথার মতো টন্‌টনিয়ে তোলেন। জীবনের মাঝে বার্দ্ধক্যের একটা স্থান আছে তার একটা গৌরবও আছে। বার্দ্ধক্যকে তারুণ্যের ছদ্মবেশ পরাতে গেলে বার্দ্ধক্য ও তারুণ্য উভয়কেই অপমান করা হয়।

ঘরে বাইরে

গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলের তের বছরের একটী বালিকা, নাম—কুমারী অমিয়া তালুকদার আমাদের একটী কবিতা পাঠিয়েছেন। কবিতাটী তাঁদের পারিবারিক শোক উৎসব ব্যাপার লইয়া রচিত বলিয়া আমরা ছাপিতে পারিলাম না। কিন্তু এতো অল্প বয়সেই বালিকাটীর রচনা নৈপুণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। আশা করি ভবিষ্যতে তাঁহার লেখা উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিবে।

—:•:—

Printed & published by Sj. Nripendra nath Banerjee from the Bela Printing Works
14, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta.

এবার বড়দিনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার

একটি গ্রামোফোন

আপনার আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য আজই কিনিয়া রাখা

কর্ত্তব্য। তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

এস্ এন্ ভট্টাচার্য্য

গ্রামোফোন, সাইকেল, হারমোনিয়াম বাদ্যযন্ত্র ও

ফুটবল প্রভৃতি খেলার সরঞ্জাম বিক্রেতা।

৬নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চ্যাম্পিয়ন স্পার্কিং প্লাগ

কে পছন্দ না করে ?

পৃথিবীতে যতগুলি মোটর কার আছে, তাহাদিগের ৩ ভাগের মধ্যে ২ ভাগ চ্যাম্পিয়ন ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাতে বুঝিতে হইবে, চ্যাম্পিয়নই উৎকৃষ্টতম স্পার্কিং প্লাগ। চ্যাম্পিয়ন স্পার্কিং প্লাগ থাকাতেই ফোর্ডে ঐ গুণ বর্ত্তমান। ১৫ বৎসর ধরিয়া এই চ্যাম্পিয়ন ফোর্ডের সাহায্য করিতেছে।

১০,০০০ মাইল চলিবার পর চ্যাম্পিয়ন বদলাইতে হয়।

চ্যাম্পিয়ন থাকিলে পেট্রল খরচ কম হয়।

সাধারণ ডিষ্ট্রীবিউটার—

ডজ এণ্ড সিমুর (ইণ্ডিয়া) লিঃ

৯নং এজরা মেনসন কলিকাতা

স্থানীয় ডিষ্ট্রীবিউটার

প্রসপারাস মোটর অ্যাকসেসরিস কোং

কলিকাতা।

CHAMPION

DEPENDABLE FOR EVERY ENGINE

WINSOR, CANADA

কি ছিলাম !—
কী হয়েছি !—
সুরবল্লী কষায়
সকল ডাক্তারখানায়
পাওয়া যায়।
সুরবল্লী কষায়
অতি উৎকৃষ্ট
বলবৰ্দ্ধক সালসা।
সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ
২৯, কলুটোলা — — — — কলিকাতা।

ধূপছায়া

সম্পাদক—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীরেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রতি সংখ্যা ।০ আনা।
বার্ষিক

বিষয় সূচী

বিষয় সুচী

বিষয় সূচি

ধুপছায়ার নিয়মাবালী

মূল্য—

ধুপছায়ার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩।৵ ও যান্মাষিক ১৸৹, প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৹ আনা। নমুনার মূল্যও ।৹ আনা। বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ধুপছায়ার বৎসর গণনা করা হয়। মূল্যাদি কার্য্যাধক্ষের নামে পাঠাইতে হয়। ভিঃ পিঃতে কাগজ পাঠাইতে অনেক অসুবিধা সুতরাং আগে মণিঅর্ডারে টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হইলে, আমাদের ও গ্রাহকদের সকলেরই সুবিধা।

অপ্রাপ্ত সংখ্যা—

ধুপছায়া প্রতি বাংলামাসের ১লা প্রকাশিত হয়। সুতরাং কোন মাসের কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া ডাক বিভাগের উত্তরসহ সেই মাসের ১০ই তারিখের মধ্যে আমাদের নিকট অপ্রাপ্তি সংবাদ পৌছান আবশ্যক।

পত্রোত্তর—

রিপ্লাই কার্ড বা ডাকটিকিট না পাঠাইলে কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব নয়।

রচনা—

সকল রচনা সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। টিকিট দেওয়া থাকিলে অমনোনীত রচনা গল্প কবিতা ফেরৎ দেওয়া হয়। রচনা কেন অমনোনীত হইল তৎসম্বন্ধে সম্পাদক কোনও উত্তর দিতে অসমর্থ। ফেরৎ রচনাদি লেখকদিগের নিকট পৌছান সম্বন্ধে আমরা দায়ী নহি। কাগজের এক পৃষ্ঠায় মার্জ্জিন দিয়া ফাঁক ফাঁক করিয়া পরিষ্কার অক্ষরে রচনা না পাঠাইলে প্রকাশিত না হইবারই বেশী সম্ভাবনা।

বিজ্ঞাপন—

কোনও মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বের মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হয়। বিজ্ঞাপন বন্ধ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ব্লক ফেরৎ লইবেন। ব্লক কোন প্রকারে ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই, যদিও ব্লক যাহাতে না ভাঙ্গে সে সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন লওয়া হইয়া থাকে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিজ্ঞাপনে হার নিম্নে দিলাম।

নিবেদক—কার্য্যাধ্যক্ষ—**ধুপছায়া**।
কার্য্যালয়—১৪নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

আশ্বিন মাস হইতে "ধুপছায়া"র কলেবর বৃদ্ধি হওয়াতে বিজ্ঞাপনের হারের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিল।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রথম কভারের অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	...	৩০৲ টাকা
দ্বিতীয় ,, পূর্ণ ,,	...	৩০৲ টাকা
,, ,, অর্দ্ধ ,,	...	১৬৲ টাকা
তৃতীয় ,, পূর্ণ ,,	...	৩০৲ টাকা
,, ,, অর্দ্ধ ,,	...	১৬৲ টাকা
চতুর্থ ,, পূর্ণ ,,	...	৫০৲ টাকা
সাধারণ ,, পূর্ণ ,,	...	১৫৲ টাকা
সাধারণ ,, অর্দ্ধ ,,	...	৮৲ টাকা
,, ,, সিকি ,,	...	৫৲ টাকা
সূচীর নীচে অর্দ্ধ ,,	...	১০৲ টাকা
,, ,, সিকি ,,	...	৬৲ টাকা
টাইটেল পৃষ্ঠার সম্মুখের পৃষ্ঠা	...	১৬৲ টাকা
আরম্ভের সম্মুখের পৃষ্ঠা	...	১৬৲ টাকা

নিবেদক—
কার্য্যাধ্যক্ষ—ধুপছায়া।

চৈত্র।

নীলকণ্ঠ

—শ্রীরেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়

--পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর—

—সাতাশ—

মাস দশেক নানান যায়গায় বেড়াইয়া ফিরিবার পথে গোপাল ও মালতী কিছুদিনের জন্ম কলিকাতায় থাকিয়া কালীঘাট, আলিপুরের বাগান, যাদুঘর প্রভৃতি দেখিয়া যাইবে ঠিক করিল।

একদিন গোপাল সুভাষের সহিত দেখা করিতে গিয়া জানিল সে নলিনের বাসায় গিয়াছে। ঠিকানা জানিয়া গোপাল সেইখানে উপস্থিত হইল।

সুভাষের কাছে শুনিল প্রতিভার বৌদি সুলতা আসন্ন প্রসবা। সবে অনেকদিন জ্বরে ভুগিবার পর পথ্য করিয়াছেন। সকলে অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া দিন কাটাইতেছে। তাছাড়া—প্রতিভার দাদা মারা গিয়াছেন, একথা সুলতা আজও শোনে নাই। তাহাকে অনেক মিথ্যা বলিয়া প্রবোধ দেওয়া হইয়াছে। সে জানে নলিন হাসপাতালের কাজে কিছুদিনের জন্ম বিদেশে গিয়াছে। যে কোনও সময় সত্য ঘটনা প্রকাশ হইলে আবার কিছু বিপদ ঘটিতে পারে।

সুভাষের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের পারি... সকল ঘটনা জানিয়া গোপাল বুঝিল এই সুলতা আর ... নয়—সে মালতীর বোন এবং বন্ধু। ভারতবর্ষময় বেড়া... গিয়া মালতী যাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্ম ... হইয়াছিল, সেই সুলতা কলিকাতাতেই এক ঘরের ... শুইয়া মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম করিতেছিল। আজ মাল... কাছে আসিয়াছে—এবং সুলতাও নীরোগ ... সুলতাকে দেখিতে পাইলে মালতী কতই না সুখী ... কিন্তু—আর পারিবে কি? যখন তাহাদের পুন... সকল বাধা টুটিয়াছে—মালতী আর কি অগ্রস... সুলতাকে বোন অথবা বন্ধু বলিয়া ভাল বাসিতে পা... রতির কথা মনে পড়িল। মালতী তাহাকে যখন ... দিতে পারিয়াছিল—সুলতাকেও দূরে ঠেলিবে না। ... পাড়া গাঁয়ের বাঙালী ঘরের মেয়ে—বিবিধ ... বিধানের মাঝে মানুষ হইয়াছে তবু অনুদার নহে। ... প্রাণ আছে একথার প্রমাণ গোপাল ... পাইয়াছে। মালতী হয়ত সুলতাকে দেখিয়া ...

করিতে কুণ্ঠিত হইবে না! কিন্তু আর এক বাধা আছে! মালতীকে দেখিলে সুলতার হয়ত পূর্ব্বের কথা মনে পড়িয়া এখন অনিষ্ট হইতে পারে!

সকল দিক ভাবিয়া গোপাল ঠিক করিল সুলতার খবর পাইয়াও সে বা মালতী কাহারও এখন তাহাকে দেখা দেওয়া উচিত নহে।

এই সঙ্গে আর একটা কথা গোপালের মনে হইল। সুলতা একদিন নলিনের মৃত্যু সংবাদ জানিবেই। নলিনের মা তাহাকে নিজের কাছে রাখিবেন স্বীকার করিয়াছেন—। কিন্তু নলিন বাঁচিয়া নেই—নলিনের বিবাহের পর সুলতাকে বধূ বলিয়া বরণ করিতে পারেন নাই—আজ যদি তিনি আপনার উদারতায় সুলতাকে ঘরে লইতে স্বীকার পান, তাহাকে দেখিয়া সান্ত্বনার পরিবর্ত্তে তিনি নিত্যদিন শুধু বেদনা পাইবেন। মুখে যতই বলুন—সুলতাকে তাঁর ছেলের বউ বলিয়া আদর করিবেন—তাঁহার অন্তর একথার স্মরণ মাত্র দগ্ধ হইবে, ইহা কি কারও বুঝিতে বাকী আছে? মালতী সুলতার জন্য ব্যাকুল। ঘরে মালতীর সঙ্গে কথা কহিতে গল্প করিতে আর কেহ নাই। গোপাল যদি সকল কথা বলিয়া নলিনের মায়ের কাছ হইতে সুলতাকে চাহিয়া লয় এবং সুলতাকে আপনারই বাড়ীতে মালতীর কাছে থাকিতে অনুরোধ করে কেহই হয়ত অমত করিবে না। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে থাকিতে হইলে সুলতার এই মাঝখানের কবছরের ইতিহাসটা একেবারে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। মালতী অথবা আর কাহাকেও তাহার জীবনের ঘটনা জানালে চলিবে না। সুলতাকে গোপাল বলিবে "তোমাকে আমরা আমাদের বাড়ীর কুলবধূ,—নিখিলের বৌ,—এবং মালতীর বোন এই বোলে ঠিক যেমন ছিলে তেমনি ভাবেই ফিরে পেতে চাই।"

সুলতার সম্বন্ধে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে গোপালের সহসা মনে হইল—তাহার যে সন্তান হইবে সে কোথায় কি পরিচয়ে থাকিবে? এই কথাটার মীমাংসা করিতে না পারিয়া নলিন মরিয়াছে। এই কথার মীমাংসা না হইলে হয়তো সুলতাও মরিবে। তার চেয়ে—তাকে যদি মালতীর ছেলে বলিয়া—ঘরে রাখে? মালতী ছেলের জন্ত পাগল। —অথচ সুলতাও ছেলেকে কাছে রাখিতে পাইবে। এক বছর আগে গোপাল এমনি একটা সঙ্কল্প ঠিক করিয়া—মালতীকে লইয়া দেশ ছাড়িয়া বাহির হইয়াছিল। এই এক বছরের শেষে এমনি কোন সুযোগ পাইলে—গোপালের ইচ্ছা ছিল—মালতীকে পালন করিতে দিয়া সকলের কাছে তাহাকে নিজের ছেলে বলিয়া পরিচিত করিবে। আজ যখন ঠিক সময়েই এই রকম শুভ সুযোগ মিলিয়া গেল—গোপাল তদনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইল।

নলিনের মা গোপালের প্রস্তাব শুনিয়া আপত্তি করিলেন না। সুলতাকে প্রথমে যতটা জোরের সহিত নিজের কাছে লোকলজ্জা তুচ্ছ করিয়া রাখিবেন ভাবিয়াছিলেন—নলিনের স্মৃতির ব্যথা ক্রমশঃই তাঁহাকে নিস্তেজ করিতেছিল। নলিন—নাই! সুলতার দিকে চাহিতে তাঁর বুক ফাটিয়ে যাইতে ছিল। মালতীর কাছে সে থাকিবে শুনিয়া তিনি বরং সুস্থির হইয়াছিলেন।

সুভাষও গোপালের সঙ্কল্প সমর্থন করিল।

প্রতিভা বলিল "তোমরা বৌদিকে জানোনা। তিনি নিজে রাজী হবেন না।"

সুভাষ জিজ্ঞাসা করিল "কেন?"

প্রতিভা বলিল "সত্য কথা গোপন রাখতে বা অস্বীকার করতে তিনি কখনো পারবেন না। বরং সকলে ঘৃণায় তাঁর ছেলেকে অবজ্ঞা করলেও তিনি তা সইতে পারবেন—তবু গর্ব্বের সহিতই তিনি একথা বলতে পেছুবেন না যে সে তাঁরই ছেলে।"

সুভাষ ভাবিল সে কথা সত্যি। ছেলের পরিচয়ের জন্য সুলতা বৌদি হয়তো ছলনার আশ্রয় লইতে কিছুতেই রাজী হইবেন না!

সুভাষ গোপালকে গিয়া বলিল।

গোপাল তখন তাহার কল্পিত ষড়যন্ত্রের কথা বলিল।

সুভাষ বলিল "এঁদের যে রকম—একটুতেই চঞ্চল হয়ে পড়েন—যদি কোন রকমে সন্দেহ জাগে—প্রাণে বাঁচান দুষ্কর হবে!"

গোপাল বলিল "কিছু ভাবতে হবে না। সব গোপন রাখবার ভার আমার।"

গোপাল রোজ আসিয়া সুলতার খবর লইয়া যাইত। যেদিন ছেলে হইল সেদিনও সে উপস্থিত ছিল।

সারদা এতদিন কোনও রকমে বুকের পুঞ্জীভূত ব্যথা চাপিয়া ছিলেন।, এই দিনটাতে আর পারিলেন না। সারদা কাঁদিলেন। সুভাষ কাঁদিল। প্রতিভা কাঁদিল। সুলতা তাহার ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাসের কথা এখনও কিছু জানিতে পারে নাই। সকলে কাঁদিতেছে কেন জিজ্ঞসা করিলে ধাই উত্তর দিল—ছেলে হয়েছিল মারা গিয়াছে! সুলতা ছেলে হবার সময় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। প্রকৃত ব্যাপার কি, কিছুই জানে নাই। পুত্রের মৃত্যুর কথা শুনিয়া তাহারও চোখে জল আসিল। যাহাকে লইয়া এত অস্থিরতা—সে আসিয়া একনিমেষের মধ্যে তাহাদের মুক্তি দিয়া গেল। আর জগতে ছেলের পরিচয়ের জন্য তাহার বা নলিনের কাহারও চিন্তিত হইতে হইবে না। এই কথা ভাবিয়া মন কিছু শান্ত হয়। ভাবে ভগবান তাহাদের ভাবনার এই আশ্চর্য্য সমাধান করিয়া দিলেন। কিন্তু তবু চোখে জল আসে। যে ছেলেকে একটীবারের জন্যও চোখে দেখিল না—যে ছেলে একটীবারের জন্যও তাহার বুকে উঠিয়া মা বলিয়া ডাকিল না—তাহার জন্যও বেদনায় চোখ ভরিয়া যায়। আশ্চর্য্য ভগবানের মায়া! সুলতা ভাবিল ভগবান যদি না রাখিবেন তাঁর দেওয়া কেন? জগতের মাঝখানে এতটুকু স্থান কি শিশুর হইত না? না হয় সুলতা তাহাকে লোকালয় হইতে দূরে যেখানে রাজার আইন মানিতে হয় না, লোকের লাঞ্ছনা সহিতে হয় না। তেমনি কোন জায়গায় বনে জঙ্গলে অথবা পাহাড়ের গুহায় আপনার বুকের মাঝটীতে লুকাইয়া রাখিত!

কিন্তু.........ওকি.........মা কেন নলিনের নাম লইয়া অমন করিয়া কাঁদিতেছেন? নলিন কোথায়? সে কি তবে বিশ্বজগৎ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে? তাই কি? তাই কি এতদিন তাহাকে দেখিতে পায় নাই? সকলে সে বিদেশে গিয়াছে বলিয়া এই সংবাদ তাহার কাছ হইতে গোপন রাখিয়াছে? তাই কি? সকলে কাঁদিতেছে—শুধু সুলতা কাঁদিল না! কাঁদিবার শক্তিটুকুও তার ছিল না! নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া সে উদাস নয়নে চাহিয়া রহিল! নলিন আজ কোথায়? সুলতা উদাস নয়নে চারিদিক চাহিয়া দেখিল। সে নাই—! সে আজ নাই! তাহার পুত্র গিয়াছে! স্বামীও আগে হইতে তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে! নলিন বলিয়াছিল—মৃত্যু যে পরাজয়ের চেয়েও বেশী ব্যথা দেবে! সে কেন তবে মৃত্যু বরণ করিল? তাহার মা আজ ব্যাকুল হইয়া ফিরিয়া ডাকিতেছেন—সে কেন শুনিতেছে না? সে কেন চলিয়া গেল? মা নিজে যে তাহাদের প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিবার জন্য আসিয়াছেন—সে কেন এইটুকু দেখিয়া যাইবার জন্য অপেক্ষা করিল না? নলিন! তুমি যে মৃত্যুর আগে জগতের কাছে প্রমাণ করে যাবে বলেছিলে—সত্যের আসন সকল ধর্ম্ম—সকল জাতি—সকল সমাজের উপর। সুলতা চাহিয়া দেখিল আজ নলিন নাই! তাহার পুত্রও ছাড়িয়া গিয়াছে! মৃত্যু চুপি চুপি আসিয়া কখন তাহাদের লুকাইয়া কোথায় লইয়া গেল কে বলিবে?

—আটাশ—

গোপাল বাড়ী আসিয়া ডাকিল "মালতী!"

মালতী একখানি মাসিকপত্রের ছবি দেখিতেছিল। স্বামীর ডাক শুনিয়া বই ফেলিয়া কাছে আসিল।

গোপালের সঙ্গে একটী শ্বেতাঙ্গিনী হাসপাতালের ধাত্রী আসিয়াছিল। তাহার ক্রোড়ে এক সুন্দর শিশু। মালতী বিস্মিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল "কে?"

"আজ এক বন্ধুর সঙ্গে হাসপাতালে গিয়েছিলুম। সেখানে এই ছেলেটীকে প্রসব করে, ছেলের মা মারা যায়। আমার একে দেখে ভারী লোভ হল। নেবে তুমি?"

মালতী সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া তাহাকে কোলে লইল। চাহিয়া দেখিল—কি সুন্দর! আহা চোখ জুড়াইয়া যায়। মনের আনন্দে ছেলেটীকে চুমা খাইতে গিয়াই কিন্তু তাহার একটা ভয়ের কথা মনে হওয়াতেই যেন চমকিয়া বিরত হইল।

স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল "কি জাত?"

গোপাল বলিল "অত খোঁজ করিনি। দরকারও

বুঝিনি। যে জাত হোক সব ভুলে তুমি যদি নিজের করে পার তবেই রাখব নইলে বলে দিই অনাথ আশ্রমে কিম্বা আর কোথাও পাঠিয়ে দিক।"

"না—না—আর কোথাও পাঠাতে হবে না। আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা করব না। সম্পূর্ণ আমার বলেই খোকাকে পালন করব।"

মাস দুয়েকের জন্য ধাত্রী মালতীর কাছে থাকিয়া খোকার যত্ন করিল। তার পরে সে বলিল "মালতী দেবী! এবার আপনি একাকী খোকার ভার সামলাতে পারবেন। আমায় দরকার হলেই আবার ডেকে পাঠাবেন।"

মালতী তাহাকে তাহার মাহিনা দিয়া বলিল "ডেকে পাঠাব বৈকি! তবে—আপনার জানাশোনা এমন কোন বাঙালী মহিলা আছেন কি যিনি আমার সঙ্গে আমাদের দেশে যেতে রাজী হবেন—এবং খোকার পরিচর্য্যায় আমাকে সাহায্য করবেন?"

ধাত্রী বলিল "আমি সন্ধান করে আপনার স্বামীকে জানাব। আজ তবে আসি। বিদায়। নমস্কার।"

মালতী প্রতি-নমস্কার করিল।

গোপাল একদিন বলিল "ধাত্রী আমাকে বলছিল তুমি তোমার সাহায্যের জন্য একটী ভদ্র মহিলাকে নিযুক্ত করতে চাও। তার চেয়ে আমি আর এক প্রস্তাব করছি—তুমি বোধহয় তাতে রাজী হবে। সুলতাকে আনব কি?"

"সুলতা? সে কোথায়! তার কোন সন্ধান জেনেছ?"

গোপাল বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিল "ও:। তোমাকে বলিনি বুঝি? ভুলে গিয়েছিলুম। সুলতা দেওঘরে তার বাপের সঙ্গে বাস করছিল। প্রিয়নাথ বাবু সেখানে মারা যান। আমার যে বন্ধুটীর কথা বলেছিলুম তাঁর মা দয়া করে, তাকে আপনার মেয়ের মতো কাছে রেখেছেন। আমি তাকে আমাদের বাড়ীতে আসবার জন্য মত জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তাতে সুলতা বলে, মালতীকে দেখতে আমার খুবই সাধ। তার কাছে গিয়ে যদি থাকতে পাই—আমার কোন আপত্তি নেই। আমি বললুম আচ্ছা মালতীকে জিজ্ঞাসা করে জানাব। তারপর এ ক' দিনের মধ্যে কথাটা ভুলে গিয়েছিলুম!"

মালতী যারপর নাই আনন্দিত হইয়া বলিল "সত্যি বলছ! সে যদি আসে—আমার কোন কষ্ট হবেনা। আহা অভাগী--কত দু:খই না পেয়েছে। স্বামী বাপ দুজনেই মারা গেলেন। তবু শ্বশুরের ভিটায় এসে থাকবে—মেয়ে মানুষের এতেই স্বর্গ! কবে তাকে আনতে যাবে?"

গোপাল বলিল "আমি দুএকদিনের মধ্যেই তাকে গিয়ে বলব। যতশীঘ্র পারি নিয়ে আসব।"

সুলতা আসিল। তাহার মাথার চুল ছোট করিয়া কাটা। পরণে থান। মালতীর মনে পড়িল বিধবা হইবার পর সুলতা যে কদিন তাহাদের কাছে ছিল যদিও সে থান পরিয়াছিল বৃন্দাবন তাহাকে তাহার চুল কাটিতে দেন নাই।

মালতী জিজ্ঞাসা করিল "এত রোগা হয়ে গিয়েছিস! অসুখ করেছিল বুঝি?"

সুলতা বলিল "হাঁ, বাঁচবার আশা ছিল না। ভগবানের কি মনে হোল ডাকদিয়েও ফের তাড়িয়ে দিলেন।"

"এতদিনের মধ্যে একটাও চিঠি লিখিস্ নি! কেমন করে ছিলি বল দেখি?"

"কোন প্রাণে আর লিখব বল।—বুঝিস্ ত সব। এতদিন পরে আবার যে দেখা হল এই আমার ভাগ্য! সেই ছেলে বেলাকার কথাগুলা মনে পড়ছে। আহা! আর তা ফিরবে না!"

দুজনেরই মন ভারাক্রান্ত হইয়াছিল। নীরবে খানিকক্ষণ কাঁদিবার পর সুলতা বলিল "কই তোর খোকা কই? দোলায় ঘুমুচ্ছে বুঝি? চ' দেখিগে।"

গোপাল সুলতাকে আনিবার সময় তাকে স্বীকার করাইয়াছিল তাহার জীবনের ঘটনা মালতী বা অপর কারও কাছে কখনো প্রকাশ করিবে না। দেওঘরের কথা নলিনের কথা, কিছুই আর সে কারও কাছে বলিবে না। তাহার ব্যথার কাহিনী হৃদয়ের মাঝে লুকাইয়া রাখিবে। মালতী ও গোপালের কাছে ফিরিয়া সে যেন শুধু মনে করে—তাহাদের বাড়ীতে শেষ যখন ছিল, তারপর এতদিন স্বপ্নের মতই কাটিয়া গিয়াছে—ইহার ভিতরকার কোন ঝড়ঝাপটা তাহার উপর কোনও চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই।

সুলতা নিজেও একথা ভাবিয়াছিল। মালতীর কাছে

ফিরিবার কথা যখন হয় সে মনকে ঠিক করিয়াছিল এই বলিয়া যে সেখানে তাহার পূর্ব্বের ছবিখানি লইয়াই ফিরিবে নলিনের স্মৃতি সে জীবনে ভুলিবে না সত্য। কিন্তু যে বিটপির গায়ে নির্ভর করিয়া লতাইয়া সে আপনাকে গৌরবান্বিত ভাবিয়াছিল আজ তাঁহার অন্তর্ধানে সে সম্বন্ধে কোন বেদনা কাহাকেও জানিতে দিবে না। যাহার পরিচয়ে সে আপনাকে গর্ব্বের সহিত জগতের সামনে খাড়া করিয়া বলিতে পারিত—"আমাকে তোমরা যতই কেন লাঞ্ছনা কর আমি তাতে ভ্রূক্ষেপ করিব না—আমি সত্য ধর্ম্মের উপাসক —আর কিছু মানি না"—সে আজ নাই! নলিনের মৃত্যুর সহিত সুলতার তেজ বা গর্ব্ব সকলি অন্তর্হিত হইয়াছে। শুধু বাঁচিতে হইবে বলিয়াই বাঁচা। যে কটা দিন মরণ না আসে যেমন করিয়া হোক দিন কাটাইয়া দিবে। তাহার পরিচয়—তাহার অলঙ্কার—তাহার সর্ব্বস্ব আজ সে আপনি লোকের সামনে হইতে গোপন রাখিবে।

মালতীর সহস্র প্রশ্নের উত্তরে সে আপনাকে ধরা না দিয়া সাবধানে কথা কহিত।

মালতীর ছেলেকে দেখিয়া সুলতার মনে কষ্ট যথেষ্টই হইয়াছিল। আহা! তাহার ছেলেটা যদি থাকিত তাহাকেও এমনি করিয়া আদর করিত।—এমনি করিয়া কোলে লইয়া চুমায় চুমায় তাহার গাল ভরিয়া দিত। অসাবধানে তাহার চোখ হইতে দুই বিন্দু জল গড়াইয়া পড়িল। সুলতাকে বিচলিত দেখিয়া মালতী ভাবিল সে ভাবিতেছিল তাহার স্বামী যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতেন— তাহারও যদি এমনি একটী ছেলে হইত—সে কত আনন্দ পাইত! মালতী নিজে ছেলে না হওয়ার কষ্ট কত নিদারুণ তাহা জানে। সেও তো ভুক্তভোগী। সুলতার দিকে চাহিয়া মালতী সমদুঃখে ব্যথিত হইয়া বলিল "আমার খোকাকে তুই নিবি? তোকেই সে মা বলে ডাকবে? তুইও ত' আমার কাছেই চিরকাল থাকবি—তাহলেই হোল। আমিও দেখতে পাব!"

সুলতা নিজেকে সামলাইয়া বলিল "না বোন। এক মুহূর্ত্তের জন্ম মনটা খারাপ হয়েছিল—আর কখনও তুই আমাকে চঞ্চল দেখবি না। আমি যেমন রাক্ষসী—আমাকে মা বললে সে বাঁচবে না। তোর ছেলে তোরই থাক। আমাকেও একটু আদর করতে দিস্!—এই হোলেই যথেষ্ট!"

—উনত্রিশ—

নীরজা সকল মায়া ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে চলিয়াছিল। কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই—। সে দেখিতেছিল —সামনে অনন্ত পথ পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাকে চলিতে হইবে। কোথায় যাইতেছে—কেন যাইতেছে—কিছুই সে জানে না। শুধু এইটুকু জানে যে তাহাকে চলিতে হইবে। লোকালয় ছাড়িয়া—মানুষের দুঃখ সুখ ভালবাসা ঘৃণা সব ছাড়িয়া তাহাকে চলিতে হইবে। কে বলিবে কোথায় তাহার মুক্তি? কে বলিবে—কোথায় পথের শেষ?

শ্রান্ত হইলে কোনও পুকুর ধারে বসিয়া অঞ্জলি ভরিয়া জল খায়। ক্ষুধা নিতান্ত অসহ্য হইলে সে অবসন্ন হইয়া পথের ধারেই পড়িয়া থাকে। কোন গ্রামবাসী পথ দিয়া যাইতে যাইতে দয়া করিয়া তাহাকে কিছু ফলমূল দিয়া গেলে সে খায়। স্বামীর উপদেশের কথা ভাবে।—সত্যই ভগবানের দয়া অসীম। সে মনে করে আমি কিছু চাইব না। তাঁর ইচ্ছা হয় দেবেন আমি মাথা পাতিয়া লইব—না দেন এইখানেই পথের ধারে মরিয়া থাকিব। আমার পথ চলা শেষ হইবে না তাহাতে কার কি যায় আসে। আমি চলিয়াছি শুধু তোমার দয়া যাচাই করিতে,—তোমার ভালবাসা বুঝিতে! তোমারই জন্য আমি মানুষকে ভুলিব —আমার সর্ব্বস্ব স্নেহ মায়া মমতা ভালবাসা যা কিছু আছে মানুষের কাছ হইতে ফিরাইয়া লইয়া তোমারই চরণে ঢালিব। মানুষকে ভুলিতে আমার যত কষ্ট সব সহিব— শুধু তোমাকে বুঝিব বোলে!

এমনি করিয়া চলার পথে তার কতদিন গেল—কে জানে? কে তাহার হিসাব রাখে?

বিন্ধ্যাচলের পাহাড় শ্রেণী দুই ধারে পড়িয়া আছে। কখনও কাছে আসিতেছে কখনও দূরে সরিয়া যাইতেছে। বন উপবন কত সামনে আসিল। নদ নদী কত নীরজাকে চলিবার পথে বাধা দিল। সে কিছুই দেখে না! সুন্দর তাহাকে আর মুগ্ধ করে না।—ভয়ঙ্করও তাহাকে অভিভূত করে না। এমনি করিয়া চলিতে চলিতে একদিন এক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা হইল।

ব্রহ্মচারী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। এক পাহাড়ের উপর বন জঙ্গলের ভিতরে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবতার আরাধনা করেন। ভক্ত শুধু ভগবানকে লইয়াই নির্জ্জনে কতদিন ধরিয়া সাধনা করিতেছেন কেহ জানে না। নীরজা যে পথ দিয়া আসিয়াছিল, এখানে ব্রহ্মচারী যতদিন আছেন আর কেহ আসে নাই। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন। হয়তো কোন অতীত যুগে নীরজারই মত প্রাণে দাগা পাইয়া লোকালয় ছাড়িয়া এই নির্জ্জন বাস বাছিয়া লইয়াছেন। আজ নীরজাকে দেখিয়া তাঁর পূর্ব্বস্মৃতি জাগিল। বলিলেন "কে মা তুই! এই হিংস্র পশু-সঙ্কুল জঙ্গলে এমনি করিয়া একাকী পথে বাহির হয়েছিস? তুই কি শক্তিময়ী নিজে আজ ছেলের কথা মনে পড়ায় নিজে আসিয়া দেখা দিয়েছিস? অথবা মা তুই শ্যাম প্রেমে কাঙালিনী রাধা অভিমানে শ্যামকে ভুলতে পালিয়ে এসেছিস? কে তুই মা?"

নীরজা এত দিন পরে আবার মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিল।

বলিল "আমার কিছু নেই—কেউ নেই! আমি শুধু পথে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসেছি। আমি জানতে এসেছি আমি কি চাই—আর আমার কি আছে। আমার পরিচয় বা নাম হারিয়ে ফেলেছি। অতীতের স্বপ্ন ভুলে গেছি। আমি কোথায় চলেছি জানি না। আমি শুধু এক পথহারা পথিক।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "ছলনা করিস নি মা। আমি তোরে চিনেছি। তুমি বিশ্বময়ী জননী—আপনার সৃষ্টির বুকে এমনি উদাস হয়ে বেড়িয়ে—কি তুমি খুঁজছ তা জেনেছি। আয় মা আমার কুটীরে। আমি তোমার ঈপ্সিত দেখিয়ে দেব।—তোমার শ্যাম আমিই যে বেঁধে রেখেছি!"

নীরজা বলিল "দেবে? কি আমি চাই খুঁজে দেবে? চল—দেখাবে চল! আমার ঈপ্সিত—তোমারি দুয়ারে বাঁধা? আমি যাকে পাবার জন্য মানুষকে ভুলেছি—আমায় দেখাবে চল!—"

ব্রহ্মচারী নীরজাকে তাঁহার মন্দিরে লইয়া গেলেন। একটী বাল-গোপালের মূর্ত্তি ছিল। নীরজা জিজ্ঞাসা করিল "ইনি কে?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "গোপাল—তুমি যাকে চাও!"

নীরজা চমকিয়া বলিল "গোপাল?—গোপাল? তুমি আজ এই বেশে আমাকে ধরা দিয়েছ?—হ্যাঁ, আমি তোমাকেই চাই! আমি পেয়েছি! আমি জেনেছি!"

ব্রহ্মচারীকে বলিল "বাবা! তুমি কি অন্তর্য্যামী? কেমন করে তুমি জানলে? আমি কাকেও যে কথা বলিনি—আমি নিজেই যে কথা জানতুম না—কেমন করে তুমি জানলে? যাকে পাবার জন্য সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছি—কেমন করে তুমি জানলে? কে তোমায় বলে দিয়েছে?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "আমিও কিছু জানি না মা? গোপাল জানত—সে ধরা দিয়েছে তাই তুমি চিনেছ!"

নীরজা আত্মহারা হইয়া গোপালকে ভালবাসিল। ক্রমে তার স্মৃতি বিকৃতি ঘটিল। গোপালের চিন্তায় সে পাগল হইয়া গেল। কখনো পুত্ররূপে, কখনো স্বামী—কখনো পিতা—এমনি বিভিন্ন রূপে যখন যেমন ভাবিত তন্ময় হইয়া যাইত। ভক্তিতে মাঝে মানুষ এ রকম আত্মহারা হইতে পারে দেখিয়া ব্রহ্মচারী পর্য্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। জ্ঞান যে তার একেবারে ছিল না—তা নয়। ব্রহ্মচারী যখন যা বলিতেন সে মন দিয়া শুনিত। যা জিজ্ঞাসা করিতেন উত্তর দিত। নীরজার শরীরের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়াছিল। আহার অন্বেষণের জন্য তার নিজের কোন চেষ্টা ছিল না। আশে পাশে বুনো গাছে অনেক রকম ফল ঝুলিয়া থাকিত। ব্রহ্মচারী পাড়িয়া আনিয়া দিতেন। কোনদিন ইচ্ছা হইলে আহার করিত—কোন দিন বা স্পর্শ করিত না। ঝড় জলে ভ্রূক্ষেপ নাই। পাহাড়ের উপর সাপ ও অন্য জানোয়ার কত ঘুরে বেড়ায় তাহাতেও লক্ষ্য নেই। নীরজা ব্রহ্মচারীর কুটীরে পর্য্যন্ত শুইত না। মুক্ত আকাশের তলে শুইয়া থাকিত। লজ্জা ঘৃণা সমস্ত ভুলিয়াছিল। ব্রহ্মচারীর দেওয়া বাঘ ছালের আচ্ছাদন কখনো ইচ্ছা হইলে পরিত—কখনো বা ফেলিয়া দিত। যশোদা-নন্দনের মায়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। ব্রহ্মচারী তাহার অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন মৃত্যুর দেবতা প্রস্তুত হইয়াই ছিল অনুমতি না পাইয়

আসিতে পারিতেছিল না। হঠাৎ একদিন কেমন করিয়া কেহ জানে না—হয়তো নীরজা নিজেই কোথাও মোহের বশে সরাইয়া রাখিয়াছিল—গোপালের মূর্ত্তিটী অদৃশ্য হইল। ব্রহ্মচারী বুঝিলেন তাহারও শেষ অবস্থা আসিয়াছে। গোপালের অদর্শনে কাতর হইয়া যে রকম ছটফট করিত তা দেখিয়া পাষাণেরও চোখে জল আসে। ব্রহ্মচারীকে সে জিজ্ঞাসা করিল "আমার গোপালকে দেখেছ তুমি ? কোথায় গেছে—বলনা।"

ব্রহ্মচারী কেমন করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবেন বুঝিতে পারিলেন না। কত খুঁজিলেন অনুরূপ আর কোনও মূর্ত্তির যোগাড় করিতে পারিলেন না। এক জায়গায় গোপালের নীল মুক্তার ছড়াটী পড়িয়াছিল। দেখিতে পাইয়া নীরজা সেটী কুড়াইয়া লইল। এবার স্থির হইয়া বলিল "গোপাল তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়া পালিয়েছ বুঝতে পেরেছি। আমার স্মৃতিটুকু জাগিয়ে রাখতেই এই হারটা এখানে ফেলে গেছ।"

পরে ব্রহ্মচারীর দিকে তাকাইয়া বলিল "দেখতে পেয়েছ কি গোপাল কোথায় গেছে.........ওই দেখ.........ওই আকাশের ওপারে অকৃতজ্ঞ ছেলে আবার কাকে মা বলে ডাকছে। দেখতে পেয়েছ ?"

সেদিনের পর থেকে নীল কণ্ঠিটা বুকের মাঝে রাখিয়া নীরজা চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইত। কখনো বা চীৎকার করিয়া ডাকিত "গোপাল! গোপাল! আমি তোমায় ভালবাসিনি বলে অভিমান করেছ ? তাই আমায় ছেড়ে চলে গেলে ? কিন্তু কত দুঃখে তোমায় ভালবাসতে পারিনি জান কি ? ভালবাসার আদর্শ তোমার কাছে শিখেছি। তুমিইত শিখিয়েছ ভালবাসলে কামনা ভুলতে হয়। তবে কেন আজ আবার তৃষিত লোলুপ দৃষ্টিতে চাইছ ? তবে কেন আজ অভিমান করে মুখ ফিরিয়ে নিলে ? ....তুমি কেঁদোনা।.........আমি তোমাকে চিরকাল ভালবাসব—কিন্তু লালসার মধ্য দিয়ে নয়।.........আমার এ ভালবাসা অমর ও অক্ষয়!"

আবার কখনো কাঁদিয়া বলিত "গোপাল! তোর মাকে ভুলে থাকতে পারছিস ? আয় আয় ফিরে আয়। আমি কতক্ষণ তোর প্রতীক্ষাতে বসে থাকব ?"

একদিন নীরজা ব্রহ্মচারীর কাছে বসিয়া গোপালের সম্বন্ধে কত গল্প করিতে লাগিল। যেন সত্যিই তার এক ছেলে ছিল। ছেলের দুরন্তপানার কত কাহিনী বলিতে লাগিল। তার সংসার জীবনেরও অনেক কথা বলিল। তার নাম—তার স্বামীর নাম সমস্তই বলিল। মালতীর নাম ও পরিচয় বলিল। আরও বলিল মালতী তার কাছে আসিয়া গোপালকে চাহিলে সে স্বেচ্ছায় আনন্দের সহিত দিয়া আসিয়াছে। মালতী কৃতজ্ঞতা জানাইলে সে বলিয়াছিল "এতে বলবার তো কিছু নেই বোন ? ছেলে কে কার ? স্বামী পিতা মাতা—সব সেই এক। তুমি আমি সব এক। তোমার স্বামী আমারও স্বামী। আমার ছেলে তোমারও ছেলে। সব এক। গোপালই আলাদা রূপ নিয়ে কখনো তুমি—কখনো আমি হচ্ছেন।" নীরজা ব্রহ্মচারীকে এই সব গল্প শুনাইয়া শেষে জিজ্ঞাসা করিল "এক কাজ করতে পার বাবা ? গোপাল এই নীল কণ্ঠীটা ফেলে গেছে তুমি তাকে পাঠিয়ে দিও।"

ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় পাঠাব মা ?"

নীরজা গোপাল ও মালতীর ঠিকানা বলিল।

সেইদিন রাত্রেই নীরজা মারা গেল। ব্রহ্মচারী তাহার 'পাগলী' মায়ের অন্তিম ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিল না। পাহাড় হইতে নামিয়া বহুদিন পরে আর একবার লোকালয়ে আসিয়া নীরজার সমস্ত কাহিনী লিখিয়া চিঠি ও নীলকণ্ঠিটী গোপালের নামে ডাকে পাঠাইয়া দিলেন!

—ত্রিশ—

গোপাল মালতাদের লইয়া এক শুভদিন দেখিয়া দেশে ফিরিল।

সকলে মালতীর খোকা দেখিয়া আনন্দ করিল। রাঙা জ্যেঠাইমা নন্দর মা, বামুন পিসী ইত্যাদি করে অনেক বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক আশীর্ব্বাদ জানাইলেন। কেহ বলিলেন "দিব্বি ছেলে হয়েছে। সন্ন্যাসী এসেছিল তার অদ্ভুত ক্ষমতা বলতে হবে"। অপর কেহ বলিলেন "টকটক করছে রঙ। যেন দুধে আলতায় মেশান। যেমন সুন্দর

তেমনি ছিরি।” কেহ বা বলিলেন “এতদিন সংসারে ছিরি ছিল না—! মা ষষ্ঠী করুন সব বেঁচে থাক্ !”

সুলতাকে দেখিয়া সকলে সমবেদনা জানাইলেন। সুলতা সকলকার আত্মীয়তায় ও স্নেহে ছেলেবেলাকার আনন্দের জীবন ফিরিয়া পাইল।

মালতীর খোকাকে আদর করিয়া সে আপনার দুঃখ ভুলিল। মালতীও খোকাকে খুব ভাল বাসিত। তবে—তার ভালবাসার মাঝে কেমন যেন একটু সঙ্কোচও জড়ান ছিল। সুলতার মত মন খুলে সে খোকাকে বুকে লইতে পারিত না। মাঝে মাঝে মালতীর মনে হয়—পরের খোকাকে সকলের কাছে নিজের বলিয়া প্রতারণা করিতেছে ইহা কি ভাল হইতেছে? মাঝে মাঝে সে স্বামীর কাছে প্রকৃত কথা—কার ছেলে কি বৃত্তান্ত জানিবার জন্য ব্যগ্র হয়। কিন্তু ভয় হয়—যদি শোনে খোকা ভাল জাতের কেহ নয়! যদি শোনে খোকার জন্ম দোষ আছে! বোধ হয় তা হলে খোকাকে সে আর এমনি করে ভালবাসিতে পারিবে না। খোকার মুখ দেখে সে ভুলে যায় আপনার সন্দেহের ব্যথা মনের মাঝেই লুকাইয়া রাখে।

সুলতা ভাবিতে চায় খোকা আর কারও নয়—শুধু তার। সে তার ভালবাসা দিয়া খোকাকে আপনার বুকের মাঝে পাইয়াছে। কৃষ্ণ যশোদাকে মা বলিয়াছিল। যশোদার মতই খোকাকে মাতৃস্নেহে সে বাঁধিতে চায়। প্রায়ই মালতী কাপড় কাচিতে বা অপর কোনও কারণে অন্যত্র যাইলে সুলতা চুপি চুপি আসিয়া খোকাকে বুকে করিয়া তাহার মুখে চুমা খায় এবং আপনার অজ্ঞাতে তাহার চোখ দুইটা গভীর মর্ম্মবেদনায় পরিপ্লুত হয়।

মালতী ফিরে আসিয়া দেখিয়া ফেলে।—সুলতার আর লজ্জার সীমা থাকে না। মালতী নিজেও তাহার মনের ব্যথা বুঝিয়া কাঁদিয়া ফেলে। এমনি করিয়া সুখে দুঃখে তাহাদের দিন কাটিতে লাগিল।

খোকা তখন ছমাসের। গোপাল মালতী সুলতা ও খোকা—এই চার জনের সভা বসিয়াছিল। সেদিনের আলোচ্য বিষয় ছিল—খোকার নাম ঠিক করিতে হইবে।

মালতী বলিল “আমি নীলমণি বলে ডাকব।”

সুলতা বলিল “যে দুরন্ত ছেলে তোমার—নীলমণির মতই শেষে গয়লা বৌএদের কেঁড়ে ভেঙ্গে মাখন চুরি করে গাছ উবড়ে গরু ঠেঙিয়ে বেড়াবে।.........আমি বলি এরকম ছেলের নাম এতটা মেয়েলিয়েম ভাল নয়। ওরির মধ্যে একটু গুরুগম্ভীর—যাতে লোকে বুঝতে পারে—তুমি কি বল ঠাকুরপো?”

এমন সময় ব্রহ্মচারীর লেখা নীরজার শেষ জীবনের ইতিহাস ও তাহার মালতীর খোকার জন্য পাঠানো ভালবাসার শেষ নিদর্শন—পিওন দিয়া গেল। সকলের মন সেই দিকেই আকৃষ্ট হইল।

নীরজা অন্ধকারে তাহার কাছ হইতে সেই রাত্রে চলিয়া যাইবার সময় গোপাল বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাধা দিতে পারে নাই। নীরজা চলিয়া গেলে যখন তার চেতনা হইল—নীরজার অন্বেষণের জন্য সে ব্যাকুল হইয়াছিল। সুভাষও দিদির অকস্মাৎ তিরোধানে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিল। গোপাল সুভাষের সহিত দেখা করিয়া নীরজাকে খুঁজিবার জন্য পুলিশে খবর দিয়া ও লোক পাঠাইয়া অনেক যায়গায় চেষ্টা করিয়াছিল। গোপাল যতদিন বিদেশে বেড়াইতে গিয়াছিল সর্ব্বত্রই সুলতার সঙ্গে নীরজারও খোঁজ লইত। এতদিন নীরজার কোন সংবাদ পায় নাই। আজ একেবারে শেষ খবর আসিল। আর তাহাকে ফিরাইবার কোন পথ নাই।

গোপালকে নীরজা কি রকম ভালবাসিত এবং সেই ভালবাসা বাল-গোপালের মূর্ত্তির উপর অর্পণ করিয়া সে কিরকম আত্মহারা হইয়াছিল সব ব্রহ্মচারীর চিঠিতে জানিয়া গভীর দুঃখে তাহার চোখে জল আসিল। মালতীও নীরজার পরিণামের কথা জানিয়া কাঁদিল। সুলতা নীরজার কথা সুভাষের কাছে শুনিয়াছিল। সেও খুব কাঁদিল। সকলকে কাঁদিতে দেখিয়া খোকাও চীৎকার করিতে লাগিল।

খানিকক্ষণ সকলে কাঁদিবার পরে সুলতা বলিল “নীরজার আশীর্ব্বাদ খোকাকে পরিয়ে দাও।”

মালতী নীলকণ্ঠটা খোকার গলায় পরাইয়া দিলে সে নূতন খেলা পাইয়া চুপ করিল।

সুলতা বলিল “নীরজার পাঠানো হারের নাম থেকে খোকার নাম রাখা হোক নীলকণ্ঠ।”

গোপাল বলিল "বেশ হোল বৌদি। তোমাদের দুজনকার ইচ্ছাই এই নামটীতে পূর্ণ হয়েছে। মালতী চেয়েছিল নীলমণি বলে ডাকতে, আর তুমি চাইছিলে ওর চেয়ে কিছু গম্ভীর নাম দিতে। নীরজা বুঝি—অন্তর্য্যামী। সে তোমাদের মনের কথা বুঝতে পেরে এই সমস্যার অপূর্ব্ব মীমাংসা করে দিয়েছে। আর—হাঁ—আমার নিজেরও এ নামটী বড় পছন্দ হয়েছে।"

সুলতা চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি ভেবে তুমি একথা বললে ঠাকুরপো?"

মালতী কৌতূহল দৃষ্টিতে চাহিল।

গোপাল বলিল "সে কথা আজ নয়। আর একদিন বলব। না—না—আমায় জিজ্ঞাসা কোরনা। আমি বলতে পারব না!"

—একত্রিশ—

গোপালের চঞ্চলতা দেখিয়া মালতী মনে করিয়াছিল —নীলুর জন্মের সঙ্গে নামের হয়তো কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে। মালতী ভাবিল যদিই কিছু থাকে সে কথা গোপন থাক।—মালতী শুনিতে চায় না!

সুলতা কিছু জানিত না। তবু তাহার মনেও এমনি একটা সন্দেহ উঠিয়াছিল। গোপাল যখন সে কথা বলিবে না বলিয়া সেখান হইতে পলাইয়া গেল,—সুলতা ভাবিতে লাগিল এমন কি গোপনীয় কথা থাকিতে পারে যা কাহারও কাছে বলা যায় না!

কিছুদিন যাইলে মালতী ও সুলতা দুজনেই তাহাদের সন্দেহের কথা ভুলিল।

পাঁচ বছর মালতীর সংসারে মালতীর ছেলেকে ভাল বাসিয়া সুলতার আনন্দে দিন কাটিল।

মাঝে মাঝে সুলতা মনে করিত নীলু যদি তার নিজের ছেলে হইত এর চেয়ে আরও কত সুখ সে পাইত! নলিনের স্মৃতি যখন ব্যথা জাগায় মৃত সন্তানের জন্য মন যখন ভারাক্রান্ত হয় সুলতা নীলুকে দেখিয়া সকল দুঃখ ভুলে যায়।

এবার তার নিজের ডাক আসিল।

মুমূর্ষু সুলতার পাশটীতে শুইয়া নীলু কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গোপাল অদূরে একটী চেয়ারে বসিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল। মালতী ছল ছল চোখে চাহিয়াছিল।

সুলতা বলিল "কাঁদছিস বোন? আর তো আমায় দরকার নেই। এবার আমায় ছুটী দে!"

মালতী রুদ্ধস্বরে বলিল "সুলতা! দিদি আমার। তুই যে চিরদিন আমাদের কাছে থাকবি বলেছিলি!"

সুলতা বলিল "যেতেই তো একদিন হবে বোন আজ না হয় কাল।"

মালতী জিজ্ঞাসা করিল "তুই নীলুকে ভুলে থাকতে পারবি? সে যে এখনো বালক—! তোর অভাবে সে বাঁচবে না।"

"মালতী। বোন! নীলুকে ভুলতে আজ আমার কি কষ্ট কেমন করে তা বলব। তবু শেষ ডাক যখন আসে কেউ তা অগ্রাহ্য করতে পারে না সব ফেলে সব ভুলে যেতে হবে।"

সুলতা গোপালকে বলিল "ঠাকুরপো। নীলু রহিল। তাকে দেখো। আর—আর—তার শিশু হৃদয় থেকে আমার স্মৃতি পারো তো মুছিয়ে দিও।"

গোপাল একথার উত্তরে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। মালতী শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেন বোন? একথা বললি কেন? নীলুতো তোকে ভুলবে না!—যদিও তুই তাকে ফেলে চলে যাচ্ছিস্ চির জন্মের মত!"

"মালতী! আমি তোকে ভুলতেই যাচ্ছি দিদি! সে কথা সত্যি! আশ্চর্য্য হস নি তুই। তার বাঁধন ছিঁড়ে ফেলবার জন্য কতদিন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি! যদি কখনো সে আমায় চিনে—ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়—সে ব্যথা আমার বুকে বড্ড বাজবে! তাই সে কিছু বোঝবার আগেই পালাতে চাই।"

"সুলতা! পাষাণী তুই! জানি না তুই আজ কি ব্যথা বিদায় বেলাতেও আমার কাছ থেকে ঢেকে রাখলি। তোর জীবনে লজ্জিত হবার মতো কোন কাহিনীই আমি জানি না। বলতে তোর কষ্ট হয় দেখে জিজ্ঞাসাও করিনি কোন দিন। আজও জানতে চাই না—!"

"অভিমান করলি বোন! আজকের দিনটীতে চোখের জল ফেলিস নি। আজকের দিনটীতে তোদের ভালবাসা নিয়েই যেনো যেতে পারি। তারপর……তারপর আমি চলে গেলে……ঠাকুরপো সবই জানে……তার কাছেই জানতে পারবি। সে কথা জানলে হয় তো আমায় আর তুই ভাল বাসতে পারবি না……তাই বলছি……আজকের দিনটীতে আমায় মাপ কর বোন।……"

আর ও কথা লইয়া মালতী কথা কাটাকাটি করিল না।

গোপাল কিছুতে আপনাকে সামলাইতে পারিতেছিল না। সুলতার হৃদয়ের আবেগ সে যে সমস্তই জানিত!

সুলতা নীলুর দিকে চাহিয়া আপন মনে বলিল 'আহা! ঘুমুচ্ছে! ঘুমুক! নীলুকে আমার বলে ভেবে এতদিন কাটিয়েছি! নীলু যদি সত্যিই আমার হোত!………"

গোপাল রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "বৌদি—তুমি জান না—নীলু তোমার। একন্তই তোমার! আমরা তোমার বুকের ধন চুরি করে এনেছিলুম। তুমি আমাদের ক্ষমা করে যাও। বলে যাও আমাদের প্রায়শ্চিত্ত কি?"

প্রদীপ নিভিবার আগে একবার যেমন জ্বলিয়া ওঠে সুলতা তেমনি বিস্ময়ে উত্তেজিত হইয়া বলিল—"সত্যিই—আমার? কি বলছ তুমি ঠাকুরপো?………তোমরা চুরি করে এনেছিলে?……আমাকে জানতে দাওনি।…… জগৎকে জানতে দাও নি।………মিথ্যার আবরণ দিয়ে তাকে লুকিয়ে রেখে সকলকে প্রতারণা করেছ?……… ভগবান!………আমাকে আজ এত অশক্ত করেছ—নীলুকে কোলে করে দাঁড়াবার সামর্থ্যটুকুও রাখো নি। নইলে বলতুম… ……কাকে লুকুতে চেয়েছ তোমরা?—সে কারও দয়া চায় না।……সে তার মায়ের কলঙ্ক নয়!…… সে দরিদ্র নয়।—সত্য আর ধর্ম্ম যার সহায়—সে হীন নয়!………"

গোপাল বলিল "আমাদের ক্ষমা করে যাও বৌদি! ………আমরা বুঝতে পারি নি।"

সুলতা বলিল "না………তোমাদের দোষ কি?…… তোমরা ভেবেছিলে আমি তাকে বাঁচাতে পারব না।…… আমার জন্যে সে জগতের মাঝে উঁচু হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।………তোমরা আমাকে ভালবাস……তাই আমার ও নীলুর প্রাণ বাঁচাবার জন্য এই কৌশল করেছিলে।…… কিন্তু আজ আমি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি!………নইলে দেখাতুম—।"

সুলতা কথা শেষ করিতে পারিল না। তাহার মাথার ভিতর শরীরের সব রক্ত উঠিয়া আসিয়াছিল। তার চোখ দুইটী একবার যেন নয়নকোটর হইতে ঠিকরাইয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল। বার দুই নিঃশ্বাসের সঙ্গে যেন তপ্ত স্ফুলিঙ্গ বাহির হইল। তারপর সব স্থির। চোখে আর পলক পড়িল না। সুলতার প্রাণবায়ু অলক্ষ্যে বাহির হইয়া গেল।

গোপাল হাহাকার করিয়া উঠিল। কেন সে দুর্ব্বুদ্ধির মত এ সময় সুলতাকে নীলুর সম্বন্ধে সত্য ইতিহাস জানাইতে গিয়াছিল? উত্তেজিত না হইলে হয়তো সে আরও দুএকটা দিন বাঁচিতে পারিত। গোপালের মনে হইল সেই বুঝি সুলতাকে হত্যা করিয়াছে!

গোপাল মালতীর দিকে চাহিতেই দেখিল—সেও বুঝি চিরঘুমে ঘুমাইয়া পড়িল।—মালতী নিস্তব্ধ ও নিস্পন্দ হইয়া নীলুর পাশটীতে শুইয়া ছিল—আর নীলু সহসা জাগিয়া উঠিয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া একবার মালতী ও একবার সুলতাকে ডাকিতেছিল "মা ওঠ! কথা কচ্ছ না কেন? ………জ্যেঠাই মা। এ রকম করে চেয়ে রয়েছ কেন? ………ওঠ তোমরা।………ওঠ।"

গোপাল বুঝিল সে নিজে অস্থির হইয়া পড়িলে হয়তো মালতীকেও হারাইবে! সে সরিয়া আসিয়া মালতীর মাথায় জলের ঝাপটা দিয়া ও পাখার বাতাস করিয়া তাহার জ্ঞান ফিরাইবার জন্য চেষ্টিত হইল।

মালতী যেন একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিয়া বলিল "নীলু! নীলু! বাপ আমার। মাণিক আমার।"

নীলু বলিল "কেন মা—এ রকম করছ কেন? কি হয়েছে তোমার? ………এই দেখ মা—জ্যেঠাই মা কথা কইছে না—"

মালতী আধ ভাঙা স্বরে বলিল "তোর জ্যেঠাইমার মুখে কথা আর শুনতে পাবি না নীলু!"

এ কথা শুনিয়া নীলু বুঝিতে পারিল—তাহার জ্যেঠাইমা আর ইহ জগতে নাই ! সুলতার বুকের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

মালতী গোপালকে জিজ্ঞাসা করিল "এতদিন বলনি কেন ? কেন আমাদের জানতে দাও নি ? তাহোলে ত— হয়তো—এত ভালবাসতুম না।—এত ব্যথা পেতুম না। আজ আমি নীলুকে কেমন কোরে কাছে নেব ?"

গোপাল বলিল "চুপ কর মালতী ! চুপ কর ! এমন অস্থির হয়ে পড়লে নীলুকে বাঁচাতে পারব না। তাকে শান্ত কর। তাকে কাছে টেনে নাও !"

মালতী ছেলেকে ডাকিয়া কাছে টানিয়া লইবার জন্য হাত বাড়াইল। অমনি কে যেন তাহাকে বিদ্যুতের চপটী দিয়া মারিল। সে পিছাইয়া আসিল। আপনার মনকে সে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিতেছিল না। যতদিন না জানিত সে বেশ ছিল। জানিয়া শুনিয়া কেমন কোরে তাকে ছেলে বলিয়া স্বীকার করিবে ? সুলতা—পতিতা ? সেই সুলতার ছেলে ? হায় ! জীবন্তে একি নরকের দৃশ্য তার চোখের সামনে ভাসিতেছে !—

সুলতার ছেলে—নীলু ? সুলতা—অশুচি ছিল ? যার হৃদয় দয়া মায়া ভালবাসা জ্ঞান বুদ্ধি সকল রকম গুণের আধার ছিল—পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি যে ছিল—সে ছিল অশুচি ? মিথ্যা কথা !—দেবললনার মতো শুভ্র অন্তঃকরণ যার—স্বচ্ছ কাচের মত বাহির হতে দেখা যায়—সে অশুচি হতে পারে না। কিন্তু—নীলু যে তারই ছেলে ! এ কথা তো সে স্বীকার করিয়া গেছে !—মালতীর স্বামীই এ কথা বলিলেন। তবে ?

নীলু পতিতার ছেলে ?—না—না—তা হোতে পারে না। এই ক্ষুদ্র নির্ম্মল অকলঙ্ক শিশু—এ অশুচি নয়। নন্দনের পারিজাত সে ! নীলু মালতীরই ছেলে। তাকে বুক থেকে ছিঁড়ে দিতে গেলে—হৃৎপিণ্ডও ছিঁড়ে দিতে হবে।

"নীলু !—নীলু ! নীলকণ্ঠ ! বাবা আমার !........."

মালতীর মনে পড়িল—খোকার নাম নীলকণ্ঠ রাখিবার সময় তাহার স্বামী এই নামের আর একটা মানে বলিতে গিয়া থামিয়া গিয়াছিলেন। সমুদ্র মন্থনে যে বিষ উঠিয়াছে—সে তা আকণ্ঠ পান করিয়াছে ! নীলকণ্ঠের মতোই মাথা উঁচু করিয়া সে স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতালের দেবতা ও দানবদের দিকে চাহিয়া হাসিতেছে। নীলকণ্ঠ ?—হ্যাঁ—তাই ! নীলকণ্ঠকে স্বয়ং বুঝি আজ মালতী পুত্রস্নেহে বাঁধিয়াছে।

মালতী ভাবিল—এর জন্য ধর্ম্ম যায় যাক্। বিষয় সর্ব্বস্ব সমস্ত রসাতলে যাক্। সে আজ সব ভুলিতে পারে ! তবু নীলুকে বুকে করিয়া মরিবে।

মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করিয়া মালতী ভাবিল "সত্য হোক্। আজ আমার ছেলের এই নাম সত্য হোক। নীলু আমার নীলকণ্ঠেরই মতো হলাহলের সমস্ত জ্বালা যেন অবহেলায় সহিতে পারে।"

মালতী নীলুকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। নীলু কাঁদিতে কাঁদিতে আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

গোপাল মালতীকে বলিল "বৌদি আজ মরে গেছেন। তিনি এখন সকল নিন্দা প্রশংসার বাহিরে। তুমি তাঁর দিকে অত কুণ্ঠিত হয়ে চাইছ কেন ? তুমি আজও তাঁকে জানতে পার নি। তিনি এমন কোনো কাজ করেন নি যার জন্য ভগবানের কাছে তাঁকে কৈফিয়ত দিতে হবে। তাঁর জন্য তোমার বা অপর কারও লজ্জিত হবার দরকার নেই। তুমি এটা স্থির বিশ্বাস কোর। তাঁর দেওয়া দান কলঙ্কের ফুল নয় ! সে আমাদের মাথার মাণিক। ভগবানের আশীর্ব্বাদের মাঝে তার জন্ম।"

গোপাল মালতীকে সুলতার ইতিহাস এক এক করিয়া সমস্ত বলিল।

মালতীর দুঃখের আর সীমা রহিল না। সে রুদ্ধস্বরে বলিল "আমি তোমাকে সন্দেহ করেছিলুম বোন—কিন্তু আমি তো সত্য জানতুম না ! জগতের লোক সবাই এমনি সত্য সন্ধান না করে বিচার করতে চায়। তাই ভুল করে। তুমি শুধু লাঞ্ছনা পেয়েই গেলে। ভগবান কোরুন তাঁর চরণে গিয়ে শান্তি পাও।"

নীলু ঘুমাইয়া ছিল। কিছু শুনিল না। কিছু বুঝিল না। শিবের মতোই পৃথিবীর ঝড় বাতাস তুফান আগুন কিছুরই প্রতি দৃকপাত না করিয়া চক্ষু মুদিয়া সে যেনো কাহার ধ্যানে মগ্ন ছিল। জগতের কাছে সে মালতীর ছেলে বলিয়াই পরিচিত রহিল। অত সত্য অসত্য ধর্ম্ম অধর্ম্ম ন্যায় অন্যায় সমাজ জাতি কোনটারই দ্বন্দ্ব সে জানিল না !

সমাপ্ত।

ক্ষুদ্র

—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ক্ষুদ্র বলে' হতাশ হয়ে অলস হ'লে চল্‌বে না—
তোমার ব্যথায় কারুর হৃদয় অশ্রুধারায় গল্‌বে না !
ক্ষুদ্র সেজে যতই তুমি থাক্‌বে পড়ে আঁক্‌ড়ে ভূমি
ততই তোমায় দ'লে যাবে সবে—
মিথ্যা আশা, কাহার গরজ ? তুল্‌বে তোমায় কোন্ দরদী কবে ?

পরের উপর ভর ক'রে এ বাঁচার চেয়ে মরণ ভালো—
বাঁচ্‌বি ক'দিন ধার করে' তুই আঁধার ঘরে পরের আলো ?
জ্বাল্‌তে হবে নতুন বাতি গড়্‌তে হবে বুকের ছাতি
মুছ্‌তে হবে সকল অন্ধকার—
মুক্ত হাওয়ায় কফের বৃদ্ধি হবে যাহার করুক্ বন্ধ দ্বার !

ক্ষুদ্র তোরা চিরকালের, অন্তরঙ্গ সব জাঁতের—
গালির বালি উড়ায় যারা গালের চুমা দে' তাদের !
এখনো ঢের সময় আছে দেখ্ চেয়ে তোর আস্‌চে পাছে
কি জন-স্রোত জল স্রোতের মত—
ঐ আবর্ত্তে পড়ে তোরেও ফির্‌তে হবে অ-হত অ-ক্ষত !

ক্ষুদ্র কোথা ? রুদ্র তোরা। দাঁড়া দেখি কেবল আজ—
হোক্ দরিদ্র ছন্নছাড়া অন্নহারা বিশ্বমাঝ—
দারিদ্র্য সে মহৎ সজ্জা— এইটে ভোলাই গভীর লজ্জা !
কাতর প্রাণে এই যে প্রাণ ভিক্ষা—
আত্মহত্যা ইহারি নাম, বাঁচ্‌তে হ'লে চাই মরণে দীক্ষা !

ওরে চপল ক্ষুদ্র, কেবল হোস্‌নে নকল তত্ত্বজ্ঞানী—
ক্লীবের ধর্ম্ম চেয়েও যে তোর অধর্ম্মেরেই সত্য মানি !
আজ রে সাহস, নতুন্ সৃষ্টি, বিপুল শক্তি, নবীন দৃষ্টি,
নিজের মনই পথ দেখায়ে তোরে—
নিয়ে যাবে চিরন্তন সত্য শিব সুন্দরেরি দো'রে !

ক্ষুদ্র নবীন ঘৃণ্য তো নো'স্, নোস তো মৃত কিম্বা পতিত
বৃহতেরি পিতা তোরা, অনন্তেরি একটি অতিথ্ !
চলা-পথেই চল্‌তে হবে বলা-কথাই বল্‌বে সবে
নতুন্ চির-নবই থাকে যদি,
সৃষ্টি তবে মহা ভ্রান্তি, মিথ্যা তার এ ঘোরাই নিরবধি !

সন্ধ্যামণি

—শ্রীসুরেন ভট্টাচার্য্য

বনমালী ধরা পড়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম।

কিন্তু—

রতনদা ও বাসন্তীর তিরোধান ব্যাপারটি ভালোরকম বুঝতে পারি নি।

লোকে নানা রকম কথা বলে।

আমি তাঁদের দোষগুণের বিচার করতে চাই না। কেন না আমার সে অধিকার নেই। আমি তাঁদের ছোট ভাই। তাঁদের ভালবাসি। তাঁদের কাজের সমালোচনা করতে পারি কোন সাহসে?

মনটা খাঁখাঁ করে।

গ্রামে প্রকৃত কর্মী আর কেহ ছিল না। কাজেই সব অনুষ্ঠান কটি ধ্বংস পেতে বসল।

আমি আই-এ পড়তাম ভবানীপুরে। গ্রামের খবর পেতাম লোকের মুখে এবং মা বোনের চিঠিতে।

সমরদা ফিরে এসেছেন—জেল থেকে, খবর পেয়েই বাড়ী এলাম ছুটি নিয়ে।

দুবছর আগের সেই সমরদা—সত্যিই তো?

সন্দেহ হয়।

চেহারা মেলে নাকো মোটেই। এ যেন—কঙ্কাল! শুধু হাড় কখানাই অবশিষ্ট আছে!

আমায় কাছে ডেকে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—কিরে মিলন, চিনতে পাচ্ছিস্ তো?

বললাম—তোমায় জানি না! কাকে চিনব? তুমি কে?

সমরদা হেসে উঠলেন। কিন্তু সেটা রুদ্ধ বেদনারই রূপান্তর। হাসি নয়!

রতনদার কথা আগে থাকতেই শুনেছিলেন। তাঁদের কথা উঠলে তিনিও চুপ করে যান, দেখেছি। আমারও মন চায় না।

দিন কাটাবার নূতনধারা আবিষ্কার করতে চাই।

গ্রীষ্মের ছুটী পড়তে, সমরদার পুনরাগমন ব্যাপারটাকে অভিনন্দিত করবার জন্যে আমারা ভীষ্ম বইখানা অভিনয় করেছিলাম।

পূজার ছুটী এলে আবার যখন সকলে একত্র হলাম, একদিন নিয়মিত উৎসব করে স্থায়ী থিয়েটার পার্টি প্রতিষ্ঠা করা গেল।

সমরদার বাড়ীতেই রোজ বিকাল বেলা আড্ডা বসে। পাড়ার অনেকেই সেখানে মিলে আমোদ আহ্লাদ করি। এবারে চন্দ্রশেখর অভিনয় হবে স্থির হোয়ে ছিল।

অমৃতবসুর প্রকাশিত নাটকাকারে চন্দ্রশেখর একখানা কিনে দুদিন রিহার্সালের পর সমরদা বললেন—বই সকলের পড়া না থাকার জন্তে গণ্ডগোল বাধছে। একবার প্রত্যেকেই যদি আগে থাকতে পড়ে নেন অনেকটা সুবিধা হয়।

সেই একখানা বই-ই আমাদের দলের সকলকার হাতে হাতে ঘুরতে লাগল।

এ সময়ে সমরদার শরীরটা ভাল ছিল না মোটেই। পায়ের দু যায়গায় কেমন করে না জানি সাদা ঘা দেখা দিয়েছে। স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারতেন না।

সমরদা গ্রাহ্য করেন না। এবং আমাদের তাঁর সঙ্গ ছেড়ে সরে বসতেই বলতেন। আমরা সরে বসতাম সামান্ত দূরেই কিন্তু সঙ্গ ছাড়তাম না।

শুনেছিলাম জেলে থাকবার সময় কার ঐ দুরন্ত রোগ হয়েছিল, সমরদা তার সামান্ত একটু সেবা করতে গিয়েই নিজেও রোগ নিয়ে বসেছেন।

একদিন বাড়ীতে মায়ের সঙ্গে ঐ সব বিষয়ে আলোচনা করছি, হঠাৎ মা-ই কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললেন—হাঁরে, মিলন, আজ সকালে হঠাৎ কানাই এসে গালিগালাজ

করে গেল, তুই কাদের চাঁদোয়া নিয়ে এসেছিলি গত জ্যৈষ্ঠ মাসের থিয়েটার করবার সময়— ?

—কানাই বলছিল ? কই আমি তো কারও জিনিষ আনি নি ? তবে, সমরদা একদিন বলেছিলেন একটা যোগাড় করবার কথা—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দরকারও হয় নি, আমরা চাইও নি কারও কাছে—

বিনা দোষে অপবাদ দিয়ে যাওয়াতে কানাই-এর ওপর রাগ হোয়েছিল খুব। সেদিন বিকালে আবার সমরদার বাড়ীতেও রেসিটেসন করবার সময়ে সবার সামনেই সে আমাকে চোর এবং জোচ্চর বলে গাল দিতে এসেছিল। সমরদা সে সময়টা বাজারে গিয়েছিলেন। কানাইএর সঙ্গে সমরদাদের কি একটা কুটুম্বিতা আছে সেই খাতিরে সে এসেছিল সমরদার ভ্রাতুষ্পুত্র সুরঞ্জনকে সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ করে নিজেদের বাড়ী নিয়ে যেতে, কিন্তু আমাদের সেখানে দেখে আপনার উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে মিথ্যে চাঁদোয়ার দাবী দিয়ে পায়ে পা তুলে ঝগড়া বাধাতে চাইল। বাংলা ভাষায় গালাগাল দেবার মত' শব্দের দৈন্য বুঝে অবশেষে সে ইংরাজীর প্রশ্রয় নিয়েছিল কিন্তু ইংরাজীতে যা বলছিল তার বারো আনাই ব্যাকরণের মতে অশুদ্ধ। আমি হেসে সেই কথাটার দিকে কটাক্ষ করে বললাম—এখানে অন্ততঃ মেয়েদের শুনিয়ে লোক হাসিও না। সুরঞ্জনের স্ত্রীও তোমার চেয়ে ভাল ইংরাজী জানে, অতএব যা বলবার আমাকে অন্যসময় আড়ালে বোলো—যেখানে ইংরাজী জানে এমন আর কেউ উপস্থিত থাকবে না।

এই কথাতে কানাই অগ্নিশর্ম্মা হোয়ে উঠ্‌ল, এবং যে কাজে এসেছিল সুরঞ্জনদের নিয়ে যেতে, সেইটাই ভুলে গিয়ে রাগে গজ্‌ গজ্‌ করতে করতে ফিরে চলল।

আমি তাকে বললাম—ফিরে যাবার দরকার নেই তোমার। তোমার অভদ্রতার জন্য অন্ততঃ এ বাড়ীর ভেতর যতক্ষণ আছ কেউ তোমার গায়ে হাত তুলবে না—বিশেষ তুমি যখন সমরদার কুটুম্বলোক আমার সঙ্গে তোমার যা কিছু বোঝাপড়া করতে হবে অন্য কোন সময়ে এবং স্থানে করলেই চলবে।

সেদিনকার মত ব্যাপারটার সেইখানেই যবনিকা পড়েছিল।

আমি মনে ভেবে দেখলাম কানাইদের সঙ্গে কোন অনিষ্টতাই কখনো করি নি। হঠাৎ সে আমার ওপর বিশেষ ক'রে এরকম ক্ষেপে উঠ্‌ল কেন ?

আমাদের সকলকার সঙ্গে একদল লোকের বনিবনাও ছিল না। বনমালীর আদর্শে এরা গ্রামের ভেতর আগাছার মত' বেড়ে উঠ্‌ছিল। এতোদিন প্রকাশ্যে তারা কেহ আমাদের শত্রুতা আচরণ করেনি। হয়তো কানাই এসে-ছিলো যুদ্ধ ঘোষণা করবার জন্যেই।

হোতেও পারে !

কিন্তু আমরাও কারও বিরক্তি বা শত্রুতাকে ভয় করতাম না !

কানাইএর ভয় প্রদর্শনকে গ্রাহ্য না করে মন থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছিলাম। পরের দিন সমরদার কাছে ফের গিয়েছি। সমরদাও কানাইএর কথা শুনে খুব নিন্দা করলেন আমাকে, বললেন ও সব নোংরা লোকের নোংরামির কথায় কিছু মনে না করাই ভাল।

অন্য কথাবার্ত্তার মাঝখানে আমি জিজ্ঞাসা করলাম। চন্দ্রশেখর বইখানা আমি নিজেই এখনো পড়তে পেলাম না। সেটা আছে কার কাছে ?

সমরদা বল্লেন—সুরঞ্জন হয়তো জানে, দাঁড়াও জিজ্ঞেস করে দেখছি।

সুরঞ্জন বল্লে—আমার এক বন্ধু হেমেন, নিয়ে গেছে !

তার পরদিন আমি দুপুরবেলা হেমেনের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

হেমেন বললে—তুমি কাল এসেছিলে শুনেছি, কিন্তু বইখানা আনিয়ে রাখতে পারি নি। মামার বাড়ীতে রয়েছে। বেশী দূর হবেনা—ঐ তেমাথাটার কাছে! জানতো ? চল না আমার সঙ্গে—

হেমেন ও আমি নৌকা বেয়ে চললাম। সঙ্গে হেমেনদের এক চাকর গিয়েছিল, নৌকাটা ফিরিয়ে নিয়ে আসতে। তখন তাদের দরকারী কাজ ছিল। আমরা হেমেনের মামার বাড়ীতে পৌছে তাকে বিদায় দিয়ে বললাম—দেরী কোর' না যেন, সন্ধ্যে ছটা সাতটার মধ্যেই আসা চাই-ই আমরা বেশীক্ষণ থাকতে পারব না এখানে—

হেমেন তার মামাতোভাই সিধুদার নাম করে ডাক দিতে তিনি বেরিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করে ঘরের ভিতরে নিয়ে গেলেন।

হেমেন আমাকে বললে,—এস না তুমি, তোমার লজ্জা করবার কিছু নেই। এবাড়ীতে আমিও যেমন তুমিও তেমনি। এঁরা গাঁয়ে নতুন এসেছেন, বরাবরই বাইরে বাইরে কাটিয়ে এসেছেন, তোমার সঙ্গে গীতার পরিচয় করে দিই চল।

গীতা হেমেনের মামাতো বোন। এমনই অদৃষ্ট, বিয়ে হবার মাস দুই পরেই বাঁ পায়ে পক্ষাঘাতের মত হয়েছে, চলা ফেরা করতে পারেন না। ষ্ট্রেচারে কোরে তাকে নিয়ে আসতে হয়েছে। আমাদের গাঁয়ে একজন অত্যন্ত প্রসিদ্ধ কবিরাজ ছিলেন, তিনিই চিকিৎসা করছেন।

গীতার ঘরে গিয়ে দেখা করলাম।

হেমেন বললে,—মিলনের নাম শোন নি ?—

গীতা বললে—শুনেছি বই কি? আপনারই নাম মিলন বাবু? আসুন, আমার কাছে। হেমেনদার বন্ধু আপনি, আপনাকেও দাদা বলে ভাবি, আপনি আমাকে সঙ্কোচ করবেন না।

আমি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম।

বললাম—আপনার অসুখ কি কমছে না মোটেই? বড় কষ্টতো!

গীতা বললে—হঠাৎ কেন যে এরকম হোল বুঝতে পারছি না। একেবারেই অথর্ব্ব কোরে ফেলেছে।...আপনি চন্দ্রশেখর বইখানা নিতে এসেছেন? কিন্তু ওটা যে আমার এখনো পড়া হয়নি।—

আমি বললাম—তাতে আর কি হয়েছে, শেষ করুন তারপর দিলেই চলবে।

গীতা বললে—আমার নিজেরও কিন্তু একলা বসে পড়তে ভাল লাগে না। দয়া করে একটু পড়ুন না কাছে বসে,—অতদূর থেকে নয়,—আমার বিছানারই এই ধারটীতে এসে বসুন। কিছু মনে করবেন না আপনি,—একলাটী কদিন ধরে এরকম চুপ করে বসে থাকতে বড় বিরক্তি লাগে। আপনারা এসেছেন,—তাই আজকের সন্ধ্যেটী এমন ভাল লাগছে—

সামান্য আধ ঘণ্টার পরিচয়ে সম্পূর্ণ সঙ্কোচ দূর করে আমাকে এতখানি আপনার বলে ভাবতে দেখে আনন্দিত হয়েছিলাম খুব।

কাল থেকে কানাইএর ব্যবহারে মনের মধ্যে যে অশান্তি এসেছিল সব ভুলে গেলাম। হেমেন ও গীতার সঙ্গে গল্প গুজব করতে করতে অনেকখানি রাত হোয়ে গেল।

তখন খেয়াল হোল—হেমেনদের চাকর নৌকা নিয়ে আসেনি। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম—ঘন ঘটাচ্ছন্ন, দুর্য্যোগ।

গীতা বললে—ভাবছেন কেন? না হয় রাতটা থেকেই যান।

গীতার মাও সে কথায় সমর্থন করে বললেন—এই দুর্য্যোগে এতখানি পথ ফিরবে কি করে? তার চেয়ে থেকেই যাও তোমরা।

পরের বাড়ীতে রাত্রি যাপন করার চিন্তাটা পছন্দ করি নি। তবু অন্য উপায় ছিল না বলে থাকতে হোল সেদিন।

গীতা মেয়েটীকে একদিনের পরিচয়েই আমার এতো ভাল লাগল যে তার কাছে স্বীকার করে ফেললাম, আমি যখনই সময় পাব তাদের বাড়ী গিয়ে তার সঙ্গে গল্পগুজব করব।

মন আমার চিরকালই ভালবাসার কাঙাল। যেখানে যাকে ভাল লাগে তাকেই নিবিড় করে ভালবাসার বাঁধনে বেঁধে আপন করে নিতে চাই। কতলোককে ভালো বাসতে গিয়ে ঠকেছি—তবু বাংলার মাটীর অণুপরমাণুটীকেও আমি ভালবাসি। সমরদার আদর্শে আমার নিজের মনকেও তেমনি করে লুটিয়ে দিতে চাই বাংলার মা বোন ভাই এদের মাঝখানে।

তাহলেও সমরদার মতো দেবতা আমার মাঝে নেই, যে নিষ্কাম হয়ে ভালবেসে যাব জগতের প্রতি প্রাণীটীকে। আমি মানুষ। বনমালী এবং কানাইয়ের হীনতাকে অগ্রাহ্য করতে চাইলেও অস্বীকার করতে পারি না। এবং মানুষের মধ্যে যাকে ভালবাসি প্রতিদানেও ভালবাসা পেতে চাই। যেখানে পাই না, বুকভরা অভিমান নিয়ে ফিরে আসি।

গীতার প্রাণের প্রীতি যাচাই করে দেবার কথা মনে জাগতেই পারে না। কাচের মতই স্বচ্ছ তার অন্তঃকরণের স্বরূপটী সম্পূর্ণরূপে দেখতে পেয়েছিলাম।

বাড়ীতে এসে মায়ের কাছে শুনলাম সেই কানাইদেরই কে একজন অপবাদ রটিয়ে বেড়াচ্ছে—আমি গীতাদের বাড়ীতে অসচ্ছন্দেশ্যে রাত্রিযাপন করেছি এবং তাদের হাতের অন্নগ্রহণও করেছি।

গীতারা বৈদ্য, এবং আমরা ব্রাহ্মণ। আমার যদিও তাদের বাড়ী ভাত খেতে জাতীয়তার বাধার দিকথেকে আপত্তি কিছুই নেই, তবু সে রাত্রের ভাত খাওয়ার অপবাদটা একেবারেই যে মিথ্যা সেকথা মাকে বললাম। খাওয়া খায়ির ব্যাপারে হিন্দুয়ানীর সঙ্কীর্ণতা আমি পছন্দ করতাম না, তবু দেশে থেকে নিজের মনের স্বাধীনতার পরিচয় জাহির করতে গিয়ে মায়ের মনেও আঘাত দিতে ইচ্ছা ছিল না।

কানাই-রা সেইখানেই ক্ষান্ত হয় নি।

গীতার সম্বন্ধে আমাদের দেশে অনেক রকম জনরব প্রচার হয়েছিল। সর্ব্বাংশে না হলেও এ সবের অনেকটাই সত্য ছিল। গীতার মত সুন্দরী, নম্র, মেয়ে ওঅঞ্চলে আর কেহ ছিল না। গীতা এস্‌রাজ বাজাতে এবং গান গাইতে বিশেষ পটু। এবং সে স্কুলে না পড়েও ম্যাট্রিকুলেশন পাশ দিয়েছিল।

আমার সঙ্গে গীতার ঘনিষ্ঠতা একটু একটু করে যখন বেড়ে উঠ্‌ছিল, কানাইদের সবারই চোখ টাটাত। তারা ব্রহ্মাস্ত্র ছুঁড়তে আরম্ভ করল। গীতাদের রান্না ঘরে, আমার নামে স্বাক্ষর করে নানা রকম কুৎসিত চিঠি লিখে লুকিয়ে ফেলে রেখে আসত। ও প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে আমাদের সম্বন্ধে দুর্নাম বাড়াবার কোন পথই বাকী রাখে নি।

একদিন শুনলাম আদত যে চাঁদোয়ার ব্যাপার নিয়ে আমার সঙ্গে তাদের শত্রুতা আরম্ভ হোয়েছে সেটা পাওয়া গেছে তাদেরই প্রতিবেশী আর এক ভদ্রলোকের বাড়ী। তিনি যে তাঁর মেয়ের বিয়ের সময় কানাইদের বাড়ী থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন কি জানি কেন ফেরত দেবার কথাটা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন।

এই ঘটনার পর কানাইএর আসা উচিত ছিল আমার কাছে ক্ষমা চাইবার জন্য। কিন্তু সে পাত্রই তো সে নয়! আমাকে ভুল করে চাঁদোয়া চুরি করেছি বলে অপবাদ দিয়েছিল, আজ সেটা অন্য যায়গা থেকে পাওয়া গেল, তবু সে আমার বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণ করতে ভুললো না।

আমি তাকে গ্রাহ্য করি না দেখাবার জন্য গীতার বাড়ী নিয়মিত ভাবেই যেতাম।

গীতা তার নামে লেখা কানাইয়ের নোংরা চিঠিগুলা আমাকে দেখিয়ে হাসত—বলত—ওরা এত' নির্ব্বোধ, মনে করে' এই চিঠি দিয়েই তোমার আমার মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলবে। তুমি যে নীচ হতে পার না তার অনেক প্রমাণ পেয়েছি। সুতরাং আমি তোমাকে ভয় করি না এক তিলও।

কানাই লোকটার সম্বন্ধে গোটা দুই কথা এখানে বলে রাখা দরকার।

বার কয়েক মোক্তারি ফেল করে সে মফঃস্বলের কোনও উকিলের মুহুরীর কাজ করে। ঘুষ খেয়ে লোক ঠকিয়ে দুপয়সা রোজগারও মন্দ নয়।

তার আর একটা মস্ত গুণ—প্রায়ই নদীথেকে মস্ত মস্ত কচ্ছপ ধরে আনে। চেহারা কালো গাঁট্টাগোঁট্টা। সারা-দিন পরচর্চ্চা করে কাটায়। দুবার বিয়ে করেছে দুটী বিবাহের পণ হিসাবে লাভ করেওছে বেশ। প্রমাণ হিসাবে অল্প দিনের মধ্যেই খড়ের ঘরের পরিবর্ত্তে টিনের নতুন দুমহল বাড়ী খাড়া হয়ে উঠ্‌ল। এবং দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীটীও তার পরমা সুন্দরী, যে দেখেছে কেহই নিন্দা করবেনা। তবু কয়লার মত লোকটার মনের ময়লা ফরসা হোল না মোটেই বাস্তু ঘুঘুর মত কেবল পরের অনিষ্ট করবার জন্য ফন্দী আঁটছে কখন কার সর্ব্বনাশ করবে সেই চিন্তাই তার একমাত্র মোক্ষ কামনা এবং হয়তো পরমার্থ।

আমাদের নৌকাগুলি রাতের বেলায় যে ঘাটে বাঁধা থাকত সন্ধান করে লুকিয়ে কচুরি পানার নীচে ডুবিয়ে রেখে ও আরও অনেক উপায়ে কানাই এখনো আমাদের শত্রুতা চরণ করে।

ক্রমশঃই দিন দিন তাদের ব্যবহার অসহ্য হয়ে পড়ছে।

তবু ভাবি—দেশের মধ্যে থাকিতো শুধু এই তিনটে মাস। এর জন্যে ওদের অপরাধের গুরুতর কোনও শাস্তি বিধান নাই বা করলাম।

একদিন ওরা আপনারাই যখন নিজেদের হীনতা বুঝতে পারবে এরকম দুষ্প্রবৃত্তি আপনা হতেই ছেড়ে দেবে।

কাজেই ওদের পাগলামির কথা ভেবে আর চঞ্চল হই না।

সুখে দুঃখে বেদনায় আনন্দে মন যখন পরিপুর্ণ, এতটুকু ফাঁক কিম্বা অভাব নেই, দুনিয়ার কোন দেনার হিসাব রাখি না, আমার জগৎ বলতে গেলে জানি আমার জন্মভূমির সামান্য পরিসরটুকু, জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলতে বুঝি আমার এই দেশেরই অধিবাসিদের দৈনন্দিন জীবনধারার মাঝখানে নিজেকেও উদ্দেশহীন হয়ে অবাধ স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া, হঠাৎ একদিন ভূমিকম্পের মতো কে যেন আমায় নাড়া দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে বললে, ছুটি ফুরিয়ে গিয়েছে!

চমকে চেয়ে দেখ্‌লাম পৃথিবীটা মাতালের মতন টলছে, ওদের সঙ্গে আমিও। একটা দিনের মধ্যে আর্দ্ধেক গ্রামের লোক যেনো কোথায় লুকিয়ে পড়ল। চারিদিকেই ভাঙনের বান ডেকেছে। তাসের বাড়ী দমকা হাওয়ার আঘাতে যেমন ভেঙে পড়ে যায় এক নিমেষে—! উৎসব শেষ হয়ে গেলে তাঁবুটাকে যখন ভাঙতে আসে, ঝরে পড়া গন্ধহীন ফুলের অশ্রুবেদনা আমি সইতে পারি না। আজও পারলাম না।

আমিও পালিয়ে এলাম।

সমরদা রইলেন,—আর রইলেন আমাদের সবার মা বোন এবং মেয়েদের মত'ই যে সব পুরুষের আজ কোনও রকমে বেঁচে থাকার মাপ কাঠির বাইরে কোনও অধিকার অথবা আবশ্যকতা নেই।

বড়দিনের দশ দিন, পুজার একমাস এবং গ্রীষ্মের দেড় মাস এই মোট মাট পঁচাশি দিনের আড়ালে বাকী দিন গুলা তাঁদের কেমন করে কাটে ধারণা করতে পারি না। আমরা বাইরে চলে আসি এবং যে যার কর্মক্ষেত্রে নতুন রুটিন তৈরী করে নিই। বাড়ী থেকে দুদিন চারদিন ছদিন অন্তর চিঠি আসে—ওদের ভাষার মধ্যে না আছে নতুনত্ব, না আছে রঙের ছাপ। মামুসি, তুমি কেমন আছ, এখানে ম্যালেরিয়া কালাজ্বর কলেরা বসন্তের মড়ক জেগেছে, আজ মায়ের অসুখ, কাল ছেলের পিলে লিভার, খেতে পাচ্ছিনা টাকা ফুরিয়ে গিয়েছে, ব্যস্ ঐ পর্য্যন্ত। অভিধানে যেন আর শব্দ থাকতে নেই! আমাদের মেসের বিশু সাধারণ বাঙালীর ঘরের বউএর চিঠির একটা স্যাম্পেল আমাকে দেখিয়ে সেদিন আপশোষ করে বলছিল—'কি লজ্জার কথা বলতো ভাই! হাতের লেখা বাঁকা, ত্রিভঙ্গ, ছাঁদও তেমনি। সাত লাইন চিঠি লিখতে সতের'টা বানান ভুল। প্রাণেশ্বর লিখতে হবে মানে বোঝে না উচ্চারণেও বাধে তিনবার কেটে দাঁড়ায় প্রাণের সর, বলিহারি, নমাস বাইরে থাকি তাই রক্ষে অসভ্য মুখ্যুদের দেশে সারা বছর থাকতে হলেই হয়েছিলো আর কি—'

দেশের এটা একটা ছবি স্বীকার করি তবু এর অর্থ বুঝতেও ধাঁধাঁ লাগে না।—একটা ছেলে গুরুমশাইএর কাছে হাতের লেখা খারাপ বলে বকুনি খেয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলো, যতদিন পর্য্যন্ত না মা সরস্বতীর কৃপায় হাতের লেখা ভাল হবে ততদিন আর দোয়াত কলম ছোঁব না। মানে একই।

নিজের বাড়ীর মেয়েদের চিঠি লিখতে পারার বেশী লেখাপড়া শেখার দাম যারা দেয় না তারাই প্রত্যাশা করে ঐ চিঠির মধ্যে কাব্যের সকল রস এবং ছন্দ ফুটে উঠ্‌বে!

আমার মা এবং বোনের চিঠি পেয়ে এতদিন এমনি অভাব বা আকাঙ্ক্ষার ইচ্ছা কখনো জাগে নি। একদিনও মনে হয় নি তাঁদের হাতের লেখা খারাপ, কিম্বা বানান ভুল। তাঁদের কাছ থেকে যেমন চিঠি আশা করি ওর মধ্যে কাব্যের রস অথবা ছন্দের গন্ধ খুঁজতে চাওয়াটা বাতুলতা ছাড়া আর কিছু ভাবি না। কিন্তু গীতার কাছ থেকে যে চিঠিখানি পেলাম, মনে হ'ল, আমার জীবনের পরিপূর্ণতার মাঝে একটা জায়গা এতদিন খালিই ছিল, যদিও জানতে পারি নি। অভাব বোঝবার আগেই মাণিকের সন্ধান পেলাম।

গীতার প্রথম চিঠি আমি সন্তর্পণে লুকিয়ে রেখে দিলাম।

পৃথিবীর সমস্ত কাব্যের সার ঐ চিঠিখানির প্রতি ছত্রে রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছিল। চিঠির মধ্য দিয়ে মানুষের প্রাণটাকেও এম্‌নি করে দেখতে পাওয়া যায়, আগে জানতাম না।

গীতা লিখেছে—আমি তোমায় ভালবাসি, প্রাণমন দিয়ে ভালবাসি। এবারে শারদা মায়ের আশীর্ব্বাদের মূর্ত্তি নিয়ে তুমি দেখা দিয়েছ। তোমাকে মানুষ বলে ভাবতে পারি না, কুণ্ঠা জাগে, অথচ দেবতাও বলতে পারি না। তাতে মনে হয় আমার নাগালের বাইরে চলে যাও। হেমেনদার মত' তুমিও আমার ভাই, কিন্তু ভাইয়ের চেয়েও আপন বলে ভাবতে চাই। তুমি আমার অন্তর হতেও আপনার।.........

লুকিয়ে রাখি আবার কেউ যখন বাড়ী থাকে না বার করে এনে পড়ি। একদিন বিশু হঠাৎ এসে দেখতে পেয়ে বললে—কার চিঠিরে এত নিবিষ্ট হয়ে পড়ছিস্?

আমি কিছু বলবার আগেই আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বিশু চিঠিখানা পড়ে ফেললে।

রেগে অস্থির হয়ে বলাম—এ কি রকম তোমার ছেলে মানুষী?

বিশু বললে—এতে আর দোষ কি হয়েছে রে? আমারও হলে তার চিঠি তোকে পড়তে দেবো দেখিস্,কিন্তু কে বলতো মেয়েটা? তোরই would be তো? হাতের লেখাটা ভাই First class. B. A, M A, তে হার মেনে যায়! খাসা তোর choice. দেখতে কেমন?

সেদিন ছটো প্রচণ্ড ঘুষি বিশুর মাথায় মেরেছিলাম। সে ঘুরে পড়ে গিয়েছিল। খানিক স্তব্ধ থেকে গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে চলে যাচ্ছিল। আমার কিন্তু তাকে মেরেই পরক্ষণেই অনুতাপ জেগেছিল,—একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে। বিশুকে কাছে ডেকে এনে বললাম—মাথার ঠিক ছিল না ভাই, কিছু মনে করিস নি। গীতা পরস্ত্রী, এবং আমার বোন। তার নাম নিয়ে তোর মুখের ওরকম ঠাট্টা শুনে আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম।

বিশু বললে—পরস্ত্রী? কিন্তু এরকম চিঠি লিখেছে যে?

জিজ্ঞাসা করলাম—কেন, অন্যায় কিছু হয়েছে?

—এটা কি রকম রহস্য বুঝতে পারি না। আমরা ভাই মুখ্যু মানুষ। তোকে লিখছেন—অন্তর হতেও আপনার! তার ওপরে ভালবাসি—

—কেন ভাই, ভালবাসাটা কি পাপ? অথবা অনাচার?

—ভালবাসার ছটোর বেশী মানে আমরা জানি না। এক স্ত্রী যখন লেখে ভালবাসি—তার মানে ঠিক উল্‌টো। কেননা ওঁদের প্রত্যেক কথাটাই হেঁয়ালি। আর এক পরস্ত্রী যখন লেখে ভালবাসি—তার মানে সুস্পষ্ট এবং অকাট্য।

বিশুর কথার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে মনটা বিষিয়ে উঠ্‌ল। ছি, ছি, এ কি রকম সন্দেহ! গীতা আমাকে ভাইএর চেয়েও আপনার বলে ভালবাসে, আমিও তাকে তেমনি ভালবাসি, এর ভেতরে পাপ বা অন্যায় বা সন্দেহ কিছু থাকতে পারে জানতাম না। কানাই এবং অন্য যারা মিথ্যে উড়ো চিঠি লিখে আমাদের ভালবাসাকে ব্যঙ্গ করেছিল, তারা জানে না এবং তাদের ধারণার ভিত্তি নেই এই বলে সমস্ত ব্যাপারটাকে উপহাস করেছিলাম। আজ বিশুও আমার মুখের ওপর সেই কথা বলতে চায়। কিন্তু কেন? যে জিনিষটা আমাদের কাছে এতো সত্য এবং স্পষ্ট' তাকেই বাইরে থেকে লোকে বিকৃত করে ভাবে কেন! শুধু বোন ভেবে নয়, পরস্ত্রী ভেবে নয়,—সে আমার আপনার প্রিয় বলেই ভালবাসি। ভালবাসাটা কি অপরাধ?

সেদিন থেকে মনটা খারাপ হয়ে রইলো, সমস্যা মেটাতে পারি না। সমরদাকে শ্রদ্ধা করি এবং গীতাকে ভালবাসি, ছটোতে তফাৎ কই? সমরদাকে ভালবাসা যদি পাপ না হয় গীতাকে ভালবাসা পাপ হবে কেন?

আর কিছুই ভাল লাগে না। জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগছে।

বিশু হয়তো আমার ব্যাখ্যা শুনে সন্তুষ্ট নয়—মুখ টিপে হাসে। এক একবার ভাবি ওর মুখখানা থেঁতলে দিই,—আর না হাসতে পারে।

গীতার দ্বিতীয়চিঠি পেলাম। প্রথমে খুলতে চাই নি, হয়তো মানে বুঝতে পারব না!—প্রথমটায় যেমন বুঝি নি!

কৌতূহলের কাছে পরাস্ত হলাম। না খুলে উপায় ছিল না।

গীতা লিখেছে—"........মিলনদা', কুমারখালিতে যাব দুতিন দিনের মধ্যে। দাদা থাকবেন সেখানে, তাঁর কাছেই যাচ্ছি। এখানকার কবিরাজের ওষুধে তো কিছু হ'ল না। সমরদার শরীর ভাল নয়। অসুস্থ হোয়েও নিজের প্রতি কিছু মাত্র যত্ন নেবেন না, তা হলে আর কি করে সারবেন? রতনদা চলে যাবার পর যে বালিকা বিদ্যালয়টী বন্ধ হয়েছিল সমরদার আন্তরিক চেষ্টায় আবার পুনঃস্থাপিত হয়েছে। আমার ছোট বোনটীকে সেখানে ভর্ত্তী করে দিয়েছি। বাবা বাড়ী এসেছেন, আমাকে কুমারখালিতে রেখে এসে এখন কিছুদিন দেশেই থাকবেন। দেশের জমি জমা গুলি না দেখা শোনা করায় নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে,—এইটেই সবিশেষ কারণ, তা ছাড়া আজ পঁচিশ বছর বাইরে বাইরে কাটিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এসেছেন, এখান থেকে আর কোথাও যেতে চান না।........"

নিতান্ত ঘরোয়া সুখ দুঃখের কথা ছাড়া এবারে আর কিছু নয়। পড়ে,আমার সমস্ত দুর্ভাবনা দূর হোল সত্যি! কিন্তু একটু অভিমানও জাগল মনে। ভাবলাম, উত্তর দেবোনা।

আর্টষ্টুডিও থেকে লোক এসে আমার তিনখানি ফটো দিয়ে গেল।

ওকথাটা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। গীতা আসবার সময় বলে দিয়েছিল আমার একখানা ছবি যেন তাকে অতি অবশ্য পাঠিয়ে দিই। দুদিন আগে ফটো তুলিয়েছিলাম, আজ তার কপি' দিয়ে গেল।

বিশু সন্ধান পেয়েই একখানা কেড়ে নিয়ে গেল। একখানা মাকে পাঠালাম। তৃতীয় ছবিটার এককোণে নিজের নাম এবং ছবি তোলার তারিখ লিখে গীতাকে পাঠিয়ে দিলাম। কথা দিয়েছি যখন না দেওয়াটা হয়তো ভাল দেখায় না।

কিন্তু চিঠি লিখি নি সাত দিন, কুমারখালি পৌছে গীতা নূতন ঠিকানা জানিয়ে আমাকে লিখেছিল"......... তোমার ছবি redirect হয়ে এসেছে পেয়েছি। কিন্তু চিঠি দাওনি কেন? একটুখানি সংবাদ—ভাল আছ—এর জন্যে কত উদগ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করে থাকি তাতো বোঝ না তোমরা। কেমন করেই বা বুঝবে? তোমরা নিষ্ঠুর শিকারী,—বাঁশী শুনিয়ে আকর্ষণ কর' তারপরে বিষাক্ত শরে হৃদয় বিদ্ধ করে ছেড়ে দাও আমরা ছটফট্ করে মরি।—"

সেই ইঙ্গিত পুনর্ব্বার, নূতন করে এবং নূতনভাষায়।

আমার নিজেরই লজ্জা বোধ হচ্ছে। বিশু আমার মনে কি এক কালশাপের বিষ ঢুকয়ে দিয়েছে যার তেজে, সংস্পৃষ্ট সব জিনিষই পুড়ে খাক্ হয়ে যায়। নিতান্ত সোজা জিনিষটা বাঁকা মনে হচ্ছে এখন থেকে!

দুটোর একটা সত্যি। হয়--গীতা আজও সম্পূর্ণ বালিকা। সংসারের হীনতা বা পাপ কোন কিছুরই ছায়া তার মনে পড়েনি। কোন্ কথার দাম কতখানি এবং মানে বলতে কি বোঝায় জানে না। নিতান্ত সাদা কথাই বলতে চায়—

না হলে,—তার মত' ভীষণ কুটিল মেয়েমানুষ জগতে আর দেখি নি! শীকারী আমি নই, সে নিজে! এবং বাঁশীর সুরে ভুলিয়ে আচ্ছন্ন করে বিষ ছুঁড়ে মারবার ক্ষমতা শুধু তারই আছে!

প্রথম বার্ষিক পরীক্ষা সামনে, ব্যস্ত রয়েছি এই বলে চিঠির জবাব লিখলাম। মাত্র দুলাইনের বেশী নয়। পাঠারম্ভে অবশ্য 'সাবিত্রী সমান হও' বলে সম্বোধন করেছিলাম।......

তিন মাস পরে আবার তল্পীতল্পা বাঁধি,—

ছুটি পেলে ঘরমুখো বাঙালী ঘরের দিকেই ছুটি।—মনের ভেতর ভয় ভাবনা এবং আনন্দ—সমান ভাবেই জেগেছিল। হয়ত গিয়ে দেখব না জানি কার সুখের নীড় ভেঙে গিয়েছে চিরদিনের জন্য, কেউ এ জগতের দেনা মিটিয়ে চলে গিয়েছেন, কেউ রোগে ভুগছে, অস্থিচর্ম্ম সার হয়ে পড়েছে, কারও আবার জীবন নদীতে নূতন করে জোয়ার সুরু হয়েছে। কারও উৎসব কারও সর্ব্বনাশ।

বাড়ী ফিরে সবার প্রথমে মাকে প্রণাম করি। তার পরই বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়াই। সবার সঙ্গে দেখা করতে যাই,—সমরদা, সুশীল, হেমেন, হরপ্রসাদ, অমূল্য। গীতার বাবার সঙ্গে দেখা করলাম। গীতারও আসবার কথা আছে দুচারদিনের মধ্যে। কুমারখালিতে ডাক্তারের চিকিৎসায়

তার অসুখ আরাম হয়েছে। এখন সে বেশ ভাল হোয়েই চলতে ফিরতে পারে। গীতার স্বামী নিখিলও আসছে সঙ্গে। গত পনের দিন থেকে গীতা তার শ্বশুর বাড়ী 'দেউলে'তে রয়েছে।

নিখিলকে আমি চিনতাম না। শুনেছি বড় ঘরের ছেলে, শিক্ষিত, টাকা পয়সা মন্দ নেই, তেজারতি করে কাটায়।

গীতা এবং নিখিলের কেমন বনিবনাও হয়েছে, দুজনে পরস্পরকে প্রীতির চোখে দেখে কি না, এ সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতুহল ছিল।

রতনদা কিম্বা বাসন্তীর আজও কোন খবর নেই।

সরকার থেকে কচুরিপানা ধ্বংস করবার জন্ম নানা জায়গায় কমিটি বসছে। বড় বড় মহারথীরা মস্ত মস্ত রিপোর্ট দিচ্ছেন। কমিটির পেছনে যে টাকা খরচ হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে কাজে নেমে কচুরি খাল থেকে তুলে ফেলবার কোনও সত্যিকার বন্দোবস্ত অনুসারে চললে এতদিনে মৃত নদী গুলা আবার বেঁচে উঠ্‌তো।

রিপোর্ট শেষ করতেই কত বছর কাটবে, তারপর কাজ আরম্ভ করতে দেখা যাবে টাকা ফুরিয়ে গিয়েছে! মরণ আমাদের ধ্রুব এবং অবশ্যম্ভাবী।

সমরদার সঙ্গে পরামর্শ করছিলাম, দেশের লোকের মনে প্রবুদ্ধতা জাগান যায় কি না, যে, সরকারের মুখের দিকে চেয়ে আপনারা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে না নিজেদেরও লাগতে হবে। নিজেদের দেশের কাজ নিজেদের হাতেই তুলে নিতে হবে।

বালিকা বিদ্যালয়টী পরিদর্শন করলাম। বেশ সুশৃঙ্খলে কাজ চলেছে। সমরদা এবং বিশুর সঙ্গে মিলে উদ্যোগ করে দিন দশ পনের মধ্যে একটা পারিতোষিক উৎসবের যোগাড় করে ফেললাম। মেয়েদের মধ্যে বেশ একটু উৎসাহ জেগে উঠ্‌ল।

আর একটা ব্যাপারে মেতেছিলাম। দেশের ছেলেরা মিলে হাতে লিখে বস্তু নামে একটী মাসিক পত্র প্রকাশ করলাম সেই বৈশাখ থেকে। কিছু টাকা যোগাড় করতে পারলে ওটাকে ছাপাবার ইচ্ছাও ছিল।

গীতা বাড়ী এসে একথা শুনে খুব আনন্দিত হয়েছিল। সেও আমাদের সঙ্গে গল্প এবং কবিতা লিখে বস্তুতে প্রকাশ করবার ইচ্ছা জানাল। আমরা তাকে রীতিমত উৎসাহ দিলাম। সমরদা গল্প কিম্বা কবিতার ধার ধারতেন না। তিনি লিখতেন স্বদেশী প্রবন্ধ। তাঁর ভাষার মধ্যে গাম্ভীর্য্য ছিল, উদ্দীপনা ছিল। তাঁর প্রত্যেক কথাটী আমাদের মাতিয়ে তুলত। আমি শুধু গল্পই লিখতাম। মানুষের মনের ভাষা নিয়ে আমার কারবার। গীতা ছবি আঁকে দেশের প্রকৃতির—শস্যশ্যামলা জননীর প্রতিমা গড়ে—নানারূপে নানা মূর্ত্তিতে।

মেয়ে স্কুলের পুরস্কার বিতরণের দিন সকাল থেকে ভীষণ দুর্য্যোগ।

যেমন জল, তেমনি ঝড়। বিকাল বেলাটায় একটু ধরণ করেছিল।

বিশু ও আর দু'একজনে ছাতা নিয়ে বাড়ী থেকে মেয়েদের ডেকে নিয়ে এল। দুর্য্যোগ বলে দিনটা পেছিয়ে দেবার কথা কেহ কেহ বলছিলেন। কিন্তু তাতে লোকসান বিস্তর। এই জন্যেই যেমন করে হোক উৎসবটী ঐদিনে সফল করতে কৃতসংকল্প হলাম।

খালি পায়ে কাদা ভেঙে আসার দরুণ—মেয়েদের পায়ের কাদায় বিদ্যালয় গৃহটীর মেঝেতে বিছানো শতরঞ্চি ইত্যাদি নোংরা হতে ছিল দেখে আমি তাদের ঘরে ঢোকবার আগে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে জল ঢেলে দিতে লাগলাম, তারা পা ধুয়ে এবং মুছে ভেতরে ঢুকতে লাগল।

দুর্য্যোগের দিন হোলে কি হবে—নানা জাতের—এমন কি শূদ্র ও মুসলমানের মেয়েদের পা ধুতে জল ঢেলে দিয়েছি—ইহার অগৌরব ও কলঙ্ক কানাই প্রমুখ লোকগুলির কল্যাণে চারিদিকে রাষ্ট্র হতে লাগল।

কিন্তু আমরা তা গ্রাহ্য করি নি!

ও দিনকার আর একটী উল্লেখ যোগ্য ঘটনা—

বিশু মস্ত রেসিটেশন পণ্ডিত! তাঁর শিক্ষায় অনেকগুলি মেয়ে নাটকের দৃশ্য এবং কাব্য অপূর্ব্ব আবৃত্তি করেছিল। শুধু তাই নয়—

"—ভাবিতেছে নিশ্বাস ফেলিয়া, আমি তো ওদের কেহ নই……"

—বলতে গিয়ে একটী মেয়ে শিশির ভাদুরী ঢঙে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস যা ফেলেছিল—চমৎকার !

আমাদের গ্রামটী বৈদ্য প্রধান।

বৈদ্য এবং ব্রাহ্মণের ভেদাভেদের মামলা আজও মেটেনি। বৈদ্যেরা বলেন,—আমরা ব্রাহ্মণ হতে চাই। পুরাণ শাস্ত্র ঘেঁটে তাঁরা প্রমাণ বার করেন—দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ। কেউ যদি বলতে চায় ও কথাটায় বৈদ্য মানে বৈদ্য জাতটাকে নির্দ্দেশ করে বোঝাচ্ছে না, বৈদ্য মানে বেদজ্ঞ, অমনি লাঠালাঠি বাঁধে। এই নিয়ে কত তর্ক কত ঝগড়া, আমার কাছে সমস্তই নিরর্থক বলে মনে হয়। বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণাশ্রমের শ্রেণীবন্ধনের কোনও মানে পাওয়া যায় না। ওটা যে যুগের উপযোগী ছিল আজ তার সার্থকতা নেই। ব্রাহ্মণ তার ব্রাহ্মণত্বের দাবী দিয়ে বৈদ্য বা অপর কোনও জাতের চেয়ে বেশী অধিকার কিছুই পায় না। এখানকার জগতে উপবীতের কোন মূল্য নেই। ওটা শুধু লুপ্ত সংস্কারের কঙ্কাল।

গীতা আমার সঙ্গে তর্ক করে,—ব্রাহ্মণের চেয়ে ছোট নই আমরা জ্ঞানে, কর্ম্মে কিংবা দেবতার প্রতি ভক্তিতে। তবে আমরা ব্রাহ্মণ হব না কেন ?

আমি বলি—তোমরা যতদিন বলবে ব্রাহ্মণ হতে চাও—ব্রাহ্মণ হতে পারবে না। কিন্তু যেদিন বলবে তোমরা ব্রাহ্মণ সেইদিন থেকেই ব্রাহ্মণত্বের অধিকারও পাবে—যদিও সামাজিক মাপ কাঠিতে ব্রাহ্মণত্বের অধিকার বলতে কিছুই বোঝায় না। যে কোনও জাত যখনই বলতে পারবে, তারা ছোট নয় কারও চেয়ে, তাদের আর কেহই বাধা দিয়ে ছোট করে রাখতে পারবে না। কিন্তু যদি কেউ বলে আমরা ছোট থাকব না বড় হতে চাই—তাদের স্পর্দ্ধার সীমা নেই।

—তবে আমরাও ব্রাহ্মণ ? তোমরা স্বীকার করবে তো ?

—আমাদের স্বীকার করা না করায় কি যায় আসে ? নিজের বুকে হাত দিয়ে বল আমরা ব্রহ্মকে জানি, উপলব্ধি করেছি মনের মাঝখানে!—চাঁড়ালের অধম হলেও একথা যে বলতে পারবে আমি তাকে নমস্কার করি! তাই বলে লোকাচারগত যে ব্রাহ্মণত্বের দাবী তোমরা চাইছ,—ওর মানেই হয় না!

—আমার সঙ্গে তোমার প্রথম যেদিন দেখা, তুমি আমাদের বাড়ী ভাত খেয়েছিলে বলে মিথ্যা গুজব রাটিয়েছিল মন্দ লোকে,—লোকাচারের যদি দাম নাই ধর—সত্যি হলেও এর ভেতরে তোমার কোন মান অপমানের কথা উঠতে পারে না বলেই জানব!

—আমিও তা অস্বীকার করি না!

—আজ তুমি আমাদের বাড়ীতে খেতে পারবে ?

—তুমি শ্রদ্ধার সহিত দাও যদি কেন তা গ্রহণ করব না ?

—আমার বড় সাধ হয় তোমাকে এবং সমরদাকে এক-দিন নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াই। কাল আসতে পারবে ?

—আসব!

—এবং কাল খাওয়া দাওয়া সেরে একটু বিকেলের দিকে সাত আট মাইল অন্ততঃ নৌকা করে বেড়িয়ে আসব সকলকে নিয়ে।

—বেশ তো, আপত্তি নেই।

কালকের অন্যান্য প্রোগ্রাম দুজনে মিলে ঠিক করা গেল। নিখিলের সঙ্গে আলাপ হোল। তাকে সঙ্গে নিয়ে সমরদাকে নিমন্ত্রণ করে এলাম। হেমেনকেও ডাকলাম।

রাতে মাকে বললাম—মা, তোমার ছেলের অন্তরের খবর তোমার অজানা নেই। তোমার আশীর্ব্বাদটুকুই আমার সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম। লোকাচারকে আমি দেবতা বলে মানি না, সংস্কারের মোহ আমার নেই। কিন্তু তোমার আদেশ আমার সব সংস্কারের চেয়ে বড়। তুমি যদি বারণ কর' যাব না।—তোমার অনুমতি শুনতে চাই।

মা সব শুনে ভেবে বললেন—তোর প্রাণে যখনি যে সমস্যা জাগবে, নিজের মনেই যাচাই করে নিবি, তাতে তোর অন্তরের দেবতাকে ক্ষুণ্ণ করে কি না, তা যদি না করে আমার কোনও আপত্তি নেই।

মায়ের মনের উদারতা আমি জানতাম। পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বললাম—তোমাকে জানি বলেই আমি আগে

থাকতে স্বীকার করে এসেছি। তোমার অনুমতি পেয়েছি যখন আর কারও বাধা মানি না।

কথাটা এমন বিশেষ করে ভাববার মানে হচ্ছে এই যে চিরকাল সহস্র রকম সংস্কারের বন্ধনে থেকে হঠাৎ যেদিন মুক্তি পেতে চাই, সঙ্কোচ জিনিষটাকে একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারি না তো।

গ্রামের মাঝ থেকে সমাজের প্রচলিত বিধান অগ্রাহ্য করা নিতান্ত সহজ নয়।

এক সঙ্গে চারজনে বসলাম। নিখিল, হেমেন, সমরদা এবং আমি। সেদিনকার গীতাকে দেখে মনে হয়েছিল, বাংলার মেয়েদের এইরূপটাই আসল।

সংসারে কল্যাণময়ী লক্ষ্মীর রূপ এই।

সমরদা অসুস্থ বেশী দূরে যেতে রাজী হলেন না।

হেমেনের বাড়ীতে কাজ ছিল, সেও সঙ্গে যেতে পারল না। গীতার মা বাবা এবং ছোট ভাই বোন গুলি একটী নৌকায় উঠলেন। আমি নিখিল এবং গীতা আর একটী নৌকায় উঠ্‌লাম। গীতার মা-এদের নৌকাটায় দুজন মাঝি ছিল। আমাদের নৌকাখানিতে কাকেও উঠ্‌তে দিই নি। নিখিল এবং আমি, দুজনে পাশাপাশি বসে, দাঁড় টানতে লাগলাম। গীতা হালের ধারে বসল।

আমরা পূর্ণ উৎসাহে একটু তাড়াতাড়ি বেয়ে চললাম। অপর নৌকাখানা অনেকটা পেছনে থেকে আমাদের অনুসরণ করতে লাগল।

তিনজনে কথা কইতে কইতে চলি।

নিখিলও গীতার মত' আমাকে ভাল বেসে ফেলেছে। নিতান্ত অর্থহীন তর্ক পর্য্যন্ত করে,—ভালবাসার লক্ষণ নয় তো কি? একদিনেই 'তুমি' বলতেও তার বাধল না।

আমি কিন্তু বেশ স্বচ্ছন্দ হয়ে তার সঙ্গে মিশতে পারছিলাম না। গীতার সঙ্গে তার ব্যবহার কথাবার্ত্তা এবং চিঠি নিয়ে কোনও মীমাংসা আজও হয় নি। তার সঙ্গেই আজ নিঃসংকোচে কথা বলতে পারি না।

বেলা পড়ে আসে।

দাঁড়ের গায়ে লেগে মাঝে মাঝে এক আধটা সাপ লাফিয়ে উঠ্‌ছে।

খাল পেরিয়ে আমরা নদীতে এসে পড়লাম। পেছন থেকে গীতার বাবা চীৎকার করে বল্লেন—এবার ফের' আর যেও না।

গীতা জবাব দিলে—আমরা আর একটু পরে ফিরবো। আমাদের জন্যে ভেবো না তিনজনে রয়েছি।

গীতার বাবা বল্লেন—তাহলে আমি কিন্তু আর দেরী করব না, তোরা বেশী সন্ধ্যে করিস নি যেন'।—

ওঁরা ফিরে চললেন।

নদীটী এখানে আধ মাইলের ওপর চওড়া। আমরা ঠিক মাঝখান দিয়েই চলতে থাকলাম।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে দূর আকাশের দিকে চেয়ে রামধনু দেখছিলাম।

গীতা ডাকলে—মিলনদা!

চমকে বললাম—কি বোন?

গীতা বললে—আজ আমার এই নৌকা-ভিযানের অন্তরালে একটা মানে আছে সেটা বোঝাতে চাই।

মানে?—

আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কি বলতে চাও?

—আমার স্বামীও সঙ্গে রয়েছেন, তুমি তাঁর সঙ্গে কথা কইবার সময় সঙ্কোচ বোধ করছ বুঝতে পারছি। তোমার এবং আমার সম্বন্ধ নিয়ে নানালোকের মনে নানা রকম সন্দেহ জাগে, তুমি নিজেও সে কথা শুনে অবধি নিজের মনের কাছে নিজেকে দোষী বলে মনে করে বেদনা অনুভব করছ। আজ সেই কথাটার মীমাংসা করতে চাই। তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা আমার রোগ শয্যার পাশে। তোমাকে দেখে অবধি আমার ভাল লাগল, তোমাকে ভালবেসে ফেললাম, এখনও ভালবাসি, তোমাকে ভালবাসার মধ্যে আমি অন্যায় কিছু জানি না, পাপও জানি না। আমার বাবাকে ভালবাসি, মাকে ভালবাসি, আমার দাদাকে ভালবাসি, তেমনি তোমাকেও আমার ভাল লাগল তাই ভালবাসলাম। সে কথা চিঠিতেও লিখেছি, মা বাবার সামনেও বলেছি, স্বামীর সামনেও বলেছি। নিষ্কাম

ভালবাসা পাপ নয় আমার মনের বিশ্বাস। ভালবাসা পাপ কখন?—যখন তাতে কাম এবং কামনার কলঙ্ক দাগ ফেলে।—বাবার প্রতি ভালবাসা, মার প্রতি ভালবাসা, স্বামীর প্রতি ভালবাসা, ভাইএর প্রতি ভালবাসা, এমনি করে ভালবাসার শ্রেণীবন্ধন করারও কোন মানে হয় না,—ঠিক যেমন তুমি কাল বলছিলে বর্ণাশ্রমের জাঁক জমকটাও আজ অর্থহীন। স্নেহ প্রেম শ্রদ্ধা ভালবাসা—সবই এক জিনিষের রূপান্তর। আমি কারও মাঝে তফাৎ দেখি না। স্বামীর সামনে সব কথা জানান আমার কর্ত্তব্য ভেবে বললাম। তুমি কিম্বা তিনি কিম্বা আর কেহ আমার অন্তরের ধারণাকে যেমন ভাবে ভাবতে চাও ভাবতে পার—নিজের মনের কাছে যখন দোষী নই আমি কারও সৎ বা মন্দ ধারণাকে ভয় করি না, গ্রাহ্যও করি না।

গীতার কথায় আমার মনের সকল অন্ধকার দূর হয়ে গেল।

নিখিল বললে—তোমাদের কথার মাঝখানে আমার কথা কওয়াটা অনধিকারের দাবী দিয়ে অগ্রাহ্য করবে না জানি, তাই বলছি,—গীতা, আমাদের বিয়ের পর বোধ হয় তোমাকে পুরো একটা মাসও কাছে পাই নি, তবু তোমাকে চেনবার আমি সুযোগ পেয়েছি যথেষ্ট, আজও সন্দেহ করবার মত হীনতা আমার একবার ও জাগে নি। তোমার ব্যবহারে বা কথাবার্ত্তায় গোপনতা নেই বিশ্বাস করি। তোমাদের দুজনকেই আমি ভালবাসি এবং শ্রদ্ধা করি—।

এই কথার পরে তিনজনেরই মনের বাঁধ আবার খুলে গেল।

বাড়ী ফিরে সেদিন গীতারও একখানা ছবি আমি চেয়ে নিয়েছিলাম। নিখিল নিজে হাতে করে আমাকে সেখানা উপহার দিয়েছিল।

দশ বারদিন পরে গীতাকে নিয়ে নিখিল বাড়ী চলে গেল। সময় পেলে আমি যেন তাদের বাড়ী বেড়াতে যাই যাবার সময় নিখিল নিমন্ত্রণ করে গেল।.........

সমরদার কদিন থেকে অসুখ এবং যাতনা দুই-ই বেড়েছে।

এমনি কি সর্ব্বক্ষণ ঘরের মধ্যেই থাকতে হয় তাঁকে। পচা ঘা সর্ব্বাঙ্গে দেখা দিয়েছে। অমন দেবতুল্য শরীরের এই বিকৃতি দেখে পাষাণেরও চোখে জল আসে।

বিশু ও আমি তাঁকে রোজ দেখিতে যাই, নাওয়া এবং খাওয়ার সময় ছাড়া সমস্তদিনই সেখানে বসে থাকি। গল্প করি, করে বর্ত্তমান অবস্থা ভুলিয়ে রাখতে চাই।

কিন্তু দিনে দিনে পলে পলে এই সত্য কথাটা বেশী করেই জাগতে লাগল আমাদের মনে, হয়তো আর বুঝি তাঁকে ধরে রাখতে পারি না।

একটী মেয়ে নীরবে অক্লান্ত মনে সমরদার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে খাটত দেখতাম,—সে মিনতি।—সমরদার মাঝে মাঝে বিভ্রম হয়, হয়তো বা সে কল্পনা! কল্পনাও দেখতে ঠিক এমনিটী-ই ছিল!

মাঝে মাঝে মিনতি বলে ডাকতে গিয়ে কল্পনা বলে ফেলেন, পরক্ষণেই বুঝতে পেরে লজ্জার আর সীমা থাকে না।

মিনতির চোখের জল কেউ দেখে না, সদাই হাসি হাসি মুখখানি, তবু মনে হয় ঐ হাসির আড়ালে তার প্রাণের বেদনা উপছে পড়ছে। কল্পনাকে সমরদা কত ভাল বাসতেন বুঝতে পেরে মিনতির দরদী প্রাণ গুমরে কেঁদে ওঠে।—তার হৃদয়-ব্যথার সাক্ষী রয়েছিতো আমি, সব বুঝতে পারি।

সেই ছেলেবেলাকার কুঁড়েখানি,—প্রথম যখন তাদের সঙ্গে দেখা,—কল্পনা এবং কল্পনার মা আর মিনতি তিনজনের সুখের সংসারটীর কথা মনে পড়ে। মিনতির ভাই-এর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে থেকে পরহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করা, কল্পনার সর্পাঘাতে মৃত্যু, ছেলে ও মেয়েকে হারিয়ে তাদের মায়ের উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা—এই তো সেদিনের কথা। কল্পনাকে ভালবাসতেন সমরদা, তাই মিনতিকেও বুকে করে তুলে নিয়ে এলেন। নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র নিরঞ্জনের সঙ্গে বিয়ে দিলেন, দুবছর বিনাদোষে কারাবাস করে এসে সুখে স্বচ্ছন্দে এতদিনে সকল দুঃখ বেদনার অবসান হয়েছে মনে করে

সমরদা আনন্দে সংসার পেতে বসলেন—। কিন্তু না জানি তাঁর কত জন্ম জন্মান্তরের কোন মহাপাপের শাস্তি—এমন কোরে তাঁকে প্রতি পলে পলে দগ্ধ কোরে মারছে। আমরা সমরদার মধ্যে আর কিছু জানি না, তাঁকে দেখলে আমাদের আর কিছু মনে হয় না, শুধু বুঝতে পারি বিশ্ব-জগতের দীন দুঃখী পিপীলিকাটীরও প্রতি এক অপূর্ব্ব ভালবাসা এবং দেশের কল্যাণ সাধনা মূর্ত্তি নিয়ে তাঁকে গড়ে তুলেছে। তাঁকে একদিনও রাগ করতে দেখিনি, একটা জোরে কথা বলতে শুনিনি, পরম শত্রুর উদ্দেশেও কোনদিন দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলেন নি,—সেই সমরদা আজ হৃদয়ের সমস্ত সাধনা অপূর্ণ রেখে জগৎ ছেড়ে চলেছেন!

সমরদা আপশোষ করে বলছিলেন—আর কোথাও যেতে চাই না মিলন। এইখানেই আমার স্বর্গ। আমার এই মাটীর বুকেই আমাকে বেঁধে রাখিস। ছেলেবেলা থেকে অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল আমার,—আমার এই একটামাত্র গ্রামের সকল অধিবাসীদের মানুষ করে গড়ে তুলব,—আমার সামান্য শক্তি, জগতের কথা বিরাট ভারতের স্বাধীনতার কথা, অত বড় বড় সমস্যার ধ্যান ধারণা আমার লক্ষ্য ছিল না। আমি চাইতাম আমার এই একটা গ্রামকেই আমার মনের মত' অলঙ্কারে সাজাব। এই কাজটুকুও শেষ করতে পারলাম না!

আমি বললাম—তোমার জীবন ব্যর্থ নয় দাদা! তোমার ব্রত সার্থক করে তুলব আমরা!

সমরদা বললেন—আমার জীবন একেবারে ব্যর্থ নয়, এই টুকু সান্ত্বনা আছে বলেই আজও আমার বিফলতার বেদনা সহ্য করতে পারি। অস্বীকার করি না। আমার এই স্বল্প জীবনটুকুর মাঝে আমি অনেক উপভোগ করেছি। তোদের শ্রদ্ধা এবং ভালবাসার সিংহাসনে বসে আমি তো রাজার জীবন কাটিয়েছি। আমার জীবন পথে—মলিনাকে পেয়েছি, মিনতিকে পেয়েছি, বাসন্তীকে পেয়েছি, রতনদা গীতা এবং তুই—তোরা সকলেই যে আমার জীবনের স্পর্দ্ধা, আমার গৌরব, আমার সম্পদ। আমার জননী জন্মভূমিকে আমি যা দিতে পারলাম না—তোদের কাছ থেকে সেই সেই জিনিষ মুখ চেয়ে প্রতীক্ষা করে রয়েছেন একথা ভুলিস নি। আমরা ব্যর্থ ফুল—কোন কাজে এলাম না—আমি এবং—

সমরদা চোখ বুজে কাকে যেন ভাবতে লাগলেন।

খানিক পরে আবার বললেন—এ সময় সবাইকে কাছে পেতাম একবার!

রুদ্ধ কণ্ঠে বললাম—মলিনাকে আনাতে পারি, রতনদা এবং বাসন্তীর খবর জানি না—

সমরদা বললেন—তারাও দূরে নেই ভাই। তোদের সামনে রুদ্ধ অভিমানে আসতে পারছে না। তোদের দেশ তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে,—তোদের দেশ তাদের সহ্য করতে পারে নি,—কেমন করে তারা আসবে—

—তাঁরা দূরে নেই? কোথায় আছে বল দাদা, আমি তাঁদের নিজে গিয়ে ডেকে আনছি,—

—কোথায় আছে তাতো জানি না, তবু বিশ্বাস করি তারা এই গ্রাম ছেড়ে যেতে পারে নি। জন্মভূমি ছেড়ে যাওয়া কি সোজা কথা? দেশের আবহাওয়া বদলে দে,—তাদের অমূল্য ভালবাসার কদর বুঝতে শেখ, তাহলে আবার তারা প্রকাশ্যে ধরা দেবে—

—মলিনাকে আনতে পাঠাব?

—মলিনাও আসছে আপনা হতেই। আমার আহ্বান তার কাণে পৌঁছেছে, সে চুপ করে বসে থাকবে না—

সমরদার কি দৈবদৃষ্টি আছে, জানি না। মলিনা সত্যই সেইদিন আমাদের গাঁয়ে এসেছিল। সমরদাকে দেখবার জন্য তার মন ব্যাকুল হওয়ায় অথবা আর যে কারণেই হউক জোর করে বাপের অনুমতি নিয়ে শ্বশুর বাড়ীতে বেড়াতে এসেছে।

সমরদার শেষ অবস্থা খবর পেয়েই সে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এল।

বাসন্তী এবং রতনদাও লুকিয়ে থাকতে পারে নি। তাঁরা আমাদের গাঁয়ের সীমার বাইরে একটা নিভৃত স্থানে কুঁড়ে বেঁধে বাস করছিলেন। রতনদা প্রায়ই মুটে মজুরের ছদ্মবেশে গাঁএর ভেতর ঢুকে আমাদের খবরাখবর নিয়ে যেতেন। নিজেদের সকল রকম লাঞ্ছনা সহ্য করেও বাসন্তীকে নিয়ে আজ প্রকাশ্যেই সমরদার বাড়ীতে হাজির হলেন। আমাদের দেখে তাঁরা সঙ্কুচিত হয়ে সরে সরে

থাকৃছিলেন, সমরদা বললেন,—রতনদা, বাসন্তী বোনটী আমার, তোমাদের আজ সকাল থেকে খুঁজেছি। দেখে যে কি আনন্দ হোল বলতে পারি না। কিন্তু একটা কথা বলে যাই। অন্যায় বা পাপ তোমরা কর নি যখন লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই। দেশ অথবা সমাজ তোমাদের চায় না তাই বলে তোমাদেরও দূরে সরে গেলে চলবে না। এই গাঁয়েরই বুকে ফিরে এসে বস। একদিন লোকে তোমাদের আদর করে বরণ করে নেবেই।—আজ হয়ত সংস্কারের বশে মুখ তুলে চাচ্ছেনা—দূরে সরে গেলে কোন দিনই তা পারবে না—তাই বলি ফিরে এস তোমরা—

আমারও চোখে জল এল। বললাম—রতনদা বাসন্তীদি, আমাকে তোমাদের ছোট ভাই বোলে ভেবে রেখো, আর কেহ তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করলেও আমি করব না,—আমি আমার সঙ্গে সমরদা, এমনি করে দশজন তোমার সঙ্গে একঘরে হয়ে থাকবো,—দেশ আমাদের কত জনকে ত্যাগ করে বেঁচে থাকবে? শেষে আপনা হতেই আমাদের ফের কাছে ডাকতে হবে—

সমরদার মুখ আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠ্‌ল! বললেন—এইতো ভাই মরদের মত কথা!

তারপর সহসা যেন চমকে উঠে জানালার বাইরে আমাদের দিকে চেয়ে বললেন—মিলন, মিনতি, আমার কাছে আয় দেখি, দেখতে পাচ্ছিস?—

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কি দাদা—

—সন্ধ্যে হয়ে গেছে বুঝি? কি ভীষণ মেঘ!—কিন্তু মাঝখানটাতে ঐ একটা তারা—দেখতে পাচ্ছিস?—

—পাচ্ছি দাদা—

—ওটাকে চিনতে পেরেছিস? মিনতি, তুই তো সাক্ষী আছিস, দেখ দেখি ভাল করে—মলিনা, তোকে একদিন চিনিয়ে দিয়েছিলাম,—কল্পনা!—কল্পনা,—আমার প্রেমের কল্পনা, আমার ভালবাসার কল্পনা, আমার সাধনার কল্পনা—

উত্তেজনায় সমরদা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

মিনতি বাতাস করতে লাগল।

গীতা সমরদার মাথাটা কোলের উপর তুলে নিয়ে বসল। রতনদা ডাক্তার ডাকতে গেলেন। মলিনা মুখ ফিরিয়ে আকাশের দিকেই চেয়ে রইল।—

সারা রাতটার ভেতর কখনো বা জ্ঞান হয়েছে কখনো আবার অভিভূত হয়ে পড়েছেন। ভোরের বেলাটা একেবারেই নির্ব্বাণ লাভ করলেন।

তাঁর সমাধিমগ্ন দেহটীর ধ্যান ভাঙতে চাই নি। তাই মুখে অগ্নিস্পর্শ করিয়েই তাঁকে তাঁর জন্ম ভূমির মাটির বুকে শুইয়ে রাখলাম।

সেই স্থানটী আমরা চিহ্নিত করে রেখেছি।

রোজ সন্ধ্যা হলে দেখতে পাই আকাশের তারাটীর বুক হোতে এক বিন্দু জল ঝরে পড়ে।

পরদেশী

—শ্রীবিষ্ণু দে

(১)

[Rondel ছন্দে]

নয়নশায়ক বিঁধেছে শিকারী আমার প্রাণে !
মীনকেতন, হয়েছে চেতনা বারেক চেয়ে !
হৃদয় তন্ত্রী পরশিল যেই উঠিল গেয়ে !
তাণ্ডব এ যে ! গিরিশের নহে, তোমারই গানে !
কি-জানি-কি-ভরে বাঁকায়ে ভ্রূদু'টী আমার পানে
চাহিল যে বালা—বেপথু আমারে ফেলিল ছেয়ে !
নয়নশায়ক বিঁধেছে শিকারী আমার প্রাণে !
মীনকেতন ! হয়েছে চেতনা বারেক চেয়ে !
কথা না কহিনু—কী যে হয়েছিল দেবতা জানে !
শীতল তুষার পড়িল ঝরি' সে নয়ন বেয়ে !
জমে গেল প্রাণ—আমি যে পুরুষ আর সে মেয়ে
ভুলে গেনু তাহা !—চলি এবে তাই তাহারই টানে
নয়নশায়ক বিঁধেছে শিকারী আমার প্রাণে
মীনকেতন ! হয়েছে চেতনা বারেক চেয়ে !

(২)

[Lai ছন্দে]

তোমারই নয়ন পাতের আশায় তপ করি,
তোমার চোখের বারেক চাওয়ার, অপ্সরী !
ধন্য দীন।
প্রাণের আবেগে কাঁপে তব তনু বল্লরী
আমি শুধু প্রাণ ও স্নায়ুর কাঁপন সম্বরি
বাজাই বীণ্।
তব লাগি, আশা নিয়েছে আমার সব হরে'।
তোমার নয়ন করুণার আশে স্তব করে,
সর্ব্বহীন।

(৩)

[Villanelle ছন্দে]

অপরূপ রূপা নবরূপে এলে অপ্সরী !
কবির মানস মানবী প্রতিমা ফেলে পুরে' !
তোমার ও দেহ দেউল, দেবীর স্তব করি !
বেশ কেশ রূপ আবেশে না লও সম্বরি' !
আঁখি পাখী তব শ্যেদন বিহঙ্গ মরে ঘুরে' !
অঞ্চল ওরে তব চঞ্চলা অপ্সরী।
প্রিয়ার মুরতি, প্রেমে কাঁপে তনু বল্লরী !
বন্ধ্যা প্রিয়ার দীপ্তি তোমার দেহে স্ফুরে !
মাতা তুমি নহ প্রেয়সী তোমার স্তব করি।
নন্দির পরশ, নাও যে চেতনা সব হরে' !
স্তনধারা কভু সুঠাম ও বুকে নাহি ঝুরে !
কটীর তনুতা ভারে নাহি ভাঙো অপ্সরী !
রহস্যময়ী, বৃথা তোমা লাগি' তপ করি' !
দেহেরই নাগাল পাইনে-মন ত আরো দূর !
মিছে এ সাধনা—মিছেই তোমার স্তব করি।
বিলোল স্তিমিত আঁখি জ্বলে' ওঠে দপ করে'
চুমা দিয়ে', মোরে জড়ায়ে, প্রেমের আধসুরে
কেশের আবেশে নিঝুম করিয়ে অপ্সরী
কোথা চলে যাও ! মিছেই দেহেরও স্তব করি।

—:•:—

—রূপশিখা—

—শ্রীঅরিন্দম বসু

ষষ্ঠ দৃশ্য

রজনী অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।

মেঘ-মুক্ত নীলিম-আকাশ প্রভাত-সূর্য্য-করঘাতে রক্তোজ্জ্বল।

চন্দা তাহার শয়ন-কক্ষে প্রসাধন-রতা। গত রজনীর প্রেম-অভিনয় তাহার প্রাণে অনুশোচনার বিদ্যুৎ-প্রবাহ আনিয়া দিয়াছে। তাহার সেই প্রদীপ্ত নয়নে আর তৃপ্তিহীন তৃষ্ণার আকুলতা নাই—আজ তাহা স্নিগ্ধ শান্ত, করুণ।

ক্ষণকাল পরে অলিন্দ-পথে উত্তীয় কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

কনক-মুকুরে তাহার প্রতিবিম্ব দর্শনে চন্দা উন্মুখ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

—শ্রেষ্টিপুত্রীর সংবাদ কি উত্তীয়?

—জানিনে,—আমি দ্বিতলে আরোহন করি নি।

—আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই—আজই তো শেষ দিন—না?

—হ্যাঁ, আজ পঞ্চম দিবস—শেষ দিনই বটে—তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন—স্বচ্ছন্দে যেতে পারো·· ···কিন্তু একাকী নয়······আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।

—সে আর এমন কি বিশেষ কথা।

—হ্যাঁ, কিছু আছে বৈ কি!······তবে এস চন্দা··· আমি প্রস্তুত।

উত্তীয় আগ্রহে চন্দার বাহু আকর্ষণ করিয়া দ্বিতলের সোপান-সম্মুখীন হইলেন।

চন্দা তাহার বাহুবন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া পরে বলিলেন—

—এমন করে তার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াতে যে আমার সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে উত্তীয়!

—কিসের সঙ্কোচ চন্দা?······প্রতিদ্বন্দিনীর সম্মুখে উন্নত-শিরে গিয়ে দাঁড়াবে···তাতে আবার লজ্জা, সঙ্কোচ!—

—প্রতিদ্বন্দিনী! সে, কি?···তোমার কথা যে আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে উত্তীয়।

—আর একটু অপেক্ষা ক'রো······যখন সেই ধন-যৌবন মদমত্তা শ্রেষ্টি দুহিতার সকল অহঙ্কার মুহূর্ত্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে······যখন সে স্পষ্ট করে বুঝতে পার্ব্বে,—উত্তীয় তার ঐ উদ্ধত প্রেমের ক্রীড়নক নয়······সে তার ব্যর্থ প্রেমের বেদনাকে বক্ষের অন্তরালে রেখে অসহায় শিশুর মত চুপ করে বসে থাকেনি,—বরং অন্য এক রূপসী তরুণীর সৌন্দর্য্য-লালসায় নিজেকে উন্মত্ত করে তুলেছে······ তখন সব বুঝতে পার্ব্বে।

সহসা উত্তীয়ের বাহু-বন্ধন ছিন্ন করিয়া চন্দা বলিয়া উঠিলেন—হুঁ, এতক্ষণে বুঝলাম গত নিশীথে কেন—

না, চন্দা—এখনো বোঝনি। বুঝবে তখনই, যখন সেই উদ্ধতা বালিকার আজন্ম সুখ-বর্দ্ধিতা সুকোমল দেহলতা তোমার চোখের সাম্নে······কক্ষতলের ঐ কঠিন পাষাণে লুটিয়ে পড়বে,······যখন তার চম্পক-নিন্দিত স্বর্ণোজ্জ্বল দেহবর্ণ অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হয়ে নিমেষে ক্লিষ্ট হয়ে উঠবে,······আর—আর সেই কিন্নর-আঁখি হ'তে যখন অঝোরে অশ্রুঝরে তার তপ্ত বক্ষ ভাসিয়ে দেবে,··· হয়তো তখনই শুধু বুঝবে চন্দা,—তার আগে নয়।

—ও, এতদুর!······হ্যাঁ, এ সন্দেহ আমার মনে জেগেছিল বটে।······কিন্তু ভাবতে চাইনি যে তা এমনই নিদারুণ····· কিন্তু—

সহসা উৎপলবর্ণাকে অদূরে কক্ষের সম্মুখে দেখিয়া চন্দা সন্ত্রস্তা হইয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন—আর তাহার মুখে কথা ফুটিল না।

উত্তীয় তাহাকে পুনর্ব্বার বাহুবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া অবশেষে চীৎকার করিয়া বলিলেন—

চেয়ে দ্যাখো নন্দদুহিতা, কে জয়ী আজ,...... কাল......যাকে তুমি হেলায় উপেক্ষা করেছিলে, আজ তারই বিলাসোৎসবে তুমি ঈর্ষান্বিতা।......কিন্তু এই তার শেষ নয়......সবে সুরু।

—কখ্খনো না, ভুল ভাবছো উত্তীয়......তুমি মনেও করো না, চন্দা তার সম্পূর্ণ জ্ঞাত সারে তোমার যৌবন-লালসার আরও ইন্ধন জোগাবে। তুমি এমনই কপট যে...

—ছিঃ চন্দা! তোমার মুখে একথা?

—হ্যাঁ আমার মুখেই আজ এই কথা......কিন্তু আশ্চর্য্য হ'য়ো না উত্তীয়...আমি সব বুঝতে পেরেছি।... ঐ কিশোরীর বিশুষ্ক মলিন মুখছবি—ঐ ব্যথাতুর নয়নের উদাস দৃষ্টি আমাকে সব বুঝিয়ে দিয়েছে।...বড় ভুলই আমি ভেবেছিলাম তোমায়।

চন্দা সজোরে অধর দংশন করিলেন। তাহার বক্ষ-স্পন্দন দ্রুত বহিতে লাগিল।

—তুমি কি উন্মত্ত হয়েছো চন্দা?

—না, বরং উন্মত্ত ছিলাম,......এখন প্রকৃতিস্থ হয়েছি। ...কিন্তু তুমি না এতদিন উদার হৃদয়-বৃত্তির গর্ব্ব করেছো, ...এই বুঝি তোমার উদারতা!...তাই প্রণয়াহত হয়ে প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ কর্ব্বার জন্য একটা পতিতাকে কপট প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করে এই অসহায়া বালিকার সাম্‌নে উপস্থিত হতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করোনি। ধিক্ তোমার এমন পৌরষে।

—চন্দা......

—শোন উত্তীয়, জীবনে পাপ করেছি যথেষ্ট কিন্তু আর নয়। এই মুহূর্ত্তে আমার প্রায়শ্চিত্তের আহ্বান এসেছে... আর সে আহ্বান এনেছে ঐ দুটী আঁখি।......কিন্তু তার পূর্ব্বে একটা কর্ত্তব্য আমায় সম্পন্ন করে যেতে হ'বে। ......তাই তোমার কাছে আমার শেষ অনুরোধ...তোমাকে তা রাখ্‌তে হ'বে।

—আজ এ নূতন কথা নয় চন্দা......এ অভিনয় অনেক দিনই তুমি করেছো। কিন্তু কিসের অনুরোধ সে?...

—মিথ্যা কথা,......চন্দা পতিতা বটে কিন্তু তোমার মত তার অন্তকরণ নীচ নয়......কিন্তু থাক্ সে কথা।... দুরন্ত অভিমানে ব্যর্থ-কল্পনার প্রতিশোধ লিপ্সায় তুমি তোমার স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলেছো...তাই আজ এ উন্মাদনা।...তোমার বিশ্রাম আবশ্যক...যাও, বিশ্রাম করগে ক্ষণকাল—তারপর...

—বিশ্রাম!

—হ্যাঁ, বিশ্রাম......পশ্চিমের ঐ কক্ষে।......তোমার মানসিক উদ্বেগের জন্য—বুঝলে?...যাও—

—ঠিক বলেছো...কিন্তু......

—না, সে কথা পরে হবে—এখন যাও—যাও—কথা শোন,—

উত্তীয় চন্দার এই তীব্র অনুরোধ অবহেলা করিতে পারিলেন না......প্রায় উন্মত্তের মতই প্রাসাদের পশ্চিমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এতক্ষণ উৎপলবর্ণা বিহ্বল দৃষ্টিতে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাহার মনে হইতেছিল ইহা যেন স্বপ্ন। পরে উত্তীয় প্রস্থান করিলে পর চন্দা যখন তাহার সম্মুখে আসিয়া সহসা নতজানু হইয়া বলিলেন—আমায় ক্ষমা ক'রো উৎপল।......সেই মুহূর্ত্তে যেন তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। প্রথম দর্শনে উত্তীয় এবং চন্দাকে পরস্পরের বাহুবদ্ধ দেখিয়া তাহার মন যেমন ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল,...এখন চন্দার এই ব্যবহার দেখিয়া তাহার যেন পরিবর্ত্তন ঘটিল। কিন্তু মুখের গাম্ভীর্য্য-ভাব দূর হইল না।

চন্দার এই আকস্মিক মার্জ্জনা-ভিক্ষায় শ্রেষ্ঠিপুত্রী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন বটে কিন্তু কি বলিবেন স্থির করিতে না পারিয়া নীরব হইয়াই রহিলেন।

চন্দা শ্রেষ্ঠি কুমারীকে নিরুত্তর দেখিয়া পুনরায় বলিলেন—

—বয়সে আমি তোমার বড় হ'বো উৎপল্......আমার যে বড় আশা তুমি আমায় ক্ষমা করবে।

—তুমি ওঠো......

উৎপলবর্ণা তাহার হাত ধরিয়া মৃদু আকর্ষণ করিলেন। চন্দা উঠিয়া শ্রেষ্ঠিপুত্রীর একখানা হাত নিজের হাতে গ্রহণ করিয়া বলিলেন—

—বলো ভাই, আমায় তুমি ক্ষমা করেছো?

—অনুমানে বুঝ্লাম তুমিই রূপসী চন্দা,—দেখতেও তাই বটে।...কিন্তু আমি তো তোমার অপরাধ নিইনি কিছু।

—হতে পারে সত্যি,-তুমি তা' নাওনি......কিন্তু অপরাধ যে আমার খুবই আছে ভাই।......তুমি আমার অতিথি......অথচ তা জেনে শুনেও তোমার অভ্যর্থনা করা দূরের কথা,—এতদিন তোমার সাথে দেখা পর্য্যন্ত করিনি।......শুধু তাই নয়,......তারপর তোমার যিনি স্বামী...... হ্যাঁ, স্বামী বৈকি...তাকে পর্য্যন্ত আমার রূপ, যৌবন, ঐশ্বর্য্যে, মুগ্ধ করে রেখে তোমায় প্রতারণা করেছি। ...একি আমার তুচ্ছ অপরাধ?......আমায় একটিবার ক্ষমা করো ভাই... অন্তর্যামী জানেন, আজ আমায় কত তীব্র জ্বালা সইতে হচ্ছে।......

চন্দার এই বাস্প-রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে শ্রেষ্ঠিকুমারীর মনে হইল হয়ত চন্দার সত্যই দোষ নাই।......বলিলেন—

—যদি তোমার সত্যি কিছু দোষ থাকে চন্দা....তবে আমি ক্ষমা করছি।

একটা অপ্রত্যাশিত আনন্দে চন্দা যেন বিহ্বল হইয়া গেলেন। মুহূর্ত্তে উৎপলবর্ণার চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—

এত উদার..... এত মহৎ তুমি উৎপল!......যাক্, আজ আমি তবে নিশ্চিন্ত হ'লাম।

উৎপলবর্ণা বিস্মিত নয়নে চন্দার দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে চতুর্দ্দিকে কক্ষ-প্রাচীরের শিল্প-বৈচিত্র লক্ষ্য করিয়া সহসা বলিলেন—

—এই প্রাসাদ তবে তোমারই চন্দা?......এত সেবা-দাসী......এত অনুচর......এত সব মহার্ঘ্য বিলাস-ভূষণ সব তোমার?

—হাঁা, এতদিন আমারই ছিল কিন্তু সেদিন এর সমস্ত সব আমি উত্তীয়কে দান করেছি।

—কেন?

—হ্যাঁ, আমিও তাই ভাব্‌ছি এখন—কেন?......সত্যি, আজ এর কোন উত্তরই নেই।

—হুঁ, বুঝেছি......কিন্তু তোমার এই নিঃস্বার্থ প্রেমের প্রতিদানে কি—

—না, সামান্য প্রতিদানও নয়।......কিন্তু তুমিও ভুল বুঝেছো উৎপল,......আমার প্রেম নিঃস্বার্থ নয়......তা' সর্ব্বগ্রাসী লালসার ক্ষণিক শান্তরূপ মাত্র।......এতদিন আমিও ভেবেছি আমার প্রেম বুঝি নিষ্কাম......কিন্তু সে ধারণা আমার আজ ভেঙ্গে গেছে।

উৎপলবর্ণা সন্দিগ্ধচিত্তে চন্দার মুখের দিকে চাহিলেন। তাহার এই স্বীকারোক্তি তিনি যেন বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। অস্ফুটকণ্ঠে শুধু বলিলেন—

—কিন্তু এ ধারণা তো তোমার ভুল হ'তে পারে...... এক মুহূর্ত্তেই কি এতদিনের......

—না, আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি,—কিন্তু সে প্রেমের বিন্দুমাত্র অস্তিত্বও আর সেখানে খুঁজে পাইনি। আমি আজ জোর করে বলতে পারি—এতদিন যা ভেবে এসেছি সব মিথ্যা।......কিন্তু উদ্বেগের কোন কারণই নেই তোমার......আমি তোমায় আশ্বাস দিচ্ছি।......আমি জানি, উত্তীয় তোমার প্রেমে আত্মহারা......তোমাকে সে নিবিড় করে পেতে চায়......হয়তো শ্রাবস্তীতে তার এমন কিছু প্রতিবন্ধক ছিল যার জন্য সে তোমাকে ছল করে বেসালির এই রম্য আম্রকাননে নিয়ে আসতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ বোধ করে নাই। কিন্তু তুমি আত্মাভিমানী হয়ে তার এই আত্মহারা প্রেমের ফাঁদে ধরা দিতে চাও নি...... বরং তাকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছো। সেই আঘাতে সে এমন উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলো......তাই প্রতিহিংসা লিপ্সায় আমার সৌন্দর্য্যে—আমার বাহুপাশে এমন করে এসে ধরা দিয়েছে।......ভালোবাসা তো দূরের কথা, সে অন্তরে আমাকে ঘৃণা করেছে।......আর আমি?......আমি আমার বহুদিনের প্রত্যাখ্যাত দেহ-যৌবন নিয়ে তাকে ছলে বলে জয় করতে চেয়েছিলাম,......তাই প্রেমের তুচ্ছ অভিনয়ের ভেতরে শুধু তার ইন্দ্রিয় জয় করেছি......হ্যাঁ,

উৎপল, ঠিক বলছি,—তাকে ভালোবাসতে পারি নি—একটুকুও না।

—তবু……

—না, ভাই, কোন দ্বিধাই মনে এনো না। আমার সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বল্‌ছি, মানুষের ক্ষণিক ভুলের জন্য……তার অজ্ঞানকৃত সামান্য অপরাধের জন্য…বড় করে তাকে দেখো না।……তাতে নিজের জীবনটাই শুধু জর্জ্জরিত হয়ে উঠ্‌বে।……মনে পড়ে, আমার সেই প্রথম যৌবন-প্রভাতে,……এই ঘৃণিত জীবন যাপনের পূর্ব্বে এম্‌নি একটা ভুলই আমায় ভুল-পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো,……আজ তারই পরিণতি জীবনে আমার এমন অবসাদ ঢেলে দিয়েছে……এক অজ্ঞাত কঠোর প্রায়শ্চিত্তের পথে আহ্বান করছে।

—কি-সে প্রায়শ্চিত্ত?

—জানি নে কি-সে প্রায়শ্চিত্ত……শুধু জানি তার আকর্ষণ অতি ভীষণ। সে আকর্ষণ আজ আমায় আকুল করে তুলেছে……সমস্ত বন্ধন আমাকে ছিন্ন করে যেতে হবে……আমি যাবো।……কিন্তু যাবার আগে তোমার কাছে আমার শেষ অনুরোধ……আমার বড় আশা,……ব'লো ভাই, তুমি তা' রাখ্‌বে?

—কি চন্দা?

—একদিন গভীর বিশ্বাসে যেমন করে তুমি উত্তীয়ের বাহুপাশে ধরা দিয়েছিলে……আজো আবার তেম্‌নি করেই তাকে আলিঙ্গন ক'রো ভাই।……মনের সমস্ত দুঃখ-কালিমা মুছে ফেলে দিয়ে আজ আবার তাকে প্রফুল্ল মনে গ্রহণ ক'রো উৎপল।

শ্রেষ্ঠিকুমারী নীমলিত নয়নে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

—যদি পিতার কথা,-শ্রাবস্তীর কথা ভেবে থাকো তুমি……তবে এই আশ্বাস আমি তোমায় দিচ্ছি—তার স্নেহ…শ্রাবস্তীর সম্মান…কিছুই তুমি হারাবে না।……চলো ভাই, আমি নিজে তোমার সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি।

উৎপলবর্ণা ক্ষণকাল গবাক্ষ-পথে নীল আকাশের পানে চাহিয়া কি যেন চিন্তা করিলেন,—পরে সহসা চন্দার একখানি হাত নিজের হাতে বন্দী করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

—চন্দা, আজ তোমার কথায় যেন আমার জীবনের একটা পরিবর্ত্তন সুরু হ'তে চলেছে—একটা মস্ত অভাব কোথায় যেন লুকিয়ে ছিল—অথচ আমি তাকে কোনদিনই বুঝিনি…ভুল আমারও কম ছিল না…… কিন্তু নিজের কথা আর ভাবছি নে,—ভাবছি শুধু,—হ্যাঁ, যদি সে আমায় তেমনি প্রসন্নদৃষ্টিতে আর…

চন্দা বাধা দিয়া বলিলেন—

না, উৎপল, আমি ভালো করে জানি……তোমার মনে যদি এই আশঙ্কাই হ'য়ে থাকে তবে জেনো তা অমূলক।

শ্রেষ্ঠিকুমারী আর কিছু বলিলেন না। সেই মুহূর্ত্তেই চন্দা সাদরে তাহার হাত ধরিয়া প্রাসাদের পশ্চিম দ্বার পথে অগ্রসর হইলেন।

সপ্তম দৃশ্য

অস্তোন্মুখ সূর্য্যের রক্তিমাভায় নদীর বুকখানি ঈষৎ রঙীন। শান্ত, মৃদু ঢেউগুলি যেন ফণা তুলিয়া নাচিয়া চলিয়াছে……তীরে মর্ম্মর সোপানশ্রেণীতে অসংখ্য রাজহাঁস গ্রীবা বাঁকাইয়া জলকেলি করিতেছে।……সন্ধ্যা-প্রকৃতি অপরূপ শান্ত, সুন্দর।

সোপানের উপরে চন্দা বসিয়াছিলেন,—তিনি চিন্তান্বিতা।

পশ্চাতে প্রাসাদ-অলিন্দে দুইটী বিরহ-শান্ত তরুণ-তরুণী দাঁড়াইয়া।…তাহাদের মুগ্ধ-দৃষ্টি সুদূর দিগন্ত-রেখায় নিবদ্ধ।

নদীতীরের পথটী খুব সঙ্কীর্ণ—বেসালির রাজপ্রাসাদের সম্মুখে, প্রশস্ত পথের সহিত তাহা মিশিয়া গিয়াছে। সেই পথে একটী লোক ক্রমশঃ সোপানের দিকে আসিতেছিল—মনে হয়, চন্দা যেন তাহারই প্রতীক্ষায় বসিয়া।

দেখিতে দেখিতে লোকটী চন্দার একান্ত সম্মুখে আসিয়া তাহাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল।

চন্দা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন—

—কি সংবাদ জীবক?…শ্রাবস্তীর সব কুশল তো?

জীবক চন্দার বিশ্বস্ত অনুচর,—উত্তীয়ের অনুরোধে তিনি তাহাকে শ্রাবস্তীতে পাঠাইয়াছিলেন।

—হ্যাঁ, অন্যান্য কুশল বটে।……তবে শ্রেষ্ঠি নন্দ কন্যার বিরহে অত্যন্ত শোকাভিভূত হ'য়ে অবশেষে গত কৃষ্ণ-

দশমীতে ভগবান বুদ্ধদেবের নিকটে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করে সংসার মায়া-মুক্ত হ'য়েছেন।

—সংসার-মায়া-মুক্ত!—আশ্চর্য্য বটে!

—শুধু তাই নয়,……তিনি মহাসমারোহে বৌদ্ধ-সঙ্ঘকে নিজের বিপুল ভবনে আমন্ত্রণ করেছিলেন,—সেথায় ভগবান তথাগতের শ্রীমুখে আষ্টাঙ্গিক আর্য্যপন্থার বিবরণ শুনে দক্ষিণা স্বরূপ তাহার সমস্ত ধনসম্পত্তি সহ সেই অত্যুচ্চ প্রাসাদ থের-সঙ্গে দান করেন।

—বুঝেছি……তাঁরও তবে আহ্বান এসেছিলো…… যাক্।……কিন্তু শ্রেষ্ঠি—না—ভিক্ষু নন্দ এখন কোথায়?

—তিনি বুদ্ধদেবের সহগামী হয়ে সম্প্রতি এই বেলুব গ্রামে যাত্রা করেছেন……সেখানেই ভগবান এই বর্ষা-ঋতু যাপন করবেন বলে সঙ্কল্প করেছেন।

—উত্তম……এখন তুমি বিশ্রাম করগে জীবক…… তোমার এই কার্য্য সম্পাদনের জন্য আমি তোমাকে সহস্র-স্বর্ণমুদ্রা……

—ক্ষমা করুন…আজ আমি নির্লিপ্ত……

—সে কি জীবক?

—আজ আমি ভিক্ষু……বুদ্ধের অমোঘ উপদেশে সংসার ত্যাগী হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি।

চন্দা বিস্মিত চোখে জীবকের পানে ক্ষণকাল চাহিয়া কি যেন লক্ষ্য করিলেন। তারপর অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন—

—কি সুন্দর!……জানি নে আজ কি বলে তোমাকে অভিনন্দিত কর্ব্বো……আমার অন্ধ-নয়নের সম্মুখে তুমি মুক্তির আলো এনেছো জীবক—আজ আমি মুক্ত।

জীবক উর্দ্ধে অঙ্গুলি তুলিয়া শুধু হাসিল পরে শান্ত কণ্ঠে বলিল—

—আমার শেষ প্রার্থনা……

—আমি জানি জীবক, কি সে প্রার্থনা…… কিন্তু—হ্যাঁ, ক্ষণেক অপেক্ষা করো……আমি এখুনি ফিরে আসছি।

সেই মুহূর্ত্তে চন্দা উদ্যান পথে প্রস্থান করিলেন। আর জীবক তাহারই প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল।

জীবকের প্রার্থনার কথা চন্দা ঠিকই বুঝিয়াছিলেন… সে যে বুদ্ধ-সন্দর্শনে গমন করিবার জন্যই চির-বিদায় লইবার সঙ্কল্প করিয়াছে তাহা তাহার প্রশান্ত মুখচ্ছবিতেই বোঝা গিয়াছিল। ত্বরিত-পদে চন্দা প্রাসাদের দ্বিতলে উপনীত হইলেন। তারপর উত্তীয় এবং উৎপলবর্ণা যে স্থানটিতে দাঁড়াইয়াছিলেন সেস্থানে গিয়া পরিস্কার-কণ্ঠে বলিলেন—

—উত্তীয়, উৎপল, আমি তোমাদের কাছে বিদায় চাইতে এলাম ভাই।

উৎপলবর্ণা সরিয়া আসিয়া চন্দার একখানা হাত টানিয়া লইয়া ব্যথিত-স্বরে বলিলেন—

—কিসের বিদায় চন্দা?……এমন অন্ধকারে কোথায় যাবে তুমি?

চন্দা হাসিয়া বলিলেন—

অন্ধকার নয়……পরিপূর্ণ আলো।……হ্যাঁ, যাচ্ছি ঐ বেলুব গ্রামে।……আমি মুক্তির সন্ধান পেয়েছি ভাই। ……সেথা থেকে আমার জীবনের সর্ব্বোত্তম সার্থকতার আহ্বান এসেছে……বড় সুন্দর আহ্বান সে।

—কার আহ্বান চন্দা?

—ভগবান গৌতমের।

—কিন্তু—

—ভুল ক'রোনা উৎপল………আমাকে আজ কোন দ্বিধাই বাধা দিতে পারবে না।……যার প্রাণে এ আহ্বান বেজেছে, সে উল্কার মত ছুট্‌বেই……এই আহ্বানেই সেদিন তোমার পিতা ছুটেছেন……আজ আমি ছুট্‌ছি……কাল আবার হয়তো……

—আমার পিতা!

—হ্যাঁ, উৎপল, তোমারই পিতা।

উৎপলবর্ণা স্তম্ভিত হইয়া চন্দার মুখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

উত্তীয় এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন—এইবার বিস্মিত কণ্ঠে বলিলেন—

—সত্যি বলছো চন্দা?……শ্রেষ্ঠি নন্দ—তিনি?…

—হ্যাঁ, তিনি কিন্তু শ্রেষ্ঠি নন্…তিনি আজ মহাভিক্ষু।

—আশ্চর্য্য বটে!

—কিন্তু আশ্চর্য্য আরো আছে উত্তীয়……তিনি শুধু

বুদ্ধপদে নিজেকে প্রত্যার্পিত করেই মায়া-মুক্ত হন নাই… তাঁর যাবতীয় ঐশ্বর্য্য…মর্ম্মর-নির্ম্মিত বিরাট বাসভবন… সমস্তই শ্রমন-সঙ্ঘে দান করেছেন।

—বাবা, বাবা, এ তুমি কি করলে ?

শ্রেষ্টিপুত্রী দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

—ছিঃ উৎপল!……তিনি আজ মহামুক্তির সাধক …তার মঙ্গলে ব্যথিত হওয়া কি তোমার উচিত ?

—কিন্তু প্রাণ যে কিছুতেই সান্ত্বনা মানতে চায় না।… মনে নেই কোন সুদূর শৈশবে মাতৃহীনা হয়েছিলুম…… তারপর হতে যাকে একান্ত আপনার বলে জেনে এসেছি সে যে ঐ পিতা…আর কে আছে চন্দা ?

—তার জন্য আর দুঃখ করে লাভ কি ভাই…তিনি তো তাঁরই আত্মার কল্যাণে স্বেচ্ছায় সর্ব্বস্বত্যাগী হয়েছেন—

—কিন্তু সে বয়স তো তাঁর হয় নি চন্দা……হয়েতো আমারই জন্য এত তাড়াতাড়ি করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন।

চক্ষু দুইটি আঁচলে মুছিয়া লইয়া শ্রেষ্টিপুত্রী নত নেত্রে চিন্তা করিতে লাগিলেন—পরে মুখ তুলিয়া শান্ত কণ্ঠে বলিলেন—

—পিতা এখন কোথায় ভাই ?

—ঐ বেলুব গ্রামে।……আমি ও সেখানেই চলেছি এখন……অনেক দেরী হয়ে গেল ভাই…তোমরা আমায় ক্ষমা করো……আমি চল্লাম।

—তবে তোমার সঙ্গে কি আর শিগ্‌গির দেখা হবে না ?

—হ'বে বৈকি উৎপল্……আমার যে এখনও একটা কর্ত্তব্য বাকী রয়ে গেছে…আগামী পূর্ণিমায় স-শিষ্য বুদ্ধদেবকে এই প্রাসাদে আমি আমন্ত্রণ কর্ব্বো—সেই দিনই আবার দেখা হবে।

চন্দা বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

জীবক নদীতীরে প্রতীক্ষা করিতেছিলে। চন্দা তাহার নিকটে আসিয়া বলিলেন—

—আমিও তোমার সঙ্গে চলেছি জীবক।

—আপনি!

—হ্যাঁ, আমি, বুদ্ধ-পদে আমারও আহ্বান এসেছে জীবক……আর সে আহ্বান নিয়ে এসেছো তুমি।

জীবক মুহূর্ত্তকাল চন্দার মুখের দিকে চাহিয়া কি যেন ভাবিলেন—পরে বলিলেন—

—তবে চলুন—

সেই পরিপূর্ণ সন্ধ্যায় মুক্তির অনির্ব্বচনীয় আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাহারা বেলুব গ্রামের পথ ধরিলেন।

এই মুক্তি-প্রয়াসী নর-নারীর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া পশ্চাতে প্রাসাদ-অলিন্দে শুধু দুটী তরুণ তরুণী গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

পক্ষাধিক অতিবাহিত।

সেদিন পূর্ণিমা তিথি।

ভগবান বুদ্ধদেব সশিষ্য বেসালির আম্র-কাননে বৌদ্ধ-শ্রাবিকা চন্দার পূর্ব্বতন মর্ম্মর-ভবনে আমন্ত্রিত হইয়াছেন।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছিল।

সুগন্ধামোদিত পুষ্পোদ্যানের এক রম্যস্থানে ভগবান সমাসীন,—তাহাকে ঘিরিয়া শিষ্যমণ্ডলী বসিয়াছেন। অদূরে প্রাসাদের সম্মুখে চন্দা মালা গাঁথিতে ছিলেন। তাহার পার্শ্বে দুইটী যুবক-যুবতী বসিয়া।

একজন ভিক্ষু-পুত্রী উৎপল বর্ণা—সদ্যস্নাতা—এলায়িত কুঞ্চিত কেশ-গুচ্ছ রক্তবর্ণ শাড়ীর উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে।

অন্যজন উত্তীয়—প্রসন্ন উজ্জ্বল নয়ন……শান্ত, সৌম্য —প্রিয় দর্শন।

সেদিন তাহাদের বিবাহ-উৎসব।

বিবাহ অন্তে তাহারা শ্রীবুদ্ধের গৃহস্থ্যশিষ্যরূপে শ্রাবস্তীতে অবস্থান করিবে।

শ্রাবস্তী নগরে চন্দার বিলাসভবনখানি বেসালির মর্ম্মর প্রাসাদের পরিবর্ত্তে উত্তীয় গ্রহণ করিয়াছেন—চন্দার অনুরোধে।

উত্তীয় বসিয়া একাগ্রমনে চন্দার নিপুন-হস্তের অঙ্গুলি সঞ্চালন দেখিতেছিলেন।

সহসা বলিলেন—

—আজ আমরা ধন্য চন্দা…তোমার কৃপায় এই মহাপুরুষের দর্শন পেয়েছি।……কি বলে যে তোমায় কৃতজ্ঞতা জানাবো—

—আজ কৃতজ্ঞতার কথা নয় ভাই—জীবনে আমার কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই।…আজ আমি থেরী ধর্ম্মব্রতা—বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সঙ্ঘ-পদে শরণ নিয়ে পার্থিব মনুষ্য জীবনের পরপারে গিয়ে পৌঁছেছি। আজ শুধু অষ্টাঙ্গিক-পথেই আমার জীবনের গতি।

—সত্যি, আজ তুমিই শুধু সুখী…জানিনে আমাদেরও এমন আহ্বান কবে আস্‌বে?

—অপেক্ষা করো, আমি জোর করে বলতে পারি একদিন এই প্রেম-ধর্ম্মের বন্যায় তোমরাও ভেসে যাবে।…সেই মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করে সকল বাসনার নির্ব্বাণ সাধন করো—তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।

সহসা অদূরে সমবেত শিষ্যবৃন্দের সুকণ্ঠ হইতে বুদ্ধদেবের মাহাত্ম ঘোষিত হইল—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি!
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি!
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

—ঐ শোনো সেই আহ্বান।…চলো ভাই তোমরা—তোমাদের গৃহস্থ ধর্ম্মাভিষেকের সময় হলো।

চন্দা উঠিয়া বুদ্ধ-সমীপে অগ্রসর হইলেন। উত্তীয় এবং উৎপলবর্ণা ধীরে ধীরে তাহার অনুগমন করিয়া চলিলেন।

শুভক্ষণে যুবক-যুবতীর উদ্বাহ-ক্রীয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। ভগবান বুদ্ধ তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহস্থ-শিষ্যরূপে দীক্ষা দান করিলেন।

উত্তীয় ভক্তি-পুলকিত চিত্তে তথাগতের জয় ঘোষণা করিলেন—

"বুদ্ধবীর নমোতনত্থু সব্ব সত্তান মুত্তম।"

চন্দার শেষ কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল।

তিনি আসিয়া উভয়ের কাছে বিদায় চাহিয়া বলিলেন—

—প্রার্থনা করি—সম্বুদ্ধ গৌতমের আশীর্ব্বাদে তোমরা সুখী হও—তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হোক।

উৎপল বর্ণা বুকের আঁচলে চোখ মুছিয়া চন্দাকে নীরবে বিদায় দিলেন।……আর উত্তীয় স্তব্ধ হইয়া মনে মনে এই নবীনা ভিক্ষুনীকে অভিবাদন করিলেন।

ভিক্ষু মন্দ আসিয়া উভয়ের শিরে হাত রাখিয়া শুভাশীর্ব্বাদ করিলেন—বলিলেন—

—বৎস উত্তীয়,—আজ আমি সমস্ত হিংসা দ্বেষের বাইরে।…আজ তোমাদের আমি এক নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত করছি—জীবে প্রেম,—স্বার্থত্যাগ—বুদ্ধের এই মূল মন্ত্র শরণ করে সংসার ধর্ম্ম পালন ক'রো—ভগবানের কৃপায় তোমরা সুখী হবে।

আশীর্ব্বাদ-অন্তে দুইজনে নতজানু হইয়া ভিক্ষুপদে প্রণাম করিলেন। উৎপলবর্ণার কপোল বহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু অতি অলক্ষ্যে গড়াইয়া পড়িল।

পরদিন শুভক্ষণে সমাগত জনমণ্ডলীর শুভাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া উত্তীয় ও উৎবলবর্ণা শ্রাবস্তী নগরে যাত্রা করিলেন। বেসালির মর্ম্মর-ভবন বুদ্ধদেবের প্রতি ভক্তি-অর্ঘ্য স্বরূপ থেরী সঙ্ঘে উৎসর্গিত হইল।

চন্দার নূতন নাম হইল—

ভিক্ষুণী সঙ্ঘদত্তা।

শেষ।

—:⊙:—

গান—

—শ্রীঅবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(১)

আজি—উজল জল ছল ছল ছল
নব আষাঢ়ের রাতি,
ওরে—বুকের কাঁচলী শিথিল করেছে
নিবায়ে দে সখি বাতি।
কিছু যে কেমন লাগে নাকো ভালো
একি জ্বালা সই একি জ্বালা হ'লো
সাধ হয় সারানিশি জেগে রই
বসন আঁচল পাতি।
মোর—কবরীতে আজ দিলি কি গন্ধ
বুক যে কেমন করে,
সখি—এ ভরা নিশীথে কে বাজায় বীণা
অমন মধুর স্বরে!
অলি কি ফিরিল গুঞ্জন রবে,
শতদল বনে মধু উৎসবে—
দিনরাত ভেদ হারালোঅন্ধ
কিসের নেশায় মাতি!

(২)

সখি, দ্বারের আগল ভেঙ্গে ফেল্ আজ
বন্ধন খুলে দে,
ললিত মধুর বাঁশরীর তানে
আমারে ডেকেছে সে।
যমুনায় দেখ ডাকিয়াছে বান
আকাশে উথলে বরষার গান
আজি আর আমি হৃদয়ের বেগ
রুধিতে পারিনে রে!
বাদল বাতাস হারালো ছন্দ
আজ সে যে উন্মাদ,
টুটেছে তাহার মোহের স্বপন
ছুটে গেছে সব বাঁধ;
কোথা নিয়ে যাবি চলে চলো সই
বাজে তার বাঁশী ওই বাজে ওই
সে শুধু আমার আমি শুধু তার
চির নিশি দিনে রে!

—:o:—

পরিচয়।

—টগোর

শিউলি বনের রাণী,
কোমল মৃণাল পাণি,
শরৎ ভোরের আলোয় তোমার—
সঙ্গে জানা জানি!
শিশির ঝরা প্রাতে,
মুগ্ধ এ হিয়াতে,
উতল বাতাস করলে তোমায়
সুরটী কানাকানি!
শিউলি বনের প্রিয়া,
এলে গো আজ শ্যামল শোভন—
কুঞ্জ বীথি দিয়া!

উজল রূপের ছটা,
কণ্ঠ বীণার ঘটা,
আজ দিয়েছ দেখা রাণী
মধু হৃদয় নিয়া!
শিউলি বনের সাকি,
তোমার অলক গন্ধে কানন—
হাসছে পুলক মাখি!
তোমার সুরের সাথে,
পিউ দোয়েলা মাতে,
হারা স্মৃতির রেশটি তোমার—
আজকে গেল ডাকি!

একটি চুমার মূল্য কি ?

—শ্রীরেণুভূষণ গাঙ্গুলি
—শ্রীঅরিন্দম বসু
—শ্রীপ্রণব রায়
—শ্রীশৈলেন ভট্টাচার্য

ফাল্গুন শেষ হয় হয়—এম্‌নি সময়।

মহানগরের ধুলো-ধোঁয়া-ধূসর পাষাণ আবরণ—বসন্ত-পরশে রঙ্গীন নয়,—বিগত প্রায় শীতের কুহেলি-কণায় অস্পষ্ট।

তবুও যেন প্রভাতের আকাশ হেসে ওঠে,—সোণার আলো মিলনোন্মুখ প্রিয়ার আঁখির আলোর মত ঝ'রে পড়ে। মেঘলা অস্পষ্ট আকাশেও যেমন রামধনু খেলে যায়......

শুধু এইটুকুতেই মন ওঠে না—কোথায় যেন মস্ত অভাব। মনে জাগে শুধু বন্ধন-মুক্তির ব্যাকুলতা—যেন কোন সুদূর পথে তার লক্ষ্য—তার যৌবনের অভিসার... বসন্তের মুক্ত হাসি সভ্যতার বন্ধনে যেখানে রুদ্ধ হয়ে ওঠেনা— প্রকৃতি প্রিয়ার বন্দনা গান যেখানে মিথ্যা হ'য়ে যায় না।

লক্ষ্যহীন?...হয়তো বা তাই—যেখানে গিয়ে গতি থম্‌কে থেমে পড়ে—সেই আমার স্থান—আমার বিবাগী মনের কুসুম-রত্ন-সিংহাসন।

সারা মনটাকে যেন বিভোর করে তোলে কোন রঙীণ নেশার স্বপ্ন......কোন অপরাজিতার অবগুণ্ঠণের অন্তরালে ফুটে ওঠে লুকোচুরীর চকিত চাউনি—সারা অন্তর দিয়ে যেন অনুভব করি—হয়তো চোখেও পড়ে—এম্‌নিই মনে হয়। ঐ হাসিটুকুই আজ স্পষ্ট করে লুকিয়ে দেখতে চাই—অনুভব করতে চাই রিক্ত অনুভূতি দিয়ে।

কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই—তার বেশী কিছু ধরা দেবার সাধ জাগে না। অক্ষুণ্ণ থাকুক রাণীর পরাজয় না-মানার মর্য্যাদা—তাতে দুঃখ নেই। কিন্তু পথ ভুলে একটিবার ফিরে চেয়ে দেখ্‌বে—একটি নিমেষ—সেই আমার আশা। উদ্বেলিত যৌবনের, উচ্ছল তরঙ্গের বুকে বুকে ভেসে যাক তার তরণী—উদ্‌ভ্রান্ত—সীমা হারা,—

আমি দূরে কূলে বসে থাকবো—অনন্ত প্রতীক্ষায়। বাঁশীর সুরে বাজিয়ে তুলব সাগরিকার বন্দনা গান। সেও শুধু হয়তো বা আনমনেই একবারটি ঝাঁপিয়ে পড়বে আমারই বুকের মাঝে—সারা জীবনে হয়তো বা সেই একবার......কিন্তু ঐ একটি মুহূর্ত্তেই আমিও তার ঘোম্‌টাটি অতর্কিতে খুলে ফেলে সেই নগ্ন বিবসনা রূপটুকু পরিপূর্ণ করে সারা দেহে উপভোগ করে নেবো।—হ্যাঁ গো, শুধু একবার—শুধু সেই।......

ইঞ্জিনের শব্দ, কাবুলি ওয়ালার গান, উড়েদের ঝগড়া আর হিন্দুস্থানী খোট্টাদের আলাপ সম্ভাষণ—এরিই ছত্রিশ রাগণীর মাঝখানে সহসা যেন স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়—বাইরের পানে চেয়ে দেখি......

জ্যোতি ডাকে তাস খেল্‌তে—অরুণ বলে না হয় দাবা—কি বলো, সময়টাতো কাটাতে হবে।

কিন্তু ওসব কিছুই যেন ভালো লাগে না—জানালার ধারে বসে চেয়ে থাকি—কোন দিগন্তের সুপ্ত বনান্ত রেখায়। শুধু মাঠের পর মাঠ—গাছ—পাথর—ওর কোথাও প্রাণ নেই,—আকাশটাতে পর্য্যন্ত বৈচিত্র্য খেলেনা।

শেষকালে ঐ গিরিডির পথে—একাই নেমে পড়লাম।

সম্পর্কও কিছু ছিল—তার ওপরও বেশী ছিল অনেকদিনের আন্তরিকতা—আমাদের সবাইর সঙ্গেই নিবিড় পরিচয়।

প্রভাতবাবু ছোট মাসীকে বিয়ে করেছিলেন। ওরা সানন্দেই অভ্যর্থনা করলেন।

প্রভাতবাবুর বড় ভাই মোহিতবাবু আমার হাত ধরে ভেতরের দিকে নিয়ে চল্লেন। অন্দরমহলের বড় হল্‌টাতে তখন মেয়েদের মজলিস্ চল্‌ছিল।

উনি আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন—এই ছাখো, তোমাদের রবি এসেছে—অনেকদিন বাদেই না?—সেই ছোট বেলায় কবে দেখিছি।

পাশের বাড়ীর কয়েকটি মেয়ে আড়চোখে আমায় দেখে নিয়ে তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে চলে গেলেন—তাদের সঙ্গে মুখে আনন্দের রেখা নিয়ে ছোট মাসিও চলে গেলেন।

দাঁড়িয়ে রইলেন শুধু মোহিতবাবুর স্ত্রী প্রতিভামাসি আর তাঁরই কিশোরী মেয়ে নীরা।

প্রতিভামাসিকে নত হয়ে প্রণাম করলাম—নীরার পানেও একবার কৌতুহল-দৃষ্টিতে চেয়ে নিলাম।

শ্যামবর্ণা নিটোল স্বাস্থ্যভরা অপরূপ কিশোরী—যেন ফুলে-ফুলে ভরা পুষ্পিতা লতা। কৈশোর শেষ বিদায় নেয় নি কিন্তু যৌবনের দীপ্তি সর্ব্বাঙ্গে এসে পড়েছে।

পরণে সাদা লালপেড়ে একখানি শাড়ী—গায়ে হাফ্-হাতা ছিটের ব্লাউস্। পল্লব-ঘন দু'টি বিশাল আঁখি—অধর কোণে স্মিত-হাসির ক্ষীণ্ রেখা।

সত্যি, দেখে যেন ভারি ভালো লাগলো এই মেয়েটিকে। নাই বা থাকলো আমার মানসী রাণীর দৃপ্ত মর্য্যাদা—নাই বা হ'লো সাগরিকার মত চির-চঞ্চল,—অপরাজিতার অমন রূপই কি সব?......

ঐ স্মিত লাবণ্যভরা স্নিগ্ধ মুখখানি—আধ-জাগন্ত উজ্জ্বল আঁখি ধারায় যৌবন স্বপ্ন—বসনের আবরণে দেহের পূর্ণ প্রকাশ—তুচ্ছ নয়,—এতেও পলক পড়ে না,—সত্যি, খুব সত্যি—

মোহিতবাবু বল্লেন—রবির বিশ্রামের বন্দোবস্ত করে দাও নীরা,—ওর জিনিষগুলোও গুছিয়ে রাখো।

সারা দেহমনেই যেন শ্রান্ত ছিলাম—বল্লাম—স্নান কর্ব্বো।

এবার নীরার কথাই কাণে এলো—একটি কথা কিন্তু কি মিষ্টি—ওতে যেন কত মোহ—বল্লে—আসুন কি সপ্রতিভ মেয়েটি—সমস্ত দেখিয়ে শুনিয়ে ঠিক করে চলে গেল।

পাশের ঘরে ছোট মাসির সঙ্গেও দেখা হ'ল—খুবই খুসী হলেন,—শুধু বল্লেন—আগে একটা খবর দিলেই পারতিস্ রবি?

সংক্ষেপেই জবাব দিলাম—সময় ছিল না মাসিমা—ভাবছিলাম বেনারস্ থেকে ফিরে এসে তারপর,—কিন্তু কি জানি কেন, আগেই চলে এলাম—সত্যি অনেকদিন তোমায় দেখিনি।

সামনে সুন্দর প্রশস্ত একটা রক্—আরও সাম্‌নে, প্রাচীরের ওধারটায় রাস্তা—তারপর সারি সারি শালের শ্রেণী,—একদিকটাতে ইউক্যালিপ্টাসের কয়েকটা সাদা মসৃণ গাছ।

একটা ডেক চেয়ারে চুপ করে বসে—হটাৎ যেন নীরার কথা শুনলাম—আমাদের বাড়ীর পাশেই ঐ যে উশ্রী—Hanging bridge এর দিকটায় বেড়াতে যাবেন রবিদা,—বাবা বল্লেন,—

সঙ্গে দশ বারো বছরের ছোট্ট ভাই—বেণু—সেও বল্লে—চলুন না, কেমন সুন্দর, দেখবেন এখন্।

কি যেন মনে হ'ল—উত্তর দিলাম—না, আজ থাক্—তোমরা যাও।

ওরা তিনজনে চলে গেল—আরও একটি ভাই—সে বেণুরও ছোট—আলো।

কয়েকদিন কেটে গেছে।

ওদের বাড়ীর সবাইর সঙ্গে আমার আলাপ যেন সহজ হ'য়ে পড়েছে—কেমন আপ্‌না আপ্‌নিই। নীরা আর ওর ভাইরা এখন আব্দারও সুরু করে—বেশ লাগে তখন।

সেদিন বেশ সকাল। আকাশে মেঘের গায়ে রবির রক্ত আভা লেগেছে।

শুধু আমি আর নীরা।

বেড়াবার পথে উশ্রীর ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছি।

সোণালী আলোর আভাষ নীচের স্বচ্ছ জলধারার বুক ছুঁয়ে ঝির্ ঝির্ করে বালির ওপর দিয়ে বইচে—ভারি সুন্দর।

ওপারে নীল পাহাড়টার ওপরেও উদয়ের স্পর্শ শোভা।

নীরা যেন হঠাৎ নেহাৎ আবদারের সুরেই বল্লে—ওপারে চলুন্‌না রবিদা ?

ব'ল্লাম—বেশ তো, কিন্তু নদী পার হ'বো কি করে—এখানটা বেশ চওড়া—অবিশ্যি জল হাঁঠুর কম, জুতো খুলে যাবে ?

কেন, ঐ যে ধারে পাথর দেখছেন্ না—এগুলো ফেলে বেশ সেতু করা যাবে—ভারি মজা হবে কিন্তু।

—তবে, খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ঐ যে খুব সরু জায়গাটা—ওখান টাতেই চলো—হয়তো সহজ হবে।

দুজনে এগিয়ে গেলাম!—জীবনের এক অপূর্ব্ব অভিনয়—ঐ কিশোরী মেয়েটি যেন আমার ক্ষণিক-যাত্রার স্বপ্ন-সঙ্গিনী—আমার কুড়ি বৎসর বয়সের যৌবন-সাধনা।

বড় বড় কয়েকখানা শিলা খণ্ড কুড়িয়ে নিয়ে কিছু দূর অন্তর ফেলে অপরূপ বিচ্ছিন্ন সেতু রচনা হ'ল।

কি স্বচ্ছ এই উশ্রীর জল—আর কি তীব্র তার স্রোত।

নিজেকে ঠিক করে নিয়ে প্রথমে আমিই পার হলাম—তার পর নীরার পালা।

সন্তপর্ণে পা ফেলে ও এগোতে সুরু করলে—যেন ভয়-চঞ্চল ওর চলাটুকু এক অপরূপ নৃত্য ভঙ্গিমা।

হঠাৎ—

অসাবধানে পা পিছ্‌লে নীরা জলে ছিট্‌কে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ওরই কণ্ঠের উচ্ছল কলহাসি—যেন একটা অপ্রত্যাশিত কৌতুকের ব্যাপার।

জল অবিশ্যি খুবই কম—এক হাঁটুও নয়—ওর শাড়ীর প্রান্তরেখা ও পায়ের সবুজ নাগ্রাই দুটি ভিজে গেল।

তাড়াতাড়ি নিটোল কোমল হাতখানি নিজের মুঠোর মধ্যে চেপে ওকে ওঠাতে সাহায্য করলাম।

সে পুলকস্পর্শে মুহূর্ত্তে যেন আমার সারা দেহে যৌবনের রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠ্‌লো। নীরার সারা দেহেও একবার চেয়ে নিলাম—

একরাশ ঝাঁকড়া চুলে ঢেকে যাওয়া ওর কাণের প্রান্ত দুটি অপরূপ লাল—এমনি একটা অতর্কিত ব্যাপার এবং দমকা চপল হাওয়ায় বুকের বসনটিও সহসা বিস্রস্ত!—তারি ফাঁকে স্ফুট প্রায় যৌবন-সোহাগের চিহ্ন দুটিও সুস্পষ্ট। ঐ বিব্রতা মেয়েটির যেন এদিকে কোন লক্ষ্যই ছিল না।

আমার সারা দেহ মনে যেন কেমন একটা উন্মাদনা—বুকের অন্তরালেও যেন উন্মুখ যৌবনের চিরন্তণ তৃষার ব্যাকুলতা।

মনে হয় ঐ রতি-পুষ্পিত দেহলতাকে যদি এই বুকের মাঝখানে চেপে ধরে একবার………

মুগ্ধ লুব্ধ দৃষ্টিতেই দেখছিলাম,—নীরা কখন ত্রস্তে বুকের বসন গুছিয়ে নিল। —মুখে লজ্জার রক্তিমাভা।

অকারণে অপাঙ্গে চেয়ে বল্লে—চলুন না রবিদা!

একটা নিঃশ্বাস ফেলে আমার উদ্গত কামনার বহ্নিকে রুদ্ধ করে বল্লাম—হ্যাঁ এসো।

নীরা আমার পানে চকিতে একবার চেয়ে নিলে—হয়তো সেই স্পষ্ট নিঃশ্বাসটির অর্থ টুকু সত্যিকরেই ও জানতে চায়।

আরও একটা দিন—সেদিন নীরার স্কুল ছুটি।

আমাদের ক্রীশ্চান-হিলে অভিযান।

ছোট খাটো একটী পাহাড়—অনেক দূর থেকে নীল মেঘ বলে মনে হয়।

ভোরের আলো ইউক্যালিপ্‌টাসের কোমল-কচি পল্লব প্রান্তে মুক্তার মালা পরিয়ে গেছে।

যাবার পথে দুজনে পাশাপাশি—উঁচু নীচু লাল কাঁকর ভরা পথ। নীরার মনের আনন্দ যেন দুটি পায়ের চঞ্চলতার মধ্যে বাঁধা পড়েছে।

বল্লাম—আস্তেই চলোনা নীরা—তুমি বরং গান গাও আমি শুনবো। নীরা কিছুই বল্লেনা কিন্তু তখনই সুরু করলে—বেশ মিষ্টি গলায়'—অপরূপ ছন্দে, সুরে—

ভোরের বেলা কখন এসে
পরশ করে গেছ হেসে।
আমার ঘরের দুয়ার ঠেলে,
কে সেই খবর দিল মেলে।

—কী সুন্দর গাও তুমি নীরা!

—হ্যাঁ, আপনি সবটাতেই ভারি ঠাট্টা করেন—যান।

—সত্যি, ঠাট্টা কক্ষণো নয়—খুব ভালো লাগে তোমায়।

নীরার মুখে এবার কথা ফুটলো না—হয়তো নিজেও তাই চমকে উঠে স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

হায়রে সর্ব্বগ্রাসী যৌবন······

অতর্কিতে দেহের কোন আকাঙ্খাটিকে প্রকাশ করে ফেলেছি, নিজের মনে যেন তা' খেয়ালই ছিল না।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি নীরা, রাগ কর্‌লে?

শুধু শুন্‌লাম—কেমন একটা কৃত্রিম ঝঙ্কার—যান্‌, আপনি বড় দুষ্টু।

পশ্চিম দিককার সহজ বাঁকা পথটাতেই পাহাড়ে ওঠা সুরু হ'ল—প্রায় দু'শো ফিটের ওপর হ'বে।

শিখরে গিয়ে নীরা বল্লে—কি সুন্দর দৃশ্য দেখুন—

দেখলাম—যতদুরে দৃষ্টি চলে—শুধু শালবনের শ্যাম-রেখা দিগন্ত-সীমার সঙ্গে মিশে গেছে—দূরে একটা দিকে কয়লার খাদ—তার উর্দ্ধমুখী চিম্‌নি—মাঝে মাঝে আরও অনেক পাহাড়—আর দূরে—অতিদূরে পরেশনাথের অস্পষ্ট চূড়া—বিরাট, বিপুল—

কাছেই উশ্রী নদীটিও যেন সরু রূপালি রেখা একটা।

নীরা লোহার একটা সুঁচালো টুক্‌রা দিয়ে পাষাণ ফলকে নিজের নামটী খোদাই করছিল। আশে পাশে আরও অনেকের অতীত স্মৃতি-লেখা—

নীরার শেষ হ'লে,—আমায় ডেকে বললে—আপনিও লিখুন না রবিদা?

—ওটা বুঝি এই জন্যই সঙ্গে করে নিয়ে এসেচো—আচ্ছা দাও।

—হ্যাঁ, নইলে কি দিয়ে লেখা হত—নিন্‌।

নীরা'র ওপরে নিজের নামটিও স্পষ্ট করে আঁকলুম—'রবি'। জিজ্ঞাসা করলাম—কেমন হ'ল নীরা—বেশ—না?

মুখে যেন চাপা হাসিও ফুট্‌লো একটু।

জানি নে যান্‌—

ওদের মুখে শুধু ঐ একটা কথাই—মনের আনন্দ-টুকু গোপন-রহস্যের ছায়াতেই যেন চাপা রাখতে ভালোবাসে—ঐ সলজ্জ মৃদু হাসি, ঐ নিমীলিত আঁখি,—ঐ অস্পষ্ট দুটি কথা—সবই যেন শুধু দুর্ব্বলতা।—ওতে ছলনাই আছে, চিরন্তন সত্যের মর্য্যাদা নেই। কিন্তু ঐ তো আমার আশা—ওর বেশী চিরদিনের প্রত্যাশা আর কিই বা আছে?

হয়তো দিনের পর দিন কত লোকই এখানে আসবে—পাশাপাশি এই দুটি নাম দেখে কত কিই না ভাববে—এরই স্মৃতিগন্ধে তাদের যৌবনের অপরূপ লীলা-মাধুরিমাও কি মুহূর্ত্তের জন্য জেগে উঠ্‌বে না?—কে জানে,—হয়তো উঠবে, হয় তো বা না।

আম-পেয়ারা গাছের পরিপাটী স্নিগ্ধ ছায়ায় দুজনে বসেছিলাম।—একধারে একটু দূরে বেণু ও আলো 'ক্যারম' বোর্ড নিয়ে মেতে আছে।

হয়তো তিন চার হাতের ভেতরেই হবে—বড় ইঁদারা-টার দিকে মুখ করে নীরা চেয়ারের ওপর—আর আমি তারই একটু দূরে······

সামনেই কালো ষ্ট্যাণ্ডের ওপর কোডাকৃটি—দুটো স্নাপসট্‌ শেষ······

তারপর?

বললাম—সত্যি নীরা, আমার যৌবনের স্মৃতির খাতায় আমাদেরই নাম লিখে যেতে চাই পাশাপাশি। তোমার মুখের ঐ একটি কথাও যেন আমার ভালো লাগ্‌চে—আমার 'ডাইরি'র পাতায় ওরই ছাপ আমার যাত্রাপথের সম্বল হ'য়ে রইবে—চিরকাল! হয় তো বা চিরকাল,—শুভ্র নীহারের আবরণ ওকে ওর স্বচ্ছতা থেকে অস্পষ্ট করতে পার্ব্বে না—একটুও না। সত্যি নীরা, আমার অন্তরাকাশে নীহারের অন্তরালেও আমি তোমার স্মিত-মুখখানিকে পেতে চাই—উজ্জ্বল, উচ্ছল······

জীবনেরও পরিবর্ত্তন হয়—অভ্যাস্‌ তো হয়ই—সে তো তুচ্ছ। কখনো বলে—তুমি—কখনো বা আপনি।

কেমন যেন অস্পষ্ট সুরে জিজ্ঞাসা করলে—তুমি ডাইরি লেখো রবিদা?

—হ্যাঁ, লিখি—

আনন্দ যেন প্রবল উত্তেজনায় চোখে মুখে দীপ্তি ছড়িয়ে যায়।

নীরা কি দেখছে,?—আমার চশমার কাচের অন্তরালে কি তারই মুক্ত প্রকাশটুকু ?

তারপরই যেন কেমন সহজ হয়ে গেল—শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—এখানকার কথা কি লিখেছেন—আর আমাদের কথা ?—আমরা কত জ্বালাতন করেছি—হয় তো এখানকার সমস্ত দুঃখ কষ্ট—না ?—আচ্ছা আমায় দেখাবেন একটিবার ? আমার কথা হয় তো কতদিন আপনাকে বিরক্ত করেছে ?

ও যেন ছল করে সব শুনে নিতে চায়—বল্লুম—আজ থাক্—আর একদিন তোমায় দেখাবো— শেষ কর্ব্বার ভার থাকবে তখন তোমার।

নীরা বললে—সে কথা থাক্—আমি আজই দেখতে চাই,—তুমি না দেখাও আমি চুরি করে দেখবো—স্যুট্‌কেসের চাবি তো আমার কাছেই।

কেমন যেন মনে হ'ল—আমি যেন আমার অধিকারের উপর জুলুম কর্‌ছি—আমার লোভ যেন মিথ্যাকে নিয়ে বেড়ে চলেছে।

মিথ্যা কথা—নীরার মাঝে আমার মানসীকে আমি কোনদিনই দেখতে পাইনি—সব ভুল—কিন্তু কি জান্‌তে চায় এই সপ্রতিভ মেয়েটি ? রহস্য ?—ভালোবাসা—না শুধু বন্ধুত্ব ?—কতটুকু—আর কি তার সে দাবী ?

নীরা ধীরে উঠে গেল।

হাতের বইখানি খুলে ধরলাম,—চোখে পড়লো—যেন একথটাই আমার জানার দরকার ছিল তখন। Between men and women there is no friend-ship possible. There is passion, enmity, worship love, but no friend-ship.—হয়তো খুবই সত্যি—কিন্তু জীবনে ওকেতো আমি পাবো না—তবে কি চাই ওর কাছে ? চুপ করে রইলুম—কিছুই যেন ভালো লাগলো না ভাবতে।

সন্ধ্যার পর প্রতিভামাসি বল্লেন—নীরা এবার পরীক্ষা দিচ্ছে—কি ও করে কে জানে—তুই একবার ওকে দেখিস তো রবি।

ওর পড়ার দিকে আর কেউ তো লক্ষ্যই করে না—কোনদিনই না।

কথাটা নীরার কাণেও গেল।

প্রথমটায় আমি যেন চম্‌কে উঠেছিলাম—তারপর বল্লাম—আচ্ছা……দেখবো' খন।

সাড়ে ন'টার ভেতরেই খাওয়া দাওয়া সবারই শেষ হ'য়ে গেছে।

বাকী কাজ কর্ম্ম ও…।

প্রতিভামাসি ও মোহিত বাবু ও-পাশের ঘরটাতে কথাবার্ত্তা কইছেন—তাদের ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথাগুলো মাঝে মাঝে আমার কাণে এসেও বাজছে। একবারে পশ্চিমের ঘরটাতে ছোটমাসিও ঘুমুতে গেছেন—এতক্ষণ প্রভাত বাবুও হল ঘরে বসে আমার সঙ্গে আলাপ কচ্ছিলেন—তিনিও উঠে গেলেন।

আমার নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল এই হল ঘরেই। আমার পেছনের ঘরটা মেয়েদের ড্রেসিং রুম। তার পরের খানায় নীরা ও বেণু থাকে—তাদের পড়া শোনাও ওখানে চলে। আলো নেহাত ছোট বলে এখনো মা-বাবার কাছেই ঘুমোয়।

বসে বসে ভালো লাগছিল না—ঘুম তো নয়ই। ডেক চেয়ারটি আশ্রয় করে 'Oscar Wilde' খানায় মন সংযোগ করলাম। নীরাদের ঘর থেকে বেণুর পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছিল বেশ স্পষ্টই। নীরার কথা যেন অনেকটা ধীর।

প্রতিভামাসি ডেকে বল্লেন—তোমার বিছানা ঠিক আছে রবি ?

বল্লুম—হ্যাঁ।

হল ঘরের বড় বাতিটা যেন ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছিল—তবুও পড়া সুরু করলাম।

হয়তো মিনিট দশেক কেটেছিল—অক্ষর গুলোও অস্পষ্ট হয়ে গেল কেমন।

—যেন একটুখানি পরে প্রদীপের ঐ ক্ষীণ শিখাটিও স্তিমিত হয়ে যাবে—তারপরই শুধু ধূসর অন্ধকার—আর তারই মাঝে বিনিদ্র ছুটি আঁখি।

দেখলাম্ পর্দার ফাঁক দিয়ে নীরাদের ঘরের আলোর চমকটুকুও এ ঘরে এসে পড়েছে।

আস্তে উঠে দাঁড়ালাম—হাতের বইখানির ওপরও বেশ লোভ—কি ভেবে অগত্যা নীরাদের ঘরেই র'ওনা হ'লাম।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি নীরা আর কতক্ষণ পড়বে?—আমিও তোমাদের ঘরে এলুম পড়তে-হল ঘরের বাতিটা নিবে গেছে।

ওরা খাটের ওপর বসেই পড়ছিল। একটা ধারে চেয়ারের ওপরে বড় টেবিল্ ল্যাম্পটি—ঘরখানি বেশই উজ্জ্বল।

নীরা একধারে সরে বসে আমার জন্য স্থান করে দিলে—বল্লে—সাড়ে দশটা অব্ধি পড়বো হয় তো।

বেণু ব'লে উঠ্‌লে—না ছোড়্দি, তারও বেশী।

এক ধারে বসে আবার পড়া সুরু করলাম—ঘড়ীতে দশটা বাজতে তখনও পনেরো মিনিট বাকী।

সবাই যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

মনে নেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—কেমন যেন একটা হাল্কা স্বপ্ন,—কেমন একটা কোমল দেহ-পল্লবের স্নিগ্ধ অনুভূতি—নিদ্রা যেন সম্পূর্ণ বিস্মৃতি নয়—অনেকটা সজাগ।

ঘড়ীতে বারোটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই হটাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল—কেমন অদ্ভুত একটা আকস্মিক চমক!—

এ কি কোথায়? ঐ তো বেণু—ঠিক যে আমারই পাশে...এ কি, নীরা!—বিস্রস্ত বসন—হেথা হোথা বিক্ষিপ্ত বই, পেন্‌সিল্, দোয়াত কলম—

আলোটা তেম্নিই জলছে—তেম্নি উজ্জ্বল—হয়তো বা তার চেয়েও বেশী।

মুহূর্ত্তে নীরাও ত্রস্তে উঠে বস্‌লো—তারপর একবার ছুটি চোখেই, সজোরে হাত বুলিয়ে নিলে। হয়তো সেও ভাবতে চায় যেন সব স্বপ্ন।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম—মনে হ'ল কেমন একটা বিশ্রি ব্যাপার ঘটে গেছে। যেন মুহূর্ত্তের কি একটা মস্ত অসোয়াস্তি!......

—ও ভাব্‌বে কি?—ছিঃ!

কিন্তু সহসাই একটা ঘটনা ঘটে গেল—একবার ঘড়িটার দিকে—একবার আমার দিকে তারপরই আলোর দিকে চেয়ে নীরা তাড়াতাড়ি বাতিটা নিবিয়ে দিলে।

ছুটি শান্ত চোখে অতবড় বিস্ময়, অতখানি চমক—আমার কল্পনাতেও যেন কোনদিন ছিল না। হয়তো ওর মনে ভয়—পাছে কেউ দেখে ফেলে। সত্যিই কি তাই?

কেমন থমকে দাঁড়ালাম—ইচ্ছে হ'ল ফিরে যাই—এখুনি—এই মুহূর্ত্তে। কিন্তু তখুনি কি একটা আশাও চকিতে মনে জাগ্‌লো—না, একটু,—আর একটু থাকি—কি আর হ'বে এমন!

অন্ধকার যেন হাতেও ঠেকে—এম্নিই জমাট।

আস্তে সরে ওর কাছে গিয়ে বস্‌লাম—চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম—আমায় ডেকে দাওনি কেন নীরা?

নীরার হাতখানিও নিজের হাতের ওপর তুলে নিলাম। হয়তো একটু চাপও......

শুনলাম—তেম্নি চাপা গলাতে নীরাও বল্লে—

আমিও যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—কি ক'রে ডাকবো।

—ভারি বিশ্রি লাগ্‌ছে তোমার না?

—না।

—না, কিন্তু কেউ যদি এখন দেখে ফেলে—

—কেউ তো জেগে নেই—এম্নি আঁধারে—

—ও।

কেমন যেন মনে হতে লাগলো। সারা দেহমন যেন একবারে আড়ষ্ট।

কেমন নিঝ্‌ঝুম......বাইরেও কি বাতাস নেই—গাছের পাতা কি একটুও নড়ে না?

একটা সূঁচ পড়লেও যেন কাণে বাজে এসে। বুকের ভেতর কিসের ও তোল-পাড়—কি বিরাট এ সর্ব্বনাশার নেশা !……

তবুও মনে হতে লাগলো যেন এই নিস্তব্ধ অন্ধকারের ভেতরই কিসের একটা ইঙ্গিত বিদ্যুতের আলোর মতই মাঝে মাঝে চমকে উঠছে—কি তীব্র তার স্পর্শ-শিহরণ।

কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে ওর হাতখানি তুলে নিজের বুকের ওপর তুলে ধরলাম—আমার দুটি হাতের বেষ্টনীর ভেতরে ওর লতায়মান দেহটিও কখন বাঁধা পড়লো—যেন খুবই আপনা আপনি।……

কি আড়ষ্ট আমার এই দেহটি—এ যেন আমার নয়—একটা পা যেন অনবরতই কাঁপছে—জোর করেও যেন ওকে শান্ত করতে পারছিনা। আমার ভেতরে এ দুর্ব্বলতা এতদিন কি করে লুকিয়ে ছিল ?

মনে হ'ল—নীরাও যেন অবশ—নিঃস্পন্দ।

কিছুই চোখে পড়ে না কিন্তু সবই যেন অনুভব করতে পাচ্ছি—সেই বক্ষ, সেই ললাট, সেই চিবুক——

কি কোমল কি নিটোল ওর সারা অঙ্গটি !

আস্তে আস্তে ওর মুখখানি তুলে ধরলাম—মনে হল হয়তো চোখ দুটি বুজে গেছে।

কি মোহভরা ঐ দুটি অধর—কি মাদকতা তার স্পর্শে।

ঝাকড়া চুলের গোছাটি নাড়া চাড়া করতে করতে জিজ্ঞাসা করলাম—কি ভাবছো নীরা ?—একটি কথাও কি কইবে না—শুধু নিতে নয়, আমি যে দিতেও চাই—নেবে না ?……এই তো কত কাছে, নেবে না—একটি-বারও কি ?

নীরা ধীরে ধীরে ওর মুখখানি যেন আপনা থেকেই তুলে আনলে। কি ব্যাকুল ঐ নিশ্বাসের স্পর্শটি—কেমন দ্রুত—কেমন উষ্ণ।

তারপরই একটি……

বল্লাম—শুধু অতটুকু নয় নীরা—আরও নিবিড়—আরও অস্থির।

নীরার উচ্ছলতা যেন আমায় ছেয়ে ফেল্লে—যতটুকু চেয়ে ছিলাম—তার চেয়েও যেন বেশী—অনেক, অনেক—

বিস্রস্ত ঐ দেহটি যেন আজ স্পষ্ট করে অনুভব করছি—বুকের প্রত্যেক স্পন্দনটি অবধি।

কত কাছে তবু যেন তৃপ্তি নেই—সাহস যেন বেড়েই চলে। চুমুতেও সাধ মেটে না—বল্লাম, তোমারি পালা, লজ্জা কি ? আরও কাছে চাই—আরও নিবিড় করে।

বেণু তেমনিই ঘুমিয়ে আছে—কি গভীর ওর নিঃশ্বাসটি।

সহসা কেমন একটা শব্দ—হয়তো বা পাশের ঘরেই।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম—নীরাও যেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো।

আস্তে বল্লে—এখন যাও !

—যাচ্ছি, কিন্তু তুমি যেয়ো আমার ঘরে—সত্যি যাবে ?

—হ্যাঁ,

—মনে থাকে যেন—আমি তোমার আশায় থাকবো।

খুব সন্তর্পণে বেরিয়ে গেলাম।

কে জানে কিসের শব্দ—কিন্তু মনে ভয় জাগলো—খুব !

বিছানায় লুটিয়ে পড়লাম—কিন্তু কি অসহ্য গরম—সারা দেহে যেন রক্তের বিপ্লব।

ঘড়িটা শুধু টিক টিক শব্দ করছিল। একটাও বেজে গেল। কি দুঃসহ প্রতীক্ষা—মনে হ'ল—যেন ঘন্টার পর ঘন্টা! হয় তো নীরা ঘুমিয়ে পড়েছে—হয় তো বা অনুতাপ,—দেহ মনের অসহনীয় জ্বালা—কে জানে!

অতিষ্ট হয়ে উঠলাম—

তারপর উঠে পা টিপে টিপে আবার……যৌবনের সে কি উত্তেজনা—সে কি আকুল অভিসার!

খুব আস্তে ওর মাথায় হাত দিলুম—ডাকলুম—

—নীরা, ঘুমিয়েছো ?

শুধু একটী কথা—অতি ক্ষীণ—অতিরুদ্ধ—কান্নায় ওর গলা যেন ভরে গেছে—

বল্লে—না!

—একটিবার—তখন বলেছিলে—ভুলে গেছো বুঝি ?

—না, না,—সব মিছে কথা—আপনি যান—আমি পার্ব্বো না।

পৃথিবী কি টল্‌ছে ?—কোথাও কি ভূমিকম্প ?—না, না, ও নীরা নয়—আর কেউ !

ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কিই বা উপায় তখন।

তারপর ?—তারপর—আমি যেন অন্ধ—বধির—পঙ্গু…

প্রভাতের আলোয় নিজের দিকে চাইতেও যেন ভয়—কি বীভৎস সেই রজনীর দৃশ্য—কি দুর্বিসহ সেই লজ্জা।

প্রতিভামাসি জাগিয়ে দিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল।—কিন্তু আজ যেন সাহস করে ঐ এক ফোঁটা বেণুর পানে চাইতেও আর সাহস হ'ল না—তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলাম।

সারাটা সকালবেলা ঐ Hanging bridge এর নীচে উস্ত্রীর ধারে বসে—সিগারেটের পর সিগারেট—আর কিছু নয়। হাঁটতে গেলেও যেন দুটি পা একই সঙ্গে অবশ হ'য়ে যায়। হায়রে, আজ নীরার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াবো কি করে ?

বাসায় ফিরলাম—তখন এগারোটা।

প্রতিভামাসি ও ছোটমাসি দুজনেই জিজ্ঞাসা করলেন—ঠিক একই সঙ্গে। বললুম—দূর পাহাড়ে গিয়েছিলাম—অনেকটা দূর কি না !

কথার জড়তাটুকু নিজের কাণে গিয়েও ঠেকে।

ছোটমাসি বল্লেন—ওরা সব খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে গেছেন—আমরাই শুধু বসে আছি—এদিকে তুইও নেই—নীরাও নেই।

ঐ একটি কথাই যেন বিদ্যুতের শিহরণ—সারা দেহের রক্তে যেন জোয়ার বয়ে গেল।

হঠাৎ রুমালখানি বার করে মুখখানি মুছে নিলাম—খুবই অকারণে।—মুখে চোখের ঐ চমকটুকু ওদের চোখে ধরা পড়ে নাই তো ?

নীরা গেছে ঘোষ সাহেবের বাড়ীতে।—'ডলি' লিখে পাঠিয়েছে—নীরা আজ এবেলা যাবে না আমাদের এখানেই খাবে।—

ছোটমাসির মুখে একথা শুনে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

কিন্তু একটু পরেই ছোট মাসি নিরালায় জিজ্ঞাসা করলেন—নীরার কি হয়েছে—জানিস রবি ?—

এর জবাব দেবার মত শক্তি আমার কোথায়—অস্ফুট কণ্ঠে বল্লাম—কই জানিনা ত ? ভাবলাম—আজই ফিরে যাই—আমার সামনে নীরা হয়তো আর বা'র হবে না—কথাও হয়তো নয়। সেই ভালো—দুঃখ আমার কিছুই নেই—, অভিমানও নয়।—আমার প্রিয়ার একটা নিশির অভিসার আমার বুকে চিরদিন জেগে থাকবে—উজ্জ্বল—অম্লান, —আমার অপরাজিতা সাগরিকার সেই পরিচয়টুকুই যথেষ্ঠ।

বিকেলে ছোটমাসিকে জানলাম—কাল পর্শু'র ভেতরেই আমি চলে যাবো—বেনারস্ না গেলেই এখন নয়। প্রতিভামাসিকেও ডেকে তাই বল্লাম।

ওরা প্রথমে আপত্তি করলেন—কিন্তু আমার প্রয়োজন-টাকে খণ্ডাতে পারলেন না। অগত্যা বল্লেন—যেয়ো না হয়।

ঘরে বসে থাকতেও আর ভালো লাগছিলো না—বাইরেও নয়। তবুও বেরিয়ে পড়লাম—ঐ উস্ত্রীরই ধারে।

আজ যেন হাতের সিগারেটটাই সব চেয়ে বড় প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একটা পাথরের ওপর একাকী বসেছিলাম 'ক্রীশ্চান হিলের' অন্তরালে গোধুলির রাঙা-রবি ঢাকা পড়ে গেছে—দলে দলে ছেলে মেয়েরা বেড়াতে বেরিয়েছে,—সবই দেখ্‌ছি কিন্তু কেমন যেন শূন্য—কেমন যেন ভাসা ভাসা। আমার চোখের সাম্নে যেন আজ সবই মিথ্যা।

হটাৎ কিসের স্পর্শে চম্‌কে উঠলাম—চেয়ে দেখি পেছনেই নীরা—আরও খানিকটা দূরে ওরই সহপাঠী বন্ধু ডলি।

এই একটা মুহূর্ত্তে সারা মুখখানি বিবর্ণ হয়ে গেছে এমনিই মনে হ'ল।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই মেয়েদের মন,—একটা স্বচ্ছ আয়না—যতক্ষণ সামনে কিছু থাকে তার ছাপও ঠিক ততক্ষণই পড়ে—তার বেশী নয় কিছু—একটুও না।

কেমন সপ্রতিভ—যেন ওর কোথাও কোন সঙ্কোচ নেই

কাল রাতে আমি যেন একটা স্বপ্নই শুধু দেখেছি—আর কিছু নয়। হায়রে, তাও যদি সত্যিই করেই ভাবতে পারতাম।

নীরা বল্লে—আপনার পণ্ড যাওয়া হতে পারে না—কক্ষনো না। ওকি, আপনার মুখ চোখ যে শুকিয়ে গেছে—যান আপনি ভারি বোকা—শুধু শুধুই এত বড় হয়েছেন—

তারপই ওর গলা যেন কেমন অস্পষ্ট হয়ে গেল—বল্লে, কাল রাত্তিরে আমায় ঐ কথায় বুঝি আপনি রাগ করেছেন্—আমি বুঝি ইচ্ছে করে বলেছি ?—আমার নিজের দিকটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল—আমি যে মেয়ে—আপনার সাধ মেটাতে আমারই কি আকাঙ্ক্ষা কম—কিন্তু তারই পরিণামে—যদি—যদি—না, আপনি কিছু বোঝেন্ না—থাকগে।—এই 'ডলি' আয় না রবিদার সঙ্গে তোকে আলাপ করিয়ে দিই—ইনিও তোর মত বড্ড লাজুক—বেশ্ মিলবে' খন—আয় না।

আবার নিজেকেও ভুলে যেতে হ'ল—নীরা কি যাদু জানে ?

আনমনে কত কিই না ভাবতে যাই কিন্তু ওর একটি কথায় সব ঘুলিয়ে যায়। ও যেন অন্তর্যামী—আমার মনের সব কথাই যেন বুঝতে পারে।

ওদের ওখানে আরও সাতদিন ছিলাম।—

ফেরবার দিন নীরাকে জিজ্ঞাসা করলাম—আবার কতদিন পরে দেখা হবে জানি না,—তুমি আমাকে মনে রাখবে তো ?

নীরা উদাস ছল ছল চোখে চেয়ে রইলো, জবাব দিলে না সে কথার।

হয়তো ওর বলার মতো কিছু নেই, হয়তো বা এতো কথা আছে যা প্রকাশ কোরতেও পারে না।

ওকে যেন কিছুতেই চিনতে পারা যায় না। সাগরের মতো গভীর রহস্যের আবরণ দিয়ে নিজেকে ঢেকে রেখেছে। যখনই ভাবি নাগাল পেয়েছি ওর মনের, তখনই সে দূরে চলে যায়।

এবারে তাই পালিয়ে আসবার সময় কৌতুহল এবং আগ্রহটাকে সেখানেই ফেলে রেখে অনুদ্বিগ্ন মনেই সবার কাছে বিদায় চেয়ে নিলাম।

নীরা বোললে—একবারটী দাঁড়াও !

বিস্মিত হোয়ে ফিরে তাকালাম।

নীরা এগিয়ে এসে আস্তে আস্তে কাঁপা গলায় জানালে—রাতের সেই একটী মুহূর্ত্তের স্মৃতিই আমার চিরজীবনের একমাত্র পাথেয় হোয়ে রইলো একথাটা তুমি শুনে যাও আর বিশ্বাস রেখো।

কি স্নিগ্ধ ওর হাতের স্পর্শ টি !—আমারই পায়ের কাছে ঐ নমিতা মেয়েটির পানে-চেয়ে অতি অলক্ষ্যেই যেন একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল।

আরও অনেক কথাই সে বলতে চেয়েছিলো হয়তো ! তাকে সন্দেহ করবার বা তার মনের ইঙ্গিত না বোঝবার আর কিছুই ছিল না।

আমার মনে আজ কোন ক্ষোভই আর নেই।—আমি যে জয় করে এসেছি—অপমান করে নয়।

তারপর ?

তারপর আবার যাত্রা সুরু হোল ! কে জানে এর শেষ কোথায় !—নীহারের আবরণ যদি শুধু ব্যথারই সৃষ্টি করে—তার স্মৃতির মর্য্যাদা আমার কাছে ক্ষুণ্ণ কোন দিনই হবে না—আমার জীবনের চলবার পথে এই কথাটাই তাকে স্পষ্ট করে বলে এসেছি।

—:⊙:—

বাংলা ভাষায় দ্বিত্বের প্রভাব

—শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীতে যত ভাষা আছে প্রত্যেকের কিছু না কিছু বিশেষত্ব আছে, যাহা ঐ ভাষাগুলির হয় স্বাভাবিক অলঙ্কার না হয় দুষ্ট অলঙ্কার। আমাদের বাংলা ভাষার এইরূপ একটু বিশেষত্ব এই 'দ্বিত্ব'। এই দ্বিত্ব আমাদের ভাষার এক বিচিত্র সম্পদ দান করিয়াছে, দ্বিত্ব বাংলা ভাষাকে সজীব ও স্ফুর্ত্ত রাখিবার অনেক সহায়তা করিয়াছে, আমাদের ভাষায় ইহার প্রভাব এত ব্যাপক যে অতি নিরক্ষর ব্যক্তির কথায়ও ইহা টের পাওয়া যায়।

বাংলায় দ্বিত্বের 'ছড়াছড়ি' অন্য দেশের চেয়ে বেশী, তার বিজ্ঞান সম্মত কারণ হতেছে আবহাওয়ার গুণ। অত্যধিক গরমের জন্য এখানে 'জিনিষ টিনিষ' স্বভাবের নিয়মে পাকা হোতে না দিয়ে কাঁচা অবস্থাতেই "ফুকো" দিয়ে নিতে হয়।—রাখলে পচে যাবার সম্ভাবনাটাই বেশী। হয়তো সেই জন্যই 'অকাল পক্কতা' আমাদের জাতের বিশেষত্ব হোয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া মাঝে মাঝে মলয় হাওয়াও 'ফুরফুর' করে এসে প্রাণ 'আনচান' করে দেয়। কাজেই যৌবনত্বের অনেক আগে—বাঙালী ছেলেমেয়েরা পরস্পর সারি গেঁথে, 'দুয়ে দুয়ে', ঘরের কোণ খুঁজে নেন—বাইরের বাস্তব জগতের আর কোনো ঝড় ঝাপটারই তোয়াক্কা রাখেন না। তা নইলে ছ মাসের শিশুর তো বটেই, শিশু জন্মাবার ছ মাস আগেও জোড়া গেঁথে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়ার নিয়ম সারা পৃথিবীতে আর কোথাও তুলনা মিলবে কিনা জানি না।

মৌখিক ভাষায় এই দ্বিত্বের যেরূপ ছড়াছড়ি সাহিত্যের ভাষায় ও তাহার ব্যবহার বড় অল্প নহে। যে কোন বাংলা বইএর যে কোন পৃষ্ঠা উল্টাইলেই দ্বিত্বযুক্ত শব্দগুলি চোখের উপর ফুটিয়া উঠে। গদ্য অপেক্ষা কবিতায় ইহার প্রয়োগ বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরগুপ্ত, হেমচন্দ্র প্রভৃতি পয়ার ত্রিপদী প্রিয় প্রাচীন কবিদের কবিতায় দ্বিত্বের পরিমাণ অধিক। মাধুর্য্য ও মিষ্টতার জন্য সকল কবিকেই দ্বিত্বের আশ্রয় লইতে হয়। কবিতায় ইহার এই সমাদরের জন্য বেশ বোঝা যায় যে দ্বিত্বের মাধুর্য্য আছে, দ্বিত্বের গৌরব আছে।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে, শত শত প্রভৃতি দ্বিত্ব ব্যবহার ব্যাকরণের নিয়মে সাধিত হইয়াছে, এইজন্য সাধু ভাষায় ইহাদের প্রয়োগ পণ্ডিতগণ না করিয়া থাকিতে পারেন না, কিন্তু যেইমাত্র 'ছলছল্' 'কল্‌কল্' প্রভৃতি ব্যকরণ বহির্ভূত শব্দ পাইলেন, অমনি তাঁহারা রায় দিলেন ওসব কথা আর সাধুভাষায় আসন পাবে না‥ …তাঁহারা আসন না দিন, বাংলা ভাষাকে সজীব ও প্রাণবান্ করিবার জন্য একদল লেখক চল্‌তি ভাষাকে গড়িয়া পিটিয়া সাহিত্যের ভাষা করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন…আজ তাঁরা জয়যুক্ত। ইঁহাদের কৃপায় শীতে কন্‌কন্ ছিপ্‌ছিপে রোগা প্রভৃতি অব্যাকরণ ঘটিত শব্দগুলি সাহিত্যে প্রবেশলাভ করিয়াছে। ইহাতে বাংলা ভাষার কী অগৌরব হইতেছে বুঝিনা!…সাহিত্য প্রাণের জিনিষ, যে শব্দ লইয়া আমাদের নিত্য কারবার……তাদের ছাড়িয়া আমরা চলি কি করে? তাদের ছাড়িলে সাহিত্যে প্রাণশক্তির অভাব লক্ষিত হইবে।

'দ্বিত্ব' বাংলা ভাষায় কত রকমে, কত শব্দে প্রযুক্ত হইয়াছে কত প্রকার অর্থ প্রকাশ করিতেছে……কত নূতন নূতন শব্দ সৃষ্টি করিয়া বাংলা ভাষায় শব্দ সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি করিতেছে। কত বিচিত্র জটিল ভাব রাশির জ্ঞাপক হইয়া বাংলা ভাষাকে বিশ্ব জগতের সমস্ত ব্যাপার সমূহ লইয়া আলোচনা করিতে শক্তি দিতেছে—তাহা আমরা সাহিত্যে, মৌখিক ভাষায় গদ্যে ও কবিতায় নিয়ত দেখিলেও আজ একত্র করিয়া আপনাদের কাছে ধরিব।……

প্রত্যেকার্থে :—

ঘরে ঘরে হাহাকার
বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করা
দেশে দেশে বেড়ান
পদে পদে বিপদ
পায়ে পায়ে ফেরা
হাঁটি হাঁটি পা পা

জিজ্ঞাসা করা গেল এ জিনিসগুলি কত করে ?

—পয়সা পয়সা

ইহা ডজন ডজন বা বাণ্ডিল বাণ্ডিল বিক্রয় হয়।
হাতে হাতে চালিয়ে দেওয়া—
স্ব স্ব গৃহে গমন—
(চলতি ভাষায়) যার যার বাড়ী চলে গেল।

ইত্যাদি—

অনেকার্থে :—

হাঁড়ি হাঁড়ি খাবার
পিপা পিপা মদ
থান থান মোহর
দিস্তা দিস্তা কাগজ
বস্তা বস্তা কাপড়
ঘড়া ঘড়া জল
গাদা গাদা মাটী

অনেক অনেক গণ্য মান্য লোক সভায় ছিলেন।
আপনার চরণে কোটী কোটী নমস্কার
লাখে লাখে হাজারে হাজারে সৈন্য
শত শত সহস্র সহস্র লোক—

সমষ্টি-অর্থে :—

থোলো থোলো আঙুর। থরে থরে টাকা।

বিভাগার্থে :—

খণ্ড খণ্ড করে কাটা, টুকরো টুকরা করিয়া ফেলা।
ফালি ফালি কুমড়া—

বিশেষণার্থে :—

বড় বড় চোখ,
কোঁকড়া কোঁকড়া চুল,
লম্বা লম্বা ঝাউগাছ
বেঁটে বেঁটে লোক—
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জানলা
লাল লাল ফুল

কেবল বহুবচনের বিশেষণে দ্বিত্বের প্রয়োগ হয়।

পরম্পরার্থে :—

যোদ্ধায় যোদ্ধায় যুদ্ধ
গাড়ীতে গাড়ীতে সংঘর্ষ
গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেষি
চোরে চোরে মাসতুত ভাই
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই—
শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি

নির্দেশার্থে :—

কে কে যাইবে
যে যে যাইবে চল।
যা যা ঘটিয়াছে ঠিক্ ঠিক্ বল।
কি কি জিনিস ?

অত্যন্ত অভিলাষার্থে :—

আগুনের মত খাই খাই করিতেছে
বলি বলি বলা হ'ল না
ধরি ধরি করি ধরিতে না পারি
ত্রাহি ত্রাহি রব।

ব্যস্ততা বা অধৈর্য্যার্থে :—

'সখি আমায় ধর ধর'
মার মার কাট কাট
চল চল, বল বল (মিনতি)
এস এস, বস বস (মিনতি)
যাও যাও (বিরক্তি) খাও খাও।

ইয়া প্রত্যয়ান্ত ধাতুতে :—

কাঁদিয়া কাঁদিয়া
পড়িয়া পড়িয়া পাগল।
হেসে হেসে খুন

শৃঙ্খলা বিন্যাসে :—

সারি সারি দাঁড়াও
একে একে চল
পর পর দাঁড়াল
দুজন দুজন করিয়া
পশ্চাৎ পশ্চাৎ এস
আগে চল আগে চল ভাই—

ক্রিয়ার বিশেষণে :—

ধীরে ধীরে চল
আস্তে আস্তে বল
জোরে জোরে বল
চুপি চুপি পালান

আনির্দ্দেশার্থে :—

কোন কোন লোক
কেহ কেহ বলেন—

প্রবণতার্থে :—

বাড়ীটা পড় পড় হ'য়েছে
পৃথিবীটা টল মল করছে

ঈষদার্থে বিশেষণে :—

'কচি কচি গালভরা খিল্ খিল্ হাসি'
হাসি হাসি মুখ
মুখখানা ভার ভার
ভাঙা ভাঙা গলা
গরম গরম চা
কড়া কড়া জবাব।

ইতে প্রত্যয়ান্ত ধাতু :—

সে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।
গান গাহিতে গাহিতে
ডুবিতে ডুবিতে

হর্ষ, বিষাদ, বিস্ময় ইত্যাদি ভাবসূচক শব্দ…

হায় হায়!	ছি ছি	
বেশ বেশ!	ধিক্ ধিক্	
সাবাস্ সাবাস্!	ঠিক্ ঠিক্	
বটে বটে…হ্যাঁ হ্যাঁ।	না না।	

প্রত্যেকার্থে :—

স্থানবাচক	**কালবাচক**
বনে বনে	দিন দিন
পর্ব্বতে পর্ব্বতে	বছর বছর
ফাঁকে ফাঁকে	হপ্তায় হপ্তায়

এইত গেল সাধু ভাষার অন্তর্গত অর্থযুক্ত শব্দে দ্বিত্বের প্রয়োগ। আর এক প্রকারের শব্দ আছে যে গুলি প্রথমে অর্থহীন ছিল, কিন্তু ব্যবহারে চল্‌তি হইয়া গিয়াছে সে গুলি ধ্বনি-সূচক শব্দ যেমন গুরু গুরু কামান গর্জ্জন…। বৃক্ষ পত্রের মর্ মর্ শব্দ ইত্যাদি। এই শব্দগুলি যেমন মধুর তেমনই ভাব-জ্ঞাপক। তার চোখ ছল্ ছল্ কর্‌ছে বলিলে… ক্রন্দনোন্মুখ মুখের একটা ছবি চোখের সাম্‌নে ফুটিয়া উঠে। …বাড়ীটা সর্ব্বদাই লোকে পরিপূর্ণ, ইহার বদলে, লোকজনে গম্ গম্ করে লিখ্‌লে বর্ণনা পরিস্ফুট হয় বলিয়া বোধ হয়।

কথা গুলি লইয়া একটা বিপদ আছে। এই কথা গুলির ভিতর হইতে অভিধানের উপযুক্ত শব্দ গুলি বাছিয়া লওয়া একটা কঠিন—ব্যপার। হাসি কত রকমের আছে যেমন খল্ খল্, খিল্ খিল্, হা-হা হো-হো…ইত্যাদি। যে কয় প্রকার হাসির কথা উল্লেখ করা হইল ঐ গুলি বহুল ব্যবহারে বিশেষ অর্থ জ্ঞাপক হইয়া গিয়েছে…। সুতরাং অভিধানে উহাদের স্থান হ'বে…কিন্তু উৎকট ধরণের হাসি আবিষ্কার করিয়া তাহাকে অভিধানে স্থান দিতে হ'লে গোল বাঁধিবে।

বাংলা ভাষায় এই দ্বিত্ব যে এক অপূর্ব্ব সম্পদ তাহাতে সন্দেহ নাই…ইহাক ভাষার অলঙ্কার বলা যাইতে পারে। পশু পক্ষীর ডাকের পর্য্যন্ত দ্বিত্ব শব্দ আছে।

—:*:—

'শনিবারের চিঠির' রবীন্দ্রনাথ

—শ্রীপ্রতুল লাহিড়ী

সম্প্রতি কোনো বাংলা কাগজের পক্ষ হইতে কতিপয় ভদ্রলোক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা সবাই বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; সুতরাং আধুনিক সাহিত্য নিয়া কথা উঠিয়াছিল। প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্যিকবৃন্দকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন এবং ইহাদের মধ্যে কয়েকজনকে প্রতিভাবান্ বলিয়া স্বীকারও করিয়াছেন। একদা পথিমধ্যে এই কথা কবি শ্রীমোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের কানে উঠে। বাংলার আধুনিক সাহিত্যের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন যেই ব্যক্তিটি এই মর্য্যাদাহানিকর বাক্য উচ্চারণ করিলেন, মোহিতলাল পরম বিস্মিত হইয়া তাহাকে বলিলেন, "বলেন কি? এ হইতেই পারে না।"

ব্যক্তিটি উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে, এ অতি সত্য কথা বলিয়াই শুনিয়াছি।"

মোহিতলাল বলিলেন, "ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। কেননা কয়েকদিন আগে শনিবারের চিঠির দলের কাছে তিনি প্রায় তিন ঘণ্টা ধরিয়া বলিয়াছেন যে ইহারা একেবারে অন্তঃসারশূন্য ও অকাল পক্ক। ইহারা বড়ো ন্যাকা।"

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া মোহিতলাল নিম্নস্বরে বলিলেন, "জানেন কি, মোদ্দা ব্যাপারটা হইতেছে এই যে রবীন্দ্রনাথ অতিশয় ধূর্ত্ত।"

ব্যক্তিটি মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, "তাই তো—"

আমরা রবীন্দ্রনাথকে এতকাল দেবতা জানিয়াই পূজা করিয়া আসিয়াছি। তাঁহাকে কোনদিন ধূর্ত্ত বলিয়া গ্রহণ করিবার অবসর আমাদের হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্যিক স্বল্পায়ুদের বিরুদ্ধে অসিচালনা আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই আক্রমণ মোটেই বীরোচিত নহে। তিনি কাপুরুষতার যে উদাহরণ দিয়াছেন তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তিনি শনিবারের চিঠি নামক একখানি ইতর ও কুৎসিত পত্রিকাকে সম্মুখে শিখণ্ডিরূপে স্থাপন করিয়া বাণনিক্ষেপ করিতেছেন। সাহিত্যিক স্বল্পায়ুদের প্রতি তাঁহার স্নেহ প্রসিদ্ধ ছিল! অকস্মাৎ তিনি তাঁহার অটল ও অভ্রভেদী সিংহাসন ছাড়িয়া 'প্রবাসীর' আস্তাকুঁড়ে নামিয়া আসিয়াছেন দেখিয়া যুগপৎ দুঃখ ও করুণার উদ্রেক হয়। আজ তাঁহার সেই বিশ্বব্যাপী উদারতা কোথায়? নবীনের প্রতি তাঁহার সেই নিয়তোৎসারিত সহানুভূতির উৎস সহসা শুকাইয়া উঠিল কেন? আর যাহাই হোক্, সাহিত্যিক জমাদারের কাজ যে রবীন্দ্রনাথের নহে,—এ কথা তিনি ভুলিয়া গেলেন কিরূপে?

তিনি যেমন অন্যায় ভাবে নবীনকে আক্রমণ করিয়াছেন তেমনি তাঁহাকে সেই আক্রমণ ফিরাইয়া লইতে হইবে। বার্দ্ধক্যে তাঁহার বুদ্ধিবৈক্লব্য যদি নাই ঘটিয়া থাকিবে তবে তিনি শনিবারের চিঠির জঘন্য গালাগালিকে আর্ট বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন কিসের জন্য? আধুনিক সাহিত্য তো তাঁহার চোখে পড়ে না বলিয়া একটা সস্তা গর্ব্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু শনিবারের চিঠির আদ্যোপান্ত তাঁহার চোখে পড়ে নিশ্চয়ই। ফাল্গুন সংখ্যায় শ্রীদরবেশ-এর গল্প এবং সাহিত্য সংবাদ এর অন্ততঃ প্রথম প্যারাগ্রাফটা তিনি পড়িয়াছেন আশা করি। তিনি ইহাদের আর্ট বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন কি না জানিনা। তাঁহার মতে ইহাই হয়তো প্রকৃষ্ট সাহিত্য সমালোচনা! মানুষ স্তাবকতায় কতদূর অন্ধ হইলে এই-রূপ দায়িত্বহীন উক্তি প্রচার করিতে পারে আমরা তাহার পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। রবীন্দ্রনাথ হয়তো ভাবেন যাহারা স্তাবক ও ভৃত্য সাজিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহার প্রসাদ ভিক্ষা করে তাহারাই তাঁহার বড় ভক্ত, বড় উপাসক। আর যাহারা একান্তে নিভৃত জীবনে 'রবীন্দ্র সাহিত্যকে' জীবনের পাথেয় করিয়া অগ্রসর হইয়াছে, যাহাদের প্রতিটি

রক্তকণা রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় চঞ্চল ও উচ্ছ্বসিত, যাহারা রবীন্দ্রনাথের ভাবের ঐশ্বর্য্যে প্রতিপালিত ও পরিপুষ্ট,—তাহারা তাঁহার কেহই নয়, তাহারা তাঁহার অস্পৃশ্য ও নিন্দার পাত্র। আজিকার তরুণেরা যে নবতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নব নব সাহিত্যসৃষ্টি করিতেছে, গল্পে কবিতায় উপন্যাসে আলোচনায় বাংলা সাহিত্যে নব-ভাব মন্দাকিনী আনিয়াছে, তাহাই কি তাহাদের রবীন্দ্র ভক্তির পরম প্রমাণ নহে? আর যাহারা শুধু অভদ্র ও ইতর গালাগালি করিতেছে, যাহাদের স্বাধীন সাহিত্যসৃষ্টি করিবার ক্ষমতা নাই, তাহারাই হইল বড় আর্টিষ্ট, তাহারাই রবীন্দ্রনাথের পালিতপুত্র, তাঁহার শাসন-জমিদারির বেতন ভোগী গোমস্তা? বিড়ম্বনা আর কাহাকে বলে?

রবীন্দ্রনাথ শনিবারের চিঠিকে উপদেশ দিয়াছেন মাঝে মাঝে তাহারা যেন আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রশংসা করে। অবশ্য তাহার কারণও নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কারণ, মাঝে মাঝে প্রশংসা করিলে "নিন্দার অনিন্দনীয় অধিকার" পাওয়া যায়। তাহার অর্থ হইতেছে এই যে, প্রশংসার উপযুক্ত বলিয়াই ইহাদিগকে প্রশংসা করিয়োনা, নিন্দার অধিকার পাইবার জন্যই প্রশংসা করিয়ো। সমালোচনায় ইহা অপেক্ষা সঙ্কীর্ণতা আর কি হইতে পারে?

কয়েক মাস হইল রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যধর্ম্ম নামে এক প্রকাণ্ড প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে আধুনিক সাহিত্যের 'বে-আব্রুতা' ও তাহার 'ল্যাঙট্-পরা' চোরার উপর আক্রমণ ছিল। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় ভাবিয়াছিলেন যে প্রধানতঃ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই রবীন্দ্রনাথ ঐ প্রবন্ধটা লিখিয়াছেন এবং তিনি রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন। সম্প্রতি 'বঙ্গবাণীতে' নরেশচন্দ্র তিন খানি চিঠি ছাপাইয়াছেন—দুই খানি তাঁহার নিজের ও একখানি রবীন্দ্রনথের, তাঁহাকেই লেখা। তাহাতে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে সাহিত্যধর্ম্ম মোটেই নরেশচন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া লেখা হয় নাই,—এমন কি তিনি নরেশচন্দ্রের কোনো বই পড়িয়াছেন বলিয়াও মনে করিতে পারেন না। তবে কাহাকে উদ্দেশ করিয়া তিনি এ-হেন মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিতে তাঁহার ততোধিক মূল্যবান সময় ব্যয় করিলেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া জানাইবার মত সৎসাহস তাঁহার নাই কেন? রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য সাহিত্যিক জমাদার যাহাকে "বে-আব্রুতা" বলিয়া ইঙ্গিত করিতেছেন তাহা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র ও পরে নরেশচন্দ্রের লেখায় ফুটিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নরেশচন্দ্র যদি তাঁহার লক্ষ্য না হইয়া থাকে তবে কাহার লেখা পড়িয়া হঠাৎ তাঁহার 'চিৎপুর রোড়ের' দৃষ্টান্ত মনে পড়িয়া গেল আমরা তাহা জানিবার দাবী করিতেছি। শরৎচন্দ্র বা চারুচন্দ্রই যদি অপরাধী হইয়া থাকেন, তবে একথা বলা যাইতে পারে যে তাঁহারা কেহই আধুনিক নন্, এবং শনিবারের চিঠির প্ররোচনায় অকস্মাৎ এতদিন বাদে তাঁহার এত বড় একটা প্রবন্ধ লিখিবারও প্রয়োজন ছিল না। বিশেষ করিয়া কাহাকে এবং কোন্ লেখাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি উহা লিখিয়াছিলেন তাহা বলিবার মত তাঁহার সাহস নাই দেখিয়া দুঃখ হয়। তবে কি ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত মাসিক কাগজে প্রকাশিত দুই একটা গল্প বা কবিতা পড়িয়াই তিনি এই ধারণায় উপনীত হইয়াছেন যে সমস্ত আধুনিক সাহিত্যই পঙ্কিলতাদুষ্ট, 'ল্যাঙট্-পরা!' যে সাহিত্যের আয়ু মোটে দুই কি তিন বৎসর, সেই তরুণ-সাহিত্যের অক্ষমতার উপরই তাঁহার আক্রোশ? ভাবিলে অবাক হইতে হয় বৈ কি। কোথাকার কে সব অকিঞ্চিৎকর লেখক,—যাহাদের লেখা এখনও হয়তো সম্পূর্ণ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই, তাহারা কি রবীন্দ্রনাথের এই অনাহূত গুরুগম্ভীর সমালোচনার সৌভাগ্য লাভ করিবার উপযুক্ত? দুই একটা "অশ্লীল" পংক্তি পড়িয়াই কি রবীন্দ্রনাথ সমস্ত আধুনিক সাহিত্যকে আভিজাত্য হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন? তাহাই যদি হইবে তবে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় যখন 'দোটানায়' ও 'পঙ্কতিলকে' 'মুক্তিস্নানে' ও 'যমুনা পুলিনের ভিখারিনীতে' প্রথম "বে-আব্রুতা" সৃষ্টি করিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ চুপ করিয়া ছিলেন কেন? তখন তাঁহার চিৎপুরের বড় রাস্তাটার কথা মনে না পড়িয়া তাহার আশে পাশের এক আধটা গলির কথাও তো মনে পড়া উচিত ছিল! তাঁহার ঔদাসীন্যের কারণ কি ইহাই, যে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার উপন্যাসে কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের লিখনভঙ্গী অনুকরণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে উপন্যাসের

প্লটও ভিক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন? আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে যদি কেহ রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে একটি গল্পের প্লট চাহিয়া-চিন্তিয়া লইয়া আসিতে পারিতেন, তবে হয়তো তাহাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথ বিরূপ হইতেন না।

মনে হইতেছে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত যুক্তির মধ্যে কোথায় একটা মস্ত গলদ রহিয়াছে। তিনি হয়তো কাহারও কথা ভাবিয়া লেখেন নাই,—শুধু স্তাবকদের স্তবাতিশয্যে বাধ্য হইয়া যাহা-তাহা একটা লিখিয়া দিয়াছেন। এবং পাছে এই স্তাবকশিবাদল ক্ষুণ্ণ হয় সেই ভয়ে তাহাদের ইতর গালাগালিকেও আর্টের পদে ডবল প্রমোশন দিয়া দিয়াছেন। মনে সাহস হইতেছে এই লেখাটাও আর্ট বলিয়াই রবীন্দ্র-দরবারে গৃহীত হইবে।

কেহ কেহ বলিতেছেন 'সাহিত্যধর্ম্মে' রবীন্দ্রনাথ 'বে-আব্রুতার' যে অভিযোগ আনিয়াছেন তাহার লক্ষ্য মূলতঃ মোহিতলালই। কেননা আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে মোহিতলালের মত অশ্লীল বাক্য আর কেহ লেখে নাই। তাঁহার কবিতার মধ্যে কামকেলির বিকট বর্ণনা রহিয়াছে, যাহা পড়িলে অতি সহজেই চিৎপুর রোড়ের কথা মনে পড়ে। তবে কথা উঠিতে পারে, তাহাই যদি হইবে তবে রবীন্দ্রনাথ 'অকৃত্রিম পৌরুষের' জন্য মোহিতলালকে সার্টিফিকেটই বা দিবেন কেন? ইহার কারণ বাহির করিতে বেশি বেগ পাইতে হইবে না। একজনকে এক সময় নিন্দা করিয়া পুনরায় অন্য সময় তাহাকে প্রশংসা করিবার অভ্যাস রবীন্দ্র-নাথের পুরামাত্রায়ই বিদ্যমান আছে। এবং এই 'ধূর্ত্ততা' সর্ব্বাগ্রে চোখে পড়িয়াছে স্বয়ং মোহিতলালেরই।

শুধু তাহাই নহে, রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্যিকদের নৈতিক চিত্তবিকার ঘটিয়াছে বলিয়া শুনিয়াছেন। তিনি নাকি সে কথা বিশ্বাস করেন না। যদি বিশ্বাসই করেন না, তবে তাহা উল্লেখ করিলেন কোন্ সাহসে? এমনি অভিযোগ কি যে-কোন লোকের বিরুদ্ধেই আনা যায় না,—তিনি যত বড়ই হোন্, যত বড় খ্যাতিই তাঁহার থাকুক? এমনি অভিযোগ কি সত্যি সত্যি আনা হয় নাই? কিন্তু আমরা তাহা বিশ্বাস করি না।—এই স্বীকারোক্তিই কি পরকে অপমান হইতে রক্ষা করিবার প্রকৃষ্ট পন্থা? সম্প্রতি দেখা গেল নরেশচন্দ্রের নিকট লিখিত তাঁহার যে পত্র বঙ্গবাণীতে ছাপা হইয়াছে তাহাতে নরেশচন্দ্রের চরিত্রের উপর আক্রমণ আছে বলিয়া লোকে সেই পত্রের অর্থ করিয়াছে। পরের চরিত্রসমালোচনার ভার ও অধিকার রবীন্দ্রনাথকে কে দিল? তিনি কি সমস্ত সাহিত্যিককুলের নৈতিক অভিভাবক? সেই সমালোচনার ভার কি আমরাও নিজ হস্তে লইতে পারি না?

শনিবারের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে তরুণ সাহিত্যিকেরা তাহাদের তারুণ্যের সার্টিফিকেট লইবার জন্য "বুড়ো অধ্যাপক পাড়ায়" গিয়া হানা দিয়াছে। "বুড়ো অধ্যাপক পাড়া" বলিতে তিনি কি বুঝিয়াছেন তাহা যাঁহারা 'উত্তরা'য় শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "সাহিত্যের নব কলেবর" পড়িয়াছেন তাঁহাদের কাছে আর অবিদিত নহে। মনে হইতেছে, তরুণেরা তাহাদের সার্টিফিকেট লইতে কেন সর্ব্ব প্রথমে রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হয় নাই এই জন্য রবীন্দ্রনাথের রীতিমত আক্ষেপ রহিয়াছে। এই পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত "প্রাচীন" লেখকেরাই রবীন্দ্রনাথের দ্বারে গিয়া গল্প ও উপন্যাসের প্লট্ কুড়াইয়া লইয়া আসিয়াছেন, কবিতা সংশোধিত করিয়া লইয়াছেন। এমনও শোনা গিয়াছে যে কোনো পদ্য লেখক তাঁহার পারস্যকবিতার সমস্ত বঙ্গানুবাদ গ্রন্থখানাই রবীন্দ্রনাথের দ্বারা সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত করিয়া লইয়া আজ বিচিত্ররূপে অভিজাত সাহিত্যিক সাজিয়া বসিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের বারিসিঞ্চনে বহু নাগকেশরই ফুটিয়াছে। মোহিতলালের মুখে আমরা একথা বহুবার শুনিয়াছি। সেই রবীন্দ্রনাথের কাছে কবিতার খাতা ও গল্পের পাতা লইয়া আধুনিক সাহিত্যিকের দল ভিড় করিয়া দাঁড়াইল না, তাঁহার পরামর্শমত সাহিত্য সৃষ্টি করিল না, এই জন্য তাঁহার আফ্‌শোষ হইতে পারে বৈ কি। কিন্তু এই তরুণের দল প্রতিবেশী রবীন্দ্রনাথের দ্বারে না গিয়া একখানি তুচ্ছ সার্টিফিকেটের জন্য সুদূরবাসী "বুড়ো অধ্যাপক পাড়ায়" গিয়া হাজির হইবে, ইহা যেমন অসম্ভব, তেমনি সর্ব্বৈব মিথ্যা। বাংলাদেশে সার্টিফিকেটদাতা বলিয়া যদি কেহ থাকেন তো তিনি রবীন্দ্রনাথ। তিনি শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া কুন্তলকৌমুদী তেলকে

পর্য্যন্ত সার্টিফিকেট্ দিয়াছেন। এবং তাঁহার সার্টিফিকেটের যে বিশেষ কোনও মূল্য নাই, ইহাতে তাহাও প্রমাণ করিয়াছেন। "বুড়ো অধ্যাপক পাড়া" হইতে তারুণ্যের যে "সার্টিফিকেট" আসিয়াছে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস, তাহা যে স্বতঃপ্রণোদিত, তাহা যে ভিক্ষালব্ধ নহে,—ইহা রবীন্দ্রনাথ ধারণা করিতে পারিলেন না কেন? তবে আমরাও কি ভাবিব যে মোহিতলাল তাঁহার কবিতার "অকৃত্রিম পৌরুষের" একখানা সার্টিফিকেট্ লইয়া বই বেচিবার জন্যই রবীন্দ্রনাথের স্তাবকতা করিয়াছিলেন? রবীন্দ্রনাথ কি স্বেচ্ছায়ই মোহিতলালকে প্রশংসা করেন নাই? তিনি এই পর্য্যন্ত যত সার্টিফিকেট্ দিয়াছেন, তাহা কি গুণগ্রাহিতার পরিচয় নহে,—সবই কি স্তাবকতার পুরস্কার?

শনিবারের চিঠির রবীন্দ্রনাথ, বলাকা ও পূরবীর রবীন্দ্রনাথ এক ব্যক্তি নহেন। আমরা শনিবারের চিঠির রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করি না, কবি রবীন্দ্রনাথ, ভাবুক রবীন্দ্রনাথ, বঙ্গসাহিত্যের ভাগ্যবিধাতা রবীন্দ্রনাথ আমাদের চিত্ততলে দেবতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকুন। শনিবারের চিঠির রবীন্দ্রনাথ পঙ্কিল ধূলায় লাঞ্ছিত,—শনিবারের চিঠির রবীন্দ্রনাথকে আমরা চাই না।

——:০:——

কালো

—শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

পাড়ার সবাই তাহাকে বৈষ্ণবী-দিদি বলিয়াই জানিত। মুখুয্যেদের একতলা 'পাঁজরা বাহির করা' কোঠাটার পাশে ততোধিক জীর্ণ চালাটায় সে দিন কাটাইত।

কালো বলিত, দীন দুঃখী মানুষ, আমার অট্টালিকের দরকার কি!

কিন্তু অট্টালিকা নাকি সত্যই তার এককালে ছিল, তবে তাহার সে গৌরব-দিনের ইতিহাস সে কাহারো কাছে প্রকাশ করিত না।

ছোট্ট চার পয়সার মূল্যের পিছন-দিকে যুগলমূর্ত্তি-আঁকা আয়নাখানি সামনে রাখিয়া প্রতিদিন প্রাতে সে আপনার কালো অঙ্গে চন্দনানুলেপন করিত। তারপর একটা বড় ঝাঁকায় তরিতরকারী, ফলমূল, দুই পয়সা হইতে ছয় পয়সা মূল্যের আর্শি-সাবান, আলতা, চুড়ী......বোঝাই করিয়া ঘাটে খেয়ার প্রথম নৌকাখানিতে উঠিয়া বসিত।

ঘাটের মাঝিরা প্রায়ই তাহার গন্তব্যস্থানটী জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিত। কালো প্রায়ই সেই সমূহের উত্তর দিত না। কদাচ কাহাকেও বলিত, পারের আশপাশ দু'দশটা গাঁয়ে গিয়ে ফেরী করি, সব জিনিষ ত' সব সময় সেখানে মেলে না।

পাশ হইতে কেহ বা প্রশ্ন করিয়া বলিত, লাভ বুঝি খুব?

হুঁ। একটাকায় চার টাকা—' বলিয়া বৈষ্ণবী গঙ্গার জল দেখায় মন দিত। ওপারের খেয়া-ঘাটের সরকারটা কালোর মুখের একটী গান শুনিবার জন্য তা'কে নিত্য পীড়াপীড়ি করিত। বলিত; একটী কেত্তন শুনতে পাই ত' একমাস পারাণি নিইনে।

বৈষ্ণবী কিন্তু কখনো গান গায় নাই।

গঙ্গা পার হইয়া দিনের প্রথম রৌদ্রের মধ্যে তা'র পথচলা সুরু হইত—শিশির ভেজা মাটীর শ্যামলিমার বুকে পা ফেলিতে তার ভয় হইত। শ্যামতৃণ লতা দেখিয়া তার মনে পড়িত অতীতের এক নব দুর্ব্বাদল মূর্ত্তি। ঘাস-পথ সন্তর্পণে এড়াইয়া সে ভিজা মাটীর পথ ধরিয়া চলিত। খেয়া ঘাটটা গাছপালার আড়াল হইয়া গেলে গুণ্ গুণ করিয়া সে গান ধরিত।

সুন্দর বদন চারু অরুণলোচন কাজরে রঞ্জিত ভেলা,
কনক-কমল মাঝে কাল ভুজঙ্গিনী শ্রীযুত খঞ্জন খেলা—

সে গানের সুরে মাঠের চাষীরা মুখ তুলিয়া চাহিত; গাছের পাখী তা'র গান শুনিত। কাহার কাজল আঁকা অরুণ-লোচনের খঞ্জন-লীলায় ভুলিয়া যে দিনের পর দিন এমনি করিয়া মাঠ-গাঁ, খাল-বিল পার হইয়া কোথায় যাইত কেহ জানিত না।

সন্ধ্যার পর—শেষ খেয়ায় বৈষ্ণবী আবার আপনার গাঁয়ে ফিরিয়া আসিত। আনাজপত্র প্রতিদিন নিঃশেষে বিক্রয় করিয়া আসিত, তবে আরসি সাবান গুলার সবকটা সবদিন বিক্রয় হইত না।

বাড়ী ফিরিয়াও তা'র ছুটী ছিল না। হাত পা ধুইয়া, দু'মুঠি ভাত পেটে দিয়া কালো মুখুয্যেদের ভাঙা র'কটীতে গিয়া বসিত।

মুখুয্যের ছেলেটা সবে বচর চারেকের। ছেলেটা তাহাকে অদৃশ্য অননুভূত এক মায়ায় জড়ায়।

মিটমিটে দুটী চোখে চাহিয়া সে কালো পুষ্ট হাত দুটী বাড়াইয়া বলে, খৈ খাব, পয়সা দে মাসী—

কালো হাসিয়া বলে, আ হতভাগা,—মাসীই বটে! পয়সা কোথায়! রোজগারের একটী পয়সাও যে এপারে ফিরে আসে না!

হারাণ হাসিয়া বলেন, সত্যি মাসীই ত। আমার ছেলের রঙ ত চাঁপাকেও লজ্জা দেয়, তোমারও তাই। আর ওর মায়ের ত' কথাই নেই। কাজেই বিষ্ণু যদি তোমায় মাসী বলে ডেকেই থাকে তাহ'লে ওর সৌন্দর্য্য-সমালোচনার সূক্ষ্মদৃষ্টির—

মুখোপাধ্যায় গৃহিণী সৌন্দর্য্য-চর্চ্চার প্রতি মনোযোগ না দিয়া বলিতেন, কিন্তু পয়সার তোমার অভাব কিসের গা? টাকায় চারগুণ লাভ কর শুনি,—

ভুল শুনিস নি ভাই—বলিয়া বৈষ্ণবী হাসে! কালো-পাষাণ-ভাঙা তরল জল-ধারার মত সে হাসি! কিন্তু সে হাসি দেখিয়া বিষ্ণুচরণ চেঁচাইয়া উঠে, কালো মাসী হাসে—ভালুকে মুলো খায়—ইত্যাদি—

কালো নামটা ত' বিষ্ণুরই দেওয়া। তার আগে বৈষ্ণবীর নাম ছিল নিস্তার। কেউ কেউ কুব্জা বলিয়াও ডাকিয়াছে। কিন্তু কুব্জা সম্ভাষণে বৈষ্ণবীর মুখে যে ভাবের কথা ছুটিত তাহা সুরের দিক দিয়া কোনো অংশে কীর্ত্তন-ঘেঁষা নয় আর রসের দিক দিয়াও আদৌ ভক্তি-আপ্লুত নহে।

হয়ত তা'র এই কুব্জা নামের একটা ইতিহাস ছিল, কিম্বা আদর করিয়া ওই নাম হয়ত কেহ তাকে দিয়াছিল; কিন্তু সে কথা কেহ জানিত না।

বিষ্ণুকে কোলে টানিয়া বৈষ্ণবী বলিত, কালো! ইস্, নিজে নদের গৌর কিনা তাই। কেনেরে দুষ্টু, কালোর কি হাঁসতেও মানা—?

বলিয়া নিস্তার বিষ্ণুর কালো-গালে আপনার পানের রসে সিক্ত পুরু ঠোঁট দুটো চাপিয়া ধরিত। ছেলেটাও বড় ন্যাওটো! দুই হাতে গলা জড়াইয়া মুখে মুখ চাপিয়া ডাকিত, কা-আ-লো—

বৈষ্ণবী বিষ্ণুর কাণে কাণে সুর করিয়া চুপি চুপি বলিত;—

'সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে গো, তেমতি চিকণ শ্যামের দেহা—'

হারাণ তাড়াতাড়ি হাসিয়া বলিতেন, ঐ দেখো দিদি, বিষ্টুচরণ তোমায় আলো খেতাব দিয়ে সন্তুষ্ট করতে চাইচে। দোহাই তোমার, রাগ কর না—

বৈষ্ণবী হাসিতে চাহিত—কোথাকার এক বিপুল পাষাণ ভাবে সে হাসি রুদ্ধ হইয়া যাইত। চোখের কোলে জল আসিয়া পড়িত,—ভাগ্যে ভূতের মত মসি নিবিড় বর্ণ তাই সামনের কেহ বুঝিত না! বৈষ্ণবী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া পালাইত। নিজের কুঁড়ের দুয়ার রুদ্ধ করিয়া দিয়া আপনার ছেঁড়া বিছানাটায় সে লুটাইয়া পড়িত।......

রাত্রে স্বপ্নজাগরণের আচ্ছন্নতার ভিতর তার কেবলই মনে হইত—এমনি একটী সুপুষ্ট শ্যামলসুন্দরের অভাবে তার গোপন অন্তর তাহার অজ্ঞাতে নিয়ত নিঃশব্দে কাঁদিয়া মরিতেছে! বুঝি বঞ্চিত মাতৃত্বের দুঃখেই তাহার গানের তাল হঠাৎ কাটিয়া যায়! পথ চলার মাঝে পা ফেলিতে ভুল হয়,......হাসির মুখে কান্না আসিয়া পড়ে!—

হারাণ-গৃহিণী মুখখানা যথাসম্ভব বিকৃত করিয়া বলেন, ঢং!...তবু নিজের পেটের নয়। সইতে পারিনি বাপু!... একটী আধলা পয়সা কখনো ছেলেটার হাতে আদর করে দিতে দেখলুম না। দরকার নেই অমন শুকনো মায়ায়!

গৃহিণীর কথার উত্তরে হারাণ বলিতেন, গিন্নি পয়সা দিলেই জগতের সব কিছু ভিজে ওঠে না। তুমি তোমার বিষ্টুকে ভালবাস, সে কি পয়সার লোভে?

তা এক রকম তাই বইকি, স্বার্থ নেই নাকি! আর নাই থাক, আমি ওর মা, ওকে যে—

—কালোও তোমার বিষ্টুর মা। কেবল গর্ভে ধরলেই মা হওয়া যায় না গিন্নি, মনে প্রাণে ও মা বলেই তোমার ছেলেকে জোর করে ভালবাসে। পয়সা দেবার কথা ওর মনেই থাকে না।—

এমনি করিয়াই অনেকগুলি না-গোনা বছর গিয়াছে।—

ছেলেটা বড় হইয়া যখন তখন বলে, মাসী গৌরপটল খাবে?

তোর বাপ খাক, মা খাক—সাতকুল খাক, আমি কেনে!—বলিয়া কালো বৃথাই রাগ করিতে চায়!

দুষ্টু ছেলেটা সুযোগ পাইয়া বলে, গৌর পটল কি মাসী? পেঁয়াজ—?

আমি কি জানি, তোর বাপকে শুধু গে যা'—

খানিক ঘুরিয়া আসিয়া বলে, কুঞ্জামাসী, কাদার ঠাসি—

বাবা, বাবা! হাড়হাবাতে, হারামজাদা—বলিয়া রাগে দুঃখে বিগতস্মৃতির তাড়নায় মাসী কাঁদিয়া ফেলে!

বর্ষার আকাশ-আঁচল ছিঁড়িয়া তখন—অবিশ্রান্ত জল ঝরিতেছিল!

একে বর্ষার রাত, তারপর পাড়া গাঁ—পল্লীটী সন্ধ্যার পরই নিঃঝুম হইয়া গেছে। দূরে অদূরে অন্ধকারের মধ্যে ঝিল্লির দল কাঁদিয়া মরিতেছে। জলের সঙ্গে ঝড়েরও যেন প্রতিযোগিতা চলিয়াছে!......

এমনি দুর্য্যোগের রাতে বৈষ্ণবীর দরজায় একটা ভীত আকুল কণ্ঠে কুঞ্জার নাম ধরিয়া ডাকাডাকি চলিতেছিল। বৈষ্ণবী দুয়ার খুলিয়া অপ্রত্যাশিত কাহাকেও দেখিয়া বলিয়া উঠিল, গোঁসাই ঠাকুর! এত রাত্রে—! কালোর মুখে হাসি ফুটিল, সংযত হইয়া লোকটীকে প্রণাম করিয়া বলিল, আসন পেতে দিই, বসো—

গোঁসাই বসিবার বিশেষ উৎকণ্ঠা প্রকাশ না করিয়া ফিস ফিস শব্দে কালোকে কি বলিল......পরক্ষণেই বৈষ্ণবীর কালী-পড়া লণ্ঠনটা লইয়া ঝড়বৃষ্টির মধ্যে পথে নামিয়া পড়িল,—

আবেগ-আকুলকণ্ঠে বৈষ্ণবী কহিল, রাগ করিস না গোঁসাই যেখান থেকে পারি কাল—

গোঁসাই তখন আলো লইয়া অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে, ঝড়ের গর্জ্জনের মধ্যে কুঞ্জার কথা শুনিল কিনা বোঝা গেল না। বৈষ্ণবী প্রাণহীনের মত দুয়ারে দাঁড়াইয়া গোঁসাইয়ের হাতের অপস্রিয়মান আলোটার প্রতি চাহিয়া রহিল।—

সেই যে রাত্রে একটা লোক বৈষ্ণবীর নিকট কি করিতে আসিয়া তখনই চলিয়া গিয়াছে—এইটুকু ব্যাপার লইয়া পাড়ার আরো দু'দশজনার সহিত হারাণ গৃহিণীও লোকটার আসিবার একটা দুষ্ট কারণ কল্পনা করিয়া আহার নিদ্রা বন্ধ করিবার উপক্রম করিলেন। স্বামীকে বলিলেন, দূর কর মাগীকে—

উত্তরে হারাণ কহিলেন, তোমার অসহ্য ঠেকে তুমি অন্যত্র সরে যেতে পারো। কালো আমার প্রজা নয়, ভাড়াটে নয়, কোনো অন্যায় অত্যেচার করেচে বলেও মনে হয় না! আমার ওকে তাড়াবার কোনো অধিকারই নেই।

কিন্তু ঐ কথা কটা বলায় সুলোচনা যে সত্যই বাপের বাড়ী যাইতে পারেন তাহা হারাণ ভাবেন নাই। দুপহরে হারাণ বাড়ী ছিলেন না, সেই সময়ে সুলোচনা পুত্রকে লইয়া পিত্রালয় যাত্রা করিলেন। সন্ধ্যার মুখে বাড়ী ফিরিয়া হারাণের বুঝিতে কিছু বাকী রহিল না। হারাণ ধীরে ধীরে বৈষ্ণবীর কুঁড়ের দ্বারে গিয়া ডাকিলেন, কালোদি!

বৈষ্ণবী তখন আপনার ছেঁড়া বিছনাপত্র বাঁধিয়া কোথায় যাইবার উদ্‌যোগ করিতেছিল, হারাণ মুক্তদ্বারের ফাঁকে তাহা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু এমন শাস্তি তুমি আমায় —দিতে পাবে না কালোদি। যে কল্পিত অপবাদ বুকে করে সুলোচনা পালিয়েচে তুমি এমনি করে পালালে সেটা

সত্যি হয়েই দাঁড়াবে। আমিত তোমায় বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস করিনি দিদি—

বৈষ্ণবী হঠাৎ বিছনার বাঁধন খুলিতে খুলিতে বলিল, তবে যাব না। কিন্তু একটী উপায় আপনাকে করতেই হ'বে মুখুয্যে মশায়! এই উপকারের জন্যে—

মুখুয্যে বলিলেন, কোনো অপকারই ত' তোমার করতে পারলুম না দিদি, বল, একটা উপকারই করে দেখি—

পাঁচ কুড়ি টাকা উপস্থিত আমায় দিতে হ'বে—ধার—' বলিতে গিয়া বৈষ্ণবী কাঁদিয়া ফেলিল!

হারাণ কহিলেন, কিন্তু তোমার কাহিনীটুক তার আগে আমায় শুনতে হ'বে। যে লোকটী এসেছিল সে তোমার কে?

বৈষ্ণবী বলিল, আজ ও আমার কেউ নয়,—

সুতরাং পূর্ব্বে নিশ্চয়ই সে কেউ ছিল—বলিয়া হারাণ সরলভাবে হাসিলেন।

পাড়া ঘরে চেনা শোনা এই পর্য্যন্ত। কিন্তু ওর ইচ্ছে ছিল আমি ওকে……

ওর ইচ্ছেটুকু পূর্ণ করলেন না কেন দিদি?

আমার তার আগে একবার বিয়ে হ'য়ে ছিল।

তবে তুমি সিদুঁর পর দিদি!—হারাণ কৌতুহলের সহিত প্রশ্ন করিলেন।

আপনারো ভয় হ'ল মুখুয্যে মশাই! কিন্তু বিধবা ত' আমি নই। আমার স্বামী ছেলেবয়েস থেকেই বিবাগী। বেঁচে আছেন কি নেই তাও জানিনা।……অমত করলুম বলে তা'র রাগ। যখন তখন টাকাকড়ি চেয়ে উপদ্রব করে। কুজা বলে ক্ষেপায়'—বলিয়া বৈষ্ণবী হাসিল।

তার উপদ্রবের ভয়েই দিদিকে বুঝি নিত্যি নিত্যি মোট মাথায় করে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়? হারাণ সস্মিত মুখে বৈষ্ণবীর প্রতি চাহিলেন! লজ্জার রক্তিমা সে কালো মুখে ফুটিল কিনা সন্ধ্যার আঁধারে তাহা বোঝা গেল না। বৈষ্ণবী মাথা হেঁট করিল।

হারাণ পুনরায় কহিলেন, তাই টাকায় চারগুণ লাভ করেও একটী আধলা ঘরে তোলবার সৌভাগ্য তোমার হ'ল না?

মুখের ম্লান হাসিটুকু ছাপাইয়া বৈষ্ণবীর চোখের কোল দিয়া জলের ধারা নামিয়া আসিল!

হারাণ ব্যথিত হইয়া বলিলেন, নতুন কোনো বিপদে পড়ে সেই তোমার কাছে এসেছিল বুঝতে পারচি। কিন্তু মানুষের মন এত নীচ কালো-দি, মানুষকে ভাল ভাবতে তার বুকে ব্যথা লাগে! এই তোমার প্রকৃত কথা না জেনে কত কথাই ত বলে। কিন্তু বাজে কথাই কইচি, টাকাটার জোগাড় দেখিগে'—বলিয়া হারাণ উঠিয়া গেলেন। ছেঁড়া কাঁথার মধ্যে হইতে যুগলরূপ বাহির করিয়া বৈষ্ণবী বারবার মাথায় ঠেকাইল।……

কিন্তু টাকার জোগাড় হইল না। হারাণ শুষ্কমুখে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, পঞ্চাশটী টাকা মাত্র ঘরে আছে। কেউ ধারও দিলে না, বিষ্যুদবার—

তবে যাক'—বলিয়া বৈষ্ণবী মুখ ফিরাইয়া লইল। তার সকল কামনা, সকল কল্পনা ধূলায় ধূলা হইয়া গেল।

হারাণ কহিলেন, থাকবেই বা কেন দিদি। সুলোচনা তাঁর সকল গহনা পত্তর নিয়ে গেচেন। কিন্তু বাক্‌সে বিষ্টুর হাতের ছেলেবেলার তাবিজ আর একজোড়া ভারি বালা আছে! আমি,—

বৈষ্ণবী মনে মনে সন্ত্রস্ত হইয়া বলিলেন, না, না, তার গহনা বেচা টাকা আমি নেব না। আপনি ও কাজ করবেন না, তাতে ওর অকল্যাণ হবে—বলিতে বলিতে তার মুখে সহস্র বিভীষিকার ছবি ফুটিয়া উঠিল! কিন্তু তার' কণ্ঠস্বরের স্থিরতায় হারাণ সহসা প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না।

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন, কিন্তু রক্ষাত' তাঁকে করতেই হ'বে। আমি সুলোচনার বাপের বাড়ী চললুম। সব কথা শুনলে সে কথনো তোমার ওপর রাগ করে থাকতে পারবে না। তার গহনা বিক্রী করে আমি তোমায় টাকা দেব। তার বাপের বাড়ী বেশী দূরও নয়, আজ রাত্রের মধ্যেই আমি ফিরে আস্‌ব।

বৈষ্ণবীর মুখের কোনো কথা শুনিবার পূর্ব্বেই হারাণ বাহির হইয়া গেলেন।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হারাণ সস্ত্রীক ফিরিয়া আসিলেন। ষ্টেশনেই তাঁহাদের পাওয়া গিয়াছিল। সুলোচনার সেখানে

পৌঁছিবার পূর্ব্বেই গাড়ী প্ল্যাটফর্ম্ম হইতে বাহির হইয়া যায়। কিন্তু সুলোচনা অসীম খেদ বশত পুত্রকে লইয়া অপর ট্রেণের প্রতীক্ষায় ষ্টেশনেই বসিয়াছিলেন।......

বৈষ্ণবীর ঘরের মুক্তদ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সুলোচনা অনুতপ্ত কণ্ঠে কহিলেন, তোমার ভুল বুঝেছিলুম দিদি; ছোট বোনকে মার্জ্জনা কর। সকালেই যদি সব কথা খুলে বলতে—......দিদি !......

পুনঃপুনঃ আহ্বানেও কেহ সুলোচনার সম্মুখে আসিল না বা ভিতর হইতে একটী কথা বলিল না। উদ্বিগ্ন অন্তরে ঘরে ঢুকিয়া সকলে দেখিল—শূন্য ঘরের মাটীতে খানিকটা শুভ্র চাঁদের আলো আসিয়া লুটাইতেছে......

হারাণ নীরবে বাড়ীর বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলেন। রাস্তার ডান ধারের চালাটার এক বুড়া কলু থাকিত। সে আসিয়া হারাণকে বলিল, বিষ্টুর মা তেনাকে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে সোয়ামীর ঘর ছেড়ে পালিয়েছিলেন। তেনার গায়ের গহনা বষ্টুম দিদি চায় নাই—

অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে হারাণ বলিলেন' কিন্তু বিষ্টু কেত' সে ভুলতে পারবে ? তা হ,লেই হ'ল—

ছেদী বলিল, বষ্টুমী দিদি এখানে ছিলেন বলেই ত' বিষ্টুর মা ছেলে নিয়ে পালিয়ে ছিলেন—গিয়ে তিনি ভালই করেচেন।

—:*:—

পুস্তক পরিচয়

পর্দ্দানসীন—(ছোট গল্পের বই) শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু বি এ রচিত। দাম বারো আনা। বরেন লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

বইখানিতে লেখকের কতকগুলি ছোট ছোট গল্প আছে। সব গল্পগুলিই প্রায় বিভিন্ন পত্রিকায় পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখকের প্রথম চেষ্টা হিসাবে বই-খানি আমাদের খুবই ভালো লাগিয়াছে। প্রত্যেক গল্পেই সামান্য কিছু না কিছু মৌলিকতা আছে। বিশেষতঃ 'পর্দ্দানশীন' 'জগা পিসি' প্রভৃতি দু একটী গল্প সত্যই অপূর্ব্ব। গল্পরচনায় লেখকের যে বিশেষ দক্ষতা আছে তাহা বইখানি পড়িলেই বেশ বোঝা যায়। বইখানির ছাপা আরো একটু ভালো হইলে সুশোভন হইত। আশা করি বইখানি পড়িয়া সকলেই তৃপ্তিলাভ করিবেন।

দখিন হাওয়া—শ্রীপ্রভাত কিরণ বসু বি এ রচিত। দাম আট আনা। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর বই এর দোকানে প্রাপ্তব্য।

ইহা একখানি ছোট কবিতার বই। গল্প অপেক্ষা কবিতা রচনায় প্রভাত বাবু সত্যই সিদ্ধহস্ত। দখিন হাওয়ার সব কবিতা গুলিই ইতিপুর্ব্বে বিভিন্ন মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছে এবং প্রত্যেকটিই এক কথায় বলিতে গেলে—চমৎকার ! 'প্রথম তোমায় দেখেছিলাম পশ্চিমের ঐ জানলা দিয়ে' 'পুত্রহারা' প্রভৃতি কবিতা বিশেষ করিয়া উল্লেখ যোগ্য। ছাপা বাঁধাই এমন কি আকারেও বইখানি লোভনীয় হইয়াছে। আমরা প্রত্যেক কাব্য-রস-পিপাসু ব্যক্তিকেই বইখানি পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

ছবি

(গান)

—শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য

পাল তুলে ঐ চল্‌লো ভেসে তরীখান—
উঠলো বেজে বিদায় বাঁশীর বেহাগতান !
সন্ধ্যা রাণীর নীলাম্বরীর দ্যুতি,—
স্নিগ্ধ হিয়ার মর্ম্ম মাঝে জাগায় অনুভূতি।
জ্যোৎস্না-পরশ সুবাস-মলয় আকুল করি তুলছে প্রাণ।
সুদূর দূরে নদী পারের সীমা,
মিশে গেছে তারি মাঝে অনন্ত নীলিমা !—
আপন ভোলা উদাসসুরে কে যেন ঐ গাইছে গান !

—:০:—

ঘরে বাইরে

ধূপছায়ার জীবনের এক বৎসর পূর্ণ হোল আজ।

এই এক বৎসরে আমরা সফলতা কতটুকু লাভ করতে পেরেছি, সাহিত্যের আসরে আমাদের পত্রিকার অস্তিত্বের কতখানি সার্থকতা প্রমাণ করেছি, সে বিচার করবার ভার আমাদের পাঠকদের।

তবু এটুকু আমরা নিঃসঙ্কোচে গৌরবের সহিত স্বীকার করি—এই সময়টা নানাদিক দিয়েই সদ্ব্যবহার করতে পেরেছি এবং অভিজ্ঞতা লাভ করেছি অনেক।

আমাদের সব চেয়ে আনন্দের কথা এই ক্ষুদ্র সাহিত্য সাধনার ভিতরে আমরা লাভ করেছি অনেক নূতন বন্ধু,—পাঠক অনুগ্রাহক অথবা লেখক রূপে ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ অথবা স্বপক্ষ হিসেবে নয়,—তাঁদের সবাই আমাদের প্রিয়, তাঁদের ভালোবাসার স্রোত এবং সহানুভূতি আমরা সারা অন্তর দিয়ে অনুভব করেছি। মানুষের শুভকামনা এবং আশীর্ব্বাদের অমিয় ধারার স্রোতে সমস্ত বাধা বিপত্তি অতল জলে তলিয়ে গেছে তারও নিদর্শন পেয়েছি।

বর্ষ শেষের সময় এই বারোমাসের জমাখরচের হিসেব-নিকেশ খতিয়ে দেখলে বুঝতে পারি লাভ লোকসানের খাতায় লাভের অঙ্ক অনেক বেশী।—আমি আর্থিক অথবা পরমার্থিক লাভের কথা বলছি না। অর্থ দিয়ে কেনা যায় না এমন জিনিষ আমরা পেয়েছি। এবং তার পরিমাণেরও সীমা পরিসীমা নেই। আমাদের এই নূতন বন্ধুদের সম্প্রীতি বিশ্বাস এবং কল্যাণ আশীর্ব্বাদ আমাদের পরম গৌরব। তাঁহাদের সহানুভূতি লাভের যোগ্য হতে পারি যেন দিনে দিনে, সেই আমাদের একমাত্র সাধনা হবে এই দুর্গম চলবার পথে।

যে আদর্শ সামনে রেখে আমরা বাণীদেবতার পূজা

করতে নেমে ছিলাম হয়তো তা সব সময় অক্ষুণ্ণ রাখতে পারি নি। আদর্শের পথে চলতে গিয়েছি বলেই আবার কারও কারও মনের অসন্তোষের ভাগী হয়ে পড়েছি সে কথা অস্বীকার করি না। লেখক ও পাঠক যাঁদের নিয়ে আমাদের কারবার সবাইকে খুশী রাখার উপরেই পত্রিকার দীর্ঘজীবনের সম্ভাবনা নির্ভর করছে। কিন্তু নির্ব্বিচারে সকলকে সন্তুষ্ট করতে পারা যে কত শক্ত, তা বলতে পারি না। 'সম্পাদকের বিপদ' নামক প্রবন্ধে এই কথাটা ইতি-পূর্ব্বেই বলেছিলাম—

আগামী বৎসরে ধূপছায়ার উন্নতিকল্পে আমরা নিজেরা তো যথাসাধ্য চেষ্টা করছি এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে আমাদের অনুগ্রাহকবর্গের কাছে উপদেশ এবং পরামর্শও জানতে চাই।

বৈশাখ থেকে আমরা শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের একখানি ধারাবাহিক সামাজিক নাটক প্রকাশ করব।

তাছাড়া সাতজনের লেখা একটা নতুন ধরণের উপন্যাসও প্রকাশিত হবে।

নতুন গ্রাহকদের জন্য, প্রথম বৎসরের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে বাড়তি আরও এক হাজার করে সংখ্যা প্রকাশ করবার আয়োজন করছি।

আমাদের অনুগ্রাহক বর্গের কাছে একটী নিবেদন,—তাঁরা যেন আগামী বৎসরের বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩।৶০ অথবা ষান্মাসিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৷৹ ৩০শে চৈত্রের মধ্যে যথা শীঘ্র সম্ভব মণিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দেন। আমরা বিশ্বাস রাখি প্রথম বৎসরের গ্রাহক-দের কাহারও সহানুভূতি হারাব না,—তবু যাঁরা নিতান্তই দ্বিতীয় বৎসরে পত্রিকা নেবেন না তাঁরা যেন দয়া করে একটী পোষ্টকার্ড লিখে ৩০শে চৈত্রের মধ্যে সংবাদ পাঠান। যাঁদের কাছে বার্ষিক মূল্য অথবা নিষেধ পত্র পাব না আমার পয়লা বৈশাখ তারিখে বৈশাখ মাসের কাগজ ভিঃ পি যোগে পাঠাব। ভিঃপিতে টাকা পেতে দেরী হয় কাজেই দ্বিতীয় মাসের পত্রিকা পাঠাতেও বিলম্ব হবার সম্ভাবনা তাছাড়া গ্রাহকদের পক্ষে দুআনা বেশী লাগে, এই সব কারণে নূতন ও পুরাতন সকল গ্রাহকদের কাছেই আমাদের অনুরোধ অনুগ্রহ করে আগে থাকতে মণিঅর্ডার যোগে মূল্য পাঠিয়ে বাধিত করবেন।

—:০:—

সওদা

লেখক নিজের নামের বিশেষণ দিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। সে লেখকের নাম শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত। কথাবস্তু যাই হোক্‌, শিরোনাম-টি লেখক সম্বন্ধেই বেশি করে' প্রযোজ্য।

মোহিতলালকে লক্ষ্য করে'ই রবীন্দ্রনাথ তাঁর অমূল্য প্রবন্ধ 'সাহিত্যধর্ম্ম' লিখেছেন—এতদিনে জেনে আমাদের স্বস্তি হ'ল। 'ল্যাঙট্‌-পরা' সাহিত্যই নামান্তরে অকৃত্রিম পৌরুষ'।

প্রবাসীর পাশ দিয়ে যে নোংরা নর্দ্দমাটা বয়ে' চলেছে,—তাতে রবীন্দ্রনাথের পিছে রামানন্দবাবুও নেমে এসেছেন। হালে তাঁর এই বীভৎসতা দেখে স্তম্ভিত হ'তে হয়। উনি বোধ হয় চোখ বুজে' উপাসনা করতে করতে ঐ লেখাটা লিখেছেন। পরে হয়তো বলবেন—আমার নর্দ্দমায় কি কি ভেসে আসে, তা কি জানি? ঘুমুতে ঘুমুতে একদিন গড়িয়ে পড়েছিলাম বই ত' নয়?

Printed & published by Sj. Nripendra nath Banerjee from the Bela Printing Work
14, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta.

চ্যাম্পিয়ন স্পার্কিং প্লাগ

কে পছন্দ না করে ?

পৃথিবীতে যতগুলি মোটর কার আছে, তাহাদিগের ৩ ভাগের মধ্যে ২ ভাগ চ্যাম্পিয়ন ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাতে বুঝিতে হইবে, চ্যাম্পিয়নই উৎকৃষ্টতম স্পার্কিং প্লাগ। চ্যাম্পিয়ন স্পার্কিং প্লাগ থাকাতেই ফোর্ডে ঐ গুণ বর্ত্তমান। ১৫ বৎসর ধরিয়া এই চ্যাম্পিয়ন ফোর্ডের সাহায্য করিতেছে।

১০,০০০ মাইল চলিবার পর চ্যাম্পিয়ন বদলাইতে হয়।

চ্যাম্পিয়ন থাকিলে পেট্রল খরচ কম হয়।

সাধারণ ডিষ্ট্রীবিউটার—

ডজ এণ্ড সিমুর (ইণ্ডিয়া) লিঃ

৯নং এজরা মেনসন কলিকাতা

স্থানীয় ডিষ্ট্রীবিউটার

প্রসপারাস মোটর অ্যাকসেসরিস কোং

কলিকাতা।

CHAMPION

DEPENDABLE FOR EVERY ENGINE

WINSOR, CANADA

পরিচালক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীপ্রণবদেব মুখোপাধ্যায় ।